পশ্চিমবঙ্গ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা

১৪০৬

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ৩৩ * সংখ্যা ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬

১৮, ২৫ ফেব্রুয়ারি এবং ৩, ১০ ও ১৭ মার্চ ২০০০

এবং ৫, ১২, ১৯, ২৬ ফাল্গুন ও ৩রা চৈত্র ১৪০৬

প্রধান সম্পাদক ঃ তারাপদ ঘোষ

সম্পাদক ঃ অজিত মণ্ডল

সহযোগী সম্পাদক

অনুশীলা দাশগুপ্ত ● মন্দিরা ঘোষাল ● উৎপলেন্দু মণ্ডল

স্মরজিৎ প্রামাণিক ● সংগ্রাম গুহ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অজিত মণ্ডল

প্রথম ও দ্বিতীয় পটচিত্র

ফলতা থানার হোগলা গ্রামের ১৫০ বছরের পুরনো ছয় গম্বুজ দশ মিনার মসজিদ ও ২৫০ বছরের সুন্দরবন এলাকার টেরাকোটা মন্দির

চতুর্থ প্রচ্ছদ

পাশ্চাত্য স্থাপত্যের নিদর্শন জলটুঙি (বাওয়ালি)

অঙ্গসজ্জা ঃ প্রতাপ সিংহ তুলসীদাস বসাক রামচন্দ্র পণ্ডিত শ্যামসুন্দর রুদ্র নিতাই গোড়ে জয়দেব পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ, হেমেন মজুমদার ও সাগর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০০১২

দাম ঃ চল্লিশ টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

বিতরণ শাখা

পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

বিষয়সূচি

রঙিন চিত্রসূচি

তবু জেগে থাকে প্রাণ *শিল্পী : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী*

পঞ্চায়েতী বিকেন্দ্রীকরণে উপেক্ষিত জনপদগুলি জেগে উঠেছে

একদিকে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর—আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশি, অপরদিকে কল্লোলিনী নগর কলকাতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। দুয়ের মধ্যবর্তী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। এর অনেকগুলি গ্রাম প্রাচীন, কবি-সাহিত্যিক শিল্পী ও মনীষীদের জন্মস্থান। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় এইসব অঞ্চলের এক সমৃদ্ধ জনপদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব। অনতিদূর সংলগ্ন 'আঠারো ভাটির দেশ' কামট-কুমীর-নোনাজল নদী পরিবেষ্টিত ব-দ্বীপ অঞ্চল যার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী সুন্দরবন অরণ্য—বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গলের বাসভূমি।

ঔপনিবেশিক শোষণের বিস্তার ঘটানোর জন্য রাঁচি ছোটনাগপুর থেকে সাঁওতাল-মুন্ডা-হো আদিবাসীদের আনা হয়েছিল সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিলের কাজে। এদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েছিলেন পার্শ্ববর্তী এলাকার শ্রমজীবী মানুষ আর মেদিনীপুর থেকে বানভাসি গরিব খেতমজুর। বিনিময়ে পেয়েছিলেন চরম বঞ্চনা। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসক এইসব জমি তুলে দিয়েছিল অত্যাচারী জমিদার লাটদারদের হাতে। বনভূমিকে যাঁরা শস্য-শ্যামল করে তুলেছিলেন, যাঁদের ঘাম-রক্ত-কান্নায় এই মাটি হয়েছিল উর্বরা, স্বাধীনতার পর বহুদিন পর্যন্ত ছিলেন শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও খাদ্য থেকে বঞ্চিত। যদিও এই অন্যায়-অবিচার তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেননি, দুর্বার আন্দোলনে গর্জে উঠেছিলেন—সে এক গৌরবময় স্বতন্ত্র অধ্যায়।

ইতিহাস এগিয়ে চলে। শুরু হয় দিনবদলের পালা। বিগত ২৩ বছরে বহুদিনের উপেক্ষিত জনপদগুলি আশার আলো দেখেছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী বিকেন্দ্রীকরণের ফলে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুদূর দ্বীপময় প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রও পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

রাজ্যের প্রতিটি জেলার উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সংখ্যা তারই ফলশ্রুতি। এর আগে নদিয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংখ্যাটিকে পূর্ণাঙ্গ আকর পত্রের রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে জেলার উল্লেখযোগ্য প্রায় সব দিকগুলি সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আমন্ত্রিত কিছু প্রবন্ধে প্রসঙ্গের মিল দেখা গেছে—এক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়। তবে তথ্যানুসন্ধানে ও আলোচনায় বৈচিত্র্য আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষক সংখ্যাটি পেয়ে উপকৃত হবেন, এমন আশা করা বোধহয় অসংগত হবে না। কেননা, এর অধিকাংশ লেখক কেবলমাত্র সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেননি, ক্ষেত্র-অনুসন্ধানেও গুরুত্ব দিয়েছেন। শেষ কথা, লেখকদের বক্তব্য ও তথ্য নিজ নিজ দায়িত্বে উপস্থাপিত; এ বিষয়ে সম্পাদকের করণীয় কেবল যথাযথ পরিবেষণ, বেশি কিছু নয়।

পরিশেষে, নতুন সহস্রাব্দের সূচনালগ্নে পশ্চিমবঙ্গ-পাঠকবর্গকে জানাই শ্রদ্ধা প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতীতের গ্লানি, সংশয় ও ভীরুতা দূর হোক। হিংসা, সন্ত্রাসমুক্ত পৃথিবীতে বৈষম্যহীন সমাজের শান্তি ও প্রগতির পতাকা উড্ডীন করার অঙ্গীকারই হোক শতাব্দীর অঙ্গীকার।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিচিতি

মোট জনসংখ্যা		৫৭,১৫,০৩০
গ্রামীণ জনসংখ্যা		৫২,৬৭,২৭১
তপশিল সম্প্রদায়	**পুরুষ**	১০,১৯,৪৭১
	মহিলা	৯,৪৯,৩৪৩
আদিবাসী সম্প্রদায়	**পুরুষ**	৩৫,৭০৬
	মহিলা	৩৪,৭৯৩
মোট সাক্ষর		২৫,৫০,৭৩৭
	পুরুষ	১৬,৫১,০৮৫
	মহিলা	৮,৯৯,৬৫২
গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা		৯,৭৩,৯৭৪
দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা		৪,১৩,৮৮০ (৪২.৫ শতাংশ)
গ্রামীণ কৃষক সংখ্যা		৪,০৯,২৮৫
শহরতলি কৃষক সংখ্যা		৪,৫৯০
গ্রামীণ পুরুষ কৃষক		৩,৯৬,৭২৭
শহরতলি পুরুষ কৃষক		৪,৩৯৮
গ্রামীণ মহিলা কৃষক		১২,৫৫৮
শহরতলি মহিলা কৃষক		১৯২
গ্রামীণ কৃষিমজুর		৪,৩০,৩৪০
শহরতলি কৃষিমজুর		১৪,৩৫২
গ্রামীণ কৃষিমজুর পুরুষ		৪,১২,১৩৩
শহরতলি কৃষিমজুর পুরুষ		১৩,৭৪৩
গ্রামীণ কৃষিমজুর মহিলা		১৮,২০৭
শহরতলি কৃষিমজুর মহিলা		৬০৯
গ্রামীণ প্রান্তিক বেকার		১,২১,৮৫০
শহরতলি প্রান্তিক বেকার		৩,৮৩৯
গ্রামীণ প্রান্তিক বেকার পুরুষ		৩২,৪৮৫
শহরতলি প্রান্তিক বেকার পুরুষ		২,৭৭৯

গ্রামীণ প্রান্তিক বেকার মহিলা	৮৯,৩৬৫
শহরতলি প্রান্তিক বেকার মহিলা	১,০৬০
গ্রামীণ বেকার (নন-ওয়ার্কার্স)	৩৫,৪৪,২৪৯
শহরতলি বেকার (নন-ওয়ার্কার্স)	৫,৫৩,৮৯৭
গ্রামীণ পুরুষ বেকার (নন-ওয়ার্কার্স)	১৩,০২,৮৫৮
শহরতলি পুরুষ বেকার (নন-ওয়ার্কার্স)	২,১২,৫১০
গ্রামীণ মহিলা বেকার (নন-ওয়ার্কার্স)	২২,৪১,৩৯১
শহরতলি মহিলা বেকার (নন-ওয়ার্কার্স)	৩,৪১,৩৮৭
মহকুমা	৫
পঞ্চায়েত সমিতি	২৯
গ্রাম পঞ্চায়েত	৩১২
পৌরসভা	৭
থানা	২৯
দ্বীপের সংখ্যা	৩৭
মৌজা	২,১৮৩
গ্রাম	৩,৪৭০
বর্গাদার	১,২৫,৬৬৫
পাট্টাদার	১,০৯,৩৫৭
বনাঞ্চল	৬,৭৮৫ হেক্টর
চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	৩,৯২,৭৯৫ হেক্টর
ভূমিহীন পরিবার	২৮,৬৪৩
মৎস্যজীবী পরিবার	৫৮,৩৫৮
ভেড়ির সংখ্যা	১,৮৩৭
বাজারের সংখ্যা	৩২৩
দৈনন্দিন বাজার	১১৫
সাপ্তাহিক বাজার	২০৮
কাঁচা রাস্তার এলাকা	৭,৪৩,৯২৫ কিমি
ইটপাতা রাস্তা	১,৬৭৮ কিমি
বাঁধানো রাস্তা	৬,৫২২ কিমি
জেটির সংখ্যা	৩৫
ফেরির সংখ্যা	১২৩
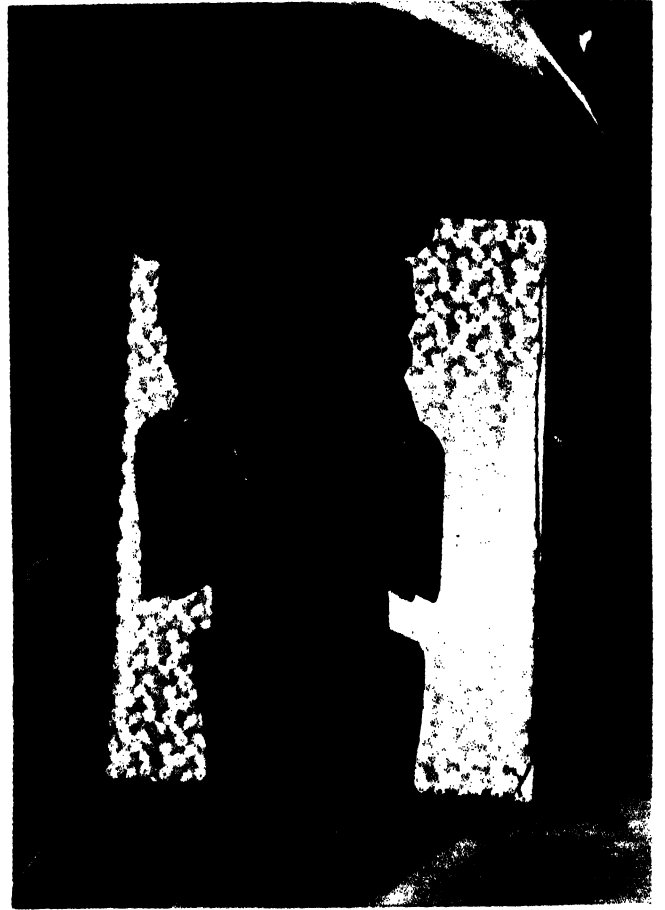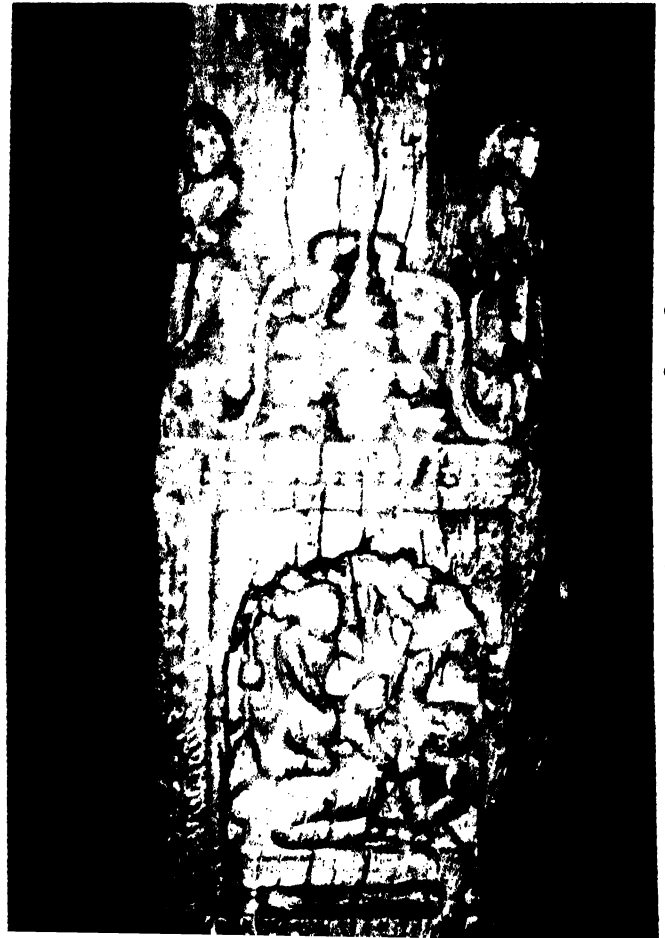
ক্ষণ চব্বিশ পরগনায় প্রাপ্ত পুঁথি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

● রাজারাম দাসের পুঁথির পাটা 'অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু' প্রাপ্তিস্থান ঃ গজাবন্তীপুর গ্রামে অমৃতলাল নস্করের বাসভবন (১৯৭২) সংগ্রাহক ঃ অক্ষয়কুমার কয়াল
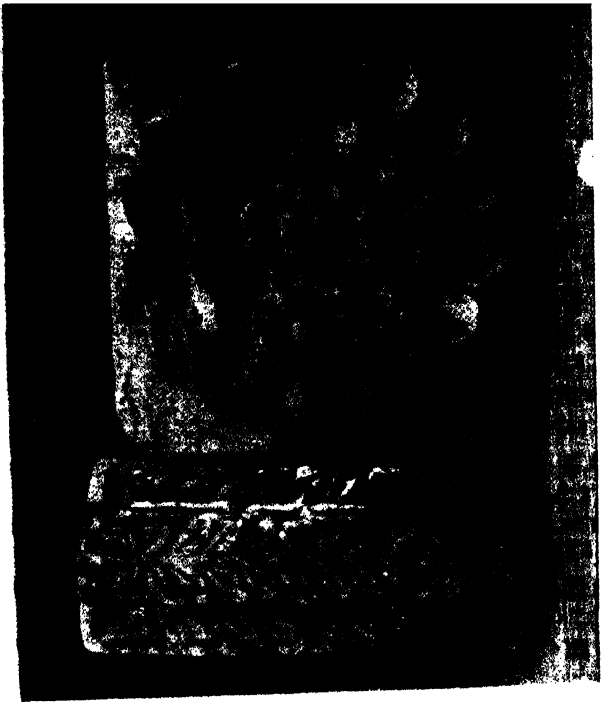
● বিষ্ণুপুর থানার ২নং ব্লকে অবলুপ্ত টেরাকোটা মন্দিরের মৃৎফলক
ছবি ঃ দেবাশিস ভদ্র
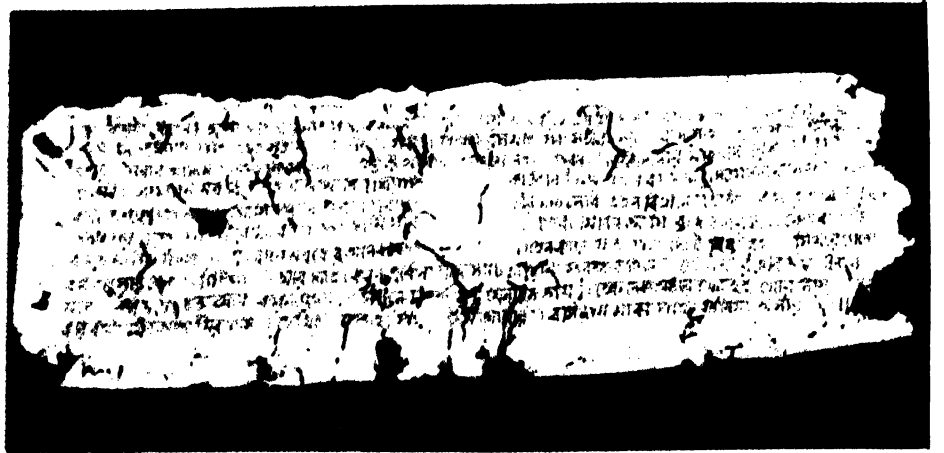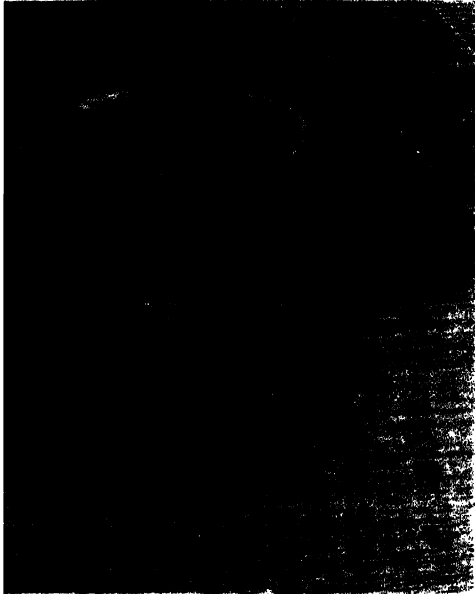
● রাজারাম দাসের পুঁথির পাটা 'ধর্মের গান' প্রাপ্তিস্থান ঃ বিষ্ণুপুর থানার মাছখালি গ্রামে শ্রীধরচন্দ্র মণ্ডলের বাসভবন (১৯৭৩) সংগ্রাহক ঃ অক্ষয়কুমার কয়াল

নের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নদীর তীরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র ছবি ঃ দেবাশিস ভদ্র

ম দাসের পুঁথির পাটা 'কালীয় দমন' প্রাপ্তিস্থান ঃ গজাবন্তীপুর গ্রামের
াল নস্করের বাসভবন (১৯৭২) সংগ্রাহক ঃ অক্ষয়কুমার কয়াল

● জয়নগর থানায় প্রাপ্ত মৃৎফলক
সংগ্রাহক ঃ সাগর চট্টোপাধ্যায়

সুশীল ভট্টাচার্য
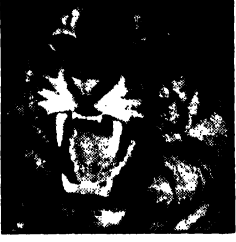
চব্বিশ পরগনার অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাচীন ও মধ্যযুগ

প্রাচীন যুগ

ডায়মণ্ডহারবারের কাছে প্রাচীন সরস্বতী তীরে (বর্তমান গঙ্গা) হরিনারায়ণপুর ও দেউলপোতায় নদীর পাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে নব্যপ্রস্তর যুগে ব্যবহৃত মানুষের হাতিয়ার ও তৈজসপত্র—পাথর ও হাড় দিয়ে তৈরী। প্রাচীন প্রস্তর যুগের এই আয়ুধগুলো খুব শানিত, পালিশ করা বা হাতল লাগানো নয়। এই যুগে ২৪-পরগনার মানুষ আগুনের ব্যবহার জেনেছে। পশু-পাখীর মাংস ও মাছ আগুনে ঝলসে খাচ্ছে। খাচ্ছে গাছের ফলমুলও। কৃষিকর্মের সূচনা হয়েছে। মাটির পাত্র তৈরী করে পুড়িয়ে নিচ্ছে। জল ও আহার্য বড় মাটির পাত্রে সংগ্রহ করে রাখার ফলে নদীতীর ছেড়ে অন্যত্র গৃহনির্মাণ করে বাস করতে আরম্ভ করেছে। মুরগী ও শূকর পুষছে। হাত ও পায়ের কুড়িটা আঙ্গুল থেকে কুড়ি দরে গণনা শিখেছে।

এই যুগে সম্ভবতঃ ধান ও গৃহপালিত পশু দিয়ে বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ তখন বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। অস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাম্রাশ্ম যুগের সূচনা হলো—এ সময়টা মহাভারতের কাল। বীরভূমে বোলপুরের কাছে অজয় নদের তীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবি খনন করে এই সময়ের বাঙ্গালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ২৪-পরগনায় যে অনুরূপ সভ্যতা কোন কোন স্থানে ছিল না—এ কথা কে জোর করে বলবে? মহাভারতে আছে ভীমসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাভূত করেন এবং সুহ্ম, তাম্রলিপি, কর্বট প্রভৃতি রাজ্য এবং সমুদ্রতীরবর্তী ম্লেচ্ছদের জয় করেন। এই ম্লেচ্ছরাই সেদিনকার ২৪-পরগনার মানুষ। তখনকার আর্যগণ, অনার্য বাঙ্গালীদের ম্লেচ্ছ, অসুর দস্যু প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক নামে অভিহিত করতেন।

পিপ্পলী বা লঙ্কা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে রপ্তানি হত। এক সের লঙ্কার দাম ছিল তিরিশ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার)। রাঢ়ের দক্ষিণ সমুদ্রে অর্থাৎ ২৪-পরগনা ও মেদিনীপুরে যে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত—তার ইঙ্গিত রাজেন্দ্রচোলের তিরুময় লিপিতে আছে। গাঙ্গেয় মুক্তার কথা পেরিপ্লাস গ্রন্থেও রয়েছে। ধান্যের পরই গুবাক (সুপারি) ও নারিকেল ২৪ পরগণার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। গুবাক্ সংক্ষেপে গুয়া এবং তার হাটের একটি স্থানের নাম গুয়াহাটি বা গৌহাটি ছিল। এ ছাড়া কলা, আম, কাঁঠাল, ডালিম প্রভৃতি ফলও ২৪-পরগনায় যথেষ্ট উৎপন্ন হত।

কৃষিকাজ

এই অষ্ট্রিকভাষী অনার্য বাঙ্গালীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ৮/১০ হাজার বছরের ওপার থেকে। বাংলার আদিম অষ্ট্রিক বা নিষাদজাতি অরণ্যচারী শিকারী ছিল। ধনুক-বাণই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। ধনুক ও বাণ শব্দ দুটি মূলত অষ্ট্রিক। এ ছাড়া বাঁখারি, দা, করাত, লাউ, কলা, বাইগণ (বেগুন), ডুমুর, কামরাঙ্গা প্রভৃতি শব্দ ঐ আদিম অষ্ট্রিক ভাষা যা এখনও বাংলা ভাষায় বর্তমান।

ধান : নব্য প্রস্তরযুগে ২৪-পরগনার বাঙ্গালী গ্রামে বাস করত। করত কৃষিকাজ। লাঙ্গল শব্দটাই অষ্ট্রিক। বন্য ধানকে ওরা লোকালয়ে এনেছিল এবং নিজেদের প্রধান খাদ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। লাঙ্গল হয়তো প্রথম দিকে পাথরের বা বাঁশের তৈরী হত, পরে তাম্র এবং সবশেষে লৌহ নির্মিত হয়েছিল। গরুর গাড়ী তিন হাজার বছরের উর্দ্ধে প্রচলিত ছিল, আজও আছে। ডোঙ্গা কথাটাও অষ্ট্রিক। গ্রামের নদীনালায় যানবাহন হিসেবে এবং মৎস্য শিকারে ব্যবহৃত হত, আজও হয়। প্রাচীন বাঙ্গলায় নানাজাতীয় ধানের মধ্যে শালিধানের প্রসিদ্ধি ছিল। কালিদাসের 'রঘুবংশে' আছে—বাংলাদেশের কৃষক-পত্নীরা আখ খেতের ছায়ায় উপবিষ্ট হয়ে শালিধান রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকত। এই ধানের কথা আমরা প্রথম পাচ্ছি খৃঃ পূর্ব ৩য় শতকে মৌর্যযুগে বগুড়ার কাছে মহাস্থানগড়ের (প্রাচীন পুন্ড্রবর্দ্ধন) শিলালিপিতে। তাতে দুর্ভিক্ষে প্রজাদের ধান এবং শস্য আর গণ্ডক
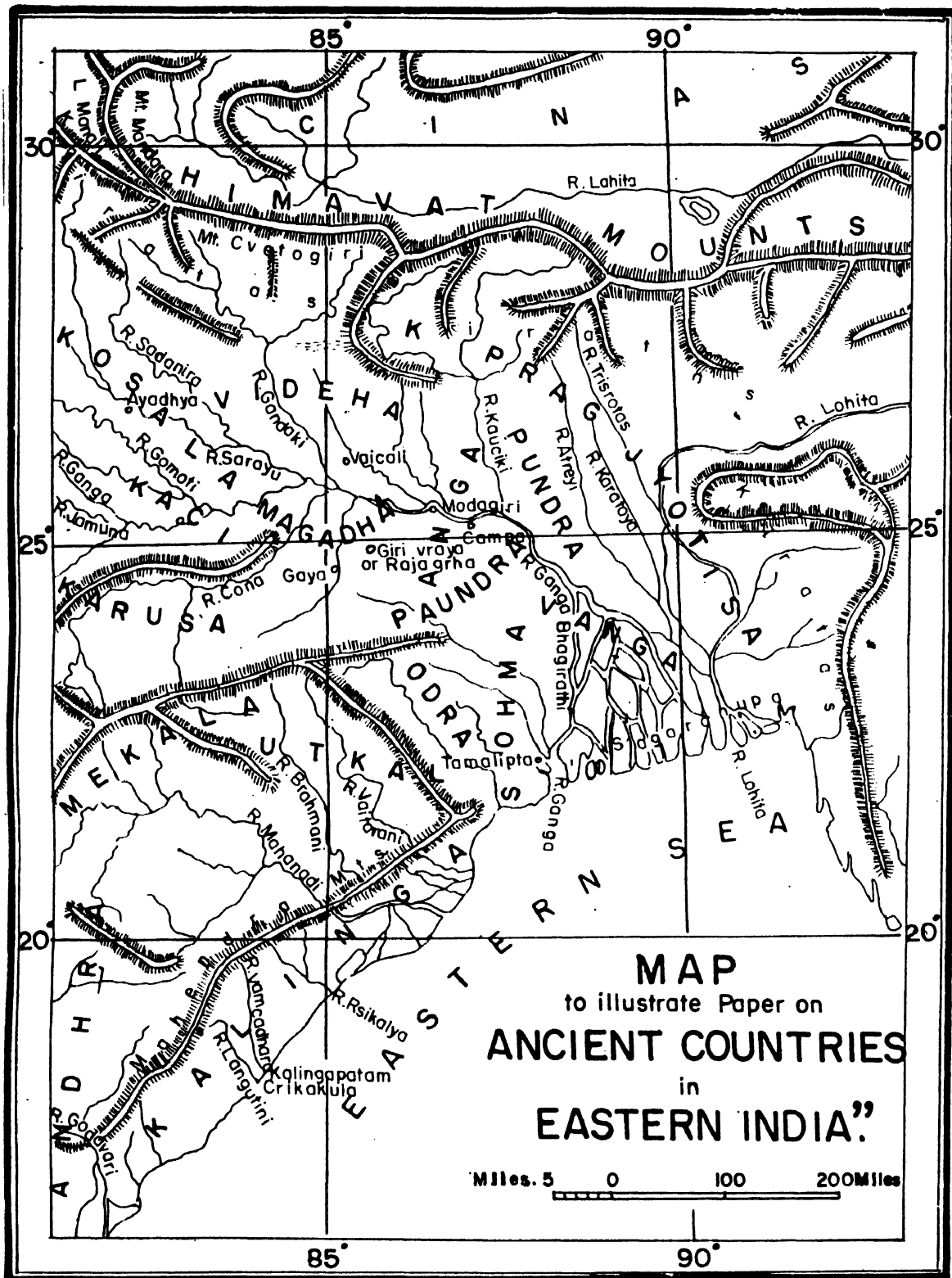
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জেলার বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে
(ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

নামে কিছু মুদ্রা ঋণ হিসাবে দেবার রাজাদেশ রয়েছে। বর্তমান ২৪-পরগনায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সকালে পান্তা এবং দুপুরে ও রাতে গরম ভাত খাবার প্রথা প্রচলিত আছে, মনে হয়, এটা খুব প্রাচীন প্রথা। প্রাচীনকালে সবজাতিই ধান চাষ করত—রাজর্ষি জনক থেকে বাংলার চারণ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পর্যন্ত।

ধানের পর আখই বোধ হয় প্রাচীন ২৪-পরগনায় বড় কৃষিজ পণ্য ছিল। যদিও উত্তরবঙ্গের আখ চাষের কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে—সুশ্রুত লিখিত পুণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রসিদ্ধ 'পৌণ্ড্রক' ইক্ষু এবং সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে লিখেছেন, বরেন্দ্রভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম কারণ তার ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ। তবুও এ জেলায় এবং অন্য জেলাতেও যথেষ্ট আখচাষ ছিল বলে মনে হয়, এখনও আছে। দু হাজার বছর আগে তাম্রলিপ্তি ও গঙ্গে বন্দর দিয়ে প্রচুর উৎকৃষ্ট গুড় রোম সাম্রাজ্যে রপ্তানি হত। এই গুড় থেকেই সেদিন এ দেশের নাম গৌড় হয়েছিল। এ জেলাতে এখনকার মত প্রাচীনকালেও প্রচুর খেজুর গাছ ছিল এবং ঐ সব গাছের রস থেকে খেজুর গুড় তৈরী হত—যেমন আজও হয়। দক্ষিণ ২৪-পরগনার জয়নগর ও উত্তর ২৪-পরগনার বসিরহাট অঞ্চলের খেজুর গুড়; মোয়া, পাটালি সম্ভবতঃ বহুদিন ধরে বিখ্যাত।

তুলা : কার্পাস শব্দটাও অষ্ট্রিক এবং সুপ্রাচীনকালে তুলার চাষও এদেশে প্রচুর পরিমাণে হত। বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে বড় শিল্প ও ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায়। অতিসূক্ষ্ম সুতী-বস্ত্র বা মসলিন বিদেশে রপ্তানি হত। নিজেদের আটপৌরে মোটাসোটা কাপড় ২৪-পরগনার মানুষ পরিধেয় বস্ত্ররূপে ব্যবহার করত। চর্যাপদের নানা সুরেলা গানে আমরা বাংলার সূতা বা তাঁতের কথা পাচ্ছি। ডোম রমণীরাই বোধ হয় তখন বাঁশের তাঁত তৈরী করত। তন্ত্রীপাদ বা তাঁত শিক্ষকের কথাও পাওয়া যাচ্ছে। একটি শ্লোকে রয়েছে 'নির্ধন ব্রাহ্মণের গৃহে নারীরা তুলা ধুনিয়া সূতা কাটিতেন।'

৬০ বছর আগেও আমাদের বাল্যকালে দেখেছি—বিধবা ব্রাহ্মণীদের গৃহে কার্পাস তুলার গাছ এবং পৈতার সুতাসহ সুতা কাটার রীতি। শতবর্ষ আগেও অধিকাংশ ঘরে ঘরে সূতা কাটা, গ্রামের তাঁতে কাপড় বোনা, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ এবং মাঠে ধান ছিল। সবার না হলেও অধিকাংশ লোকের মাছ-ভাত-দুধ কাপড়ের খুব অভাব ছিল না। উত্তর কলকাতার সুতানুটি গ্রাম একদিন সূতার হাটের জন্য বিখ্যাত ছিল। দক্ষিণ ২৪-পরগনার সুতাবেচা, চাউল-গোলা, বারুইপুর, সরিষার হাট, শাঁখশহর প্রভৃতি গ্রামের আজ নামটাই পড়ে আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য আর নেই।

সর্ষের তেলে বাঙ্গালী চিরকাল রেঁধে এসেছে, পুরুষেরা গায়ে মেখেছে তাই সর্ষের চাষ বাংলার সর্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। আজও আছে। তবে পঃ বঙ্গে এর চাষের পরিমান বাড়ানো দরকার।

বরজ কথাটা অষ্ট্রিক। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাঙ্গালী পান খেয়ে এসেছে। চাষ করেছে, রপ্তানিও করেছে।

পিপ্পলী বা লঙ্কা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে রপ্তানি হত। এক সের লঙ্কার দাম ছিল তিরিশ স্বর্ণমুদ্রা (দীনার)। রাঢ়ের দক্ষিণ সমুদ্রে অর্থাৎ ২৪-পরগনা ও মেদিনীপুরে যে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত—তার ইঙ্গিত রাজেন্দ্রচোলের তিরুময় লিপিতে আছে। গাঙ্গেয় মুক্তার কথা পেরিপ্লাস গ্রন্থেও রয়েছে। ধান্যের পরই গুবাক (সুপার) ও নারিকেল ২৪ পরগণার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল। গুবাক্ সংক্ষেপে গুয়া এবং তার হাটের একটি স্থানের নাম গুয়াহাটি বা গৌহাটি ছিল। এ ছাড়া কলা, আম, কাঁঠাল, ডালিম প্রভৃতি ফলও ২৪-পরগনায় যথেষ্ট উৎপন্ন হত। ৭ম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট এবং সমতট থেকে ২৪-পরগনার ওপর দিয়ে তাম্রলিপ্তি ভ্রমণ করেছিলেন। সে সময় তিনি একটি ফলের কথা বলছেন, যে ফল বৃহদাকার এবং গাছের পাদদেশ থেকে ডালপালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—উহার মধ্যে অসংখ্য সুমিষ্ট কোষ। উহাই সেদিনের 'পনস' বা আজকের কাঁঠাল।

লক্ষ্মণ সেনের দঃ গোবিন্দপুর তাম্রশাসন বারুইপুরের ঠিক দক্ষিণে যে 'শাসন' গ্রাম দান করা হয়েছে—তার অন্যতম আয়ের ক্ষেত্র উল্লিখিত হয়েছে ঝাট-বিটপ (বাঁশঝাড় ও বৃক্ষাদি), গুবাক, নারিকেল ও গঙ্গাতীরে দাড়িম্ব ক্ষেত্র। লিপিগুলোতে ধান্য, অন্যান্য শস্য, মৎস্য প্রভৃতি উপকরণ প্রায়ই অনুল্লিখিত থাকত।

তবে মাঝে মাঝে সজল (অর্থাৎ সমস্য) ও সলবণ অর্থাৎ লবণ কর ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৪-পরগনার সমুদ্রতীরবর্তী নিম্ন-ভূমিতে (অন্যান্য জেলাতেও) জোয়ার যখন আসে, তীরবর্তী অনেক স্থানই নোনাজলে ডুবে যায়। বড় বড় গর্তো করে লোকে সমুদ্রের জল ধরে রাখে। পরে রৌদ্রে অথবা জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে লবণ তৈরী করে। এই প্রথাটি প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ পাই নয়পালদেবের ইরদা তাম্রলিপিতে।

সহকার-পনস বা আম-কাঁঠালও ২৪-পরগনার বড় উৎপন্নদ্রব্য ছিল। ১২শ শতকের শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসনে দেখি—"সাম্রপনসা। সগুবাক—নালিকেরা সলবণা সজলস্থলা।" বিটপ শব্দটিতে কাষ্ঠ ও অরণ্যের কথাও বোঝাত। এটা চিরকালই মূল্যবান উৎপন্নদ্রব্য। মৎস্য কৃষিজদ্রব্য না হলেও ২৪-পরগনার সমুদ্র ও নদ-নদীতে প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হত।

যে কোন দেশের অর্থনীতি বা ধনোৎপাদনের মোটামুটি তিনটি উপায়—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। প্রাচীন ২৪-পরগনার কৃষিজ উৎপন্নদ্রব্যের কথা উল্লিখিত হল।

শিল্পকাজ

মৃতশিল্প : সম্ভবত মৃৎশিল্পই ২৪-পরগনা আদিম শিল্প। প্রথম দিকে মানুষ মৃৎশিল্প হাতে তৈরী করেছে। পরবর্তীকালে চাকে এবং ছাঁচে। এই ভাবে হাড়ি, কলসী, ঘট, জালা, থালা ও সরা, মালসা, খেলনা, পুতুল, প্রতিমা পর্যন্ত প্রাচীন ২৪-পরগনায় তৈরী হয়েছে। এই পোড়ামাটির তৈরী মানুষের নানা সৃষ্টি 'টেরাকোটা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দঃ ২৪-পরগনার আটঘরা, হরিনারায়ণপুর, রাক্ষসখালি ও সাগরদ্বীপ, বোড়াল এবং উত্তর ২৪-পরগনার চন্দ্রকেতুগড়, হাড়োয়া প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাচীনকালের নানাপ্রকারের প্রচুর পোড়ামাটির বিচিত্র বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক মূর্তির মধ্যে গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। জানি না, মানুষের মাথার খুলিই আদিম মানুষ প্রথম পান-পাত্র হিসেবে ব্যবহার করত কিনা তবে মাটির খুলি কথাটা এখনও প্রচলিত এবং মৃন্ময় ঘটের আকৃতি মানুষের গলা থেকে মুণ্ডের আকার স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলার বিভিন্ন হাটে ও গঞ্জে এই মৃৎশিল্পের বাজার ছিল, আজও আছে, তবে ধাতব পাত্রের আবির্ভাবের পর থেকে কুম্ভকারদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি চাহিদা ক্রমশঃ কমে গেছে।

হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত জীবজন্তুর হাড়ের তৈরি আয়ুধ *(রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালা, বেহালার সৌজন্যে)*

বস্ত্রশিল্প : খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় উৎকৃষ্ট সূতীবস্ত্র (মসলিন), রেশম ও পট্টবস্ত্র তৈরী হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকুল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক এই চার রকম বাংলার বস্ত্রের উল্লেখ আছে।

এর মধ্যে প্রাচীন ২৪-পরগনা কিছু কার্পাস বস্ত্র এবং সম্ভবতঃ পট্টবস্ত্র তৈরী করত। মসলিন বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও কোমল ছিল যে একখানা কাপড় একটা আংটির মধ্য দিয়ে গলে যেত।

তাম্র ও লৌহ শিল্প : কৃষিকাজ খুবই আদিম কালের এবং কৃষি-যন্ত্রাদি প্রথমে পাথর, কাঠ থেকে আরম্ভ করে পরে তামা ও সবশেষে লোহায় নির্মিত হত। ২৪-পরগনার কর্মকার প্রাচীনকাল থেকেই নানা যন্ত্র তৈরী করেছে। বাংলার দ্বিধার তলোয়ার একদিন বিখ্যাত ছিল।

কাষ্ঠশিল্প : বিটপ শব্দটিতে কাষ্ঠ ও অরণ্যের কথাও বোঝাত। ইহা চিরকালই মূল্যবান উৎপন্নদ্রব্য। তখনকার সুনিপুণ তক্ষণ শিল্প তো কাষ্ঠ ছাড়া হতই না। ঘরবাড়ী, মন্দির, পালকি, গরুরগাড়ী (তিন হাজার বছরের প্রাচীন), রথ, নানা-প্রকার নৌকা, সমুদ্রগামী পাল তোলা জাহাজ সবইতো কাষ্ঠ নির্মিত ছিল। সে সবের আজ বিশেষ কিছু বেঁচে নেই। তবুও প্রাচীনকালের ভগ্ন মন্দির বা গৃহের স্তম্ভ, খিলান, খুঁটির দুচারটি টুকরার যে কারু-নৈপুণ্য এখনও দৃষ্টি গোচর হয় তা বিস্ময়কর। এই সেদিনও যে কাঠের পুতুলের ও পোড়ামাটির মাতৃমূর্ত্তি মেলায় মেলায় বিক্রী হত, তা বহু প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

নানা শিল্পদ্রব্য নির্মাণের সাথে সাথে এই জেলার বাণিজ্যেরও প্রসার হয়েছিল অতি প্রাচীনকাল থেকে। বাণিজ্য দুরকম ছিল ঃ অন্তর্বাণিজ্য (বাংলা ও ভারতের মধ্যে) এবং বৈদেশিক বহির্বাণিজ্য- সিংহল, সুবর্ণভূমি, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব এশিয়ার নানাস্থানে। আবার পশ্চিমে মিশর, গ্রীস, রোম, ভূ-মধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপেও। এ সব বিবরণ পেরিপ্লাস গ্রন্থে (১ম শতক) ও টলেমীর বিবরণীতে (২য় শতক) পাওয়া যায়। অন্তর্বাণিজ্য জল ও স্থল উভয় পথেই হত। সরস্বতী, গঙ্গা, বিদ্যাধরী, যমুনা, ইছামতী প্রভৃতি নদী দিয়ে পণ্যদ্রব্য সারা বাংলা ও পূর্ব-ভারতে ছড়িয়ে পড়তো। সেদিন এ সব নদী কত কোলাহলে মুখরিত ছিল। প্রাচীন স্থলপথও অনেক। য়ুয়ান চোয়াঙ ৭ম শতকে যে পথ দিয়ে সমতট থেকে ২৪-পরগনার ওপর দিয়ে তাম্রলিপ্তি আসেন সে পথে পূর্ববঙ্গে ও কামরূপে ২৪-পরগনার পণ্যদ্রব্য গরুরগাড়ী করে যেত, এ তো অসম্ভব কল্পনা নয়। এ ছাড়া গঙ্গাতীর ধরে শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে যাত্রার বহু জন লাঞ্ছিত প্রাচীন পথ যাকে আমরা দ্বারীর জাঙ্গাল বলে জানি সে পথও বাণিজ্য পথ ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ইংরেজ আমলে যত রেলপথ হয়েছে সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীনস্থল পথের ওপরই নির্মিত।

প্রাচীনযুগে গঙ্গার মোহনাস্থ গঙ্গে বন্দর, নিকটস্থ তাম্রলিপ্তি বন্দর, হরিনারায়ণপুর, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি বন্দরই ২৪-পরগনা ও বাংলার প্রধান বাণিজ্য পথ ছিল। এই বাণিজ্য খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে ৭ম শতক পর্যন্ত অব্যাহত। তার পরেই শতবর্ষের মাৎস্যন্যায়ের কালে ইহা বিপর্যস্ত। অষ্টম শতকে সরস্বতী ক্ষীণ হওয়ায় তাম্রলিপ্তি বিনষ্ট। তৎপূর্বেই গঙ্গে বন্দরও অবলুপ্ত। খৃঃ পূঃ তিনশো ও খৃষ্টীয় তিনশো—এই প্রায় ছশো বছরকাল ২৪-পরগনায় পরাক্রান্ত গঙ্গারিডি জাতির কাল। সেদিন এখান থেকে দুঃসাহসী বাঙ্গালীর জাহাজ সমুদ্র পথে দিক্-দিগন্তের বাণিজ্য করতে যেত আর সেখান থেকে ধনৈশ্বর্যে ও নানা দ্রব্য নিয়ে দেশে ফিরত। রোম সাম্রাজ্যের প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা সেদিন এ দেশে এসেছিল—যে জন্য শুঙ্গ-কুষাণযুগে ও গুপ্তযুগে আমরা প্রচুর

স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পাই, ৭ম শতকের পর যা অদৃশ্য হয়ে গেল। এ দেশের বাণিজ্যের সেই স্বর্ণযুগে ঐতিহাসিক প্লিনি শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন—'এই ভাবে স্বর্ণ রপ্তানি হতে থাকলে শীঘ্রই রোম-সাম্রাজ্য স্বর্ণহীন হয়ে পড়বে।' গুপ্তযুগে সোনার চেয়ে রূপায় দাম ছিল বেশী। মানুষ তখন স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে জমিজমাও কিনতো। মুদ্রা বিনিময় নির্ভর। অর্থনৈতিক জীবন সভ্যতার অগ্রগতি সূচিত করে। প্রাচীনযুগে অর্থ সঞ্চিত থাকত বণিকদের হাতে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বণিকরাই মুদ্রা তৈরী করতেন। অবশ্য এর নিয়ন্ত্রণ থাকত রাজার হাতে। বাংলার প্রাচীনতম মুদ্রা মৌর্য মুদ্রা। এ যুগের মুদ্রা ২৪-পরগনা জেলার আটঘরা, হরিনারায়ণপুর এবং চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া গেছে। এগুলো প্রায় ক্ষেত্রেই তাম্রমুদ্রা—শুধু বেড়াচাঁপা ও জাত্রায় (বর্তমান ঝিকরা) কিছু রৌপ্যমুদ্রাও পাওয়া গেছে। মুদ্রাগুলির বুকে সূর্য, হস্তী, পদ্ম, অর্ণবপোত প্রভৃতির চিহ্ন অঙ্কিত। চন্দ্রকেতুগড়ে কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। অপর একটি স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত। জয়নগরের কাছে বাইশহাটার মঠবাড়ী থেকে এবং সুন্দরবনে জি-প্লটের বুড়াবুড়ির তট থেকে ২য় চন্দ্রগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে বারুইপুরের কাছে নবগ্রামে রাস্তা তৈরীর সময় গুপ্তযুগের শেষভাগের একটি স্বর্ণমুদ্রা (জয়নাগ) আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—১৭৮৩ সালে কালিঘাটে এক হাঁড়ি গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা (২০০টি) আবিষ্কৃত হয়।

পাল রাজাদের আমলের বা সেন-আমলের মুদ্রা এ জেলায় কেন বাংলাদেশেও বিশেষ পাওয়া যায় নি। এটি বেশ রহস্যজনক ব্যাপার। অবশ্য তখন মুদ্রারূপে কড়ির ব্যাবহার খুবই প্রচলিত ছিল। এই সেদিনও পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত কড়ি বাজারে চালু ছিল। মেয়েরা বিবাহের সময় বরকে কড়ি দিয়ে কিনতো। আজও সে প্রথা রয়ে গেছে। লক্ষ্মণ সেন নাকি একলক্ষ কড়ির কম কাউকে দান করতেন না। ৪র্থ শতকে ফা-হিয়েন বলছেন—শহরে ও বাজারে কড়ির ব্যবহার খুবই প্রচলিত। কড়ি আসতো মালদ্বীপ থেকে।

গুপ্তযুগকে বলা হয় ভারতের সুবর্ণযুগ। ঐশ্বর্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে সকল দিকেই সমৃদ্ধশালী। তবে কি স্বর্ণমুদ্রার অভাবে বাংলার পাল-সেনযুগ দীন-দরিদ্র ছিল? ইতিহাস তো তা বলে না। বহির্বাণিজ্যের অভাবে মানুষ ক্রমশঃ কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল একথা ঠিক কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল বলে তো মনে হয় না। সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে পালরাজধানী রামাবতীর বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'প্রশস্ত রাজপথের ধারে কনক-পরিপূর্ণ ধবল প্রাসাদ শ্রেণী মেরুশিখরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত এবং ইহার উপর স্বর্ণকলস শোভা পাইত। নানাস্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, পুষ্করিণী, ক্রীড়াশৈল, ক্রীড়াবাপী ও নানাবিধ পুষ্প, লতা, তরু, গুল্ম নগরের শোভা বৃদ্ধি করিত। হীরক, বৈদুর্যমণি, মুক্তা, মরকত, মাণিক্য ও নীলমণি খচিত আভরণ, বহুবিধ স্বর্ণ খচিত তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ, মহামূল্য বিচিত্র সূক্ষ্মবসন, চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য এবং নানা যন্ত্রোত্থিত মন্ত্রমধুর ধ্বনির সহিত বিশুদ্ধ সঙ্গীত-রাগিণী নাগরিকদের ঐশ্বর্য, সম্পদ, রুচি ও বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিত।' সাধারণ পরিচারিকাগণও মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত থাকত। রামচরিতে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির মনোরম বর্ণনাও আছে যা ২৪-পরগনাকে বাদ দিয়ে নয়।

OLD FLOW OF THE ADI GANGA
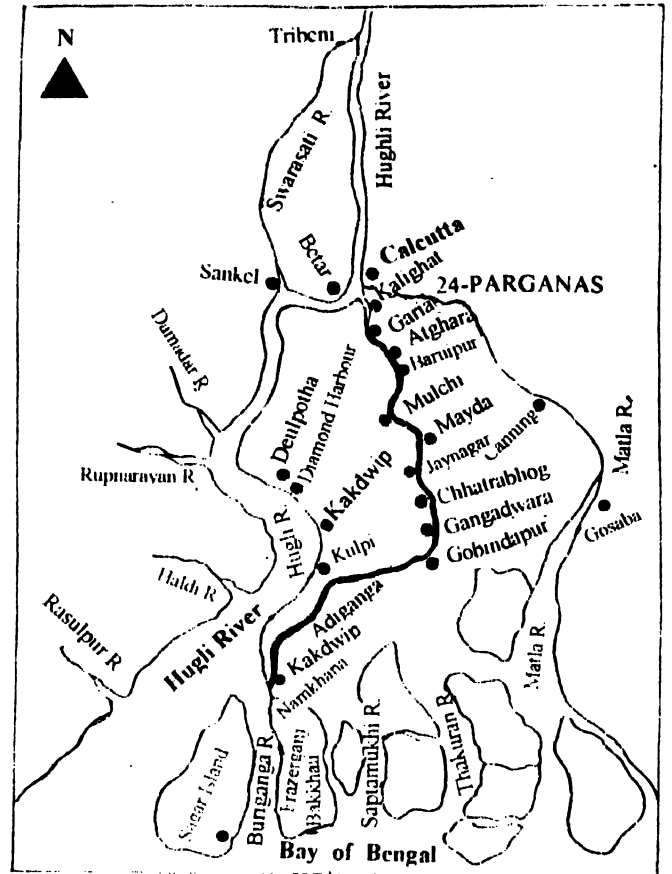
পুরনো আদি গঙ্গা-প্রবাহ, নীরা সেন অঙ্কিত

মধ্যযুগ

হিন্দুযুগের শেষ পাঁচশো বছরে বাংলাদেশে পাল-সেন আমলে তখনকার বিখ্যাত রাজাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রায় পাওয়া যায়নি বল্লেই চলে। এখনও এটা একটা অজ্ঞাত রহস্য। সম্ভবত তখন গুপ্তযুগের মুদ্রাই চলতো এবং সেন আমলে কড়ির বহুল প্রচলন ছিলো। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নবদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করেন। তারপর আরো দুশো বছর লেগেছিলো সমগ্র বাংলাদেশের ওপর মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। এর অনেক পরে পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। আমরা ১২০৪ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বৎসরকাল বাংলায় মুসলিম যুগ বা মধ্যযুগ বলে অভিহিত করছি।

১২০৪-১৩৩৯ খৃঃ বাংলার পাঠান (বা আফগান) শাসকেরা দিল্লীর অধীন ছিলেন। ১৩৩৯-১৫৩৮ খৃঃ এই দুশো বছর এঁরা বাংলায় স্বাধীন সুলতান হিসেবে রাজত্ব করেন। ১৫৭৬-এ দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়। এই ২৩৬ বছরে ৬০ জন পাঠান সুলতান বাংলার রাজত্ব করেন।

বাংলার প্রথম মুসলিম বিজেতা বখতিয়ার খিলজি ১২০৪ সালে বাংলার কিছুটা অধিকার করেই রাজমুদ্রা (সিক্কা টাকা) প্রচার করেন। মুসলিম যুগে বাংলার সব স্বাধীন সুলতানই নিজের নামে মুদ্রা ছাপাতেন। সতেরো শতকের পর সুবাদারি আমলে মোগল সম্রাটদের

মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিলো। রূপার নাম ছিলো 'টঙ্ক'—এ থেকেই টাকা শব্দের জন্ম। হিন্দু যুগের মত মধ্যযুগেও সাধারণ কেনা-বেচায় কড়ি ব্যবহৃত হতো।

সে যাই হোক ১৩শ থেকে ১৬শ শতক পর্যন্ত মোটামুটি বাংলার স্বাধীন সুলতানী বা পাঠান আমল বলা যায়। এ সময় বাংলার ধন-সম্পদ বাংলাতেই থাকতো। বাইরে পাচার হয়ে যেতো না। এ সময়টা ছিলো বাংলার স্বর্ণযুগ। সত্যিই সেদিন বাংলা ছিলো সোনার বাংলা। ধনৈশ্বর্যে, শিল্পে, কৃষিতে, বাণিজ্যে বাংলার সমৃদ্ধির অন্ত ছিলো না। ক্রমশঃ বাংলার ঐশ্বর্যের কথা সারা পৃথিবীতে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু মোগল আমলে বাৎসরিক খাজনা হিসেবে বহু টাকা বাংলা থেকে দিল্লীতে চলে যেতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বছরে এক কোটি টাকা এবং অন্যান্য সুবাদারের আমলেও অনুরূপ পরিমাণ টাকা দিল্লীতে চলে যেতো।

এছাড়া 'ঘুষ' জিনিষটা বোধ হয় চিরকালীন। এ সময় এটা প্রচুর পরিমাণে ছিলো। বাংলার সুবাদারগণ অবসর গ্রহণকালে সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত বহু টাকা এদেশ থেকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। শায়েস্তা খাঁ ৩৮ কোটি টাকা এবং ঔরংজেবের নাতি আজিমুশ্বান ৮ কোটি টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যরা বাদ যান নি। এই পরিমাণ রূপার টাকা গাড়ী বোঝাই হয়ে দিল্লীতে চলে যেতো। এভাবে শোষণের ফলে রূপার টাকার পরিমাণ এদেশে খুব কমে যায়। জিনিষপত্রের দামও পড়ে যায়। কড়ির ব্যবহার বেড়ে যায়। পলাশী যুদ্ধের কাল পর্যন্ত এদেশে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিলো।

ওপরে যে কোটি কোটি টাকা অপহরণের কথা বলা হল—তার দাম কি ছিলো, তখনকার জিনিষপত্রের দামের একটা হিসেব দিলেই তা বোঝা যাবে। ১৪শ শতকে আফ্রিকা থেকে পর্যটক ইবনবতুতা এসেছিলেন বাংলাদেশে। তাঁর দেওয়া তখনকার এক মূল্য তালিকায় (১ টাকা=৬৪ পঃ) দেখা যায়—চাল ১ মন ১২ পয়সা, ঘি ১ মন ১৪৫ পয়সা, চিনি ১ মন ১৪৫ পয়সা, সূক্ষ্ম কাপড় ১৫ গজ ২০০ পয়সা, দুগ্ধবতী গাভী ১টি ৩০০ পয়সা, পুষ্ট মুরগী ১২ টি ২০ পয়সা, ভেড়া ১টি ২৫ পয়সা। ঋগ্বেদের আমল থেকে ইংরেজ আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যত্র দাস কেনা-বেচা হতো। ইবনবতুতা বলেছেন—তিনি মাত্র ১৫ টাকায় এখান থেকে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীকে কিনে আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৬শ শতকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও জিনিষপত্রের সস্তা দামের কথা বলা হয়েছে। ১৮শ শতকে (১৭২৯ খৃঃ) রাজধানী মুর্শিদাবাদের এক মূল্য তালিকায় দেখা যায়—প্রতি টাকায় চাল ৪ মন, ঘি ১০ সের তেল ২১ সের, তুলা ২ মণ।

বাংলায় সুলতান রাজত্বের সম্ভবতঃ শেষভাগে মার্কোপোলো বাংলা ভ্রমণ করেন। তিনি বলেন—এদেশে প্রচুর তুলা, আদা, ইক্ষু, চিনি, গম ও সর্ষপ চাষ হয়। বাংলার মসলিন ও রেশমী রুমালের আদর সর্বত্র।

সোলেমান কররাণীর রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র বা পোদ জাতির উপর খুব অত্যাচারের ফলে অনেকে মুসলমান হয়ে যায়। এই সময় তাঁরা গৌড় ও রাঢ়দেশ ছেড়ে দক্ষিণবঙ্গে (বিশেষ করে ২৪-পরগনা অঞ্চলে) পালিয়ে আসে। তাদের জাতীয় কাজ রেশমের কাজ ছেড়ে কৃষক হয়ে যায়। এরাই ২৪-পরগনায় বিলাতি কুমড়া, পালংশাক, পটল প্রভৃতির চাষ প্রচলিত করে। এখনও পর্যন্ত এরা ২৪-পরগনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি।

মধ্যযুগে জেলায় জমি ছিল প্রচুর, লোকসংখ্যা কম। জেলার সর্বত্র তুলার চাষ এবং সুতীবস্ত্র তৈরী হতো। মাঠে ধান, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু এবং বাড়ী বাড়ী মেয়েদের সুতো কাটার চল ছিলো। মাছ-ভাত-দুধ ও পরনের বস্ত্রের বড় অভাব ছিল না তাই। তবে সমাজের নিচুভাগে প্রচুর দরিদ্র মানুষ ছিলো। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে খুল্লনার কষ্ট ও ফুল্লরার বারো মাসের দুঃখের বর্ণনায় এদের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিলো জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার ও জুলুম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নিজেও এই সব কর্মচারীদের অত্যাচারে সাত পুরুষের পৈত্রিক ভিটা ও চাষবাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটক মানরিক লিখেছেন—রাজস্ব দিতে না পারলে যে কোন হিন্দুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নীলামে বেচা হতো। এছাড়া সরকারী কর্মচারীরা যখন তখন কৃষক রমণীদের ধর্ষণ করতো। এর কোন প্রতিকার ছিলো না। দুঃসময়ে ও দুর্ভিক্ষে এই সব দরিদ্র মানুষ তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের হাটে বেচে দিতো। অনেকের ধারণা মুসলমান আমলে আমরা খুব ভাল ছিলাম। তা ঠিক নয়। জিনিষের দাম সস্তা ছিলো কারণ লোকের হাতে টাকা ছিল না। তাই কেনার সামর্থ্যও ছিল না। চালের দাম আধ পয়সা বাড়লে হাহাকার পড়ে যেতো।

দেশের সাধারণ লোকায়ত মানুষেরা নানা জীবিকা-নির্ভর ছিল। এরা আমাদের চাষ করে খাইয়েছে, ঘরবাড়ী তৈরী করেছে ঘরের চাল ছেয়েছে, মন্দির গড়েছে, মন্দির গাত্রে নানা কারুকাজ করেছে ও ছবি এঁকেছে। মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি, তৈজসপত্র এবং ছেলেমেয়েদের পুতুল ও হরেক রকম খেলনা তৈরী করেছে, কোদাল কুড়ুল-শাবল লাঙ্গল প্রভৃতি চাষের যন্ত্র আবার তরবারি-বর্শা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করেছে। আমাদের শোবার খাট, বসার চৌকি-চেয়ার, মন্দিরের কারুকার্যমণ্ডিত কাঠের থাম নির্মাণ করেছে, নৌকা গড়েছে। সমাজ এদের শ্রমে নির্ভরশীল উন্নতশীল। পাল (কুম্ভকার), কর্মকার, ঘরামি, সূত্রধর নইয়া প্রভৃতি পদবী ছিল এদের জীবিকা অনুযায়ী। কিন্তু সমাজে পদবীর সঙ্গে জীবিকা কোন দিন স্থির-নির্দিষ্ট থাকেনি, আজও নেই। মোগল আমলে সাধারণত মজুমদার, শিকদার, প্রভৃতি পদবীধারী হিন্দুরা রাজস্ব আদায় করতেন। হিন্দু-মুসলমান রাজকর্মচারীরা অনেক সময় বেতনের পরিবর্তে এক বা একাধিক গ্রামের জায়গীর পেতেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমুদ্রতীরবাসী চণ্ডালেরা লবণ প্রস্তুত করত—সারা ভারতে তার চাহিদা ছিল।

তখন ২৪-পরগনা জেলার জন্ম হয়নি। সারা বাংলাদেশ ১৯টি সরকার ও ৬৮২ মহলে (পরগণার চেয়ে একটু বড়) বিভক্ত ছিল। সরকার সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম সরকার ছিল অন্যতম সরকার যার অন্তর্গত বর্তমান ২৪-পরগনা জেলা। সপ্তগ্রাম নগর এই সরকারের রাজধানী ছিল। সরস্বতী তীরস্থ এই সপ্তগ্রাম হিন্দুযুগ থেকেই পূর্বভারতের এক প্রসিদ্ধ বন্দর। ৮ম শতকে সরস্বতীর নিম্নধারা ক্ষীণ হওয়ায় তাম্রলিপ্তি বন্দরের পতন ঘটে। তখন থেকেই সপ্তগ্রাম বন্দরের প্রসিদ্ধি। হরিদ্রাপুর, গোবিন্দপুর, সেকেন্দরপুর, চন্দনপুর, সাহাপুর কৃষ্ণপুর ও সপ্তগ্রাম—এই সাতটি গ্রাম একত্র করে সপ্তগ্রাম নগর হয়েছিল। সপ্তগ্রামে সুবর্ণ বণিকদের প্রধান ধনিক সমাজ ছিল।

বর্তমানে মজানদীর দেশ হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে ২৪-পরগনা অঞ্চলে অসংখ্য বেগবান প্রসিদ্ধ নদ-নদী ছিল। মধ্যযুগেও আদিগঙ্গা, সরস্বতী, বিদ্যাধরী, যমুনা, ইছামতী, পদ্মা, সূঁতী, পিয়ালী প্রভৃতি মিষ্টিজলের নদী এবং সুন্দরবনে বহু লোনা জলের নদী ছিল। এইসব নদীর মাছ জেলার প্রয়োজন মিটিয়েও বাইরে চালান যেত। এইসব নদীর বুকের ওপর দিয়েই ২৪-পরগনার বাণিজ্য-তরী দিগ্বিদিকে বাণিজ্য যাত্রা করত। মঙ্গলকাব্যের ধনপতি, শ্রীমন্ত, চাঁদসদাগরের দূর-দূরান্তরে বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনী মিথ্যা নয়। বর্দ্ধমান জেলায় চাঁদের চম্পাই বা চম্পকনগর এবং ধনপতিদের উজানিনগর এখনও বর্তমান। দিনে সূর্য ও রাতে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে বাঙ্গালী বণিক সাত সমুদ্দুর তেল নদী পাড়ি দিত। কিন্তু বাঙ্গালীর এই বর্হিবাণিজ্য মধ্যযুগে প্রথম আঘাত পেল আরব সাগরে আরব জলদস্যুদের বারংবার আক্রমণের ফলে। পরিণামে তারা পশ্চিমের দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য ত্যাগ কবতে বাধ্য হয় এবং শুধু সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি পুর্বদেশের সঙ্গে বাণিজ্য অব্যাহত রাখে। কিন্তু ১৬শ শতকে এ বাণিজ্যও বিঘ্নিত হতে লাগলো বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণের ফলে। শেষপর্যন্ত মধ্যযুগের বাঙ্গালী বণিক ১৬শ শতকের পর বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে একেবারেই হটে গেল। এইসব দস্যুদের বন্দুক ও কামানের সঙ্গে মোকাবেলা করার ক্ষমতা বাঙ্গালী বণিকদের একেবারেই ছিল না। বংশীদাসের লেখায় আছে—

"মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুক পলিতা হাত
একেবারে দশগুলি ছোটে।"

বৈদেশিক বাণিজ্য হারিয়ে বাঙ্গালীরা তখন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মনোনিবেশ করলেন। তখন বাংলাদেশে অনেক বিদেশী বণিক এসে গেছে। এখানে প্রথম আসে পর্তুগীজরা তারপরে যথাক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, দিনেমার ও শেষকালে ফরাসীরা।

দক্ষিণ ২৪-পরগনায় গড়িয়ার পুর্বে বিদ্যাধরীর তীরে বিখ্যাত তার্দা বন্দরে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা প্রথম ঘাঁটি গাড়ে। তার্দা তখন ২৪-পরগনার এক বিখ্যাত বন্দর। কালিন্দী ও মাতলা নদী হয়ে পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল, খুলনা ও ২৪-পরগনার সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বালাম চাল, কাঠ, গোলপাতা, মধু, মাছ প্রভৃতি বোঝাই হয়ে হাজার-মনী দেশী নৌকা তার্দা বন্দর পর্যন্ত আসত। ২৪ পরগণা জেলায় বহু চাষের জমিও পর্তুগীজেরা অধিকার করেছিল। সেখানে তারা বিদেশ থেকে এনে আলু, তামাক, আনারস, আতা, আমড়া, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি অনেক বিদেশী ফসল চাষ করত। মনে হয় তখন থেকেই বারুইপুরে পেয়ারার চাষ প্রসিদ্ধি লাভ করে যা আজও অব্যাহত আছে। শায়েস্তা খাঁর আমলে পর্তুগীজরা ২৪-পরগনার ইছামতী নদীর তীরে প্রায় ১২ মাইল বিস্তৃত এলাকায় ফিরিঙ্গি বাজার বসায়। এদের মধ্যে অনেকে দস্যুবৃত্তিও করত। এই সব মগ-ফিরিঙ্গি দস্যুরা শুধু সমুদ্রে বাঙ্গালীর বাণিজ-তরী আক্রমণ করত না, তারা দক্ষিণ ২৪-পরগনার পশ্চিম সুন্দরবনের আদিগঙ্গা তীরস্থ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম-নগর আক্রমণ করে লুটপাট করত, ঘর জ্বালিয়ে দিত, নারী-পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের হাটে বিক্রী করত। বিশেষ করে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে দক্ষিণ ২৪-পরগনার এই সব অঞ্চল একেবারে অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এখানকার মগরাহাট মনে হয় মগেদেরই হাট ছিল এবং সেদিন দক্ষিণ ২৪-পরগনা 'মগের

হরিনারায়ণপুর থেকে আবিষ্কৃত তামার মুদ্রা রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

মুল্লুকের' কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এইভাবে সেদিন এই প্রচণ্ড দস্যুবৃত্তি ও লুঠপাটের ফলে দক্ষিণ ২৪-পরগনার এই সব সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও নগর থেকে লোক পালাতে লাগলো। সব ঘন অরণ্যে পরিণত হল। ক্রমশঃ বন এগিয়ে এলো সেদিনের কলকাতা পর্যন্ত যেখানে ১৬৯০ সালে জোব চার্ণক এসে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ঘাঁটি গাড়লেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—মধ্যযুগে দক্ষিণ ২৪-পরগনার আদিগঙ্গা তীরস্থ ছত্রভোগ প্রসিদ্ধ বন্দর ও তীর্থস্থান ছিল যেখান থেকে গঙ্গা শতমুখী ধারায় বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছিল। নীলাচল যাত্রাকালে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীচৈতন্য এই ছত্রভোগে এসে আদিগঙ্গাতীরস্থ এতদিনের হাঁটাপথ দ্বারির জঙ্গল ত্যাগ করে নৌকাযোগে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সম্ভবত হিন্দুযুগ থেকেই বন্দর হিসেবে ছত্রভোগের প্রসিদ্ধি ছিল।

এছাড়া ২৪-পরগনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম (সরস্বতী তীরে) এবং পরবর্তী কালে সরস্বতী একেবারে মজে গেলে গঙ্গাতীরস্থ হুগলী বন্দর (১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) সেযুগে পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বন্দর ছিল। সপ্তগ্রাম তো প্রাচীন যুগ থেকেই প্রসিদ্ধ বন্দর। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা হুগলী থেকে মোগল সৈন্য কর্তৃক সম্পূর্ণ উৎখাত হলে তাদের শূন্যস্থান দখল করে ইংরেজরা। হুগলী শব্দটি সম্ভবত হোগলা আচ্ছাদিত স্থান থেকেই হয়েছে বলে অনুমান। পর্তুগীজরা উচ্চারণ করত ওগ্লী বা Ogle। ২৪-পরগনার এত কাছে দুটি বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দরের সঙ্গে ২৪-পরগনার মানুষের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল না একথা কল্পনা করা যায় না। উত্তর ২৪-পরগনার গঙ্গাতীরস্থ নৈহাটির অপর পারে হুগলী এবং কাঁচড়াপাড়ার গঙ্গাপারে কিছুটা দূরেই সপ্তগ্রাম বন্দরে ২৪-পরগনায় ক্রেতা-বিক্রেতারা সহজেই গঙ্গা পেরিয়ে যাতায়ত করত। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামেই তাদের বাণিজ্যের মূলঘাটি স্থাপন কর‍ছিল। এই সময় শেরশাহ সপ্তগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তী কালে উভয় দিকে আরও সম্প্রসারিত হয়ে হাওড়া থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত এই রাস্তার নাম হয় গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই রাস্তা হবার ফলে উত্তর

ভারতের ব্যবসায়ীদের স্থলপথে সপ্তগ্রামের হাটে আসার পথ আরও সুগম হয়। এছাড়া গঙ্গানদীপথেও বহু ব্যবসায়ী এখানে আসতেন। ২৪-পরগনার মানুষও উত্তরে যমুনা ও বিদ্যাধরী নদীর মাধ্যমে এবং দক্ষিণে আদিগঙ্গা হুগলী ও সরস্বতীর মাধ্যমে জলপথে সপ্তগ্রাম ও হুগলীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতো। সপ্তগ্রামের বাজার সর্ব্বদাই অসংখ্য মানুষের কোলাহলে মুখরিত ছিল। এই প্রাচীন বন্দরের নদীতীরে বহু নৌকা ও জাহাজ নোঙর করে থাকত এবং মাল বোঝাই করে ফিরে যেত। বাঙ্গালীর এই বাণিজ্যবন্দর সে যুগে বাঙ্গালী বণিকদের অসীম ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছিল। 'চৈতন্য চরিতামৃতে' আছে—

"হিরণ্য-গোবর্দ্ধন নামে দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর।।"

যে যুগে টাকায় ৫/৬ মন চাল পাওয়া যেত সে সময়ে বারো লক্ষ টাকার দাম কত তা সহজেই অনুমেয়। এই দুই ধনী বণিকের মত ধনী বণিক সপ্তগ্রামে আরও অনেক ছিল। এরা অধিকাংশই সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের লোক। এদের মধ্যে থেকেই শেঠ ও বসাকরা প্রথম কলকাতায় (গোবিন্দপুরে) এসে বসতি করেন।

সরস্বতী মজে গেলে সপ্তগ্রামের পতনের পর গঙ্গাতীরে যখন হুগলী বন্দরের অভ্যুত্থান ঘটলো তখন সপ্তগ্রামের অনেক বাঙ্গালী বণিক পরিবার ব্যবসার খাতিরে হুগলীতে এসে বসবাস করলেন। সে সময় শিবপুরের কাছে বেতড় পর্যন্ত সরস্বতী দিয়ে বড় বড় জাহাজ আসতে পারত তারপর আর ক্ষীণ সরস্বতী দিয়ে উত্তর দিয়ে সপ্তগ্রামে পৌঁছিতে পারতো না। জাহাজগুলোকে গঙ্গা-ভাগীরথী বেয়ে ঘুরপথে প্রথমে ত্রিবেণী পরে সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রামে যেতে হত। এজন্য কিছু কিছু বাঙ্গালী বণিক ব্যবসায়ে অধিক লাভের আশায় বেতড়ে চলে এলেন। তাদেরই উত্তর পুরুষের মধ্যে চারঘর বসাক ও একঘর শেঠ পরিবার গঙ্গা পেরিয়ে বেতড়ের অপর পারে এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করলেন (বর্তমান গড়ের মাঠ অঞ্চল)। এরা এখানে তাদের উপাস্য দেবতা গোবিন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধানের চাষ প্রবর্তন করেন। সেই সুগন্ধি সরু চাল গোবিন্দের ভোগে ব্যবহৃত হত। এখনও সেই চালের নাম গোবিন্দভোগ চাল। তারা উত্তরে সুতানুটি গ্রাম (বর্তমান বাগবাজার অঞ্চল) থেকে সুতা কিনে বিদেশী বণিকদের কাপড় বেচতে আরম্ভ করলেন। পরবর্তীকালের বাণিজ্য নগরী কলকাতার প্রথম সূচনা দেখা গেল।

বাণিজ্যের জন্য শুধু যে বাংলার বাইরে থেকে বণিকরা এখানে আসতেন তা নয়, বাঙ্গালী বণিকরাও পসরা নিয়ে বাংলার বাইরে যেতেন। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জয়নারায়ণ রচিত 'হরিলীলা' নামে এক বাংলা বই থেকে জানতে পারা যায় যে বাংলার এক বণিক ব্যবসা উপলক্ষে হস্তিনাপুর, কর্ণাট, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, ভোজ, পঞ্চাল, কম্বোজ, মগধ, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, চীন, মহাচীন ও কামরূপ প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। হিন্দুযুগে জমিদারী প্রথা ছিল না। এ প্রথাটির সৃষ্টি হয় মধ্যযুগে। তবে মধ্যযুগে সান্ধ্য আইনে খাজনা বাকী পড়লে জমিদারী নিলাম করে নেওয়া হত না। মোগল আমলে বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী ও বারুইপুরের রায়চৌধুরীরা খুবই বিখ্যাত জমিদার ছিলেন।

এখানে একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষণীয়—পর্তুগীজরা বাংলা থেকে বাংলার নিজস্ব শিল্পজাত দ্রব্য সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র, মসলিন, রেশমবস্ত্র প্রভৃতি সস্তায় কিনে নিয়ে অন্যত্র বেশী দামে বিক্রি করত। এতে দেশে শিল্পের বিকাশ ও প্রচুর ধনাগম হত। কিন্তু ইংরেজরা এসেই আস্তে আস্তে দেশের শিল্পসমূহ ধ্বংস করে দেশকে শুধু কাঁচামালের আড়তে পরিণত করলো। ইংরাজরা এদেশ থেকে কাঁচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগলো এবং সেই কাঁচামাল থেকে তৈরী বিলাতী জিনিষ এদেশে এনে বিনাশুল্কে সস্তায় বিক্রী করতে লাগলো কিন্তু দেশী কাপড়ের উপর ট্যাক্স চাপিয়ে তার দাম বাড়িয়ে দিলো। বাংলার শিল্পসমূহ জাহান্নামে গেল। বাংলা কৃষিনির্ভর হয়ে পড়লো। তাও অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড় বন্যার ফলে কৃষি নষ্ট হয়ে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হতে লাগল। এই ভাবেই ৭৬-এর মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৬৯ খৃঃ) বিখ্যাত হয়ে আছে, যার পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সৃষ্টি।

সব শেষে ২৪-পরগনার কয়েকটি কৃষিজ দ্রব্য ও শিল্পে বিখ্যাত স্থানের নাম স্মরণ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। নামগুলো প্রায় সবই মধ্যযুগের গ্রাম নাম।

হাজীপুর বা ডায়মণ্ডহারবারের কাছে সরিষারহাট গ্রাম একদিন সর্ষের হাটের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙ্গালীর রান্না সর্ষের তেলে তাই ২৪-পরগনাতেও একদিন প্রচুর সর্ষের চাষ হতো। লক্ষ্মীকান্তপুরের কাছে চাউলগোলা গ্রাম নিশ্চয়ই একদিন চালের গোলায় পূর্ণ ছিল। সংগ্রামপুরের ধান্যঘাটা গ্রামের ঘাটে একদিন কাতারে কাতারে ধানের নৌকা এসে ভিড়ত। ভাঙড় থানার চন্দনেশ্বরের কাছে শাঁকশহর (শাঁকসর) গ্রাম একদিন শঙ্খশিল্পে নাম করেছিল। তিনশো বছর আগে কলকাতার উত্তরে সুতানুটি গ্রাম (বর্তমান বাগবাজার অঞ্চল) সুতার হাটের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজ শুধু গ্রামের নামগুলোই পড়ে আছে—মধ্যযুগের সেই সব উৎপন্ন দ্রব্য আর সেখানে বিশেষ কিছু নেই। ১৪৯৫ খ্রিঃ রচিত বিপ্রদাস পিপিলাই এর 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে সর্বপ্রথম বারুইপুরের নাম পাওয়া যায়। বারুই বা বারুজীবী শব্দের অর্থ—পানচাষী। আজকের দিনে বারুইপুরে ইতস্তত ২/৪ টি বরজ দেখা গেলেও মধ্যযুগে এখানে এবং এর আশে পাশের গ্রামে প্রচুর পানচাষ হত। এখনও কাছেই গোচরণ ষ্টেশনের অদূরে তসরালা ও অন্যান্য গ্রামে দেখা যায় বাড়ী বাড়ী বরজ (শব্দটি প্রাচীন অষ্ট্রীক শব্দ অর্থ পান চাষ) রয়েছে এবং বরজের জন্য প্রয়োজনীয় একখণ্ড বাঁশ ঝাড় প্রায় প্রতি বাড়ীতেই আছে। গোচারণের কাছে হোগলা গ্রামে একদিন প্রচুর হোগলা জন্মাতো। এখনও কিছু জন্মায়। বারুইপুর মধ্যযুগ থেকেই লিচু, পেয়ারা ও আমের জন্য প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ২৪-পরগনার জয়নগর-মজিলপুর এবং উত্তর ২৪-পরগনার টাকি, হাসনাবাদ ও বসিরহাট অঞ্চল মধ্য যুগে খেজুর গুড় ও তজ্জাত উৎকৃষ্ট মোয়া, পাটালির জন্য বিখ্যাত ছিল এবং আজও আছে। আজও শীতকালে নলেন গুড়ের সন্দেশ এ অঞ্চলে অতি বিখ্যাত। খেজুর গাছে বাঁশের কাঁপানল লাগিয়ে রস সংগ্রহ করেই গুড়-পাটালি তৈরী হয়। এই সঙ্গে স্মরণীয় উত্তর বাংলার উৎকৃষ্ট ইক্ষুগুড় প্রাচীন যুগে রোমেও রপ্তানি হত। এই গুড় থেকেই বাংলার প্রাচীন নাম হয়েছিল গৌড়। পানিনি বলেছেন—'গুড়স্য অয়ং দেশঃ গৌড়ঃ।'

প্রবন্ধটি পুরাতনী পত্রিকায় (১৩৯৪) প্রকাশিত

লেখক পরিচিতি : বিজ্ঞান ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক, সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক, 'রবি প্রদক্ষিণ' গ্রন্থপ্রণেতা।

হেমেন মজুমদার

প্রত্নতত্ত্বের ইতিকথা : চব্বিশ পরগনা

স্বর্ণ ও ধন সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে অষ্ট্রিয়ার লোভী রাজকুমার প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ উৎখনন শুরু করেছিলেন। তার বছর ৪০ পর ১৭৪৮-এ পম্পেই নগরী উৎখননের উদ্যোগ মানুষের মধ্যে কৌতূহল ঔৎসুক্য সৃষ্টি করল। পুরনো শহর ও রাজ্য-মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, ব্যাবিলন নিয়ে অনুসন্ধানের প্রতি আগ্রহী হন সাধারণ মানুষ। বিদগ্ধজনের মধ্যে ইতিহাসের রোমাঞ্চ কাজ করে। ধনসম্পদ লাভের জন্য দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীরা পালতোলা জাহাজ নিয়ে বের হয়। ব্যবসায়ীরা বের হয় ব্যবসার জন্য আর দেশ দখলের অভিযান চালাতে বের হয় সম্রাটরা। নেপোলিয়ান বিশ্বজয়ের নেশা নিয়ে মিশরে পৌঁছে দুর্গের ভিত খুঁড়তে নির্দেশ দিলে কোদালের কোপে এক শিলালিপি উঠে এল। এইভাবে প্রত্নতত্ত্ব এক শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠল। ইতালিয়ান, বেলজানির উৎখননে (১৮১৫) প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর লণ্ডন প্রদর্শনী দৃষ্টি আকর্ষণ করল ব্যাপক মানুষের। ইজিপ্সিয়ান সোসাইটির উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উৎখনন শুরু, পরে ফ্রান্সের ইতিহাসবেত্তার চেষ্টায় মিশরে মিউজিয়ামে জমা হল প্রত্নবস্তু। এর পর নানা জাতির বিশেষজ্ঞরা পিরামিড উৎখননে নামলেন। ফরাসি লরেটে; মার্কিনি ডেভিস, ওরেইসনার, ব্রিটিশ কারনারভন, ৪০ বছর ধরে মিশরে উৎখননের মধ্য দিয়ে এক স্বীকৃত পদ্ধতি গড়ে তুললেন প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান, উৎখনন ও প্রদর্শন ও গবেষণার।

পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রী, বণিক, নাবিকদের প্রচারে ভারতের সম্পদের কথা ছড়িয়েছিল ইউরোপের দেশে দেশে। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, স্পেনীয়, ফরাসি, বৃটিশরা কোম্পানি করে ফরমান নিয়ে ভারতে ব্যবসা করতে এল, দেশ দখল করে নানা ছল চাতুরীতে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অফিসারদের নির্দেশ দিয়ে বলে দিলো যে কোনও জায়গায় গেলে সেই এলাকার রিপোর্ট ও বিবরণী জানতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। এই বিবরণীতে প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়েরও উল্লেখ ছিল।

বাংলার রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনে অনেক সময় এই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু বাংলার অন্য জেলাগুলির ইতিহাস কোনও না কোনওভাবে রচিত হলেও এই জেলার ইতিহাস রচিত হয়নি। জেলার ইতিহাস চর্চা এই শতকের প্রথমভাগ হতে শুরু হয়েছে এবং অন্তত ৫বার সে প্রয়াস কখনো সম্মেলন, সমাবেশ, বিদগ্ধ আলোচনা ও আকাঙ্ক্ষার লতাগুল্মদামের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

ব্রিটিশরা কোম্পানি হিসাবে এ দেশের ধনসম্পদ যেমন পাচার করেছে, তেমনি কোম্পানীর কর্মচারীরা লুটেরা হয়ে সম্পদ লুঠ করেছে। মণিমুক্তা প্রাসাদ অট্টালিকার সাজসজ্জাও বাদ যায় নি। ১৭৮৪-র সুপ্রিমকোর্টের জজ উইলিয়াম জোনসের এশিয়াটিক সোসাইটি তৈরি, রেনেলের তিনখণ্ডে হিন্দুস্থানের মানচিত্র (১৭৮৩-৯৩) প্রকাশ, বাংলার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (পরবর্তীকালের গৌড়) টলেমি বর্ণিত গঙ্গারেজিয়া রাজ্য নিয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা, ক'বছর পর এশিয়াটিক রিসার্চার্স (১৮০০) প্রকাশ ও ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, প্রভৃতি চর্চা কেবল মেজর ফার্গুসন, বিভারিজ, রেগলার, ওয়েস্টম্যানের বিষয় রইল না নবীন শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকমল সেন, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশীয়দের মধ্যে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব চর্চা, গবেষণার উদ্যোগ সৃষ্টি করল। আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম দেশী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দেশীয় সাহিত্যের উৎস হতে পুরাতাত্ত্বিক রসদ সংগ্রহ, এশিয়াটিক সোসাইটির পরবর্তী প্রাচীন সম্পাদক জেমস প্রিন্সেপ নিয়ম মতো বৈজ্ঞানিক উৎখনন চালু করলেন। ফাহিয়েন হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী হতে বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলি-নালন্দা, রাজগৃহ, পাটলিপুত্র উৎখনন ক্যানিংহামের উদ্যোগ করা হল। অজন্তা ইলোরা শিল্পসম্ভার জন সমক্ষে প্রচারিত হল। গৌড় পাণ্ডুয়া, বানগড়, পাকবিড়া, মুর্শিদাবাদ নিয়ে চর্চা নতুন উৎসাহে শুরু হল। অনুসন্ধানের মাধ্যমে ৫টি ডিভিশনের ২৯১টি দুর্গ, স্তম্ভ, প্রাসাদ ইত্যাদি চিহ্নিত হল। প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে ৮৪, বর্ধমান ৮৫, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৯, ৫৮ ও ১৫টি

হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাথরের তৈরি পুঁতি রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

প্রত্নক্ষেত্র তালিকা তৈরি হল। ১৯০৩-এ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের গঠন, প্রত্নতাত্ত্বিক জন মার্শালের উদ্যোগ ও ১৯২০ হতে ধারাবাহিক উৎখননের ব্যবস্থাপনা এই সবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটে চলে।

২৪ পরগনার কলকাতায় প্রথম পত্তন হয়েছিল ভারতের রাজধানী, কলকাতার কাছে থাকার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানের ও প্রত্নবস্তু প্রাপ্তির সুযোগ বেশি ছিল। এজন্য নানা প্রত্নবস্তুর সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন ১৭৮০ তে কালীঘাট হতে পাওয়া ২০০-রও বেশি গুপ্তযুগের সুবর্ণমুদ্রার কলস আবিষ্কার ও রাজা নবকৃষ্ণ দেব কর্তৃক তা হেস্টিংসকে প্রদান।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে ১৮৭৭-এ এ. জে, এইচ, রেইলি প্রদত্ত সুন্দরবনে প্রাপ্ত ৪২" × ২০" বিষ্ণু মূর্তি, সাগরের লাইট হাউস হতে প্রাপ্ত ১৮৫০-এ ক্যাপ্টেন ডাইসি কর্তৃক ৮" × ৪" শিবপার্বতী মূর্তি দান। ১৮৬৮ তে বকুলতলাতে প্রাপ্ত তাম্রফলক ও ১৯১৯-এ বারুইপুরের পাশে প্রাপ্ত তাম্রফলক দুটিই মহারাজ লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত ভূমি দান পত্র ছিল।* মানুষ মনে করে বাঘ নিজের পিঠে করে দেব মূর্তি নিয়ে অন্য গ্রামে ফেলে রেখে যাওয়ার পরে ওই মূর্তি নিয়ে গ্রামবাসীদের ধর্মান্ধতার সংবাদ লঙ সাহেব বারুইপুর বিবরণীতে লিখেছেন। বিভিন্ন জায়গায় এইরূপ প্রত্নবস্তু ও মূর্তি পাবার খবর হিসাবে এর গুরুত্ব বোঝা যায়। সুন্দরবনে গভীর জঙ্গল মহলের মধ্যে পরিত্যক্ত প্রাসাদ, মন্দিরের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছিল। এমনি এক মন্দিরের খবর হয়েছে ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে মথুরাপুর থানার ১০০ ফুট উচ্চতার ওড়িশার রেখ দেউলের আদলে গঠিত জটার দেউল সম্বন্ধে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের পক্ষ হতে P. C. Mukherjee সরেজমিন অনুসন্ধান করে এটিকে 'Deul of Jatesvara Mahādeva বলে রিপোর্ট পাঠালেন। ১৯০৪-০৫ এর সার্ভে রিপোর্টে মিঃ টি ব্লক্ এটিকে ১০ম শতকের মন্দির বলে লিখলেন—Jatar Deul "The Temple itself is a single tower built of brick. It stands on an ancient mound. The accurate date of the temple is not known but it is certainly more that 500 years old. A copper plate of about 900 year old is said to have been found close to it several years ago but it is not known what has been become of it and it could not be traced". ইতিপূর্বে ১৮৫৭-এ পাঠানো ডায়মন্ডহারবার হতে রিপোর্ট ছিল। হারিয়ে যাওয়া তাম্র পত্রিকার তথ্য হতে (শকাব্দ ৮৯৭)—৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের হদিস মেলে। সংবাদ পাওয়া

* দ্বিতীয় তাম্রফলক প্রসঙ্গে রাধাগোবিন্দ বসাক 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভূগোল' প্রবন্ধে লিখেছেন—"বর্তমান ২৪ পরগনার বারুইপুর রেল স্টেশনের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণ সেনের তাম্র শাসন হইতে জানা যায় যে রাজা তদীয় রাজ্যের দ্বিতীয় সংবতে বাৎস্য গোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় শ্রী ব্যাসদেব শর্মাকে রিজ্ঞার 'শাসন' নামক যে গ্রামখানি দান করিয়াছেন তাহা বর্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিমখাটিকার বেতড্ড চতুরকে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত গ্রামের পূর্ব দিকস্থ অবস্থিত স্রবন্তী (নদী) জাহ্নবী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই বেতড্ড চতুরক বর্ধমান বিভাগের হাওড়া জেলাস্থিত বেতড় গ্রাম বলিয়া মনে করেন।" অমূল্য বিদ্যাভূষণ পঠিত এই তাম্রপত্র ও ননীগোপাল মজুমদার এর Inscription of Bengal এর Vol. III বর্ণিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত হাওড়ার বেতড়ের দাবি কালিদাস দত্ত আপত্তি জানিয়ে লিখেছেন—'বর্তমান বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন শাসন গ্রামের উত্তরে (তাম্রপত্রে বর্ণিত চতুঃসীমায় উল্লিখিত) ধর্মনগরী নামে প্রাচীন জনপদ ও পূর্বদিকের মজাগঙ্গা জাহ্নবী নদীর খাত ......ঐ গ্রামের শাসন নামও......উল্লিখিত তাম্রপত্রে বর্ণিত ঐ গ্রাম দুটির সীমায় ঐক্য দেখিলে ঐ জনপদটিই সেনরাজ গণের বিজয়-শাসন অথবা উহার অংশ ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।" বারুইপুরের বর্তমান ধামনগর গ্রাম যে ধর্মনগরী এটি হান্টার সাহেবের বর্ণনায় মিলে যায়।

যাচ্ছে এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রাজা জয়ন্ত চন্দ্র। মহকুমা অধিকর্তা প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হল The Deputy colleetor of Diamond Harbour reported in 1875 that a copper plate discovered in a place little to the the north of Jatar Deul Fixes the date of the erection of this temple by Raja Jayantachandra in the year 897 of the Bengali Sak era corresponding to A D. 975. The copper plate was discovered at the clearing of the Jungle by the grantee Druga prasad Chowdhury. The inscription is in Sanskrit and the date as usual given in enigme with name of the founder". (১৯১৪—১৯১৫) সালে জে এফ ব্ল্যাকস্টোন এই মন্দির পরিদর্শন করেন। পরে এই মন্দির সংরক্ষিত হয়েছে। ১৯০৫ এর ২৩শে মার্চ ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর থিয়োডোর ব্লক ও নৃপেন বসু উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত মহকুমার বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতু গড় হতে একটি মুদ্রা পান। তা হতে প্রাসাদের অস্তিত্ব নির্দেশ হয়। চন্দ্রকেতুগড় নিয়ে ১৯০৭ এ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট লিখেছেন A. H. Long hurst (যিনি নিজে এই এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন)। "The only signs of a palace or fort were a rising mound of broken brick, earth and debris, over grown with grass and jungle, running east and west for

কাকদ্বীপের গঙ্গারিডি সংগ্রহশালায় রক্ষিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাকুড়তলা থেকে প্রাপ্ত দুটি বান্নামূর্তি

a distance of about 250 yards and being roughly 40 yards in which at the highest, end, which rises about 30 feet above the ground and shows traces here and there of a brick wall embeded in its surface which, however no where projects higher than few inches above the ground.

However, to judge from our occasional brick, here and there, measuring 15" × 11" × 12" and an interesting little piece of pottery. I picked up having the image of Goruda stamped upon its surface, there must have been some Burddhist stupa here, the remains of which may be buried under the long mound. Some times in future......., a few trial trenches might be made and parts of the mound opened, as without excavating, it is impossible to say whether it is of any interest to the department or not. It certainley has no other signs of any value."

পাথরপ্রতিমা থানার বিষ্ণুপুরে আবিষ্কৃত পাথরের নৃসিংহদেব মূর্তি

ছবি : সাগর চট্টোপাধ্যায়

১৯২০ তে চন্দ্রকেতু গড়কে বৌদ্ধমঠ স্বীকৃতি দিয়ে সংরক্ষণের আওতায় আনা হল। তিনবছর পর সর্বেক্ষণের কে. এন. দীক্ষিত আবার এসে প্রত্নবস্তু, প্রত্নস্থল নিয়ে রিপোর্ট দেন—

".........Remains are one of earliest in lower Bengal" মহেঞ্জোদারো হরপ্পা উৎখনন বিশেষজ্ঞ বনগ্রামের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেড়াচাঁপায় আসেন। এখান হতে কয়েকটি মুদ্রা ও মৃৎ শিল্প পেয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। জয়নগরের কালিদাস দত্ত রাখালদাসের সঙ্গে এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট ১৯৪৮ ও ১৯৫২ তে এই প্রত্নস্থল নিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান চালান। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন আহুত হয়। এই উপলক্ষে একটি প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীতে একটি সূর্যমূর্তি বারাসতের কানাই ঘোষ দেন। এই মূর্তিটি প্রত্নবস্তুর কাল নির্ণয় নিয়ে বহু সংশয় দূর করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার পক্ষ হতে অর্থ সংগ্রহ ও অনুমতি নিয়ে চন্দ্রকেতুগড় উৎখননের উদ্যোগ নেন কিউরেটর দেবপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, চিত্ত রায় চৌধুরী। পরেশ দাশগুপ্ত (সহকারী কিউরেটর) হিসাবে অনুসন্ধান-পর্বে এলাকায় স্থানীয় গ্রামবাসী সত্যেন রায়, গোপাল মাইতি, ধীরেন মৈত্তে

সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা ছবি : সুবর্ণ দাস

ও ভবেন মৈতের সহায়তা পান বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৫৬-৫৭ হতে ১৯৬১-৬২ দীর্ঘ ৫ বছর ধরে এখানে উৎখননের কাজ চলে। উৎখননের এই কাজ পরিচালনা করেন অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী। তিনি এই বেড়াচাঁপায় খনা মিহিরের ঢিবি ও ইঁটখোলা ডাঙা সম্পর্কে জানান— "এই মঠের গঠন প্রণালী মধ্যভারতের নাচনাকুঠারার পার্বতী মন্দিরের অনুরূপ।" বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অজস্র প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়। কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী ও চিত্তরঞ্জন রায়চৌধুরী খনন কার্য চালান। এই সমগ্র উৎখনন নিয়ে ওই সময়ের পত্রিকাগুলিতেও লেখালেখি হয় (কলকাতা ও পাশাপাশি এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহও সৃষ্টি হয় কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য এই উৎখননের রিপোর্ট আজো প্রকাশিত হয়নি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গোস্বামী ও রায়চৌধুরী বিগত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন মৌর্য যুগ হতে পাল যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক নগর সভ্যতার এই সাক্ষ্য গ্রিক-রোমের সঙ্গে বাণিজ্য কেন্দ্র, ভারতের পশ্চিম হতে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এই প্রত্নস্থল যথার্থ সংরক্ষিতও হয় নি। কেন্দ্রীয় পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের ডেপুটি ডাইরেক্টর নীলরতন ব্যানার্জির ১৯৬৫-র আশ্বাস সত্ত্বেও প্রত্নবস্তুর যথাযথ সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রত্নবস্তু ব্যবসায়ীদের হয়েছে মৃগয়া ক্ষেত্র আজ চন্দ্রকেতুগড়। পি. ডব্লিউ. ডির রাস্তা নির্মাণের জন্য চেষ্টা আশুতোষ মিউজিয়াম কর্তৃক জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে বন্ধ করা হয়েছে। ইদানীংকালে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জির বিচারে বেড়াচাঁপায় প্রাপ্ত মুদ্রায় খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপির বিস্ময়কর অবস্থান হতে পূর্ব পশ্চিম ভারতের অশ্ব ব্যবসায়ের নতুন সূত্র পাওয়া গিয়েছে।

বিগত ৭০।৭৫ বছর ধরে ২৪ পরগনার নানাস্থানে প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়ে আসছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্নবস্তুর প্রাপ্তিস্থলের মহকুমাভিত্তিক মোটামুটি তালিকা (যদিও অসম্পূর্ণ) ডায়মন্ডহারবার-১৬, বারুইপুর-১৬, কাকদ্বীপ-১১। ক্যানিং ৮ আর আলিপুর ৫ হবে। আরো কেন্দ্র হয়তো আগামী দিনে যুক্ত হতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যাতীত প্রত্নবস্তু আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের Encyclopaedia of Indian Archaeology (Edited by Amalendu Ghosh), Director General of archaeology) Explored early historical site in Bhagirathi Delta—Boral, Deulpota. Haripur (Harinarayanpur?), Atghara all in 24 Parganas. The antiquities recovered from there—figureine, pottery, beads of semi-precious stone and other objects." বেড়াচাপা উৎখনন ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণী সমাজে একটা ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল। আশুতোষ মিউজিয়ামের দেবপ্রসাদ ঘোষ, কল্যাণ গাঙ্গুলী, কুঞ্জ গোস্বামী প্রমুখের নেতৃত্বে তরুণ গবেষকরা অনেকেই নানা প্রত্নক্ষেত্রে গিয়ে পুরাবস্তু সংগ্রহ করেছেন, গ্রামের মানুষকে উৎসাহী করেছেন ও অনুসন্ধান ও চর্চায় যুক্ত করেছেন। জয়নগরের কালিদাস দত্ত এ কাজে সবচেয়ে বেশি সারাজীবন ধরে পরিভ্রমণ করেছেন, সারা জেলা জুড়ে এবং অন্তত ৩০টি প্রত্নস্থলের অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর তালিকা ও বিবরণীসহ প্রবন্ধ রচনা করেছেন তৃতীয় দশকের পূর্বেই। এছাড়া নিজবাড়িতে সংগ্রহশালা সাজিয়েছেন, কত জিনিস নানা মিউজিয়ামে তা দিয়েও দিয়েছেন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হাড়োয়ার লাল মসজিদকে কেন্দ্র করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক উল্লেখিত বালান্দা অনুসন্ধান চলেছে। স্থানীয় কমিউনিস্ট ও কৃষক নেতা আবদুল জব্বার এই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও প্রদর্শশালা গঠন করে আজীবন কাজ করেছেন। ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার বোড়াল গ্রামের বিভূতি ভূষণ মিত্র ইঁটখোলার প্রয়োজনে উৎখনিত জমি হতে উদ্ধার করেছেন ফসিলিভূত হাতির পা, দাঁত আর চোয়াল, বাঘের পা, হরিণের শিং, এমন কি গণ্ডারের দেহাংশও সংগৃহীত হয়েছে। ৭ম শতাব্দির কষ্ঠি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণু পাদপদ্ম চিত্রিত শিলাখণ্ড বেলে পাথরের তারা মূর্তি, খোদাই করা মন্দির গাত্রের ইঁট মৃৎপাত্র, কুলাল খণ্ড ইত্যাদি। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত কৃষিবিদ ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁর সংগ্রহে কিছু প্রত্নবস্তু রেখে গেছেন। ১৯৮৯ এর পর বোড়াল গ্রামে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধানে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় হতে প্রথম শতকের। (মৌর্য) ধূসর মৃৎভাণ্ড, লম্বা গলা যুক্ত মৃৎপাত্র, হালকা লাল রঙের হাতে তৈরি পাত্র, এছাড়া সুঙ্গ, কুষাণ, পাল, সেন আমলে প্রত্ন সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে। নানা ধরনের মূর্তি (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ধর্মীয়) এখানে পাওয়া গেছে। তা সংগৃহীত হয়েছে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির, আশুতোষ চিত্রশালা, সাহিত্য পরিষদে। বোড়ালের পাশে ডিসেলগোতা গ্রামে কুন্তদীঘি হতে নানা মূর্তি ও পুরাবস্তুর অস্তিত্বের সন্ধান হয় এদের প্রয়াসে। আশুতোষ চিত্রশালায় কালিদাসবাবুর সংগ্রহ, ও পরে রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত হয়েছে।

দেউলপোতা গ্রামটি (ডায়মন্ডহারবারের আবদালপুর গ্রাম) হতে নানা প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। কালিদাস দত্ত, পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্তসহ প্রত্নবিদরা এখান হতে সংগ্রহ করেছেন যক্ষিণী, বিভিন্ন দেবদেবী ও মাতৃমূর্তি সিলমোহর, তাম্র জাহাজ ইত্যাদি ছাড়া প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনও আছে।

হরিনারায়ণপুর গ্রাম বর্তমান কুলপী থানার মধ্যে পড়ে। গঙ্গার তীরে অবস্থানের কারণে নদীর পাড় ভেঙে পড়ায় নানাযুগের প্রভূত প্রত্নবস্তু সংগৃহীত হয়েছে এবং আরো জিনিস নিয়মিত সংগৃহীত হয়। মূল্যবান পুঁতিদানা, নানা পাত্র, মূর্তির অংশগুলি যেমন সংগ্রহ হয়েছে তেমনি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তুও এখানে সংগৃহীত হয়েছে। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের হরিনারায়ণপুরে অনুসন্ধান নিয়ে Statesman রিপোর্ট

দেয়—His exploration have resulted in the recoverey of several terracotas including some remarkable figures representing yakshinies.''যুগান্তর পত্রিকায় (৮ই আগস্ট ১৯৫৭) আশুতোষ মিউজিয়ামের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে সঠিক ভাবেই লেখা হয় '২৪ পরগনা, হাওড়া, মেদিনীপুর জেলার প্রায় ২৩।২৪টি বিলুপ্ত জনপদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা যেন কলকাতাকে কেন্দ্র করে ৫০ মাইল ব্যাসার্ধ ধরে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে গাঙ্গেয়ভূমিকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে। হরিনারায়ণপুর প্রাচীন বাংলার সেই ভূগর্ভশায়ী জপপদ মালারই মধ্যে গাথা।'

আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটার দেবপ্রসাদ ঘোষ মতামত দিয়েছেন—The lower Bengal region was in ancient times doted with a chain of parts and cities and ports from west of Tamralipta to the east upto Chandra ketugorh. He also infers that the Bidyadhori was an estuary for meritime contacts with the western world rivalling the importance of the main channel of the Ganga, lying further west.'' বারুইপুর থানা (বর্তমানে মহকুমা)র আটঘরা রিপোর্ট Indian Archaeology -তে বের হয় প্রাপ্ত Terracotas, Roulated wares, grey sherd copper coin''. আটঘরা গ্রামের মানুষ হিসাবে আমাদের সংগৃহীত কিছু প্রত্নবস্তু নিয়ে ১৯৫৬ সালে কালিদাস দত্তের কাছে আমি ও অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাড়িতে দেখা করি। তিনি এই গ্রামে আসেন ও আশুতোষ মিউজিয়ামে তা দেখান। মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটর পরেশ দাশগুপ্ত পরের সপ্তাহে আটঘরা গ্রামে আমাদের নিয়ে অনুসন্ধান করেন। স্বাধীনতা পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। ওই বছরের Statesman-এ ৮ই ডিসেম্বর 'New light on Bengal's Past' সংবাদে লেখে—''first clue was supplied by Mr. Kalidas Dutta early copper cast coin.....'anothor coppor cast coin found by P. C. Dasgupta. সংবাদে উৎখননের প্রস্তাবও ছিল এই ভাবে 'The University authorities contemplate extensive excavation at the site near future.' আটঘরায় পুরাতাত্ত্বিক অনুষ্ঠান' (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ আনন্দবাজার) প্রবন্ধে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত লেখেন—

''বর্তমান লেখক ক্রমান্বয়ে বহুবার আটঘরায় অনুসন্ধান পরিচালনা করেন।.........এই অনুসন্ধান কার্যে বর্তমান লেখক স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক সাহায্য পান শ্রী অশোকমুর চট্টোপাধ্যায়, শ্রী হেমেন্দ্র মজুমদার ও শ্রীমান অপূর্ব মজুমদারের নিকট থেকে' ....এই স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু সংখ্যক পুরাবস্তু। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই স্থানে একদা দুই সহস্র পূর্বে বিরাজ করত এক কর্মচঞ্চল বন্দর নগরী এবং এর পার্শ্বের অধুনা বিশুষ্ক নদীবক্ষে নোঙর ফেলত দূর দুরান্তরের বাণিজ্যতরণী। ....তাম্রলিপ্ত, তিলদা, হরিনারায়ণপুর এবং আটঘরায় যে সমস্ত ভারতীয় ও বৈদেশিক পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, এককালে বাংলার সুরম্য নগরীসমূহের দুঃসাহসী নাবিকবৃন্দ সংযোগ রক্ষা করতেন সমুদ্রপারের দেশ সমূহের সঙ্গে।'' খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি বর্ণিত অষ্টগৌড়া নগরী সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—

দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে প্রাপ্ত প্রত্নলিপি ছবি : সাগর চট্টোপাধ্যায়

''........ কে জানে এই অষ্ট গৌড়ের ধ্বংসাবশেষই নিহিত আছে আটঘরার মৃত্তিকা গর্ভে?'' এখানে প্রাপ্ত ধারাবাহিক প্রত্নসম্ভারের প্রমাণ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্মলেন্দু মুখার্জি রত্নগর্ভা আটঘরা বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৮০ সালে ৬ই জুন রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুধীন দে ও দিলীপ রায়কে নিয়ে এই গ্রামাঞ্চলের ছয়টি প্রত্নস্থল দমদমার ঢিবি, চটারপাড়, সীতামা .পুকুর, গাজিডাঙ্গা, চিত্রশালী, হালদার চাঁদনী পরিদর্শন করেন। ১৯৮৯-এর ২১শে জানুয়ারী exploratory digging শুরু হয়। খনন কার্য ১১টি স্তর পর্যন্ত নেমে যায়। তিনটি খাদ খনন করে দমদমার ঢিবি হতে মৌর্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা যায়। ব্যাখ্যামূলক একটি পুস্তিকায় সুধীন দে বিবরণী দিয়েছেন সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা হতে তা প্রকাশিত হয়েছে। আটঘরার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও এই সব প্রত্নবস্তুর প্রাচুর্য দেখা যায়। মনে হয়—এই সভ্যতা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্যামচাঁদ মুখার্জি Statesman-কে বললেন—

A flourishing civilisation, dating back to more than 2000 years, existed at Atghora village and its adjoining area of Baruipur in South 24 Parganas. This was revealed by a team of exparts from the State Archaeological Directorate. Similar claim were made earlier some historian and archaeolgists and they have now been confirmed. ......the current archaeological work at the spot as a trial digging which according to him, was a precurser to an extensive in the area in future. Mr Mukherjee, who is optimistc about the outcome of an extensive excavation, stated that there was hardly any archaeological site in the entire lower gangetic valley

of such potential.......He said after the trial digging was completed he would prepare a report and send it to the higher authorities recommanding official grant for a thorough excavation.''

আটঘরার নমুনা উৎখননের পর বৃহত্তর উৎখনন প্রয়াস আগামী দিনে নতুন তথ্য দিতে পারে। জয়নগর থানার বাইসহাটা গ্রামের ঘোষের চক রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আটঘরার পর উৎখনন করেন। এখানের দুটি উচ্চ স্তূপকে ১৭৭৮খ্রিঃ রেনেল সাহেব প্যাগোডা বলে উল্লেখ করেছিলেন তাঁর ম্যাপে। স্তূপ দুটি উৎখনন করে পাওয়া গেল নানা পালযুগের মৃৎপাত্র, প্রস্তর মূর্তি, দ্বারবাজু, নকশা কাটা পদ্ম, প্রস্তর নির্মিত আসন, জল নিকাশী নালা। উভয় স্তূপেই ৩.৫ মিটার (প্রথম উৎখনন খাত) এবং ৩.৩ মিটার (দ্বিতীয় উৎখনন খাত) স্তূপিকা (Hemis pherical dome), ভিত্তি গহ্বরে মূল্যবান উজ্জ্বল জেড পাথরের পঞ্চতল বিশিষ্ট পুঁতিদানা, উভয় স্তূপকে যুক্ত করে ইটপাতা রাস্তার অস্তিত্ব। নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্নউৎখনন নামের সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা প্রকাশিত পুস্তকে উৎখনন দলের নেতা সুধীন দে এই স্তূপ দুটিকে বৌদ্ধ বা জৈন মঠের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। ইঁটের গাঁথুনি, স্তূপিকার অস্তিত্ব, পালযুগের মৃৎপাত্র সামগ্রিকভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এসবই খ্রিস্টীয় ১০ম ও ১১শ শতকের কথা' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

মাহিনগর (সোনারপুর থানা) গ্রাম হতে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উদ্ধার করেছেন একটি ১.২২ মিঃ ব্যাস ও উচ্চতার মাটির জালা, খিস্টীয় ৩—৪র্থ শতকের মৃৎপাত্র, ১১—১২ শতকের, প্রত্নবস্তু মৃৎশিল্পের নিদর্শন। মরে যাওয়া আদি গঙ্গার পাড়ে (মজুমদার গঙ্গা) একটি দুর্গ আবিষ্কার করে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। এই মাহিনগর গ্রাম মহীপতি বসুর নামে আশেপাশের নানা গ্রাম ওই বসু পরিবারের নামে বেঁচে আছে। আপাতত কয়েকটি প্রত্নস্থল ও তার অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত এখানে তুলে ধরা হল। কিন্তু পূর্বে যা বলা হয়েছে যে আমাদের ২৪ পরগনার দুটি জেলা প্রত্নক্ষেত্রের সংখ্যা শতাধিক হয়ে যাবে। ইতিহাসের ধারায় নানান উদ্যোগী মানুষের প্রয়াসে এই ক্ষেত্রগুলির নাম উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু ফলপ্রসূ বৈজ্ঞানিক বহুমুখী অনুসন্ধান আজো নজরে আসেনি। 'কঠিন লোহা মাটির নীচে ছিলো অচেতন তার ঘুম ভাঙাইলি কে?'—এ গান কবে শোনা যাবে আমাদের প্রত্ন অনুসন্ধানীদের উদ্দেশে।

এরই মধ্যে শুরু হয়েছে প্রত্নদস্যুতা। প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে প্রেতের রাজত্ব চলছে। শিক্ষিত দুস্যরাই এর নেতৃত্বে দাঁড়িয়ে আছে। তথ্য সন্ধানী ক্ষেত্রমুখীন বিদগ্ধ স্বচ্ছ আলোচনা, জনমুখী শিক্ষা প্রয়াস নেই। মূর্তি পাচারের Network কাজ করছে। হাতের কাছে পাওয়া একটি অসম্পূর্ণ তালিকা থেকে দেখছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অন্তত ৬৭টি মূর্তির হিসাব। (কালিদাস দত্ত প্রাপ্তব্য মূর্তির সংখ্যা ২০০র বেশি হবে ভেবেছিলেন দুটি ২৪ পরগনায়) এই মূর্তির মধ্যে ৩৪টি প্রস্তর ৪টি ব্রোঞ্জের বিষ্ণুমূর্তি, নৃসিংহ-৫, গরুড়-৩, কূর্ম-২, লক্ষ্মী-২, গণেশ-৭, জগদ্ধাত্রী-১, শিব-৪টি। এই, পুরনো বৈষ্ণব হিন্দুমন্দিরের পাশেই ৭টি বৌদ্ধমূর্তি, ৯টি জৈনমূর্তি প্রাপ্তি অঞ্চলে ধর্মীয় সহাবস্থানের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আজ ধর্মোম্মত্ততার যুগে যা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এই মূর্তিগুলির কটি এখন কোথায় আছে, কটি সাগর পারে পাড়ি দিয়েছে তার খোঁজ কি কেউ জানেন? সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালার হিসাবে আমাদের দু জেলায় অন্তত ২৫টি সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। দেশপ্রেমিক সচেতন মানুষই এই প্রচেষ্টার পুরোভাগে থাকতে পারে। সরকারি প্রয়াসকে এই শক্তির সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। সংগ্রহশালাগুলির সংগ্রহের তালিকা রচনা, বিবরণী প্রকাশ, পঞ্চায়েত, শিক্ষালয়গুলিকে যুক্ত করে বস্তুবাদী এই ইতিহাস শিক্ষা ও প্রচার, সুলভে মানুষের হাতে সাহিত্য প্রচার, নিয়মিত প্রদর্শনী, আলোচনা, চোখে দেখা হাতে ছোঁয়া পরিচিতির ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা দরকার।

জীবনের শেষপর্বে এক প্রত্নতত্ত্ববিদ 'আমাদের জেলার প্রত্নস্থল' (হরিনারায়ণপুর আটঘরা)-এ লিখলেন আমাদের দায়িত্বের কথা। "পুরাবস্তুসমূহ বিস্ময়করভাবে প্রমাণ করে, অনেক আগে ২৪ পরগনায় ছিল নানা সুরম্য নগরী ও নৌবন্দর, যেখানে নিয়মিত আসত দেশ বিদেশের বাণিজ্য তরণী। সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি শোভিত এই সব জনপদের বিলাস বাহুল্য মার্জিত সংস্কৃতির দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। .....কিন্তু এ গুলি তো ঐতিহাসিক যুগের কথা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্তই আজ আমাদের বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করে, কারণ তা আজ আমাদের কাছে অজ্ঞাত। .....খননের দ্বারা প্রমাণিত হল একদা বিরাজিত এক প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি ও জীবনধারার অস্তিত্ব।

চব্বিশ পরগনায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকের বহমান ধারা চলেছে এই শতকের প্রথম দিক হতেই। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়ংবেঙ্গল শিরোমণি বারুইপুরের রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসে জনজীবনের গুরুত্ব তুলে ধরে ইতিহাস রাজারাজড়ার কেচ্ছাকাহিনীর বিরুদ্ধে মতামত ও তদনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক উপাদান চিন্তা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'এনসাইক্লোপেডিয়া বেঙ্গলিনীস্' এ ইতিহাসের আধুনিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন বিশ্বের দেশবিদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম গঙ্গারিডি রাজ্য নিয়ে আলোক সম্পাত করে ছিলেন। হরপ্রসাদশাস্ত্রী কেবল তিব্বত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন, পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেছেন তাই নয় বুড়ুনিয়া (জলে বুড়ে বা ডুবে যাওয়া দেশ) হিসাবে ২৪ পরগনার জেলার সংবাদ জেলা ইতিহাসের অংকুর রচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ও অনুরূপ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কালিদাস দত্ত সারাটা জীবন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে মেতে উঠেছিলেন আর বাংলার ইতিহাসকে প্রাগৈতিহাসিক সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বাংলার রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনে অনেক সময় এই উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু বাংলার অন্য জেলাগুলির ইতিহাস কোনও না কোনওভাবে রচিত হলেও এই জেলার ইতিহাস রচিত হয়নি। জেলার ইতিহাস চর্চা এই শতকের প্রথমভাগ হতে শুরু হয়েছে এবং অন্তত ৫বার সে প্রয়াস কখনো সম্মেলন, সমাবেশ, বিদগ্ধ আলোচনা ও আকাঙ্ক্ষার লতাগুল্মদামের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এই ২৪ পরগনার অংশীভূত কলকাতার ৩০০ বছর নিয়ে উদ্যোগ কম নেই, কিন্তু ২৫০০ বছরের প্রত্ন-ঐতিহ্য সম্পন্ন এই ২৪ পরগনার চর্চা যেন স্থানীয়ত্ববাদী (localism) সংকীর্ণতার ভীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। অথবা রমেশচন্দ্র মজুমদারও স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য সংগৃহীত না হলে যে জাতীয় ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় না বলে লিখলেন তার খোঁজ আমরা রাখি না। এ কর্তব্য সাধনে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানই একমাত্র ভরসা।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট গণসংগঠক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক

সাগর চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা ও প্রত্নতত্ত্ব একটি রূপরেখা

প্রাক্‌কথন ঃ

পুরাকীর্তি বলতে বুঝি মাটির নীচে এবং মাটির ওপরে চোখে দেখা যাচ্ছে এমন বস্তু বা উপাদান যা আগেকার দিনের মানুষের তৈরি। এই উপাদানের মধ্যে পড়ছে সৌধ, ইমারত, স্তুপ, পুঁথিপত্র, মুদ্রা, শিল্প-ভাস্কর্য, শিলালেখ, তাম্রলিপি, মাটির জিনিসপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, প্রাচীন জলাশয়, পুরনো স্মারকবস্তু ও নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্র সহ আরো অনেক কিছু যার মধ্যে শিল্প অথবা ইতিহাসগত কিছু গুরুত্ব আছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের পুরাবস্তু সংক্রান্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে কোন পুরাবস্তুকে হতে হবে অন্তত একশ বছরের পুরনো। পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞায়ও পুরাবস্তুর মাধ্যমে মানুষের অতীত দিনের সংস্কৃতিকে খুঁজে বার করার কথা বলা হয়েছে—Archaeology deals with the study of the past human culture through materialistic remains. ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের মিল একটা জায়গায় যে দুটিই অতীতকে নিয়ে। পুরাবস্তুগত প্রমাণ নিয়ে প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের দরজায় হাজির হয় তবেই ইতিহাস পূর্ণতা পায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এমন একটি জেলা যার মধ্যে পুরাকীর্তি বা পুরাবস্তুগত উপাদান প্রচুর ছড়িয়ে আছে। খ্রিষ্টপূর্ব বা খ্রিষ্টপরবর্তী বিভিন্ন যুগের পুরাবস্তু এখানে পাওয়া গেছে যা জেলায় মানুষের অধিবসতির প্রাচীনত্ব ও তার সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। অনেকের কাছে এই জেলার প্রাচীনত্ব আজও সংশয়ের বিষয়। এ প্রসঙ্গে শ্রী কালিদাস দত্তের মন্তব্য—"কেবলমাত্র ভূতত্ত্ববিদগণ এ দেশকে নবীন বলিয়াছেন বলিয়া প্রাচীনকালে ইহার অস্তিত্ব ছিল না এরূপ স্থির করা আদৌ যুক্তি যুক্ত নহে। ভূতত্ত্ববিদগণ লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন, কারণ তাঁহাদের অনুসন্ধান ঐতিহাসিকদের ন্যায় পাঁচ সাত হাজার বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এ জন্য তাঁহাদের নিকট যে দেশ নবীন, ঐতিহাসিকদের নিকট তাহা বহু প্রাচীন।"

এ পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে সমস্ত পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে বলা যাচ্ছে যে এই জেলার একটি সুস্পষ্ট প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। শত শত বছর আগে বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায়, পৌরানিক গ্রন্থে, প্রাচীন কবিদের রচনায় এমন কিছু কিছু জায়গার উল্লেখ আছে যা বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত বলে অনেক গবেষক মনে করেন। মাটির নীচে পাওয়া বিভিন্ন পুরাবস্তু ছাড়াও বর্তমানে এই জেলার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রত্ন সৌধ যার পরিচয় এই অল্প জায়গায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রত্নসম্পদে সমৃদ্ধ একটি উল্লেখ করার মতো জেলা। অনেকেই এই জেলায় প্রত্নতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন, করছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থে এই গবেষণা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই জেলার অতীত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে গেছেন বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক, গবেষক ও এই জেলার প্রত্ন গবেষণার প্রথম পথিকৃৎ প্রয়াত কালিদাস দত্ত (১৮৮৫-১৯৬৮)। সুন্দরবন সহ তৎকালীন ২৪ পরগনার নিম্নভূমির বহু দুর্গম জায়গায় তিনি প্রত্নানুসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন বহু উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু, পুরা সৌধ তাঁর সংগৃহীত প্রত্নসামগ্রী রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতীত ও প্রত্ন সংক্রান্ত তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধই মূল্যবান, তথ্যসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণমূলক যা এই জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লক্ষ্য করা গেছে যে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের নিদর্শন এই জেলায় বেশি অর্থাৎ শুঙ্গ-কুষাণ যুগের নিদর্শন সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। মৌর্য যুগের নির্দশন পাওয়া গেলেও সংখ্যায় কম, খ্রিষ্টিয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক অর্থাৎ গুপ্ত যুগের ধারার নিদর্শনও লক্ষ্য করা গেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাচীন ইতিহাস আজও মূলত উৎখনন ও গবেষণা সাপেক্ষ। তবে এ জেলায় মানুষের বসতির প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। প্রস্তরযুগের মানুষের ব্যবহৃত নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে এই জেলার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার দুটি জায়গায়। জায়গা দুটি হল দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর। এ ছাড়াও প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের বহু পুরাবস্তু এই জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে পাওয়া গেছে যা গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যগত দিক থেকেও এই জেলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বঙ্গোপসাগর আগে পূর্বসাগর বলে অভিহিত হত (বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে—রবীন্দ্রনাথ)। রামায়ণের আদিকাণ্ডে পূর্ব সমুদ্রতীরে সাগরদ্বীপ বা সমুদ্র আশ্রিত নিম্নবঙ্গের উল্লেখ আছে পাতাল বা রসাতল বলে। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল মুনির সাধনাস্থল গঙ্গাসাগর সঙ্গম বলে অনেক গবেষকের ধারণা। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে কপিলাশ্রম পাতালে অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন। মৎস্য ও বায়ু পুরাণেও কপিলাশ্রমের ঐ একই অবস্থানের কথা বলা হয়েছে[১]। মহাভারতের যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করে কলিঙ্গের বৈতরণীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন।

— স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায় সঙ্গমে নৃপঃ।
নদী শতানাং পথ্যানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্।।
ততঃ সমুদ্র তীরেন জগাম বসুধাধিপ।
ভাতৃভিঃ সহিতো বীরং কলিঙ্গান প্রতি ভারতঃ।। (বনপর্ব)

ভীম দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি ইত্যাদি বঙ্গ এবং সুহ্ম রাজাদের পরাজিত করে শেষে সাগরতীরে আসেন এবং ম্লেচ্ছদেরও পরাজিত করেন—

সমুদ্র সেনং নিৰ্জ্জিৰ্ত্য চন্দ্র সেনং চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চরাজানাং কর্ব্বটাধিপতিং তথা।।
সুহ্মাণামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসীনঃ।
পূর্বাণ ম্লেচ্ছগনাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।।
(সভাপর্বান্তর্গত দিগ্বিজয় পর্বাধ্যায়)

মহাভারতে ঐ ম্লেচ্ছগণ এই অঞ্চলের আদিবাসী হওয়া অসম্ভব নয়। পদ্মপুরানেও এ অঞ্চলের আরো বিবরণ পাওয়া যায়। সে সময়ে সাগরসঙ্গমে সুষেণ নামে চন্দ্রবংশের এক রাজা রাজত্ব করতেন। এখানে ছিল গভীর অরণ্য ও জনপদ। সে অরণ্যে দীপান্তীনগরের রাজনন্দিনী ও তালধ্বজনগরের রাজকূলবধূ সুলোচনা পুরুষের ছদ্মবেশে ভীমনাদ নামে এক গন্ডারকে হত্যা করেছিলেন।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকে বাদ দিলে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত সম্ভবত এই নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের জনবসতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায় গ্রীক ও রোমান লেখকের রচনায়। এছাড়াও বিদেশী ভুগোলবিদের তৈরি করা প্রাচীনতম ম্যাপেও তৎকালীন নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গঙ্গারিদাই বা গঙ্গারিদেই নামে একটি দেশ এবং গঙ্গারিদ বা গঙ্গারিডি নামে একটি জাতি সেইসঙ্গে গঙ্গা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের লেখায়— This river (Ganges) which is 30 stadio in width flows from north to south and empties into the ocean forming boundary towards the east of the tribe of the Gangaridae: [Deodorous. XVIII 93, McCrindle Translation]

অর্থাৎ গঙ্গারিদ জাতির রাজ্যের পূর্বসীমায় গঙ্গা যা ৩০ স্টেডিয়া বা প্রায় ৬০২৬ গজ চওড়া, উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই জাতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—গ্রীসীয় ও ল্যাতিন সাহিত্যে গঙ্গারিদাই বা ঐ সংশ্লিষ্ট যে নামগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মূল ভারতীয় নাম ছিল 'গঙ্গারিদ', গ্রীসীয় ভাষায় কর্তৃকারকের বহু বচনে যার রূপান্তর হত গঙ্গারিদাই'। এই মূল গঙ্গারিদ নামটির সঙ্গে গঙ্গার যোগ আছে। কথাটির অর্থ হচ্ছে 'গঙ্গা যার (অর্থাৎ যে দেশের) হৃদয়ে' (গঙ্গাহৃদ > গঙ্গারিদ)। এই ব্যাখ্যা 'পেরিপ্লৌস তেস ইরিথ্রাস থালাসেসস্' লিখিত গঙ্গা দেশের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। এই গঙ্গা দেশই কালিদাসের বঙ্গ, যার অবস্থান ছিল গঙ্গার বিভিন্ন স্রোত ধারার মধ্যে।[২] ডিওডোরাসের লেখায় গঙ্গারিদ জাতির বীরত্বের পরিচয়ও লেখা হয়েছে— India..........is inhabited by very many nations among which the greatest of all is that of the Gangaridae, against whom Alexander did not undertake an expedition, being deterred by the multitudes of their elephants. This region is separated from further India by the greatest river in those parts (for it has a breadth of 30 stadia). [Deodorous XVIII. McCrindle translation]

গঙ্গারিডির প্রাচীনতম ম্যাপ

তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গঙ্গারিদ জাতির স্বীকৃতি ছাড়াও তাদের বীরত্বে ও তাদের হস্তিবাহিনীর জন্য আলেকজান্ডার তাঁদের আক্রমণ করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আলেকজান্ডারের সময়কালকে ধরে (খ্রিঃ পূর্ব ৩২৭) গঙ্গারিদ জাতির সময়কাল অনুমান করা যাচ্ছে। খ্রিঃ পূর্ব ১ম শতকে ইতালীর মহাকবি ভার্জিল তাঁর বিখ্যাত জর্জিস (Georgies) কাব্যগ্রন্থে গঙ্গারিদ জাতির বীরত্বের প্রশংসা করেছেন।

On the doors will I represent
In solid gold and ivory
The battle of the Gangaridae........Book III

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ টলেমীর আন্তর্গাঙ্গেয় ভারতবর্ষের মানচিত্রে (India Intra Gangem) গঙ্গার পঞ্চনদী মুখের উল্লেখ পাওয়া যায়। টলেমি গঙ্গারিদ জাতির রাজ্যের রাজধানীকে 'গঙ্গে' বলে উল্লেখ করেছেন।

—All the country about the mouths of the Ganges is occupied by the Gangaridae with the city-Ganga, a royal city.'' [Ptolemy's Geography]

ভার্জিলের প্রায় সমসাময়িক ও **পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি** গ্রন্থের রচয়িতা এক অজ্ঞাত নাবিকের বিবরণ অনুযায়ী "গঙ্গে" নগর-বন্দর থেকে অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ও নানা দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হত।

গঙ্গারিদাই রাজ্য ও রাজধানী গঙ্গের প্রকৃত অবস্থান আজও রহস্যে ঘেরা। বিতর্কও রয়েছে গঙ্গারিদাই জাতির হস্তিবাহিনীর সংবাদ পেয়েই পিছু হটেছিলেন বীর আলেকজান্ডার৩। এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলেছে। বিভিন্ন গবেষকের মতে সম্ভাব্য দুটি জায়গার নাম পাওয়া যাচ্ছে, প্রথমটি বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনার আদিগঙ্গা বিধৌত সাগর অঞ্চল, অন্যটি উত্তর চব্বিশ-পরগনার দেগঙ্গা অঞ্চল সেইসঙ্গে বেড়াচাঁপা-র সুবিখ্যাত চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থলটি। আবার টলেমীর ম্যাপে উল্লিখিত ত্রুটি জনক অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গারিদাই রাজ্যের প্রকৃত অবস্থান সনাক্ত করা আজ প্রায় অসম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন। বিতর্ক যাই থাক বিদেশী লেখকদের রচনায় গঙ্গারিদ জাতির উল্লেখ প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখযোগ্য। শ্রী যদুনাথ সরকারের মতে গঙ্গা থেকে গঙ্গারিদ শব্দের উৎপত্তি। সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক বিনয়চন্দ্র সেন তাঁর Some Historical aspects of the Inscription of Bengal, Calcutta, 1942 গ্রন্থে লিখেছেন—By the quarter of the 4th Century B.C, lower and western Bengal had been formed into a united compact kingdom (Gangaridae). পাশাপাশি গঙ্গারিদ জাতির উল্লেখ এদেশের কোন প্রাচীন লেখকের রচনায় পাওয়া না গেলেও আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব চতুর্থ শতকের কবি কালিদাস থেকে শুরু করে ভারতীয় কবি বা লেখকের রচনায়, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে সেইসঙ্গে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর সাহায্যে বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যে একটি সুসভ্য জনজীবনের অস্তিত্ব এককালে ছিল তা আর অস্বীকার করা যায় না। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় গঙ্গারিদ জাতির বাস্তব অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক গঙ্গা (বর্তমানে আদিগঙ্গা) ও তার অববাহিকাকে কেন্দ্র করেই মূলত এই জেলার প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস।

২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা : পলাশীর যুদ্ধের ছ মাস পরে ১৭৫৭-র ২০শে ডিসেম্বর ২৪ পরগনার জন্ম। মীরজাফর ইংরেজকে কলকাতা সহ দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত ২৪টি পরগনা কলকাতার জমিদারি বা ২৪ পরগনার জমিদারি নামে ৮৮২ বর্গমাইল এলাকা দান করেছিলেন বার্ষিক ২২২৯৫৮ টাকা খাজনা সেইসঙ্গে বাংলার নবাব হবার আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে—That the country to the south of calcutta lying between the river and the lake and reaching as far as Culpee shall be put under the perpetual government of the English in the manner as now governed by the country Zamindars, the English paying the usual rents for the treasury.[৪]

সেইসময় জেলার আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল, পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬৩৯ বর্গমাইল। মোট ২৪টি পরগনা ছিল এই অঞ্চলে—আকবরপুর, আমীরপুর, কলিকাতা, পৈখান, আজিমাবাদ, বালিয়া, বারিদহাটি, বসনধোয়াব, দক্ষিণ সাগর, গড়, হাতিয়াগড়, ইখতিয়ারপুর, খাড়িজুড়ি, খাসপুর, মেদনমল্ল, মাগুরা, মানপুর, ময়দা, মুড়াগাছা, পাটকুলি, সাতাল, শাহনগর, শাহপুর ও উত্তর পরগনা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের অধিকাংশ সময় সুন্দরবনের এক বিস্তৃত অংশ ২৪ পরগনার মধ্যে ছিল না। ১৭৭০-এ সর্বপ্রথম জঙ্গল কেটে সুন্দরবন অঞ্চলে বসতি ও চাষ আবাদের শুরু। ১৭৯৩-এ লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর উন্নয়নের স্বার্থে সুন্দরবনকে চব্বিশ পরগনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮৭১-এ ২৪ পরগনা থেকে বাদ দেওয়া হয় কলকাতাকে যা আলাদা একটা জেলার স্বীকৃতি লাভ করে। এর আগে ১৮২২-২৩ নাগাদ বসতি ও চাষ আবাদের জন্য সুন্দরবনকে লট (lot) ও প্লটে ভাগ করা হয়। সুন্দরবনের উত্তরাংশের এলাকাগুলো ১, ২, ৩, ইত্যাদি ক্রমানুসারে মোট ১৬৯টি লট বা স্থানীয় ভাষায় লাট ও দক্ষিণ সমুদ্রের দিকের এলাকাগুলো A, B, C থেকে L পর্যন্ত ১২টি প্লটে চিহ্নিত করা হয়।

২৪-পরগনা তৈরি হবার আগে এই অঞ্চল মুসলমান পূর্ব যুগে একটি বিশেষ সরকারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলে বাংলাদেশের ৫টি বিভাগ ছিল রাঢ়, বাগড়ী৫ (ব্যাঘ্রতটি অর্থাৎ যে তটে বাঘ বাস করে সম্ভবত সুন্দরবন অঞ্চল) বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা। বঙ্গের আবার তিনটে ভাগ ছিল লক্ষ্মৌতি, সাতগাঁ ও সোনারগাঁ। বাংলার প্রথম জরিপ ১৫৮২তে আকবর ও আকবরের অর্থসচিব টোডরমলের আমলে। এই জরিপে বাংলাকে ১৯টি রাজস্ব অঞ্চল বা সরকারে এবং ৫৩টি মহলে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে একটি বিভাগ ছিল সরকার সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম সরকার। এর সীমা উত্তরে পলাশী থেকে দক্ষিণে সাগরদ্বীপের হাতিয়াগড় এবং পূবে কপোতাক্ষ থেকে পশ্চিমে হুগলী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ২৪ পরগনা ছিল এই সাতগাঁ সরকারের একটি অংশ। ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে মোগল আমলের শেষ জরিপে ঐ পরগনাগুলিকে চাকলা হুগলীর অর্ন্তভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ১৮৫৫য় মহকুমার ধারনাকে নিয়ে আসা হয় ও সমগ্র জেলাকে ৮টি মহকুমায় ভাগ করা হয়। নতুন মহকুমার সৃষ্টি বা অদল বদলও এর পরে ঘটে। আর প্রশাসনিক সুবিধের কারণে ১৯৮৬-র ১লা মার্চ শনিবার ২৪
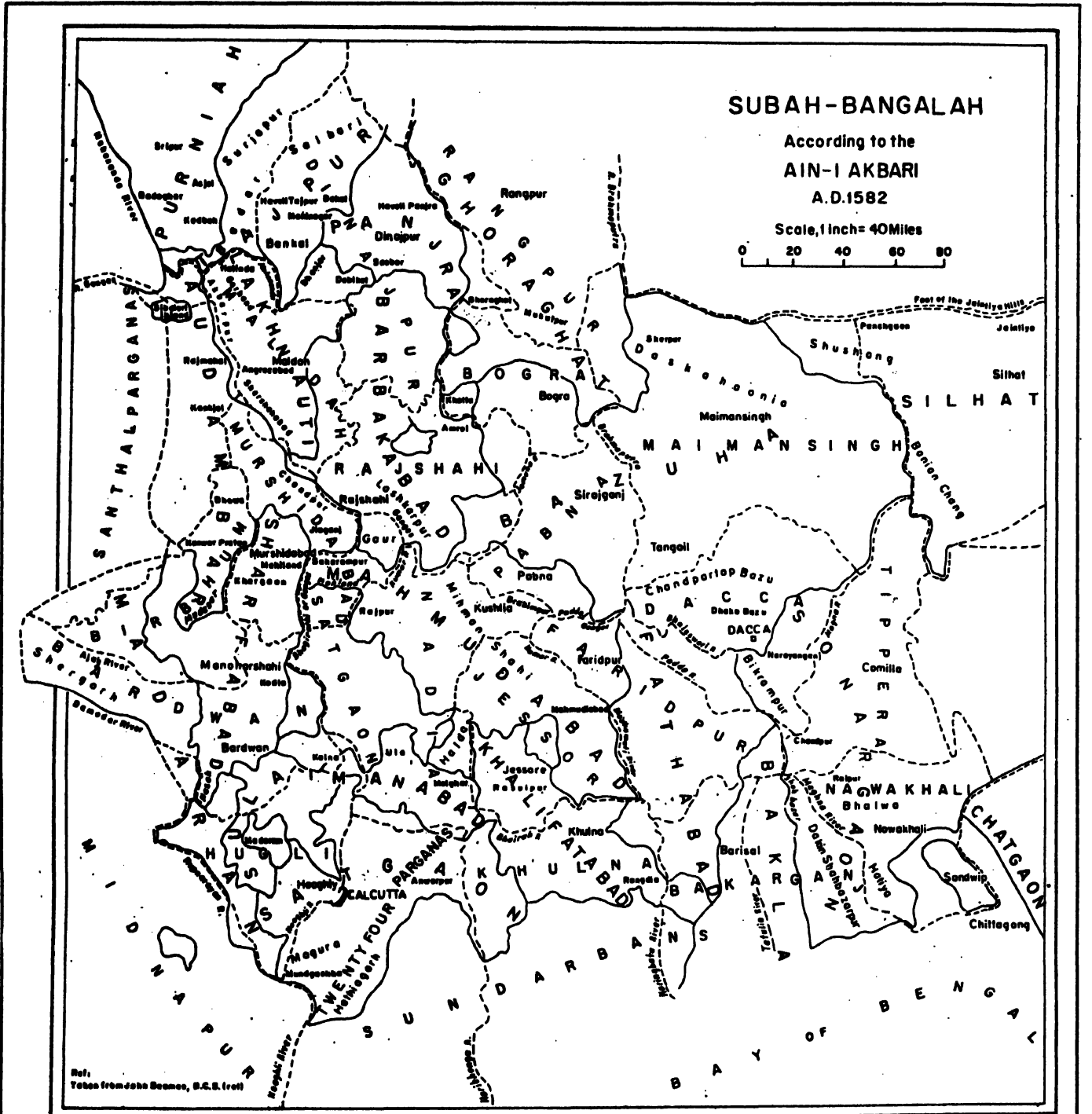
আইন-ই-আকবরী অনুসরণে সুবাবাংলার মানচিত্র

পরগনাকে ভেঙে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই দুটি জেলায় ভাগ করা হয়।

বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভৌগোলিক অবস্থান ২২°৩৭' থেকে ২১°২৫'৩০" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১'১০" থেকে ৮৯°৬'১৫" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে। উত্তরে কোলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমে হুগলী নদীর ওপারে হাওড়া ও মেদিনীপুর, দক্ষিণে গঙ্গার মোহনা ও অসংখ্য নদীনালা সহ বঙ্গোপসাগর সেইসঙ্গে ভারতীয় সুন্দরবনের অন্তর্গত সুবিশাল ম্যানগ্রোভ বনভূমি যা পৃথিবীর নবম বায়োস্ফিয়ার বা জীব পরিমণ্ডল হিসেবে পরিগণিত আর পূবে উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ, সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা।

আদিগঙ্গা ঃ চলতি কথায় প্রয়াগকে বলা হয় গঙ্গার যুক্তবেণী আর ত্রিবেণীকে মুক্তবেণী। এই দুটো শব্দেরই তাৎপর্য রয়েছে। প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যমুনা ও সরস্বতী। গঙ্গা এখানে যুক্তবেণী আর ত্রিবেণীতে গঙ্গা থেকে কেটে বেরিয়ে যমুনা ও সরস্বতী আলাদা পথে সাগরে পড়েছে, ত্রিবেণী এখানে গঙ্গার মুক্তবেণী। শোনা যায়

সূর্যবংশীয় রাজা ভগীরথ একবার হিমালয় থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত বিলুপ্ত নদীপথ সংস্কার করেছিলেন এবং এ দেশের ওপর দিয়ে স্রোতস্বিনী গঙ্গাকে প্রবাহিত করেছিলেন। তাই গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী। রামায়ণ, মহাভারতে গঙ্গা ও ভগীরথীর এই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণে খিদিরপুর পর্যন্ত ভাগীরথীর মূলধারা এখনও লক্ষ্য করা যায়। খিদিরপুরের কাছ থেকে মূল ভাগীরথী একসময় কলকাতা, বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা সেইসঙ্গে সুন্দরবনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে পড়ত। তিনটি নদীর মধ্যে সম্ভবত মূল নদীস্রোত ছিল গঙ্গা-ভাগীরথীর। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রপট্টে গঙ্গা-ভাগীরথীকে বলা হয়েছে সুরসরিৎ বা দেবনদী। অন্য দুটি শাখানদীর মধ্যে সরস্বতী এককালে সপ্তগ্রামের পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে দামোদর ও পরে বর্তমান কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাম্রলিপ্তের পাশ থেকে কংসাবতী মোহনার সঙ্গে সাগরে পড়ত। সরস্বতীর প্রাচীন স্রোতধারা হিসেবে এটি মনে করা হয়, পরবর্তীকালে এই প্রাচীন সরস্বতীর গা থেকে আরেকটি ধারা হাওড়া, সাঁকরাইল হয়ে দামোদর ও রূপনারায়ণের প্রবাহ বহন করে হুগলী নদী হয়ে সাগরে পড়ত। একে বলা হয় উত্তর সরস্বতী বা সরস্বতী। ১৫শ—১৬শ শতক পর্যন্ত এই সরস্বতী যথেষ্ট স্রোতস্বিনী ছিল[৭] সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন কারণে এটি মজে যাওয়ায় সপ্তগ্রাম বন্দর বিলুপ্ত হয় ও ভাগীরথীর তীরে হুগলি বন্দর গড়ে ওঠে। অবশিষ্ট যমুনা নদীটি ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ইছামতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। যমুনারই একটি শাখা বিদ্যেধরী।

আদিগঙ্গা প্রসঙ্গে গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বিভিন্ন সময়ে নদী মাতৃক সভ্যতার সূত্র ধরে গড়ে উঠেছিল বহু প্রাচীন জনপদ। তার নিদর্শন এখনো মেলে মাটির তলা থেকে পাওয়া বিভিন্ন যুগের প্রত্নবস্তু থেকে। মাটির ওপরে প্রাচীন প্রত্ন-সৌধের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে এলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারও নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। আদিগঙ্গা মূল ভাগীরথীরই আদি স্রোতধারা যা এককালে খিদিরপুর থেকে দক্ষিণে কালীঘাট, বোড়াল, রাজপুর, মাহিনগর, বারুইপুর, দক্ষিণ বারাশত, জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ, খাড়ি, সাগরদ্বীপ ছুঁয়ে সাগরে পড়ত। জনশ্রুতি মুসলমান রাজত্বের শেষদিকে ১৭৫০ সালে মূলত বানিজ্যিক সুবিধের কারণে নবাব আলিবর্দি খিদিরপুর থেকে হাওড়া-সাঁকরাইল পর্যন্ত খাল কেটে ভাগীরথীর জলপ্রবাহকে সরস্বতীর পরিত্যক্ত খাত দিয়ে সাগরের দিকে প্রবাহিত করেন, ফলে আদিগঙ্গা দ্রুত মজে যেতে আরম্ভ করে। এই কারণে খিদিরপুরের পশ্চিমে হুগলি নদীকে আজও স্থানীয় লোকেরা কাটা গঙ্গা বলে এবং নদীর এই অংশের জল কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় না। ১৭৬৪ সালে রেনেল সাহেব যখন বাংলাদেশের জরিপের কাজ শুরু করেন তখন আদিগঙ্গা সম্পূর্ণ মজে গেছে। তাই রেনেলের ম্যাপে[৬] আদিগঙ্গাকে নালুয়া পর্যন্ত একটি ক্ষীণ ধারা হিসেবে দেখান হয়েছে। পরবর্তীকালে কালিদাস দত্ত বহু পরিশ্রমে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আদিগঙ্গার একটি মানচিত্র তৈরি করেন। ১৯৩১ সালে এটি সরকারী স্বীকৃতিও লাভ করে[৭]।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আদিগঙ্গার এই মজে যাওয়া প্রাচীন স্রোতধারার সঙ্গে বিজড়িত এই জেলার ইতিহাস ও প্রত্নসম্পদ। বাংলার
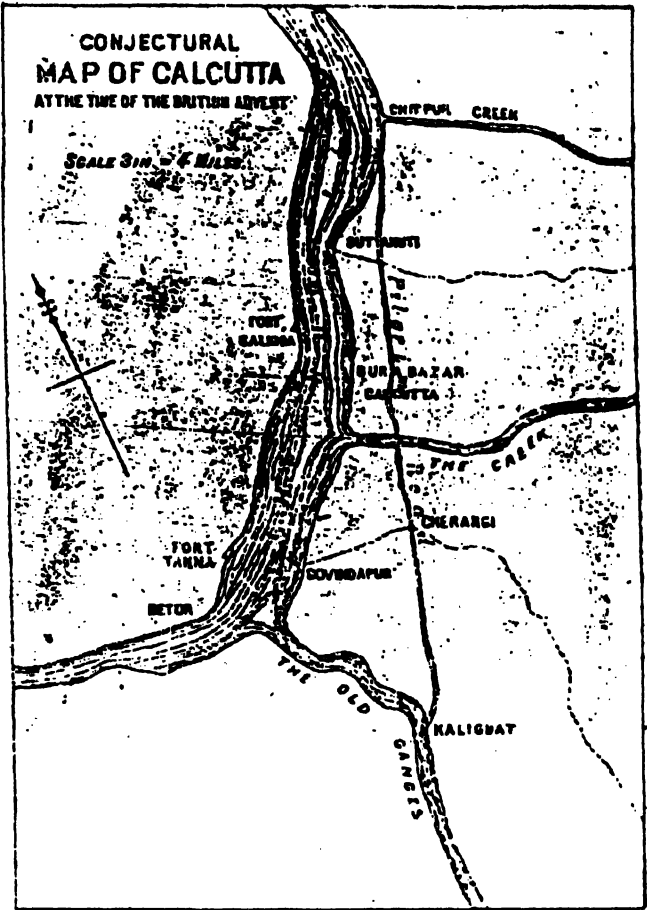
জোব চার্নকের আমলে ও তৎপরবর্তীকালের কলকাতা

প্রাচীন কবি বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল (১৪৯৫), মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল (১৫৭৫), কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্যে (অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ) দেখা যায় তৎকালীন ধনপতি, চাঁদ, শ্রীমন্ত ইত্যাদি বণিকেরা আদিগঙ্গা দিয়ে বাণিজ্য করতে যেতেন। ১৫১০ সালে শ্রী চৈতন্যদেব এই আদিগঙ্গাকে অনুসরণ করে হেঁটে বারুইপুরের আটিসারা ও আরো দক্ষিনে ছত্রভোগে পৌঁছে নৌকায় নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। সেই হাঁটাপথ আজও কয়েক জায়গায় লক্ষ্য করা যায়, প্রচলিত নাম দ্বারির জাঙ্গাল। বিশেষজ্ঞদের মতে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য এই রাস্তা এককালে প্রচলিত ছিল। ১৮ শতকের আগে যখন কোলকাতা-বিষ্ণুপুর (বর্তমান দক্ষিণ বিষ্ণুপুর) রাস্তা তৈরী হয় নি, তখন জলপথ ছাড়া গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন অঞ্চলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল এই রাস্তা যা আদিগঙ্গার তীর ধরে কালীঘাট থেকে ছত্রভোগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কাগজপত্রে এই রাস্তার উল্লেখ আছে 'Pilgrim's track' বলে। দ্বারীর জাঙ্গাল ছাড়াও 'গঙ্গাসাগর রাস্তা' বা 'ছত্রভোগ পথ' নামেও এটি অভিহিত হত।

এছাড়া ১৫৬০ সালে জ্যাও ডি ব্যারোস ও ১৬৬০ সালে ভ্যানডেন ব্রুকের বাংলার মানচিত্রে আদিগঙ্গাকে ভাগীরথীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে দেখানো হয়েছে। ১৯২৩ সালে এই জেলার

বারুইপুরের কাছে গোবিন্দপুরে রাজা লক্ষ্মণ সেনের (আঃ ১১৭৯-১২০৫ খ্রিঃ) একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। লিপির এক অংশে 'জাহ্নবী' বা গঙ্গার উল্লেখ রয়েছে

—শ্রী বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতি পশ্চিম্ খাটিকায়াং বেতড্ড-চতুরকে পূর্ব্বে জাহ্নবী (স্র) বস্তি অর্দ্ধসীমা'[৮]

তাম্রফলকটি একটি ভূমিদান সনদ। এর মাধ্যমে রাজা লক্ষ্মণ সেন জাহ্নবীর তীরে বেতড্ড চতুরকের অধীন বিড্ডার শাসন গ্রামটি ব্যাসদেব শর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করছেন। শাসন গ্রামের পূর্বসীমায় আজও আদিগঙ্গার মজা খাতটি লক্ষ্য করা যায়। এই তাম্রফলকটি প্রমাণ করে যে দ্বাদশ শতাব্দীতে আজকের আদিগঙ্গা জাহ্নবী নামে খ্যাত ছিল। আরো কয়েক শতাব্দীর পর ১৮৬৪তে লেখা আত্মজীবনীতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন—নৌকো করে তিনি কোলকাতা থেকে তাঁর গ্রাম মজিলপুরে যেতেন। নিশ্চিতভাবেই আদিগঙ্গা ধরে তিনি মজিলপুরে যেতেন। আদিগঙ্গা তখনো পুরোপুরি শুকিয়ে যায় নি।

আদিগঙ্গা নামটি প্রাচীন নয়। মজে যাওয়া গঙ্গাকেই অনেকে আদিগঙ্গা নাম দিয়েছেন। কালিদাস দত্তের আদিগঙ্গার ইতিহাস প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—''উক্ত (ভাগীরথী) লুপ্ত প্রবাহের মজাগর্ভ এখনও কোথাও আদিগঙ্গা নামে খালের আকারে, আবার কোথাও বা গঙ্গার বাদা বা মজা গঙ্গা নামে নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া কালীঘাট, বৈষ্ণবঘাটা, বোড়াল, রাজপুর, মাহীনগর, বারুইপুর, সূর্যপুর (নাচনগাছা), মূলটি, দক্ষিণ বারাশত, জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ ও খাড়ি প্রভৃতি জনপদের ওপর বিদ্যমান আছে। সে কারণে ঐ সকল স্থানের হিন্দু অধিবাসীরা উক্ত আদিগঙ্গা নামক খালের তীরে ও গঙ্গার বাদা বা মজাগঙ্গা নামক নিম্নভূমির ওপর শবদাহ করেন এবং উল্লিখিত খালের ও নিম্নভূমির ওপর খনিত পুষ্করিণী সমুহের জল গঙ্গাজল বলিয়া ব্যবহার করেন[৯]।

আজও জয়নগর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, রাজপুর ইত্যাদি জায়গায় ঘোষের গঙ্গা, শিবগঙ্গা, বাসন্তী গঙ্গা, বোসের গঙ্গা ইত্যাদি নামে কিছু জলাশয় লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট কিছু পরিবার মজে যাওয়া গঙ্গাকে জায়গা বিশেষে সংস্কার করে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী এই ধরনের নাম দিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলা ১১৯০ সালেরও আগে জলাশয়গুলো কাটা হয়েছে এমন প্রমাণও আছে[১০]। জলাশয়গুলোর প্রতিটি নামের শেষে গঙ্গা শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো যা প্রাচীন গঙ্গার স্মৃতি বহন করছে। পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই জলাশয়গুলো উল্লেখ্য এই কারণে যে পরবর্তীকালে এমন বহু জলাশয় সংস্কার করার সময় বিভিন্ন যুগের মূল্যবান পুরাবস্তু পাওয়া গেছে।

টালির নালা ঃ ১৭৭৫ সালে মেজর উইলিয়াম টালি কোলকাতার হেস্টিংস থেকে দক্ষিণে গড়িয়া পর্যন্ত ৮ মাইল লম্বা আদিগঙ্গার, মজা খাতকে কেটে কিছুটা গভীর ও চওড়া করেন। টালিসাহেবের নামেই টালিগঞ্জ। এরপর গড়িয়া থেকে আদিগঙ্গা ধরে আর দক্ষিণে না গিয়ে পূব দিকে বাঁক নিয়ে গড়িয়া রেলস্টেশন হয়ে আরো ৯ মাইল একটা নতুন খাল কেটে টালিসাহেব পূবে শামুকপোতা অঞ্চলে বিদ্যাধরীর সঙ্গে এটি যোগ করেছেন। বিদ্যাধরীর তখন ছিল প্রবল স্রোত। শামুকপোতার ওপারে বিদ্যাধরীর কূলে ছিল তার্দা বন্দর যা তৎকালীন চব্বিশ পরগনার প্রথম পর্তুগীজ ঘাঁটি হিসেবে স্বীকৃত। হেস্টিংস থেকে এই শামুকপোতা পর্যন্ত ১৭ মাইল লম্বা খালকে টালির নালা বলা হয়। ১৮০৪-এ এই টালির নালাকে সংস্কার করে আরো চওড়া ও গভীর করেন ইংরেজ সরকার। এর কারণও ছিল। শামুকপোতা থেকে বিদ্যেধরী নদী তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাহিনী হয়ে ক্যানিং-এর কাছে মাতলা নদীতে গিয়ে মিশত। এখান থেকে জলপথে কালিন্দী হয়ে খুলনার বসন্তপুর ও বসন্তপুর থেকে বরিশাল যাওয়া যেত। এইভাবে কোলকাতার সঙ্গে বরিশাল, খুলনা পর্যন্ত একটা সরাসরি যোগাযোগের রাস্তা গড়ে উঠেছিল টালির নালার মাধ্যমে।

পুরাবস্তু ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত যা পুরাবস্তু পাওয়া গেছে তা পূর্বভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এক তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন বলা যেতে পারে। তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে সুদুর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পুরাবস্তু এই জেলায় পাওয়া গেছে। এই পুরাবস্তুগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পাথরের অস্ত্র (২) পোড়ামাটির জিনিষপত্র (৩) পোড়ামাটির মূর্তি, ফলক, (৪) ধাতু ও পোড়ামাটির অলংকার পুঁতিদানা, (৫) পাথরের ও ধাতুর ভাস্কর্য বা মূর্তি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ যে বেশিরভাগ পুরাবস্তু চানস্ ফাইনডিংস্ বা হঠাৎ করে পাওয়া। বিভিন্ন সময়ে মাটি কাটা, পুকুর সংস্কার, জঙ্গল হাসিল বা পুরনো স্তুপ থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে মাটির ধারাবাহিক স্তরবিন্যাস বা সাংস্কৃতিক কিংবা কালগত বিন্যাস ছাড়া এগুলো পাওয়ায় এই পুরাবস্তুগুলোর বয়স বা সময়কাল ঠিক করা অনেকটা তুলনা বা অনুমান নির্ভর। পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে বিজ্ঞানভিত্তিক উৎখননও এই জেলার কয়েকটা জায়গায় হয়েছে যার মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরাবস্তুকে বিভিন্ন যুগ অনুযায়ী চিহ্নিত করা গেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুরাবস্তুর প্রাচীনতম নিদর্শন প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্র যা কয়েকটি জায়গায় কিছু পরিমাণে পাওয়া গেছে। ডায়মন্ডহারবার মহকুমার দুটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর। এই দুটি প্রত্নস্থলই ভারতীয় পুরাতত্ত্বে এক উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করেছে। প্রাচীন সরস্বতী নদীখাত ও বর্তমান হুগলি নদীর তীরে এই দুটি জায়গায় মধ্যপ্রস্তর বা ক্ষুদ্রাশ্মীয় যুগের আয়ুধ বা অস্ত্র পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ। অনেকের মতে দেউলপোতায় সন্ধান পাওয়া গেছে প্রায় ৫০০০০ বছর আগের উল্লেখযোগ্য অস্ত্রতৈরির ক্ষেত্রের। ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পক্ষে দেউলপোতা থেকে হরিনারায়ণপুর পর্যন্ত অনুসন্ধান চালান প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডঃ আর ভি. যোশী ও রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন নির্দেশক ডঃ পি. সি. দাশগুপ্ত। এই সংক্রান্ত প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বালির স্তর থেকে আবিস্কৃত হয়েছে মধ্য বা ক্ষুদ্রাশ্মীয় যুগের কিছু অস্ত্র, শঙ্খ ও পাথরের পিণ্ড সহ পুঁতিদানা ও খোলামকুচি। হরিনারায়ণপুরে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার থেকে শুরু করে মৌর্য শুঙ্গ-কুষাণ, হিন্দু ও মুসলমান বা মধ্যযুগের বিভিন্ন প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। স্বর্গত কালিদাস দত্ত সর্বপ্রথম হরিনারায়ণপুরে একটি গর্ত থেকে ১২টি নব্যপ্রস্তরযুগের হাতিয়ার আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে তিনি এখান থেকে আরো ১৭টি বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার খুঁজে পান। এইগুলি হল একটি কুঠার, একটি মসৃণ চকচকে পাথর, একটি হাতুড়ি, দুটি চাঁচুনি, দুটো পেষাই করা পাথর (Pounders), তিনটি নোড়া ও আটটি হাড়ের তৈরি ছুঁচ। স্বর্গত পরেশ দাশগুপ্ত এখান থেকে একটি কুঠার সংগ্রহ করেন ১৯৫৮-৫৯ সালে। অনেকের ধারণা
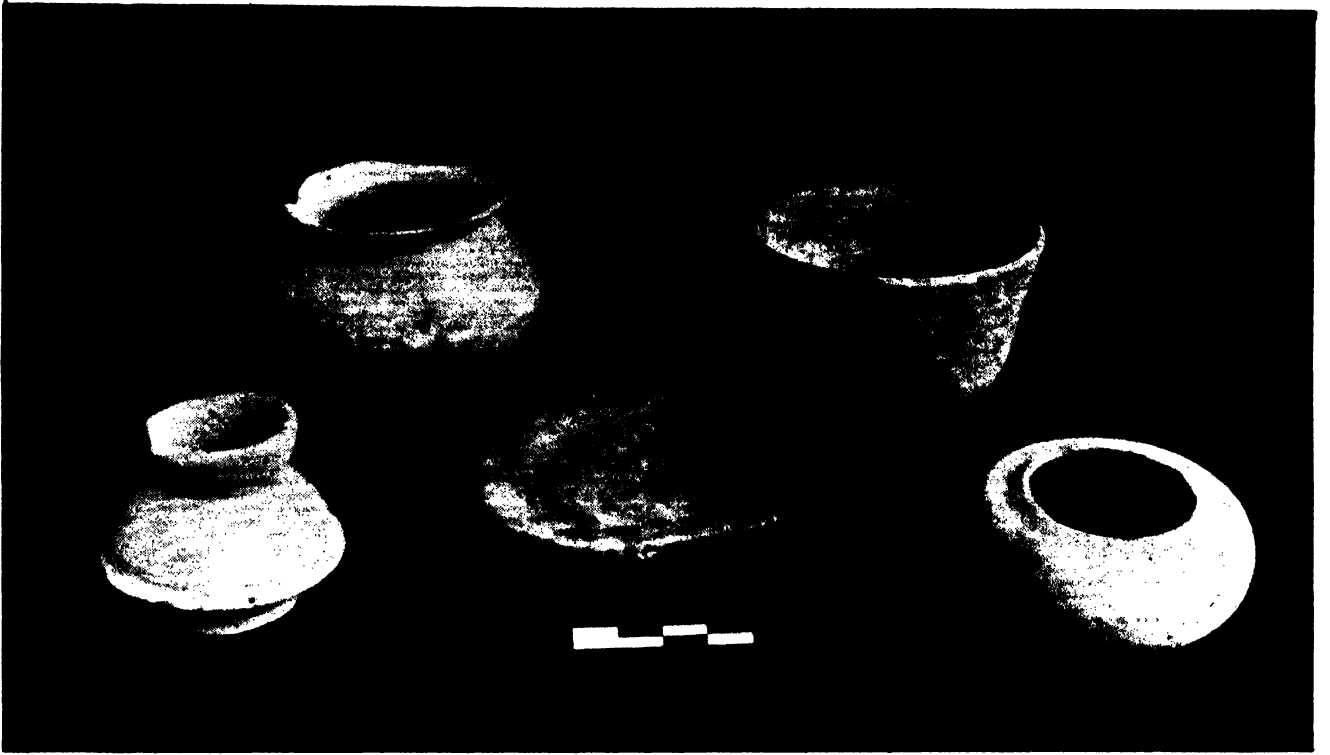
হরিনারায়ণপুর থেকে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র, রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

হরিনারায়ণপুরে এই ধরনের অস্ত্র তৈরির একটা কারখানা ছিল। তবে এই জেলায় মধ্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ পাওয়া নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন অনেকে। এমনকি নব্যপ্রস্তর যুগে এই জেলায় মানুষের অধিবসতি ছিল এমন ধারণা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। পাশাপাশি তাম্রপ্রস্তর বা তার পরবর্তী তাম্র-লৌহ যুগের নিদর্শনও এই জেলা থেকে এখনো পাওয়া যায় নি বলে জানা গেছে যা তাৎপর্যপূর্ণ।

পোড়ামাটি-শিল্প (Terracotta art) :

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পোড়ামাটির দ্রব্যের ইতিহাস কমপক্ষে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ বছর ধরা হলেও এই ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ধরে নেওয়া হয় হরপ্পা-মহেঞ্জদড়ো সভ্যতা থেকে (আঃ খ্রিঃ পূ—৩০০০ অব্দ)[১১]। বাংলায় প্রাচীন মৃৎশিল্পের যা নির্দশন এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষভাগে কিংবা তার কিছু পরে পাথরের দ্রব্যের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে এবং তামার ব্যবহারের প্রচলনের পরে মাটির পাত্রকে চিত্রিত করার ও মাটির পুতুল গড়ার রীতির প্রবর্তন হয়েছিল।[১২] বর্ধমান জেলার পান্ডুরাজার ঢিপিতে আবিষ্কৃত একটি মৃৎপাত্রের একাংশের ধার ঘেঁসে ছিটে বেড়ার আকারের নকশা দেখা যায়। নকশার নীচে এক সারি মাছ যেগুলির অবয়ব বিভিন্ন রেখার সাহায্যে আনার চেষ্টা হয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিপি ও মঙ্গলকোটে উৎখননের সময় হাতে টিপে নরম মাটির দলা থেকে বানানো পুতুল কিছু পাওয়া গেছে যা প্রধানত তাম্র-লৌহ যুগে (আঃ ১০১২ (± ১২০) খ্রিঃ পূ) তৈরি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এই ধরনের কিছু হাতে তৈরী মৃৎসামগ্রী যুগ যুগ ধরে একই বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিক নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে এবং বিশেষ কোন যুগের মৃৎসামগ্রী হিসেব আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। ইংরেজীতে বলে Ageless, timeless, primitive বা archaic type, বাংলায় 'কালাতিক্রান্ত'। এগুলি সবই মাতৃকা মূর্তি ও পশুপাখির সরলিকৃত রূপ। গ্রাম বাংলার লৌকিক আচারে, আচরণে এ ধরনের মৃৎসামগ্রী দেখা যায়। তবে প্রাচীন মৃৎশিল্পের আসল পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া পোড়ামাটির দ্রব্যের মধ্যে যেগুলি বিভিন্ন যুগ অনুযায়ী শিল্পগত বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই দু ধরণের মৃৎসামগ্রীই পাওয়া গেছে যেমন নানা ধরণের মূর্তি, ফলক, প্রদীপ, খেলনা, পাত্র, হাঁড়ি, হাতে গড়া টেপা পুতুল, সরা, গেলাস, প্রদীপদানী, কুজো, পানপাত্র, হুঁকো গেলাসের চাপা, জীবজন্তুর মূর্তি, লাট্টু, অলংকৃত টালি, ঝুড়ির চিহ্নযুক্ত ছোট জলাধার ইত্যাদি, তবে পাওয়া যায় নি তাম্রাশ্রিয় বা তাম্র-লৌহ সংস্কৃতির (আঃ খ্রিঃ পূর্ব ১৫০০-৩০০ অব্দ) নিদর্শন সূচক কোনও কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎপাত্র (Black & Red Ware) বা অন্য কিছু যা তাৎপর্যপূর্ণ। এই হিসেবে এই জেলার মৃৎশিল্পের সূচনার সময় হিসেবে আমরা মূলত আদি ঐতিহাসিক (Early Historic) পর্যায় অর্থাৎ আ: খ্রিঃ পূর্ব ৪০০ অব্দকে বেছে নিতে পারি।

লক্ষ্য করা গেছে যে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের নিদর্শন এই জেলায় বেশি অর্থাৎ শুঙ্গ-কুষাণ যুগের নিদর্শন সংখ্যার দিক থেকে অনেক বেশি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। মৌর্য যুগের নির্দশন পাওয়া গেলেও সংখ্যায় কম, খ্রিষ্টিয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক অর্থাৎ গুপ্ত যুগের ধারার নিদর্শনও লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তী পাল সেন যুগের মৃৎসামগ্রীও পাওয়া গেছে এই জেলায়, কয়েকটি প্রত্নস্থলে উৎখননের মাধ্যমে এই ধরনের মৃৎসামগ্রীকে চিহ্নিত করা গেছে। আর

পাল সেন পর্বের পর পরবর্তী প্রায় চার শতক পোড়ামাটি শিল্পের শূন্যতার শেষে এই শিল্পের ব্যবহার আবার লক্ষ্য করা গেছে মূলত মূর্তি ভাস্কর্য সেইসঙ্গে মন্দিরের দেওয়ালে নানা ধরনের অলংকরণ হিসেবে। অন্যান্য জেলার মত এই জেলায়ও টেরাকোটা মন্দির তৈরি হয়েছে. নানা বিষয়বস্তু নিয়ে মৃৎফলক ও অন্যান্য অলংকরণও লক্ষ্য করা গেছে।

মৌর্য-শুঙ্গ যুগ থেকে পোড়ামাটির নিদর্শন পাওয়া গেছে এমন কয়েকটি আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল বোড়াল, দেউলপোতা, আটঘরা, হরিনারায়ণপুর। আটঘরায় ও হরিনারায়ণপুরে NBPW *(উত্তর ভারতীয় মসৃণ কালো মৃৎপাত্র) প্রাপ্তি মৌর্য শুঙ্গ যুগের মানুষের অধিবসতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। আটঘরা থেকে পাওয়া কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মৃৎসামগ্রী—মৌর্য যুগের পোড়ামাটির সছিদ্র গোলক, ছোটদের খেলনা খুঁটি (hop scotch)। এই মৌর্য যুগেরই আর একটি মৃৎসামগ্রী—বোড়াল থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলকে একটি মাতৃমূর্তি যেখানে একটি শিশু মায়ের ডান স্তনটি বাঁ হাতে ধরে আছে। শুঙ্গ যুগের দুটি উদাহরণ আটঘরা থেকে পাওয়া পোড়ামাটির ছিদ্রযুক্ত টালি (যা উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ের শুঙ্গস্তর থেকেও পাওয়া গেছে) ও হাতলযুক্ত পোড়ামাটির ঝুমঝুমি। ঝুমঝুমির গায়ে ছোট একটি ছিদ্র, পাথরের ছোট টুকরো ভেতরে, নাড়ালে শব্দ হয়। এই ধরনের ঝুমঝুমি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। আগে ছিল মাটি এখন প্লাস্টিক বা অন্যকিছু। উপাদান, প্রযুক্তি ও আঙ্গিক বদলেছে কিন্তু মূল ধারণাটা একই আছে। এটি পাওয়া গেছে বোড়াল থেকে। দেউলপোতায় আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রিঃ পূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতকের মধ্যে তৈরি গজলক্ষ্মীর মৃৎফলক ও উপরত্নের পুঁতি, হরিনারায়ণপুরে চুনাপাথরের একটি ষাঁড় পাওয়া গেছে যা মেদিনীপুরের তমলুক ও উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ের পুরাবস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এই ষাঁড়টির বয়সকাল বিশেষজ্ঞরা মৌর্য যুগ ধরলেও তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বেহালায় রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রয়েছে এই হরিনারায়ণপুর থেকে পাওয়া কুঁজযুক্ত হাতে তৈরি একটি ষাঁড় (humped bull) যেটি ageless বা কালাতিক্রান্ত বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।[১৩]

কুলতলি থানার চুপড়িঝাড়া থেকে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র *ছবি : জয়ন্ত হালদার*

হরিনারায়ণপুত্র থেকেও বিভিন্ন পোড়ামাটির মূর্তি, খেলনা, পুঁতিদানা ও NBPW পাওয়া গেছে।

এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা যেখানে খ্রিষ্টিয় ১ম শতক থেকে পোড়ামাটির উল্লেখযোগ্য দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ করার মতো প্রত্নবস্তু সম্ভবতঃ ১ম-২য় শতাব্দীতে তৈরি নারী পুরুষের মিথুন মূর্তি।

আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল কাকদ্বীপের কিছুটা আগে পাকুড়তলা যেখান থেকে বেশ কিছু প্রাক্-বঙ্গলিপিযুক্ত (Proto Bengali inscription) পোড়ামাটির ফলক বা কেক পাওয়া গেছে। এগুলো রাখা আছে কাকদ্বীপের গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র সহ অন্যান্য কিছু সংগ্রহশালায়। হাতে তৈরি অসম আকারের চ্যাপ্টা এই ফলকগুলোতে কাঁচা বা নরম অবস্থায় কঞ্চি বা কাঠের ধারালো টুকরো দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে।

'The main texts show a few lines of cursive writting done with a sharpened piece of bamboo or wood when the clay was wet. The plaques occasionally carry minute seal impressions of illegible motifs.[১৪] ।

বিশিষ্ট গবেষক, অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী মেদিনীপুর ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত এই ধরনের মোট ৬০টি লিপি ফলকগুলি সম্মন্ধ মত প্রকাশ করেছেন—"These plaques carry proto-Bengali inscriptions, the earliest group of which falls between the 8th/7th and 12th Centuries A.D. Basically they are all votive plaques."[১৫] দক্ষিণ ২৪ পরগনার দেউলপোতা, মন্দিরতলা ও খাড়ি অঞ্চলেও এই ধরনের লিপি ফলক পাওয়া গেছে। এই ধরনের লিপি ফলকগুলির সময়কালের সীমারেখাও অধ্যাপক মুখার্জী রেখেছেন এইভাবে (১) ৭০০/৮০০ থেকে ১২০০ (২) ১৩০০ থেকে ১৪০০ এবং (৩) ১৫০০-১৭০০/১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

পাকুড়তলা থেকে পাওয়া উল্লেখযোগ্য মৃৎসামগ্রীর মধ্যে পোড়ামাটির পুঁতি, ঝুড়ির ছাপ লাগা পাত্র (busket pottery) উপরত্নের পুঁতি, লাঞ্ছনময় তামার মুদ্রা, পোড়ামাটির অলংকার, শুঙ্গ থেকে গুপ্ত যুগের চিহ্ন যুক্ত মৃৎসামগ্রী, বড় নল যুক্ত আধার ও প্রচুর পোড়ামাটির ফলক (terracotta plaque)। পাকুড়তলার কাছাকাছি মহাদেবতলা, পুকুরবেড়িয়া, মানিকনগর থেকেও প্রচুর মৃৎসামগ্রী পাওয়া গেছে। এই চারটি গ্রাম সম্বন্ধে এটুকু বলা যায় যে কোন প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষের ওপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত। দেউলপোতাতেও খ্রিঃ পূর্ব ২য়/১ম শতকে তৈরি একটি গজলক্ষ্মীর মৃৎফলক, গুপ্তযুগের পোড়ামাটির জিনিষ, খেলনা, উপরত্নের পুঁতি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এই কয়েকটি জায়গা ছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার আরো অসংখ্য গ্রাম থেকে প্রাচীন মৃৎসামগ্রী পাওয়া গেছে। এই জায়গাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিলপি, ডাবু, ঢোসা, পাতপুকুর, ঘোষের চক, বৈদ্যের চক, জামতলা, রাধাকান্তপুর, দেবীপুর, পাখিরালয়, বকখালি, জালাবেড়ে, খোলাখালি, গোকর্ণী, কাশীনগর, বাইশহাটা, হোগলা, গুড়গুড়িয়া, সাগরদ্বীপের মধ্যে কচুবেড়িয়ার ঘাট, কীর্তনখালি,

*সুধীন দে : নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন, বারুইপুর, ১৯৯৪

প্রসাদপুর (ধবলার ঘাট), বারুইপুরের কাছাকাছি মাহিনগর ইত্যাদি। প্রাপ্ত মাটির জিনিষের নিদর্শন দেখে এটুকু আন্দাজ করা যায় খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতক থেকে খ্রিস্টিয় ১৩-১৪ শতক বা সপ্তদশ শতক পর্যন্ত জনবসতির চিহ্ন এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছিল।

প্রাচীন মুদ্রা ঃ

আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব ৫ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এরই সমসাময়িক সময়ে গ্রীস, পারস্য, লিডিয়ায় উন্নততর মুদ্রা পদ্ধতির কথা জানতে পারা যায়। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে ও অন্যান্য প্রচলিত বিবরণে ভারতে তারও আগে মুদ্রার উল্লেখ থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্নানুসন্ধান বা আবিষ্কারের মাধ্যমে ৫ম শতাব্দীর আগের কোন মুদ্রার খোঁজ পাওয়া যায় নি বলে যতদূর সম্ভব জানা গেছে। ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রার খোঁজ পাওয়া গেছে উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলা ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে। লম্বা ও সামান্য বাঁকানো, মধ্যে মুদ্রা প্রচলনকারীর দেওয়া ছাপ, সম্পূর্ণ রূপোর তৈরি মুদ্রা, ইংরেজীতে বলে Bent Bar। এরপরে ভারতীয় মুদ্রা পাওয়া গেল খ্রিঃ পূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে, মৌর্য আমলে। শুধু রূপো নয়, তামা দিয়েও মুদ্রা তৈরি হত। দেখতে চৌকো বা আয়তাকার, কোন্‌গুলো কাটাকাটা। গাছপালা, হাতি, মাছ, ষাঁড় ইত্যাদির ছাপ খুব হাল্কা ভাবে দেওয়া থাকত। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তামার মুদ্রাকে কার্ষাপন ও রূপোর মুদ্রাকে পুরান বা ধরন বলা হত। মৌর্য যুগের পর শুঙ্গ ও কুষাণ রাজত্বের শেষ পর্যন্ত আর এক ধরনের মুদ্রার প্রচলন ছিল এর নাম কপার কাষ্ট কয়েন বা তামার ছাঁচে ঢালাই মুদ্রা। দেখতে চারকোনা বা গোলাকার, ব্যবহৃত প্রতীক সামান্য উঁচু রিলিফ হিসেবে থাকত।

বাংলায় এই ধরনের মুদ্রার ব্যবহার ছিল। এখানে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে গুপ্তযুগের সোনা ও রূপোর মুদ্রা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় কুমারগুপ্তের মুদ্রার ব্যবহার। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রাও পাওয়া গেছে, বিশেষজ্ঞদের মতে তা মৌর্য-শুঙ্গ কালের। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রকেতুগড়ের মুদ্রা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন—'চন্দ্রকেতুগড় যে ভারতের প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম তার একটি কারণ হ'ল মুদ্রা।' দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেলেও তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। আদিগঙ্গার তীরে কোলকাতার দক্ষিণে ১৭৮৩ সালে কালীঘাটে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় একঘড়া গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা (Hoard of Gold coins)। সংখ্যায় ছিল দুশোর কিছু বেশি। এগুলোর অধিকাংশই নষ্ট বা গালিয়ে ফেলা হয়েছিল। এই মুদ্রাগুলো আবিষ্কারের পর রাজা নবকৃষ্ণ তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের হাতে এগুলো তুলে দিয়েছিলেন। হেস্টিংসে মারফৎ এগুলো চলে যায় ইংল্যান্ডে। অল্প যে কয়েকটি মুদ্রা পরবর্তীকালে অক্ষত অবস্থায় থেকে যায় তার অনেকগুলো রাখা আছে অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামে, কেমব্রিজের পাবলিক লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। পাঠোদ্ধার করার পর জানা যায় যে ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও বিষ্ণুগুপ্তের মুদ্রা এগুলো। কালীঘাট এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নয়, তবে আদিগঙ্গার তীরে এই স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার পরোক্ষভাবে এই জেলা তথা বাংলার ইতিহাসকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে. এছাড়াও আদিগঙ্গার মূল গতিপথ বরাবর বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে তামার ঢালাই করা লাঞ্ছনময় মুদ্রা ও অঙ্ক চিহ্ন যুক্ত রূপো বা তামার মুদ্রার সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জের প্রাচীন মুদ্রা, কুষাণ মুদ্রা, কুষাণমুদ্রার অনুকরণে তৈরি মুদ্রা, গুপ্ত রাজাদের মুদ্রা, সুলতানী মুদ্রা ইত্যাদি। নবম ও দশম শতাব্দীর পাল ও সেন রাজাদের কোন নিজস্ব মুদ্রার কথা জানা যায় না। গুপ্তযুগের মুদ্রার প্রাচুর্য সম্ভবত এই দুই বংশের রাজাদের আলাদা মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে দেয় নি, তবে ঐ সময়ে যে কড়ির প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় আবিষ্কৃত মাটির পাত্রে রাখা প্রচুর কড়ি দেখে।
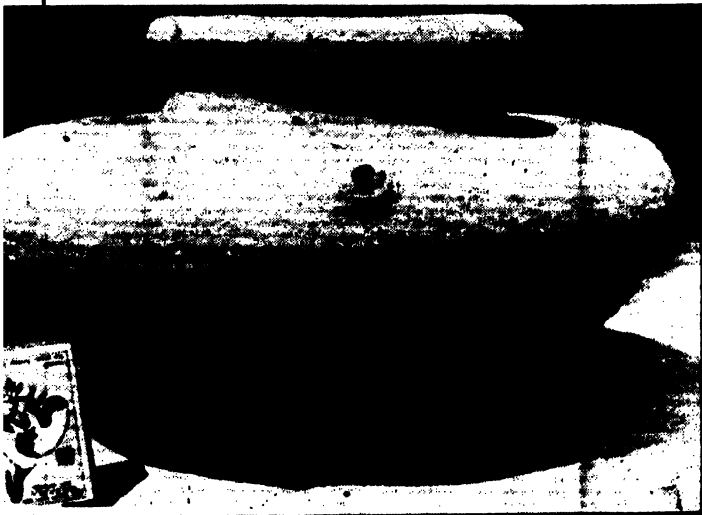
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এ পর্যন্ত যত প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে তার মধ্যে নানা ধরনের প্রতীক চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো বিশেষ করে রূপোর মুদ্রায় হাতি, মাছ, চক্র, সূর্য, বৃষ ও তামার মুদ্রায় হাতি, গাছ, চৈত্য, ক্রশ, চাঁদ, মাছ ইত্যাদির ব্যবহার বেশি। কখনো চৌকো, কখনো গোল, উভয়ই অনিয়মিত মাপের। হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত তামার ঢালাই করা মুদ্রার ওপরে তোরণ মুদ্রিত হয়েছে যা থেকে মৌর্য-শুঙ্গ যুগের তোরণদ্বারের গঠন বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আবার এই হরিনারায়ণপুরের তামা মেশানো রূপোর মুদ্রায় সমুদ্রগামী জাহাজের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ, চন্দ্রকেতুগড় ও মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত বা বর্তমান তমলুকেও এই ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকদের মতে এই মুদ্রাগুলো মৌর্য-শুঙ্গ কালে প্রচলিত ছিল। আটঘরা থেকে পাওয়া মুদ্রায়ও জাহাজের প্রতীক লক্ষ্য করা গেছে যা প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যিক প্রসার ও নৌ তৎপরতার কথা ব্যক্ত করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে সমস্ত অঞ্চল থেকে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি হোল সীতাকুণ্ড-আটঘরা, বোড়াল, সাগরদ্বীপ (মন্দিরতলায় মৌর্য শুঙ্গ-কুষাণ আমলের তাম্রমুদ্রা), বাড়িভাঙা, হরিনারায়ণপুর, সুন্দরবনের জিপ্লটের অর্ন্তভুক্ত বুড়োবুড়ির তট (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা), বারুইপুরের নবগ্রাম (জয়নগের স্বর্ণমুদ্রা অন্যমতে কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা ও ফিরোজশাহ তুঘলকের স্বর্ণমুদ্রা) ইত্যাদি। নবগ্রামের এই স্বর্ণমুদ্রাটি তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রামে রাস্তা করার সময়

পাথরপ্রতিমা থানার অচিন্ত্যনগর গ্রামে মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত নলযুক্ত মাটির হাঁড়ি
ছবি ঃ সাগর চট্টোপাধ্যায়

বারুইপুর থানার নবগ্রামে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা *হেমেন মজুমদারের সৌজন্যে*

খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতকের এই স্বর্ণমুদ্রাটি পাওয়া যায়। মুদ্রার একদিকে তীরধনুক হাতে রাজমূর্তি, অন্যপিঠে দেবীমূর্তি। 'জ য় গ' এই তিনটি শব্দ এই স্বর্ণমুদ্রায় আছে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের প্রাক্তন অধিকর্তা প্রয়াত পরেশচন্দ্র দাসগুপ্তের মতে এই মুদ্রার প্রবর্তক শশাঙ্কের (গুপ্তযুগের শেষ) পরবর্তী রাজা জয়নাগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রাজা জয়নাগের মুদ্রা পাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। হরিনারায়ণপুরের কাছে হাটবেড়িয়া গ্রামে কিছু মুসলিমযুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। এছাড়াও পাকুড়তলায় আবিষ্কৃত হয়েছে তামার লাঞ্ছনময় মুদ্রা, দেউলপোতায় ১২টি কোন ছাপ ছাড়া ছাঁচে ঢালা তামার মুদ্রা (Cast Copper Coin), ২৭নং লাট কুলতলীতে গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা। ১১৬নং লাটে জাটুয়াখালের পাড়ে একটি ভাঙা হাঁড়ি থেকে শতাধিক তামার মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রার একদিকে জনৈক রাজার মূর্তি ও উল্টোদিকে বিন্দু দিয়ে সীমানা টানা রয়েছে (border of dots)। মুদ্রাগুলি কুষাণ সম্রাট হুবিষ্ক অথবা স্থানীয় কোন রাজা প্রচলন করেছিলেন বলে অনেকে ভাবেন।

তাম্রশাসন :

তামার পাতে উৎকীর্ণ লিপি বা লিখিত বিষয়বস্তু যা তৎকালীন রাজা বা প্রজাশাসকরা তাঁদের কীর্তি বা অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কোন উদ্দেশ্যে কাউকে ভূমিদান বা জমিপ্রদান, মন্দির তৈরি, বিহার বা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে এই ধরনের তাম্রশাসনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তামার পাত সহজে নষ্ট হয় না, শত শত বছর অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারে, তাম্রশাসনে ব্যবহারের কারণে। তৎকালীন বাংলার বেশ কিছু অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অনেক তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি নিদর্শন মালদা জেলার জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন যা পাল রাজবংশের এক অশ্রুতপূর্ব ব্যক্তিত্ব মহেন্দ্রপালদেবের উৎসর্গীকৃত জমিতে একটি বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্বের ইঙ্গিত এনেছিল। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার এই তাম্রশাসনের সূত্র ধরে ধীরে ধীরে পাল আমলের এই বৌদ্ধবিহারটির ধ্বংসাবশেষকে টেনে বার করছেন।

মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত বা পাল রাজাদের কোন তাম্রশাসন বা তাম্রলিপি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাওয়া যায় নি। তবে অন্য জায়গা থেকে পাওয়া পাল রাজাদের লিপিতে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে। নবম শতাব্দীর সম্রাট দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় গোপালদেব সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল জয় করার জন্য রণকুঞ্জরগণকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর ভৃত্যগণ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন। বীরভূম জেলার শিয়ান গ্রামে পাওয়া শিলালেখে বলা আছে—পাল বংশের জনৈক রাজা গঙ্গাসাগরে সোনার ত্রিশূল স্থাপন রূপোর সদাশিব মূর্তি, সোনার চন্ডিকা ও গণেশমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও দুই দেবতার জন্য স্বর্ণপীঠ তৈরী করেন।

× × × × × সাগ
র সঙ্গমে।।
রৌপ্যঃ সদাশিবো হৈমৌ চণ্ডিকা-বিঘ্ননায়কৌ
কারিতৌ কারিতং যেন তয়োর্হৈমঞ্চ পীঠকং (কম্)[১৬]।।
চন্ডাংশু × (শ্লোক ৫২—৫৩)

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এ পর্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে, একটি বাদে বাকিগুলি সেন যুগের। প্রথম তাম্রশাসনের উল্লেখ পাওয়া

যায়- ১৮৯৬তে প্রকাশিত List of Ancient Monument in the Presidency Division বইটিতে। — " The Deputy Collector of Diamond Harbour reported in 1875 that a Copper plate discovered in a place little to the north of Jatar Deul fixes the date of the erection of this temple by Raja Jayanta Chandra in the year 897 of the Bengali Sak era corresponding to A.D. 975. The Copper plate was discovered at the clearing of the jungle by the grantee Durga Prased Chowdhury. The Inscription is in Sanskrit and the date as usual given in enigma with the name of the founder."

তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'জটার দেউল' এই জেলা তথা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নসম্পদ যা এখনো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রেখ শৈলীর স্থাপত্যের অনন্য সাধারণ উদাহরণ এটি। তৎকালীন সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্যে এমন একটি দেউল কী ভাবে পাওয়া গেল তা অনেকের কাছেই বিস্ময়ের ব্যাপার। তাম্রশাসন অনুযায়ী এর প্রতিষ্ঠাকাল (৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) পালযুগে বলে মনে করা হলেও এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তা সত্ত্বেও সুদূর অতীতে সুন্দরবন অঞ্চলে যে জনপদ ও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল জটার দেউল নিঃসন্দেহে তারই স্মৃতি বহন করছে। যাইহোক তাম্রলিপিটি পরে হারিয়ে যায় তবে ঐ সময় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন বলে শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্ত বলেছেন।

এরও আগে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মথুরাপুর থানার ২২নং লাট বকুলতলায় একটি পুকুর খুঁড়তে গিয়ে মজিলপুরের জনৈক হরিদাস দত্ত একটি তাম্রশাসন পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এই তাম্রশাসনটিও পরে হারিয়ে যায়। প্রচলিত ভাষায় এটি লক্ষ্মণ সেনের সুন্দরবন তাম্রলিপি হিসেবে পরিচিত। রামগতি ন্যায়রত্নের লেখা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের ৩৭১ পাতায় এই তাম্রলিপিটির বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা আছে। প্রাক্ বঙ্গলিপিতে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ তাম্রলিপিটির মূল বক্তব্য—রাজা লক্ষ্মণ সেন পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতি খাড়িমণ্ডলের অন্তর্গত কাতল্লপুরচতুরকে মণ্ডল গ্রামে তিন দ্রোণ ভূমি শ্রীকৃষ্ণ ধর দেবশর্ম্মা নামে একজন ব্রাহ্মণকে দান করছেন।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের আর একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায় বর্তমান বারুইপুরের কাছে গোবিন্দপুর গ্রামে একটি পুকুর থেকে ১৯১৯ সালে। সামনের দিকে ২৬ লাইন ও উল্টো দিকে ২৭ লাইন মোট তিপ্পান্নটি লাইনে এই ভূমিদান সনদটি লেখা। লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় প্রাক্ বঙ্গাক্ষরে। মূল বক্তব্য রাজা লক্ষ্মণ সেন জনৈক ব্রাহ্মণ উপাধ্যায় ব্যাসদেবশর্মাকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী তীরে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম খাটিকায় বেতড্ডচতুরকে বিড্ডারশাসন গ্রামটি দান করছেন। সেন রাজাদের পৃষ্টপোষকতায় পুন্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে ব্রাহ্মণদের বহু নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল এমন আভাস এই লিপি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এই তাম্রশাসনে একটি ডালিম্ব ক্ষেতের উল্লেখ আছে যার অবস্থান ছিল গঙ্গার খুব কাছে।

এই জেলা থেকে আর একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় পশ্চিম সুন্দরবনের এফ্ প্লট সাগরদ্বীপের ১২ মাইল দূরে রাক্ষসখালি নামে একটি দ্বীপে। প্রাপ্তিস্থান অনুসারে এটি রাক্ষসখালি তাম্রলিপি নামে পরিচিত। ডোম্মনপাল সম্ভবত এই অঞ্চলের কোন সামন্তরাজা ছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এই সামন্তের নাম ডোম্মন পাল পাঠ করেছেন, তবে এই ডোম্মন পাল বাংলার পাল বংশের কেউ ছিলেন কিনা বলা যায় না।[১৭] এই চারটে তাম্রশাসন থেকে আমরা দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সুন্দরবন পর্যন্ত জনবসতির ইঙ্গিত পাচ্ছি।

কুলপি থানার দামোদরপুর গ্রামে হরিসভার দালানে রক্ষিত পাথরের বিষ্ণুমূর্তি (পাল-সেন যুগ) ছবি : লেখক

প্রাচীন সীল ও সীলমোহর :

সীল (Seal) এবং সীলমোহর (Sealing) এক জিনিষ নয়। Seal is a stamp bearing a device or letter(s) or both containing to its owner while its impression on any material is called sealing. অর্থাৎ সীল বলতে কোন বিশেষ প্রতীক যা কোন পত্র বা বস্তুর ওপর উল্টো করে মুদ্রিত থাকে, আর সীলমোহরও প্রতীক বা পরিচয়ের কার্য করে যা অন্য কোন পত্র বা বস্তুর ওপর ছাপ দেওয়া বা মুদ্রিত হয়। রোমবাসীরা সীলমোহর তৈরির

জন্য মোম ব্যবহার করতেন এবং খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে এই প্রথা চালু ছিল। ভারতে তাম্রশাসন ও তাম্রফলকের ওপর মুদ্রিত সীল প্রথম পুরাতত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেন। গয়া এবং শোনপথ থেকে পাওয়া সমুদ্রগুপ্ত ও সম্রাট হর্ষবর্ধনের সীল এর উদাহরণ। রোহটাস দুর্গে পাথরের ওপর খোদিত শশাঙ্কের সীল পাওয়ার পর ১৮৮৯ সালে ভিটারীতে দ্বিতীয়গুপ্ত সম্রাটের সীল পাওয়া যায়। সেইসময় যে কোন দানপত্র তাম্রফলকে খোদিত হত এবং তাম্রফলকের কোন এক জায়গায় সীল মুদ্রিত করা হত।[১৮] তখনও পর্যন্ত সীলমোহরের কোন ধারণা পাওয়া যায় নি। Sir Henry Layard প্রাচীন আসিরিয়ার কুয়ুঞ্জিক নামক জায়গায় খননের সময় কয়েকটি মাটির সীল দেখতে পান। একটিতে মিশরের কোন রাজার নাম মুদ্রিত ছিল। পরে ঐ জায়গায় পাথরের গোল সীল পাওয়া যায়। কোন পাথরে খোদাই করা দলিল বা চুক্তিপত্রে ভিজে মাটির ওপর এগুলি চেপে বসালে সীলে অঙ্কিত নামগুলি মাটির ওপর মুদ্রিত হত। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বকুলতলা থেকে পাওয়া লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের ওপরের দিকে সেন রাজবংশের আরাধ্য দেবতা সদাশিবের মূর্তি সীলমোহর বা প্রতীক হিসেবে খোদিত ও সংযুক্ত। গোবিন্দপুর তাম্রশাসনেও সেই একই সদাশিব মূর্তি খোদিত লক্ষ্য করা যায়। আর জটার দেউল ও রাক্ষসখালির তাম্রশাসনে সীলমোহর সম্পর্কিত কোন উল্লেখ নেই।

এ পর্যন্ত এই জেলায় কিছু প্রাচীন সীল পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে মূলত আদিগঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলি থেকে। বেশীর ভাগই গোলাকৃতি, অনেক ক্ষেত্রে ডিম্বাকার, বা অসমত্রি কোণাকৃতি। প্রায় সবই পোড়ামাটির তবে পাথরের তৈরি সীলও পাওয়া গেছে। একটি উদাহরণ সীতাকুণ্ড—আটঘরায় পাওয়া হরফ ও দেব-মূর্তি উৎকীর্ণ লালপাথরের একটি সীল। এছাড়াও গোল বা অসম আকারের পোড়ামাটির সীল যার এক পিঠে প্রাক্ বঙ্গলিপিযুক্ত এবং উল্টো পিঠে শিলমোহরের ছাপ পাওয়া গেছে পাকুড়তলা, দেউলপোতা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। এগুলিকে অনেকে ভোটিভ বা নিবেদন মূলক সীল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

প্রাচীন দিঘি ঃ

হান্টারের Statistical Account-এর ১ম সংখ্যার ২৩৫ পাতায় লেখা আছে—In the Sunderban jungles just south of this fiscal division (kh[illegible]) are [illegible] remains of several temples and the Reven[illegible] [illegible] in 1857 found the sites of two very large [illegible] over-grown with jungles and surrounde[illegible] [illegible] of embankments from thirty to forty fe[illegible] h[illegible] No clue could be obtained from the su[illegible] [illegible]lagers as to their history.''

এই জেলায় বেশ কি[illegible] দিঘি লক্ষ্য করা যায় যার ইতিহাস বেশ পুরনো [illegible] এর অধিকাংশই জঙ্গল হাসিলের সময় আবিষ্কৃত। অ[illegible] ইঙ্গিত এই ধরনের দিঘি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। "খাড়ি" [illegible] দত্ত লিখছেন—"প্রায় এক শত বৎসর হইল এই [illegible]ছে। প্রবাদ—এখানকার অরণ্য কাটাইতে হয় নাই, দা[illegible] পু[illegible]য়াছিল। বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মুখে শোনা যায় যে অরণ্য হাসিল কালে এখানে বহু সংখ্যক ইষ্টক নির্মিত গৃহের ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও অনেকগুলি মজা পুষ্করিণী আবিষ্কৃত হইয়াছিল।''[১৯] খাড়ির অনতিদূরেই রায়দিঘি। রায়দিঘির সুবিশাল জলাশয়টির মাপ প্রায় ১১০ বিঘা। এই দিঘির নামেই সম্ভবত রায়দিঘি। শোনা যায় এই দিঘি থেকে সংস্কৃত অক্ষরে খোদাই করা একটি পাথরের ফলক পাওয়া গিয়েছিল তাতে এই দিঘিটির প্রতিষ্ঠার কথা লেখা ছিল।* কালিদাস বাবু এই দিঘির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন যে বরদা প্রসাদ রায়চৌধুরীর জনৈক পূর্বপুরুষ সীতারাম রায় এই অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল করার সময় জঙ্গলের মধ্যে এই দিঘির সন্ধান পান ও সংস্কার করান। রায়দিঘির লাগোয়া মণি নদীর ঠিক ওপারে কঙ্কণদিঘির নামের মধ্যেও দিঘির অস্তিত্ব। এখানেও বেশ কয়েকটি বড় মজা দিঘি, পুকুর ও ইটের ঘরবাড়ির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে, পাওয়া গেছে বহু মূল্যবান প্রত্নসম্পদ যা এই জেলায় প্রাচীন জনবসতির ইঙ্গিত দেয়। কঙ্কণদিঘি এই জেলার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলও যেখানে এক বিস্তৃত জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।* রায়দিঘির আরো কিছুটা উত্তরে কাটানদিঘি সংস্কারের সময় পাওয়া গেছে পাথরের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সহ আরো মূল্যবান প্রত্নবস্তু। লাগোয়া ছত্রভোগ গ্রামের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের অনতিদূরে সুপরিচিত রাঘব দত্তের প্রায় ২২ বিঘে পুকুরটিও প্রাচীনত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। পুরনো পাতলা বর্গাকৃতি টালির স্নানঘাট এখন জলের তলায়, আদিগঙ্গাকে সংস্কার করে এই দিঘি তৈরি। প্রবাদ এর জলের তলায় রয়েছে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। গোসাবার হ্যামিলটনের কাঠের বাংলোর সামনে যে বড় পুকুর তার নীচে ও পাড়ে পাতলা ইট ও টালির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। ১৯০৫ সাল নাগাদ জঙ্গল হাসিল করে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন গোসাবায় বসতি পত্তনের আগে থেকেই এখানে ইট/টালির অস্তিত্ব ছিল। জনশ্রুতি প্রতাপাদিত্যের আমলের জনবসতির চিহ্ন এগুলি। এছাড়াও এই ধরনের প্রাচীন দিঘি, ঘরবাড়ি, ইটের স্তূপ ও কুয়োর চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে এই জেলার আরো কয়েকটি অঞ্চলে। এই জায়গাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বাইশহাটা, মইপিঠ, মাধবপুর, মণিরটাট, নলগড়া, হাড়ভাঙা, বোলাল, লাঙ্গলবেড়িয়া, ধোপাগাছি—পুরন্দরপুর (বারুইপুর) ইত্যাদি। শতাব্দী প্রাচীন আর এক ধরনের কিছু বড় পুকুর ও পাতলা ইটের স্নান-ঘাটও লক্ষ্য করা যায় এই জেলার বেশ কিছু অঞ্চলে। জঙ্গল হাসিল করে গ্রাম পত্তনের সময় বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলি এইগুলি তৈরি করেন। কাঠে পোড়ানো নানা মাপের ইট ও টালি স্নানঘাটে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

* কঙ্কণদিঘি ও রায়দিঘির প্রতিষ্ঠা সম্ভবত ১০০১ বঙ্গাব্দ বা ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দেরও আগে। ১৩১৪ সালে পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের লেখা "কুমুদানন্দ" নামে একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে জানতে পারা যায়।

"রায়দীঘী ও কঙ্কণদীঘী প্রতিষ্ঠার তারিখ একখানি প্রস্তরফলকে পাওয়া গিয়েছিল। প্রস্তরখানি কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী জমিদার হরপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট ছিল। জেলা চব্বিশ পরগনার থানা মথুরাপুরের অন্তর্গত সুন্দরবনের মধ্যে উক্ত জমিদার মহাশয়ের অধিকৃত ২৪ নম্বর পরিস্কৃত লাটে ওই দুই দীর্ঘিকা আজিও বর্তমান আছে। ১০০১ সালে জলপ্লাবনের পর দেশ জনশূন্য হইয়া গেলে এই সমস্ত স্থান জঙ্গলে আবৃত হইয়া যায়। ওই দুই দীর্ঘিকার মধ্যে বর্তমান মণি নদীও ওই জলপ্লাবন সময়ে সৃষ্ট (পৃঃ-৩৪)", এখনও কঙ্কণদিঘির পাড়ে পাতলা টালির স্নানঘাট ও পাশে মাটির বেশ খানিক গভীরে Offset যুক্ত ইটের Structure বা অবয়ব লক্ষ্য করা যায়।"

পাথরপ্রতিমা থানার দুর্গারচক গ্রামে প্রাপ্ত ও রক্ষিত পাথরের বিষ্ণুমূর্তি (পাল-সেন যুগ) *ছবি : লেখক*

এমনই কয়েকটি গ্রামের নাম—উত্তর সুতোবেচা, কাদীপুকুর, জগদীশপুর (হাউড়ির হাট), বাজারবেড়িয়া, ঘাটেশ্বর, ধনুরহাট, খোরদ, সেহালামপুর, বরদা, উত্তর কামারপোল, রামনগর (বাপুলিবাজার), মুলীমুকুন্দপুর, সাহাজাদাপুর ইত্যাদি।

প্রাচীন মূর্তি-ভাস্কর্য :

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ সেইসঙ্গে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক থেকেই নগর সভ্যতার ব্যাপক নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাৎপর্যপূর্ণ এটাই যে চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, হরিনারায়ণপুর, মহাস্থান, বাণগড়ের নাগরিক সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শনের মধ্যে পাথর বা ধাতুর তৈরি মূর্তি প্রায় অনুপস্থিত। এইসব প্রাচীন নগর থেকে যে শিল্প নিদর্শন বিপুল সংখ্যায় পাওয়া গেছে তা হল পোড়ামাটির ছোট এবং মাঝারি মাপের মূর্তিকা ও ফলক। পোড়ামাটির কাজের প্রাচুর্যের পাশাপাশি বাংলায় আদি ঐতিহাসিক পর্বে (আঃ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক) পাথর সেইসঙ্গে ধাতু-মূর্তির অপ্রতুলতা সহজেই চোখে পড়ে। আদি-ঐতিহাসিক পর্বের শিল্প পরম্পরায় পাথর এবং ধাতু-মূর্তির স্থান কেমন এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও আমাদের জানা নেই।

বাংলায় প্রাচীনতম রূপকীর্তির উপাদান মাটি। মৌর্য ও প্রাক্ মৌর্যকাল থেকে মাটিতে গড়া পুতুলের ব্যাপক অস্তিত্ব যে এখানে ছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে। বাংলার মাটিতে আবিষ্কৃত রূপকীর্তির প্রাচীনতম নিদর্শন তমলুক থেকে পাওয়া মৌর্যকালের সমসাময়িক একটি মাটির নারীমূর্তি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার হরিনারায়ণপুর থেকে পাওয়া একটি চুনাপাথরের বৃষমূর্তিকে মৌর্যকালীন বলে চিহ্নিত করা হলেও তা নিয়ে বিতর্ক আছে। এই জেলায় এ পর্যন্ত পোড়ামাটির প্রাচীন পুতুল বা মূর্তি যা পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই নারী বা মাতৃকামূর্তি। দু একটি সালংকরা বা জটাজুট ধারিণী, পুরুষের সংখ্যা কম। কাল হিসেবে ধরলে শুঙ্গ-কুষাণ যুগের শিল্পশৈলীর প্রভাব এই জেলায় বেশী এবং গুপ্ত-পাল-সেন যুগের শিল্পশৈলীর আঙ্গিকে তৈরি মূর্তি-পুতুলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। প্রকারগত দিক থেকে ধরলে নারীমূর্তি ছাড়া যক্ষ-যক্ষিণী, বাহন হাতি সহ ইন্দ্র, গণপতি, কুবের, গজলক্ষ্মী ইত্যাদি। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে হাতি, হরিণ, বানর, কুমীর, ঘোড়া, বৃষ—এর মধ্যে বেশী আবিষ্কৃত হয়েছে হাতির মোটিফ। এছাড়াও জাতক কাহিনী, দৈনন্দিন জীবন, নীতিগল্প বা দুই মহাকাব্যের নানা ঘটনাকে নিয়েও মাটির ফলক তৈরী হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রাচীন শিল্পশৈলীর পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে শুধু মাটির মূর্তি বা মূর্তি-ভাস্কর্যে নয়, এই জেলায় বিশেষ করে আদিগঙ্গার গতিপথের অনুসরণে বিভিন্ন জায়গা থেকে আবিষ্কৃত পাথরের ভাস্কর্যে। মূলত পাথরের জোগানের অভাবে বাংলায় শুঙ্গ আমলের পরেও অনেকদিন পাথর কেটে মূর্তি তৈরি হয়নি। চন্দ্রকেতুগড়ে একটি পাথরের বোধিসত্ত্বমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এর গঠনশৈলীতে খ্রিস্টিয় ১ম শতকে কুষাণ যুগের মথুরারীতির পরিচয় থাকলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত বাংলার বাইরে থেকে কোন বণিক এটি চন্দ্রকেতুগড়ে নিয়ে এসেছিলেন। সেই হিসেবে এটি বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য নয়। তবে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহির হাঁকড়াইলে পাওয়া একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রাক্ গুপ্তযুগ সেইসঙ্গে বাংলার স্থানীয় কোন কারিগরের হাতে তৈরি বলে কল্যান কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত। পাশাপাশি বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্যশৈলীর প্রাচীনতম নিদর্শন রাজশাহীরই নিয়ামতপুরে পাওয়া উত্তরবঙ্গের উপলব্ধবালুপাথরে তৈরি খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ায় তৈরি সূর্যমূর্তিটি।

আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের পর বাংলার ভাস্কর্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু চতুর্থ শতক থেকে এটা ধরে নেওয়া যায়। নিয়ামতপুরকে নিয়ে মোট চারটি ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে এই শতকে। এর মধ্যে একটি হল উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া মস্তকবিহীন জিন মূর্তিটি। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতকের ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন মুর্শিদাবাদ জেলার এক অজ্ঞাত প্রত্নস্থলে পাওয়া শিবের লকুলীশ মূর্তি (আশুতোষ সংগ্রহ শালায় রক্ষিত)। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের দুটি ভাস্কর্য মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে পাওয়া একটি চক্রপুরুষ মূর্তি এবং এই জেলারই চিরুটি গ্রামে আবিষ্কৃত চুন-বালিতে (Stucco) তৈরি এক দেবপ্রতিমার মুখমণ্ডল। প্রথমটি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত। খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা চলে যে খ্রিস্টিয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী এই তিনশো বছরে বাংলার ভাস্কর্য নিদর্শন সংখ্যায় একেবারে নগণ্যই বলা চলে। এই পর্যায়ে বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে পাওয়া ভাস্কর্যের দুটি নিদর্শন, জয়নগর থানার কাশীপুর গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা কালো পাথরের রথারোহী সূর্যমূর্তি এবং সুন্দরবনের অজ্ঞাত অঞ্চল থেকে পাওয়া একটি বিষ্ণুমূর্তি, উভয় মূর্তির বলিষ্ঠ শারীরিক

গঠন ষষ্ঠ শতকের ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনীয়। সূর্যমূর্তিটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা এবং বিষ্ণুমূর্তিটি ভারতীয় যাদুঘরে (কলকাতা) সংরক্ষিত। আদিগঙ্গার ধারে চেতলায় চুনারের লাল বেলে পাথরে তৈরি গুপ্তযুগের একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এরই কাছাকাছি আর একটি জায়গা থেকে কালীঘাট হোর্ড নামে ২০০-র বেশি গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল তার কথা আগেই বলা হয়েছে। চেতলা বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগনায় না পড়লেও আদিগঙ্গা ও এই জেলায় জনজীবনের প্রাচীনত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম শতক তুলনায় অনেক বেশি সৃজনশীল। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে রাঢ়ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল ভূখণ্ডের অনেকগুলি প্রত্নস্থল থেকে সপ্তম শতাব্দীর ভাস্কর্য সংগৃহীত হয়েছে। কয়েকটি সুপরিচিত প্রত্নস্থল—বর্তমান বাংলাদেশের ময়নামতী, দেউলবাড়ি, মহাস্থান ও পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মণিরতট। কুমিল্লা জেলার দেউলবাড়িতে আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার ভাস্কর্যের আদিপর্যায়ে একমাত্র তারিখ-সম্বলিত ভাস্কর্য—রাজা দেবখড়্গের (৬৬৫ খ্রিঃ) সময়ের লিপিযুক্ত দেবী সর্বাণীর একটি মূর্তি সহ একটি ধাতব সূর্যমূর্তি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘি থানার মণিরতটে একটি চন্দ্রশেখর শিবমূর্তি পাওয়া গেছে যার শিল্প শৈলী খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের ভাস্কর্য শৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূর্তিটি বর্তমানে কোথায় তা জানা যায় না। এছাড়াও এই জেলার আরো কয়েকটি প্রত্নস্থল থেকে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে তৈরি আরো কয়েকটি ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি হল বোড়ালের মহিষমর্দিনী ও বিষ্ণু (আশুতোষ সংগ্রহশালা), গোসাবার ছোট সূর্যমূর্তি (রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা) ইত্যাদি।

পাল যুগের কয়েকটি ধাতব মূর্তিও এই জেলায় পাওয়া গেছে, এর মধ্যে উল্লেখ্য ময়দার নৃত্যরত গনেশ, ছত্রভোগ অঞ্চলের উমা-মহেশ্বর, বিষ্ণু, সূর্য, লক্ষ্মী ও গনেশ সহ হর-পার্বতী মূর্তি, ফরতাবাদের গনেশ, কৃষ্ণচন্দ্রপুরের লক্ষ্মীমূর্তি, বোড়ালের সরস্বতী ও তারা, রামনগরের গনেশ, মহিষমর্দিনী ইত্যাদি। তবে এই জেলায় সব থেকে বেশী পাওয়া গেছে বিষ্ণুমূর্তি। মূলত পাল ও সেন যুগের বিষ্ণুমূর্তিই এখানে বেশী পাওয়া গেছে। ১৯৭৫ সালে বেহালার ব্লাইন্ড স্কুলের সামনের রাস্তা সংস্কার কর[illegible] সময় [illegible]বিষ্কৃত হয় গুপ্তযুগের একটি আবক্ষ বিষ্ণুমূর্তি, মূর্তিটি [illegible] ক[illegible]র ভারতীয় জাদুঘরে রাখা। ডায়মন্ডহারবার থানার [illegible] [illegible]রে রাখা আছে একটি বিষ্ণুমূর্তি, মূর্তিটি পাল-[illegible] [illegible] অনুমান করা যায়, মথুরাপুর থানার শ্রীকৃষ্ণনগর গ্রামে [illegible] আ[illegible] নিচে একটি বিষ্ণুমূর্তি রাখা, এটিও পাল-সেন যুগের, [illegible] যাচ্ছে। কাকদ্বীপ অঞ্চলের মানিকনগর অন্যমতে [illegible] চক থেকে আবিষ্কৃত একটি লাবণ্যমণ্ডিত বিষ্ণুমূর্তি [illegible]পর নৃসিংহ আশ্রম চত্বরে রাখা। এছাড়াও এই জে[illegible] থেকে বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে উ[illegible] [illegible]ল, নরেন্দ্রপুর, সীতাকুণ্ড, আটঘরা, সরিষাদহ, সা[illegible], [illegible]লঘাটা, গজমুড়ি, মাধবপুর (১২২ নং লট), উজো[illegible]র [illegible], কুলপী, লেবুতলা (১০নং লট) করঞ্জলী, কাঁটাবেনি[illegible] [illegible]পুর, কাজিরডাঙা, পঞ্চগ্রাম, কুমড়াখালি (ক্যানিং) ইত্যাদি। বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপ এ সব বিষ্ণুবিগ্রহে প্রতিফলিত হয়েছে।

এছাড়াও জৈন তীর্থংকর ও বৌদ্ধমূর্তির কিছু নিদর্শনও এই জেলায় পাওয়া গেছে। এই জায়গাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ঘাটেশ্বর, বাইশহাটা, কঙ্কণদিঘি, ছাটুয়া, খাড়ি, কাশীনগর জোবরালি, মাজেরাট, করঞ্জলী, কাঁটাবেনিয়া, পাতপুকুর, নলগোঁড়া, রায়দিঘি, বৈদ্যের চক, দমদমা, দক্ষিণ বারাশত, পুরন্দরপুর ইত্যাদি। আদিগঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যে এককালে প্রভাব বিস্তার করেছিল এই মূর্তিগুলি তার ইঙ্গিত বহন করছে। অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে কুবের সরস্বতী, কূর্মাবতার বিষ্ণু, নৃসিংহ, গণেশ, মনসা, মহিষাসুর চণ্ডী ইত্যাদি মূর্তিও এই জেলায় পাওয়া গেছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধান

আটঘরা-বাইশহাটা ঃ

২৪ পরগনা দ্বিখণ্ডিত হয় ১৯৮৬-র ১লা মার্চ-শনিবার, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। তৎকালীন ২৪ পরগনা বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে উৎখনন হয় ১৯৫৪ সাল নাগাদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার মাধ্যমে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের কাজ শুরু হতে একেবারে আশির দশক। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের উদ্যোগে খনন কার্য পরিচালনা করেন এই দপ্তরের অধীক্ষক বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শ্রী সুধীন দে মহাশয়। ১৯৮০ তে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েকটি প্রত্নস্থলে অনুসন্ধানের পর পরীক্ষামূলক উৎখনন শুরু হয় ১৯৮৯ সালে। উৎখনন হয়েছে এই জেলার মোট ২টি গ্রামে (১) বারুইপুর স্টেশনের প্রায় ৩ কি.মি. পূর্বে আটঘরার 'দমদমা' ঢিপি (তিনটি খাদ) এবং জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনের প্রায় ৫ কি.মি. দূরে বাইশহাটা গ্রামের ঘোষের চকের (মঠবাড়ি) দুটো ঢিপি। প্রসঙ্গত বেশ কয়েক দশক আগে থেকেই আটঘরা গ্রামটি থেকে তাম্রমুদ্রা, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি, সীলমোহর, শিলামূর্তি ইত্যাদি পাওয়া যায়। তারই সূত্রধরে এই গ্রামে যে পরীক্ষামূলক উৎখনন হয় তাতে জানা যায়* মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ/৩য় শতক) পাল-সেন যুগ (খ্রিস্টিয় ১২/১৩ শতক) পর্যন্ত এখানে জনবসতি ছিল। আটঘরার সামগ্রিক প্রত্নক্ষেত্র প্রায় ১৩-১৪ একর জায়গা জুড়ে। উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল—গাজীর ডাঙা, সীতাকুন্ড, ফাঁসির ডাঙা ইত্যাদি। সর্বোচ্চ ৩.৮৫ মিটার গভীর উৎখনন ও ১১টি স্তর থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে উল্লেখ্য আনুমানিক মৌর্যযুগের ছোটদের খেলনা ঘুঁটি (Hop Scotch), পোড়ামাটির চুড়ি, লাল রঙের ভগ্ন মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির সছিদ্র গোলক, আনুমানিক শুঙ্গযুগের ছিদ্রযুক্ত পোড়ামাটির টালি (একই ধরনের টালি চন্দ্রকেতুগড়ের শুঙ্গস্তর থেকে পাওয়া গেছে), মাছের জাল নিমজ্জনের কাজে (Net sinker) ব্যবহৃত পোড়ামাটির সছিদ্র গোলক, জারিত লৌহফলা ও লৌহমল (Iron slag), পাতলা কানা সমেত ধূসর মৃৎ পাত্রের অংশ, বিভিন্ন পরিধি বিশিষ্ট এন. বি. পি. মৃৎপাত্রের অংশ, কালো রঙের বয়াম (Jar), ভান্ড (bowl), পোড়ামাটির পুঁতিদানা, পোড়ামাটির ছিপি, আনুমানিক কুষাণযুগের পোড়ামাটির ভগ্ন নারীমূর্তি, হাড়ের তৈরি কীলক (nail), অ্যাগেট পাথরের তৈরি অসমাপ্ত

* সুধীন দে : নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন, বারুইপুর, ১৯৯৪

পুঁতিদানা, কালো লাল মিশ্রিত রঙের মৃৎপাত্র (ভিতরের দিকে কালো, বাইরে লাল, বাইরে দুটি রঙের স্তর অর্থাৎ বাইরে লাল রঙের আস্তরণ দেওয়া হয়েছে।) অস্বচ্ছ পাথরের পুঁতিদানা, পোড়ামাটির পুঁতিদানা (পাথরের পুঁতিদানার গায়ে আচড়ান (etched), আনুমানিক গুপ্তযুগের পোড়ামাটির ভগ্ন নারীমূর্তি, পোড়ামাটির মিথুন ফলক, আনুমানিক আদি পাল যুগের পোড়ামাটির পুরুষমূর্তি (মাথাটি বাঁ দিকে ফেরান), লম্বাধরনের পোড়ামাটির পুঁতিদানা, আনুমানিক পালযুগের দন্ডায়মান পোড়ামাটির ভগ্ন তীর্থঙ্কর মূর্তি, পোড়ামাটির ইট (১০ সে.মি. x ৮.৫ সে.মি.), দাঁড়ানর ব্যবস্থাযুক্ত বয়াম (Jar-on stand), নলযুক্ত (spouted) লালরঙের বড় মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির হুঁকা (hubble bubble) ও আনুমানিক পাল সেন যুগের লাল রঙের হাঁড়ি, ধূসর ধাতব বর্ণের উজ্জ্বল বয়াম ইত্যাদি। এছাড়াও উৎখননে একটি খাদে ইটের দেওয়ালের ভগ্নাংশ ও অন্য একটি খাদের (২মি x ২মি.) প্রায় সমস্ত পরিসর জুড়েই পাকা ইটের দুটি গাঁথনি আবিষ্কৃত হয়। স্তরবিন্যাস দেখে এ দুটি যথাক্রমে পাল ও গুপ্তযুগের বলে অনুমান করা গেছে। বাইশহাটা ঘোষের চকের (মঠবাড়ি) দুটি ঢিপি ও সংলগ্ন ধানজমিতে পরীক্ষামূলক উৎখননে প্রাথমিক ভাবে ইটের একটি রাস্তা ও বড় ইমারতের দেওয়াল আবিষ্কৃত হয়। দুটি ঢিপির মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১০০ মিটার এবং প্রায় দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে মণি নদী। সম্পূর্ণ উৎখনন না হলেও এখানে ১০০ মিটার দীর্ঘ ও দু মিটার প্রশস্ত খাড়াভাবে পাতা (brick on edge) ইটের রাস্তার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ঢিপি দুটির সংযোগকারী রাস্তা এটি। দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত বড় ঢিপিতে সামান্য উৎখননে বিভিন্ন টালির আকারে ইট দিয়ে বাঁধান ইমারতের দেওয়াল, গাঁথনি এবং উত্তরের ছোট ঢিপি থেকে ৩.৫ মিটার ব্যাস সম্পন্ন গোলাকার ইটের গাঁথনি ও এর ভিত্তি গহ্বর (foundation trench) আবিষ্কৃত হয়। এই ভিত্তি গহ্বর থেকে জেড্ পাথরের পঞ্চতল বিশিষ্ট পুঁতির দানা পাওয়া যায়। গোলাকৃতি ইটের গাঁথুনি দেখে সুধীনবাবু এটি একটি বৌদ্ধ বা জৈন মঠের স্তূপিকা (স্তূপের ক্ষুদ্র সংস্করণ) বলে মত প্রকাশ করেছেন যার অর্ধ গোলাকার ওপরের সম্পূর্ণ অংশই (hemispherial dome) বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। এই উৎখননে প্রাপ্ত পালযুগের কিছু মৃৎসামগ্রী ও উপরোক্ত স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন দেখে শ্রী দে এই ঢিপি দুটিকে ১০ম/১১দশ শতকের কোন বৌদ্ধ বা জৈন বিহার বলে মত প্রকাশ করেছেন। উৎখনন ছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাহিনগর-মালঞ্চ অঞ্চলে প্রত্নানুসন্ধানে মজে যাওয়া আদি গঙ্গার পূর্ব পাড়ে একটি ভগ্নপ্রায় দুর্গের কিছু অস্তিত্ব এবং একটি ঘরের মেঝের নিচে কালো রঙের ১.২২ মি. ব্যাস ও উচ্চতা বিশিষ্ট হ্রস্ব আকৃতির (Squattish shaped) এবং অবতলিক তল বিশিষ্ট (round based) চারটি জল রাখার পাত্র (jar) আবিষ্কৃত হয়। এই জলাধারগুলি উল্টোভাবে মেঝের নিচে পোঁতা ছিল। তুলতে গিয়ে তিনটি ভেঙে যায়। অক্ষত অবস্থায় অবশিষ্টটি বেহালার রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু হিসাবে রাখা আছে। আদি গঙ্গার পশ্চিমতীরে বোড়াল একটি প্রাচীন গ্রাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই প্রাচীন গ্রাম ও আশপাশের অঞ্চল থেকে মৌর্য-শুঙ্গ থেকে পাল যুগ পর্যন্ত নানা প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে আছে মৃৎপাত্রের সম্পূর্ণ বা ভগ্নাবশেষ, ধাতব ভাণ্ড (bowl), লৌহ কীলক (iron nail), পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি (নারীমূর্তি মস্তক, মাতৃমূর্তি ইত্যাদি), পোড়ামাটির ইট, বিভিন্ন প্রাণীর অস্থি, মাটিতে নিমজ্জিত গাছের কাণ্ডের অংশ ইত্যাদি। বেশির ভাগ প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে বোড়ালের বহুশ্রুত "সেন দিঘির" সংস্কারের সময়। শ্রী দে বোড়ালে এক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে মাটির স্তর বিন্যাসের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত জীবজন্তুর অস্থি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় প্রাণীতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (Zoological Survey of India) দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী একদা সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাণীরা যে একসময় এখানে বিচরণ করত সে কথাও জানতে পারা যায়।

এর আগে ৬০-এর দশকে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকার এই দক্ষিণ ২৪ পরগনার (তৎকালীন ২৪ পরগনা) নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের কয়েকটি প্রত্নস্থলে অনুসন্ধান চালিয়ে মধ্য প্রস্তরযুগের (Middle Stone Age tools) কিছু আয়ুধ সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কার করে। এই অনুসন্ধানের বিবরণ (Indian Archaeology, 1964-65, A Review পত্রিকাতে প্রকাশ পায়। বিবরণীটি তুলে ধরা হোল।

The exploration in the lower Ganga valley by the Directorate of Archaeology. Govt. of W.B. last Year (1963-64, P.59) has yielded stone age tools in the generally silty terrain of this region. The above horizon of the implementiferous deposit, however, could not be located at that time. At the same time, it was necessary to have a larger collection of the artifacts to ascertain the tool-types for a comparative study with lithic industries in other parts of India. With this end in view a fresh exploration was undertaken jointly by Dr. R. V. Joshi of the Prehistory Branch of the Survey and Shri P.C. Das Gupta of the Archaeological Deptt. of West Bengal.

During this work, the left (northern) bank of the Ganga river was examined from Deulpota to Harinarayanpur, covering approximately 15 km. The survey revealed the occurrence of discontinuous patches of fine-to-coarse sand mostly at and around Deulpota. This sandy deposit, perhaps the horizon of the middle stone age tools, yielded a large number of nodules besides the well-worked and finished implements.These tools are made on brownish chert and rarely on Chalcedony and dark grey flinty material. The tools comprise unifacially worked sub-triangular points, borers, side-scrapers and hollow-scrapers, the tool-outfit being of the Middle Stone Age complex. An interesting feature of the tools is their diminutive form which may either be due to the size of the available chert nodules on which they are worked or a special character of the lower Ganga Middle Stone Age Industries. The latter postulate, howerver, needs confirmation by further examination of both the banks of this river, particularly upstream.

Along with the chert material, a flinty rock-material in the form of fairly large partially-fractured pebbles, carrying a thick coat of whitish patina was

noticed. No finished tools were, however, found except some trenchet-like points or simple unworked points or cortex-covered flakes.

As was reported previously, this area also yielded pottery, mostly belonging to the early historical and later periods. The sherds occur in low talus all along the river-bank in this area. An attempt was made to trace the true locus of the pottery—bearing deposit by sinking a trial trench near Deulpota. While nothing tangible was found to a depth of nearly 2 metre of sticky, micaceous and in places sandy clay, some red ware sherds including fragments of lids and bowls assignable to the Sunga-Kushan period, were recovered from a depth of about 2.5m. below surface.

মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ঃ

উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার ভিতারগাঁওয়ের একটি ইটের মন্দির গুপ্তযুগে (সম্ভবত খ্রিঃ ৫ম শতক) তৈরি বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। ভারতে ইটের তৈরি গুপ্তশৈলীর মন্দিরের মধ্যে এটিই অক্ষত বলে মনে হয়। বাংলায় মন্দির নির্মাণের সূত্রপাতও গুপ্তযুগে। চন্দ্রকেতুগড়ে তথাকথিত খনা-মিহিরের টিপি উৎখনন করে একটি

কুলপির বারচালা মুনাবিবির স্মৃতি সৌধ *ছবি ঃ সাগর চট্টোপাধ্যায়*

ইটের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এটির মূল নির্মাণকাল গুপ্তযুগে, সেই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম মন্দির এটি। মুসলমান যুগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের মন্দিরগুলির মধ্যে একমাত্র সুন্দরবনের জটার দেউল ও আশপাশের কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর নিদর্শন নেই। রেখশৈলীর মন্দির-স্থাপত্যের এই অনন্যসাধারণ উদাহরণ শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়, দেশেরও একটি মূল্যবান প্রত্নসম্পদ। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (Archaeological Survey of India) জটার দেউলকে সংরক্ষিত পুরাসৌধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

জটার দেউল কবে তৈরি হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কাশীনাথ দীক্ষিতের মতে এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এটির নির্মাণ মুঘলযুগ, সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে 'এই দেউল প্রকৃতপক্ষে প্রতাপাদিত্যের জয়স্তম্ভ এবং ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত।' আবার অনেকের মতে এটি গুপ্তযুগে তৈরি। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মন্দিরের কাছাকাছি আবিষ্কৃত একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায় ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক রাজা জয়ন্তচন্দ্র এই দেউল তৈরি করান। এই তাম্রলিপির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিবের মন্দির হিসেবে বর্তমানে ব্যবহৃত হলেও এটি আদপে মন্দির না কোন স্তম্ভ এ নিয়েও পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে।

জটার দেউলের গঠনশৈলী সম্বন্ধে অনেকেই গবেষণা করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া আছে অসীম মুখোপাধ্যায়ের ২৪ পরগনার মন্দির বইটিতে। সংক্ষেপে বলা যায়—মন্দিরটি বর্গাকার, খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে। উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট। ওপরের অংশ ভাঙা। উড়িষ্যার রেখ দেউল বা রেখ শৈলীর প্রভাব এতে পড়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত—"The temple (32th square ground plan) rises straight from a low mound (about 2 m high). Its outer facade is broken into three different pilasters each of which is similarly treated. The main body is separated from the sikhara portion by three deep recesses and four sharp lines of projection. The doorway (16th high, 9ft 6 inch wide) faced east and was topped by a triangular corbelled arch."[২০]

রেখ বা শিখর দেউল বাংলায় একসময় তৈরি হত। জটার দেউল ছাড়া মুসলমান পূর্ব যুগে তৈরি এমনই কয়েকটি সুপ্রাচীন রেখ দেউলের উদাহরণ—বাঁকুড়ার বহুলাড়া, সোনাতপল, বর্ধমানের সাতদেউলিয়া, পুরুলিয়ার বড়াম ইত্যাদি। এই ধরনের অধিকাংশ রেখ দেউল আজ নিশ্চিহ্ন। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এমন রেখ দেউলের ধ্বংসাবশেষ এখনও কয়েকটি জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ছাড়া এই ভগ্ন দেবালয়গুলির আজ আর কিছুই দাবি করার নেই। এগুলি সবই সুন্দরবন অঞ্চলে এবং মুসলমান পূর্ব যুগে তৈরি বলে অনুমান করা যায়। জায়গাগুলো হল জটার দেউলের কাছাকাছি দেউলবাড়ি ও পাথরপ্রতিমার কাছাকাছি বনশ্যামনগর ও গোবিন্দপুর। কয়েকদশক আগেও বনশ্যামনগরে রেখ দেউলটির কিছুটা অংশ লক্ষ্য করা যেত,[২১] বর্তমানে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। দেউলবাড়ির দেউলটির 'বাঢ়' অংশের কিছুটা এখনো টিকে আছে, উচ্চতা আঃ ২০ ফুট, গর্ভগৃহের মাপ $৭\frac{১}{২} \times ৭\frac{১}{২}$। সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, কালিদাস দত্তের মতে এটি পাল যুগে তৈরি

হয়েছিল। গঙ্গাসাগরেও কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ছিল, জলোচ্ছ্বাসে তা আজ সম্পূর্ণ জলের তলায় বলে প্রকাশ। পাথরপ্রতিমা থানার গদামথুরা দ্বীপের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে মাটির তলায় একটি পাতলা ইটের অবয়ব অনেকের মতে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গড়িয়ার কাছে বোড়ালেও একটি ইটের মন্দির আবিষ্কৃত হয়, বিশেষজ্ঞদের অভিমত এটি সেনযুগে তৈরী, এছাড়াও আদিগঙ্গার তীর বরাবর সরবেরিয়ায় (জয়নগর থানা) একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে পাথরের অলংকৃত দ্বারস্তম্ভ পাওয়া গেছে। অনেকের অভিমত এগুলি গুপ্ত যুগের।

গুপ্ত-পাল-সেনের পর মুসলমান যুগ। হিন্দুযুগে বা মধ্যযুগের প্রথমে বাংলায় চার ধরনের মন্দির তৈরি হত—রেখ বা শিখর দেউল, পীঁড়া বা ভদ্র দেউল, শিখর শীর্ষ পীঁড়া বা ভদ্র দেউল এবং স্তূপশীর্ষ পীঁড়া বা ভদ্রদেউল। রেখ বা শিখরশৈলীর মন্দিরই বেশি তৈরি হয়েছিল। মুসলিম যুগে পুরনো কিছু রীতি বাদ পড়ল ঢুকল বাংলার একান্তই নিজস্ব কিছু মন্দির শৈলী। রেখ দেউল হিন্দুযুগের মত মুসলিম যুগেও তৈরি হয়েছে, তার উদাহরণ পঞ্চদশ শতকে তৈরি বরাকরের তিনটে রেখ ও বর্ধমানের ইছাই ঘোষের দেউল। ষোড়শ থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্তও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রেখ দেউলের আদলে মন্দির তৈরি হয়েছে, তবে সংখ্যায় কম। রেখ দেউল ছাড়া মুসলিম যুগে আরও কয়েক ধরনের মন্দির তৈরি হল যা আগে ছিল না। এগুলি হল বাংলার নিজস্ব চালা মন্দির, বাংলা মন্দির ও রত্ন মন্দির। সময়কাল হিসেবে বলা যেতে পারে পনের শতকের শেষ বা ষোড়শ শতকের শুরু। আসলে হিন্দু-যুগের শেষ বা পাল-সেন আমলের পরবর্তী খ্রিস্টিয় তের শতক থেকে পনের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলায় তুর্কী-আফগান শাসন কায়েম হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠার কাজ ব্যাহত হয়েছিল। তবে এই দীর্ঘ বিরতির পর বাংলায় নতুন করে আবার মন্দির তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই সময় থেকেই মন্দির স্থাপত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক পরিলক্ষিত হল ইসলামী স্থাপত্য থেকে আহৃত গম্বুজ ও ভল্টের নির্মাণ কৌশল যা বাংলার নিজস্ব মন্দির-শৈলীতে ব্যবহৃত হয়েছে ও এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাশৈলীর চালা মন্দির সাধারণত দোচালা, চারচালা ও আটচালা। এর মধ্যে আটচালার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি আর বারচালা হাতগুণতি। বারচালার উদাহরণ মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের জলসরা, জয়কৃষ্ণপুর এবং এগরার চিরুলিয়া। বারচালার উদাহরণ এই জেলাতেও রয়েছে। মন্দির হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও বারচালার একটি স্থাপত্যশৈলী নজর আসে ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপের মধ্যে কুলপীর (দুর্গানগর) সুপরিচিত মুনাবিবির কবরে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি জনৈকা পর্তুগীজ রমনীর (মুনাবিবি) স্মৃতিসৌধ অন্যমতে 'প্যাগোডা'। স্থাপত্য ও পুরাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি উল্লেখযোগ্য।

বাংলা মন্দির দু-ধরনের—এক বাংলা ও জোড় বাংলা। জোড় বাংলার অতি সুপরিচিত উদাহরণ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কেষ্ট রায়, নদীয়ায় বীরনগরের রাধাকৃষ্ণ। মন্দির না হলেও এক বাংলা স্থাপত্যরীতির আদর্শ উদাহরণ মালদা জেলার গৌড়ের ফতে খাঁর সমাধিসৌধ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জোড় বাংলার কোন উদাহরণ না পাওয়া গেলেও এক বাংলা বা দো-চালার আদলে মসজিদ সংলগ্ন একটি ছোট, নাতি উচ্চ সমাধি লক্ষ্য করা যায় জয়নগর থানার-পদ্মেরহাট গ্রামে। আর রত্নমন্দির সাধারণত এক, পাঁচ, নয়, তের, সতেরো ও একুশ ইত্যাদি রত্ন বা চূড়া নিয়ে তৈরি হত। এর মধ্যে নবরত্ন মন্দিরের প্রাচুর্যই বেশি। মুসলিম ও তার পরে বৃটিশযুগে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সবচেয়ে বেশি তৈরি হয়েছে আটচালার মন্দির। তুলনায় চারচালা মন্দিরের সংখ্যা একেবারে হাতগুণতি। উদাহরণ হিসেবে মথুরাপুর থানার বাপুলিবাজারে পাশাপাশি চারটে চারচালা এবং কাশীনগর ও মজিলপুরের দত্ত বাজারে একটি করে চারচালা মন্দিরের কথা বলা যেতে পারে। আর রত্নমন্দিরের ক্ষেত্রে নবরত্নের দুটি উদাহরণ বজবজের বাওয়ালী ও নিউ আলিপুর স্টেশন সংলগ্ন মণ্ডলদের দুটি মন্দির। এক রত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দিরও এই জেলায় রয়েছে। এক রত্নের উদাহরণ মালঞ্চ-মাহিনগর সংলগ্ন পঞ্চবটির পঞ্চশিবের মন্দির আর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি রয়েছে উস্তি থানার দক্ষিণ গোপীনাথপুর গ্রামে, অবহেলায় উত্তরদিকের দুটি রত্ন আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত সেইসঙ্গে আগাছায় পরিবৃত। তবে আরো বেশি রত্ন যুক্ত মন্দির-পুরাকীর্তি এই জেলায় আছে বলে আমার জানা নেই।

বাংলার মন্দির স্থাপত্য প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে চারচালা মন্দিরের মূল ধারণাটা এসেছে গ্রাম বাংলায় সাধারণ চারচালা খড়ের ঘরের অনুকরণে। এক্ষেত্রে চারদিকে দেওয়াল তুলে তার ওপর চারটি ঢালু চাল বা আচ্ছাদন এমনভাবে তোলা হয় যা কিছুটা বাঁকানো একটি সাধারণ রেখাকে স্পর্শ করে। স্বাভাবিক কারণে দুটি চালা হয় লম্বায় অনেকটা বেশি। কিন্তু চারচালা মন্দিরের ক্ষেত্রে চারটি ঢালু চালাই হয় ত্রিভূজাকার এবং রেখার বদলে একটি বিন্দুতে গিয়ে চারটি চালা যুক্ত হয়। আর প্রতিটি চালার সব থেকে নিচু অংশের কার্নিশ সরলরেখা না হয়ে ধনুকের মতো বাঁকা হয়, বৃষ্টির জল যাতে না জমে দুদিকের কোন দিয়ে দ্রুত ঝরে পড়তে পারে।

এই কারণে ঢালু চাল ও বাঁকা কার্নিশ ছাদের ধারণা তৈরি হয়েছিল। বাংলার কুঁড়েঘর ও বাংলা শৈলীর মন্দির স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিশিষ্ট প্রত্নবিদ জেমস্ প্রিন্সেপের।

—The Bengalees taking advantage of the elasticity of the bamboo universally employ in their dwellings a curvilinear form of roof. উক্তিটি একটু ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় যে বাঁশের নমনীয় বক্রতার ওপর ভিত্তি করে বাঙালীরা যে চালা-ঘরের বাঁকানো ছাদ তৈরি করে থাকে, বাংলার নিজস্ব চালা ও রত্নমন্দিরের ছাদ সেইসঙ্গে কার্নিশ নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই রীতিটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এক বাংলা বা দো-চালা মন্দিরের ক্ষেত্রে দুটি চালাই ঢালুভাবে উঠে একটি সাধারণ রেখাকে স্পর্শ করে আর জোড় বাংলা বা দুই বাংলা মন্দিরের ক্ষেত্রে দৃশ্যটা অনেকটা এরকম—দুটি দোচালা মন্দির পাশাপাশি রেখে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং মন্দিরের মাথায় কখনো কখনো এক সংযোগকারী বা সাধারণ চূড়ার ব্যবহার। আর আটচালা মন্দিরকে চারচালা মন্দিরেরই একটি বিবর্ধিত রূপ হিসেবে কল্পনা করা যায়। নিচের চারটি ঢালু চালের ওপর আরো চারটে দেওয়াল সামান্য উঁচুতে তুলে একইভাবে ছোট আকারের আরো চারটে চালা তৈরি করা হয়। উপরের এই ছোট চারচালার ব্যবহার মূলত মন্দিরের

অঙ্গসজ্জার উদ্যেশ্যে। এই আটচালা মন্দিরের ধারণাও এসেছে গ্রামবাংলায় সনাতন আটচালা কুঁড়েঘরের অনুসরণে। আর আটচালার ওপরে আরো চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট চালা যুক্ত করে বারচালা সৌধ। পাশাপাশি রত্নমন্দিরের ক্ষেত্রে চারদিকের ঢালু বা বাঁকানো কার্ণিশযুক্ত ছাদের কেন্দ্রস্থলে একটি চূড়া থাকলে থাকে বলা হয় এক রত্ন। রত্ন অর্থে চূড়া, একই ছাদের চার কোণে চারটি ও মধ্যে একটি রত্ন থাকলে তার নাম পঞ্চরত্ন। কেন্দ্রীয় রত্নটি আকারে সবসময়ে বড়ো। এই কেন্দ্রীয় রত্ন বা চূড়ার জায়গায় একটি দোতলা কুঠরি বা ঘর তৈরি করে একই রকমভাবে কুঠরির ছাদের চার কোণে আরো চারটে চূড়া ও মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটি বড়ো চূড়া বসালে মোট রত্ন বা চূড়ার সংখ্যা দাঁড়ায় নয়, সেই হিসেবে এটি নবরত্ন। এইভাবেই ধাপে ধাপে ১৩,১৭, বা ২১ রত্ন মন্দির। নবরত্নের একটি আদর্শ উদাহরণ দক্ষিণেশ্বরের সুপরিচিত ভবতারিণীর মন্দির।

এই জেলায় সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ইটের আটচালা মন্দির। বেশিরভাগ বৃটিশ আমলে, অল্প কিছু মুসলিম আমলে তৈরি। উনিশ শতকের মন্দিরই সংখ্যায় বেশি। সবচেয়ে কম সতেরো শতকের মন্দির। সতেরো শতকের আগে মুসলিম যুগে কোন মন্দির এই জেলায় তৈরি হয়েছে কি না তা বলা যায় না। সতের শতকের মন্দিরের একটি উদাহরণ সোনারপুর থানার রাজপুরের আনন্দময়ী অন্যমতে অন্নপূর্ণার মন্দির যার কিছু অবশিষ্টাংশ এখন ঘন ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা। ২৪ পরগনার মন্দির বইটিতে অসীম মুখোপাধ্যায়ের এই অন্নপূর্ণা মন্দির সম্বন্ধে বর্ণণা, বিশ্লেষণ ও মতামত রয়েছে।

পাশাপাশি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন ধর্মীয় পূজা উপকরণের ক্ষেত্রে আটচালার মন্দিরই তৈরি হয়েছে বেশি, অন্যান্য লৌকিক দেব-দেবীর মন্দিরও তৈরি হয়েছে এই স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী। একটি উদাহরণ কাকদ্বীপ থানার শিবকালীনগরের কামারপরিবারের আটচালার বিশালাক্ষীর মন্দির। এই জেলার একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মন্দির হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে মন্দিরবাজারের কাছে জগদীশপুর হাউড়ির হাটের পাশাপাশি যোগেশ্বর ও ভুবনেশ্বর মন্দিরদুটি যেখানে রেখ ও পীঁড়া এই দুই স্থাপত্যশৈলীর যুগপৎ সংমিশ্রণ ঘটেছে। সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় তৈরি এমন অভিনব স্থাপত্যরীতির মন্দির এই জেলায় আর নেই। বর্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনার (হাওড়া-নবদ্বীপ-[illegible] পথে) প্রতাপেশ্বর মন্দিরটি অনেকটা একই ধরনের গ[illegible]লেই বোঝা যায়। সমতল ছাদ বিশিষ্ট দালান মন্দির[illegible] কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। দালান মন্দির বলতে খি[illegible] স্তম্ভ [illegible]লিন্দযুক্ত সমতল ছাদের মন্দিরকেই বোঝাত। সাধার[illegible] এই [illegible] মন্দির একতলাই হয়, তবে মেদিনীপুর ও হাওড়া জে[illegible] দ্বিতল দালান মন্দিরের সন্ধানও পাওয়া যায় যা এ[illegible]টিশ আমলে অনেক ক্ষেত্রে ত্রিখিলান দালানের বদলে [illegible] পথিক স্থাপত্যের অনুকরণে সামনের দিকে স্তম্ভ নির্মাণ [illegible] হয় [illegible] এক নজরে মন্দিরের বদলে কোন প্রাসাদের অংশ ব[illegible]তে পারে। বেহালার বরিষার সাবর্ণপাড়ায়, বারুইপুরে[illegible]চৌ[illegible]বাড়িতে এই ধরনের দালান মন্দির বা দুর্গাদালান ল[illegible]হড়ুর শ্যামসুন্দর মন্দিরটিও দালান মন্দিরের এক অ[illegible] উদা[illegible] পাশাপাশি ধপধপির দক্ষিণ রায়ের বিখ্যাত মন্দিরটি [illegible] মন্দি[illegible]ও ১৯০৯ সালে তৈরি বলে

দেরবেড়িয়া মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা — ছবি : প্রভাত ভট্টাচার্য

এটি পুরাকীর্তি বলা যাচ্ছে না, তবে লৌকিক দেবতা হিসেবে দক্ষিণ রায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাটির মূর্তি ও সংশ্লিষ্ট ইতিহাসটি গুরুত্বপূর্ণ।

দালান মন্দিরের আর এক সংস্করণ চাঁদনি। দালানের সঙ্গে চাঁদনির পার্থক্য আছে। সাধারণত অনেকগুলো দরজা নিয়ে লম্বা পাকা ঘর ও দরদালান অর্থেই 'দালান' শব্দটির প্রচলন হয়েছিল। যেমন দুর্গাদালান, কালীদালান। আঠার-উনিশ শতকে জমিদার বা বর্ধিষ্ণু পরিবার এই ধরনের দালান মন্দির তৈরি করতেন। তবে দালানের ওপর ছোট, ঘরযুক্ত মন্দিরই চাঁদনি হিসেবে প্রচলিত। চলন্তিকা মতে চাঁদনি শব্দের অর্থ 'ছাদের উপরিস্থিত গৃহ', বঙ্গীয় শব্দকোষে প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ বলা হয়েছে। পুরাকীর্তির নিরিখে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বর্তমানে কোন চাঁদনি নেই বলেই আমার ধারণা। তবে দুর্গাদালান এই জেলায় লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও সংস্কার করা হয় নি এমন জীর্ণ, পলেস্তারা ওঠা দুর্গাদালানের দুটি উদাহরণ লক্ষ্মীকান্তপুরের পুততুন্ড ও ঘাটেশ্বরের ঘোষ-চৌধুরী পরিবারের। ভাঙা দোলমঞ্চ ও সাধারণ আটচালাও এই জেলায় বেশ কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবারে চোখে পড়ে।

তুলনায় প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্যের সংখ্যা এই জেলায় কম। মুসলিম পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে মসজিদের কথা। এই জেলায়

মসজিদের প্রাচুর্য থাকলেও পুরাকীর্তির নিরিখে তা কতটা বিচার্য হবে এটা বলা শক্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগে ছিল কাঁচা ঘর, চলতি শতকে তা পাকা করা হয়েছে। ফলে পুরাকীর্তি হিসেব তা গ্রাহ্য হচ্ছে না। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি শতাব্দী প্রাচীন মসজিদের কথাও জানা যায় যেগুলি জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রায় হয়ে আসলে, তা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে নতুন করে সেখানে এই শতকেই মসজিদ তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে মসজিদের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন হলেও আক্ষরিক অর্থে তা পুরাকীর্তি নয়। মন্দির ও গীর্জার ক্ষেত্রেও এই ধরনের পুনর্নির্মাণের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। এমনই একটি পুরনো অথচ সম্পূর্ণ নবনির্মিত মসজিদ—মগরাহাটের পূর্ব বেলাড়িয়া গ্রামের মিএগদের মসজিদ। গ্রাম বৃদ্ধদের স্মৃতি ও জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি ছিল পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট, কিছু অলংকরণও ছিল, তৈরি হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শেষের দিকে। জীর্ণ হয়ে আসলে ভেঙে ফেলে বর্তমান মসজিদটি কয়েক দশক আগে তৈরি হয়। আর এক ধরনের মুসলিম পুরাসৌধও এই জেলায় রয়েছে তা মূলত 'জঙ্গলকাটি' বা জঙ্গলের মধ্যে থেকে চলতি বসতি পত্তনের সময় আবিষ্কৃত বলে জনশ্রুতি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বা প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের পরিচয় বা স্থাপন কালও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইয়ারপুর গ্রামে এমন একটি মসজিদ চোখে পড়বে। আবার কিছু প্রাচীন মসজিদের কথাও শোনা যায় এই জেলায় যা আজ কালের গর্ভে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। বাসন্তী থানার পাঠানখালির মসজিদবাটি মসজিদ সম্বন্ধে এমন জনশ্রুতি রয়েছে। এগুলো বাদ দিলে বেশ কয়েকটি মাজার ও দরগা রয়েছে এই জেলায় যার ইতিহাস বেশ পুরনো। এর মধ্যে উল্লেখ্য—ক্যানিংলাইনে খুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজীর মাজার, ভাঙরের ভাঙর-পীরের মাজার, দক্ষিণ বারাশতের শতর্ষা গাজীর মাজার, মল্লিকপুরের গনিমাত-উল-খায়ের, খাঁড়ির বড়-খাঁ গাজীর মাজার ইত্যাদি। প্রাচীন একটি দরগা—সংগ্রামপুর স্টেশনের কয়েক কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে টেকপাঁজা গ্রামে জঙ্গলাবৃত একটি ভাঙাচোরা নাতি উচ্চ গম্বুজ যুক্ত স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ। পাতলা ইট, ভাঙা গম্বুজ আর একাধিক জনশ্রুতি এই দরগাটিকে ঘিরে। শতাব্দীপ্রাচীন কিছু মসজিদও এই জেলায় রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মগরাহাট থানার কলস, ফলতা থানার হোগলা, উস্তি থানার জাহাঙ্গীর গড়, মথুরাপুর থানার তিলপি, ডায়মন্ডহারবার থানার দক্ষিণ শেওড়দহ ইত্যাদি। হরিনাভি ও আমতলা মোড়ের কাছে ফকির পাড়ায় দুটি প্রাচীন মুসলিম পুরাসৌধের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এই জেলার মসজিদ স্থাপত্য প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে মসজিদ পুরাকীর্তিগুলি কোথাও এক গম্বুজ এবং কোথাও একের অধিক এবং চতুষ্কোণ মিনার যুক্ত। এক গম্বুজ মসজিদের প্রার্থনা কক্ষ বা লিয়ান বর্গাকার, গম্বুজ তৈরীতে শুধু খিলান ছাড়া কোন স্তম্ভের ব্যবহার নেই। আর একের বেশি গম্বুজওলা মসজিদ আয়তাকার এবং গম্বুজগুলো স্তম্ভ ও অর্ধগোলাকার খিলানের ওপর সংস্থাপিত। সাধারণত রত্ন ও চালা মন্দিরের ক্ষেত্রে যে ঢালু ছাদ ও বাঁকানো কার্নিশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় মসজিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত এই জেলাতেও লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও যে কোন মসজিদে মক্কার দিকে মুখ রেখে প্রার্থনার নির্দিষ্ট দিক বা কিবলা অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটি অবতল কুলুঙ্গি বা মিহরাব থাকে এবং মিহরারের পাশে উত্তর দিকে থাকে প্রচার বেদী হিসেবে ব্যবহৃত সামান্য উচ্চতাবিশিষ্ট এক চতুষ্কোণ জায়গা যার প্রচলিত নাম মিমবার। মসজিদের ইমাম এখানেই দাঁড়িয়ে ধর্মোপদেশ বা খুতবা প্রদান করে থাকেন।

গীর্জা :

এটা ধরে নেওয়া হয় যে যোড়শ শতকের শেষের দিকে ব্যান্ডেল গীর্জা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে বাংলায় প্রথম খ্রিষ্টিয় সমাজের পত্তন। ব্যাণ্ডেল গীর্জা স্থাপিত হয় ১৫৯৯ অন্যমতে ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে। তবে ১৬৩২ নাগাদ মোঘলদের আক্রমণে এটি ধ্বংস হলে ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে গোমেশ ডে সেটোর উদ্যোগে গীর্জাটি নতুন করে তৈরি ও পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত হয়। কলকাতায় একটি ছোট গীর্জা তৈরি হয় ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮৩৪-এ কলকাতায় স্থাপিত হয় ভিকারেট এপস্টলিক অফ বেঙ্গল (Vicarate Apostolic of Bengal)। উদ্দেশ্য কলকাতাকে কেন্দ্র করে দিকে দিকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলার ভিকারেটকে ভাগ করা হয়—পশ্চিমাংশের জন্য ভিকারেট অফ্ ক্যালকাটা আর পূর্বাংশের জন্য কোলকাতারই নিয়ন্ত্রণাধীনে ভিকারেট অফ্ চিটাগং। ১৮৫০ নাগাদ এ দুটি আলাদা কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হতে থাকে। উড়িষ্যার বালেশ্বর, ছোটনাগপুরের চাইবাসা আর মেদিনীপুরের পাশাপাশি তৎকালীন ২৪ পরগনায়ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু হয় এবং যতদূর জানা যায় এই জেলায় খ্রিষ্টধর্মের প্রথম অনুপ্রবেশ ১৮১৬ নাগাদ। চেতলার হাটে প্রচারে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপুর থানার রামমাখালচক গ্রামের রামজী প্রামাণিক আর তাঁর দুই সঙ্গী সীতারাম বাগ ও বুদ্ধিনাথ গায়েন খ্রিষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮২৫ সালের ১৮ই অক্টোবর খিদিরপুরে লন্ডন মিশনারী সোসাইটির আচার্য ট্রইন সাহেবের কাছে তাঁরা দীক্ষা লাভ করেন। ১৮৩৩ সালে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার সমিতি তাঁদের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন বারুইপুরে। এর মধ্যে নুরসিকদার চক (১৮২২), টালিগঞ্জ (১৮২৯), ঠাকুরপুকুর (১৮৩০), ঝাঁঝরা (১৮৩২) ও আঁধারমানিক (১৮৩৩) গ্রামে এই শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাথলিক মন্ডলী এই জেলায় প্রথম ক্যাথলিক মিশন তৈরি করে ১৮৪০ সাল নাগাদ বর্তমান রাঘবপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত কইখালি গ্রামে। এই জেলায় এই দুই ধর্মমন্ডলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁদের তৈরি বিভিন্ন গীর্জা, স্কুল ও মিশনগুলিতে।

এই জেলায় যতগুলি গীর্জা তার মধ্যে কয়েকটিকে পুরাকীর্তির মধ্যে ফেলা যেতে পারে। C.N.I (Church of North India) গোষ্ঠীভুক্ত বারুইপুরের সেন্ট পিটার্স গীর্জাটি স্থাপিত হয় ১৮৪৬ সালে। দ্য প্রপোগেশন অফ্ গসপেল নামে এক বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সেইসময় জনৈক খ্রিষ্টান পুরোহিত রেভা: ডিব্রারেজের চেষ্টায় ৬০০ আসন বিশিষ্ট গীর্জাটি স্থাপিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল একটি ইংরেজী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি পাঠাগার। যতদূর জানা গেছে আগুন লেগে গীর্জাটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেলে ১৯৬৬ সালে এটিকে সংস্কার করা হয়। গীর্জার মূল কাঠামোর বেশ কিছু অংশ এখনো অবিকৃত। প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বের কিছু আলোকচিত্র দেখে এই গীর্জাটি আগে কেমন দেখতে ছিল তা অনুমান করা যায়। এর আগে ১৯২০ সালে বারুইপুরে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, এর মূলে ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বারুইপুর নিমক মহলের প্রধান কর্মচারী মি: টি. প্রাউডেন—"The nucleus of a mission at this station was

formed by Mr. Plowden who was a salt agent at Baruipur: it was the residence of a Magistrate doctor and collector engaged in the salt Deptt. as salt is manufactured to a large amount in the district to the south.................... In 1920 he established a school and superintended it for several years."

এই স্কুলটির কোন নিদর্শন বর্তমানে চোখে পড়ে না।

হান্টারের Statistical Account of Bengal, Vol-I এ এই জেলার খাঁড়িতে ১৮৫৭ সালে একটি গীর্জা ও একটি ইংরেজী স্কুল তৈরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে—"The Principal village is Khari which contained a church and an English School in 1857 and a large portion of the population of which were Christian converts.''

কিন্তু যতদূর জানা গেছে খাঁড়ির বর্তমান গীর্জাটি এই শতকের চল্লিশের দশকে তৈরি যা পুরাকীর্তির মধ্যে পড়ছে না। তবে ওই সময় খাঁড়িতে কোন মাটির গীর্জা হয়ত ছিল যা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন।

আগেই বলেছি ১৮৪০ সালে বর্তমানে এই জেলার রাঘবপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত কইখালি গ্রামে প্রথম ক্যাথলিক মিশন স্থাপিত হয়। ১৮৪৪-এ কইখালিতেই তৈরি হয় প্রথম মাটির গীর্জা। এমনই মাটির গীর্জা তৈরি হয়েছিল জয়দেবহাট, রাঘবপুর, হোগলকানিয়া, সালপুকুর, পানকুয়া, খড়িবাড়িয়া, কালীচরণপুর, বেথবাড়ি, বলরামপুর, ছেয়ারি, টালিগঞ্জ, কাওরাপুকুর, বন্দিপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, ধনেখাটা, খাঁড়ি, বামনাবাদ, ক্যানিং, বাসন্তী, রামকৃষ্ণপুর, কোলাহাজরা, টেংরাখালি, ফুলবাড়ি, বকুলতলা ইত্যাদি জায়গায়। এর আগে ১৮৩৭ সালে সদিনাবেড়িয়া গ্রামের দুজন ধর্মান্তরিত অধিবাসী কর্তৃক প্রদত্ত একটি শিবমন্দির গীর্জায় রূপান্তরিত হবার কথা শোনা যায়। মগরাহাট থানার মড়াপাই-এর ক্যাথলিক চার্চটি তৈরি হয় ১৮৮৫ সালে। ১৮৭৫-এ এই গ্রামে ফাদার Delplace S. J. মড়াপাই ধর্মপল্লীর ভিত্তি স্থাপন করেন। রাঘবপুরের সাধু যোসেফের উপাসনালয়টি ১৮৯০-এ প্রতিষ্ঠিত, তৈরি করেন রাঘবপুর বেলজিয়াম দেশী যীশু সংঘের পুরোহিতরা। বাসন্তীর গীর্জাটিও শতাব্দীপ্রাচীন। সম্প্রতি এটির শতবর্ষ পালিত হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যান্য জেলার মত এই জেলার গীর্জাগুলিতেও পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলীর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

লিপি-অলংকরণ-প্রত্ন[illegible] :

আব[illegible] র[illegible]
ক্ষৌ[illegible]
শিব[illegible] ভূ[illegible]
শ্রী [illegible]দবে—
ন [illegible]

মন্দিরবাজারে অ[illegible]শ্বর মন্দিরের দক্ষিণমুখী ত্রিখিলান প্রবেশপথের দু[illegible] পোড়ামাটির মন্দিরলিপিতে সংস্কৃত ভাষায় বাংলা [illegible] কথাগুলো লেখা আছে। সরাসরি প্রতিষ্ঠা-বর্ষের [illegible]লেও ঐ শব্দগুলোর মধ্যে কায়দা করে লুকিয়ে রা[illegible] এখানে আকাশ = ০, অব্ধি (সমুদ্র = সাতে সমুদ্র)= [illegible] রস) এবং ক্ষৌণি = পৃথিবী =১, শাকে = শকাব্দ। [illegible]গুলো [illegible]র রাখলে ০৭৬১। অঙ্কের বামাগতি সূত্র ধরে উল্টে দিলে দাঁড়ায় ১৬৭০ শকাব্দ বা (১৬৭০+৭৮)=১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ মন্দিরটি তৈরি হয়েছে ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। শিল্পী বাসুদেবকে দিয়ে রাজা কেশব মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন। মুসলিম যুগে বাংলাশৈলীর মন্দিরে মন্দির শিল্পীর নামের স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য, বাংলায় তখন চলছে আলিবর্দীর রাজত্বকাল।
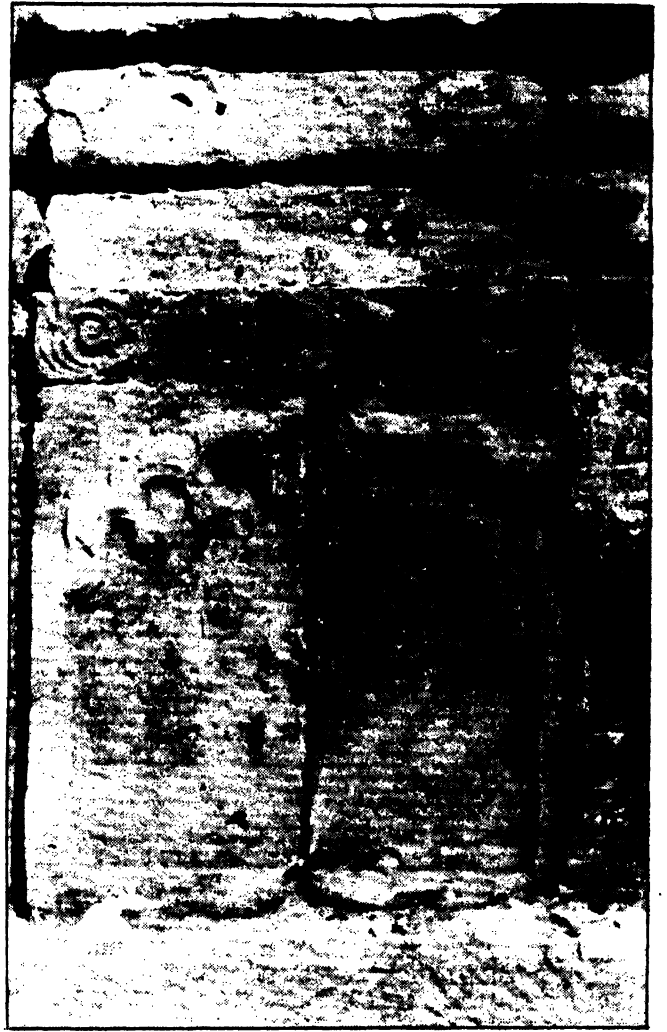
উত্তরকামারপোল গ্রামের রাধাকান্ত মন্দিরের অলংকৃত ইট

ছবি : সাগর চট্টোপাধ্যায়

এইভাবেই মন্দির প্রতিষ্ঠা-লিপিতে ঘুরিয়ে, হেঁয়ালি করে, সংখ্যা বাচক শব্দ ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠাবর্ষ লিখে রাখার রেওয়াজ ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আরো কয়েকটি মন্দিরে এই ধরনের প্রতিষ্ঠালিপি নজরে আসে। যেমন বারুইপুরের ধোপাগাছি পুরন্দরপুর শ্মশানঘাটে আদিগঙ্গার তীরে মুখোমুখি দুটি শিবমন্দিরের আলাদা দুটি মন্দিরলিপি যদিও দুটিরই প্রতিষ্ঠাবছর এক। দক্ষিণেরটিতে লেখা

—নেত্র যুগাব্ধি তারেশ শাকে ইদং মন্দিরং কৃতম্
নারায়ণীশ্বরস্য শ্রী কালীচরণ শর্ম্মানা

* A Corpus of dedicatory inscriptions from temples of West Bengal, Calcutta, 1982. P-137 by A. K. Bhattachariya.

একইভাবে এখানে নেত্র = ৩ (তিনে নেত্র), যুগাব্ধি = জোড়া সমুদ্র = ৭৭, তারেশ = তারকাদের ঈশ্বর অর্থাৎ চন্দ্র মানে ১ (একে চন্দ্র)। একইভাবে অঙ্কস্য বামাগতি সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠাকাল দাঁড়ায় ১৭৭৩ শকাব্দ বা ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দ।

ওপরের তিনটি মন্দিরই শিবালয়। আটচালা। তৎকালীন জমিদার বা বর্ধিষ্ণু পরিবারের তৈরি। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই মুহূর্তে যত মন্দির বা দেবালয়, শিবের মন্দিরের মোট সংখ্যা তার থেকে কিছু কম বললে অত্যুক্তি হবে না। শিব ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা এই জেলায় প্রাধান্য পেয়েছে। বৈচিত্র্যও আনা হয়েছে লিঙ্গরূপী শিব ও শিবালয়ের নাম, আকার, অবস্থান, গঠনশৈলী, উপাদান ও অলংকরণের ক্ষেত্রে। কোথাও মন্দির বেশ উঁচু যেমন মন্দিরবাজার থানার কেশবেশ্বর, বিষ্ণুপুর থানার বাখরাহাট, কোথাও শিবলিঙ্গের আকার বেশ বড়ো যেমন রাজপুরের দুর্গেশ্বর, মগরাহাট থানার গাড়েশ্বর, কোথাও শিবলিঙ্গ মাটির নিচে প্রোথিত (রায়দিঘির দিকে কাশীনগর বা শ্রীমতী গঙ্গা বাসস্টপ—বজুকেনাথের মন্দির), আবার কয়েক ফুট নিচে নেমে কোথাও শিবদর্শন করতে হয় (দক্ষিণ বারাশতের আদ্য মহেশ, বোলসিদ্ধির (গুরুদাসনগর) অনাদিশ্বর, চিত্রশালীর নন্দিকেশর (সীতাকুণ্ড, বারুইপুর)। শিবলিঙ্গের উপকরণেও কত পার্থক্য। কোথাও শিব বেলেপাথরের, কোথাও কালো বা শ্বেতপাথরের, কোথাও খোলা আকাশের নিচে (দক্ষিণ বিষ্ণুপুর), কোথাও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে তুলে এনে শিবলিঙ্গ কাঁচা ঘরে রাখা (চৈতন্যপুর)।

এবার আসি এই জেলার কিছু উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে। এই জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিবালয় মন্দিরবাজার থানার রামনাথপুর গ্রামের কেশবেশ্বর। বেশি পরিচিতি মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর বলে। আকার উচ্চতা, স্থাপত্যশৈলী ও পোড়ামাটির অলংকরণে শুধু এই জেলা নয়, তৎকালীন বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য আটচালার দক্ষিণমুখী মন্দির এটি। উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। মন্দিরলিপি প্রসঙ্গে এই মন্দিরটির কথা আগে বলা হয়েছে। মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য তিনদিকেই রোয়াক সেইসঙ্গে ত্রিখিলান প্রবেশপথ ও অলিন্দের ব্যবহার। একসময় প্রচুর টেরাকোটা অলংকরণ ছিল, বর্তমানে অধিকাংশই বিলুপ্ত, এর মধ্যে জীবজন্তু, ফুল, পতাকাশোভিত মন্দিরে শিবলিঙ্গের ছোট ছোট অনুকৃতি সহ কিছু মৃৎফলক (terrecotta plaque) এখনও আকর্ষণীয়।

কেশবেশ্বর মন্দিরের কাছেই জগদীশপুর হাউড়ির হাটের যোগেশ্বর ও ভুবনেশ্বর পাশাপাশি দুটি দক্ষিণমুখী শিবমন্দির। আকারে ছোট হলেও স্থাপত্য রীতি ও প্রাচীনত্বের নিরিখে এ দুটি মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরলিপি না থাকলেও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে এ দুটি কেশবেশ্বর মন্দিরের (১৭৪৮ খ্রিঃ) আগে তৈরি। প্রাচীন রেখ ও পীড়াশৈলীর যুগপৎ সংমিশ্রণ ঘটেছে মন্দিরদুটিতে। ভুবনেশ্বর মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে মাটিতে ধসে পড়লে তারই অনুকরণে বর্তমান ভুবনেশ্বর মন্দিরটি তৈরি পুরনো ভিতের ওপর ১৩৭৩ সালে, ফলে এই মন্দিরটি পুরাকীর্তির বিচারে আসছে না। সামনে মাটিতে পড়ে প্রাচীন ভুবনেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এই মন্দিরদুটির সেবায়েৎ গ্রামেরই নস্কর পরিবার। প্রসঙ্গত, এই নস্কর পরিবারের আদি পুরুষ রামচন্দ্র খাঁ ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে এই জেলারই ছত্রভোগে শ্রী চৈতন্যকে নৌকায় করে নীলাচল যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলে প্রাচীন কবিদের লেখায় প্রকাশ। গ্রামটিও প্রাচীন। গ্রামের হাউড়ির হাট এই জেলার ৩০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন একটি হাট। একসময় এই হাটে কড়ি দিয়ে কেনাবেচার কথা শোনা যায়।

জগদীশপুর ও রামনাথপুর এই দুটি গ্রামই প্রাচীন ছত্রভোগ অঞ্চলের মধ্যে। এই ছত্রভোগ, জেলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে শ্রী চৈতন্যের সেখানে পদার্পণের পর—এই' মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে/আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে' (বৃন্দাবন দাস)। তৎকালীন ছত্রভোগ ছিল আদিগঙ্গার পথে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম ও বন্দর। রায়মঙ্গল, মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, শ্রী শ্রী চৈতন্যভাগবত, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদি প্রাচীন কাব্যে উল্লেখ আছে যে চাঁদ সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগর, ধনপতি সওদাগর ইত্যাদি বণিকেরা আদিগঙ্গা ধরে বাণিজ্য করার সময় ছত্রভোগে এসে তীর্থপূজা করেছিলেন। এই ছত্রভোগ শিব এবং শক্তি দুই মহাশক্তির পুন্যমিলনভূমি। এই অঞ্চলেই ছিল অম্বুলিঙ্গ শিব ও দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রাচীন মন্দির যা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কাছে নতুন করে তৈরি হয়েছে বদরিকানাথ বা অম্বুলিঙ্গ ও ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির। প্রসঙ্গত প্রাচীন ছত্রভোগ বর্তমানে কয়েকটা ছোট গ্রাম—জলঘাটা, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, বড়াশী, কাশীনগর খাঁড়ি, ঘাটেশ্বর ইত্যাদি। ছত্রভোগে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এবং বড়াশী গ্রামে অম্বুলিঙ্গ শিবের আটচালা, দক্ষিণমুখী আধুনিক মন্দিরটি অবস্থিত। বড়াশির কাছেই চক্রতীর্থ যা গঙ্গা-বিষ্ণু-শিব ও শক্তির অধিষ্ঠান। কথিত ভগীরথ গঙ্গা আনার সময় এইখানে গঙ্গা নিজের হাতে জ্যোতির্ময় চক্র দেখিয়ে ভগীরথকে তাঁর অস্তিত্বের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন, এই থেকেই চক্রতীর্থ। অন্যমতে অম্বুলিঙ্গ শিব, শক্তিদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী, গঙ্গা এবং নীলমাধব (বিষ্ণু) এই চারশক্তির সমাবেশের জন্যই চক্রতীর্থ হিসেবে খ্যাত। চক্রতীর্থের প্রাচীন জলাশয় নন্দার পুকুরের পশ্চিমপাড়ে মহাশ্মশান ও সারিবদ্ধ সমাধিমন্দির। কিছুদূরে 'খাঁড়ি গ্রামে আছে বড় খাঁ গাজীর মাজার। খাঁড়ি থেকে প্রায় ১২ কিমি দূরে গদামথুরা দ্বীপের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে মাটির গভীরে সম্ভবত প্রাচীন মন্দির ও দরদালানের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছত্রভোগ অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। এর প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে কালিদাস দত্ত তাঁর ছত্রভোগ প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'ছত্রভোগের প্রাচীনত্ব এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তবে বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকারে আসিবার পূর্বেও যে সেখানে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল তাহা জানা যায় সেখানকার ভূগর্ভে আবিষ্কৃত পাল ও সেন রাজগনের আমলের অনেকগুলি কালো প্রস্তরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং কয়েকটি কারুকার্য মন্ডিত দ্বারফলক ও স্তম্ভাদি হইতে।'

ছত্রভোগের প্রায় ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে ঘাটেশ্বর। ঘাটেশ্বর এখন মন্দিরবাজার থানার মধ্যে। লক্ষীকান্তপুর থেকে যাওয়া সুবিধে। ঘাটেশ্বরও প্রাচীন গ্রাম। প্রাচীন ছত্রভোগ অঞ্চলের মধ্যে। একসময় ঘাটেশ্বর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল তিনটি বেলে পাথরের জৈনমূর্তি ও মাটির নিচে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন। গবেষকদের ধারণা জৈন ধর্মের প্রভাব এই অঞ্চলে একসময় বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে এই ঘাটেশ্বরে কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবার এসে বসতি স্থাপন করে। এর মধ্যে বসু ও ঘোষ-চৌধুরী পরিবারের তৈরি ইটের কিছু দেবালয়, দোলমঞ্চ, দুর্গাদালান ও জরাজীর্ণ বসত বাড়ির বিশেষ

কিছু অংশ আজও ঘাটেশ্বর গ্রামের প্রাচীনত্বের সাক্ষর বহন করছে। কায়স্থ পাড়ায় বসুদের পূর্বমুখী, একদুয়োরী আটচালা শিবমন্দিরটি রানী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিবমন্দিরের সমসাময়িক বলে জানা গেছে। শিবমন্দিরের পাশে বসুদের প্রাচীন দোলমঞ্চের ধ্বংসস্তূপ। কিছুটা দূরে ঘোষ-চৌধুরী পরিবারের আটচালা দক্ষিণমুখী শিবমন্দির ছাড়াও ইট বের করা জীর্ণ পরিত্যক্ত ত্রিখিলান দুর্গাদালান। একসময় পোড়ামাটি ও পঙ্খের অলংকরণ ছিল দুর্গাদালানটিতে তার কিছু নিদর্শন এখনও লক্ষ্য করা যায়। পাশে পারিবারিক গৃহদেবতা কৃষ্ণরায়ের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত দালান মন্দির ছাড়াও এই পরিবারের একটি ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত দ্বিতল দোলমঞ্চ লক্ষ্য করা যায় কায়স্থ পাড়ায় ঢোকার মুখে। ঘাটেশ্বরের মতোই মন্দিরময় প্রাচীন গ্রাম ডায়মন্ডহারবার থানার খোরদ ও সরিষা। খোরদ গ্রামে রয়েছে রাজা কেশব রায় চৌধুরী পরিবারের জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বসতবাড়ি, দুর্গাদালান ও চারটি আটচালা শিবের মন্দির। সরিষা গ্রামে বর্ধিষ্ণু বসু, মিত্র ও সরকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দুর্গাদালান, শিবমন্দির, মদন গোপাল, দক্ষিণাকালীর আটচালা মন্দির। শেষ দুটো বেশ উঁচু প্রায় ৫০ ফুট, গঠনশৈলীও আকর্ষণীয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্নসৌধ ও পুরাবস্তু সংক্রান্ত একটা বড়ো জায়গা দখল করে আছে জয়নগর ও মজিলপুর। জয়চণ্ডী দেবীর নামানুসারে আদিগঙ্গার তীরে জয়নগরের পরিচিতি সেই মধ্যযুগ থেকে—অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান/নাহি যার উপমান/তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ। বাদ্য বাজে সুমধুর/বাহিয়া রাজা বিষ্ণুপুর/জয়নগর করিল পশ্চাৎ (রায়মঙ্গল, কৃষ্ণরামদাস)। শোনা যায় জয়চণ্ডীদেবীর আদেশে যশোহর থেকে এসে জনৈক গুণানন্দ মতিলাল এখানে জঙ্গলের মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মতিলাল পাড়ায় আজও জয়চণ্ডীদেবীর মন্দির আছে। জয়চণ্ডীদেবীর প্রায় চার ফুট উঁচু মূর্তিটি কাঠের, সম্ভবত বকুল কাঠের, এটাই জনশ্রুতি। জয়নগরের অন্যতম পুরাতাত্ত্বিক আকর্ষণ কুলপী রোডের পশ্চিমে মিত্র গঙ্গার তীরে মিত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পূর্বমুখী আটচালার নাতিউচ্চ দ্বাদশ শিবমন্দির। মিত্ররা জয়নগরে আসেন সপ্তদশ শতকের শুরুতে, প্রথম পুরুষ রামগোবিন্দ মিত্র। তাঁরই উত্তরপুরুষ মধুসূদন মিত্র, মিত্র গঙ্গার তীরে মিত্র পরিবারের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দিরটি তৈরি করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে প্রায় একই মাপ ও আদলে বাকি মন্দিরগুলি তৈরি হয় যথাক্রমে ১৭৬১, ১৭৯৯ ও ১৮৭৫ সালে। এর মধ্যে [illegible]তম মন্দিরটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসে আর ষষ্ঠ মন্দিরটির জায়গায় [illegible] একটি পঞ্চরত্ন মন্দির তৈরি করা হয় যা পুরাকীর্তি[illegible] না। দ্বাদশ মন্দির ছাড়াও আটচালার আরও তিন[illegible]টি দোলমঞ্চ এই মন্দির চত্বরে রয়েছে। এর মধ্যে দক্ষি[illegible] উল্লেখ্য এই কারণে যে এতে স্পষ্ট ইউরোপীয় স্থাপত[illegible] চিহ্ন। শ্রী অসীম মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চব্বিশ পরগনা[illegible]ত এই দোলমঞ্চের উল্লেখ করেছেন—"জয়নগরে[illegible]রত্ন দোলমঞ্চটি তো দেশীয় ভূস্বামীদের স্থাপত্য চিন্ত[illegible]ভাবের বিস্তৃতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উপরের চৌচাল[illegible] দিলে নিচের অংশটিকে হুবহু একটি ইউরোপীয় প্রথ[illegible] বাসভবন বলেই মনে হয়। সমতল ছাদ, সমতল [illegible] দরজা, ফ্যান লাইট ইত্যাদি সামান্য চুন-সুড়কির সা[illegible] এমন [illegible]কারভাবে নির্মিত যে দূর থেকে ঐগুলিকে প্রকৃত দরজা জানালা বলেই মনে হয়। বস্তুত জয়নগরের এই দোলমঞ্চটি ইঙ্গ-বঙ্গ তথা বঙ্গ-ইউরোপীয় স্থাপত্যের মিলন মিশ্রণের এক নীরব সাক্ষী। চৌচালাটি বাংলার ঘরোয়া স্থাপত্যের প্রতীক আর দ্বিতল কক্ষটি ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের উদাহরণ।" বর্তমানে এই দোলমঞ্চটি উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে যথেষ্ট সৌন্দর্য হারিয়েছে।

বাংলার নিজস্ব মন্দির ও সৌধে ইউরোপীয় স্থাপত্য ও অলংকরণের প্রভাব পড়তে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। স্থাপত্যের মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় স্তম্ভ (ডোরিক, আয়নিক, করিন্থিয়ান) ও অলংকরণের ক্ষেত্রে ফ্যানলাইট ও ফেস্টুনের প্রয়োগ বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিভিন্ন মন্দির-মসজিদ ছাড়াও দোলমঞ্চ রাসমঞ্চ ও বাড়ি তৈরির স্তম্ভ পরিকল্পনায় এই ধরনের প্রভাব চোখে পড়ে। বজবজ অঞ্চলে বাওয়ালীতে মণ্ডলদের একটি সুবিস্তৃত মন্দির চত্বরে (temple complex) এই ইউরোপীয় স্থাপত্য ও অলংকরণের প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। বাওয়ালীর এই মণ্ডল পরিবার সম্ভবতঃ ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে তৈরি করে গেছেন আটচালা ও নবরত্ন মন্দির, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, নাটমণ্ডপ, দিঘি, শ্বেতপাথরের ঘাট, জলটুঙি, বাগানবাড়ি ইত্যাদি। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এত বড় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মন্দির চত্বর আর নেই। মণ্ডল ভিলা যেখান থেকে শুরু, তার প্রবেশ দরজার দুপাশে বিদেশিনীর মূর্তি, মূর্তি সংলগ্ন বাগানবাড়িতে ইউরোপীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রভাব। এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় মণ্ডলদের বসতবাড়ি, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, নাটমণ্ডপে। ব্যবহৃত হয়েছে ইউরোপীয় স্তম্ভ, ফ্যানলাইট, ফেস্টুন বা পুষ্পমাল্য। অঙ্গসজ্জায়ও ইউরোপীয়ও প্রভাব স্পষ্ট। এছাড়া এখানে পোড়ামাটি ও পঙ্খের কাজ লক্ষ্য করা যায় গোবিন্দ জিউর আটচালা মন্দিরটিতে। কাছাকাছি রাধাকান্তের আটচালা মন্দিরের গায়েও পোড়ামাটির মূর্তি-ফলক ও অলংকরণ এখনও কিছু অংশে টিকে আছে। এই মন্দিরটিই সম্ভবতঃ প্রথমে তৈরি হয়েছিল ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে। তবে বাওয়ালীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় পুরাকীর্তি গোপীনাথ জিউ-এর নবরত্ন মন্দিরটি। ১২০১ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মানিক মণ্ডল এই মন্দিরটি তৈরি করান। আর একটি নবরত্ন মন্দির এই পরিবারেরই রামনাথ মণ্ডল

মন্দির প্রতিষ্ঠালিপি, উত্তর কামারপোল গ্রামের আট চালা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির

ছবি : লেখক
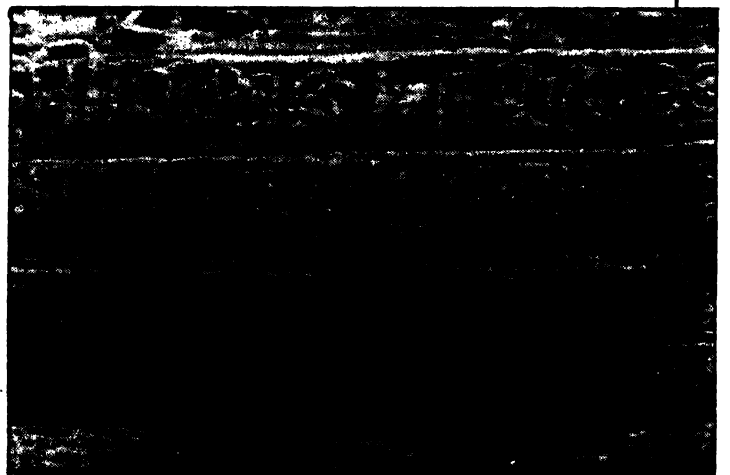
প্রতিষ্ঠা করেন টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার উল্টোদিকে চেতলা-নিউ আলিপুর অঞ্চলে মন্ডল টেম্পেল লেনে ১৭৯৪-এর কিছু পরে। ইউরোপীয় অলংকরণের আর একটি উদাহরণ ধর্মতলা-নুরপুর বা রায়চক যাবার পথে উত্তর কামারপোল গ্রাম। গ্রামের দেওয়ান পাড়ায় অর্ণবদের সুপ্রাচীন রাধাকান্তের পশ্চিমমুখী ত্রিখিলান রোয়াক ও অলিন্দযুক্ত আটচালা মন্দির। মন্দির অলংকরণে এখনও স্পষ্ট পঙ্খের কাজ সেইসঙ্গে চুন-বালির ভেনিশীয় কৃত্রিম জানলা ও ফ্যানলাইটের অস্তিত্ব। মন্দিরটিতে পদচিহ্নযুক্ত কিছু অলংকৃত ইটের ব্যবহারও বিরল উদাহরণের মধ্যে পড়ে। উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফুট, সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি তৈরি। উত্তর কামারপোলও এই জেলায় একটি উল্লেখযোগ্য temple complex। এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেওয়ান দর্পনারায়ণ অর্ণব পরিবারের রাধাকান্ত, ঘনশ্যাম ও শিবের আটচালা মন্দির, পরিত্যক্ত আটকোনা দোলমঞ্চ, ভেঙে পড়া ভোগ্যমন্ডপ, ভূগর্ভস্থ ইটের বনেদ, প্রাচীন দেওয়ান দিঘি। পূবে ঘনশ্যামের মন্দিরের পোড়ামাটির মন্দিরলিপিটিও২২ উল্লেখযোগ্য—

> স্মৃত্বাকৃষ্ণপদং বেদ ঘ [*খ] শ্ব
> ক্ষৌনীমিতেশকে। নির্ম্মায়।
> শ্রীঘনঠামশ্রীঘনশ্যামমন্দিরং
> শ্রীজগমোহনেনং ব্রপ্তি [*ব্যাপ্তি] শ্চানাৎ কৃতং
> সন ১২০৬ সাল মিদং

এছাড়া ইউরোপীয় স্তম্ভের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ঘাটেশ্বরের পরিত্যক্ত দ্বিতল দোলমঞ্চ ও বহড়ুর প্রসিদ্ধ বসু ভিলাতেও। স্তম্ভগুলো দ্রুত জীর্ণ হয়ে এসেছে। বহড়ুও পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখ্য। বসু পরিবারের নন্দকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর জিউ-এর ১৮৩৬-এর দালান মন্দিরটি এই জেলার শিল্প-সুষমার এক অনবদ্য নিদর্শন। এই জেলায় সম্ভবতঃ একমাত্র ফ্রেসকো বা প্রাচীন চিত্রের নিদর্শন এই মন্দির। মন্দিরের ভেতরে পাশাপাশি তিনটে ঘর, বাইরের অলিন্দের তিন দেওয়ালে স্থান পেয়েছে শিব, দুর্গা, নন্দী, ভৃঙ্গী, রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, শ্রী চৈতন্যের নানা বিষয়বস্তুগত রঙিন চিত্র, অবহেলা ও সংরক্ষণের অভাবে ছবিগুলো মলিন ও বিবর্ণ হয়ে এসেছে। ছবিগুলো এঁকেছিলেন দুর্গারাম ভাস্কর। অলিন্দের পূব দিকে তাঁর পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে— "অতি দিন হিন ভক্ত জন:
দুর্গারাম ভাসকরেন: চিত্রকরেণ

বসুদের বাড়ির সামনের দোলমঞ্চ পেরিয়ে পূবে বহড়ু বাজারের দিকে বসুদেরই পাশাপাশি জীর্ণ ও পরিত্যক্ত পাঁচটি শিবের মন্দির। বহড়ুর আগের স্টেশন দক্ষিণ বারাশত। দক্ষিণ বারাশতের আদ্যমহেশের আটচালা মন্দিরটিও পুরনো তবে নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। এই দক্ষিণ বারাশতে আর এক বসু পরিবারের জনৈক কৃষ্ণচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি তিনটি শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। দুটিতে প্রতিষ্ঠা বছর বলা আছে। একটি ১২০৭। অন্যটি ১২১৫ বঙ্গাব্দ। মজিলপুরের দত্ত পাড়া ও দত্ত বাজারে রয়েছে কয়েকটি পুরনো আটচালা ও একটি চারচালা দেবালয়। দত্তদের দুর্গাদালানে পঙ্খের কাজ এখনও সুন্দর। কাছাকাছি দেরবেড়িয়ায় পূবমুখী, অলিন্দযুক্ত ত্রিখিলান রাজরাজেশ্বরের আটচালা মন্দিরে পোড়ামাটির ও পঙ্খের কিছু বৈচিত্র্যময় অলংকরণ স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে মন্দিরের সামনের আচ্ছাদনের নিচে সারিবদ্ধ পোড়ামাটির নরমুন্ড ও অন্যান্য অংশে পদ্ম, পদ্মকোরক ও পদ্মপত্রের ফলক সম্বলিত অলংকরণ উল্লেখযোগ্য। ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটি তৈরি করান রাজচন্দ্র দেব। বাংলা হরফে পোড়ামাটির টালিতে উৎকীর্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির সংক্ষিপ্ত পাঠ—১৭২৭ সন-১২১২ মুনিপক্ষর্ষিপৃথি বীমিতে শাকে অচ্যু তালয়ঃ শ্রীরাজ চন্দ্র দেবেন কৃতঃ কৃষ্ণেন কর্ম্মনা। কাছাকাছি আর একটি মন্দির এখানে ছিল যা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুরাকীর্তির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক কাঠের অলংকরণ। নদীয়ার উলা-বীরনগর বা হুগলীর আঁটপুরে কিছু প্রাচীন দারুশিল্পের নিদর্শন রয়েছে। এই জেলার মথুরাপুর স্টেশনের ২ কিমি পশ্চিমে মন্দিরবাজার থানার মহেশপুরে বৃন্দাবনচন্দ্রের আধুনিক দালান মন্দিরের বারান্দায় ১১টি খুঁটিতে বিধৃত হয়ে আছে প্রাচীন তক্ষণশৈলীর এক অমূল্য নিদর্শন। মূলত শ্রীকৃষ্ণলীলার নানা বিষয়বস্তু এতে স্থান পেয়েছে। যতদূর জানা গেছে প্রায় ৩০০ বছরেরও পুরনো এই দারু ভাস্কর্য। স্থানীয় জনশ্রুতি দালান কোঠার ওপর কাঠের 'জোড়বাংলো'য় এই খুঁটিগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। শ্রী তারাপদ সাঁতরার মতে খুঁটিগুলো ছিল প্রাচীন চন্ডীমন্ডপের। বিতর্ক যাই থাক দারুভাস্কর্যের এমন সুপ্রাচীন নিদর্শন এই জেলায় বিরলই বলা চলে। এত প্রাচীন না হলেও মথুরাপুর থানার শ্রীকৃষ্ণনগর-গোয়ালবেড়িয়া গ্রামে বৈদ্যদের ধ্বংসপ্রাপ্ত আটচালায় ব্যবহৃত কাঠের স্তম্ভে কিছু উল্লেখযোগ্য অলংকরণ স্থান পেয়েছে। শুধু কাঠের অলংকরণ নয় মহেশপুর গ্রামের আর একটি আকর্ষণ মাটির উঁচু দোলমঞ্চ যা সচরাচর দেখা যায় না। গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রাচীন মন্দিরের ইটের ধ্বংসাবশেষ এখনো লক্ষ্য করা যায়।

মহেশপুরের ঠিক পেছনেই পূর্ব গোপালনগর গ্রাম। গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি সীতারামের দক্ষিণমুখী আটচালার ভগ্ন, পরিত্যক্ত ইটের মন্দিরটি। মন্দিরের গায়ে একটি শ্লেট পাথরের প্রতিষ্ঠালিপি ছিল। এটি খসে পড়ার পর বর্তমানে সেবায়েত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঠাকুরঘরে রাখা। প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ

> মুনি রসাদিতি ক্ষৌণী মিতে সা
> কে সূরালয় দ্বিজশ্রী রাজ
> ....কৃতবান শিল্পিনে
> শকাব্দা ১৭৬৭ সন
> ....৩ কার্ত্তিক শ্রী হরি

মহেশপুরের উল্টো দিকের গ্রাম গোকুল নগর। নন্দদুলালের পরিত্যক্ত দক্ষিণমুখী ত্রিখিলান আটচালা মন্দির ছাড়াও অন্যতম পুরাতাত্ত্বিক আকর্ষণ—বটগাছের ঝুরিতে সম্পূর্ণ আবৃত বৈষ্ণব আউল সম্প্রদায়ের জনৈক আবুল গোঁসাই-এর সমাধি-মন্দির। পাতলা কাঠে পোড়ানো ইট এর প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করছে।

এই জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন সমাধি যা পুরাকীর্তির বিচারে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কুলপীর হুগলী নদীর কাছে বারচালা স্থাপত্য রীতির সুপরিচিত মুনাবিবির কবর। কালিদাস দত্তের মতে এটি জনৈক পর্তুগীজ রমনীর সমাধি। এর প্রতিষ্ঠাকাল ও পর্তুগীজ রমনীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। এই সমাধি স্থলের কাছে একসময় মাটি খোঁড়ার সময় পাওয়া গিয়েছিল পর্তুগীজ সৈনিকের একটি পোড়ামাটির মূর্তি ও কয়েকটি মৃৎপাত্র।২৩ এই মূর্তিটি থেকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে পর্তুগীজ সৈন্যদের

* লিপিকর প্রমাদ

নূরপুর গ্রামে সাহেব-মেমের প্রাচীন সমাধি — *ছবি : লেখক*

বেশভূষার পরিচয় পাওয়া যায়। নূরপুরে নদীর ধারে একটি পুরনো পাতলা ইটের সমাধি চোখে পড়ে। প্রতিষ্ঠাফলক আগে থাকলেও বর্তমানে সেটি খুলে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় এটি সাহেব মেমের কবর। কিছুটা ব্যবধানে সাহেব মেমের দুটি আলাদা ছোট স্মৃতি সৌধ। জনশ্রুতি দুজনেই জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন। স্মৃতি-সৌধ দুটি বর্তমানে গাছপালায় পরিবেষ্টিত। বজবজের অছিপুরে চীনাম্যানতলায় জনৈক টং অছুর অশ্বক্ষুর আকৃতির একটি প্রাচীন সমাধি মন্দির আকর্ষনীয়। টং অছু [illegible] বাংলার চীনাদের আদিপুরুষ। ১৭৭৬-এর মন্বন্তরের পর অছুর [illegible] প্রথম গড়ে ওঠে চীনাকলোনি, অছুর মৃত্যুর পর চীন[illegible] বিভিন্ন জায়গায় চীনা পল্লী তৈরি করে বসবাস করছে।

ডায়মন্ডহারব[illegible] জায়গায় প্রায় দুশ বছরের বেশি পুরনো কয়েকটি ইউ[illegible] আজও লক্ষ্য করা যায়। —"The clump of lofty [illegible]s, through whose foliage the summer win[illegible] music of the ocean, will indicate to thos[illegible] in ships the place where lie so many of [illegible]e expectations of reaching their native lan[illegible]mond Harbour thwarted by the call to a [illegible] journey".

[Bengal Past and P[illegible] No. 1. (Jan, March 1909, P. 159]

ডায়মন্ডহারবার শহরের নুনগোলা অঞ্চলে দুশ বছরেরও পুরনো ইউরোপীয়ানদের কবর ও স্মৃতিফলক রয়েছে। সবচেয়ে পুরনো স্মৃতিফলকটি (Epitaph) জনৈক থমাস থমসনের যিনি মারা যান ১৭৯৫-এর ২০শে অক্টোবর। ফলকটির কয়েকটি ইংরেজী হরফ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। শ্বেতপাথরের ফলকটিতে উৎকীর্ণ তথ্যটি এরকম—To the memory of Thomson who departed from this life 20th October, 1795, aged 30 years. This year's Port master of this Harbour. Monument is erected by his..................Mrs. MARY THOMSON.

২০০ বছর আগে এই অঞ্চল যে সুপ্রসিদ্ধ একটি বন্দর ছিল তা এই ফলকটি থেকে জানতে পারা যাচ্ছে। Diamond Harbour নামের মধ্যেও বন্দরের অস্তিত্ব। কফিন ও ক্রশের আদলে এখানে আরো কয়েকটি সমাধি ফলকও রয়েছে, বিয়োগান্ত ব্যাথার সুরে কিছু মর্মস্পর্শী গাথা সেখানে উৎকীর্ণ, হরফগুলো দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

বারুইপুরের শাসন গ্রামে শাসন স্টেশনের কাছে দুজন ইংরেজের জীর্ণ ও আগাছা পরিবৃত ইটের নাতিউচ্চ দুটি পাশাপাশি সমাধি সৌধ প্রাচীনত্বের দিক থেকে উল্লেখের দাবী রাখে। ইটের কিছু প্রাচীন মুসলিম সমাধিও এই জেলায় লক্ষ্য করা যায়। এমনই দুটি গ্রামের নাম মন্দিররাজার থানার টেকপাঁজা ও ডায়মন্ডহারবার থানার মরুবেড়িয়া। জাহাঙ্গীর গড়ের কয়েকটি সমাধি কালগত দিক থেকে শতাব্দী প্রাচীন হলেও পরবর্তীকালে এই সমাধিগুলোর ওপর নির্মিত ইটের অবয়ব (Structure) পুরাকীর্তির মধ্যে আসছে না।

কিছু প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষও এই জেলার উল্লেখযোগ্য প্রত্নসম্পদ। ডায়মন্ডহারবারের সুপরিচিত ধ্বংসপ্রাপ্ত কেল্লাটির নাম চিংড়িখালির দুর্গ, তৈরি করেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জলদস্যুদের হাত থেকে নিম্নগাঙ্গেয় বাংলাকে বাঁচানোর জন্য। পুরনো নথিপত্রে দেখা যায় যে এই দুর্গনির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৮৬৮-৬৯ সাল নাগাদ। বর্তমানে ইট ও পাথরের একটি ধ্বংসস্তুপ হুগলী নদীর জলের কিনারায়। একসময় ইট-পাথরের Bunker তৈরি করে কামান বসানো হয়েছিল নদীর দিকে মুখ রেখে। কয়েকটি কামান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েও ছিল নদীর পাড়ে, বর্তমানে তা চোখে পড়ে না।

ফলতায়ও ডাচদের একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষের কিছু নিদর্শন এখনো পর্যন্ত টিকে আছে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুর্গটি গড়ে উঠেছিল। ১৭৫৬ সালে কলকাতায় সিরাজের কাছে হেরে ইংরেজরা তাদের জাহাজগুলি নিয়ে পালিয়ে এসে ফলতার এই ডাচ-দুর্গে আশ্রয় নেয়। এখানে তারা ছ মাস কাটিয়েছিল কলকাতা পুনর্দখলের জন্য সৈন্যবল বাড়াতে। একসময় চওড়া পরিখা দিয়ে দুর্গটি সুরক্ষিত ছিলে, সেই পরিখা আজও রয়েছে। রয়েছে ভূগর্ভস্থ ও চর্তুদিকে বিস্তৃত সুড়ঙ্গপথ, কামান দাগবার জায়গা, আস্তাবল, বারুদ কারখানা। ছিন্নমূল কিছু পরিবার সুড়ঙ্গপথে বসবাস করছেন।

ফলতার অদূরে বজবজে একটি দুর্গ ছিল। শোনা যায় প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে আক্রমণ করতে বজবজের এই কেল্লার সামনে নদীতীরে রণতরী থেকে মান সিংহের সৈন্যদল অবতরণ করেছিল। পরবর্তীকালে ঐ দুর্গ নবাবের দখলে আসে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কামান, গোলা, বারুদ দিয়ে এটি আরও শক্তিশালী করেন। ১৭৫৬-য় লর্ড ক্লাইভের ইংরেজ বাহিনী এটি দখল করে এবং
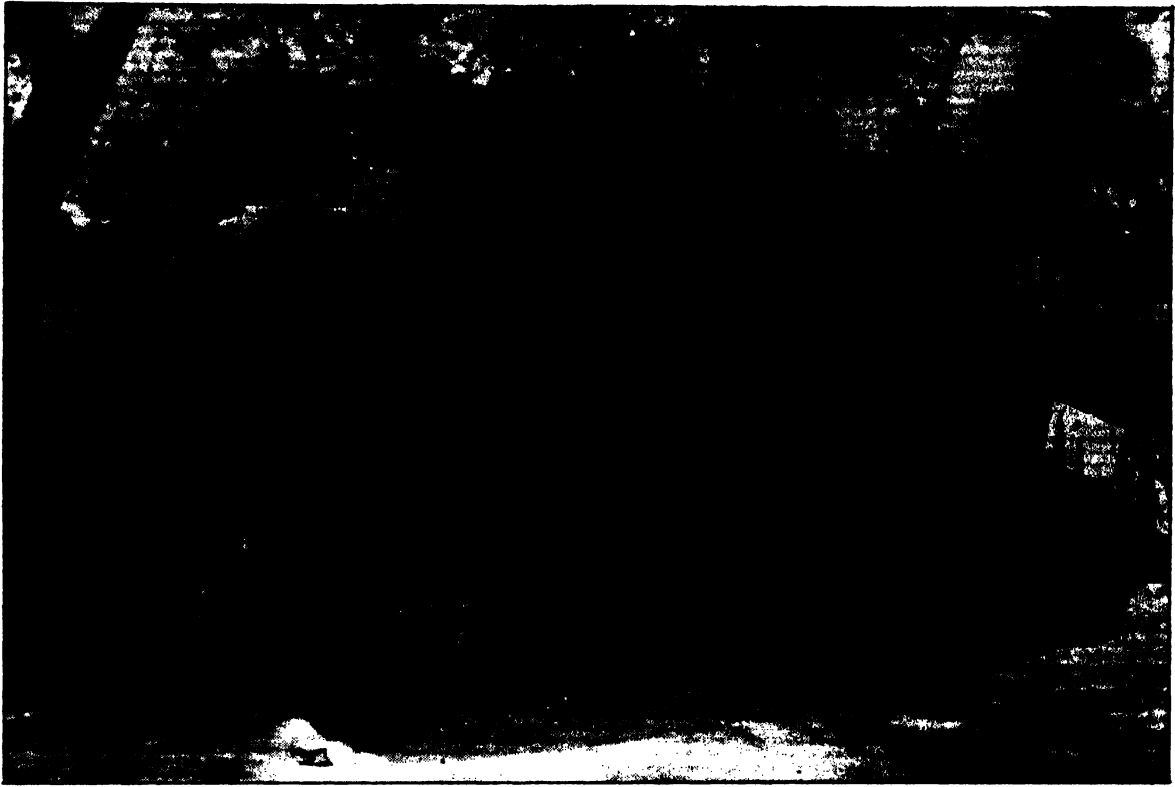
পরিত্যক্ত কলডা দুর্গের একটি সুড়ঙ্গ — *ছবি : লেখক*

১৭৯৩-তে এটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। দুর্গের পরিখার কিছু চিহ্ন এখনো লক্ষ্য করা যায়।

মুসলমান আমলেও এই জেলায় কিছু প্রাচীন দুর্গের কথা জানতে পারা যায়। এই দুর্গগুলি মূলত তৈরি হয়েছিল যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের আমলে সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের একেবারে গোড়ায়। তৎকালীন যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে মুঘলশক্তি কয়েকটি গড় বা কেল্লা তৈরি করেছিল। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে প্রতাপাদিত্যও বেশ কিছু দুর্গ তৈরি করেছিলেন যার কয়েকটি বর্তমানে এই জেলার মধ্যে পড়ে। অধিকাংশ দুর্গই ছিল সম্ভবত মাটির যে কারণে ইতিহাসটুকু ছাড়া দুর্গের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সেইভাবে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে কয়েকটি হল—ক্যানিং-এর মাতলা দুর্গ, চ্যান্ডিক্যান দুর্গ (সাগর), ঘুটিয়ারী শরীফের অদূরে বাঁশড়া অঞ্চলে গড় ধো-ঘাটা অন্যমতে ধুমঘাট, বেহালা সরশুনা অঞ্চলে রায়গড় দুর্গ ইত্যাদি। প্রসঙ্গত কলকাতার আশপাশে প্রতাপাদিত্যের মোট সাতটি দুর্গের কথা জানতে পারা গেছে।

মুসলমান পূর্ব যুগেও কয়েকটি প্রাচীন বন্দরের কথা জানতে পারা যায় যা দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে উল্লেখের দাবী রাখে। এর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছত্রভোগ, হরিনারায়ণপুর। এমনই সুপ্রসিদ্ধ মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ের আরো কয়েকটি বন্দর যেগুলি বহুদিন আগেই অবলুপ্ত অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে গুরুত্বপূর্ণ যেমন—বন্দর মাদিয়া (বর্তমানে জয়নগর থানার ময়দা অঞ্চল যা এক সময় পর্তুগীজ বন্দর হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল বলে প্রকাশ), রায়মঙ্গল বন্দর (মাতলার পূবে), বড়দহ বন্দর (বর্তমানে সোনারপুর থানার জগদ্দল, রাজপুর, কোদালিয়া অঞ্চলের কোন জায়গায়, ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত নিমতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে এই বন্দরের উল্লেখ আছে) ইত্যাদি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রত্ন নিদর্শনও এই অঞ্চলগুলোতে পাওয়া গেছে।

আগেই বলেছি দক্ষিণ ২৪-পরগনার পুরনো মন্দিরগুলির বেশীরভাগ উনিশ শতকে তৈরি। এর পরেই অষ্টাদশ শতক। অষ্টাদশ শতকের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য মন্দির—বিষ্ণুপুর থানার গোবিন্দপুরে ১৭৬৯-এ তৈরি পালেদের আটচালা শিবমন্দির যা একসময় পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিল, বজবজ থানার পাইক পাড়ায় ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে শিল্পী বুলচন্দ্র পালের তৈরি ও কেদার দাস প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা। শ্রী অসীম মুখোপাধ্যায় এই মন্দিরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে স্থাপত্য ও অলংকরণে এটি মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর মন্দিরের সমতুল্য ছিল। বর্তমানে মন্দিরের অবয়বটুকু শুধু টিঁকে আছে। মন্দিরলিপিটির পাঠ—"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৭৬, তারিখ ২৯শে অগ্রহায়ণ, কীর্তি, শ্রী কেদার দাস, শিল্পীবর, বুলচন্দ্র পাল"।

বাওয়ালীর রাধাকান্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে জনৈক বুলচন্দ্র মিস্ত্রীর উল্লেখ আছে—"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৯৩ সন, ১১৭৮ সাল নায়েক শ্রী হরানন্দ মণ্ডল, কারিগর শ্রী বুলচন্দ্র মিস্ত্রী"।[২৫] বুলচন্দ্র পাল ও বুলচন্দ্র মিস্ত্রী একই ব্যক্তি কি না, এটাও জানা যায় না। এই 'মিস্ত্রী' উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে উনিশ শতকের আর একটি আটচালা শিবের মন্দিরে। মন্দিরবাজার থানার খোর্দ-সদাশিবপুর গ্রামে। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ—'দুলালী মিস্ত্রী, বাগদা'। অন্যদিকে মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর মন্দিরের শিল্পী বাসুদেবের পদবী জানা যায় না। বহড়ুর দেওয়াল চিত্রের শিল্পী দুর্গারাম তাঁর পদবী 'ভাস্কর' বলে ব্যবহার করেছেন। শ্রী কালিদাস দত্ত তাঁর বহড়ু প্রবন্ধে বলেছেন—"বাংলাদেশে পূর্বে

একদল চিত্রকরের এই রূপ 'ভাস্কর' উপাধি ছিল। প্রবাদ, উহাদের পূর্বপুরুষেরা প্রাচীনকালে ভাস্করের কাজ করিত, পরে ওই ব্যবসা লোপ পাইলে পুরুষাণুক্রমে ছবি আঁকিতেন।" বাংলার মন্দিরশিল্পীরা অধিকাংশই ছিলেন সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত। ইট, কাঠ, পাথর ও পটে তাঁরা সমান দক্ষতায় শিল্প সৃষ্টি ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই লোকশিল্পীরা কোনদিনই সেভাবে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে পারেন নি বা আসতে দেওয়া হয় নি। দক্ষিণ ২৪-পরগনার বেশিরভাগ মন্দিরের ইতিহাস জমিদার বা বিত্তবান সমাজের, ইতিহাসও রচিত হয়েছে অনেকটা সেভাবেই। আমরা আজও জানি না, ঐতিহাসিক 'জটার দেউলের মূল কারিগর কে, আমরা জানি না মহেশপুরের অনন্য সাধারণ তক্ষণ-শিল্প কার হাতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। আবার প্রতিষ্ঠাতা পরিবার সেইসঙ্গে মন্দির শিল্পীর নাম জানা যায় না এমন কিছু পরিচয়হীন পুরনো আটচালা মন্দিরও ওই জেলায় রয়েছে। গ্রামের মানুষেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগুলির সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছেন। এমনই একটি উদাহরণ লক্ষীকান্তপুর-কুলপী রোড ও দয়ারামপুর হয়ে গাববেড়িয়া গ্রামের নস্কর পাড়ায় প্রায় ৪০ ফুট উঁচু পূবমূখী শিবমন্দিরটি, গ্রামেরই বর্ধিষ্ণু হালদার পরিবারের বর্তমানে সংস্কৃত ত্রিখিলান দুর্গাদালানের চারটি প্রশস্ত আটকোণা স্তম্ভও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

টেরাকোটা মন্দির শিল্প প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত যে সব টেরাকোটা মন্দির রয়েছে এগুলি প্রায় সবই চৈতন্য পরবর্তী অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় ষোল শতকের শেষার্ধ বা তার পরে তৈরি। শিল্পশৈলী অনুযায়ী ভাগও করা হয়েছে আদি, মধ্য ও অন্ত যুগ। বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুযায়ী মধ্যযুগের টেরাকোটা মন্দির বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র্য, কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পশৈলীর নিরিখে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু দুঃখের কথা এই জেলায় এখনও পর্যন্ত যে কটি টেরাকোটা মন্দির টিকে আছে তার ভিত্তিতে টেরাকোটা শিল্প যে খুব উঁচু মানে পৌছেছিল তা বলা যায় না।

ইট বা টালিকে কয়লায় পুড়িয়ে পাকা করার রীতি চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত কাঁচা ইটকে কাঠে পোড়ানো হত। স্বাভাবিক কারণে ইটগুলো হত পাতলা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। পাল এবং গুপ্ত যুগেও বাংলায় এই পাতলা ইট বা টালির ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তী মুসলিম, বৃটিশ এমনকি চলতি শতকের গোড়ার দিকের মন্দিরেও কাঠে পোড়ানো পাতলা ইট ব্যবহৃত হয়েছে। পুরাকীর্তির মধ্যে না পড়লেও এমনই একটি আটচালা মন্দির [illegible] উল্লেখযোগ্য এর পাতলা ইট এবং দেওয়ালে চুন বালির প[illegible] একটি প্রতিষ্ঠালিপির জন্য। এই শতকেও সনাতন শ[illegible] প্রতিষ্ঠাকালকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটি লক্ষ্মীকা[illegible]-ডায়মন্ডহারবার রাস্তায় বিদ্যাধরপুর গ্রামের আ[illegible] আটচালা গোপীবল্লভের মন্দির, বাংলায় প্রতিষ্ঠা[illegible]

—শ্রী শ্রী শ্রী ধর [illegible] বসু চন্দ্র মিতে শাকে দেবালয় দিয়তে শ্রী নবকু[illegible]। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়

এক্ষেত্রে নেত্র-৩, [illegible] ৩, [illegible] চন্দ্র-১, অঙ্গের বামগতি সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠাবর্ষ দাঁড়ায় [illegible]৩ [illegible] অর্থাৎ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ।

পুরাবস্তুর নিরি[illegible] এক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান। তাম্রলিপির [illegible] কীর্তিকে অক্ষয় করে রাখার

জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতের খাটসারা গ্রামের শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি
ছবি : লেখক

জন্য এর ব্যবহার। বিভিন্ন পুরাসৌধের গায়ে কখনো আলাদা ফলক হিসেবে গেঁথে বসানো হয়েছে। কখনো পলেস্তরায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠাকাল সহ অন্যান্য তথ্য। প্রতিষ্ঠালিপি প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে বাংলায় খ্রিষ্টিয় সতের শতকের আগে ও পরে তৈরি হওয়া অধিকাংশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকের ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ বাংলা। আরো পরবর্তীকালে হরফ ও ভাষা দুটোই মূলত বাংলা যদিও একই সঙ্গে আগের রীতিও পুরোপুরি বাতিল হয় নি। ১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটেশ্বরী গ্রামের একটি চারচালা শিবমন্দিরে (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন) নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পরিচয় পাওয়া গেলেও এই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ১৫ এবং ১৬ শতকে কোন মন্দির তৈরি হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না প্রধানত প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলোতে এই জেলায় কিছু মন্দিরের উল্লেখ থাকলেও এবং বিক্ষিপ্তভাবে ভূগর্ভস্থ কিছু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেলেও এগুলির আনুমানিক প্রতিষ্ঠাকাল নিয়েও বহুমত রয়েছে। ১৭ শতকের মন্দিরের সম্ভবত একমাত্র উদাহরণ এই জেলার রাজপুরের আনন্দময়ী অন্যমতে অন্নপূর্ণার মন্দির যা এই মুহূর্তে প্রায় নিশ্চিহ্ন, সেখানেও কোন প্রতিষ্ঠা ফলকের কথা জানা নেই, সুতরাং এই জেলায় মন্দির প্রতিষ্ঠালিপির প্রসঙ্গ উঠলে তা আঠার এবং উনিশ শতকের মন্দির হিসেবেই দেখতে হবে এবং তা নিঃসন্দেহে চালা অথবা রত্ন মন্দির এবং এটা স্বীকার্য যে প্রতিষ্ঠালিপি যুক্ত মন্দিরের সংখ্যাও এ জেলায় খুবই কম।

মন্দির ছাড়াও লিপি দেখতে পাওয়া যায় বিগ্রহ এবং বিগ্রহরূপী শিলাখণ্ডে। দক্ষিণ শিবগঞ্জে (পাথরপ্রতিমা) মৃদঙ্গভাঙা নদীগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত চর্তুমুখ চতুষ্কোন শিবলিঙ্গের গায়ে উৎকীর্ণ কয়েক সারি লিপির অস্তিত্ব এখনো বোঝা যায় তবে তা অবহেলায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, এখনো পাঠোদ্ধার হয়নি। এই পাথরখণ্ডটির নামেই পাথরপ্রতিমার নামকরণ।

মন্দিরবাজার থানার টেটিবেড়িয়া গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে কাঠের বংশীধারী কৃষ্ণের পদ্মাসনে উৎকীর্ণ পুরনো বাংলা অক্ষরে প্রতিষ্ঠাতার নাম—সেবাৎ রামশাগর বন্দপাধ্যয় বংশতালিকা, বিগ্রহশৈলী ও এই ধরনের হরফের ব্যবহার মূর্তিটির প্রাচীনত্বকে ইঙ্গিত করে।
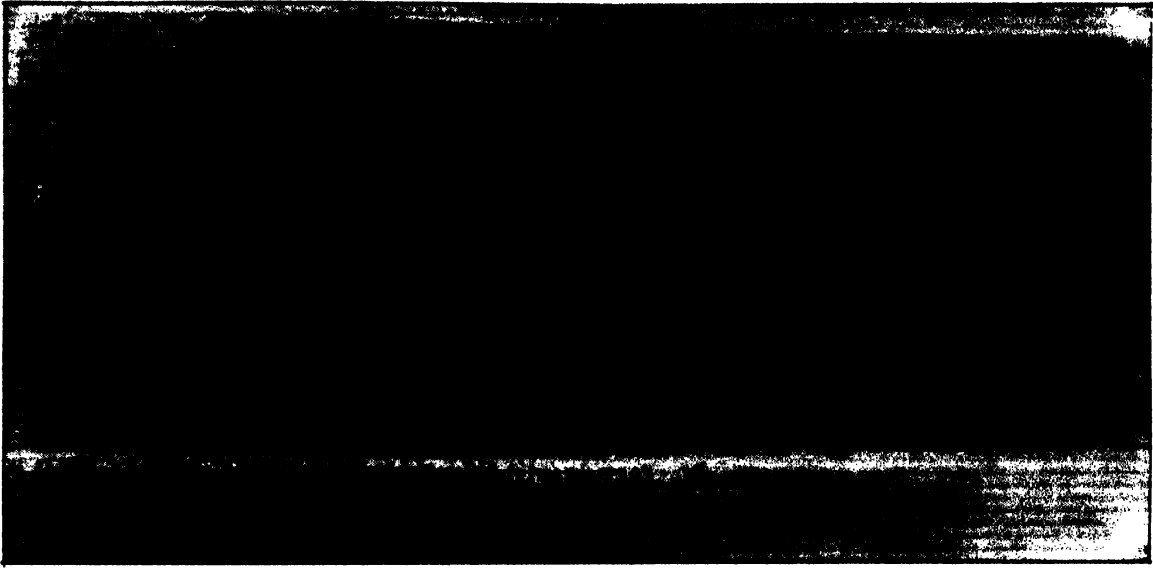
ডায়মন্ডহারবার থানার পারজানা গ্রামের বিরল বাংলা মসজিদ লিপি — *ছবি : লেখক*

নূরপুর-রায়চক রাস্তায় গোয়ালারা-গোবিন্দপুর বাসস্টপে নেমে উত্তরে ১৫ মিনিট হাঁটাপথে ডায়মন্ডহারবার থানার পারজানা গ্রাম। গ্রামের ১৩১৮ সাল অর্থাৎ ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দুই গম্বুজ ও ছয় মিনার পাকা মসজিদটি পুরাকীর্তির মধ্যে না পড়লেও এটি উল্লেখ্য এর প্রতিষ্ঠালিপির জন্য। এই জেলায় মুসলিম ধর্মীয় পীঠে প্রতিষ্ঠালিপির ব্যবহার বিরলই বলা চলে। সিমেন্টের কালো প্লেটে বাংলা অক্ষরে প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ।

—প্রতিষ্ঠাতা আল্লা হু আকবর

মোঃ ভূতই খাঁন ওরফে হানিফ খাঁন পারজানা পত্তন তাং সন ১৩১৮ সাল	রাজমিস্ত্রী সেখ রতন পত্তনদার
আকামত তাং সন ১৩২১ সাল তাং ২০শে শ্রাবণ ১৪ই রমজান	কচিমদ্দিন খাঁ মেরামতদার

পূর্ণ মেরামতী কার্য্য তাং ৫ই জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৫৭ সাল

প্রতিষ্ঠাতা সেইসঙ্গে মসজিদ শিল্পীর নামের ব্যবহার এখানে লক্ষ্য করার মতো। প্রতিষ্ঠালিপির মাধ্যমে স্থপতি, শিল্পী, তাঁদের বাসস্থান, প্রতিষ্ঠাকাল ও পুরাসৌধের বিভিন্ন রীতিপ্রকরণের কথা জানতে পারা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির উপাদান প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় যে অপেক্ষাকৃত পুরনো মন্দিরগুলোতে প্রতিষ্ঠাফলক মূলত পোড়ামাটির, এছাড়াও মন্দিরের গায়ে পাতলা, ছোট ইটের ওপরও লিপি খোদিত হয়েছে, পাথরে খোদাই-এর ব্যবহার এই জেলায় বিরলই বলা চলে আর তুলনায় কম পুরনো মন্দিরের দেওয়ালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিপি-ফলক গাঁথার বদলে পলেস্তরায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে মন্দির সংক্রান্ত তথ্য। মন্দিরলিপির সনাতন পদ্ধতি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে সাংকেতিক শকাঙ্ক রীতি।

কিছু উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি

বিষ্ণুপুর থানার শুকদেবপুর গ্রামে পাল ও সিংহ (বর্তমানে ঘোষ) পরিবারের দুটি করে মাঝারি আটচালার শিবমন্দির বর্তমানে জীর্ণ ও পলেস্তারা ওঠা। পাল পরিবারের পশ্চিমের মন্দিরটির প্রবেশ দরজার গোড়ায় দুদিকে পোড়ামাটির একটি করে মাঝারি উচ্চতার দ্বারপালের মূর্তি লক্ষণীয়। দুটি মূর্তিই ক্ষয়প্রাপ্ত। দ্বারপালের ব্যবহার এই জেলায় চট করে নজরে আসে না। এই থানারই জয়রামপুরের খড়্গেশ্বরের আটচালা শিবমন্দিরটির গঠন স্থাপত্যে অভিনবত্ব থাকলেও তা পুরাকীর্তির মধ্যে পড়ছে না। গড়িয়া থেকে বোড়াল যাওয়ার রাস্তায় নতুন বৈদ্যুতিক চুল্লীর গড়িয়া আদিমহাশ্মশানে পাশাপাশি দুটি পূর্বমুখী ছোট আটচালা শিবমন্দির বেশ পুরনো ও জীর্ণ। উত্তরদিকের মন্দিরটিকে বটগাছের ঝুরি অনেকটা অংশে বেষ্টন করেছে। নতুন করে বসানো শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা—'শ্রী মন্ত সওদাগর প্রতিষ্ঠিত'। জনশ্রুতি হলেও মন্দিরটি প্রাচীন। নরেন্দ্রপুর পেরিয়ে জগদ্দলেও রয়েছে মুখোমুখি দুটি আটচালার শিবমন্দির। অত্যধিক জীর্ণ হয়ে আসলে সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকাল দক্ষিণেরটি ১৮২৭ এবং উত্তরেরটি ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ। রাজপুর ও হরিনাভিতে মজা আদিগঙ্গার ধারে দুর্গারাম কর ও ঘোষ পরিবারের কয়েকটি পুরনো শিবমন্দির ও পরিত্যক্ত দুটি দোলমঞ্চ চোখে পড়ে। দুর্গারাম কর প্রতিষ্ঠিত আরো একটি জীর্ণ দোলমঞ্চ রাজপুর ভুড়ি পুকুরের ধারে। ফ্যানলাইট ও আয়নিক স্তম্ভবোধিকার অখণ্ড কিছু নিদর্শন এই দোলমঞ্চটিতে কাছাকাছি দক্ষিণপাড়ায় সুবিশাল দুর্গেশ্বরের মন্দির সহ আরো দুটি আটচালার অপেক্ষাকৃত ছোট শিবালয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মা প্রভাবতী দেবী ১৩৪৪ সালে দুর্গেশ্বরের মন্দিরটি সংস্কার করান। হরিনাভিতে শতাব্দীপ্রাচীন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের দুটো ভাঙা মিনার এখনো চোখে পড়ে। মসজিদটি ছিল চারমিনার ও এক গম্বুজ। বারুইপুরের দিকে পঞ্চবটিতে আনুমানিক ১২৬৬ সালে তৈরি অন্নপূর্ণা, ১২৫৮-এ পঞ্চশিবলিঙ্গ ও ১২০৫-এ দুর্গারাম কর প্রতিষ্ঠিত বিমলা কালীর মন্দির ছাড়াও কালীমন্দিরের দুপাশে মুখোমুখি দুটি ছোট আটচালা শিবমন্দির স্থাপত্যগত দিক থেকে কিছুটা উল্লেখযোগ্য। সাগরদ্বীপে হরিণবাড়ির কাছে সাগর থানার অন্তর্গত নরহরিপুরের শিবমন্দিরটি ছোট হলেও গঠন ভঙ্গিটি লক্ষ্য করার

মতো। ডায়মন্ডহারবার থানার সরিষা গ্রামে রয়েছে দুটি সুবিশাল আটচালা মন্দির, একটি দক্ষিণাকালীর অন্যটি মদনগোপালের।

মন্দির স্থাপত্যরীতি প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে অধিকাংশ চালা মন্দিরগুলির গর্ভগৃহের ছাদ চারদেওয়ালের কোণে Pendentive বা লহরার বিন্যাস করে গম্বুজের আকারে তৈরি। শুধু গম্বুজ নয় Vault-এর আকারেও তৈরি হয়েছে গর্ভগৃহের ছাদ, মুসলিম পুরাসৌধেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। উদাহরণ মজিলপুরের দেরবেড়িয়ার আটচালা রাজরাজেশ্বর ও খাঁড়ি গ্রামের বড় খাঁন গাজীর মাজার। বেশিরভাগ মন্দির শুধু রোয়াকযুক্ত, তুলনায় অলিন্দযুক্ত মন্দিরের সংখ্যা কম। দ্বিতল মন্দিরের মধ্যে ডায়মন্ডহারবার থানার উত্তর কামারপোল গ্রামের ঘনশ্যাম এবং এই থানারই রামরামপুর গ্রামের শিব ও নারায়ণের মন্দিরের কথা বলা যেতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে নির্দিষ্ট কক্ষে দেবতার অধিষ্ঠান। এই জেলায় যে কটি টেরাকাটা মন্দির চোখে পড়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলংকরণে পোড়ামাটির লতাপাতা, ফুল, জ্যামিতিক নক্সা ও চক্রের ব্যবহারই বেশি। পঙ্খের ব্যবহার কম, খুব কম ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষকে বিষয় করে অলংকরণ তৈরি হয়েছে। নারী-পুরুষের যুগল মূর্তি সম্বলিত পোড়ামাটির মৃৎফলকের (terracotta plaque) একটি উদাহরণ ডায়মন্ডহারবার থানার দক্ষিণ ভাদুড়া গ্রামের সামন্তদের পশ্চিমমুখী আটচালা শিবমন্দির। মন্দিরটির অধিকাংশ মৃৎফলকই সংস্কারের সময় পলেস্তারার আড়ালে চাপা পড়েছে বলে গ্রামবৃদ্ধদের অভিমত। টেরাকোটা মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মগরাহাট থানার বনসুন্দরিয়া, হাসুড়ি, মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর, বিষ্ণুপুর থানার গোবিন্দপুর, বজবজ থানার রাজারামপুর ইত্যাদি। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে ছাঁচ নয়, একটা একটা করে হাতে কেটে পোড়ামাটির ফলকগুলি তৈরি যা তৎকালীন মৃৎ-শিল্পীদের গভীর শ্রম ও শিল্প প্রতিভার প্রশংসনীয় দিকটি তুলে ধরে। নিদারুণ অবহেলায় এই ধরনের অমূল্য শিল্প নিদর্শন আজ বিলুপ্তির পথে। বেশিরভাগ মন্দিরই জীর্ণ, পলেস্তারা খসা, হতশ্রী, সংস্কারহীন। বট, অশ্বত্থ ও আগাছায় পরিবৃত হয়ে কোন রকমে মাটির ওপর টিকে আছে এই যা। এক্ষেত্রে মন্দির দ্রুত ধ্বংসের পথে এগোলেও গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে লাভ হয়েছে এটাই যে বেশিরভাগ সংস্কারহীন মন্দিরে ব্যবহৃত ইটের মাপ, অলংকৃত [illegible], [illegible] অলংকরণের বৈশিষ্ট্য, স্থাপত্যশৈলীর বিভিন্ন [illegible] অলংকরণের অন্যান্য দিক ভালোভাবে লক্ষ্য করা [illegible] আগামী দিনে বাংলার মন্দির-গবেষণায় কাজে লাগবে [illegible], পরিকল্পনাহীন সংস্কারের ফলে মন্দির কোনমতে [illegible] স্থায়িত্ব কমেছে সেই সঙ্গে দেওয়ালের মূল্যবান [illegible] চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়েছে।

এই জেলার বেহা[illegible] যছে একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস ও পুরাকীর্তির নিদর্শন, [illegible] দিক থেকে বেহালা আজ বৃহত্তর কলকাতারই অঙ্গ [illegible] শাসনে বেহালা এই জেলারই আওতায়। এক সময় ক[illegible] অখ্যাত গ্রাম, তখন বেহালার বড়িশা, সরশুনা প্রাচীন [illegible] সমৃদ্ধ [illegible] দরূপে স্বীকৃত ছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত [illegible] কিছু অঞ্চল জল, জঙ্গল, বাঘ ও হিংস্র পশুদের আব[illegible] ছি[illegible] না যায় এই অঞ্চলের দক্ষিণ

হরিনাভির পরিত্যক্ত দোলমঞ্চ *ছবি : লেখক*

শ্যামপুর গ্রামে বাঘের আক্রমণের শিকার হয়েছিল জনৈক বালিকা। গ্রাম-নামের দৃষ্টিকোণে সরশুনার দক্ষিণ পশ্চিমে একটি গ্রামের নাম আজও 'বাঘপোতা' যা তাৎপর্যপূর্ণ।

বেহালার সুপরিচিত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের আদিপুরুষ কেশবরাম রায়চৌধুরী ১৭১৬ খ্রিষ্টাব্দে বিরাটি থেকে বড়িশায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায়চৌধুরীর আমলে বড়িশায় ও তাঁর জমিদারীভুক্ত এলাকায় বহু শিবমন্দির তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বড়িশার সাবর্ণ পাড়ায় আটচালার সুপরিচিত দ্বাদশ শিবমন্দির, দক্ষিণ বেহালা ও সরশুনার মাঝামাঝি শিবমন্দির, আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে পুঁটিয়ারী অঞ্চলে দ্বাদশ শিবমন্দির (৬ টি পুনর্নির্মিত), চোঙার মোন অঞ্চলের কয়েকটি শিবমন্দির ইত্যাদি। সাবর্ণ পাড়ার দ্বাদশ শিবমন্দিরগুলিতে পোড়ামাটির অলংকরণের কিছু নিদর্শন এখনো চোখে পড়ে। বড়িশায় উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে তৈরি দত্ত পরিবারের ছটি আটচালা শিব মন্দিরও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বেহালা অঞ্চলের আর একটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি সাবর্ণ পাড়ার সুবিখ্যাত 'সাজার আটচালার' কয়েকটি ছাদহীন, পরিত্যক্ত ডোরিক রীতির স্তম্ভ। সরশুনা অঞ্চলে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের তৈরি সুবিখ্যাত রায়গড়-দুর্গের কথা গবেষকরা উল্লেখ করলেও তার কোন নিদর্শন বর্তমানে দেখা যায় না। 'সরশুনা' নামটিও স্থান নাম সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

মহেশতলা অঞ্চলেও রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন কিছু শিবালয়, এর মধ্যে উল্লেখ্য—চট্টকালিকাপুরের রায়েদের জোড়া শিব মন্দির,
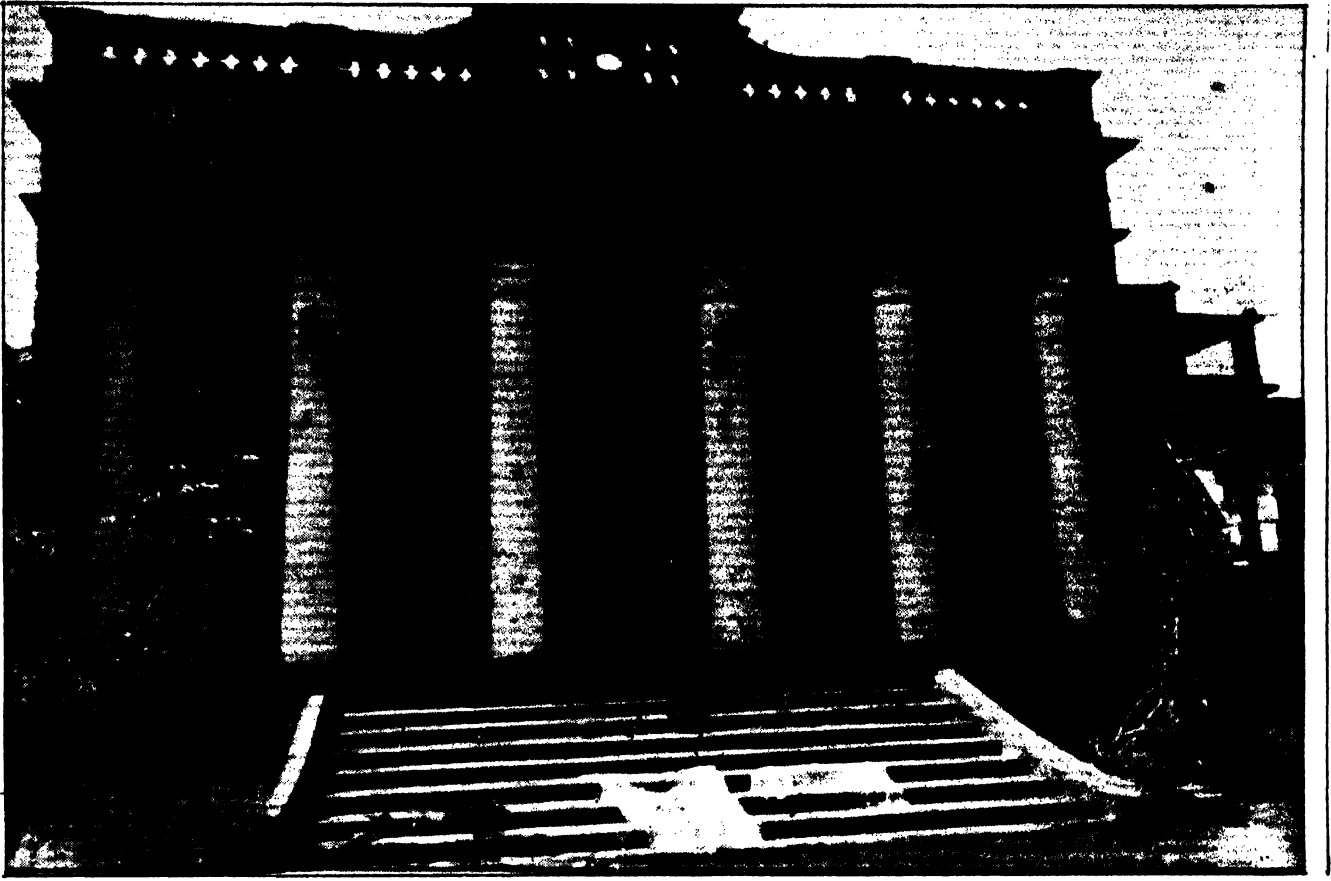
বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাদালান ছবি : লেখক

'ব্যানার্জী হাটের' পরিচয়বাহী সুপরিচিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জোড়া শিব মন্দির ইত্যাদি।

সবশেষে আসি মন্দির অলংকরণের উপাদান প্রসঙ্গে। খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত মূলত ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ামাটি। বৃটিশ যুগে বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীতে পোড়ামাটির বদলে চুন-বালি বা চুন-সুরকির অলংকরণ বেশি করে ব্যবহৃত হতে থাকে। চুন-বালির অলংকরণ আগেও ব্যবহৃত হত। তবে ইউরোপীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের প্রভাবে সেইসঙ্গে পাথর ও পোড়ামাটি শিল্পের ব্যবহার কমে আসলে চুন-বালির ব্যবহার আবার নতুন করে শুরু হয়। এছাড়াও এই জেলার বেশ কিছু দেবালয়ে পলেস্তারা সেইসঙ্গে অলংকরণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের মিহি চুন বা পঙ্খের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় যা অন্যান্য জেলাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। যতদূর জানা যায় আগে নদী ও সমুদ্রের লোনা জলে উৎপন্ন গাজরের মতো দেখতে এক ধরণের শামুকের খোলা পুড়িয়ে (যার প্রচলিত নাম 'জোংড়া') জোংড়া চুন তৈরি হত। এছাড়াও সাধারণ শামুক, গুগলি ও ঝিনুক থেকেও তৈরি হত বাখারি চুন যা গাঁথনি ও পলেস্তারার কাজে লাগত। আলাদা সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল চুন সরবরাহের জন্য যাদের বলা হত চুনারি সম্প্রদায়। নিমপিঠের লাগোয়া সাহজাদাপুর গ্রামের নস্কর পাড়ায় সুপরিচিত প্রত্নস্থল মঠবাড়ির লাগোয়া পুকুর পাড়ে বেশ খানিকটা নিচে প্রচুর আধপোড়া শামুক সহ একটি চুনের স্তূপ দেখেছিলাম, এরই অদূরে বাগানে মাটির নিচে ইটের গাঁথুনির অস্তিত্ব আছে বলে গ্রামবৃদ্ধদের অভিমত।[২৫] চুনের ব্যবহার সম্ভবত এই কারণে। এইভাবে চুন তৈরির রীতিও প্রাচীন। উত্তর ২৪-পরগনার বেড়াচাঁপায় উৎখণিত গুপ্তযুগের মন্দিরটি তৈরিতে গাঁথনির পলেস্তারা হিসেবে যে শামুক পোড়ানো চুন ব্যবহার করা হয়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিহি চুন বা পঙ্খের অলংকরণ এই জেলার বেশ কিছু মন্দিরে, দুর্গাদালানে আজো লক্ষ্য করা যায়। একটি উদাহরণ ডায়মন্ডহারবার থানার উত্তর কামারপোল গ্রামের রাধাকান্ত মন্দির। পঙ্খের কাজের এত সুন্দর উদাহরণ এই জেলায় খুব কমই চোখে পড়ে। ফলতা থানার মালা গ্রামের জরাজীর্ণ দুর্গাদালানটিতেও পঙ্খের অলংকরণ লক্ষ্যণীয়। বারুইপুর রবীন্দ্রভবনের উল্টোদিকে রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গাদালানটিও পঙ্খ সেই সঙ্গে ইউরোপীয় স্থাপত্যের এক আদর্শ উদাহরণ। শুধু শহর কলকাতা নয় ঔপনিবেশিক স্থাপত্য ও অলংকরণ শৈলী যে এই জেলাতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল তা দেখলেই বোঝা যায়। এই জেলার বিভিন্ন বসতবাড়িতেও এই প্রভাব চোখে পড়ে। একটি উদাহরণ সাউথ গড়িয়ার বিশিষ্ট নট ও চিত্রাভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হতশ্রী বাড়িটি।

এই জেলায় পীর বা গাজী সাহেবের আবির্ভাব ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লোকজীবনে তাঁদের প্রভাবও এক উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়েছে। তৎকালীন বাংলায় বেশ কয়েকজন পীরের মধ্যে অন্যতম মানিক পীর, সত্য পীর, কাউয়া পীর ও দরিয়া পীর। এরমধ্যে দক্ষিণ

ডায়মন্ডহারবার থানার পঞ্চগ্রামে ধ্বংসপ্রাপ্ত বড়খানগাজীর থান | *ছবি : লেখক*

২৪-পরগনায় মানিক ও সত্য পীরের প্রভাব বেশী যেমন সরিষাদহ, মহেশতলায় মানিক পীরের দরগা। আর সত্য পীর কালক্রমে হিন্দুদের কাছে গৃহদেবতা সত্যনারায়ণে রূপান্তরিত হয়েছেন। এ ছাড়াও জায়গা বিশেষে এই জেলায় আরো কিছু পীরের পরিচয় পাওয়া যায়—ভাঙর পীর (ভাঙর), পীর ইসমাইল শা (মরিচা), পীর গোরাচাঁদ (বামুনিয়া), পীরসাহেব (হরিনাভি, নিজামতলা) ইত্যাদি। এই পীরসাহেবদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দরগা, থান, মাজার যার কয়েকটি পুরাকীর্তির আওতায় পড়ে। সংগ্রামপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত দরগার কথা আগেই বলেছি। মল্লিকপুর রেলস্টেশনের পূবদিকে পীর হাবিব আবদুল্লা আল আত্তাসের দরগাটি ১৩২৬ হিজরি বা [illegible] সালে তৈরি, ফলে পুরাকীর্তি হিসেব গ্রাহ্য না হলেও এর গম্বুজ [illegible] কোণের মিনার আকর্ষণীয়। ইয়েমেন থেকে পীরসাহেব এখানে [illegible] এসেছিলেন এবং ইয়েমেনে ফিরেই তিনি দেহান্তরিত হন। সেই হিসেবে এটি [illegible] মাজার হয় নি, হয়েছে পীরের আস্তানা। ক্যানিং [illegible] ঘুটিয়ারী শরিফের ইতিহাসটি সুপ্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও পীর [illegible] বর্তমান মাজার বা সমাধি-সৌধটি সম্ভবত এই শতকে [illegible] গম্বুজের গঠনটি আকর্ষণীয়। যতদূর জানা যায় খ্রিস্টিয় [illegible] গোড়ার দিকে পীরসাহেব পঞ্জাব থেকে নানা পথ [illegible] ঘুটিয়ারীর অন্তর্গত নারায়ণপুর ও পরে কুয়ালীর (সাপুর [illegible] বেঁকিয়ে যাওয়া কেওড়া গাছের নীচে আসন পাতেন। এ [illegible] বর্তমান 'ঘুটিয়ারী শরিফে' চলে আসেন। 'শরিফ' নাম [illegible] ঘুটিয়ারীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাংলায় তখন চলছে মু[illegible] রাজত্বকাল।

এই ধরনের গাজী সাহেবের থান বা মাজার এই জেলার বহু গ্রামে চোখে পড়ে। থানগুলির অধিকাংশই মাটির তবে অনেক ক্ষেত্রে বট অশ্বত্থের শিকড় বা ঝুড়ির আবেষ্টনে পুরনো পাতলা কাঠে পোড়ানো ইটের সুস্পষ্ট কোন অবয়ব লক্ষ্য করা যায় যা লৌকিক ইতিহাস ও পুরাকীর্তির নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ। ডায়মন্ডহারবার থানার পঞ্চগ্রামে ঝুরি ও শিকড় বেষ্টিত একটি পাতলা ইটের নাতি উচ্চ অবয়ব লক্ষ্য করেছি যা বড় খান গাজীর থান বলে পরিচিত। প্রবাদ বাংলার মাটিতে প্রায় সতেরশ গাজীর অস্তিত্ব। পীর মোবারক গাজী ছাড়াও এই জেলায় আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব—সোনারপুরের সোনাপীর/গাজী, নভাসনের গাজী সাহেব, বাঁশড়ার কালুগাজী, ময়দার বরখান গাজী, গাববেড়িয়ার (লক্ষ্মীকান্তপুর) বামনগাজী, কাকদ্বীপের গাজী সাহেব, সোনারপুর থানার কামালগাজী, জয়নগরের রক্ত খাঁ (বড় খাঁ গাজী), দক্ষিণ বারাশতের শতর্ষা গাজী ইত্যাদি। এই জেলায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)-এর রাজত্বকালে একসময় বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের বান ডেকেছিল। পরবর্তীকালে শের শাহ বাংলাদেশ দখল করলে তৎকালীন ২৪-পরগনার এই নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। অন্যমতে খ্রিষ্টিয় পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশের শহর, গ্রামে 'দরগা' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় এবং দরগাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্মের প্রসার চলতে থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণ বঙ্গে পীরদের উপস্থিতি অন্য জেলার থেকে বেশি লক্ষ্য করা যায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবত সমুদ্র

ও নদী বন্দর থাকার ফলে দক্ষিণবঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ-এ পীরসাহেবদের যাওয়া আসার সুবিধে হয়েছিল।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার প্রত্নসম্পদ আজ অনেকটাই প্রকাশিত, আলোচিত। তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে এই জেলায় বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক প্রত্ন সংগ্রহশালা, রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালা, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম, কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম ও অসংখ্য পত্র-পত্রিকায়। বাংলাদেশের বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সংগ্রহশালাতেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু স্থান পেয়েছে। বিগত দশকের শেষের দিকে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের উদ্যোগে এই জেলায় বিজ্ঞানভিত্তিক উৎখনন ও অনুসন্ধান হয়েছে চার জায়গায়—আটঘরা, মাহিনগর বোড়াল ও ঘোষের চক (মঠবাড়ি)। এর আগে ১৯৬৪-৬৫ নাগাদ একবার দেউলপোতা থেকে হরিনারায়ণপুর পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও দেউলপোতার কাছে ছোট একটি পরীক্ষামূলক উৎখনন হয়েছিল। উভয় উৎখননেই মূলত আদি ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত নানা ধরনের পুরাবস্তু পাওয়া গেছে। বিশেষ করে একটি বৌদ্ধস্তূপের অস্তিত্বের ইঙ্গিত মিলেছে ঘোষের চক উৎখননে*, পাওয়া গেছে প্রদক্ষিণ পথ যুক্ত ইটের দেওয়াল ও জটিল গাঁথনির অংশ। দু ধরনের ইট/টালির মাপ (৩১×২৫×৫ সেমি³) ও (২১×১৪×৫ সেমি³)। অনুমান এটি ছিল একটি বৌদ্ধ স্তূপ। ঘোষের চক উৎখননে পাওয়া গেছে পুরনো স্থাপত্য ছাড়াও বুদ্ধ ও জৈন মূর্তি। রায়দিঘির আগে পুরকাইচক গ্রাম থেকে সম্প্রতি একটি কালো পাথরের বিরল দর্শন চতুর্মুখ শক্তি শিবলিঙ্গ পাওয়া গেলেও তা চুরি গেছে। কঙ্কণদিঘি গ্রামের মাটির নীচে একাধিক প্রত্নক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই প্রত্নক্ষেত্রগুলি হোল পিলখানার বাড়ি, শ্বেতরাজার টিপি, মঠবাড়ি-মহা দিঘি ইত্যাদি। কঙ্কণদিঘির পরেই রায়দিঘি, মধ্যে মণি নদী। একাদশ-দ্বাদশ শতকের বহু মূল্যবান পুরাবস্তু এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে। পুরাবস্তুর মধ্যে কালোপাথরের বুদ্ধ, জৈন, মহিষমর্দিনী, বিষ্ণু, পোড়ামাটির ফলক, থালা, বাটি ইত্যাদি। অনুমান এখানে একটি প্রাচীন জনপদ ছিল। এই জেলায় প্রাচীন মানব-সংস্কৃতির পরিচয় পেতে কঙ্কণদিঘি ছাড়াও আরো কয়েকটি জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন দরকার। জেলার দুর্গম জায়গাগুলো আজ ততখানি দুর্গম নয়, রাস্তাঘাট হয়েছে, যান চলাচল বেড়েছে, ফলে প্রত্নানুসন্ধানের কাজও সহজতর হয়েছে। এই জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল সহ আরো কিছু দুর্গম জায়গায় প্রত্ন সৌধ কিছু কিছু ছড়িয়ে আছে বলে জানা যায় যা প্রাচীন কোনও জনবসতির ইঙ্গিত দেয়। এই অনুসন্ধানের কাজ এখনো বাকি। দক্ষিণ ২৪-পরগনার প্রত্নসম্পদ শুধু আদি গঙ্গার মজা খাত বা অববাহিকা বরাবর আবিষ্কৃত ফেলে আসা কিছু যুগের স্মারকবস্তু নয়, কয়েকশো বছর আগের হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান প্রত্নসৌধ ও সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক উপাদান প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান গুরুত্ব দাবী করে। একশ থেকে দুশ আড়াইশ বছরের বেশ কিছু দেবালয় এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই ধরনের গ্রামগুলোর সাংস্কৃতিক ইতিহাসটিকে সেই হিসেবে তুলে আনা দরকার যা এই জেলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে। গ্রামের কিছু কিছু পরিবারে এখনও পুরনো পুঁথি, দলিল দস্তাবেজ ও হস্তশিল্পের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রাচীন বঙ্গলিপির নিদর্শন ও ইতিহাস সম্বলিত এই ধরনের কাগজ পত্রের উপযুক্ত সংরক্ষণ দরকার। এই জেলায় বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ দেবালয়ের ওপর লেখা গ্রামীণ কবিদের কবিতা সম্বলিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া যায়। এইগুলিও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠাতা ছাড়াও তৎকালীন মন্দির শিল্পীদের নাম যে অর্থে গুরুত্বপূর্ণ, সেই একই অর্থে বাংলার প্রাচীন কবিদের অনুসরণে মূলত পয়ার ছন্দে লেখা এই ধরনের গ্রামীণ কবিদের রচনাও জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করবে। জেলার আর এক ধরনের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন মূলত গৃহদেবতা হিসেবে পূজিত পাথর, ধাতু ও কাঠের কিছু বিগ্রহ। এই বিগ্রহের তালিকায় কৃষ্ণ, রাধা জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ছাড়াও ধাতুর দুর্গা সহ অন্যান্য বিগ্রহ। মাটির তলা থেকে পাওয়া প্রাচীন মূর্তি ভাস্কর্যে বা শিলাখণ্ড গৃহদেবতা হিসেবে অনেক পরিবারে বা গ্রামের খোলা জায়গায় বা মন্দিরে পূজিত। ১১৯০ সালের চিঠাতেও কিছু পরিবারে এই ধরনের প্রাচীন বিগ্রহের সন্ধান মেলে। ..... পুরনো নথি সেই সঙ্গে শিল্পশৈলীর অনুসরণে এই ধরনের প্রাচীন বিগ্রহের একটি তথ্যনিষ্ঠ তালিকাও তৈরি করা প্রয়োজন। জেলায় কয়েক শতকের প্রাচীন পারিবারিক দুর্গোৎসবও প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গোৎসবের সনাতন ঐতিহ্য শুধু নয়, শতাধিক বছরের প্রাচীন ধাতুর দেবী দুর্গার বিগ্রহও অন্যতম মূল্যবান পুরাবস্তু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। বহড়ুর ভঞ্জ পরিবারে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে অষ্টধাতুর দুর্গাপ্রতিমাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মূর্তিটি নিত্যপূজিত। বহড়ুর দক্ষিণ পাড়ায় টিবির হাটে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি ফেলে ভঞ্জদের ঠাকুরদালান। স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে ভঞ্জ পরিবারের দ্বারকানাথ ১২৮৪ সালের ২৬শে আশ্বিন কোলকাতার নতুন বাজারের শিল্পী বক্রেশ্বর প্রামাণিক কে দিয়ে এই দেবী মূর্তিটি তৈরি করান বলে কথিত। এমনই কিছু প্রাচীন দুর্গোৎসব জয়নগর মিত্র পাড়ার স্বর্গত অন্নদাপ্রসাদ মিত্র পরিবারে। দুর্গোৎসবের সূচনা ১১৩৫ বঙ্গাব্দে। দেবী পূজায় মোষ বলি দেওয়ার রীতি এই পরিবারে ছিল। পারিবারিক বড় লোহার কাতানটিও পুরাবস্তুর বিচারে উল্লেখ্য। কাতানটিতে খোদাই করা আছে প্রস্তুতকারক বাঞ্ছারাম কর্মকারের নাম, সালটাও দেওয়া আছে ১১৩৫। ঘাটেশ্বরের বসু, লক্ষ্মীকান্তপুরের পূততুন্ড, বরদার (ডায়মন্ডহারবার থানা) বসু পরিবারের শতাব্দী প্রাচীন দুর্গোৎসবে ব্যবহৃত কাতান এখনো পরিবারে রাখা। প্রসঙ্গত জেলার অন্যতম প্রাচীন একটি দুর্গাপূজার উদাহরণ—মজিলপুরের দত্ত পরিবার। প্রায় ৩৫০ বছর ধরে এই পরিবারে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে বলে জানা গেছে।[২৬]

লৌকিক বেশ কিছু দেবদেবীও এই জেলার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে পূজিত হতে দেখা যায়। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর বাংলার লৌকিক দেবতা সহ অন্যান্য গ্রন্থে লৌকিক দেবতাদের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এর বাইরেও নতুন সংযোজন হিসেবে আরো কিছু দেবদেবীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামভিত্তিক পর্যালোচনায় এই ধরনের লৌকিক দেবতার ওপর গবেষণাও প্রয়োজন, কারণ প্রত্নতত্ত্বের সীমারেখায় আর একটি নতুন ধারাও ঢুকে পড়েছে যার নাম লৌকিক প্রত্নতত্ত্ব (Ethno-Archaeology)। জেলার লোকায়ত জীবনে এমনই কিছু লৌকিক দেবদেবীর নাম—পঞ্চানন, দক্ষিণরায়, বনবিবি, ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ গোসাবায় এসেছিলেন ১৯৩২-এর ২৯শে ডিসেম্বর। হ্যামিল্টন সাহেবের আমন্ত্রণে। কাটিয়েছিলেন ২ টো দিন, তিনটে রাত, কাঠের বেকন বাংলোয়। রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত এই ঐতিহাসিক বেকন বাংলো সেইসঙ্গে হ্যামিল্টনের বাংলোর ইতিহাসগত গুরুত্ব রয়েছে। সেই

*সুধীন দে : নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন, বারুইপুর, ১৯৯৪।
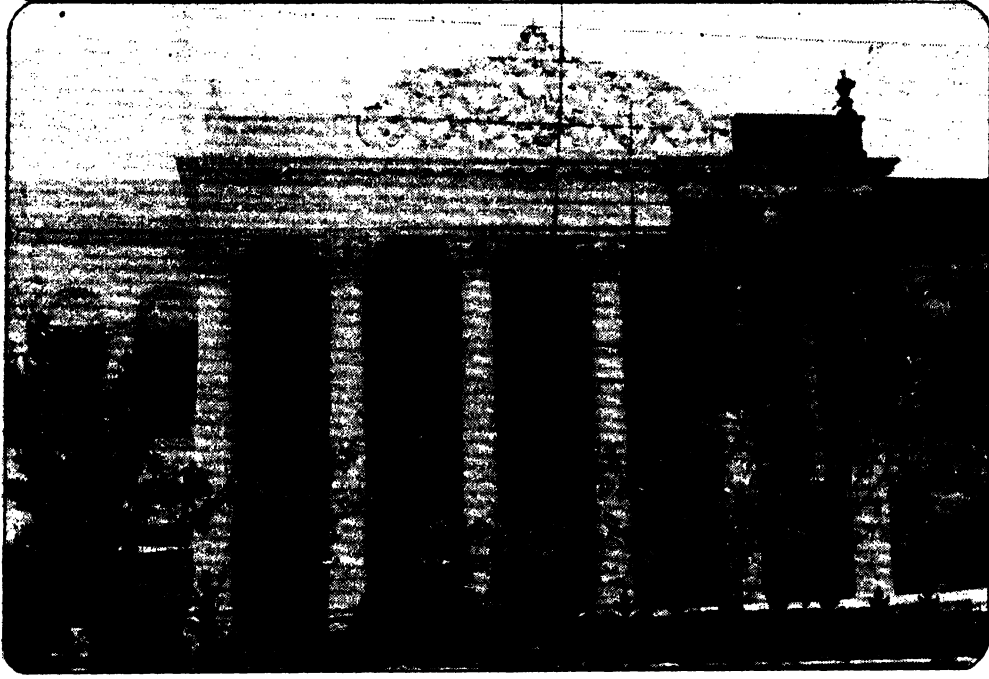
দক্ষিণ গড়িয়ার বিশিষ্ট নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছবি : হরিকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

হিসেবে দ্রুত সংস্কার ও সংরক্ষণ দরকার। ক্যানিং-এ অযত্ন, অবহেলায় পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর দ্বিতল জরাজীর্ণ হোটেল কুঠিটির স্থাপত্যগত কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষ করে খিলানের ব্যবহার আকর্ষণীয়। নীলকর সাহেবদের পুরনো নীলকুঠি এই জেলায় বেশ কয়েকটি থাকলেও, বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণে তৈরী এই ধরনের নীলকুঠিগুলিও পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এরও তালিকা তৈরী দরকার। শতাধিক বছরের পুরনো কারুকার্যখচিত কাঠের আসবাবপত্রও অনেক বর্ধিষ্ণু পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের মূল্যবান দারুশিল্পকেও আলোকচিত্র ও বর্ণনায় তুলে আনা দরকার। মন্দিরবাজার থানার কাদিপুকুর গ্রামের শতাধিক বছরের পুরনো অসাধারণ শিল্পসুষমায় তৈরি stucco-র কিছু পরী ও নারী মূর্তি অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেলায় এই ধরনের বিরল শিল্পশৈলীর দ্রুত সংরক্ষণ [illegible] দরকার মহেশপুরের বিলুপ্তপ্রায় দারুভাস্কর্য সেই [illegible] বিবর্ণ দেওয়াল চিত্রের।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা [illegible] সংগ্রহশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রাহকগণ :

বেহালার রাজ্য [illegible] ১নং সত্যেন রায় রোড কলিকাতা-৩৪

ভুবন মিউজিয়াম-[illegible]

ঠাকুরপুকুরের [illegible] (জোকা)—ব্রতচারীগ্রাম, ঠাকুরপুকুর, পোঃ জোকা, [illegible]।

বারুইপুর সুন্দরবন [illegible] সংগ্রহশালা—পোঃ বারুইপুর, দঃ ২৪-পরগনা।

ত্রিপুরাসুন্দরী সংগ্রহশালা, [illegible], গড়িয়া, দঃ ২৪-পরগনা।

ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহশালা, বোড়াল, দঃ ২৪-পরগনা।

বারুইপুরের রামনগর গ্রন্থাগারে কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালা—গ্রাম+পোঃ রামনগর; বারুইপুর, দঃ ২৪-পরগনা।

জয়নগরের 'দক্ষিণীপুরাকীর্তি ও বরেণ্যস্মৃতিকক্ষ সংগ্রহশালা' শান্তিসংঘের লাইব্রেরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মজিলপুরে প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা— পোঃ জয়নগর-মজিলপুর, দঃ ২৪-পরগনা।

শ্রীবিমল চক্রবর্তীর কয়েন মিউজিয়াম, মজিলপুর,—দঃ ২৪-পরগনা।

নিমপীঠ রামকৃষ্ণমিশন সংগ্রহশালা—নিমপীঠ, মজিলপুর, দঃ ২৪-পরগনা।

বামনখালি প্রগতিসংঘের সংগ্রহশালা—প্রযত্নে অনিল খাঁড়া, বামনখালি—সাগর দ্বীপ, দঃ ২৪-পরগনা।

তুলসী ভট্টাচার্য্য সংগ্রহশালা, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, দঃ ২৪-পরগনা।

সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি ও পুরাকীর্তি সংগ্রহশালা—ডায়মন্ডহারবার (নিউটাউন) দঃ ২৪-পরগনা।

খাড়ী-ছত্রভোগ আঞ্চলিক সংগ্রহশালা—দীনবন্ধু নস্কর, খাড়ী, দঃ ২৪-পরগনা।

শ্রীজগন্নাথ মাইতির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণমিশন সংগ্রহশালা, মনসা দ্বীপ (সাগর), দঃ ২৪-পরগনা।

গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা, প্রযত্নে-নরোত্তম হালদার, কাকদ্বীপ, দঃ ২৪-পরগনা।

নৃসিংহ আশ্রম, কাকদ্বীপ—দঃ ২৪-পরগনা। (নৃসিংহ শিলা ও প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি আছে)।

নামখানা-নারায়ণপুর—কপিল বিমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দরবন সংগ্রহশালা, প্রযত্নে ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানা, দঃ ২৪-পরগনা।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের যাদবপুরে অবস্থিত—পুরাকীর্তি পরিষদ সংগ্রহশালা, গড়ফা (দঃ ২৪-পরগনা), কলিকাতা-৭৮।

পক্ষীরাজ গোষ্ঠী—জয়নগর-মজিলপুর, দঃ ২৪-পরগনা।

গোপাল ভট্টাচার্য্য—জয়নগর, দঃ ২৪-পরগনা।

রবীন হালদার, আবদালপুর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪-পরগনা।

সুকুমার মিস্ত্রী—মণিরতট, দঃ ২৪-পরগনা।

সুরেন্দ্রনগর হাইস্কুল—জি-প্লট, পাথরপ্রতিমা, দঃ ২৪-পরগনা।

হাতিয়ার পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাহিত্য সংসদ, প্রযত্নে মিহির কান্তি ন্যায়বান—কাশীনগর, দঃ ২৪-পরগনা।

এছাড়া সরিষা, ও ডায়মন্ড হারবারে কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহ আছে।

অন্যান্য সংগ্রহশালা :

চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা, বেড়াচাঁপা—উঃ ২৪-পরগনা।

বালান্দা প্রত্নসংগ্রহশালা, হাড়োয়া,—উঃ ২৪-পরগনা।

চব্বিশপরগনা ইতিহাস পরিষদ, হাবড়া—উঃ ২৪-পরগনা।

গৌরীশংকর দে ও নরেন্দ্রকুমার নাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহ—উঃ ২৪-পরগনা।

কলকাতার ভারতীয় যাদুঘর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (আশুতোষ মিউজিয়াম) ইত্যাদি।

সৌজন্য : দক্ষিণ-চব্বিশপরগনা : আঞ্চলিক-ইতিহাসের উপকরণ—কৃষ্ণকালী মণ্ডল।

তথ্যসূত্র :

১। কালিদাস দত্তের মতে—'এ সকল গ্রন্থে দেখা যায় যে প্রাচীন যুগে ভারতের পূর্ব সমুদ্র তীরবর্তী সমগ্র দক্ষিণ দেশ পাতাল ও রসাতল নামে অভিহিত হইত। তজ্জন্য মহর্ষি বাল্মীকিও রামায়ণে কপিলাশ্রম পাতালে অবস্থিত বলিয়াছেন।....অতীত যুগে পাতাল, রসাতল প্রভৃতি শব্দের অর্থে কেবলমাত্র ভূগর্ভস্থ প্রদেশকে বুঝাইত না। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিকেও বুঝাইত'—দক্ষিণ ২৪-পরগনার অতীত, ১ম খণ্ড, পৃ : ২৫-২৬ বারুইপুর ১৯৮৯

২। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প পৃঃ ৭, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা জানুয়ারি',১৯৯৯

৩। সম্প্রতি আলেকজান্ডারের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে গবেষণা করে গ্রীসের ইপোক্রেটিন হাসপাতালের ডাঃ প্রোপেদিউটিক একটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন যে আলেকজান্ডার গঙ্গার দিকে অগ্রসর হননি শুধু তাঁর সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সেনা বিদ্রোহের জন্য, অন্য কারণে নয়। পি.টি.আই-এর পাঠানো এই সংবাদটি 'প্রতিদিন' পত্রিকায় বেরিয়েছে গত ২৪শে নভেম্বর'৯৭।

......"গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের মৃত্যুর প্রায় ২৩০০ বছর পর চিকিৎসকেরা তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ খুঁজে পেলেন। প্রধানত প্যানক্রিয়াসের রোগ, অতিরিক্ত মদ্যপান ও গুরুপাক খাবার খাওয়ায় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়েছিল। সম্প্রতি হায়দরাবাদে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজির ৩৮ তম বার্ষিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন গ্রীসের ইপোক্রেটিন হাসপাতালের ডাঃ প্রোপেদিউটিক। আলেকজান্ডারের জীবনালেখ্যর উপর গবেষণা চালিয়ে ডাঃ প্রোপেদিউটিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এশিয়া মহাদেশের অর্ধেকাংশেরও বেশি জয় করার পর আলেকজান্ডার প্রচণ্ড অবসাদে ভুগছিলেন। এর প্রধান কারণই হচ্ছে তাঁর দলের মধ্যে সেনা বিদ্রোহ। খ্রি: পৃ: ৩২৭-এ পুরুকে পরাজিত করার পর সেনাবিদ্রোহের দরুন আলেকজান্ডার গঙ্গার দিকে অগ্রসর হতে পারেননি।.....ডা: প্রোপেদিউটিক আলেকজান্ডারের ওপর ২০০০০ পত্রপত্রিকা নিয়ে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্যানক্রিয়াসের রোগেই আলেকজান্ডার মারা গিয়েছিলেন।

৪। Bengal in 1756-57 (Vol.II.P.215-17) by Hirrel

৫। "স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতে ব্যাঘ্রতটীকে বর্তমানকালের বাগড়ী বলিয়া জানিতে হইবে। প্রাচীন ব্যাঘ্রতটী নামটি আধুনিক বাগড়ী-নামে পরিণত হওয়া সরল ও সহজ। সংস্কৃত 'ব্যাঘ্র', 'বগ্ঘ' হয় (বাঙ্গালা বাঘ), 'তটী' ও 'তড়ী' হওয়া অসম্ভব নহে। 'ব্যাঘ্রতটী', 'বগ্ঘঅড়ী' হইতে পারে, তৎপর 'বগ্ঘঅড়ী', 'বাগড়ী' হইতে পারা বিশেষভাবে অনুকূল। এই 'বাগড়ী' অবশ্যই গঙ্গানদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহানা লইয়া গঠিত ছিল। সুন্দরবন যে ব্যাঘ্রের নিবাসভূমি সমুদ্রতটবর্তী ভূমিভাগ তাহা সুবিখ্যাত। এই মত খুবই সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভূগোল—রাধাগোবিন্দ বসাক, পৃ: ৩২৩, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড—বিনয় ঘোষ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮০

৬। Extract from Plate 52, Part 1 & 2, The Provinces of MIDNAPUR, BURDWAN, HOOGLY, BISSUNPOUR. Surveyed in the years 1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774 by Messrs Carter, Douglous, Call, Portsmouth, Martin Richards & Rennel

৭। তবে ছত্রভোগ থেকে সাগর পর্যন্ত কালিদাস দত্তের ম্যাপটির নির্ভুলতা নিয়ে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন

৮। Ref of Govindapur Ins.—Nani Gopal Majumdar—Inscription of Bengal, Vol-III, Rajshai, 1929, P.96.

৯। কালিদাস দত্ত : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৬, বারুইপুর'১৯৮৯

১০। শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী—বিষ্ণুপুরের ইতিবৃত্ত (১৩৫০বঙ্গাব্দ)

১১। "১৯৬০ সালের প্রথমদিকে জেমস মেলার্ট তুরস্কের আনাতোলিয়া উপত্যকা খনন করে নানাধরনের মাটির পাত্র উদ্ধার করেন। পাত্রগুলো কমপক্ষে নয় হাজার বছর আগের তৈরি। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০০ বছর আগে আরো উন্নতমানের হাতে তৈরি পোড়ানো এবং রং দেওয়া মাটির পাত্রও একই জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়।"

—শফিকুর রহমান চৌধুরী : বাংলাদেশের মৃৎশিল্প, পৃ: ৯ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৫

১১। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প, পৃ: ১৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯

১৩। S.C. Mukherjee, Treasures of the State Archaeological Museum West Bengal Vol. I, P.-27, No.1, Directorate of Archaeology, Govt. of West Bengal, January 1991, introduction and Edited by Gautam Sengupta

১৪। Dilip K. Chakraborty, N. Goswami and R.K. Chattopadhyay : Archaeology of Coastal West Bengal : Twenty four Parganas and Midnapur Districts, South Asian Studies, Vol. 10, 1994, P-151

১৫। Ibid

১৬। দীনেশচন্দ্র সরকার—'শিয়ান গ্রামের শিলালেখ', শিলালেখ—তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ: ১১১

১৭। Ref. of Rakshaskhali ins. of Dommanpala—Epigraphia Indica. Vol XXVII, P.P. 119—124 and ibid, Vol. XXX, PP. 42-46

'১১১৮ শকে (১১৯৬খ্রি:) মহাসামন্তাধিপতি, মহারাজাধিরাজ, সামন্তরাজ ডোম্মনপালদেব পূর্বখাটিকাস্থ দ্বারহটিক থেকে এই তাম্রশাসন মারফৎ বামহিত্থা গ্রাম দান করেন। গ্রহীতা ছিলেন, ডোম্মনপালের মিত্র রানক উপাধিধারী বার্ধিনসগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ বাসুদেবশর্মা।'

১৮। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ভারতীয় শীলমোহর, বাণী, ১৩১৩

১৯। কালিদাস দত্ত : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯, বারুইপুর, ১৯৮৯

২০। Dilip K. Chakraborty, N. Goswami and R. K. Chattopadhyay—Op. Cit. P—150

২১। শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চব্বিশ পরগনার মন্দির' বইটিতে (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) বনশ্যামনগরের এই দেউলটির উল্লেখ করেছেন—'দ্বিতীয় দেউলটি পাথরপ্রতিমার প্রায় সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে, বনশ্যামনগরে অবস্থিত। ....এই দেউলটিরও কেবল বাড় অংশটিই অবশিষ্ট আছে। প্রথম আলোকচিত্র গ্রহণের সময় গণ্ডীর একটি অংশ কোনও রকমে টিকে ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং আগাছার উৎপাতে এখন সেই খণ্ডাংশটির বহু ইট ঝরে গেছে। দেউলটির বর্তমান উচ্চতা ২৮ থেকে ৩০ ফিট হবে বলে মনে হয়। আসন বর্গাকার এবং প্রবেশপথ জটার দেউল এবং দেলবাড়ির মতোই সরদালে গঠিত।'

২২। প্রতিষ্ঠালিপির পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদনা—ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মীনা ঘোষ। শ্রীতারাপদ সাঁতরার মতে মন্দিরটি ১২০৬-এর বদলে ১২৭৬ সালে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি। তাঁর পঠিত মন্দিরলিপিটি এরকম —স্মৃত্বা কৃষ্ণপদং বেদখশ্ব
ক্ষৌনীমিতে শকে। নির্ম্ময়ে
শ্রী· ঘনঠাম· শ্রীঘনশ্যাম মন্দিরং
শ্রী জগমোহনে নে ব্রহ্মোচাল। তৎকৃতং
সন ১২৭৬ সাল মুদা

২৩। কালিদাস দত্ত—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৭, বারুইপুর, ১৯৮৯

২৪। অসীম মুখোপাধ্যায়—চব্বিশ পরগনার মন্দির, পৃ: ৬৬, ১৩৭৭, কলকাতা

২৫। জয়নগর থানার উৎখনিত প্রত্নস্থল ঘোষের চক—মঠবাড়ির অদূরে সম্ভবত এই সাহজাদাপুর গ্রামেই পাথরের একটি বুদ্ধমূর্তি ছাড়াও আরো কয়েকটি পাথরের ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছিল বলে জানা যায়।
—'Sahajadpur which lies considerably to the north of Mathbari, a few stone images were found, one of them being a stone Buddha image.'' [Dilip K. Chakraborty, N. Goswami and R. K. Chattopadhyay—Op. Cit. P—148

২৬। প্রভাত ভট্টাচার্য—জয়নগর-মজিলপুরের প্রাচীন দুর্গাপূজা—নব নিম্নবঙ্গ, ৭-১০-৯৭, মজিলপুর

গ্রন্থপঞ্জী :

- কালিদাস দত্ত : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত (১ম ও ২য় খণ্ড), বারুইপুর, ১৯৮৯
- তারাপদ সাঁতরা : পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য : মন্দির ও মসজিদ, কলকাতা, ১৯৯৮
- রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : ভারতীয় শীলমোহর, বাণী, ১৩১৩
- ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলার ভাস্কর্য, কলকাতা ১৯৮৬
- ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত : বাংলার ভাস্কর্য, কৌশিকী, ১৯৯৫
- অসীম মুখোপাধ্যায় : চব্বিশ পরগনার মন্দির, ১৩৭৭, কলকাতা
- ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : লোকশিল্প বনাম ''উচ্চ'' মার্গীয় শিল্প, কলকাতা, ১৯৯৯
- বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (৩য় খণ্ড), কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮০
- অশোক মিত্র : পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১
- গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : বাংলার লৌকিক দেবতা, কলকাতা, ১৯৬৬
- সুধীন দে : নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন, বারুইপুর, ১৯৯৪
- সুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বেহালা জনপদের ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৯৮
- শফিকুর রহমান [illegible] : [illegible]াংলাদেশের মৃৎশিল্প, ঢাকা, ১৯৯৫
- কমল চৌধুরী : [illegible]ক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত, [illegible]কাতা, ১৯৮৭
- Indian Archaeo[illegible] [illegible] review)
- Dilip K. Chak[illegible] [illegible]ami and R. K. Chattopadhyay : [illegible]rchaeology of Costal West Bengal : [illegible]wenty four Parganas and Midnapur Districts, South Asian Studies, Vol [illegible]0, 1994
- D. P. Ghosh [illegible]rchaeological Discoveries in lower [illegible]angetic Valley, Science and Culture, Vol. 23, December, 1957
- Treasures of th[illegible] [illegible]gical Museum, West Bengal, Vol. [illegible] & II, Calcutta, 1991
- Niranjan Gosv[illegible] [illegible]rchaeological Activities in Bengal [illegible]ill 1967, Pratna Samiksha, Vol 2 & [illegible], Directorate of Archaeology & Museums Govt. of West Bengal, Calcutta.
- সাগর চট্টোপাধ্যায় : বাংলার প্রত্নতত্ত্ব : একটি রূপরেখা, লোকশ্রুতি, খণ্ড-১৪, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৮, কলকাতা
- সাগর চট্টোপাধ্যায় : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দেব দেউল : সাম্প্রতিক বীক্ষণ—পশ্চিমবঙ্গ, পর্যটন সংখ্যা'৯২
- তুহিনময় ছাটুই : লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতির দর্পণে পীর, গাজী, বিবি (দ: চ.প.), কলকাতা, ১৯৯৮
- অরুণকুমার মণ্ডল : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বাওয়ালি মণ্ডলবাড়ি, বাখরাহাট, ১৪০২
- ডঃ ভৈরবচন্দ্র মিত্র ও ডঃ গোপালচন্দ্র মিত্র : কৃষ্ণমোহন ও জয়নগর মিত্র পরিবার, কলকাতা, ১৯৮৮
- ধূর্জটি নস্কর : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শৈবতীর্থ, দক্ষিণ বারাশত, ১৯৮৯
- সত্যানন্দ মণ্ডল : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৪
- কৃষ্ণকালী মণ্ডল : দ: চব্বিশ পরগনা : আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, বারুইপুর, ১৯৯৭
- হরেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী : চব্বিশ পরগনার প্রাচীন মুদ্রা, প্রজ্ঞা ১৩৬৬
- ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য : ২৪ পরগনার ভূমি যুগে যুগে, সুদক্ষিণা, হরিনাভি, ১৩৯৭
- নকুড়চন্দ্র মিত্র : বজবজের ইতিহাস অতীত ও বর্তমান, বজবজ, ১৯৯০
- ১২৫ বর্ষের আলোকে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা ১৯৯৪
- ২৪ পরগনা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলন, বারুইপুর ১৯৮৩
- গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র মাসিক পত্রিকা সংকলনের বিভিন্ন সংখ্যা, সম্পাদনা নরোত্তম হালদার
- অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী : জেলা চব্বিশ পরগনার গড়; দুর্গ ও বন্দর সন্ধান, মিলনী, হরিনাভি, ১৩৯৬

প্রকাশচন্দ্র মাইতি

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ প্রস্তর যুগের আলোকে

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে। এই জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বাংলাদেশ, উত্তরে কলকাতা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা, পশ্চিমে হুগলী নদী, এই জেলার আয়তন প্রায় ৯০০০ বর্গ কিলোমিটার এই জেলা মূলত নদী বাহিত পলিমাটি নিয়ে গঠিত। জেলার দক্ষিণের মাটি কিছুটা লবনাক্ত। এই জেলার দক্ষিণে গভীর, অরণ্য যেখানে সুন্দরী, গরান, গর্জন, কেওড়া প্রভৃতি বৃক্ষরাজি এবং জঙ্গলে বাঘ, হরিন বিভিন্ন রকমের সরিসৃপ এবং জঙ্গলের নদীতে কুমীরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই জেলার প্রধান প্রধান নদীগুলি হল—বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, গোসাবা, মাতলা, জামীরা, সপ্তমুখী, বড়তলা প্রভৃতি। এই জেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪০-২০০ সে.মি.। কৃষিজ ফসল গুলির মধ্যে ধান, পাট, বিভিন্ন রকমের ফলমূল এবং শাক সব্জী প্রধান। জেলাটির দক্ষিণে অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ আছে। বছরের সবসময় কমবেশী মাছের যোগানও ভালো।

প্রত্নতত্ত্বের আলোকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা খুবই সমৃদ্ধ তবুও তার আগে এই জেলার ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার—প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়—১৯৭৫ সালে ঢাকা থেকে প্রেস ট্রাস্ট অফ্ ইণ্ডিয়া (P.T.I) মাধ্যমে একটি খবর প্রকাশিত হয়। তাহল বাংলাদেশের উপকূল ভাগ বরাবর একটি নতুন ভূভাগ জেগে উঠেছে। এই ভূভাগ বা ডাঙ্গাটি প্রথম নজরে আসে মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরায়। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়, তারপর শুরু হয় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের গবেষণা। এই ভূ-ভাগটির আয়তন প্রায় ১০ হাজার বর্গমাইল। এই ভূভাগে বর্তমানে কোন জনবসতির চিহ্ন দেখা যায়নি বটে তবে লতা, গুল্ম, বৃক্ষ পুষ্ট এই দ্বীপে প্রাণের স্পন্দন বর্তমান। অদূর ভবিষ্যতে এখানে মানুষের সমাগম ঘটবে এবং অতীত ইতিহাসের হাত ধরে আধুনিক সভ্যতা বিকশিত হবে আশা করা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা থেকে যে সকল প্রস্তরযুগীয় নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে বেশ কিছু মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় যুগের। দেউলপোতা এবং হরিনারায়ণপুর থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের নিদর্শন হল নবাশ্মীয় কুঠার এবং মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ। এই দুই প্রত্নস্থল গঙ্গার পূর্ব পাড়ে আর গঙ্গার অপর পাড়ে মেদিনীপুর জেলা, এই জেলার তমলুক, নাটশাল অপর দুই প্রত্নক্ষেত্র, তমলুকে নবাশ্মীয় যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মোটামুটি নিম্ন গঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে মিল দেখা যায়। এর থেকে ধারণা করা যায় যে প্রাচীন যুগে এই সকল জায়গার মধ্যে যোগাযোগ ছিল এবং সময়কাল অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রায় সমসাময়িক।

প্রখ্যাত ভূতাত্ত্বিক জে. ফার্গুসনের মতে প্রায় ৫০০০ বছর আগে গঙ্গা, পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃতি একদিকে প্রাচীন রাঢ় (বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং অন্যদিকে বরেন্দ্রভূমি (উত্তরবঙ্গ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ ভাগীরথী, পদ্মার অস্তিত্ব ৫০০০ বছরের বেশী নয়। কালক্রমে নিজের আসল গতিপথ পরিবর্তন করেছে বহুবার এবং বছরের পর বছর ধরে আনা পলিমাটি দিয়ে এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে তুলেছে বিশাল এই সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমির সবদক্ষিণের জেলাটি হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই জেলাতে প্রথম শিলাস্তরের সন্ধান পাওয়া যায় প্রায় ৩০০০ ফুট মাটির নীচে। (ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানীরা কলকাতার কাছে ড্রিলিং করে এতথ্য দিয়েছেন)। যেখানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রথম শিলাস্তর এত গভীরে সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দার্জিলিং জেলায় প্রাচীন মাটির স্তরের সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাইট যুক্ত শিলাস্তর এবং কিছু কিছু জেলায় মাইকাসিষ্ট ও কোয়ার্টজাইট শিলা স্তরের প্রাধান্য দেখা যায়। ভূ বিজ্ঞানিরা পরীক্ষামূলক ভাবে মাটির উপর থেকে নিচ অব্দি পলিস্তরের একটি তথ্য দিয়েছেন যা দুর্গাপুর, গলসী, বর্ধমান, রানাঘাটকে একই সরল রেখায় রেখে। রানাঘাটের পলিস্তর প্রায় ১০০০ ফুট নিচ অব্দি। দুর্গাপুরে প্রায় ২৫০ফুট এবং

পোড়ামাটির মূর্তি, দেউল পোতা। রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

বর্ধমানে প্রায় ৫০০ ফুট পর্যন্ত এই তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পলিস্তর এবং শিলাস্তরের একটি আভাস পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে বেশ কিছু প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সংগৃহীত প্রত্নবস্তুগুলি মাটির উপর থেকে পাওয়া গেছে। কোন প্রত্নবস্তুই স্তরবিন্যস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। এই নিদর্শন গুলি বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত হয়েছে। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ক্ষেত্রানুসন্ধানী এই জেলায় অনুসন্ধান কার্য চালান। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের প্রাক্তন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত হরিনারায়নপুর থেকে বেশ কয়েকটি নবাশ্মীয় হাতিয়ার অবিষ্কার করেন। তাছাড়া কাকদ্বীপের ...রিডি... গবেষণা কেন্দ্র, কালিদাস দত্তের সংগ্রহশালা, রাজ্যপ্রত্নতত্ত্ব ... কিছু প্রস্তর যুগের নিদর্শন গচ্ছিত আছে। অন্যান্য ... মধ্যে সুধীন দে, অশোক দত্ত, সাগর চট্টোপাধ্যায়, ... চ...য়, অতুল সুর, কৃষ্ণকালী মণ্ডল, নরোত্তম হালদার, ... নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, কালিদাস দত্ত, দিলীপ চ... ...ক্তিবর্গ। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, আশুতোষ মি... ...য় যাদুঘর এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের (পশ্চিমবঙ্গ ... বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধান কার্যচালানো হয়। রাজ্য ... ...শালায় দেউলপোতা থেকে আবিষ্কৃত সহস্রাধিক ছোট ... গচ্ছিত আছে, যে গুলিকে কয়েকজন (ক্ষেত্রানুসন্ধা... ...গের বলে মনে করেন।

প্রাক্ ঐতিহাসিক ... এর সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক যুগের আবিষ্কৃত নিদর্শন... ...ও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। অবিভক্ত চ... ...লার বিভিন্ন প্রত্নস্থল যেমন হরিনারায়নপুর, চন্দ্রকেতু... ...া, বোড়াল, চকের পাহাড়, মোচপাল, আটঘরা, গোপালপুর, বঙ্গনগর, তুরবান, মিনাখাঁ, কচুবেড়িয়া, বিষ্ণু রামপুর, পাকুলিয়া, মুকুন্দপুর, সরবেড়িয়া, সুন্দরবন, লালগড় থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে উত্তর চব্বিশ-পরগনা জেলার চন্দ্রকেতু গড় হল প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল। এই স্থানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম, এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ উৎখনন কার্য চালান। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর মধ্যে ১নং পর্যায়ে প্রাক্ মৌর্য যুগের লাল প্রলেপ দেওয়া মৃৎপাত্র, হাতির দাঁতের পুঁতি, চিত্রিত গৈরিক রংয়ের মৃৎপাত্র (প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে সন্দেহ আছে) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২নং পর্যায়ে মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের উত্তর ভারতীয় কালো রং-এর পালিশ করা মৃৎপাত্র (NBP.W.) কালো পালিশ করা মৃৎপাত্র (BW), ধূসর রংয়ের মৃৎপাত্র, বিভিন্ন পাথরের তৈরী পুঁতি, তামার তৈরী বস্তু এবং মুদ্রা, পোড়ামাটির মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি।

৩নং পর্যায়ে পরবর্তী শুঙ্গ যুগের প্রত্নবস্তুর মধ্যে ছাপযুক্ত লাল রং এর মৃৎপাত্র, ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা মৃৎপাত্র, মূর্তি, পোড়ামাটির কেক, তামার মুদ্রা।

৪নং পর্যায়ে কুষাণ পোড়ামাটির মূর্তি, ফলক এবং বাঁশ, কাঠ, মাটির টালি দিয়ে তৈরী এবং মাটির দেওয়াল যুক্ত ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

৫নং পর্যায়ে গুপ্ত যুগের স্থাপত্য নিদর্শন, পোড়ামাটির ইট এর সঙ্গে ধূসর ও কালো মৃৎপাত্র, কিছু কিছু মৃৎপাত্রের উপরে ছাপা মারা নক্সা, জ্যামিতিক চিত্র, জীবজন্তুর পোড়ামাটির ফলক, মিথুনযুক্ত পোড়া মাটির ফলক প্রভৃতি।

দেউলপোতা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার উল্লেখযোগ্য এই প্রত্নস্থলটি ডায়মণ্ড হারবারের খুব কাছে। এখান থেকে বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় প্রায় ১১৫৪ টি পাথরের নিদর্শন (মধ্যাশ্মীয় যুগের আয়ুধ বলে কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন) পোড়ামাটির তৈরী লিপিযুক্ত বিভিন্ন আকৃতির প্রত্নবস্তু, এগুলির মধ্যে কোনোটার দুই দিকে প্রাক্-বাংলা অক্ষরের ছাপ স্পষ্ট এবং একদিকে শীলমোহরের ছাপ আছে এগুলির মাপ হল ৫ × ৫ সেমি, ৬ × ৫ সেমি, ৬ × ৬.৫ × ৩ সে.মি, ৬ × ৬ সে.মি., ৮ × ৩.৫ সেমি। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর "New Epigraphic and Palalo graphic Discoveries" প্রবন্ধে বাংলা অক্ষরের বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। দেউলপোতা সহ চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে প্রাপ্ত এই পোড়ামাটির কেকগুলি দেখে উনি এই ক্ষেত্রে বাংলাভাষার তিনটি পর্যায়ের সীমারেখাকেও স্পষ্ট করেছেন সেগুলি যথাক্রমে ৭০০-৮০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩০০ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ, এবং ১৫০০ থেকে ১৭০০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। এই জাতীয় পোড়ামাটির লিপিযুক্ত কেক দেউলপোতা ছাড়াও হরিনারায়নপুর, চন্দ্রকেতুগড় এবং মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গা থেকেও পাওয়া গেছে। দেউলপোতা থেকে আবিষ্কৃত অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে বিভিন্ন রং এর মৃৎপাত্র, পুঁতি, পোড়ামাটির মূর্তি, তামার মুদ্রা, পাথরের তৈরী বস্তু প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

হরিনারায়ণপুর ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অপর উল্লেখযোগ্য প্রত্নক্ষেত্র, এখান থেকে বিভিন্ন রকমের পোড়ামাটির মূর্তি মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ সময়ের শীলমোহর, রৌপ্যমুদ্রা, NBPW, রুলেটেড মৃৎপাত্র, পুঁতি, নব্যপ্রস্তর যুগীয় হাতকুঠার, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে বোঝা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রাগঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগপর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয় হল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় প্রাগ্ ঐতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল কিনা। আলোচনার প্রথমে এই জেলার ভূতাত্ত্বিক গঠন বর্তমান অবস্থান, আয়তন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। এখন মূল বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন বাঁকুড়া, জেলার শুশুনিয়া পাহাড়। মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা, পুরুলিয়া জেলার কংসাবতী, কুমারী ও অযোধ্যা পাহাড় সন্নিহিত অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। রাঢ় বাংলার এই তিন জেলার ভূ প্রকৃতির সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার যথেষ্ট অমিল রয়েছে। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ বলতে ইতিহাস পূর্ব যুগকে বোঝায়। মানুষ এই যুগে মূলত পাথর দিয়ে তার বেঁচে থাকার হাতিয়ার তৈরী করত। তারা অন্য কোন ধাতু ব্যবহার করতে জানতো না। তাই এই যুগকে প্রস্তর যুগ বলা হয়। প্রত্নবিজ্ঞানিরা প্রস্তর যুগকে আবার তিনভাগে ভাগ করেছেন (১) পুরাপ্রস্তর যুগ (এর আবার তিনটি ভাগ নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ) (২) মধ্য প্রস্তর যুগ বা মধ্যাশ্মীয় যুগ এবং (৩) নব্য প্রস্তর যুগ বা নবাশ্মীয় যুগ। ভারতে পুরাপ্রস্তর যুগ মধ্যপ্রস্তর যুগ এবং নব্যপ্রস্তর যুগের সময় কাল যথাক্রমে উচ্চ প্লাইস্টোসিন যুগ এবং এর পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ অনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০০০, ৫০০০০ এবং ১০০০০বছর আগে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা থেকে যে সকল প্রস্তরযুগীয় নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে বেশ কিছু মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় যুগের। দেউলপোতা এবং হরিনারায়ণপুর থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরযুগের নিদর্শন হল নবাশ্মীয় কুঠার এবং মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ। এই দুই প্রত্নস্থল গঙ্গার পূর্ব পাড়ে আর গঙ্গার অপর পাড়ে মেদিনীপুর জেলা, এই জেলার তমলুক,
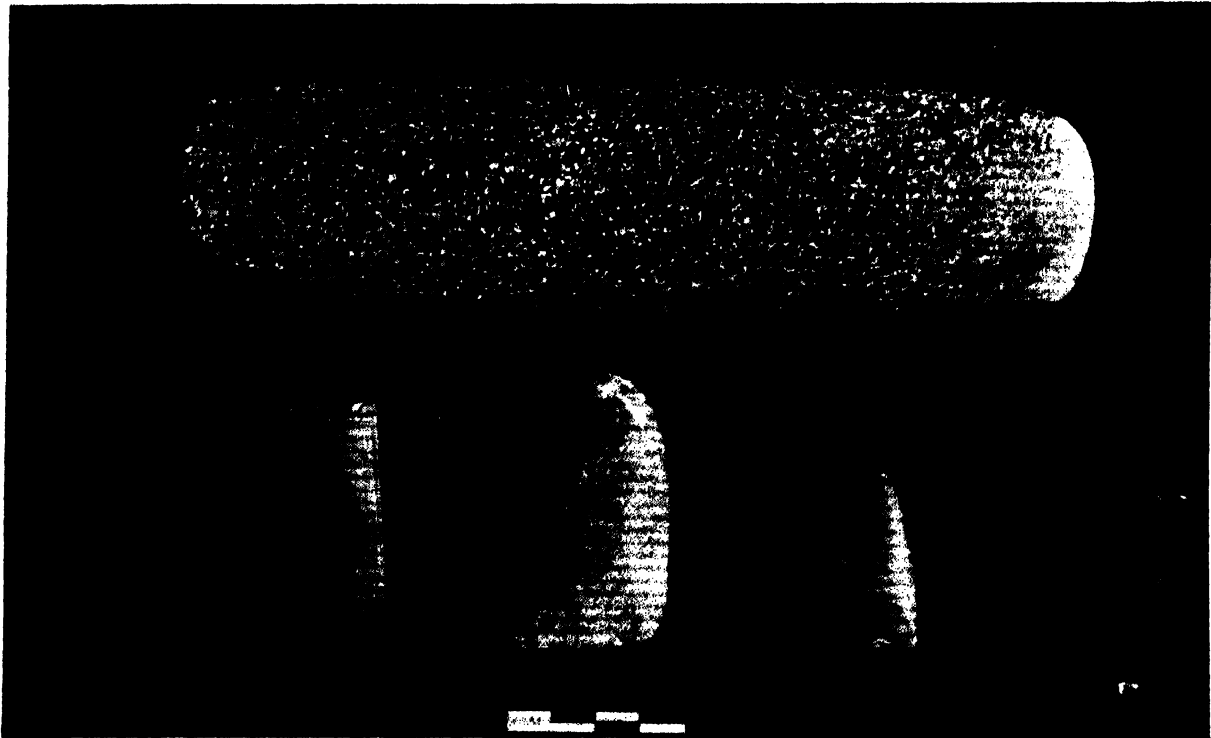
হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত নবাশ্মীয় হাতিয়ার, রাজ্য প্রত্নসংগ্রহশালার সৌজন্যে
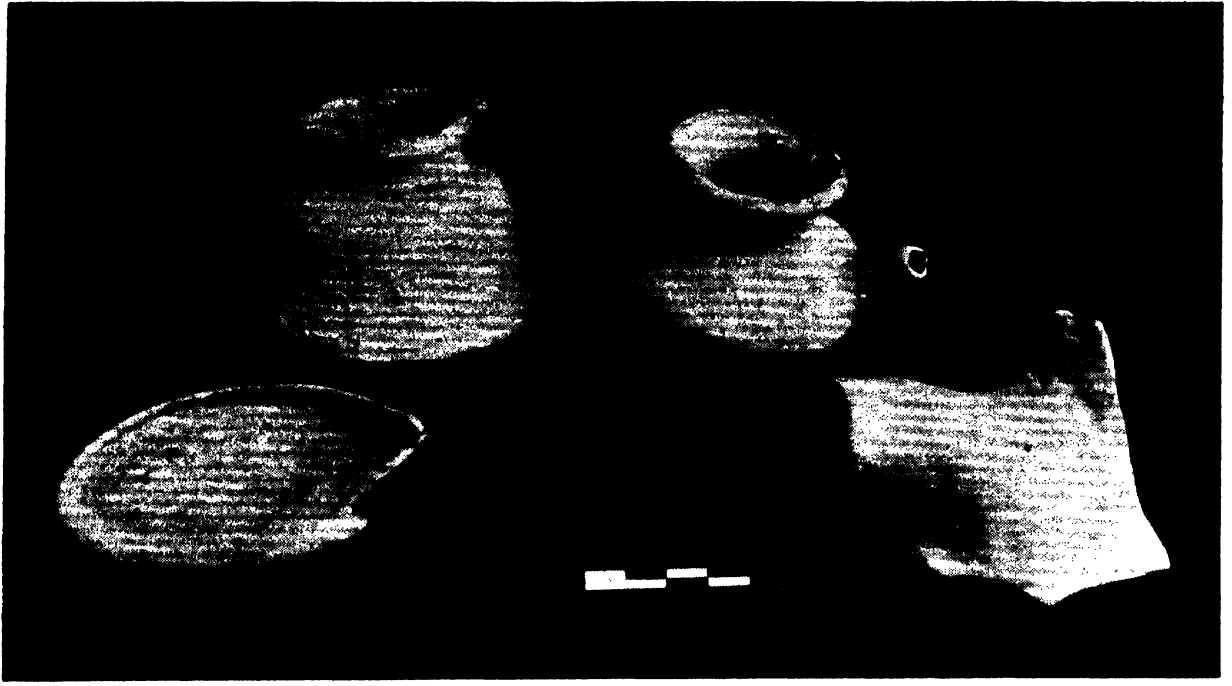
দেউলপোতায় প্রাপ্ত মৃৎপাত্র; রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

নাটশাল অপর দুই প্রত্নক্ষেত্র, তমলুকে নবাশ্মীয় যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত পর্যাপ্ত প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মোটামুটি নিম্ন গঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে মিল দেখা যায়। এর থেকে ধারণা করা যায় যে প্রাচীন যুগে এই সকল জায়গার মধ্যে যোগাযোগ ছিল এবং সময়কাল অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রায় সমসাময়িক। এই জেলায় পুরাপ্রস্তর যুগে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল কিনা? এই প্রশ্নের সমাধান খুবই শক্ত কিন্তু একটি বিষয় পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে নিম্নবঙ্গের এই জেলায় যতটানা ঐতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ততটা প্রস্তর যুগের সভ্যতার বিকাশ সম্ভব ছিল না।

প্রবন্ধের প্রথমে উল্লিখিত ভূপ্রকৃতি আলোচনায় আমরা দেখেছি গঙ্গা এবং পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বয়স মোটামুটি ৫০০০ বছর। অতএব প্রস্তর যুগের সভ্যতা গড়ে উঠতে হলে প্রথম ও প্রধান শর্ত হল হাতিয়ার নির্মাণের জন্য পাথরের প্রাচুর্য্য। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় তার সম্ভবনা কতটা? সেই যুগের মানুষ একমাত্র পাথরের ব্যবহার জানত বলে প্রস্তর যুগ [illegible] হয়। [illegible] হলে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনাতে অতীতে পাথরের পর্যা[illegible] থাকলে বর্তমানে তার বিলুপ্তির কারণ কি? সেই যুগে [illegible] তা[illegible]য়ার বানানোর পাথর জোগাড় করত মূলত তার বাস [illegible] অঞ্চল থেকে। আমরা পৃথিবী মানচিত্রে যত প্রস্তর [illegible]কাশস্থলগুলি জেনেছি সেগুলি হয় পাথরযুক্ত পাহা[illegible] নদী উপত্যকায়। এই দুই পরিবেশের প্রথমটি [illegible]না জেলার কোথাও কি পার্বত্য অঞ্চল আছে? এবং [illegible] আদিম যুগে মানুষের ব্যবহার্য পাথরের সন্ধান মেলে [illegible]দী উপত্যকা, ধরে নেওয়া যাক গঙ্গা বর্তমানে যে অ[illegible] হচ্ছে প্রস্তর যুগ তার গতিপথ অন্যদিক দিয়ে দিলে [illegible] নদী পর্যাপ্ত পরিমাণ কোয়ার্জ, কোয়ার্জাইট, ডলোরা[illegible] প্রভৃতি পাথর বহন করত এবং তা থেকে প্রস্তর যুগের মানুষ হাতিয়ার বানাতো। কিন্তু সেগুলিতো তার বাসস্থানের কাছাকাছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সেই চিহ্ন আছে কি? পুরাপ্রস্তর যুগের মানুষ মূলত বাসস্থান হিসাবে পাহাড়ের গুহাকে ব্যবহার করত তার প্রমান হিসাবে ভিমবেটকার কথা বলা চলে, এখানে প্রস্তর যুগের বিভিন্ন চিত্র আজও বিদ্যমান। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার জেলায় এই সব কোন পার্বত্য গুহা আছে বলে জানা নেই। যে ভূখণ্ডের বয়স মাত্র ৫০০০বছর সেখানে কি প্রস্তর যুগের সভ্যতার বিকাশ সম্ভব?

প্রস্তরযুগের মানুষ মূলত গাছের ফলমূল এবং জীব জন্তুর মাংস খেয়ে জীবনধারন করত এবং তার জন্য তারা গভীর জঙ্গলে দলবদ্ধ ভাবে হানাদিত জীবজন্তু শিকারের আশায় এবং গাছের ফলমূল আহরণ করতে। যদিও চব্বিশ-পরগনার বিস্তৃত অঞ্চল জঙ্গলে ঘেরা যা সুন্দরবন নামে পরিচিত কিন্তু এই জঙ্গলের অস্তিত্ব কত দিনের এবং এখানকার প্রধান প্রধান গাছগুলির আবির্ভাবের সময়কাল কবে? বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জৈবিক নমুনা সংগ্রহ করে কার্বন-১৪ পরীক্ষার মাধ্যমে মোটামাটি খ্রীঃ পূঃ ৭০০০ বছরের আভাস দিয়েছেন।

বাংলাদেশের উপকূল বরাবর যে ভূখণ্ডটি বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে সেইরকম আরো বহু ভূখণ্ডে মানুষের অজান্তে সৃষ্টি হয়েছে, যে ভূখণ্ডগুলির বয়স প্রস্তর যুগে নয়। সেগুলি ২০০-৫০০ বছরের মধ্যে। গঙ্গা পদ্মা মোহনায় যে সকল দ্বীপ গড়ে উঠেছে সেগুলির মাটির বিন্যাস দেখালে নিশ্চয় প্রস্তর যুগের বলে মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভূবিজ্ঞানিরা এ বিষয়ে আরো ভালো বলতে পারবেন। ধরে নেওয়া যাক গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে প্রস্তর যুগে এক বিশাল দ্বীপ বিরাজ করছিল কিন্তু সেই দ্বীপে যে সকল মানুষ বসবাস করত তার চিহ্ন কোথায়? তাদের ব্যবহার্য জিনিষ, খাদ্যাভ্যাসের নির্দর্শনের প্রাচুর্য আছে

কি? যদি বা এগুলি মাটি চাপা পড়ে থাকে তা হলে প্রত্নবিজ্ঞানীদের অবিলম্বে ব্যাপক উৎখনন এবং অনুসন্ধানের সাহায্যে আবিষ্কার করা দরকার।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলি মধ্যাশ্মীয়, নবাশ্মীয় এবং আদি ঐতিহাসিক (Early historic) যুগের। কিন্তু আদি ঐতিহাসিক যুগের পূর্ববর্তী তাম্রাশ্মীয় যুগের (Chalcolithic) কোন নিদর্শনের চিহ্ন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বিকাশ ঘটেছিল। প্রস্তরযুগের সর্বপ্রথম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা বলতে ছিল শিকার, খাদ্য আহরণ ও খাদ্য সঞ্চয়। এই সময়ে মানুষ তার অস্ত্র বানানোর কারিগরী কৌশল বলতে ব্লক অন ব্লক টেকনিক ব্যবহার করত। এই পদ্ধতি অনুযায়ী দুটি পাথরকে পারস্পরিক আঘাত করে হাতিয়ার তৈরী হত, এই ধরনের হাতিয়ার হল চপার, চপিং। এই পদ্ধতি ছাড়াও সিলিণ্ডার হ্যামার টেকনিক, কণ্ট্রোল ফ্লেকিং, প্রেসার ফ্লেকিং টেকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন হাতিয়ার বানানোর নয়া কৌশল আবিষ্কার করে। প্রস্তর যুগের প্রথম পর্যায়ে তাদের পাথর নির্মিত অস্ত্রগুলি ছিল বড় এবং ভোঁতা ধরনের ক্রমে ক্রমে নির্মাণ কৌশলে পরিবর্তন আসে এবং হাতিয়ারের আকৃতির ছোট এবং ধারাল হয়। নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগে হাতিয়ার যেমন ছিল উচ্চ পুরা প্রস্তর যুগে তার আমূল পরিবর্তন হয় এবং বানানোর কৌশলেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে। তেমনি পরবর্তী মধ্যাশ্মীয় যুগে হাতিয়ার বা আয়ুধ গুলি আরো ক্ষুদ্রাকৃতির হয় এর ফলে পাথরের সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুর হাড়, সিং এবং গাছের ডালপালার সাহায্যে আরো উন্নত হাতিয়ার তৈরী হয়। এই যুগে মানুষ আরো গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং শুধু মাত্র খাদ্য সংগ্রহ নয় খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করে এবং পরবর্তী নবাশ্মীয় যুগে চাষবাস, বাসস্থান নির্মাণ, পশুপালন, মাটির সাহায্যে মৃৎপাত্র নির্মাণ, শুরু করে। প্রস্তর যুগের এই পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যাকে বলা যায় মনুষ্য সমাজের প্রথম বিপ্লব। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন ধাতু ব্যবহারের চেষ্টা এবং তামা হল প্রথম ধাতু যার ব্যবহার মানুষ প্রথম শুরু করে। এই যুগে মানুষ পাথরের ছোট ছোট অস্ত্রের সঙ্গে তামা এবং জীবজন্তুর হাড়ে নির্মিত বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্র তৈরী করত। এই যুগকে তাম্রাশ্মীয় যুগ বা Chalcolithic যুগ বলে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় তাম্রাশ্মীয় যুগের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নি। তাহলে কি এটা ধরে নেওয়া যায় যে প্রস্তর যুগের দুই পর্যায় মধ্যাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ তাম্রাশ্মীয় যুগের এই জেলার অস্তিত্ব ছিল না? বা এই সময়ে মানুষ অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল? পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ আদি ঐতিহাসিক যুগে আবার তারা অবিভক্ত চব্বিশ-পরগনা জেলায় বসবাস করতে শুরু করে। এই জেলায় ঐতিহাসিক যুগ থেকে পরবর্তী এবং বর্তমান যুগপর্যন্ত বহু নিদর্শন অবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটা পণ্ডিতেরা বিভিন্ন অনুসন্ধান ও উৎখননে প্রমাণ করেছেন যে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাগ্ মৌর্য যুগ থেকে সভ্যতার বিকাশ লাভ করেছিল এবং এর সঙ্গে—মেদিনীপুরের তমলুকে আবিষ্কৃত বস্তুর যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। সামগ্রিক আলোচনার বিচারে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলা থেকে প্রাপ্ত মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় নিদর্শন পাওয়া গেলেও এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই প্রত্নবস্তু খুবই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং তা থেকে কখনোই বলা যায় যে প্রস্তর যুগের সভ্যতার বিকাশ এখানে ঘটেছিল। যে নিদর্শনগুলি দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা থেকে পাওয়া গেছে সেগুলি অন্য কোন জায়গা থেকে বাহিত অর্থাৎ কেউ বয়ে নিয়ে গেছে অথবা নদী বাহিত হয়েছে।

দেউলপোতায় যে সকল মধ্যাশ্মীয় আয়ুধের আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ বলে মনে হয় নি। বাকিগুলি নদীবাহিত নুড়ি পাথর যা কোয়ার্জ, কোয়ার্জাইট ও বিভিন্ন
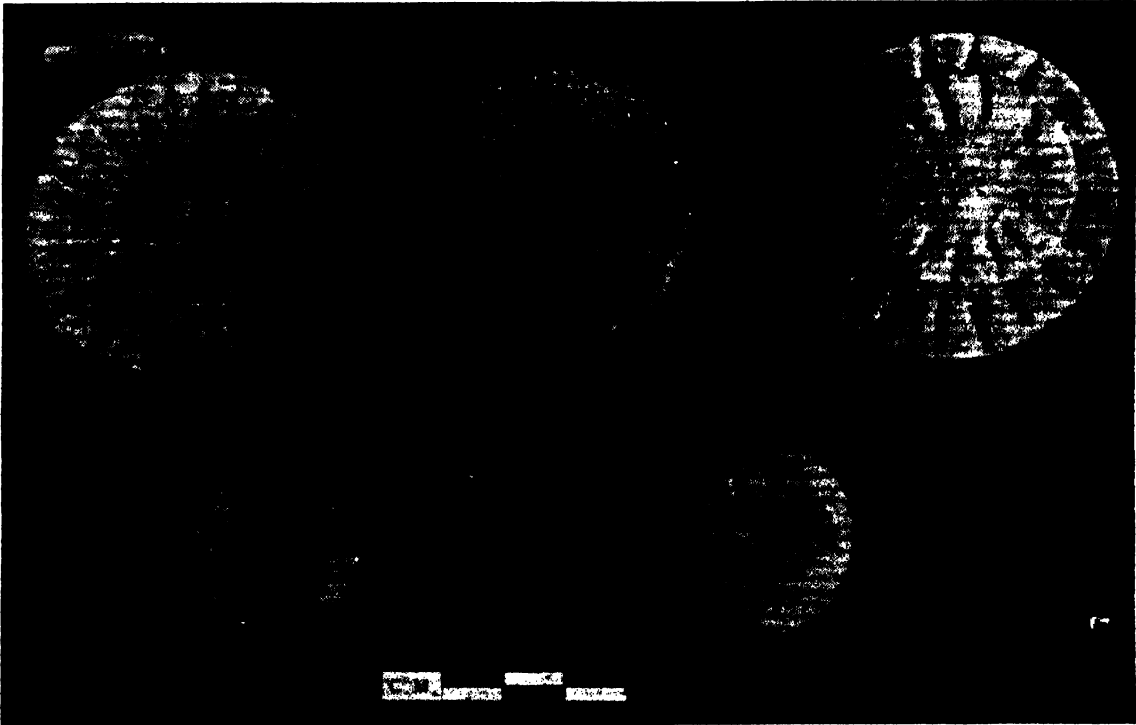
হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত নকশাযুক্ত পোড়ামাটির চাকতি, রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালার সৌজন্যে
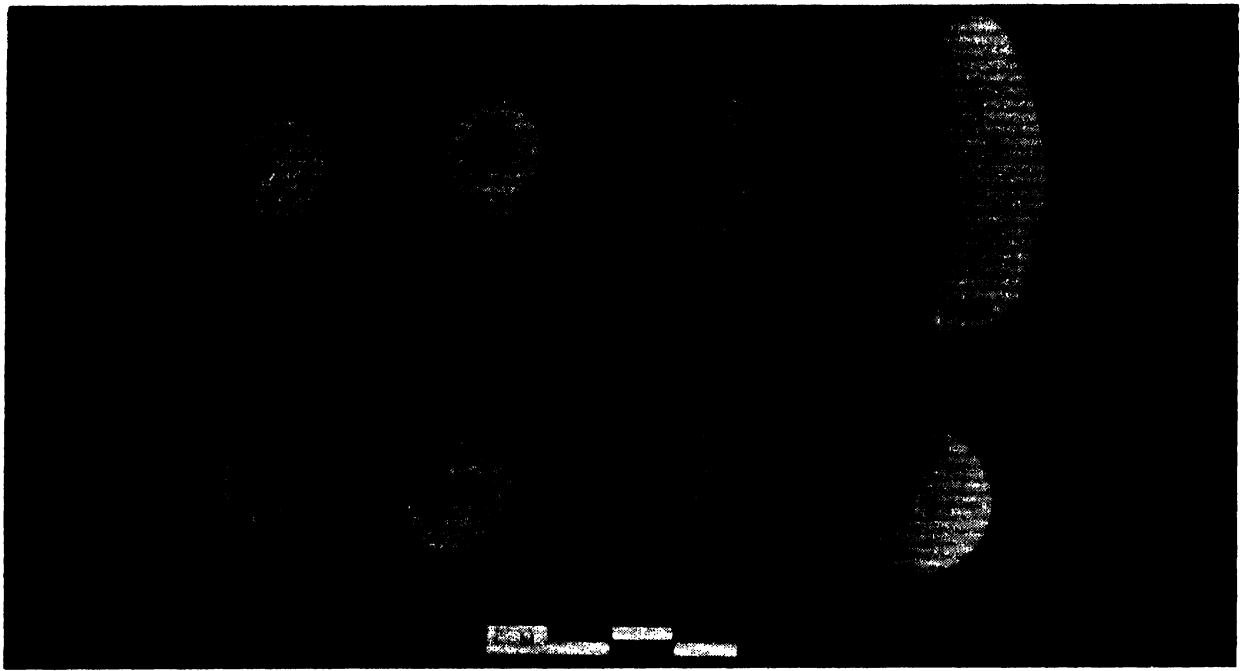
দেউলপোতায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির পুঁতি, রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

রকমের ছোট ছোট পাথরের টুকরো। এগুলিতে কোন স্ট্রাইকিং প্লাটফর্ম, বাল্ব অফ্ পারকাসন বা রিটাচিং এর কোন চিহ্ন নেই। এগুলির কোনটিই মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ নয়। প্রত্নতত্ত্বের ভাষায় বলা যায় যদি কোন জায়গা থেকে দুই একটি প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়, সেই জায়গাকে প্রত্নক্ষেত্র বলা যায় না। প্রত্নক্ষেত্র তাকেই বলা হয় যদি সেখানে প্রত্ন নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করে আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার বর্তমান ভৌগোলিক চিত্র দেখে এটা পরিষ্কার যে এখানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ অসম্ভব। কারণ এই সভ্যতার যা সময়কাল তাতে এখানে সেই সময়ে কোন ভূখণ্ড ছিল না, সভ্যতা বিকাশ তো দূর অস্ত। দ্বিতীয়তঃ যে সকল মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় আয়ুধ এই জেলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি যে কোন ভাবেই হোক অন্য জায়গা থেকে এসেছে। দেউলপোতা থেকে সংগৃহীত ছোট ছোট পাথরের বস্তুগুলির ৯৯ শতাংশ মধ্যাশ্মীর যুগের নয়। যে কয় একটি মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ বলে মনে হয় সেগুলি এই প্রত্নস্থলের কিনা সন্দেহ জাগে।

এই জেলা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের সভ্যতার আলোকে আলোকিত যা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার চন্দ্রকেতু গড়ে এবং এই জেলার হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে। সভ্যতার বিকাশ প্রাক্ মৌর্য যুগে শুরু অর্থাৎ খ্রিঃ পূর্ব ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে ফিরে যাওয়া কঠিন। তবুও এই জেলায় ব্যাপক অনুসন্ধান ও উৎখনন হওয়া দরকার যার মাধ্যমে এই জেলাকে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার আলোকে আলোকিত করা না গেলেও ইতিহাসের আলোকে আরো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করা সম্ভব হবে।

তথ্যপঞ্জী

১) IAR-1955-56, 19...-57, 19...-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-... ...964-... ...971-72.

২) প্রত্ন সমীক্ষা ১-... ... প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার প.ব.সরকার

৩) প্রত্ন সমীক্ষা ২-... ঐ

৪) Pre history of ... ...narekha Valley—অনিলচন্দ্র পাল, সঙ্গীতা রায়, প্র... ...গুহ

৫) An Encyclopa... ...chaeology—A. Ghosh.

৬) Old stone Ag... ...ttacharyay.

৭) Palaeolithic W... ... Chottopadhyay.

৮) Stone Age to ... ...a.

৯) Changing Ge... ...ate of West Bengal Since 18,000 B.P.—B.C. ... ...kraborty, S. N. Banerjee, P. Chakraborty.

১০) Palaeo Biology in under standing the Change of sea level and cost line in Bengal basin During Holocene period—Manju Banerjee, Prasanta Kr. Sen.

১১) Palaeo environment of Bengal Basin During the Holocene Period—P. K. Sen, Manju Benerjee.

১২) New Epigraphic and Palaeographic Discoveries—B.N.Mukherjee.

১৩) ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা—সঙ্কর্ষণ রায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই লেখাটি লিখতে মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন সাগর চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দাস, তারাপদ সাঁতরা, বিশ্বনাথ সামন্ত, সুব্রত নন্দী, সিন্‌হা পাঁজা, প্রতীপ মিত্র, সুধীন দে, শিউলি মাইতি প্রমুখ। ছবিগুলি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার থেকে সংগৃহীত, আলোকচিত্রী শিহরণ নন্দী।

লেখক পরিচিতি ঃ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকারে অনুসন্ধান সহায়ক পদে কর্মরত।

অতুলচন্দ্র ভৌমিক

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ প্রত্নায়ুধ প্রাপ্তিস্থল ও পর্যালোচনা

ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূসংগঠন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা। ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ চব্বিশ পরগনা জেলা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও উত্তর চব্বিশ পরগনা এই দুই জেলায় পুনর্গঠিত হয়েছে। আলিপুর (সদর) ও ডায়মন্ডহারবার এই দুই মহকুমা নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। আয়তন ৯৬০০ বর্গ কিলোমিটার। এই জেলা দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চল ৯৩০০ বর্গ কিলোমিটার নিয়ে মূলত গঠিত। আর বিস্তৃত ২১°৩০' ও ২২°৩০' উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°২' ও ৮৯°০' পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। জেলার উত্তরে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ও পশ্চিমে হুগলি নদী (চিত্র-১)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে অধিকাংশ সময় (১১৪ বছর) দক্ষিণের ঘন অরন্যানি বিস্তীর্ণ সুন্দরবন চব্বিশ পরগনা জেলার বাইরে ছিল। ১৭৫৭ সালে ২৩ জুন পলাশি যুদ্ধের পর সেই বছর ২০ ডিসেম্বর মীরজাফর চব্বিশ পরগনার এই বিস্তৃত অঞ্চল কোম্পানিকে যৌতুক দিয়েছিলেন। ১৮৭১ সনে পশ্চিম সুন্দরবনের ৩৭১৪ বর্গ কিলোমিটার অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। নদীমাতৃক দক্ষিণ বাংলার ভাটা সমুদ্রোপকূলবর্তী বনভূমে সুঁদরী (সুনরী) বৃক্ষের আধিক্য থাকায় এ অঞ্চলের নাম হয়েছে সুন্দরবন। এখানকার অরণ্যে গরান, গেঁওয়া, গর্জন, বচ, বায়েন, হাতিম, পিটুলি, নিপা, পশুরি, গোলপাতা, কেয়া ও হোগলা প্রচুর জন্মায়।

> **দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মূল্যবান কিছু প্রস্তরায়ুধ ডায়মন্ডহারবারের কাছে দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর থেকে মূলত পাওয়া গেছে। তাছাড়া সাগরদ্বীপে বামনখালি মন্দিরতলা, কাকদ্বীপে পাকুড়তলা ও মণির তট থেকে আরও কয়েকটি হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে এরূপ উল্লেখ আছে। এসব প্রত্নস্থল থেকে ক্ষুদ্রায়ুধ, তার শল্ক, সেল্ট, নোড়া, জালকাঠি এবং তামা ও আংশিক অঙ্গারীভূত কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব প্রত্নপরিচয় এই জেলাকে বর্নচ্ছটায় গৌরবময় করে তুলেছে; আর দিয়েছে কিছু দুর্লভ সম্মান।**

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে এককালে প্রাচীন ভূভাগ বিদ্যমান ছিল একথা উইলিয়াম উইলকক্স তাঁর 'Ancient System of Irrigation in Bengal' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৩ সনে আর ডি ওল্ডহাম্ তাঁর 'Geology of India : Stratigraphical and Structural Geology' বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, ভূতত্ত্বানসন্ধানকালে তিনি এ অঞ্চলের ভূগর্ভে যে পরিমাণ নুড়ি ও কাঁকুরে বালির সংস্তরের সন্ধান পেয়েছেন তাতে তিনি মনে করেন যে, সুদূর কোনও এক অতীত কালে এখানে প্রস্তরের ছোট ছোট পাহাড় ছিল যাহা ভূনিমজ্জনে বসে গেছে। এই কারণে বোধ হয় যে, এ অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ অন্যান্য ব-দ্বীপের ন্যায় সমতল নয়। ফলে এ অঞ্চলের পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বাংশ অনেক নিম্ন। ক্রমে তদুপরি জোয়ারের ফলে পলি জমিয়া বর্তমান নিম্নবঙ্গের এরূপ সমতল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই, বয়সে নবীন। তাঁর মতে কোন ব-দ্বীপের নিম্নাংশে এরূপ প্রস্তররাশি ও কাঁকর-বালি থাকে না। নিম্নবঙ্গের এরূপ ভূভাগে পূর্বদিকে বাংলাদেশের খুলনা জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধান হতে এটা জানা যায় যে, ভূতত্ত্বীয় ইউস্ট্যাসি, ভূমিকম্প বা অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণে অতীতযুগে এ অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের অবনমন ঘটেছিল। তবে কোন সময়, প্রকৃত কোন কারণে অত্রস্থ ভূনিমজ্জন ঘটেছিল তা আজও সঠিক নির্ণয় হয়নি, শুধু অনুমান করা হয়। ভূতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, একাধিকবার ভূমিকম্পে এতদঞ্চলের অবনমনের কারণ। ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার তাঁর 'A Statistical Account of Bengal', Vol.I বইতে এরূপ কারণের কথা বলেছেন। তাঁর এই বইতে কর্নেল গাসট্রেল (Colonel

Gastrell) উক্তি— "It is the more probable that it was caused suddenly, during some great earthquakes" (Hunter:1973 : 292)। হান্টার তাঁর উক্ত বইয়ের ২৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৫৯ সালে মাতলা নদীর তীরে ক্যানিং শহরে ৩০গজ চওড়া একটি ছোট পুকুর খননকালে মাটির ১০ ফুট তলায় ৪০টি বৃহৎ সুন্দরী বৃক্ষ দণ্ডায়মান অবস্থায় পাওয়া গেছে। কথিত আছে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ডায়মণ্ডহারবার থেকে ৬৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ৪৩০ সালে নির্মিত কপিলমুনির প্রাচীন মন্দির সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেছে এবং বড়াশীর অম্বুলিঙ্গ মন্দির বিনষ্ট হয়েছিল। সাগরদ্বীপের অস্তিত্ব পাওয়া যায় রেনেল-এর মানচিত্রে (১৭৬৪-৭৬)। তার আগে জাও-দ্য বারোস (১৫৫০) এবং ভনডেন্ ব্রুক-এর (১৬৬৬) মানচিত্রে সাগরদ্বীপের কোনও উল্লেখ নেই। ১৯৫৯ সনে বোড়াল গ্রামে মাটি খুঁড়ে তত্তুল্য উদ্ভিজ্জ জলসিক্ত হয়ে পচনে বিকৃতাকারপ্রাপ্ত এবং আংশিক অঙ্গারীভূত প্রায় ৩ ঘন ফুট জমাট পদার্থ আর অসংখ্য সুন্দরী বৃক্ষের নিম্নাংশ, মূল ও তার ডালপালার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। অতি সম্প্রতিকালে কলকাতা শহরে ভূগর্ভ রেলপথ খননকালে অনুরূপ বৃক্ষাংশ পাওয়া গেছে। এইসব চিহ্ন থেকে বোঝা যায় যে, এ অঞ্চলে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন ভূভাগ ছিল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যাংশ বর্তমানে পরিণত ব-দ্বীপাংশ এবং দক্ষিণাংশে সক্রিয় ব-দ্বীপ গভীর বনে ঢাকা। নিম্নবঙ্গের এ অংশে অতীতযুগে বঙ্গোপসাগর ছিল এবং কালক্রমে এখানে আদি গঙ্গা, ভাগীরথী ও হুগলি নদীর পলি জমে বহু দ্বীপভূমির সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সমগ্র এই অঞ্চলে বহু খাঁড়ি, ছোট ছোট নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে জালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। এই অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বড়তলা (বারাতলা), শতমুখী (সপ্তমুখী), ঠাকুরান (ঠাকুরুন), জামিরা, মাতলা ও বিদ্যাধরী। হুগলি নদী থেকে বিদ্যাধরী নদী প্রথমে পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পরে এই জলধারা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মাতলা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ জেলার সব প্রবাহধারা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। নদীগুলি সমুদ্রের জোয়ারের জলে পুষ্ট বলে নদীর জল ও মৃত্তিকা লবণাক্ত। পূর্বে এখানকার কিছু নদীর উৎস-ভাগীরথীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বর্তমানে উৎসের সঙ্গে এসব নদীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা খাঁড়িতে পরিণত হয়েছে। জোয়ারের সময় এগুলি সমুদ্রের লবণাক্ত জলবাহী নালা; তাই খাঁড়ি বলে। খাঁড়িগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

গঙ্গার শাখানদী ভাগীরথীর নিম্নাংশ হুগলি নদী দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পশ্চিম সীমানা চিহ্নিত করে প্রবাহিত। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দক্ষিণে খিদিরপুরের পুলের তলা দিয়ে হুগলি নদীর যে একটি বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ সলিল স্রোত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত ছিল তাহা আদি গঙ্গা (মজা গঙ্গা/বাদা গঙ্গা)। এক সময়ে এটা শুষ্ক খাতে পরিণত হয়ে পড়ে। পরে টালির (টোলীস্) নালা নামে কালীঘাট, রসা, বৈষ্ণবঘাটা, বোড়াল, রাজপুর, মালঞ্চ, মহিনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন, সূর্যপুর, মূলটি, দক্ষিণ বারাসাত, বহড়ু, ধর্মনগর, জয়নগর, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি জনপদের উপর দিয়ে বহু মুখে বিভক্ত (তখন সমস্ত শাখানদী গঙ্গার সপ্তমুখী নামে পরিচিত) হয়ে খাঁড়িতে এসে কাকদ্বীপ অঞ্চলে কালনাগিনী নামে অভিহিত হয়ে মুড়িগঙ্গা ও হুগলি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং এখানে আবার বহুমুখে বিভক্ত হয়েছে বলে শতমুখী নামে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিশেছে। এই আদি গঙ্গার লুপ্তপ্রায় অগভীর বালুকাপূর্ণ জলধারার খাদ স্থানে স্থানে এখনও বিষ্ণুপুর থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়।

নদীমাতৃক দক্ষিণ বাংলার সাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এসব নদী-নালায় জোয়ার-ভাঁটার পট পরিবর্তনের নিরন্তর খেলা চলে বলে এই অঞ্চল ভাটির দেশ বা ভাটিদেশ নামে অভিহিত হয়। ভাটিদেশের জমি দক্ষিণ দিকে ক্রমশ নিচু হয়ে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে সমতল হয়ে মিশে গেছে। তাই বৌদ্ধ আমলে এ অঞ্চল সমতট নামে অভিহিত হত। তবে সমতট এই শব্দের উৎপত্তি সম্ভবত সম+তট (সমতল শব্দের 'সম' ও সমুদ্রতটের 'তট') এই দুয়ের সংযুক্তিকরণের ফলে হয়েছে। এই অঞ্চলটি বারভাটি (বারোটি জনপদের জন্য) নামে আখ্যায়িত হয়েছিল। আবার কখনও আঠারভাটি

তাম্র মাদুলি, দেউলপোতা, রাজ্যপ্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে
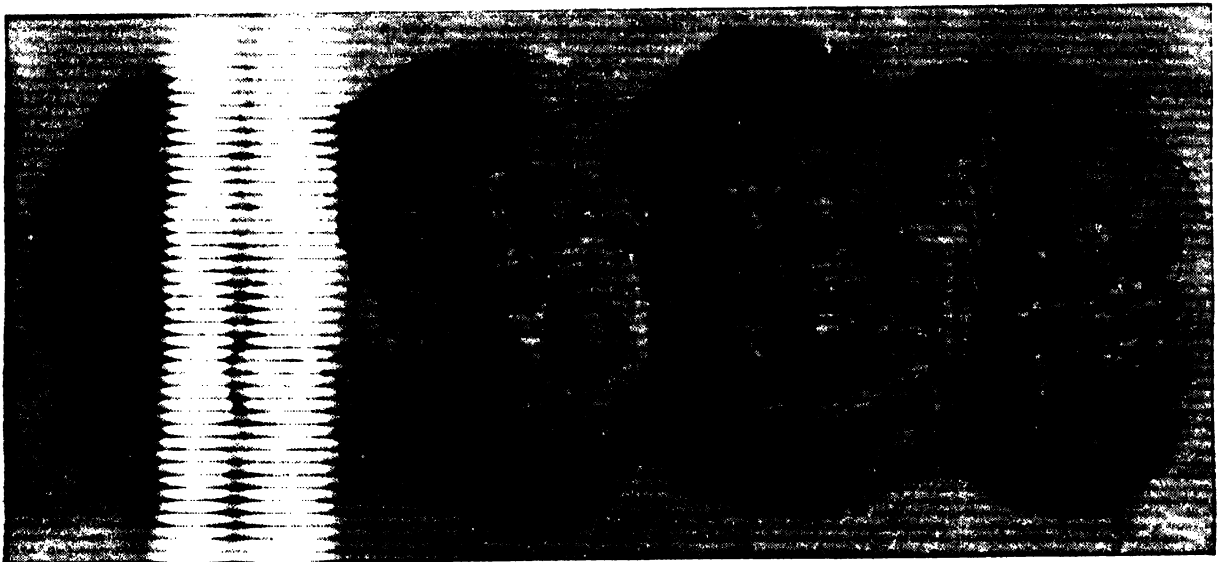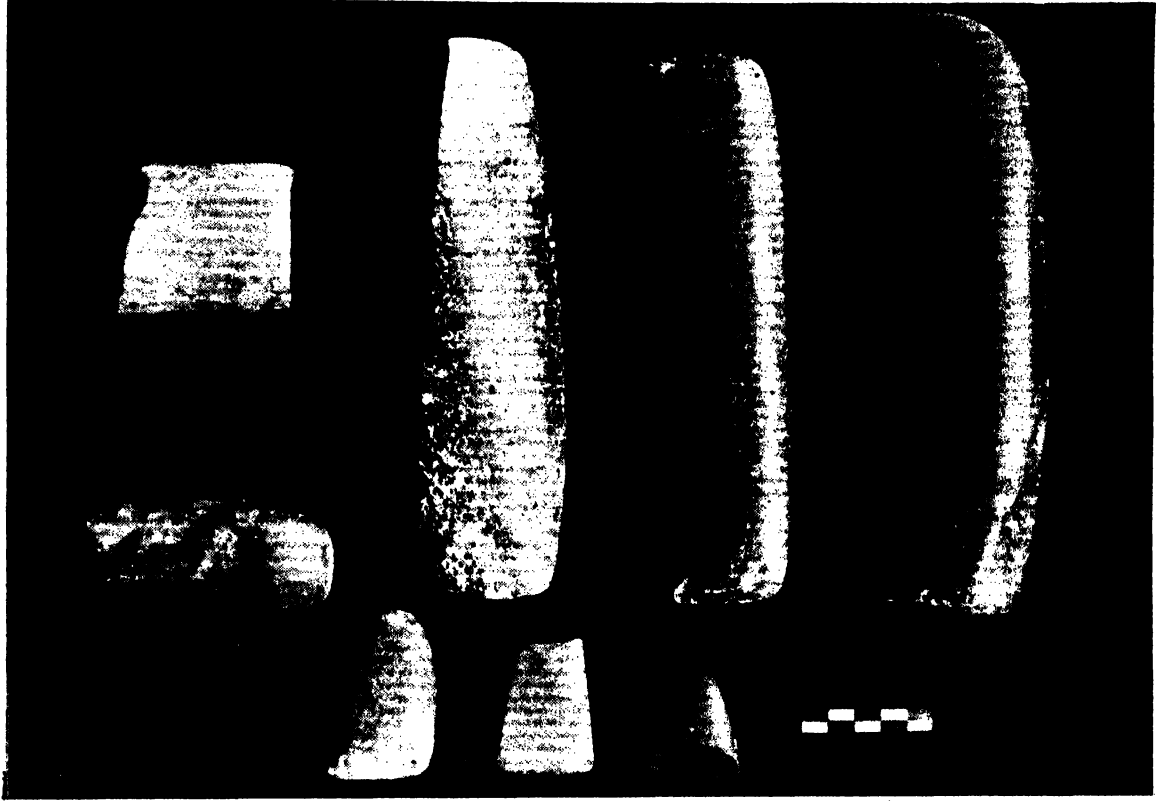
নোড়া ও সেল্ট, হরিনারায়ণপুর, রাজ্যপ্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

নামে। এই জনপদগুলি হল কালীঘাট, বোড়াল, রাজপুর, মালঞ্চ, মহিনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, বারুইপুর, শাসন, সূর্যপুর, মূলটি, দক্ষিণ বারাসাত, বহড়ু, ধর্মনগর, জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, জলঘাটা, ছত্রভোগ ও হরিনারায়ণপুর। গঙ্গার পূর্ব পাড় থেকে এই অঞ্চলকে দক্ষিণদেশ বলা হয়। আর এই অঞ্চলটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ; তাই এর প্রাচীন আর এক নাম বকদ্বীপ বা বগড়ি (বগেড়ি)। হিন্দু বৌদ্ধ যুগে এ অঞ্চলের নাম ব্যাঘ্রতটি ছিল। এই তটে ব্যাঘ্রের প্রকোপ বেশি ছিল বলে ব্যাঘ্রতটি। সুন্দরবনের রয়ালবেঙ্গল টাইগার এখনও পৃথিবী বিখ্যাত।

সুন্দরবনের সবটাই নিম্নভূমি আর জলাভূমি। এখানকার ভূগঠন এখনও চলছে। ভূগঠনের দিক থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা নতুনত্বের দাবি রাখে। কারণ উপসাগরের অগভীর অংশে নদী বাহিত বালি সঞ্চিত হয়ে সাগরবক্ষে নতুন চর (যেমন পূর্বাশা) এখনও জেগে উঠছে। তারপর নদী বাহিত বালি, কাঁকর, পলি, ক্রমশ চরের চতুর্দিকে জমা হয়ে একদা দ্বীপাকারে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং এভাবে অঞ্চলটি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার তটভূমি প্রায়ই সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে ভেঙে যাচ্ছে। অরণ্য, দ্বীপময়, বালুকাপূর্ণ ও ভগ্ন উপকূল এই জেলার তটরেখাকে এক বৈচিত্র্য দান করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এখানকার ভূমির গড় উচ্চতা ৩-৪ মিটার উঁচু। তাই জোয়ারের জলে এই অঞ্চল ডুবে যায়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ২০০ সেন্টিমিটার। গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা প্রায় ২০°—৩০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে।

দক্ষিণের সক্রিয় ব-দ্বীপাংশে সুন্দরবনের নিশ্ছিদ্র সবুজ অরণ্যানি ইংরেজ আমলে হাসিল হয়ে বসতি ও চাষ-আবাদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি লট ও প্লট নামে আখ্যাত। এক সময় অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার আলিপুর, ডায়মন্ডহারবার ও বসিরহাট মহকুমায় মৃতপ্রায় উত্তর ব-দ্বীপাংশে ১-১৬৯টি লট বা লাট (একটি লট ৬৪ বিঘায়) এবং দক্ষিণাংশে সমুদ্র এলাকায় এ-এল-এই মোট ১২টি প্লটে বিভক্ত ছিল। বসিরহাট মহকুমার লট ও প্লটগুলি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থানের ফলে বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় লট ও প্লটের সংখ্যা উক্ত সংখ্যা থেকে কম। সুন্দরবনের জমিকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, বাদা ও আবাদ। এখানকার কর্দমাক্ত নিচু জলাজমি ও বনভূমি বাদা; আর যেখানে চাষবাস হয় তাকে আবাদ জমি বলা হয়। বর্তমানে ক্যানিং ও সাগর অঞ্চলের বেশিরভাগ জমি বাদা থেকে আবাদ জমিতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অবক্ষয়িত অঞ্চল তার আপন বৈশিষ্ট্যে সর্বদা এক বিশেষ অঞ্চল গঠন করেছে।

পূর্ব পরিক্রমা

প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত মহাশয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর থেকে বিস্মৃত অতীত যুগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার উদ্ধার করেছেন। এ অঞ্চলের সুপ্রাচীন কালের লুপ্ত সংস্কৃতির রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে তাঁর এই অবদান নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। তাঁকে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের

প্রচেষ্টায় দেউলপোতায় অতি প্রাচীন অধিবসতির প্রমাণ পান এবং সেখান থেকে তিনি বালি ও নুড়ির সঙ্গে মেশানো কিছু ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধ ও বেশি শল্ক উদ্ধার করেন। তাঁরাই একাজে প্রথম অগ্রণী উদ্যোক্তা। তাঁদের অনুসরণ করে অতি সম্প্রতিকালে শ্রীনরোত্তম হালদার ও আরও অনেকে ডায়মন্ডহারবারের সন্নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে পাথরের আরও কিছু হাতিয়ার সংগ্রহ করেছেন। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে সংগৃহীত পাথরের আয়ুধের সংখ্যা খুব সীমিত। তবে এতদঞ্চলে যেসব প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে তা প্রাচীন সভ্যতার এক নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দেয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রাপ্ত প্রত্নায়ুধ ও তার তাৎপর্য সামগ্রিক এই পর্যালোচনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মূলত ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে এলোমেলো প্রাপ্ত চান্‌স ফাইন্‌ড—হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া প্রত্নায়ুধ নিদর্শনাবলিকে নির্ভর করে। ভূপৃষ্ঠে পাওয়া এসব আয়ুধ মূলত নদীস্রোতে আনীত হয়েছে এরূপ মনে করা সঙ্গত। কারণ সব হাতিয়ার
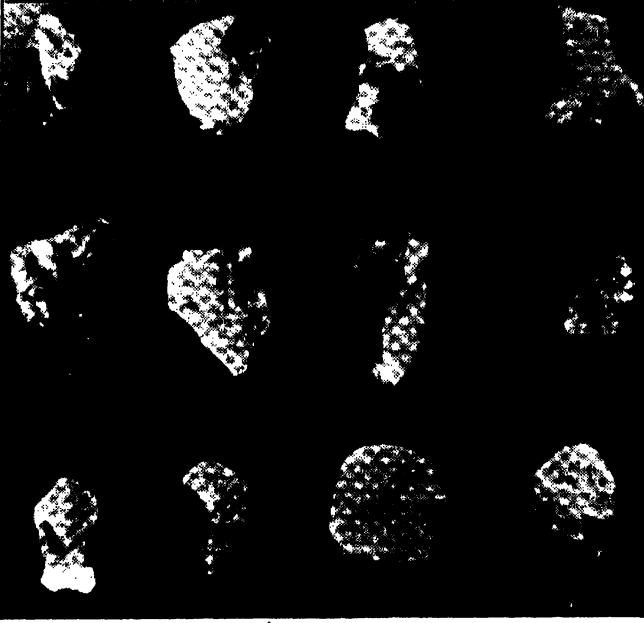
ক্ষুদ্রায়ুধ ও তার শল্ক, দেউলপোতা, রাজ্যপ্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

মিলেমিশে একাকার, বিশৃঙ্খল। প্রস্তরায়ুধ উৎখননের মাধ্যমে সংগৃহীত না হওয়ায় ভূগর্ভের ক[illegible] গভীরতায়, ভূ-ত্বকের কোন স্তরবিন্যাসের সঙ্গে এসব প্রত্ন যুক্ত [illegible] কো[illegible]সামগ্রী কার অনুষঙ্গী সে প্রত্নতথ্য রয়ে গেছে আজও [illegible]। [illegible] সংস্কৃতির কালক্রম ও আয়ুধের সঠিক কাল নিরূপণ [illegible] উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ফলে চান্‌স ফাইন্‌ডস্‌ এ[illegible] নি[illegible] এক ভূমিকা নিয়েছে মাত্র। প্রয়োজনীয় এসব স[illegible] তথ্যে[illegible]ভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুসংবদ্ধ আদি সভ[illegible] ইতি[illegible] রচনায় অসুবিধা অনেক; তবে আয়ুধসব একাজে এ[illegible]বিশ[illegible] সহায়িকা। সেজন্য, এসব প্রত্নসাধ্য অর্থবহ।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মূল্যবান কিছু প্রস্তরায়ুধ ডায়মন্ডহারবারের কাছে দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর থেকে মূলত পাওয়া গেছে। তাছাড়া সাগরদ্বীপে বামনখালি মন্দিরতলা, কাকদ্বীপে পাকুড়তলা ও মণির তট থেকে আরও কয়েকটি হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে এরূপ উল্লেখ আছে। এসব প্রত্নস্থল থেকে ক্ষুদ্রায়ুধ, তার শল্ক, সেল্ট, নোড়া, জালকাঠি এবং তামা ও আংশিক অঙ্গারীভূত কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব প্রত্ননিচয় এই জেলাকে বর্ণচ্ছটায় গৌরবময় করে তুলেছে; আর দিয়েছে কিছু দুর্লভ সম্মান।

প্রত্নস্থল

দেউলপোতা : ডায়মন্ডহারবারের থেকে ছয় মাইল উত্তরে হুগলি নদীর সুবিস্তৃত জলধারার পূর্ব তীরে দেউলপোতা ঢিবির বাঁকে নদীতরঙ্গে আলোড়িত ও ভূমিক্ষয়িত স্তর থেকে পাওয়া গেছে দুই-একটি উপলাস্ত্র। এগুলি কর্তরীর পরিচয়জ্ঞাপক। এছাড়া পাথরের কিছু ক্ষুদ্রাস্ত্র ও তার শল্কছেদই বেশি পাওয়া গেছে (চিত্র-২)। এসব পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র[১] আদি ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্রের এক অসামান্য রহস্য। বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্রায়ুধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলও চাঁচনি, সূচ্যগ্র তীরের ফলা, ছুরিকা। এসব শল্কায়ুধ ক্ষুদ্রাশ্মীয় কালের, না আদি ঐতিহাসিক কালের তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে আছে মতবিরোধ। তবে এগুলি আদি ঐতিহাসিক কালের এ এক প্রত্যয় বিশ্বাস। খুদে সব হাতিয়ার সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট অস্বচ্ছ কালো চার্ট (সিলিসিয়াস পাথর), ফ্লিন্ট (ঈষদচ্ছ, প্রায় সাদাটে-ধূসর বর্ণ, বিরল), চ্যালসিডনি (স্বচ্ছ, লাল আভাযুক্ত) পাথর থেকে তৈরি। চাঁচনি, ছুরিকা ইত্যাদি আয়ুধসবের কর্মপ্রান্তে ছোট ছোট ছিল্কা তুলে ধারালো করে কাজের বিশেষ উপযোগী করা হয়েছে। তবে আয়ুধগুলি উন্নত কারিগরির দৃষ্টান্ত নয়। আর এসব খুদে একটি হাতিয়ার তৈরি করতে সময় লাগত প্রায় ৩০ মিনিট। প্রাপ্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন আয়ুধ যে আদি এক জনজীবনের সাক্ষ্য দেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনুশিলায় তৈরি একাধিক ছুরিকা উপযুক্ত কোনও বাঁকা কাঠের হাতলে বা পশুর চোয়ালে বা হাড়ের দণ্ডের সঙ্গে সারিবদ্ধ ও সুপরিকল্পিতভাবে গাছের গঁদ, জতু বা রেজিন বা তত্তুল্য অন্য কোনও আঠা যুক্ত করে যৌথ পূর্ণাঙ্গ এক কাস্তে তৈরি করত। আর সূচ্যগ্র তীরের ফলা কোনও শরের অগ্রে যুক্ত করে তৈরি করেছে পশু শিকারের তীর। ক্ষুদ্র হাতিয়ার নির্মাতা-প্রয়োগকারী আদিম ভূমিপুত্রদের জীবনবৃত্তির বিশেষায়ন ছিল মূলত ছোট পশু শিকার এবং বনজ খাদ্য সংগ্রহ। আর এসব ছিল অসাধারণ এক কঠিন কাজ— হিংস্রবন্য পশু শিকার করার যেন তারা নিয়েছিল এক ব্রত; আর সাফল্যে পেয়েছে দুর্জয়কে জয় করার এক অপরিসীম তৃপ্তি; মানুষ ও পশু পরস্পরের মধ্যে ছিল এক কঠিন সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা, বাঁচার লড়াই। তাই আদি মানব ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ, দলে ছিল সংহতি। এসব হালকা ধরনের ধারাল কর্তরী, সূক্ষ্মাগ্র ফলা, ধনুঃশর, আশুগ আভাস দেয় এক মৃগয়াভিলাষী জাতিগোষ্ঠীর। শিকার ও সংগ্রহের কাজে পুরুষজন অধিকাংশ সময় বাইরে থাকতে হত বলে গোষ্ঠীজীবন ছিল মাতৃপ্রধান।

এতদভিন্ন এখানে একটি ঈষৎ বড় প্রায় মসৃণ কুঠারের অনুরূপ হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এর কাজের প্রান্ত চওড়া ও ধারাল। দীর্ঘকাল অব্যবহৃত হবার ফলে এই প্রস্তরায়ুধের গায়ে কাদচে হালকা বাদামি

১। অস্ত্র—যাহা নিক্ষেপ [illegible] যায়, [illegible] তীরাগ্র ফলা, ছেদনী শস্ত্র—যাহা ক্ষেপণ করা যায় না, যথা, চাঁচ[illegible] ছুরিকা [illegible]

আভাযুক্ত প্যাটিনা দেখা যায়। এতদ্দেশে উপরত্ন প্রস্তরে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের পুঁতি পাওয়া গেছে।

দেউলপোতায় তাম্রনির্মিত গোবর পোকাকার আশ্চর্যজনক মাদুলির কতিপয় প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে (চিত্র-৩)। এই মাদুলিগুলি মিশরীয় স্কারাব মাদুলির সঙ্গে মিল দেখা যায়। তাছাড়া এখান থেকে তামার তৈরি কাজল কাঠি ও ক্ষুদ্রাকৃতি জাহাজের একটি ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে।

হরিনারায়ণপুর : ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রায় চার মাইল দক্ষিণে হুগলি নদীর পূর্ব তীরে কুলপি থানার অন্তর্গত হরিনারায়ণপুর গ্রামের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে কালিদাস দত্ত একটি চপার (ছেদনী), বড় নোড়া, কয়েকটি ছোট সেল্ট, হাতুড়ি পাথর পেয়েছেন। তাছাড়া কিছু ক্ষুদ্রায়ুধ; যা চার্ট জেস্‌পার, ফ্লিন্ট পাথরে তৈরি, একাধিক মসৃণ সেল্ট ও নোড়া আগ্নেয় শিলা কালো ব্যাসল্ট ও সকুঠিন সবুজাভ নিস্ পাথরখণ্ডে তৈরি ও বালিপাথরের হাতুড়ি সংগ্রহ করেছেন। বেলনাকর নোড়াগুলির মধ্যে একটি (প্রায় ৪.৫ × ৪.০ সেমি.) ঈষৎ ধূসরাভ, তার দুই প্রান্ত ভাঙা; ছোট একটি (প্রায় ৭.৫ × ৪.৪ সেমি.) চ্যাপ্টা, নিকষ কালো; আরেকটি (প্রায় ১৬.০ × ৪.৫ সেমি.) পলিত-কালো, দুই প্রান্তে ভাঙা ছোট ছোট চিহ্নযুক্ত; অপর একটি (প্রায় ১৬.৫ × ৪.৪ সেমি.) ধূসরাভ-কালো, দুপ্রান্ত প্রায় সমান গোলাকার এবং বড় অন্যটি (প্রায় ১৯.৫ × ৬.২ সেমি.) একপ্রান্ত ব্যবহারে অধিক ক্ষয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। ত্রিভুজাকার সেল্টগুলির মধ্যে ছোটটি (প্রায় ৩.৫ × ৩.০ সেমি.) কালো, ধারাল প্রান্ত সোজা; অন্য একটি (প্রায় ৫.০ × ৩.৫ সেমি.) ধূসরাভ, ধারাল প্রান্ত সরল, তবে বক্র, উপর পৃষ্ঠতলে একাংশ ভাঙা এবং অপর একটি (প্রায় ৪.০ × ৩.৫ সেমি.) ধূসরাভ, ধারাল প্রান্ত সোজা এবং কুঁদা (বাট) প্রান্ত সমতল পলকাটা। এটা দেখে মনে হয় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার পক্ষে বেশ উপযোগী। ত্রিভুজাকার সেল্ট ও নোড়া প্রয়োজনমাফিক ঘষে মসৃণ করা (চিত্র—৪)। এখানে প্রাপ্ত সেল্ট মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত তাম্রলিপ্তে ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অন্তর্গত পূর্ব শাখার তৎকালীন অধীক্ষক এস এন দেশপাণ্ডের তত্ত্বাবধানে যে খননকার্যে আবিষ্কৃত সেল্টের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০-২০০০ বছর আগেকার বলে অনুমেয়। তবে এখানে প্রাপ্ত মসৃণ ছোট সব সেল্ট নিঃসংশয়ে অনন্য ও বিশেষ ভাবোদ্দীপক। এগুলি নবাশ্মীয় কালের, কি আদি ঐতিহাসিক কালের এ নিয়ে আছে সংশয়। তবে আদি ঐতিহাসিক কালের বলে ধারণা করা হয়। এগুলির ঠিক ব্যবহার, প্রকৃত তাৎপর্য কী ছিল তা প্রশ্নাতীত নয়; এখনও অজ্ঞাত। মনে হয় এসব ক্ষুদ্রাকার সেল্ট সূত্রধরগণ কাঠে র‍্যাঁদা দেবার ছেনি বা লৌকিক আচার পালন সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে বা রোগোদ্ধারে অভীষ্ট ঔষধীয় বা অনির্বচনীয় অপযাদুমন্ত্রাদি তুকতাক ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির দৈবশক্তির প্রতীকরূপে বা ক্ষুদ্রাকার নমুনা যা দেখে পরে বড় মাপের অনুরূপ সেল্ট তৈরি করতে সম্ভবত সময় লেগেছে প্রায় ৬ঘন্টা। পাথরের এরূপ সেল্টের ছেদন প্রান্ত চওড়া, খুব ধারাল ও সরল; বর্তমানকালের লোহার কুড়ুলের এক আদিরূপ। নোড়া শস্যদানা চূর্ণনকারী এক পেষণযন্ত্র—যা উন্মুক্ত করে এক কৃষিভিত্তিক জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে
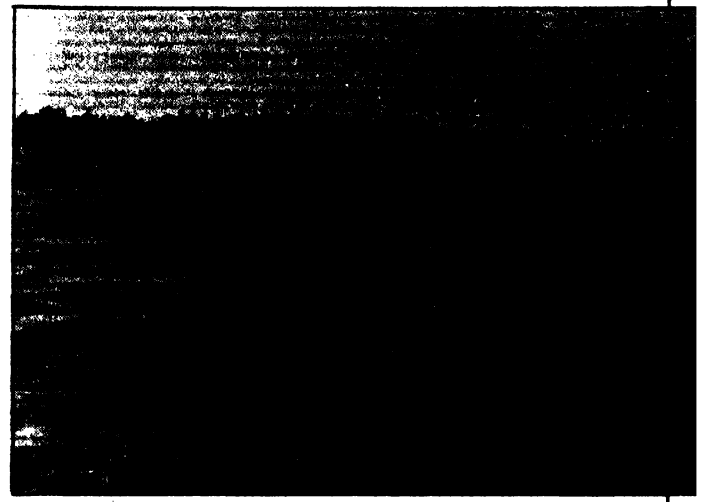
সমুদ্র মোহনায় সুন্দরবন অরণ্যের হাতছানি

এবং কৃষি উৎপাদনের উন্মেষ কালের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া এখানে নদীর উত্তাল তরঙ্গ প্লাবিত ক্ষয়িত অঞ্চল থেকে চুনে পরিণত স্তূপাকার কচ্ছপ, শামুক, ঝিনুক, গুগলি, কাঁকড়ার খোলা, মাছের কাঁটাও তার সঙ্গে ধূসরবর্ণের বেলেপাথরে তৈরি অসমান্তরাল চতুর্ভুজাকার, গায়ে খাঁজযুক্ত জালকাঠি (প্রায় ৩.৫ × ৩.০ সেমি.) পাওয়া গেছে। খাঁজ দেখে মনে হয় যে, জালের দড়ি বাঁধার ফলে এরূপ হয়েছে। এসব থেকে বোঝা যায় যে, সেসময়ে মানুষ জলজ প্রাণী খাদ্য হিসাবে আহরণ করেছে।

এসব প্রস্তরায়ুধ একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, অপরদিকে তেমনই এই জেলার এক রোমাঞ্চকর বর্ণাঢ্য অতীত ইতিহাসের বিস্ময় আরেকটি পৃষ্ঠাকে উন্মোচন করে। সে সময় মানুষ খাদ্যের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে স্থায়ীভাবে জমির সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে; ফলে উত্তরণ আসে খাদ্য-স্বনির্ভরতায়। এ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আর সমাজ হয়ে পড়ে তৎকালে পিতৃ-প্রধান।

হরিনারায়ণপুরে ঝুড়িছাপযুক্ত হাতেগড়া মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এসব কৌলাল প্রোটো-হিস্‌টরিক কালজ্ঞাপক। এখান থেকে হাড়ের তৈরি কিছু সূঁচ, পতঙ্গদেহাকার ব্রোঞ্জ মাদুলি পাওয়া গেছে। তাছাড়া প্রাপ্ত আয়তনাকার একটি মৃৎখণ্ডে পরস্পর মুখোমুখি দুটি পাখি, সূঁচালো চঞ্চুসহ একটি হরিণ? পাখীদ্বয়ের মধ্যে, গোলাকৃতি একটি সীলে ককুদ বৃষের প্রতিরূপ এবং এতদভিন্ন খুব ছোট চক্রাকার আরেকটি সীলে একজন মানুষ দাঁড়ানো আছে। এগুলি প্রোটো-হিস্‌টরিক শৈলীজ্ঞাপক।

সাগরদ্বীপে বামনখালি মন্দিরতলা : সাগরদ্বীপে বামনখালি মন্দিরতলায় কিছু ক্ষুদ্রায়ুধ নিদর্শনের হদিস পাওয়া গেছে। তদ্ভিন্ন তথায় হুগলি নদীর ভাঙনে ছোট মসৃণ সেল্ট সংগৃহীত হয়েছে।

কাকদ্বীপে পাকুড়তলা : সুন্দরবনের ১০নং লটে কাকদ্বীপের কুলপি থানার অন্তর্গত পাকুড়তলা গ্রামে ও ৫নং লটে ঝুড়িছাপযুক্ত পোড়ামাটির মোটা কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। এই পাত্রগুলির অধিকাংশই ৫"×৪" আয়তনবিশিষ্ট। মোচাকৃতি ছোট এসব পাত্রের

তলদেশ সমতল নয় এবং সোজাভাবে মাটির উপর বসিয়ে রাখা অসম্ভব। এগুলি কুঁড়ি (ছোট পাত্র)—স্থানীয় এই নামে পরিচিত। অনেকে আবার এগুলিকে নুনের কুঁড়ি বলেন। তাই মনে করা যায় যে, একদা এসব পাত্রে লবণ তৈরি করা হত। কিন্তু এসব পাত্রে জল অল্প ধরে। তাই ইহা খুব সঙ্গত ভাবনা যে, এসব ছোট পাত্র লবণ প্রস্তুত করার পক্ষে উপযোগী নয়; বরং লবণ পরিমাপ করা হতো এরূপ ধারণা করা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। অনুরূপ মৃৎপাত্র দক্ষিণ ভারতে আরিকামেড়ুতে অ্যারেন্টাইন স্তরের নিম্ন থেকে পাওয়া গেছে। ঘনিষ্ঠভাবে অনুরূপ ঝুড়িছাপযুক্ত মোটা বড় মৃৎপাত্র ও তার ভাঙা টুকরা মেদিনীপুর জেলায় শিলদার অদূরে তারাফেনী নদীর তীরে ধুলিয়াপুর প্রত্নক্ষেত্র থেকে পাওয়া গেছে। মনে হয় সুদূর অতীতকালে জনসমাজে ঝুড়িছাপযুক্ত মোটা মৃৎপাত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। পাকুড়তলা থেকে পতঙ্গদেহ তাম্র মাদুলি পাওয়া গেছে।

মণির তট : কাকদ্বীপের কুলতলি থানার অন্তর্গত ২৮নং লটে মনির তটে (মণির টাটে) স্তূপ থেকে তাম্রপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় যেসব তাম্রদ্রব্য পাওয়া গেছে এগুলি আদি ঐতিহাসিক কালের বলে মনে করা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় প্রাপ্ত উল্লিখিত প্রত্ননিচয়গুলি সংরক্ষিত আছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায়, বেহালা। তাছাড়া আছে কাকদ্বীপ গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র, সাগরদ্বীপ বামনখালি প্রগতি সংঘ, মন্দিরতলা সংগ্রহশালা, জয়নগর-মজিলপুর ভ্রাম্যমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা এবং আশুতোষ মিউজিয়াম অব্ ইন্ডিয়ান আর্ট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার নৈসর্গিক বর্ণবৈচিত্র্য, গভীর অরণ্য তরুতলা ও আগাছাকীর্ণ সবুজে ভরা গহন নিবিড়তা, দুর্গম, আবিল ও সর্পিল গতিতে আঁকা-বাঁকা নদী-নালা বিপদবহুল এবং শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশ প্রত্নবিদের চিকীর্ষু মনকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে তার শাশ্বত রূপে; আর আকৃষ্ট করে তাঁদের প্রত্ননিচয়ানুসন্ধানে। তবে এখানও পর্যন্ত এ অঞ্চলে আদি সভ্যতার পাথরের অতি অল্প হাতিয়ার ও তার শল্ক পাওয়া গেছে। তাছাড়া ভারতের অন্য স্থানে প্রাগৈতিহাসিক আবাসস্থলের মতো উপযোগী পাহাড়িয়া আবাসস্থলের হদিস এখানে এখনও পাওয়া যায়নি। আর পাথরের এসব হাতিয়ার তৈরির উপকরণের সংস্থান [illegible] কোথায় [illegible] হতে পারে জলস্রোতে আনীত উপলখণ্ড এবং ছোট [illegible] নুড়ি [illegible] হাতিয়ার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। তাছাড়া [illegible] আয়ুধের ধারাল প্রান্ত জলে আবর্তিত হতে হতে [illegible] আয়ুধ প্রাপ্তির উল্লিখিত স্থলগুলির অবস্থান হুগলি নদী [illegible] আবার দেউলপোতায় বালি ও জলবাহিত ছোট নুড়ি [illegible] বিশৃঙ্খল হয়ে আছে ক্ষুদ্রায়ুধের শল্কগুলি এবং হরি[illegible] ২৩ মাইল পশ্চিমে তমলুকের সেন্টের সঙ্গে হরি[illegible]ন্টের মিল বেশি। তাই, মনে হয় এখানে হুগলি নদী[illegible] তমলুক বা তৎসমীপবর্তী অন্য কোন উচ্চ জায়গা [illegible] বাহিত হয়ে এসব স্থলে সঞ্চিত হয়েছে। বা ইতস্ত[illegible] কয়েকটি প্রস্তরায়ুধের উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় [illegible] চব্বিশ পরগনার এই নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চল অতি প্রাচীন কালে আদি মানবের শিকার ও বনজ খাদ্য সংগ্রহের উপযুক্ত এক বিচরণ ভূমি ছিল। যেসব মানুষজন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীনভাবে বন্য পশুর অন্বেষণ ও তার পশ্চাদ্ধাবনে নিয়ত এসবাঞ্চলে করেছিল ইতস্তত বিচরণ, যেন ক্লেশ ও ক্লান্তি তাদের স্পর্শ করেনি। আর তাদের ধ্বনির অনুরণনে, কলকাকলিতে সে এক দূরকালও হয়েছিল অনুরণিত। তাই বাঁচার তাগিদে পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার করেছে তৈরি। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার প্রস্তরায়ুধের আদ্যোপান্ত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে তৎসম্বন্ধে এতদঞ্চলে চাই বৈজ্ঞানিক উৎখনন ও আরও ব্যাপক অনুসন্ধান। তবে একদিন এখানকার ধরাপৃষ্ঠের আলোছায়ায় রহস্যাবৃত বিস্মৃত যুগের ইতিহাস জানা যাবে। আর অতীত মানুষের অতীত মানুষের বাঙ্ময় আচরণ—চরিত্র চিত্রণ হবে। আর আটঘরা, ঘোষের চক, চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি স্থানের মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিকাশমান সভ্যতার পশ্চাতে যে এই প্রাচীনতর সংস্কৃতির এক পটভূমিকা আছে তা হবে আরও সুস্পষ্ট।

গ্রন্থসূচি

চৌধুরী, কমল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৮৭।

দত্ত, কালিদাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অতীত, প্রথম খণ্ড, (সম্পাদক, ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য ও হেমেন মজুমদার), সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৯৮৯।

দাসগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, প্রাগৈতিহাসিক 'সংস্কৃতি', (সম্পাদক, সজীবকুমার বসু), প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৭০।

দাসগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, প্রাগৈতিহাসিক চব্বিশ পরগণা দেউলপোতা, 'সংস্কৃতি', (সম্পাদক, সজীবকুমার বসু), তৃতীয় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৬৪।

দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র, প্রাগৈতিহাসিক চব্বিশ পরগণা, ২৪পরগণা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলন, বারুইপুর, ১৯৮৩।

ভৌমিক, অতুলচন্দ্র, প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাম্রলিপ্ত, 'পূর্বাদি', (সম্পাদক, ইন্দুভূষণ অধিকারী), বার্ষিক সংকলন, তমলুক, মেদিনীপুর, ১৯৯৩।

ভৌমিক, অতুলচন্দ্র, প্রাগৈতিহাসিক দক্ষিণ ২৪ পরগণা, গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র মাসিক পত্রিকা, (সম্পাদক শ্রীনরোত্তম হালদার), ১৩ বর্ষ, আগষ্ট সেপ্টেম্বর, শরৎ সংখ্যা, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৯৯৫।

হালদার, নরোত্তম, গঙ্গারিডি : আলোচনা ও পর্যালোচনা, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৮৮।

Bose, Bibhuti Bhusan (ed), *Kalidas Dutta-An Archaeologist of Bengal*, Kalidas Dutta Smriti Sangrahasala (circulating), Jaynagar-Majilpur, South 24 Parganas, West Bengal, 1989.

Willcock, Willium, *Ancient System of Irrigation in Bengal.*

Dasgupta, P.C. (ed), *Exploring Bengal's Past*, Directorate of Archaeology, West Bengal, Calcutta, 1966.

Ghosh, A.(ed), *Indian Archaeology 1954-55-A Review*, Department of Archaeology, Government of India, New Delhi, 1955.

Hunter, W.W., **A Statistical Account of Bengal**, Vol. I. First Reprint, D.K Publishing House, Delhi, 1973.

Oldham, R.D., *Geology of India : Stratigraphical and structural Geology*, 1893.

'O' Malley, L. S. S., *Bengal District Gazetteer 24 Parganas*, XXXI.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : চিত্র ১—শ্রীমতী ভাস্বতী রায়চোধুরী, চিত্র ২,৩,৪—রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বেহালা

লেখক পরিচিতি : রীডার, মিউজিওলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রেবতীমোহন সরকার

নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পশ্চিমবঙ্গের একটি দক্ষিণ প্রান্তিক জেলা এবং এই জেলাটি বেশ কয়েকটি দিকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আমরা দেখতে পাই যে এই জেলাটির অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি এই রাজ্যের অন্যান্য জেলা থেকে কেবল পার্থক্যই রচনা করেনি—নানা বিষয়ে এটি স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছে। জল ও জঙ্গলের মাপে এর বিকাশ ও বিস্তৃতি সর্বাগ্রে লক্ষণীয় বিষয়। সেই জঙ্গলের প্রকৃতিও আবার বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সমগ্র বিশ্বের প্রকৃতি-পরিবেশে এই জঙ্গল একটি আকর্ষণীয় বিষয়। এখানের বনাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদরাজির উৎপত্তি ও বিকাশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় রচনা করেছে। লবণাক্ত নদনদী এবং খাড়িগুলির জটাজালে সমাকীর্ণ সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে এই বিশেষ বনভূমির মধ্যে রয়েছে নানা জাতের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। লবণাক্ত জল ও জমির সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করে সেই প্রতিকূলতার সঙ্গেই এরা সখ্যতা স্থাপন করেছে। সেই ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে একদা সুন্দরী নামের উদ্ভিদের আধিক্যহেতুই নাকি এই বিশাল বাদাবন সুন্দরবনে পর্যবসিত হয়েছিল। ইতিহাসের গভীরে সে তথ্য নিহিত এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্যও রয়েছে। এই সুন্দরী বৃক্ষ সমন্বিত বাদাবনে "রয়েল বেঙ্গল টাইগার" সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে। এই বিশেষ প্রজাতির বাঘটি তার রাজকীয় স্বভাব নিয়ে বঙ্গভূমির এই দক্ষিণাঞ্চলটিকে জীবজগতে এক বিশিষ্ট আসন দান করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানেও এই অঞ্চলটি বিশিষ্টতার সূচনা করে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব-দ্বীপের একেবারে দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বহু ছোট-বড় নদ-নদী ও খাড়িসমূহের উপস্থিতিতে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার দক্ষিণাংশের ভূমিভাগ বহু ছোট-বড় দ্বীপের সমষ্টিতে প্রভাবিত হয়েছে। এই অংশটিতে ভাঙাগড়ার কাজ এখনও চলেছে। নদ-নদী ও খাড়িসমূহের জটাজাল সমগ্র ভূখণ্ডটিকে বুঝি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে। নদ-নদী ও খাড়িগুলি সমুদ্রবক্ষের আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমুদ্রের উচ্ছ্বাস এই সকল সংলগ্ন স্রোতধারার মধ্য দিয়ে ভূমিভাগের বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। জোয়ারের জলস্ফীতি এখনও বহু দ্বীপকে নিমজ্জিত করে দেয়—আবার ভাটার টানে এদের প্রকাশ ঘটে। জোয়ারভাটার পশ্চাৎপটে এদের এই লুকোচুরি দক্ষিণ চব্বিশ- পরগনা জেলার দক্ষিণাংশের ভূমিভাগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিগর্ভ হতে প্রাপ্ত নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণগুলিই এই প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্বের নির্দেশ দান করে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থানে যেমন সাগরদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, পাকুড়তলা, রাক্ষসখালি, দেউলপোতা, কঙ্কণদীঘি রায়দীঘি, জটার দেউল প্রভৃতিতে বহু পোড়ামাটি ও পাথরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে প্রাচীন মানব সভ্যতার ব্যঞ্জনা মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের নানা স্থানের ভূমিগর্ভ হতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর ও অস্থি নির্মিত হাতিয়ার থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক যুগের প্রস্তর নির্মিত ও পোড়ামাটির কারুকার্য সমন্বিত দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাগরদ্বীপ অংশে মন্দিরতলা ও পাকুড়তলায় তাম্রমুদ্রা এবং সন্নিহিত দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে কিছু রৌপ্যমুদ্রার আবিষ্কার এই অঞ্চলে উন্নত ধরনের মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসন্দিহান করে তোলে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলা প্রকৃতপক্ষে হিমালয় পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত গঙ্গানদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। গঙ্গার উদ্দাম স্রোতধারা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তার অসীম ও অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় বয়ে আনা পলিজ মৃত্তিকা ধীরে ধীরে জমতে শুরু করলে গঙ্গার প্রধান স্রোত নানাভাবে বাধা পেয়ে জলধারার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রথমে দ্বিধারায় ও পরে শতধারায় বিভাজিত হয়ে যায়। অবশেষে ক্লান্ত ও স্তিমিত গঙ্গার ধারা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাসঙ্গম রচনা করেছে—যে স্থানটি মানুষের নিকট কেমলমাত্র পূত-পবিত্র ও স্মরণীয়ই নয়, এই

সঙ্গম স্থানটির মধ্য দিয়েই অতীত দিনের মানুষেরা মহাসমুদ্রের অঙ্গনে প্রবেশলাভ করতেন এবং এটিই ছিল বহির্বাণিজ্য পরিচালনার একমাত্র জলপথ। কাজেই সঙ্গমস্থানটিই সেদিনের সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছিল।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার লোকজীবনের ইতিহাস গৌরবময়। সেদিনের কথা ও কাহিনী আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে এই অঞ্চলটি বরাবরই জনশূন্য এবং জঙ্গলময় ছিল বরং নানা তথ্যপ্রমাণের দ্বারা স্বীকৃত হয় যে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার দক্ষিণাঞ্চল একদিন সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এখানে অত্যন্ত উন্নত ধরনের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেই সুদূর অতীতের দিন থেকেই—বিভিন্ন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বহু
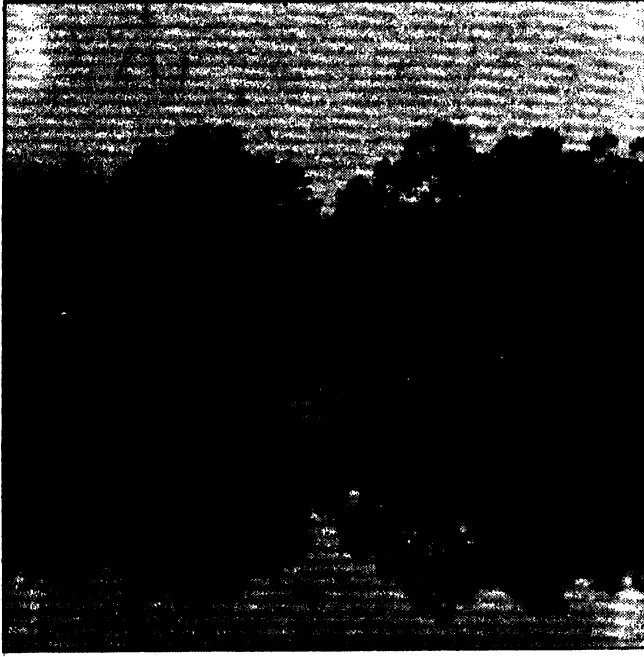
সুন্দরবন অরণ্যের দৃশ্য

জনগোষ্ঠী এখানে কর্ম উপলক্ষে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। সে বিষয়ের নানা বাস্তব নিদর্শন এই অঞ্চলের ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে আজকের এই অংশটি নদ-নদী পরিবৃত হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছে—লবণাক্ত জলরাশির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম পরিচালনা করে সেই জঙ্গল হিংস্র [illegible] মনুষ্যগোষ্ঠীর নিকট বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বিপদস[illegible] এই বনভূমির বৈচিত্র্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বন[illegible] সঙ্গে সৌন্দর্য পাশাপাশি বিরাজিত। এই জেলা[illegible] সামগ্রিকভাবে আজ সুন্দরবন নামে পরিচিত। সমগ্র [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে আজ সুন্দরবন একটি বিশিষ্ট নাম। এ[illegible] প্রকৃতি, উদ্ভিসমূহের বিভিন্ন ধরন, বহু বিশেষ জা[illegible]াস এবং তাদের অভিযোজন পদ্ধতি জীবজগতের [illegible]ার সন্ধান দেয়।

মোটামুটিভাবে [illegible]মিটার জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত বিশাল এলাকা জুড়ে [illegible]। সামগ্রিক এলাকাটি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র—এই দুটি [illegible] ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলনের পরিপ্রেক্ষিতে রূপলাভ করেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ গড়ে উঠা এই সুন্দরবন আজও পৃথিবীর মহাবিস্ময়। ভারতীয় সুন্দরবন সর্বমোট ৯৬৩০ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। পশ্চিমে হুগলি নদীর মোহনা, পূর্বে ইছামতী-রায়মঙ্গল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে ডামপিয়ের-হোজেস রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুন্দরবন অঞ্চল তথা দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের রূপরেখা অঙ্কনে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই এলাকাটির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির আলোচনা ও ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে উঠে। কারণ, সমগ্র এলাকাটি বহুকাল জুড়ে ত্বরিৎ ভৌগোলিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিল যার রেশ আজিও একইভাবে লক্ষনীয়। ভৌগোলিক পরিবর্তন ধারা এই অঞ্চলের জনজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। নদনদীর গতিধারার ও ভূমিভাগের হঠাৎ ও ব্যাপক পরিবর্তন কখনও জনজীবনের অনুকূলে এসেছে, জীবনযাপনের উপযোগী নানা পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আবার কখনও বা ভৌগোলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিকূলতার প্রচণ্ড প্রকোপে জনজীবন স্থিমিত হয়ে পড়েছে। সমৃদ্ধশালী জনপদ জলরাশিতে বিলীন হয়েছে। এই ধরনের ঘটনাবলী সুন্দরবন এলাকার অতিপরিচিত সাধারণ ব্যাপার। সেই সব ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে সুন্দরবনের ইতিহাস—এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর পর্যায়ক্রমিক ধারায় সেই ইতিহাস সাক্ষী।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে সুন্দরবন নামটি কিন্তু খুব প্রাচীন নয়। পুরাকালে এই অঞ্চলটি অন্যনামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে উপকূলবঙ্গের এই অঞ্চলটিকে পাতাল বা রসাতল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর বহু পরে ঐতিহাসিককালে মেগাস্থিনিস, ডিওডোরাস ইত্যাদি পরিব্রাজকের রচনা থেকে এবং টলেমির ম্যাপ ও প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে এই ভূখণ্ডটি পূর্বে গঙ্গারিডি নামে পরিচিত ছিল। টলেমির ধারণা অনুযায়ী সমস্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপগুলি গঙ্গারিডির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর রচিত ম্যাপে এই গঙ্গারিডির রাজধানী গঙ্গাসাগর এলাকায় গঙ্গে নামে এক বন্দরের সন্নিকটে ছিল। হিউয়েন সাঙ এই অঞ্চলটিকে সমতটের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। পাল ও সেন যুগে এই এলাকাটি ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রীচৈতন্যযুগে এই সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকাটি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে ছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে মুসলমান আমলে এর পরিচিতি হয়েছিল ভাটিদেশ হিসেবে। এমনিভাবে এই উপকূল বঙ্গের অংশটি নানা সময়ে নানা নামে পরিচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন তথ্য থেকে পাওয়া যায়, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কালেক্টর রাসেল সাহেব এবং পরবর্তীকালে হেঙ্কেল সাহেব যখন চব্বিশ-পরগনা অঞ্চলের জমি বন্দোবস্ত দিতে শুরু করেন তখনও এই অঞ্চলকে সুন্দরবন নামে চিহ্নিত করা হয়নি। প্রসিদ্ধ জনমত, সুন্দরীবৃক্ষের উপস্থিতি এই বনাঞ্চলকে সুন্দরবন করেছে। কেউ কেউ বলেন সমুদ্র সন্নিহিত 'সুমুদ্রবন' কথাটি সমুদ্রের বন এবং পরে অপভ্রংশ হয়ে সুন্দরবন হয়েছে। আবার কারোর মতে এই অঞ্চলের বিস্তৃত অংশ প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অরণ্যঘেরা সেই চন্দ্রদ্বীপবন বা চন্দ্রবন কালক্রমে সুন্দরবন নামের রূপ ধারণ করেছে। তবে সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে সুঁদরী গাছের উপস্থিতিই এই অঞ্চলটিকে সুঁদরবন নামে পরিচিতি দান

করে। এই সুঁদ্‌র কথাটি ইংরেজিতে লিখতে গিয়ে ব্রিটিশদের নিকট এটি Sundarban (সুঁদরবন) নামে চালু হয়।

এই সুন্দরবন তখন সত্যিসত্যিই বনাঞ্চল ছিল না। এই অংশে ছিল সমৃদ্ধ জনপদ। তদানীন্তন সময়ে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রধান দ্বারটিকে ঘিরে বহু মানুষের আগমন ও বসবাস যে গড়ে উঠবে একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। কাজেই আজ যেখানে হিংস্র শ্বাপদের বাসভূমি, লবণাক্ত জলরাশির মধ্যে বাদাবনের প্রাধান্য, সুদূর অতীতের কোন একসময় এখানেই ছিল সমৃদ্ধশালী মানব আবাস ও
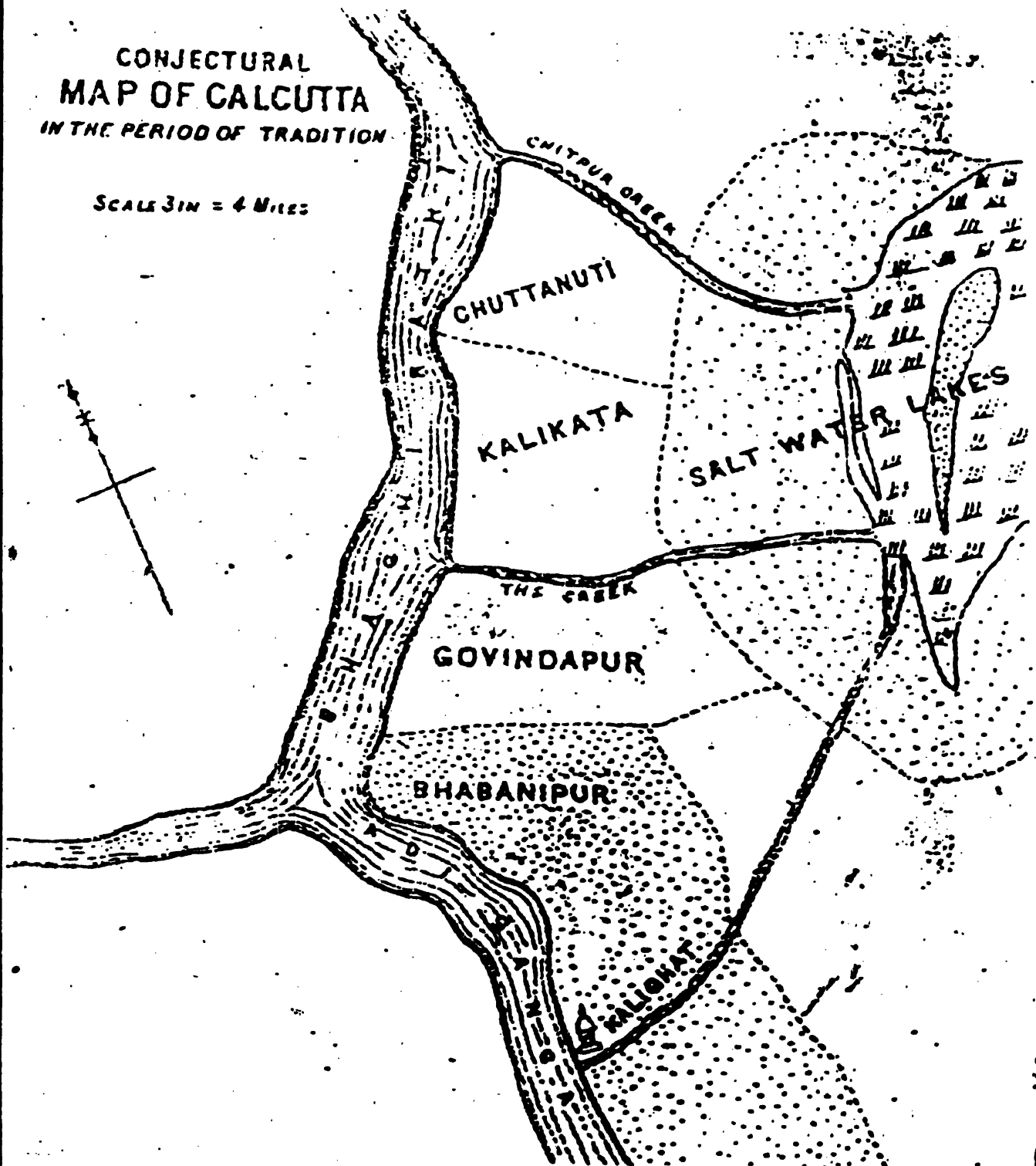
প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বের কলিকাতা, কালীঘাট ও আদি গঙ্গা

সুন্দরবনের বিধ্বংসী ঝড়ে ভেঙে পড়া বিদ্যালয় গৃহ

কর্মভূমি। নদ-নদীর জটাজালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থাকে নির্ভর করেই সেদিনের আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সার্থকভবে রূপলাভ করেছিল।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার যে ভূমিভাগ বর্তমানে বিস্তৃত রয়েছে তাকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) উত্তরাঞ্চলের উচ্চভূমি প্রভাবিত অংশে অল্পবিস্তর স্থায়ী ব-দ্বীপভূমি। এখানে জোয়ার-ভাটার প্রভাব কম এবং (২) দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নভূমি প্রভাবিত অংশের সক্রিয় এবং গতিশীল ব-দ্বীপভূমি। এই অংশটি এখনও গঠনের ক্রিয়াশীলতায় প্রভাবিত। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার অধিকাংশ ভূমিভাগ এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। গঙ্গার স্রোতধারা এই নিম্নভূমির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে বিরাজিত ছিল। উত্তর ভারতের প্রধান নদী গঙ্গা বঙ্গদেশে প্রবেশ করে আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গার মূল স্রোতোধারাটি পদ্মা নাম নিয়ে চলে গিয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে এবং অবশেষে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছে। সেদিনের মূলধারাটি যাকে আমরা আদিগঙ্গা বলি, ছিল প্রাণবন্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এই নদীর উপর দিয়েই সমুদ্রগামী জাহাজ ও নৌকো প্রভৃতি জলযান বহির্ভারতে বাণিজ্যের জন্য পাড়ি দিত। আদিগঙ্গার দুই তীরে বর্ধিষ্ণু জনপদ গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন সাহিত্যে আমরা আদিগঙ্গা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিতে এবং চৈতন্যভাগবতেও আদিগঙ্গার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। এই সময় আদিগঙ্গা সুবিস্তৃত এবং সুনাব্য নদী ছিল। মেগাস্থিনিস, পেরিপ্লাস প্রমুখ পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে দক্ষিণবঙ্গে আদিগঙ্গার তীরে অনেক নৌবহর ছিল। বিভিন্ন নদীও সমুদ্রপথে এই বন্দরগুলির সঙ্গে মিশর, গ্রিস, রোম এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অনেক স্থানের যোগাযোগ ছিল। কাজেই বিশ্বের তৎকালীন উন্নত দেশগুলির সঙ্গে এই আদিগঙ্গার মধ্য দিয়েই ভারত যোগাযোগ রাখত। সেদিনের বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত মসলিন, রেশম বস্ত্র, সুগন্ধীদ্রব্য প্রভৃতি এই পথ দিয়ে দূরদূরান্তরে রপ্তানি হত। কাজেই এটি খুব স্বাভাবিক ঘটনা যে
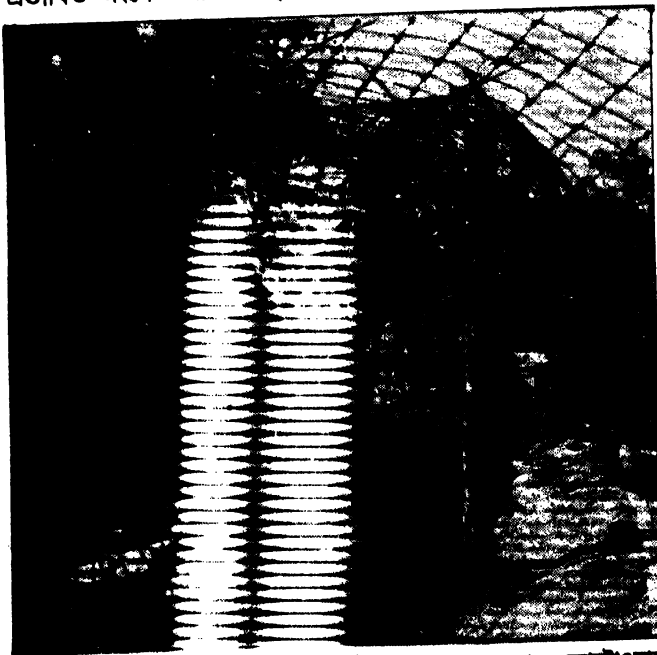
ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন অরণ্যের ওয়াচটাওয়ার
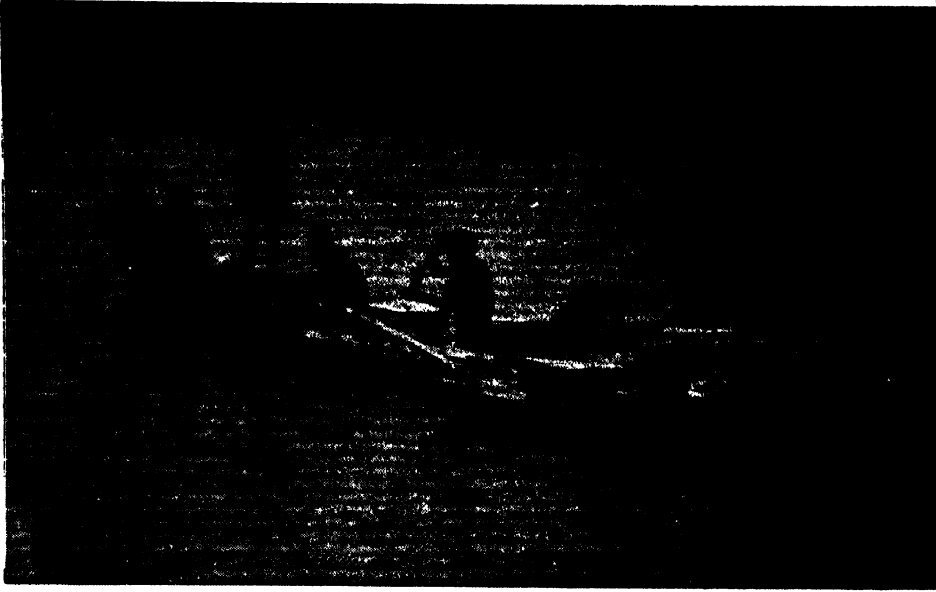
সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরছেন জেলেরা

আজকের সুন্দরবনের এই অঞ্চলে যেখানে বহির্বিশ্বে যাওয়ার প্রধান দরজা সেখানে সমৃদ্ধশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল।

আদিগঙ্গা উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত। তখনকার কলকাতার উপর দিয়ে যে অংশে আদিগঙ্গা প্রবাহিত হত তা ছিল জলাভূমি অধ্যুষিত ও জঙ্গলময়। আদিগঙ্গার তীরেই বিখ্যাত কালীমন্দির গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনকার দিনে এই মন্দিরের চতুর্দিকেই ছিল জঙ্গল। এখানে কাপালিক ও ডাকাতদের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। আদিগঙ্গার উপর দিয়ে নৌকো, জাহাজ চালানোর সময় যাত্রীরা অথবা নাবিকেরা এখানে ভয়ে নামতেন না। এই এলাকায় এলেই দ্রুত পার হয়ে যাওয়ার কথাই সবাই চিন্তা করতেন। কালীঘাট তখন একটি ছোট গ্রামমাত্র। তার কিছুদূরে কলকাতারও ওইরকমই অবস্থা ছিল। এই দুটি জনপদের মাঝখানে ছিল গভীর জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চল। তীর্থযাত্রীরা বহু কষ্ট সহ্য করে কালীঘাটে পুজো দিতে আসতেন। বিভিন্ন পাল-পার্বণে মানুষ দলবেঁধে এখানে আসতেন এবং দিনের আগে থাকতে থাকতেই এই স্থান ত্যাগ করতেন। তবুও বহু তীর্থযাত্রীকে ডাকাতের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। কলকাতা থেকে ধনী ব্যক্তিরা আসতেন পালকি চড়ে।

এই আদিগঙ্গাই ভাগীরথী। মহাত্মা ভগীরথ আনীত গঙ্গাই এই সেই ভাগীরথী। অতি প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে সুদূর অতীতে নদ-নদী মজে গিয়ে দেশে গভীর জলসঙ্কট দেখা দেয়। কৃষিকাজ বিপর্যস্ত মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জলাভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সূর্যবংশীয় রাজা ভগীরথ উত্তর ভারত থেকে বিলুপ্ত নদীপথকে সংস্কার করে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত প্রবাহিত করেছিলেন। সেই জলপ্রবাহে সমগ্র রাজ্যের অসংখ্য মরণাপন্ন মানুষ জীবনের স্বাদ ফিরে পায়। এই উপকথাটির মধ্যে এতদঞ্চলের জনজীবনের এক মহাসত্য লুকিয়ে রয়েছে। আদিগঙ্গার স্রোতধারা যখন স্তিমিত হতে শুরু করল, তখন থেকেই নদীমাতৃক সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এটি ভৌগোলিক সত্য। গঙ্গার প্রাচীন ধারাটি আজ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গিয়েছে। এর সমগ্র পথটিতে কোথাও সে শীর্ণকায়া নালার রূপ ধারণ করেছে, আবার কোথাও বা ছোট জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার নিম্নভূমি অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং উন্নয়নশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত গঙ্গার অপমৃত্যুই এই অংশে বর্ধিষ্ণু জনপদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ। লবণাক্ত জলের প্রভাব থাকলেও সেদিন গঙ্গার অপর্যাপ্ত জলরাশি এবং তার স্রোতের তীব্রতা সমুদ্রের জলকে খুব বেশি অন্তর্মুখী হতে দিত না। গঙ্গার জলধারার প্রচণ্ড তোড় নদীমুখে সঞ্চিত পললরাশিকে দূরে নিক্ষেপ করতো। ফলে নদীমুখ সকল সময়েই প্রশস্ত ছিল। এই জলরাশিতেই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কৃষিকাজ খুব ভালভাবেই সম্পন্ন হত। প্রধান ফসল ধানের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষেরও নিদর্শন মেলে। কিন্তু কালক্রমে উচ্ছ্বাসময়ী গঙ্গা পরিপার্শ্বিকতার চাপে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এই পরিবর্তন হঠাৎ আসেনি, ধীরগতিতে গঙ্গার প্রাণোজ্জ্বল জীবন নিভতে শুরু করল। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার কৃষিজীবী মানবগোষ্ঠীর জীবনে নেমে এল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কিন্তু মানুষ একেবারেই আপন ভাগ্যের উপর জীবনকে সঁপে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি। গঙ্গার স্তিমিত স্রোতধারাকে বিশাল ও কার্যকরী প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে প্রবহমান করে তোলার প্রচেষ্টায় কোনও এক মহামানব ভগীরথ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। জনশ্রুতি এ বিষয়ে প্রভূত আলোকসম্পাত করে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রাচীন জনজীবনের ধারার উৎস সন্ধান অতীব দুরূহ, কারণ এখানের সুদূর অতীতের ইতিহাস মুখর নয়—অধিকাংশই অনুমানভিত্তিক। তাহলেও এখানের বিভিন্ন জনশ্রুতি এবং অত্যল্প পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে সামগ্রিক জনজীবনের পশ্চাৎপটটিকে সুচারুভাবে পুনর্গঠন করতে না পারলেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে দক্ষিণাঞ্চলের এই ভূমিভাগে সভ্যতার উন্মেষ অতিপ্রাচীন। ভূমিগঠনের ক্রিয়াশীলতায় প্রভাবিত এই ব-দ্বীপ অঞ্চলে জনজীবন বারে বারে বিপর্যস্ত হয়েছে। নদীসমূহের জলোচ্ছ্বাস, আবহাওয়ার

খামখেয়ালিপনা, ভূস্তরের আকস্মিক অবনমন এই সকল বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। এই অঞ্চলের ভূস্তর থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তৈজসপত্র এবং দেবদেবীর মূর্তির নানা নিদর্শন এখানের জনপদের অস্তিত্বের কথাই প্রমাণিত করে।

বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলের মানবজীবন ও সংস্কৃতির বিকাশ যে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুষ্ঠুভাবে ঘটেছিল তার প্রমাণ বিভিন্ন নৈসর্গিক ও ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। নদীসমূহের আকস্মিক জলোচ্ছ্বাস বহু সম্পন্ন জনপদকে নিমজ্জিত করেছে, কিছু প্রাচীন বিবরণীতে এর উল্লেখ রয়েছে। এই অঞ্চলের ভূমিভাগের ধরন অনুযায়ী ভূস্তরের হঠাৎ অবনমন একটি বিশেষ নৈসর্গিক ঘটনা। সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমিভাগ ভূ-অবনমনের মতো প্রাকৃতিক ঘটনায় বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে বহুবার এখানের উপরিভাগের মৃত্তিকা-স্তর তার উপর নির্মিত মানব আবাস, কৃষিক্ষেত্র এবং অন্যান্য মানব-প্রচেষ্টার বাস্তব নিদর্শন সহ ভীষণভাবে ভূ-অবমননের প্রকোপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ সমৃদ্ধ জনপদ তার সব কিছু নিয়ে একেবারে মাটির তলায় চলে গিয়েছে। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন, সমুদ্রতলের মৃত্তিকা ধীরে ধীরে ক্ষয় পেয়ে কখনও কখনও গভীর নিম্নস্তরে শূন্যতার সৃষ্টি করে। সমুদ্রগর্ভের এই শূন্যতার বিজ্ঞানভিত্তিক নাম Swatch of no ground. এই গহ্বরের উৎপত্তি হলে পার্শ্ববর্তী অংশ থেকে ভূমিভাগ নিম্নমুখী হতে থাকে—ফলে ভূপৃষ্ঠে আলোড়ন হয়। পরে সমগ্র এলাকাটি অবনমিত হয়। মুহূর্তে সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশি ওই অবনমিত এলাকাটিকে দখল করে নেয়। এমনিভাবে কোনও জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে যে জীবনচর্যার ধারা তিলেতিলে গড়ে উঠেছিল তা অতি অল্প সময়েই বিলীন হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে পুকুরে খুঁড়তে গিয়ে বা ওই ধরনের কোনও খননকার্যের সময় ৪০/৫০ ফুট নিচে বড় বড় গাছের নিম্নাংশ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানিং অঞ্চলে যখন বিভিন্ন রকমের খননকার্য চলছিল তখন সেখানের ভূমিভাগের গভীর তলদেশে বহু সুন্দরী গাছের গুঁড়ি প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এই এলাকাগুলি অরণ্যসমেত অবনমিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তার উপর আবার ধীরে ধীরে পলি সঞ্চিত হতে হতে সেই অবনমিত স্থানটির উপর ভূমিভাগ জেগে উঠে। প্রাকৃতিক কারণেই সেখানে আবার অরণ্যভূমির সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই ভূমি অবনমন সুন্দরবন অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার দক্ষিণাংশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে জনজীবনে প্রত্যক্ষ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। কোনও অংশের অবনমন ঘটতে থাকলে সেই অংশের মানুষ তার জীবনের অবিস্মরণীয় সম্পদকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ধ্বংসের হাত থেকে তারা তাদের তিলে-তিলে গড়ে তোলা ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, কৃষিভূমি, ব্যবসা-বাণিজ্যকে রক্ষা করতে পারেনি। জীবনরক্ষার তাগিদ তাদের অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য করেছিল। বংশ পরম্পরায় গড়ে ওঠা মানব সংস্কৃতি ও সমাজ হয়তো আবার কোনও ধরনের ভূ-অবনমনের ফলে সমাধি লাভ করে। সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিগর্ভ হতে প্রাপ্ত নানা ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শগুলিই এই প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্বের নির্দেশ দান করে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থানে যেমন সাগরদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, পাকুড়তলা, রাক্ষসখালি, দেউলপোতা, কঙ্কণদীঘি রায়দীঘি, জটার দেউল প্রভৃতিতে বহু পোড়ামাটি ও পাথরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে প্রাচীন মানব সভ্যতার ব্যঞ্জনা মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের নানা স্থানের ভূমিগর্ভ হতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর ও অস্থি নির্মিত হাতিয়ার থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক যুগের প্রস্তর নির্মিত ও পোড়ামাটির কারুকার্য সমন্বিত দেববীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাগরদ্বীপ অংশে মন্দিরতলা ও পাকুড়তলায় তাম্রমুদ্রা এবং সন্নিহিত দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে কিছু রৌপ্যমুদ্রার আবিষ্কার এই অঞ্চলে উন্নত ধরনের মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসন্দিহান করে তোলে। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত এই সব নিদর্শনগুলি আঞ্চলিক সংগ্রহশালাগুলিতে সযত্নে রক্ষিত হয়ে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার প্রাচীন মানব সভ্যতার একটি বিশিষ্ট দিকের প্রতি আলোকসম্পাত করে চলেছে। এছাড়াও এই অঞ্চলসমূহে আবিষ্কৃত জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং নানা অপৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মূর্তিগুলির আবিষ্কার এই অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সুপ্রাচীন মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথাই প্রমাণিত করে। যদিও এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পদ্ধতিগত উৎখননের ফলে সংগৃহীত হয়নি—কোনও কিছুরই ভূস্তরের সঙ্গে সমতা রক্ষিত করে সময় নির্ঘণ্ট রচিত হয়নি এবং অধিকাংশ আবিষ্কারই আপতিক সংগ্রহের (chance collection) পর্যায়ভুক্ত হলেও এগুলি যে বিস্মৃত অতীত দিনের মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনচর্যা ও কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্ননৃবিজ্ঞানের (Palaeoanthropology) প্রাথমিক কাজ হল মানুষের অস্থি-কঙ্কালের জীবাশ্মভূত অবশেষ এবং সেই সঙ্গে তাদের

জ্বালানি সংগ্রহ করে ফিরছেন শ্রমজীবী নারী
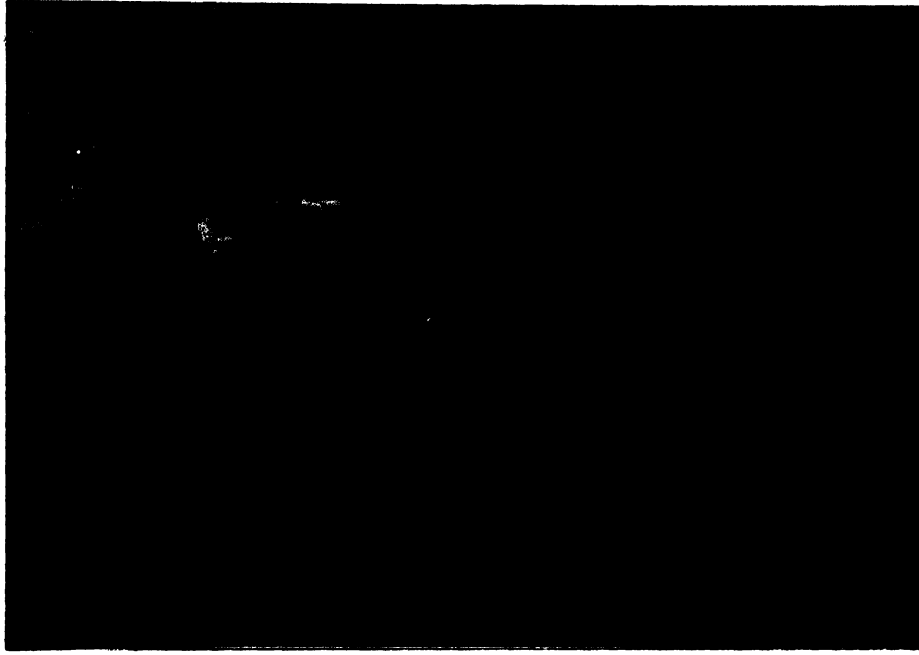
শৈশবের সাথী — *ছবি : পার্থ কুণ্ডু*

সম্পর্কযুক্ত মানবকর্ম প্রচেষ্টার নিদর্শনগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীর জৈব-সাংস্কৃতিক (Bio-cultural) লুপ্ত ধারাটির পুনরুদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ। কিন্তু এই পদ্ধতি সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন মানব সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া সূত্রটির খোঁজে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কারণ, এই অঞ্চলের ভূমিভাগ হতে এখনও পর্যন্ত কোনও মানব কঙ্কালের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। যেখানে মানুষের নির্মিত বা সংগৃহীত এবং ব্যবহৃত বস্তুসমূহের সন্ধান মিলেছে, সেখানে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের সূচনা করে না তবে তার সন্ধান না পাওয়ার প্রত্নবিজ্ঞানের নিরিখে সভ্যতার নিদর্শনগুলির সঠিক এবং নৃবিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন সম্ভব হচ্ছে না। এখানের কয়েকটি অংশে প্রাচীনকালের কয়েকটি অবলুপ্ত প্রাণীর অস্থি-কঙ্কালের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। তবে মানব কঙ্কালের কোনও জীবাশ্ম একেবারেই অনুপস্থিত থাকার জন্য এই প্রাচীন সভ্যতার সৃষ্টিকারী মানুষগুলির জৈবিক পরিচয় লাভে আমরা এখনও পর্যন্ত বঞ্চিত। সুন্দরবনের এই লবণাক্ত ভূমিভাগে বিভিন্ন ধরনের লবণ ও অ্যাসিডের উপস্থিতি অস্থি-কঙ্কালের সংরক্ষণের পরিপন্থী—নানা ধরনের বিক্রিয়ার ফলে অস্থি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে জীবাশ্ম সৃষ্টি হয় না। আবার এমনও হয়েছে যে বহু অস্থি-কঙ্কালের নিদর্শন নদী-সমুদ্রের ত্বরিৎ ভাঙাগড়ার খেলায় অতল জলরাশির গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছে অথবা পলিজ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে চিরসমাধি লাভ করেছে। এখান থেকে হঠাৎ বহির্গমন আর সম্ভব নয়। অন্ধকার অতীতের গর্ভে, লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়া এই নিদর্শনাবলী আর হয়তো কোনওদিনই তাদের নিঃশব্দ অথচ কার্যকরী কথা নিবেদন করবে না অথবা এমনও হতে পারে কোনও ধরনের ভূ-আন্দোলনের ফলে এদের পুনরাবির্ভাব ঘটে একটি বিস্মৃত অধ্যায়কে নবরূপে উজ্জীবিত করে তুলবে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা অঞ্চলের মানব সংস্কৃতি ও সভ্যতা সুপ্রাচীনকাল থেকেই নানাভাবে বিপর্যয়ের মুখে। এখানের প্রকৃতি বড়ই খামখেয়ালি এবং মুহূর্তে ভয়ঙ্করী। ভূমি অবনমনের মতো ভূকম্পনও এখানের ভূমিভাগের একটি বিশিষ্ট চারিত্রিক দিক। এই অঞ্চলের ভূমিভাগের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে সংবদ্ধ শিলাভাগের অস্তিত্ব কম এবং থাকলেও তা খুবই নমনীয় ও দুর্বল। এমতাবস্থায় নিম্নতর স্তরগুলিতে বিচ্যুতি ঘটা খুবই স্বাভাবিক এবং এই বিচ্যুতিই ভূমিকম্প সৃষ্টিকারী। এখানে ঐতিহাসিক যুগে বেশ কয়েকটি ভয়ঙ্কর ধরনের ভূমিকম্পন ঘটে গিয়েছে—তার পূর্বে ইতিহাসের আওতার বাইরে এই দুর্ঘটনা যে কতবার ঘটেছে তার হিসাব নেই। এর সঙ্গে ছিল ঝড় ও প্লাবন। সুন্দরবন অঞ্চলের এই প্রাকৃতিক পরিবেশে ঝড় ও প্লাবন খুব ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে, যার ফলে এখানের ধন ও প্রাণ বারেবারে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগের অন্তর্ভুক্ত ৫০০ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে ২১টি বড় ধরনের ভূমিকম্প এবং ঝড় ও প্লাবনের মতো ঘটনা ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিমপর্বে প্রবল এক ঝড়ে সাগরদ্বীপ অঞ্চলে ৬০/৭০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং অসংখ্য পশুপক্ষীর নিধন হয়। আবার ওই শতাব্দীর মধ্যভাগে ভূমিকম্প ও ঝড়ের যৌথ ক্রিয়ার ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের বহু অংশ জনশূন্য হয়ে পড়ে। এমনিভাবে এর পূর্ববর্তী যুগে যে কত দুর্ধর্ষ ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে তার ঠিক নেই। উপর্যুপরি বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অনবিকশিত এলাকা এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যিক পশ্চাদভূমির প্রকৃতির ক্ষতি করলেও এখানে বসবাসকারী মানুষেরা তাদের বহুবন্দিত ও কষ্টার্জিত আবাসভূমিকে ত্যাগ করতে পারেনি। ভূমিকম্প, ঝড় ও প্লাবনের দুর্বিপাকে পড়েও পরবর্তী মুহূর্তে মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসভূমিকে পুনর্নির্মাণে হাত লাগিয়েছে। এর জন্য মানুষ যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তা ওই অঞ্চলের পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক
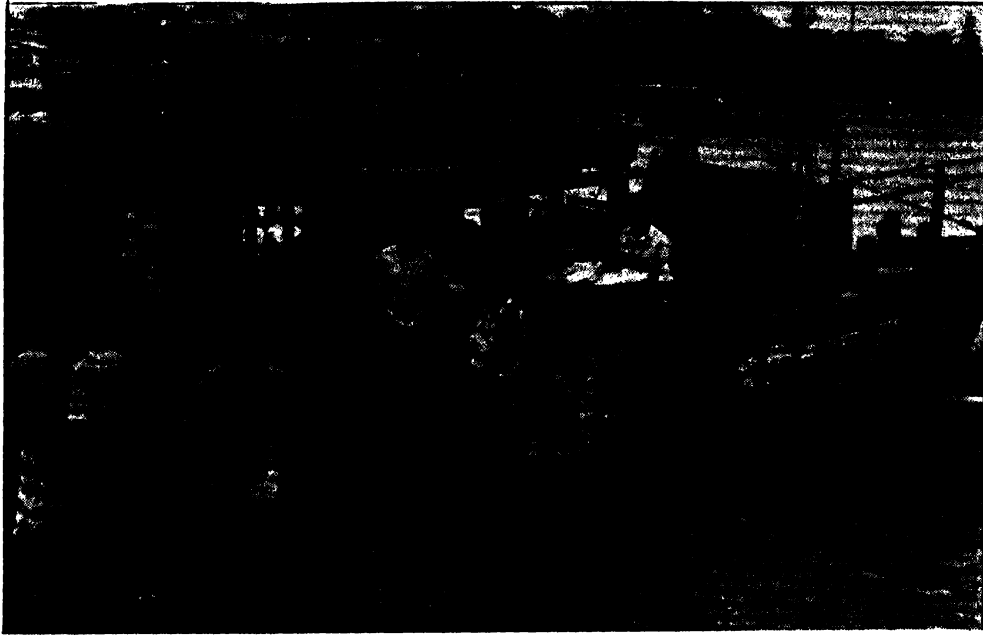
ট্রলার থেকে মাছ নামানো হচ্ছে

বিপর্যয় এবং তাদের ধ্বংসলীলার গভীরতাই প্রমাণ করে। উত্তর ও পূর্বভাগের ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র কার্যকরী পীঠস্থান হিসেবে বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এই অঞ্চলটিই বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। কারণ, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র রচিত নদ-নদীর জটাজাল এখানের জলপথকে বড় বড় জাহাজ গমনাগমনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। যে সময়ে জলপথই একমাত্র অবলম্বন সেই সময় গঙ্গানদীর নাব্যতা এবং তার বঙ্গোপসাগরে মিলন জলযানগুলির বহির্গমনের পথটিকে সাবলীল করে তুলেছিল। বিভিন্ন প্রাচীন কাব্যে, ধর্মগ্রন্থে এবং ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই জলপথ ধরে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মধ্য দিয়ে দূর সমুদ্রে গমনের বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

কালক্রমে গঙ্গানদী তার স্বাভাবিক নাব্যতা হারাতে থাকে। মোহনার স্রোতের [illegible] যাওয়ায় পললরাশিকে সবেগে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ [illegible] হারাল। এর ফলস্বরূপ গঙ্গার বুকে চড়ার সৃষ্টি হতে [illegible] প্রশস্ত মুখ সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়ার জন্য বড় বড় জাহাজে [illegible] করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। গঙ্গার উপর দিয়ে বহির্বাণি[illegible] দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল তা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল [illegible] ভাবেই এই অঞ্চলটি ধীরে ধীরে তার গুরুত্ব হারাতে [illegible] বাণিজ্যভিত্তিক জীবনধরার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভা[illegible] লের তৎকালীন মানবগোষ্ঠী খুবই অসুবিধাজনক পরি[illegible] ক্রপ্ত হল। এই অঞ্চলটিতে সকল সময়েই জলদস্যুদের [illegible] পণ্যবাহী নৌকো, জাহাজ লুটপাট করে এরা দ্রুতগামী [illegible] দূর সমুদ্রে চলে যেত। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বা[illegible] বং পণ্যবাহী জলযান। কিন্তু যখন এই সকল জলযানে [illegible] ম যেতে যেতে একেবারে বিরল হতে থাকল তখন [illegible] ঞ্চলের জনপদগুলিতে হানা দিল। অবরুদ্ধ জলপথের [illegible] ণিজ্য প্রায় বন্ধ, কাজেই নিজেদের বাঁচাতেই দস্যুদলের এই ভিন্নপথ গ্রহণ। একদিকে ভেঙে পড়া ব্যবসাভিত্তিক অর্থনীতি এবং অপর দিকে জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচার সমৃদ্ধ গ্রামগুলির জীবনধারাকে স্তব্ধ করে দিতে উদ্যত হল। বহু মানুষ এই দ্বিবিধ সমস্যায় পড়ে দলে দলে এই অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। যাঁরা কোনরকমভাবে টিকে থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছিলেন, তাঁরাও দস্যুদলের অত্যাচারে তাঁদের ঐতিহ্যময় বাসভূমি পরিত্যাগ করলেন। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার দক্ষিণাংশ জুড়ে যে বিভিন্নরূপী জনগোষ্ঠী নিয়ে সমৃদ্ধশালী জনপদ গড়ে উঠেছিল, তা ধীরে ধীরে কালের করাল গ্রাসে অবলুপ্ত হল।
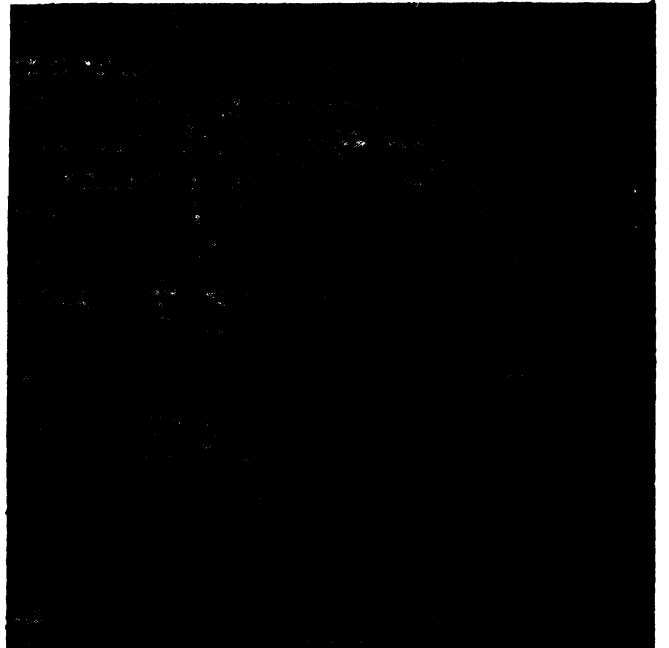
সামুদ্রিক মাছ রোদে শুকানো হচ্ছে
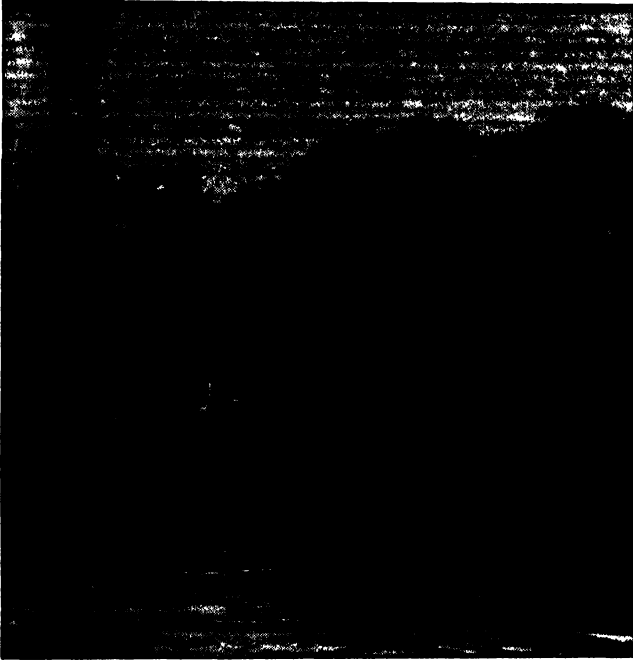
বাগদা চিংড়ির মীন ধরা হচ্ছে

এই জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এদের জাতিগত পরিচিতি (Racial identification) যেমন ভিন্নরূপী ছিল, তেমনি এদের ধর্মমতও ছিল নানাধরনের। অর্থাৎ এরা খুব সম্ভবত জাতিগত ও ধর্মগত বিষয়ে অসমগোষ্ঠীভুক্ত (heterogeneous group) ছিল। তবে অর্থনৈতিক জীবনধারায় এদের মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়েছিল। এবং এই অর্থনীতিই সেদিনের এই অঞ্চলের গ্রামজীবনের সমাজ-সংস্কৃতির ধারাকে রূপায়িত করেছিল। প্রখ্যাত ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী (ভারতে কর্মরত) হাটনের (Hutton) মতে এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী মূলত নিগ্রয়েড (Negroid) জাতিভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এখানে আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid) গোষ্ঠীর মানুষদের আগমন ঘটে। নর্দিক (Nordic) বা তথাকথিত আর্য (Aryan) জাতিগোষ্ঠীর মানুষের এরপর এখানে প্রব্রজিত হয়। উত্তর ভারত থেকে সরাসরি এদের আগমন ঘটেছিল বলে জাতি-বিজ্ঞানীদের ধারণা। উত্তর ভারতের বহু মানুষ বাণিজ্য পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের কাজে এই অঞ্চলে সপরিবারে বসবাস শুরু করেছিলেন। দুটি বিশেষ কারণে এই ঘটনা অপরিহার্য ছিল। প্রথমত ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত মানুষেরা এই অঞ্চলে এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস না করলে ব্যবসা পরিচালন ফলপ্রসূ হবে না। দ্বিতীয়ত গঙ্গানদীর মাধ্যমে এই অঞ্চলের সঙ্গে তাদের আদি বাসভূমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষিত হবে—কাজেই এই দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস খুব একটা অসুবিধাজনক হবে না। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের মানুষেরাও নানা বাণিজ্যিক কাজকর্মে এখানে প্রব্রজনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আদিম ও অন্ত্যজ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা, যারা লৌকিক দেবদেবী, চিন্তাধারা ও লোকদর্শনের পশ্চাৎপটে নিজেদের জীবনধারাকে রূপায়িত করে এই অঞ্চলের জনধারায় একটি বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলের মৃত্তিকাগর্ভ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি থেকে সহজেই অনুমিত হয় এই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্নতর জীবনদর্শনের পরিমণ্ডলভুক্ত ছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রত্যক্ষ উপাদান প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বোল্লেখই (side reference) ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের সাহায্যকারী হিসেবে পরিগণিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র নিম্নবঙ্গের বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর অবনমন এই অঞ্চলের প্রাচীন জনজীবনের বহু প্রমাণ চিরতরে বিলুপ্ত করেছে। এই সঙ্গে নিম্নবঙ্গে বিকাশপ্রাপ্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ নগর ও বন্দর সলিলসমাধি লাভ করেছিল। বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে এই অঞ্চলের জনজীবনের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে গ্রিস ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকেরা এই অঞ্চলটিকে গঙ্গারিডি নামে চিহ্নিত করেছিলেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরে এখানের জনজীবনের উল্লেখও অনেক প্রাচীন পরিব্রাজকদের দিনলিপিতে দেখা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার গঙ্গা ও সংশ্লিষ্ট নদীগুলি এদের আপন বাহিত পলিজ মৃত্তিকায় মজে যাওয়ার পর এখানের বাণিজ্যকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় যখন যবনিকাপাত ঘটল, তখন এখানের অধিবাসীরা বিকল্প মাধ্যমের খোঁজে খুব স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এই বিপর্যয়ের পর মুহূর্তেই দস্যুদলের দলবদ্ধ আক্রমণে ও অত্যাচারে বিধ্বস্ত মানবগোষ্ঠী এই অঞ্চল ত্যাগে বাধ্য হলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাঞ্চল একেবারে জনশূন্য হয়ে গেল। নদী-সমুদ্র ও ভূমিভাগ আপন খেলায় মেতে থাকল বহুকাল—জনহীন এলাকা জুড়ে দেখা দিল গভীর ও দিগন্ত বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ অরণ্য অথবা বাদাবন।
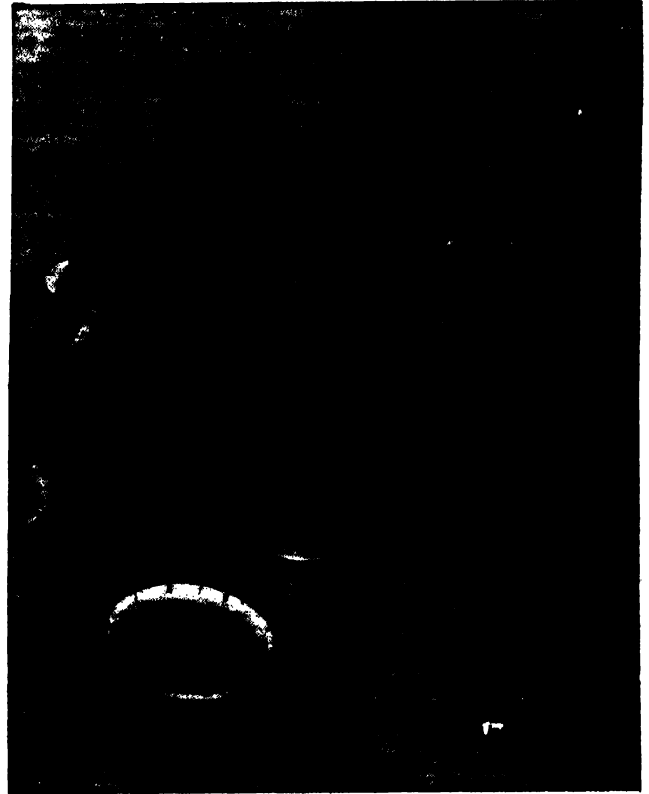
চিংড়ি মাছের মীন ধরা হয়েছে

একেবারে বাধাহীন অবস্থায় সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনভূমি সমগ্র পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ বনভূমির পরিমণ্ডলে প্রাধান্য লাভ করল এমনিভাবে বহির্বাণিজ্যকেন্দ্রিক দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের উদ্দাম জলরাশি বিধৌত সর্ববিষয়ে বিকশিত ভূমিভাগটি অরণ্যাঞ্চলে রূপান্তরিত হয়ে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল পরিবৃত হয়ে উঠল। মানব বাসভূমির এই সার্বিক রূপান্তরণ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গণ-ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে জনজীবনে এইভাবে একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সুন্দরবন ধীরে ধীরে সুন্দরতর হয়ে উঠতে থাকল। সেদিনের বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশের বিরাট এলাকা জুড়ে এর ব্যাপ্তি। তৎকালীন কলকাতাও ছিল এই সুন্দরবন এলাকার মধ্যে। যাই হোক এই সামগ্রিক অরণ্য অধ্যুষিত জনহীন অঞ্চলে আবার নতুনভাবে মনুষ্য আগমন ঘটতে শুরু হল যখন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার সুন্দরবনে জমি উদ্ধার উদ্যোগের সূচনা করলেন। কলকাতার সীমিত অঞ্চলের অধিকারী হয়ে ব্রিটিশ সরকার তার অধিকৃত এলাকার চতুর্দিকে আপন প্রভাব বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। কাজেই বঙ্গদেশের দক্ষিণের বিশাল এলাকাটিকে গভীর জঙ্গলের গ্রাস থেকে উদ্ধার করে তাকে কৃষিভূমিতে এবং তারই সঙ্গে মনুষ্য বাসভূমিতে রূপান্তরকরণে সরকারের নজর পড়ল। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কালেক্টর জেনারেল মিঃ ক্লড রাসেল ১৭৭০—১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জঙ্গল পরিষ্করণের মাধ্যমে ভূমি উদ্ধার ও কাঠ সরবরাহের জন্য সাধারণকে জঙ্গলের ইজারা দিতে শুরু করেছিলেন। ঠিক এর পরই যশোহরের (বর্তমান বাংলাদেশ) জেলা সমাহর্তা মিঃ হেঙ্কেল তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট সুন্দরবন এলাকায় শান্তিস্থাপন ও সুষ্ঠুভাবে জমি উদ্ধার কাজের জন্য বিস্তারিত বিবরণী দাখিল করেন। এরই মাধ্যমে ওয়ারেন হেস্টিংস রায়মঙ্গল থেকে হরিণঘাটা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে উন্নয়নের কাজের জন্য জমি লিজ দিতে শুরু করেন। ১৮২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে মিঃ পিজেপ সুন্দরবনে রীতিগত পদ্ধতিতে জমি জরিপ করেন এবং পুনরুদ্ধারকৃত জমিগুলিকে খণ্ডে খণ্ডে চিহ্নিত হয়, যেগুলি লট বা লাট হিসেব আজও পরিচিতি বহন করে চলেছে। সুন্দরবন অঞ্চলের সকল এলাকাই লট নম্বর হিসেবে উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই লট বা লাটের লিজ গ্রহণকারীর নাম লাটদার। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার জেলা সম[illegible] সাগরদ্বী[illegible]পর অরণ্য পরিবেষ্টিত ভূমিভাগকে সামান্য পরিমাণে [illegible]লিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে এই সময় Sagar Isla[illegible] একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাগরদ্বীপের প্রচ[illegible] বন্যার প্রকোপ থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য [illegible]িসেবে এখানে নদী-সমুদ্রের তীরে উঁচু বাঁধ দেওয়[illegible]ই বেগুয়াখালি অঞ্চলে একটি আলোকস্তম্ভ তৈরি[illegible]দ্বীপ এককালে উন্নত জনজীবনে বিশেষভাবে প্রভা[illegible] ও বঙ্গোপসাগরের জলরাশির মহামিলনকে কেন্দ্র[illegible]টি একটি পবিত্রভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে। বঙ্গোপ[illegible] কপিলমুনির আশ্রম সারাভারতের মানুষের নিকট [illegible] তীর্থস্থান। সকল তীর্থস্থানের মহিমা এই সাগরদ্বীপে [illegible] কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে এই সাগরদ্বীপের জনজীবনও স্তব্ধ হয়ে যায়—সমগ্র এলাকা জুড়ে অরণ্যের বিশালতা ছড়িয়ে পড়ে। ভীত ও বিপর্যস্ত মানুষ প্রাণরক্ষার তাগিদে সাগরদ্বীপ তথা সমগ্র সুন্দরবন এলাকা পরিত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কপিলমুনির আশ্রমের কথা, সর্বভারতীয় এই মহাপবিত্র তীর্থস্থানটির কথা মানুষ বিস্মৃত হয়নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ প্রচণ্ড জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ও বিক্ষুব্ধ আবহাওয়াকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে সাধারণ নৌকোর মাধ্যমে এই ভয়ঙ্কর শ্বাপদসঙ্কুল দ্বীপে হাজির হয়ে কপিলদেবের পদপ্রান্তে প্রণাম নিবেদন করেছেন। সাগরসঙ্গমের পূতসলিলে অবগাহন সমাপন করে দেহ ও মনকে পবিত্র করেছেন। দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা এই ঐতিহ্যধারা কিন্তু নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অবরুদ্ধ হয়নি। এই বিশেষ ঘটনাটিই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সামগ্রিক গণ-ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। ভৌগোলিক পরিবেশ এবং মানবমনের এই সংযোগ এক অনির্বচনীয় পরিস্থিতির সূচনা করে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার জনজীবনের প্রকৃতি উদঘাটনের এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই বিশেষ ধরনের ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা সেদিনের হারিয়ে যাওয়া সমাজ-সংস্কৃতির বহু অজানা বিষয়ের উপলব্ধিতে আমাদের সহায়ক হতে পারে।

লাটদারেরা জঙ্গলের লিজ গ্রহণ করে নির্বণীকরণের (deforestation) জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। সুন্দরবনে তখন কেবলমাত্র জলে কুমির ও ডাঙায় বাঘই নয়—তার সঙ্গে ছিল গাছের ডালে জড়িয়ে থাকা নানা ধরনের বিষাক্ত সাপ, যেগুলি বাঘ ও কুমিরের থেকে আরও ভয়ঙ্কর। লবণাক্ত বনভূমিতে একফোঁটাও পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। জঙ্গলের অভ্যন্তরে অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করলেও নানা ধরনের রোগের শিকার হতে হয়। এমনি এক চরম প্রতিকূলতার মধ্যে অরণ্য পরিষ্করণের কাজ খুব সহজ নয়। মুষ্টিমেয় কিছু কাঠুরিয়া রাজি হলেও গাছ কাটার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোক পাওয়া যাচ্ছে না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ ঢুকতে রাজি নয়। এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলার জন্য ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে জঙ্গলের জীবনে অভ্যস্ত আদিবাসীদের আনবার ব্যবস্থা হল। এই কর্মীদের মধ্যে ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো আদিবাসীরাই প্রধান। নতুন কাজের উৎসাহে এদের সবাই এককথায় রাজি। তাছাড়া জঙ্গলকাটার পর যে জমি উদ্ধার হবে সেগুলি কৃষিভূমিতে রূপান্তর করার কাজের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসী কর্মীদের ওই অঞ্চলেই আপন আপন কৃষিকাজের জন্য জমি বিলি করা হবে। এই ব্যবস্থাও কম আকর্ষণীয় নয়। কাজেই বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে এসে এই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা সুন্দরবন সাফাইয়ের কাজে লেগে গেলেন। এঁদের সঙ্গে স্থানীয় কাঠুরিয়া সম্প্রদায় যোগ দিয়েছিল। বহু পরিশ্রম ও ঝুঁকির মাধ্যমে সুন্দরবনের জমি পুনরুদ্ধার করে আবাদ সৃষ্টি হল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘদিন ধরে এই আবাদ সৃষ্টির কাজ চলেছিল। বনভূমি কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত হওয়ার পরই এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকা বিশেষ করে মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলা থেকে বহু মানুষের প্রব্রজন ঘটতে থাকল। মেদিনীপুর জেলার অনেকেই জমি উদ্ধারের কাজে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং আবাদ সৃষ্টির পর এখানেই পুরোপুরিভাবে বসবাস শুরু করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লাটদারদের প্রায় সকলেই মেদিনীপুরের

মানুষ—বেশ কয়েক পুরুষ এখানে বসবাসের মধ্য দিয়ে এই জনগোষ্ঠী চব্বিশ-পরগনা জেলার সঙ্গে নিজেদের সংযোগ-সূত্র রচনা করতে পেরেছে। এদের মধ্যে অনেকেই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় সম্পূর্ণভাবে বসতি স্থাপন করেও মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসস্থানের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। আবার অনেকের সেই সম্পর্কটুকুর অস্তিত্ব আজ আর নেই—পুরোপুরিভাবে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। এখানে আবাদভূমিতে কৃষিকাজ শুরু হলে বহু কৃষিশ্রমিকের প্রয়োজন হল। সেই অভাব পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির অধিবাসীরাই পূরণ করলেন। এখানে প্রব্রজিত হয়ে কাজকর্ম করতে করতে এই অঞ্চলের কৃষিজমি এবং কৃষিজ শস্যের উন্নততর সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করে অনেকেই এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়লেন। কাজেই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিভাগের বর্তমান অধিবাসীদের অনেকেই বিভিন্ন স্থান থেকে প্রব্রজিত জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ।

আদিবাসীদের সঙ্গে চুক্তিমত জমি উদ্ধারের কাজ শেষ হলে তাদের প্রত্যেককে ঘরবাড়ি তৈরি ও চাষবাসের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য জমি দেওয়া হল। দেখতে দেখতে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মাটিতে আদিবাসীদের গ্রাম গড়ে উঠল। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এঁরা সকলে কিন্তু একগোষ্ঠিভুক্ত আদিবাসী ছিলেন না। কিন্তু এই নবনির্মিত বাসভূমিতে বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য রচনা করে দিনাতিপাত করা গেল না। মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো ইত্যাদি আদিবাসীগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্ত জমিজমার অবস্থান অনুযায়ীই ঘর বাঁধতে শুরু করেছিলেন এবং চাষবাসের কাজ ও তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সকলে সম্মিলিতভাবে হাত লাগিয়েছিলেন। এঁদের প্রতিটি পরিবারই সেদিন ভূমির মালিক হিসেবে পরিগণিত হয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে নবপরিচিতি লাভ করেছিলেন। কাজেই এই আদিবাসীগোষ্ঠীর মানুষেরাই সুন্দরবন অঞ্চলের পুনরুদ্ধারকৃত অংশের প্রথম পর্যায়ের অধিবাসী। গভীর অরণ্যানিতে পরিব্যাপ্ত, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল পরিবৃত সুন্দরবন অঞ্চলকে কৃষিযোগ্য এবং বাসযোগ্য করার প্রাথমিক কাজে এই আদিবাসীদের অবদান অবিস্মরণীয়। অরণ্যের জীবনদর্শন অরণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে পদানত করে আরোপিত কর্মপরিচালনে এই আদিবাসীদের প্ররোচিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত এঁদের কর্মপ্রচেষ্টা সফলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এই সম্মিলিত আদিবাসীরাই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার পুনরুদ্ধারকৃত ভূখণ্ডের প্রাথমিক বাসিন্দা। এঁরা এখানেই পুরুষানুক্রমে বসবাস করে চলেছেন। ছোটনাগপুরের পাহাড়ি অরণ্যসঙ্কুল পরিবেশ থেকে কর্মোপলক্ষে এঁরা অভিবসিত হয়েছিলেন সুন্দরবনের লবণাক্ত মৃত্তিকার জলজঙ্গলের এক ভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে। এই পরিস্থিতিক (Ecological) পরিবর্তন এঁদের জীবনে বিরাট ওলটপালট ঘটিয়েছে। প্রথমত এঁদের নিজেদের মধ্যে সম্প্রদায় বিভিন্নতার কঠোরতা অত্যধিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। একই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে এঁদের সকলের জীবনদর্শনের মধ্যে একীভবন ঘটেছে। তবে অন্যান্য সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এঁরা সামাজিক পার্থক্য রক্ষা করে চলেছেন, যদিও এঁদের সামাজিক জীবনে বহু রূপান্তরণ (Transformation) ঘটেছে। এঁদের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের আদিবাসীদের সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সমাজ-ধর্মীয় জীবনে
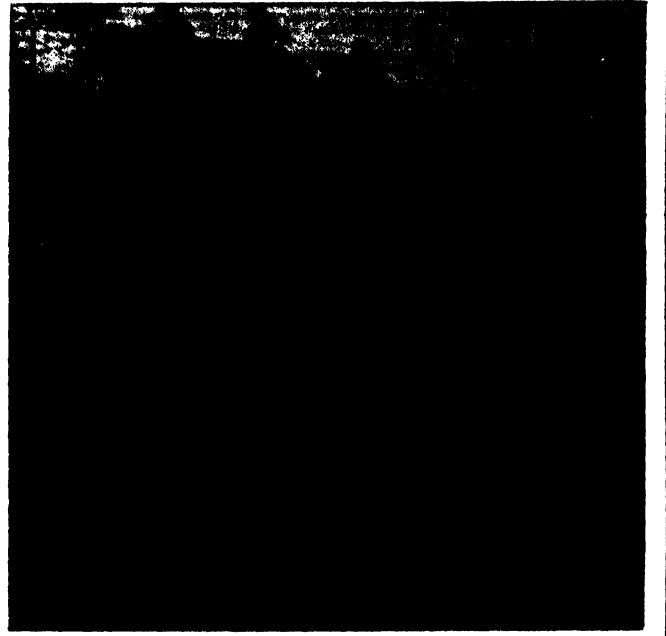
সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য

নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করায় এঁদের সামাজিক জীবনধারা ও ধর্মীয় বিশ্বাস নবরূপে রূপায়িত হল। এই অঞ্চলের সাধারণ জনগোষ্ঠীর নিকট এঁরা পৃথক পৃথকভাবে মুণ্ডা, সাঁওতাল বা ওঁরাও আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত হলেন না। বনাঞ্চলে এঁদের গ্রাম গড়ে ওঠার জন্য এঁরা সকলে 'বুনো' (অর্থাৎ বনের বাসিন্দা)—এই নামে পরিচিত হলেন। আসলে এই বুনোরা কিন্তু ছোটনাগপুরের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি সংহত রূপ। বর্তমানে এই বুনো বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই সুন্দরবন অঞ্চলের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গোসাবা সন্নিহিত অংশে এবং অন্যান্য ছোট ছোট গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগরদ্বীপ অংশে এঁদের কিছু গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। চার পুরুষ ধরে সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসের পর এঁরা দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার জল-মাটি-মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছেন। এঁরা তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যময়ী দেশজ জীবনচর্যার সঙ্গে স্থানীয় ভাষা, রীতি-নীতি ও আনুষঙ্গিক আচার-আচরণ গ্রহণ করে পুরোপুরিভাবে এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছেন। তবে এঁদের সেই প্রাক্তন মালিকানাভিত্তিক কৃষিকাজের পর্যায়টি ভাগচাষী অথবা কৃষিমজুর হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্যানিং, গোসাবা, কুলতলি, বাসন্তী ইত্যাদি অঞ্চলে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে একশো বছরের বেশি সময় ধরে খুব জোর গতিতে জঙ্গল উচ্ছেদ করে জমি উদ্ধারের কাজ চলতে থাকে। অর্থাৎ সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জুড়ে এই কাজ কেবল দীর্ঘ সময় ধরেই পরিচালিত হয়নি—গভীর ও লবণাক্ত অরণ্যভূমিকে কার্যকরীভাবে কৃষিভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই সঙ্গে কতকগুলি এলাকারও উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মাতলা নদীর উপর নতুন বন্দর তৈরির প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশ

সরকার গঙ্গানদীর উপর কলকাতা বন্দরের ক্রমাবনতির কথা বিবেচনা করে খরস্রোতা এবং শক্তিশালী জোয়ার-ভাঁটায় কার্যকরী মাতলা নদীর উপর বন্দর নির্মাণের চিন্তা করেন। এই নবনির্মিত বন্দরের নাম দেওয়া হয় পোর্ট ক্যানিং। সেদিনের মাতলা গ্রাম এর ফলে ক্যানিং টাউনে পরিণত হল। লর্ড ক্যানিংয়ের নামানুসারে বন্দর প্রতিষ্ঠার পর এটিই সামগ্রিক সুন্দরবনের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিগণিত হয়। এই বন্দরশহরকে কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার জন্য শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং টাউন পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়। লর্ড ক্যানিংয়ের নামানুসারে যেমন আজকের এই অঞ্চলটি পরিচিত, ঠিক তেমনিভাবে ক্যানিং সহধর্মিণীর নামের সঙ্গে বাঙালির মিষ্টান্ন সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্যায় যুক্ত হয়েছে। ক্যানিং টাউন পরিদর্শনকালে লেডি ক্যানিং বাঙালির একটি বিশেষ মিষ্টান্ন পানতুয়ার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। একটি প্রচলিত মত রয়েছে যে, সেই সময় থেকে একটি বিশেষ ধরনের পানতুয়া 'লেডিকেনি' (লেডিক্যানিং থেকে) নামে পরিচিতি লাভ করে। এই নাম আজও চলেছে। এই অঞ্চলের গোসাবা নামক স্থানটির প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে একজন বিদেশির অবদান সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার সমাজ-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্কটল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন। তদানীন্তন পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি মানবগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তাকে সার্থকতায় পর্যবসিত করেছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোসাবা অঞ্চলে প্রায় ৯০০০ একর জমির বন্দোবস্ত নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার এবং নদীবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে তাকে বাসযোগ্য করে তোলেন। মাত্র ৪ বছরের অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টায় তিনি এই অঞ্চলটিকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মানবদরদী কর্মী—কর্মই ছিল তাঁর জীবন। খুব অল্প সময়েই তিনি গোসাবা, রাঙাবেলিয়া এবং সাতজেলিয়া নামক তিনটি দ্বীপের উপর কৃষি-উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। স্থানীয় দরিদ্র, নিপীড়িত ও অসহায় বিশাল জনগণের উন্নয়নের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি গোসাবাতে একটি আদর্শ জনপদ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উন্নত ধরনের কৃষিকাজ, গোপালন, শস্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এবং সমবায় সমিতি প্রচলনের মাধ্যমে তিনি গোসাবাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। এছাড়া শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং [illegible] বিষয়ক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার প্রতি তিনি সদাসতর্ক [illegible]। এমন কি স্থানীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও প্রচলন করে [illegible] নামে টাকার প্রচলনও তিনি করেছিলেন। দক্ষিণ [illegible] এই সার্বিক গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে [illegible] আলোড়ন ঘটেছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কবিগুরু র[illegible]মিলটন সাহেবের এই সার্বিক গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা প্র[illegible]ক্ষণের মাধ্যমে অতীব সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

নদ-নদী, নদী[illegible] খাড়িতে পরিপূর্ণ এই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় কৃ[illegible] সঙ্গে সঙ্গে মাছ ধরাও একটি বিশিষ্ট অর্থনীতি হি[illegible]। সুন্দরবনের সংলগ্ন অঞ্চলটি মোটামুটিভাবে বাসযো[illegible]র এখানে বহু মানুষ পাশাপাশি অঞ্চল যেমন উত্তর [illegible], মেদিনীপুর, হাওড়া থেকে এই অংশে অভিবাসিত [illegible] তাঁদের মধ্যে অনেকেই জেলে, বাগদি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদের পেশা ছিল মৎস্যশিকার। এঁরা খুব সহজভাবেই সেদিনের এই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা অঞ্চলে এই উন্নত মৎস্যসম্পদকে কাজে লাগিয়েছিলেন। নানাধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে এই বহিরাগত মৎসজীবী সম্প্রদায় সুন্দরবন অঞ্চলের ভয়ঙ্কর নদী-সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৎস্য শিকার কার্যে সফলতা লাভ করতে পেরেছিলেন। মৎস্য শিকার মোটামুটিভাবে সারাবছরেরই একটি কর্মপদ্ধতি—কাজেই এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সকলসময়েই কাজে নিযুক্ত থাকতে পারতেন এবং মাছের প্রাচুর্য অত্যন্ত প্রকট থাকায় মৎস্য শিকার একটি বিশেষ লাভজনক পেশা হিসেবে দেখা দিল। এই বিশেষ ঘটনাটি কালক্রমে বহু বহির্বাসী মানুষকে আকর্ষণ করল। যাঁদের জাতিবৃত্তি মৎস্য শিকার, তাঁরা ছাড়াও অন্যান্য জাতিভুক্ত মানুষেরাও প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য শিকারের কাজে লেগে পড়লেন। ফলে এখানে জাতিভিত্তিক পেশা পরিবর্তনে বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। অনেকের জাতি পরিচিতিও পরিবর্তিত হয়ে গেল। অমৎস্যজীবী জাতি মৎস্যজীবী জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত হল। এছাড়াও বহুমানুষ প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য শিকারে যুক্ত না থেকে মৎস্য ব্যবসায় এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে নিজেদের নিয়োজিত করে সুন্দরবন অঞ্চলের সামগ্রিক মৎস্য শিকার পরিমণ্ডলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নিজেদের রূপায়িত করেছেন। জঙ্গলে মধু ও মোম সংগ্রহে বহু মানুষ নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। সুন্দরবনের মধু অত্যন্ত উন্নত মানের, তবে মৌচাকগুলি একেবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে থাকে। ফলে মধু সংগ্রাহক অথবা মৌলেদের বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পাড়ি দিতে হয়। মৌলেরা দলবেঁধে মধু সংগ্রহে যান—ছোট ছোট নৌকা নিয়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়তে হয়। কোনও একটি অঞ্চলে প্রায় দু'সপ্তাহ থেকে মধু সংগ্রহ করে এঁদের ফিরতে হয়। কিন্তু এখানে প্রতিটি মুহূর্তই বিপজ্জনক। এই মৌলেদের বাঘ অথবা কুমিরের খাদ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। এখানের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এইভাবে কিছু কিছু মৌলের মৃত্যুবরণের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মানুষদের অনেককেই মধু সংগ্রহে যেতে হয়। পূর্বে কাঠুরিয়াদের জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হত। সমুদ্র ও নদীতে যাঁরা মাছ ধরতে যান অর্থাৎ সেই জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদেরও জীবনে অনিশ্চয়তা ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি কখনও কখনও আরও জটিলাকার ধারণ করে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে আরও ভীষণ আকার ধারণ করলে নৌকো, এমন কি ট্রলারবাহী জেলেরাও মহাসঙ্কটে পড়ে যান। গভীর অরণ্যের মধ্যে খাড়িগুলিতে মাছ ধরার সময় বাঘ অথবা কুমির নৌকো থেকেই মানুষকে তুলে নিয়ে যায়। সঙ্গী-সাথীদের অসহায় অবস্থা—কারণ জঙ্গলের বাঘ আর জলের কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা অসম্ভব ব্যাপার। অনেক দূর সমুদ্রের বুকে ট্রলারভর্তি মাছ জলদস্যুরা লুট করে নিয়ে যায়। এমনি নানা বিপদ ছড়িয়ে রয়েছে জলে আর জঙ্গলে। এ সবকে অতিক্রম করেও জেলেরা পুরুষানুক্রমে এখানে মাছ ধরে যাচ্ছেন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আজ পর্যন্তও এঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের কোনও বিশেষ প্রযুক্তিকৌশল গ্রহণ করার সুযোগ পাননি। কিছু কিছু যন্ত্রচালিত ট্রলার ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি থেকে এঁরা বঞ্চিত। তবে লক্ষ্য করার বিষয় যে এই জেলেদের নিজস্ব দেশজ বিজ্ঞান (Native

জালে বন্দী রুপোলি মাছের ঝাঁক

science) রয়েছে—যে বিজ্ঞান নদী-সমুদ্র ও মাছের প্রকৃতি ও ব্যবহারপ্রণালীর উপর পুরুষানুক্রমিক প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এঁরা সত্যিসত্যিই প্রকৃতি-পর্যবেক্ষক। জলের রং দেখে, বায়ুপ্রবাহের গতি লক্ষ্য করে, ঢেউয়ের প্রকৃতি অনুধাবন করে এবং আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলার পরিস্থিতি বিচার করে তাৎক্ষণিক আবহাওয়ার প্রকৃতি, জলে মাছের উপস্থিতি এবং তাদের বিভিন্ন প্রকারের বিষয় বুঝতে এঁরা সক্ষম। গভীর অরণ্য ও নদ-নদীর জলে প্রতিটি পদে বিপদ—এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ। এই সকল সমস্যাকে অস্বীকার করা যায় না—আবার এই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে জঙ্গল ও নদীর মধ্যে পাড়ি দেওয়া বন্ধ করলেও চলে না। কাজেই এই রকম এক অপরিহার্য প্রতিকূলতার কাছে এঁরা মাথা নত করেননি, বরং মাথা উঁচু রেখে এবং বুকে সাহস সঞ্চয় করে সেই প্রতিকূলতা এবং জীবনের অনিশ্চয়তাকে এঁরা জয় করে ফেলেছেন। সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষদের বিশেষ করে নদী-সমুদ্র ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো মানুষদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের চেতনা জাগ্রত হয়েছে। সেই চেতনাটি হল আধিভৌতিক (Super natural) বিশ্বাস। কাজেই বাঘের হাত হতে পরিত্রাণ পেতে হলে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের শরণাপন্ন হতেই হয়। মানুষ কাজের সময় অসতর্ক মুহূর্তে বাঘের মুখে পড়ে যেতেই পারে, কিন্তু দক্ষিণ রায় সহায় থাকলে মানুষ রক্ষা পেয়ে যায়—এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই দক্ষিণ রায়ের অধিষ্ঠান। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বহু গ্রামে এবং জঙ্গলের মধ্যেও এই ব্যাঘ্রদেবতার পূজায় মানুষ অন্তরের আকুতি জানায়। জঙ্গলের মধ্যে অনিশ্চয়তার অন্ত নেই—খাদ্য ও পানীয় জল ছাড়াও এখানে ঘুরে বেড়ানোর নানা সমস্যা। কখন যে বিপদ কোন দিক থেকে এসে হাজির হবে, একথা কেউই বলতে পারে না। কাজেই জঙ্গলের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল মানুষেরা বনদেবীর শরণাপন্ন হয়েছেন। বনবিবি সার্বিক বনদেবী হিসেবে সমগ্র সুন্দরবনে বিশেষভাবে পূজিতা। এছাড়া দেখা যায় সর্পদেবী মনসার আরাধনার প্রচেষ্টা। সুন্দরবনের সাপ অতি ভয়ঙ্কর জীব। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন। কারণ, সাপের আক্রমণ অতর্কিত। কাজেই মানুষকে এই সাপের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতেই হয়। সর্পদেবী মনসার পূজা ও অনুগ্রহ কামনার মধ্য দিয়ে মানুষ এই বিশেষ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। জেলে এবং মৌলেদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছেন। এঁরা সকলেই একই পরিস্থিতিতে কাজ করতে করতে একটি সাধারণ জীবনদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন, যা পার্থিব ও সংকীর্ণ জাতি ও ধর্মভিত্তিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে। এই বিশেষ জীবনদর্শনে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা—তা না হলে দিনের পর দিন একই সঙ্গে কিভাবে এঁরা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সমবেত যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রতিকূলতাকে জয় করবেন? এই বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও সংস্কার অপর সম্প্রদায় দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে। অরণ্যের দেবদেবী তাই সকলের নিকটই সমানভাবেই আরাধ্য। মন্ত্রতন্ত্র ও তুকতাকের নানা পদ্ধতি এঁদের মনে কিছুটা বল সঞ্চয় করে—একেবারে অসহায় পরিস্থিতিতে মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে এগুলির ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় রচনা করেছে। যেভাবেই হোক—পথটি অন্যের নিকট যুক্তিপূর্ণ অথবা অযৌক্তিক হোক না কেন—সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্যে কর্মরত এই মানবগোষ্ঠীর অজস্র প্রতিকূলতার সঙ্গে অভিযোজনের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়েছে। এর ফলে এঁদের জীবনে একটা বেপরোয়া ভাবের উদয় হয়েছে—এটিই এখানের সাধারণ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর অভাবে জল-জঙ্গলের ভয়ঙ্করতা এবং হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুলের বিভীষিকাকে জয় করে এই অঞ্চলের মানুষ তাঁদের কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন না। এখানের সাধারণ জনগোষ্ঠী জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত হলেও পরাজিত নয়।

সাম্প্রতিককালের দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই পেশা মৎস্য শিকার। আবার অনেকে অন্য পেশা থেকে মৎস্য শিকারে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন। কাজেই সুন্দরবনের নদী-সমুদ্র, মোহনা এবং খাড়িতে মৎস্য শিকারির সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে মৎস্য ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে কর্মীর সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সুন্দরবনের নদীমুখগুলি দীর্ঘদিন ধরে পলি জমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই মাছের আনাগোনা কমেছে। কোনও কোনও সময় এখানে মাছের দেখাই মেলে না। এমতাবস্থায় সাধারণ জেলে সম্প্রদায় খুবই অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। নদী-সমুদ্রে মাছ ধরায় যে পরিশ্রম, ঝুঁকি ও অর্থব্যয় হয় তার মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এঁদের মনে হতাশা এসে যাচ্ছে। সুন্দরবনের অপর অর্থনৈতিক পর্যায় কৃষিও কিন্তু সমস্যা-জর্জরিত। একফসলি কৃষির উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। গ্রামগুলির মানুষ দিশেহারা—বিকল্প অর্থনীতির কোনও ব্যবস্থাই নেই।

বনাঞ্চল সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় বনজসম্পদ আহরণও আর সম্ভব নয়। এই অঞ্চলের স্বাভাবিক সম্পদসমূহের সদ্ব্যবহারের কোনও বিশেষ প্রয়াস গৃহীত হয়নি। প্রয়োজনই উদ্ভাবনের মূল। সুন্দরবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ নদীর তীরে তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এঁদের হাতে ছোট-বড় মাপের মশারি জাল। নদীর অগভীর জলে এই মশারি জাল পেতে এঁরা বাগদা, চিংড়ির পোনা ধরছেন। সুন্দরবনের নদীগুলিতে এগুলি বিশেষভাবে লভ্য। আজ সুন্দরবনের সমগ্র এলাকা জুড়ে এই দৃশ্য দেখা যাবে। জলের স্রোতের সঙ্গে বাগদার পোনা অথবা বাগদা মীন এই জালগুলিতে ঢুকে পড়ে আটকে থাকে। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাছ ও জলজ কীট এবং প্রাণীর ছোট ছোট বাচ্চাগুলিও ধরা পড়বে। কয়েক ঘন্টা পর এই জালগুলি তুলে অতি যত্ন সহকারে বাগদা মীনগুলিকে সংগ্রহ করে অন্যান্য জলজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এতে দেখা যায় প্রতি বারে দশ-বারটি বাগদা মীনের সঙ্গে শত শত জলজ প্রাণী নষ্ট হচ্ছে। এই ছোট ছোট জলজ প্রাণীর মধ্যে বহু ধরনের মাছের বাচ্চাও রয়েছে আবার তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন কিছু জলজকীট যেগুলি মাছের প্রিয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে ব্যাপকভাবে বাগদা মীন ধরার জন্য সুন্দরবনের নদীসমূহে পরিস্থিতিক ভারসাম্য (Ecological balance) হারিয়ে যাচ্ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আজ সুন্দরবনের অসংখ্য মানুষের এই বাগদা মীন ধরাই বিকল্প রোজগার হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের স্বার্থেই, এখানে মৎস্যসম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই আত্মহননকারী উদ্যোগটিকে অচিরেই ত্যাগ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার অধিবাসীদের মধ্যে তফসিলি জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যাই বেশি এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই এঁরা এই অঞ্চলের জীবনচর্যাকে বিভিন্ন দেশজ ভাবধারার মধ্যে রূপায়িত করেছেন। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তি এখানে বিশেষভাবে নিষ্ক্রিয়, কাজেই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী এবং তৎসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানের উপস্থিতি এখানে তুলনামূলকভাবে কম। লৌকিক আচার-আচরণ এবং লোকিক দেবদেবী ও চিন্তাধারা সমন্বিত জীবনই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার অধিবাসীদের বিশিষ্ট লক্ষণ। সুদূর অতীতের দিন থেকেই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় বহিরাগত মানুষদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। স্থানীয় দেশজ জনগোষ্ঠীর মতাদর্শের সঙ্গে এঁদের সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে এবং কালক্রমে এখানে একটি মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে। এই বিশেষ ঘটনাটি আজিও কার্যকরী। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার এই মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি বহু প্রাচীন। এই অঞ্চলে সেই সুন্দর অতীতের উজ্জ্বল দিনগুলিতে যেমন রকমারি পণ্যবোঝাই বাণিজ্যতরী তদানীন্তন স্রোতস্বিনী গঙ্গার বুকে ভেসে যেত দূর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে তখন থেকেই এখানে সর্বভারতীয় জনসমাগমের ফলে মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এই আন্তর্জাতিক নৌবন্দরে এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ভারতের প্রায় সকল অংশের, বিশেষ করে উত্তর এবং পূর্ব ভারতের মানুষদের কর্মভূমি ও বাসভূমি গড়ে উঠেছিল। আজও কি তাঁদের উত্তরপুরুষেরা সেই পবিত্র কর্মভূমি ও বাসভূমির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে বছরে একবার নিয়ম করে ভারতের নানা অংশ থেকে সুন্দরবনের গঙ্গা ও সমুদ্রের পবিত্র মিলনভূমিতে সদলবলে হাজির হন? দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার দক্ষিণ প্রত্যন্ত প্রদেশে সর্বভারতীয় মিলনগাথা চিরভাস্বর হয়ে এই ভূমিভাগকে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট আসন দান করেছে।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

গ্রন্থপঞ্জি

এই প্রবন্ধটি লেখকের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং পূর্বপ্রকাশিত তথ্যাবলী যৌথ উদ্যোগে রচিত।

সাহায্যকারী প্রকাশিত তথ্যাবলী :

Bagchi, K : 1944-The Ganges Delta, University of Calcutta Calcutta.

De, Baron (Ed) : 1994-West Bengal District Gazetteers-24-Parganas, Govt. of West Bengal, Calcutta.

De, Rathindranath : 1990-The Sundarbans, Oxford University Press, Calcutta.

Mandal, A.K. and R.K.Ghose : [illegible]989-Sundarban— A Socio-Bio-Ecological [illegible], Bookland, Calcutta.

Mukherjee, K.N. : [illegible]83-[illegible] of Settlement in the Sundarbans [illegible] Bengal, in Indian Journal of [illegible]pe Systems and Ecological Stud-[illegible] 6 No. 1 + 2, Calcutta.

O'Malley, L.S.S.(Ed) : [illegible]14-[illegible] District Gazetteers-24 Parganas [illegible], Calcutta.

ঘোষ, বিনয় : [illegible]৫[illegible]বঙ্গের সংস্কৃতি, পুস্তক প্রকাশক, [illegible]তা

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী : [illegible]৯৯[illegible] চব্বিশ পরগনা—আঞ্চলিক ইতিহাসের [illegible]ণ, নবচলন্তিকা, কলিকাতা

[illegible]৯৯[illegible] চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়, [illegible]ন্তিকা, কলিকাতা

রায়, নীহাররঞ্জন : ১৩৫৯-বঙ্গাব্দ—বাঙালির ইতিহাস—আদিপর্ব, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলিকাতা

সরকার, রেবতীমোহন : ১৯৯৯-'গঙ্গাসাগর একবার' দৈনিক চন্দ্রভাগা (রমানাথ সিংহ সম্পাদিত), সিউড়ি, বীরভূম।

হালদার, নরোত্তম : ১৯৮৮—১৯৯৬-গঙ্গারিডি গবেষণা পত্রিকা (বিভিন্ন সংখ্যা), কাকদ্বীপ।

লেখক পরিচিতি :

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান

নৃবিজ্ঞান বিভাগ

বঙ্গবাসী কলেজ/কলিকাতা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ক্ষেত্রসমীক্ষা বর্তমানে পরিচালন করছেন। এই অঞ্চলের পরিবেশ-পরিস্থিতি, জনবিন্যাস, এবং জেলে সম্প্রদায়ের বর্তমানের জীবনধারা ও সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তারিত Indian Council of Social Science Research-এর সহযোগিতায় তাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষাভিত্তিক পরিচালনা করছেন। (Ministry of Human Resource Development) সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন Sundarban Biosphere Reserve-এর সহযোগিতা সুন্দরবন অরণ্য...সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং হস্তক্ষেপের বিষয়ে প্রত্যক্ষ গ্রামভিত্তিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা অন্যান্য অঞ্চল যেমন বীরভূম/সাঁওতাল পরগনা এবং রাঁচি অঞ্চলে জনজীবন ও আদিবাসী জীবনের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষায় কর্মরত।

Anthropology-এর আন্তর্জাতিক পত্রিকা Man In India-এর সম্পাদক।

নরোত্তম হালদার

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও গঙ্গারিডি সংস্কৃতি

কলকাতাসহ বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার অংশবিশেষ-কে নিয়ে প্রথম গঠিত হয়েছিল মূল চব্বিশ-পরগনা জেলা। সে হিসেবে আদি চব্বিশ-পরগনার উৎস এই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা। ইংরেজ আমলে আদি চব্বিশ-পরগনা জেলার পরগনা-সংখ্যা প্রথমে ছিল চব্বিশটি এবং তার আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল। ক্রমান্বয়ে সেই জেলার পরগনা-সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পঁচাত্তরে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু জেলার নাম পঁচাত্তর-পরগনা হয়নি, সেই চব্বিশ-পরগনাই থেকে গিয়েছিল। তার পরেও দেশবিভাগের ফলে বনগাঁ মহকুমার পরগনাগুলো তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এভাবে অখণ্ড চব্বিশ-পরগনা জেলার আয়তন বাড়তে বাড়তে ৫২৯২.৫ বর্গমাইলে দাঁড়িয়েছিল এবং একদা সেই জেলা এ রাজ্যের বৃহত্তম জেলা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের পয়লা মার্চ সেই জেলাকে উত্তর-দক্ষিণে দুভাগে বিভক্ত করার ফলে বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার উৎপত্তি। বর্তমানে এর আয়তন ৯৯৫৯.৯১ বর্গ কিলোমিটার। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চল ৯৭৯৬.২৩ বর্গ কিলোমিটার এবং শহরাঞ্চল ১৬৩.৬৮ বর্গকিলোমিটার।[১]

জেলার নামরূপে পরিগণিত হওয়ার আগে থেকেই 'চব্বিশ-পরগনা' একটা স্থাননাম হিসেবে পরিচিত ছিল। এই চব্বিশ পরগনা নামটি মোগল আমল (ষোড়শ শতাব্দী) থেকে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এই নামের সূত্রপাত হয়েছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে; যাঁদের সাহায্যে নিয়ে মানসিংহ যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করতে পেরেছিলেন, কথিত আছে তাঁদের একজনকে চব্বিশটি পরগনার শাসনাধিকার দেওয়া হয়েছিল, তার তখন থেকে বঙ্গোপসাগর কূলবর্তী এই দক্ষিণাঞ্চলে 'চব্বিশ-পরগনা' নামক স্থান নামের প্রচলন শুরু হয়েছিল।

সমুদ্রতীরে কলিঙ্গী, তারপর উত্তরদিকে যথাক্রমে অন্ধ্র, তাম্রলিপ্ত, মল্ল প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হলে এদের পূর্বদিকে হবে গঙ্গারিডি রাজ্য এবং তা গঙ্গার শেষাংশে অবস্থিত হলে টলেমি-বর্ণিত সীমাটিকেই মেনে নিতে হয়। উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্ররাজ্য একদা গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধন দেশরূপে অভিহিত হয়েছিল। বৃহত্তর গাঙ্গোপদ্বীপ বা দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গঙ্গারিডি দেশরূপে অভিহিত। উপবঙ্গের বাইরে মূল পুণ্ড্রদেশকে গঙ্গারিডি বলা হত না।

'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলী' (পৃঃ ২১৭-১৮) থেকে জানা যায় যে, ষোড়শ শতকে পাটনা নগরে বিজ্জলদের নামে এক চৌহান রাজা ছিলেন। তিনি জগমোহন নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় 'দেশবাণী বিবৃতি' নামক ভারতবর্ষের একটি গেজেটিয়ার প্রস্তুত করেছিলেন। তাতে প্রতাপাদিত্যের উত্থান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে। এই 'দেশবাণী বিবৃতি' নামক গেজেটিয়ার থেকে উক্ত তথ্য জানা গেছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৪ সালে 'সপ্তম বর্ষীয়' সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা বিশেষ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ও পবিত্র ভূমি হিসেবে পরিগণিত। এই জেলার মধ্য দিয়ে একদা পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-জাহ্নবী প্রবাহিত ছিল। ভাগীরথী গঙ্গার প্রধান ধারা। প্রয়াগে ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যমুনা ও সরস্বতী। তাই ত্রিবেণী যেখানে গঙ্গার যুক্তবেণী হিসেবে পরিচিত। আর হুগলিতে ভাগীরথীর প্রধান ধারা থেকে মুক্ত হয়ে যমুনা ও সরস্বতী অন্য পথে সাগরে পড়েছে। তাই ত্রিবেণী এখানে গঙ্গার মুক্তবেণীরূপে পরিগণিত। ভাগীরথী থেকে বের হয়ে যমুনা প্রথমে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ইছামতীর সঙ্গে মিলিতভাবে দক্ষিণে গিয়ে সাগরে মিশেছে। তার আগে বিদ্যাধরী নামে যমুনার একটি শাখা দক্ষিণে নেমে এসে মাতলা নাম নিয়ে সাগরে পড়েছে।

ত্রিবেণীতে ভাগীরথী থেকে বেরিয়ে একদা সরস্বতী দক্ষিণ-পশ্চিমে গিয়ে বর্তমান হুগলি নদীর পথ ধরে সাগরে পড়ত। একে বলা যেতে পারে 'প্রাচীন সরস্বতী'। অতি প্রাচীনকালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে গঙ্গার প্রাচীনতম আরেকটি ধারা রাঢ়ভূমির
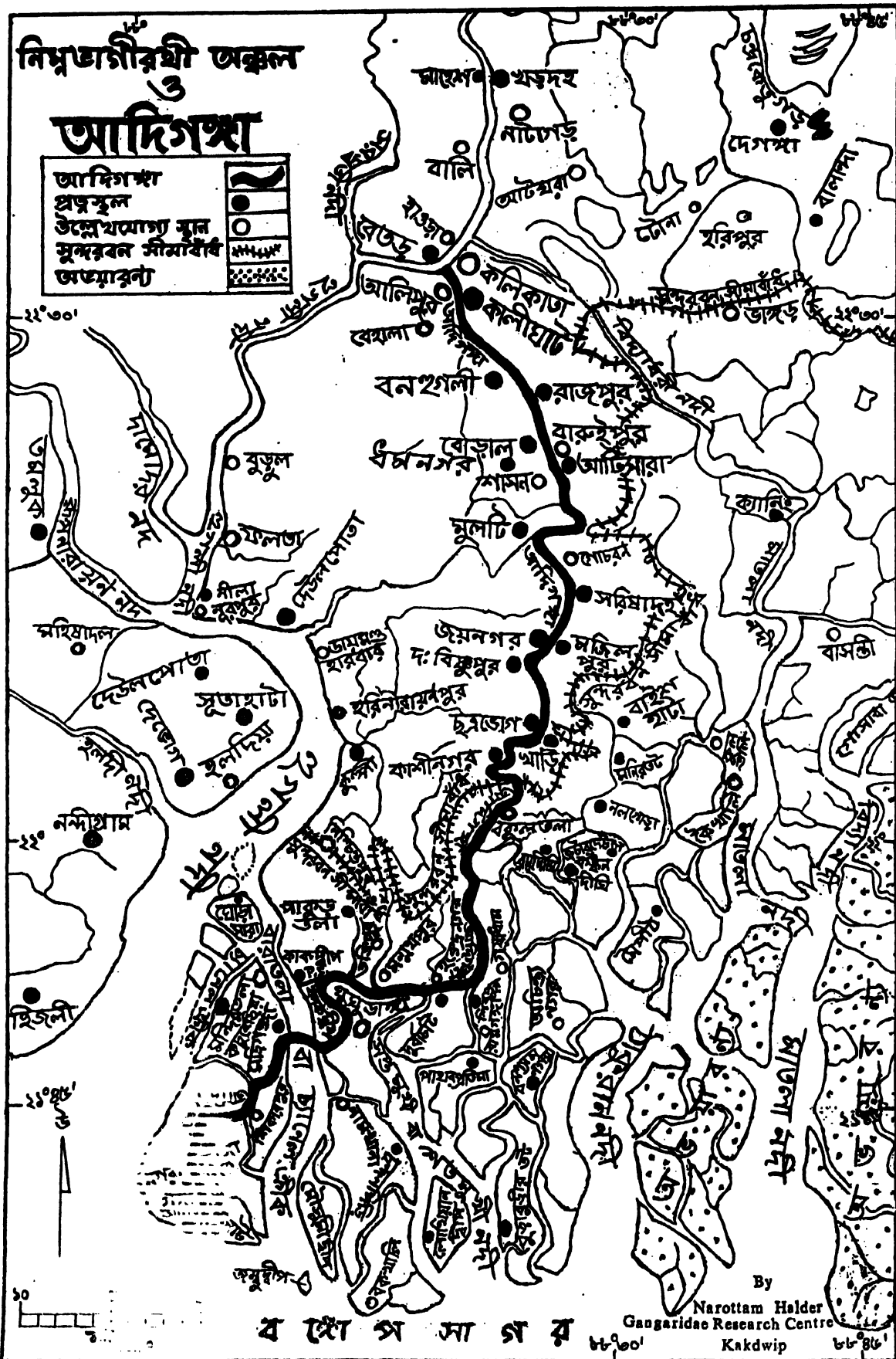
নিম্নভাগীরথী অঞ্চল
ও
আদিগঙ্গা
আদিগঙ্গা
প্রত্নস্থল
উল্লেখযোগ্য স্থান
অভয়ারণ্য
মাহেশ
খড়দহ
বালি
দেগঙ্গা
হরিপুর
হাওড়া
কলিকাতা
আলিপুর
কালীঘাট
বেহালা
ভাঙড়
বনহুগলী
রাজপুর
বোড়াল
বারুইপুর
ধর্মনগর
শাসন
বুড়ুল
ফলতা
মুলটি
ক্যানিং
সরিষাদহ
জয়নগর
দঃ বিষ্ণুপুর
হরিনারায়ণপুর
ছত্রভোগ
কাশীনগর
বকুলতলা
মহিষাদল
দেউলপোতা
সুতাহাটা
হলদিয়া
নন্দীগ্রাম
হিজলী
কাকদ্বীপ
জম্বুদ্বীপ
বাসন্তী
ব ঙ্গো প সা গ র
By
Narottam Halder
Gangaridae Research Centre
Kakdwip

উপর থেকে প্রবাহিত হয়ে এই পথেই কংসাবতী মোহনা দিয়ে সাগরে পড়ত বলে জানা যায়।[২]

নিম্নবঙ্গে মুক্তত্রিবেণী থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত ভাগীরথীর প্রধান ধারা এখনও খিদিরপুর পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। খিদিরপুরের কাছ থেকে কলকাতা ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সুন্দরবনের উপর দিয়ে মূল ভাগীরথী একদা প্রবাহিত হত। এই পথটি বর্তমানে মজে গেছে। এখন এই খিদিরপুরের পাশ থেকে সরস্বতীর পথ ধরে গঙ্গানদী হুগলি নদীর মোহনা দিয়ে সাগরে পড়েছে। ক্রমান্বয়ে নদীগর্ভ ভরাট হতে হতে এই পথেও বর্তমানে জাহাজ চলাচলের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

প্রথম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ গ্রিক ভৌগোলিক স্ট্রাবো (খ্রিঃ পূঃ ২৭-৩৭ খ্রিঃ) তাঁর 'জিওগ্রাফিকন্' নামক গ্রন্থে (XV. 1, 69) লিখেছিলেন যে, ভারতবাসীরা গঙ্গানদীর পূজা করে। তাঁর বিবরণ (XV. 1.13) থেকে ভারতবর্ষের বৃহত্তম নদী গঙ্গার একটিমাত্র মোহনার কথা জানা যায়—"This river, which is the largest in India descends from the mountainous country and turns eastward upon its reaching the plains. Then, flowing past Palibothra, a very large city, it pursues its way to the sea in that quarter and discharges into it by a single mouth."[৩]

গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে শত শত শাখা-প্রশাখাযুক্ত নদীনালা থাকলেও স্মরণাতীত কাল থেকে বর্তমান দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত আদিগঙ্গার জলই পবিত্র গঙ্গাজল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং কেবলমাত্র এই আদিগঙ্গাকে গঙ্গাদেবীজ্ঞানে পূজা করার প্রথা প্রচলিত আছে। আদিগঙ্গার ঘাটে ঘাটে ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পৌষ সংক্রান্তিতে ও বিভিন্ন তিথিতে এবং চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ-সময়ে গঙ্গাস্নান মেলা এবং গঙ্গাপূজা ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি-পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং আদিগঙ্গা তীরের শ্মশানঘাটগুলিতে অধিক সংখ্যায় শবদাহের কাজ অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গা ও অন্যান্য শাখানদীগুলিতে এসব হয় না। ভগীরথ কর্তৃক যে নদীপথের সংস্কার সাধিত হয়েছিল, সেই ভাগীরথী-জাহ্নবীর আদিধারার অংশ হিসেবে এর নাম হয়েছে আদিগঙ্গা-ভাগীরথী। বর্তমানে ভাগীরথীর এই লুপ্ত প্রবাহ সাধারণভাবে 'আদিগঙ্গা' নামে পরিচিত। স্ট্রাবো গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে যে একটিমাত্র ধারার উল্লেখ করেছিলেন, গঙ্গার সেই ধারাটিকে ভারতবাসীরা পূজা করে; সুতরাং সেকালে সেই বৃহত্তম গঙ্গার শেষাংশে প্রধান ও পবিত্র মুখ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে একমাত্র এই আদিগঙ্গা।

প্রথম শতাব্দীর একজন গ্রিক নাবিক মিশর থেকে বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্রপথে কয়েকবার এদেশে এসেছিলেন। সম্ভবত ৬৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত তাঁর 'ইরিথ্রিয়ান সমুদ্রের পথনির্দেশিকা' (পেরিপ্লাস টেস্ ইরিথ্রাস থালাস্‌সেস্) নামক ভ্রমণবৃত্তান্তের দিনলিপিতে বঙ্গোপসাগরের কোলে 'গঙ্গা' নামক একটা জনপদ, 'গঙ্গা' নামক একটা নদী ও 'গঙ্গা' নামক একটা বাণিজ্যনগরীর কথা উল্লেখ করেছেন।—"After these, the course turns toward the east again, and sailing with the ocean to the right and the short remaining beyond to the left, Ganges comes into view, and near it the very last land towards the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges, and it rises and falls in the same way as the Nile. On its bank is a market town which has the same name as the river Ganges."[৪] এখানে গঙ্গা নামক জনপদে গঙ্গা নামে একটা নদীর কথা বলা হয়েছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থকারের বর্ণনার মাত্র কয়েকবছর আগে, অর্থাৎ প্রায় সমসাময়িককালে স্ট্রাবো বৃহত্তম গঙ্গার যে প্রধান ও পবিত্র ধারাটির কথা বলেছিলেন, সেই ধারার সঙ্গে পেরিপ্লাস গ্রন্থে একটা নদী হিসাবে বর্ণিত ধারাটির অভিন্নতা প্রতীয়মান হয়।

স্থাননাম হিসেবে গঙ্গার ব্যবহার এদেশে ছিল। এ সম্পর্কে দেশীয় সাহিত্যে 'গঙ্গা' শব্দ ব্যবহারের উদাহরণস্বরূপ পাণিনি পতঞ্জলির ব্যাকরণশাস্ত্রের উল্লেখ করে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বঙ্গভূমিকায়' লিখেছেন—"প্রাচীন বৈয়াকরণদের উদাহরণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' থেকে গাঙ্গেয় ভূমি অর্থে 'গঙ্গা' শব্দের প্রয়োগ অনুমান করা যায়।" এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন "খ্রিষ্টপূর্বকালে গঙ্গার ভাটি অংশ (গাঙ্গ অনূপ) কোথাও কোথাও উন্মত্তগঙ্গ এবং লোহিতগঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।" এ ছাড়া ৮৮০ শকাব্দে তৃতীয় কৃষ্ণের করহাড় শাসনে অন্যান্য জনপদ বর্ণনা প্রসঙ্গে 'গঙ্গা' জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—'দ্বারস্থাংগ কলিঙ্গ গঙ্গা মগধৈরভ্যর্চিতাজ্ঞশ্চিরং'। আলোচ্য শাসনে অঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা ও মগধের উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, গঙ্গা জনপদ অর্থে উল্লিখিত।"[৬]

সম্ভবত আদিগঙ্গা ও গঙ্গাসাগর সঙ্গম অধ্যুষিত সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা ও তার সন্নিহিত অঞ্চল একদা 'গঙ্গাসাগর'-জনপদ বা 'গঙ্গা' জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানকার দুর্ধর্ষ জনজাতিদের দ্বারা অধিকৃত বৃহত্তর গাঙ্গোপদ্বীপ গ্রিক ও রোমান লেখকগণের বিবরণে গঙ্গারিদৈ (Gangaridai) বা গঙ্গারিড়ি (Gangaridae) নামে উল্লেখিত হয়েছে। জলজঙ্গল অধ্যুষিত সমুদ্রকূলের এই গাঙ্গেয় নিম্নভূমি রামায়ণে রসাতল বা পাতাল নামে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতে এই এলাকার জনজাতিকে সমুদ্রকূলের ম্লেচ্ছজাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ভীমসেন পূর্বভারতে দিগ্‌বিজয়কালে এই সাগরতীরের জলপ্রধান দেশবাসীর কাছ থেকে প্রবাল, মুক্ত, কাঞ্চন, অগুরুবস্ত্র, (হালকা বা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র) প্রভৃতি উপঢৌকন প্রচুর পরিমাণে আদায় করেছিলেন বলে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। পেরিপ্লাস-গ্রন্থকারের বিবরণেও গঙ্গানগরে প্রবাল, মুক্তা, কলতিস্ (কলিত) নামক কাঞ্চনমুদ্রা, সর্বোৎকৃষ্ট গাঙ্গেয় মসলিন (সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্ত্র) প্রভৃতি পাওয়া যেত বলে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলের মূল্যবান সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশি সূত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যা হোক, পেরিপ্লাস-গ্রন্থকারের বর্ণনায় সমুদ্রের কাছে গঙ্গার তৎকালীন প্রধান ধারার কূলে গঙ্গানগরের অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছে বোঝা যায়। গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর মতে "পেরিপ্লাসের নাবিকের বর্ণনায় গঙ্গা অর্থে ভাগীরথীকেই নির্দেশ করেছে।"[৬]

দ্বিতীয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমি তাঁর আন্তগাঙ্গেয় ভারতবর্ষের ম্যাপে প্রাচীন গঙ্গার পাঁচটি প্রধান মুখের উল্লেখ করেছিলেন। পশ্চিমে মূল ভাগীরথীর তিনটি বিশেষ মুখ এবং পূর্বদিকে পদ্মানদীর দুটি প্রধান মুখের অবস্থান দেখানো হয়েছিল অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সহযোগে।

INDIA INTRA G... M... from the Latin edition of Ptolemy's Geography, printed at Rome in 1490.

১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে রোমে ছাপা টলেমীর ম্যাপ

ইতিহাস থেকে জানা যায়, আদিগঙ্গা ভাগীরথীর পশ্চিমে সরস্বতী এবং তারও পশ্চিমে প্রাচীন সরস্বতীরূপে প্রাচীনতর দুটি ধারা প্রবাহিত ছিল। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার সর্বপশ্চিমের এই ধারাটি একদা রাঢ়ভূমির উপর দিয়ে। কংসাবতীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সাগরে পড়ত বলে জানা যায়।[৭] টলেমির ম্যাপে উল্লিখিত গঙ্গার সর্বপশ্চিমের এই মুখটির নাম কম্বিসাম্ (CAMBYSUM) অর্থাৎ কংসাবতী-মুখ। সেই ধারাটি এখন সম্পূর্ণ মজে গেছে। উত্তরকালে স্থান পরিবর্তনের কারণে একদা নতুন পথে প্রবাহিত বর্তমান-সরস্বতী হুগলী নদীর পথ ধরে স্মরণাতীত কাল থেকে সাগরে মিলিত হত। টলেমির ম্যাপে পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত প্রাচীন গঙ্গার এই দ্বিতীয় মুখটির নাম ম্যাগ্‌নাম (MAGNUM) অর্থাৎ বৃহৎ মুখ। সরস্বতী-হুগলির এই মুখটি আবহমানকাল সর্ববৃহৎ মুখ হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। এই সরস্বতীর গা থেকে একদা গঙ্গানদী 'আদিগঙ্গার প্রধান পথ ধরে সাগরে পড়ত। উত্তরকালে উত্তরাংশের পথ পরিবর্তন করে গঙ্গানদী আরও পূর্বদিকে সরে এসে বর্তমান ভাগীরথীরূপে প্রবাহিত হলেও নিম্নাংশে আদিগঙ্গার পথ ধরেই সাগরসঙ্গতা হত। তাই বর্তমান ধকলটের খাল বা আদিগঙ্গার মোহনাই প্রকৃত গঙ্গাসাগর সঙ্গম হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এই সূত্র ধরে বিচার করলে টলেমি-নির্দেশিত প্রাচীন ভাগীরথীর তৃতীয় মুখ কাম্বেরিকাম্ (CAMBERICUM)-কে আদিগঙ্গা হিসেবেই মেনে নিতে হয়।

রেনেলের মতে, 'প্রাচীন সরস্বতীর নিম্নাংশ একদা চণ্ডীতলা, আমতা, কোলাঘাট দিয়ে প্রবাহিত হত।[৮] এখন 'সরস্বতী'র পথ ধরে ভাগীরথী সাগরে পড়ছে। আদিগঙ্গার মুখ বুজে যাওয়া অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি নবাব আলীবর্দীর আমলে বেতড়ের দক্ষিণে সরস্বতীর খাতে ভাগীরথীকে প্রবাহিত করা হয়েছে।[৯] এটি ভাগীরথীর দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ বর্তমান হুগলি নদীর মোহনা। আর তৃতীয় মুখ সম্পর্কে বর্ধমান-সংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরীর অভিমত হল—"আদিগঙ্গার সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে কাম্বেরিকাম্ বা তৃতীয় মোহনার অবস্থান হওয়া উচিত, একে কুমার নদীর মোহনা বলা যায় না।[১০] কিন্তু ধ্বনিসাদৃশ্য অনুসারে কাম্বেরিকাম্‌কে কেউ কেউ কুমার হরিণঘাটা হিসেবে সনাক্ত করেছিলেন। গঙ্গা বা ভাগীরথীর একটা প্রধান শাখা হিসেবে পদ্মাকেও গঙ্গানদী বলা হয়। কারণ গঙ্গার অতিরিক্ত জল পদ্মা-বুড়িগঙ্গা-মেঘনার মুখ দিয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাই টলেমির ম্যাপে এই মুখটি আন্তিবোলা (ANTIBOLA= Thrownback) নামে উল্লিখিত হয়েছে। টলেমির ম্যাপে এটি গঙ্গার পঞ্চম মুখ এবং পদ্মার দ্বিতীয় ও প্রধান মুখ হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু স্থান অনুসারে পশ্চিমে পদ্মার প্রথম মুখ ও গঙ্গার চতুর্থ মুখ 'গড়াই-মধুমতী-হরিণঘাটা' পদ্মানদীর শাখা হিসেবে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হলেও এটি গঙ্গার আসল মুখ নয়; তাই টলেমির ম্যাপে একে সুদোস্‌তোমাম্ (PSEUDOSTOMUM) বা False mouth বলা হয়েছে।

গ্রিক ভৌগোলিক টলেমি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সহযোগে সর্বপ্রথম পৃথিবীর ম্যাপ অঙ্কন করেছিলেন; স্বাভাবিক কারণে তাঁর ম্যাপে অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বহু নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, জাতিবাচক দেশনাম (অর্থাৎ কৌম জনপদ) ও বিলুপ্ত নগরের আপেক্ষিক অবস্থান এই ম্যাপ থেকে প্রথম জানা যায়। একই কারণে এ দেশ এবং অন্যান্য দেশের গবেষকগণের কাছে এই ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ম্যাপে গঙ্গানদী (GANGES), গন্ধার জাতির দেশ (GANDARAE), মালব জাতির দেশ (ABASTAE), গোণ্ড বা গণ্ড জাতির দেশ (GONDALI), মন্দ্য জাতির দেশ (MANDALAE), শবর জাতির দেশ (SABARAE), গঙ্গাঋদ্ধ জাতির দেশ (GANGARIDAE) অর্থাৎ দক্ষিণপুণ্ড্র বর্ধন বা গাঙ্গোপদ্বীপ এবং পাটলিপুত্র (Palibothra), তাম্রলিপ্ত (Tamalites), গঙ্গা (Gage) প্রভৃতি নগরের আপেক্ষিক অবস্থান বিশেষভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বিদেশি লেখকগণের মধ্যে একমাত্র টলেমি সবচেয়ে স্পষ্টরূপে গঙ্গারিডির সীমা, আয়তন ও রাজধানী-শহর সম্পর্কে লিখেছিলেন : এই শহরসহ গঙ্গামুখগুলির অন্তর্বর্তী সমস্ত দেশ গঙ্গারিডিদের অধিকারে ছিল, গঙ্গে একটি রাজধানী শহর যার দ্রাঘিমা ১৪৬° এবং অক্ষাংশ ১৯°১৫'।'[১১] তিনি সর্বপ্রথম তাঁর ম্যাপে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সহযোগে দুদিকে গঙ্গানদী ও একদিকে সাগরবেষ্টিত ত্রিভুজাকৃতি গঙ্গারিডি দেশের সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্ণয় করেছিলেন। এর পশ্চিমে গঙ্গা (অর্থাৎ প্রাচীন 'সরস্বতী-কংসাবতী') এবং পূর্বদিকেও গঙ্গা (অর্থাৎ পদ্মা-মেঘনা), আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে মেগাস্থিনিস ও ডিওডোরাসের বর্ণনাতেও গঙ্গানদীকে গঙ্গারিডি দেশের পূর্বসীমা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। টলেমি কংসাবতী মুখ থেকে মেঘনা-মুখ পর্যন্ত গঙ্গারিডি দেশের দক্ষিণ সীমার আয়তন দেখিয়েছিলেন ১৪৪° থেকে ১৪৮° পূর্ব-দ্রাঘিমা অর্থাৎ সর্বমোট চার ডিগ্রি। টলেমির ম্যাপে ত্রিভুজাকৃতি গঙ্গারিডি দেশের তিনটি বাহুর আয়তন বর্তমানের ম্যাপের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গঙ্গারিডি দেশের মাত্র চারটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় টলেমির ম্যাপে। তাদের মধ্যে পালুরা (PALURA) ও তিলোগ্রাম্মাম্ (TILOGRAMMUM) নামক দুটি সমুদ্র-বন্দর এবং গঙ্গে (GAGE REGIA) ও আগ্‌গা (AGGA) নামক দুটি সমুদ্র-উপকূলবর্তী গাঙ্গেয়-বন্দর। ভাগীরথীর প্রথম ও দ্বিতীয় মুখের অন্তর্বর্তী স্থানে টলেমি 'পালুরা'র উল্লেখ করেছেন; আর বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতী ও হুগলির মোহনার মধ্যবর্তী স্থানে হলদিয়া বন্দর অবস্থিত। বৃহত্তর হলদিয়া বন্দর এলাকার ভূনিম্ন থেকে কিছু পুরাকীর্তির নিদর্শন প্রাপ্তির কথা শোনা যাচ্ছে। টলেমি তিলোগ্রাম্মামের উল্লেখ করেছেন গঙ্গার তৃতীয় ও চতুর্থ মুখের অন্তর্বর্তী স্থানে; আর আদিগঙ্গা ও হরিণঘাটার অন্তর্বর্তী স্থানে বর্তমানে বুড়াবুড়ির তট, বনশ্যামনগর প্রভৃতি প্রত্নস্থানগুলি অবস্থিত। এগুলি দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত। ওই এলাকায় কোনও সমুদ্র-বন্দরের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল না। ভাগীরথীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুখের অন্তর্বর্তী স্থানে টলেমি গঙ্গারিডির রাজধানী গঙ্গেনগরের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। আর হুগলি নদীর মোহনা ও আদিগঙ্গার মোহনার অন্তর্বর্তী স্থানে বর্তমানে শ্রীধাম গঙ্গাসাগর নামক জনবসতি অবস্থিত। ম্যাপের স্থাননির্দেশ থেকে মনে হয় আদিগঙ্গার পশ্চিম দিকে সাগরদ্বীপের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে

একদা গড়ে উঠেছিল 'গঙ্গাসাগর' তীর্থনগর, যা পেরিপ্লাস গ্রন্থে ও টলেমির ম্যাপে 'গঙ্গা' নামক নগররূপে বর্ণিত হয়েছে।

টলেমির ম্যাপে অনেক ক্ষেত্রে ভুল থাকায় গবেষকগণ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী ম্যাপের স্থানগুলিকে সনাক্তকরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ম্যাপের স্থাননির্দেশের আপেক্ষিক অবস্থান বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে যতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেভাবে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করাই প্রথাসম্মত। টলেমির ম্যাপে সমুদ্রের কাছাকাছি স্থানে গঙ্গা-নগরের অবস্থান দেখানো হয়েছে। ওই ম্যাপ অনুসারে সম্ভাব্য এলাকায় বর্তমান গঙ্গাসাগর দ্বীপ অবস্থিত। এই প্রত্নস্থলে প্রাচীন বসতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এখানকার মন্দিরতলা নামক স্থানে প্রাচীন যুগের বিভিন্ন নিদর্শনের সঙ্গে সম্প্রতি নবপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হতে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া এই সাগরদ্বীপের নিকটবর্তী হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা প্রভৃতি স্থানেও প্রাগৈতিহাসিক বসতি স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহলে, টলেমির নির্দেশ অস্বীকার করে সমুদ্রকূল থেকে আরও অনেক দূরে গঙ্গানদীর পরিবর্তে অন্য নদীর কূলে গঙ্গানগরের অবস্থান ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা প্রথাবিরুদ্ধ নয় কি?

প্রত্নসম্পদের খনি এলাকা দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা তথা সুন্দরবন একদা অরণ্যাবৃত ও শ্বাপদসংকুল হয়ে ওঠায় তার প্রত্নসম্পদগুলি দীর্ঘকাল ধরে অনাবিষ্কৃত ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে গবেষক পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৫) যশোহর জেলায় গঙ্গানগর অবস্থিতি ছিল বলে তাঁর অনুমানের কথা প্রকাশ করেছিলেন। তারপর রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র মিত্র উত্তর-চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গায় প্রাচীন বসতির ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর সেখানে গঙ্গানগর অবস্থিত ছিল বলে তাঁর অনুমানের কথা 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭৫) প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু স্ট্রাবোর কথা, পেরিপ্লাস গ্রন্থকারের বিবরণ এবং টলেমির ম্যাপের নির্দেশ অনুসারে ওই সময় গঙ্গানগর সমুদ্রের আরও কাছে ভাগীরথী-আদিগঙ্গার কূলে ছিল—এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। বিশিষ্ট গবেষক কল্যাণ রুদ্র আপেক্ষিক অবস্থান ও অক্ষাংশ-দ্রাঘিমার হিসেব অনুসারে সাগরদ্বীপের কিছু উত্তরে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ হরিনারায়ণপুর নামক প্রত্নস্থলটি গঙ্গানগর হতে পারে বলে অনুমান করেছে[illegible] [illegible]াস্থিনিসের বিবরণ বিশ্লেষণ করে প্লিনিপাটলিপুত্র থে[illegible] দূরত্ব নদীপথে ৬৩৮ রোমান মাইল, অর্থাৎ প্রা[illegible]িটার বলে নির্ণয় করেছিলেন। বর্তমানে সোজাসুজি[illegible]কপথে পাটনা থেকে গঙ্গাসাগর অর্থাৎ আদিগঙ্গার [illegible] ৭২৯ কিলোমিটার। আঁকাবাঁকা নদীপথের সঙ্গে [illegible]খর দূরত্বের এই তারতম্য খুবই স্বাভাবিক।

ভৌগোলিক [illegible]শিষ্ট্য অনুসারে এবং প্রশাসনিক সুবিধার কারণে [illegible]ধানী একাধিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সে হিসেবে [illegible]গরের সমতুল্য নগররূপে দ্বিতীয় গঙ্গানগর বা দ্বিগ[illegible]তে পারে। একইভাবে, গঙ্গাতীরে অবস্থিত গাঙ্গেয় [illegible]াজধানী কলকাতাকে গঙ্গানগরের পরিবর্তিত রূপ [illegible]লিক সুবিধা অনুসারে রাজধানীর সম্প্রসারণ ও বি[illegible]র স্থান পরিবর্তন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অতএব [illegible]oyal City বা Regia) গঙ্গাসাগর হলেও দ্বিগঙ্গা গঙ্গারিডির দ্বিতীয় রাজধানী বা মেট্রোপলিটন সিটি হওয়ায় কোনও বাধা নেই। কিন্তু পেরিপ্লাস গ্রন্থে ও টলেমির ম্যাপে নির্দেশিত আদি গঙ্গানগরকে দেগঙ্গা বলে কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। তৎকালীন গঙ্গাসাগর দ্বীপের অন্তবর্তী স্থানে আদিগঙ্গানদীর পাশে আসল গঙ্গানগর অবস্থিত ছিল।

আদিগঙ্গার পূর্বদিকে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত 'আটঘরা' নামক স্থানে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের ব্যবস্থাপনায় উৎখননের ফলে প্রাচীন বসতি স্তরের সন্ধান মিলেছে। টলেমির ম্যাপে ASTHGURA বা ASTAGURA নামক একটা নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান আটঘরাকে ওই ASTAGURA-র ধ্বনিসাদৃশ্য অনুসারে অষ্টগৌড়া নামে কেউ কেউ সনাক্ত করার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু টলেমি মূলগঙ্গার পশ্চিমে গঙ্গারিডি অর্থাৎ গাঙ্গোপদ্বীপের বাইরে বহু দূরে বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তরে ও পাটলিপুত্রের দক্ষিণে এই নগরের স্থান নির্দেশ করেছেন। আর আটঘরা আদিগঙ্গার পূর্বদিকে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র বা গাঙ্গোপদ্বীপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। তাহলে, যেভাবে টলেমি ভুলক্রমে তামালিট্স্ বা তাম্রলিপ্তকে পাটলিপুত্রের সন্নিকটে এবং গঙ্গানগর থেকে দূরবর্তী স্থানে দেখিয়েছেন, সেভাবে আটঘরাকেও কি ভুল করে তিনি বিন্ধ্যপর্বতমালার উত্তরে দেখিয়েছেন? কিন্তু তাম্রলিপ্তের ক্ষেত্রে দূরত্ব নির্ণয়ে টলেমির ভুল হলেও আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণয়ে ভুল হয়নি। তাম্রলিপ্তকে তিনি মূল গঙ্গার পশ্চিমে এবং মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের দক্ষিণে এবং সাগরদ্বীপ বা গঙ্গানগরের উত্তর-পশ্চিমে চিহ্নিত করতে পেয়েছেন। এক্ষেত্রে বিন্ধ্যপর্বতমালার উত্তরে নির্ণীত ওই স্থানে অন্য কোনও প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব ছিল কি না দেখা দরকার। সে হিসেবে বর্তমান ভাগীরথীর পশ্চিমে, পাটনার দক্ষিণে এবং বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীর উত্তর-পূর্বদিকে বর্তমান রাজগীর প্রাচীনত্বের বিচারে ও আপেক্ষিক অবস্থানের ভিত্তিতে টলেমির 'আস্থাগুরা' হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রত্নসম্পদসমৃদ্ধ রাজগীরের প্রাচীন নাম 'রাজগৃহ'। রাজগীরের সঙ্গে আস্থাগুরার অবস্থানগত ও ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে (আস্থাগুরা <রাজগৃহ> রাজগীর)। একদা এই রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী। উত্তরকালে রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে জানা যায়। গ্রিক উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে চন্দ্রগুপ্ত হয়েছেন অন্দ্রোকোত্তস্ (Andracattas), বিপাশা হয়েছে হিপাসিস্ (Hypasis), শতদ্রু হয়েছে হেসিদোরুস্ (Hesidorus)—এমন আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে 'রাজগৃহ' শব্দটি আস্থাগুরা বা আস্তাগুরা হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। সুতরাং ওই আস্থাগুরাকে অবলম্বন করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আটঘরাকে 'অষ্টগৌড়া' নামে কল্পনা করা বাস্তবসম্মত নয়। তাছাড়া, ওই নামে কোনও প্রাচীন স্থানের অস্তিত্বের কথাও জানা যায় না।

টলেমির ম্যাপের ইংরেজি সংস্করণে কাম্বেরিকাম্ বা আদিগঙ্গার পার্শ্ববর্তী উত্তর-পূর্বদিকে আগ্গা (Agga) নামক একটা নগরের উল্লেখ দেখা যায়। ম্যাক্রিণ্ডল ও উইলফোর্ডের মতে এই নগর এবং অগ্রদ্বীপ অভিন্ন।[১৩] কিন্তু অগ্রদ্বীপ বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত। আর আগ্গা নগর সমুদ্রে আরও কাছে তার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। সে হিসেবে টলেমির ম্যাপে উল্লিখিত স্থান নির্দেশ অনুসারে অগ্রদ্বীপ

নিম্নভাগীরথী অববাহিকা অঞ্চল ও প্রাচীন নদনদী
প্রত্নস্থল
উল্লেখযোগ্য স্থান
সুন্দরবন অভয়ারণ্য
বর্ধমান
দামোদর নদ
বাঁকা দামোদর
পান্ডুয়া
ত্রিবেণী
সপ্তগ্রাম
তারকেশ্বর
মুণ্ডেশ্বরী নদী
দামোদর নদ
প্রাচীন সরস্বতী
সরস্বতী নদী
ভাগীরথী নদী
যমুনা নদী
হাবড়া
বনগাঁ
বাদুড়িয়া
দেগঙ্গা
হাড়োয়া
হাসনাবাদ
বারাসাত
দমদম
সাঁকরাইল
কোলাঘাট
রূপনারায়ণ
হুগলী নদী
তমলুক
(তাম্রলিপ্ত)
গেঁওখালি
কংসাবতী নদী
নন্দীগ্রাম
খেজুরী
বাহিরী
কাঁথি
দীঘা
ক্যানিং
গঙ্গাসাগর
জম্বুদ্বীপ
বাংলাদেশ
বঙ্গোপসাগর
By
Goutam Halder
Gangaridae Research Centre
Kakdwip
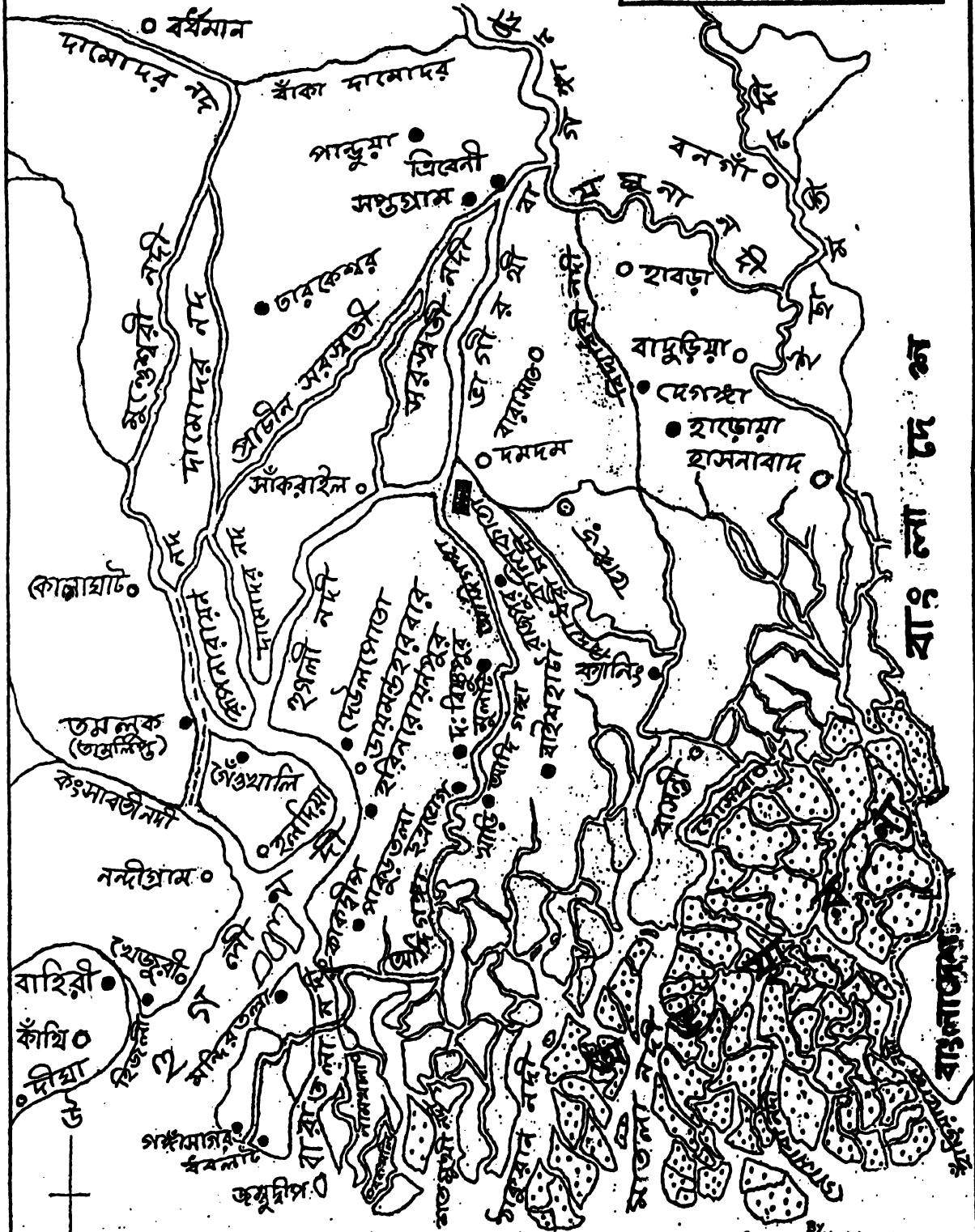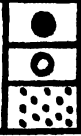
অপেক্ষা আটঘরার কাছাকাছি ওই আগ্‌গা নগর প্রদর্শিত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় যে স্থানটি বর্তমানে আটঘরা নামে পরিচিত, একদা সেই স্থানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব ছিল। মেষবাহন অগ্নিদেবতা, জৈন তীর্থঙ্কর, গৌতম বুদ্ধ, যক্ষ-যক্ষিণী, হস্তী, মেষ, নারীমূর্তি, পুতুল, মূর্তিফলক (Seal), নানাবিধ পাত্র, কর্ণাভরণ, পুঁতিদানা, ইষ্টক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি পোড়ামাটির বহু নিদর্শন এবং বিষ্ণু, মহিষমর্দিনী, ঘোড়সওয়ার, মাতৃকামূর্তি, ব্রাহ্মীলিপি উৎকীর্ণ ফলক, পুঁতিদানা, চন্দনপিঁড়ি প্রভৃতি প্রস্তরনিদর্শন এবং লৌহফলক, তাম্রমুদ্রা, অস্থি-আয়ুধ, হস্তীদন্ত, পক্ষীকঙ্কাল প্রভৃতি বিচিত্র প্রকারের বহু প্রত্নসম্পদ আটঘরায় পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে গুপ্ত, কুষাণ, সুঙ্গ ও মৌর্য আমলের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। আটঘরায় প্রাপ্ত কুষাণযুগের দ্বিমেষবাহিত অগ্নিমূর্তি থেকে এ অঞ্চলে অগ্নি-উপাসকগণের অস্তিত্বের পরিচয় মেলে।

আগ্‌গা নগরের সোজাসুজি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকূলে টলেমি তিলোগ্রাম্মাম্ নামে একটা সমুদ্র-বন্দরের উল্লেখ করেছেন। আগে বলা হয়েছে যে, সে স্থানটি বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার 'বুড়াবুড়ির তট' অথবা তার সন্নিকটবর্তী স্থানকে নির্দেশ করে। বুড়াবুড়ির তট, বনশ্যামনগর প্রভৃত স্থানে প্রাচীন বসতির নিদর্শন প্রচুর পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গাসাগর দ্বীপের সন্নিহিত এই সব স্থানে গঙ্গা বন্দরের সহায়ক বন্দর হিসেবে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আরও অনেক হাট-শহর বা গঞ্জ স্থাপিত হয়েছিল। টলেমির ম্যাপে সমুদ্রে কাছাকাছি মাত্র চারটি বন্দরের উল্লেখ থাকলেও সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপে আরও অনেক নগরের অস্তিত্ব ছিল, তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে। উত্তর চব্বিশ-পরগনার খাসবালান্দা, দেগঙ্গা-চন্দ্রকেতুগড়ে এবং দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার দেউলপোতা, হরিনারায়ণপুর, মন্দিরবাজার-জগদীশপুর, আটঘরা, ধর্মনগর, সরবেড়িয়া, বোড়াল, হরিহরপুর, খাড়ি, ছত্রভোগ, গজমুড়ি, বিষ্ণুপুর, রায়দীঘি, কঙ্কনদীঘি, কুল্পি, করঞ্জলি, কাঁটাবেনিয়া, দক্ষিণ-বারাশত, মজিলপুর, সরিষাদহ, বাইশহাটা-মঠবাড়ি, কাকদ্বীপ-পাকুড়তলা, মহাদেবতলা, পুকুরবেড়িয়া, গোবিন্দপুর, গদামথুরা, বনশ্যামনগর, এল প্লট্‌, রাক্ষসখালি, পাথরপ্রতিমা, বুড়াবুড়ির তট, চন্দনপিঁড়ি, জটা, মন্দিরতলা, গঙ্গাসাগর এবং আরও বহু স্থানে প্রাচীন বসতিস্তর এবং প্রাক্ ও উত্তর গঙ্গারিডি সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিভিন্ন নদনদীর নিকটবর্তী স্থানসমূহ থেকে প্রাচীন নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় [illegible] প্রাচীন নৌবন্দর ও সুরম্য নগরীসমূহের পরিচ[illegible]দেশের বাণিজ্যতরীর আনাগোনা এবং সুসভ্য নগর[illegible]দা এ অঞ্চলে যে উন্নতিশিখরে অরোহণ করেছিল, [illegible] ধ্বংসাবশেষ থেকে তার সুস্পষ্ট আভাস মেলে। ব[illegible] শহরতলি অঞ্চল ছাড়া উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বি[illegible]ও অনুন্নতি ও দুর্গমতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অথচ অ[illegible]ক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে শহ[illegible]টা অসমান-উন্নতির অবস্থা ছিল না বলেই মনে হ[illegible]নুসন্ধানে আমরা তাই আদিগঙ্গা-শতমুখীর অসংখ্য [illegible]সেই সামগ্রিক উন্নতির সাক্ষ্য অনুভব করি। উত্তরবঙ্গ অ[illegible] সমুদ্রপথ ও নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সঠিক হয়েছিল বোঝা যায়। "অধুনা দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনায় বহিরাগতের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও মেদিনীপুর থেকে বহু মানুষ এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বসবাস করছে। সুন্দরবন অঞ্চলে এদের সংখ্যা অধিক। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষায় মিশ্রভাষার কিছু ছায়াপাত ঘটেছে।"[১৪] এখানকার মানুষের কথ্য ভাষায় বর্তমানে আঞ্চলিক টান আর বিশেষ দেখা যায় না। আবহমানকাল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা বিবিধের মাঝে মহামিলনের পুণ্যভূমি। সে ঐতিহ্য আজও বজায় আছে। প্রতিবছর শ্রীধাম গঙ্গাসাগরের গঙ্গামেলা আজও মিনি ভারতবর্ষের রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে। "আমরা জানি ভূগোল সব সময়ই ইতিহাসকে ব্যঙ্গ করে। প্রকৃতির খামখেয়ালীপনায় বারবার বদলে যায় বহু ভৌগোলিক চালচিত্র। নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন সভ্যতার ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে ঠিক একই কথা বলা যায়। সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প বারবার তছনছ করে দিয়েছে এই ভূখণ্ডের প্রাচীন মানবসভ্যতা। অথচ এখানে আদি ভারতীয়দের গড়া সভ্যতা কখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। গঙ্গারিডি সভ্যতার প্রাচীন এই লীলাভূমিতে আবহমানকাল ধরে মানুষ বসবাস করে চলেছে।"[১৫] তাই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় যেখানে-সেখানে মাটির তলা থেকে মানবসভ্যতার বিচিত্র নিদর্শন নিত্যনূতনরূপে আবিষ্কৃত হওয়ায় দেশে-বিদেশে গবেষকগণের কৌতূহল সঞ্চার হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারের সাড়ে তিন মাইল পশ্চিমে আবদালপুর গ্রামে ঘোষেরচকের দক্ষিণে দেউলপোতা নামক স্থানে হুগলি নদীর তীরে একটি হাতি ও বুনো হরিণের ফসিল পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুমান—এগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন। একটি বানর জাতীয় জীবের করোটিও এখান থেকে পাওয়া গেছে। দেউলপোতায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম ও প্রস্তর যুগের নিদর্শন থেকে মনে করা যেতে পারে যে মানবসভ্যতার বিকাশকালের সময় এ অঞ্চলেরও অবদান ছিল। এখান থেকে প্রাপ্ত তাম্রনির্মিত পতঙ্গদেহ মাদুলি মিশরীয় স্কারাব মাদুলির সঙ্গে তুলনীয়। সমুদ্রগামী জাহাজের তাম্রনির্মিত ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এবং প্রাগৈতিহাসিক অলঙ্করণ শোভিত তাম্রফলকের ভগ্নাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে। এখানকার পোড়ামাটির পুতুল (যক্ষিণী মূর্তি, জটাজুটসমন্বিতা মাতৃমূর্তি ও নানা দেবদেবীর মূর্তি), প্রাচীন লিপি ও চিত্রযুক্ত সিলমোহর ও মুদ্রা, প্রস্তরায়ুধ, অস্থি-আয়ুধ, শিলীভূত দারু-আয়ুধ প্রভৃতি নিদর্শন পুরোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুর থেকে স্বর্গত কালিদাস দত্ত প্রথমে কিছু প্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কার করেন। অতঃপর দামোদর হালদার ও রবীন হালদার নামক দুজন প্রত্ন-সংগ্রাহকের সংগৃহীত ফ্লিন্ট পাথরের হাতিয়ার পশিচমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের হস্তগত হয়। স্বর্গত পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত উক্ত প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পরীক্ষা করে দেউলপোতায় প্রস্তর যুগের বিলুপ্ত সংস্তর আবিষ্কারের বিষয় উপলব্ধি করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ থেকে উৎখননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক ভূমিস্তরের দ্বারোদঘাটিত হয়। তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেউলপোতা অনুসন্ধানের ফলে সুঙ্গ-কুষাণযুগের মৃৎপাত্রে কতকগুলি অংশ এবং কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এই

উপাদানগুলি বিভিন্ন যুগে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার ও সুন্দরবনের উত্থান-পতন এবং ব্যাপক ভূমি-নিমজ্জনের সাক্ষ্য বহন করে।[১০] প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তিসমূহের উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না—সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার অধিকাংশ প্রত্নস্থলে এবং উত্তর-চব্বিশ পরগনার কয়েক স্থানে প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের ও মধ্যযুগের বসতি স্তরের নিদর্শন প্রচুর পাওয়া গেছে। বিদেশি লেখকগণ কলিঙ্গ, অন্ধ্র, মধ্যকলিঙ্গ, মক্কোকলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, মল্ল, গঙ্গারিদেস্-কলিঙ্গ, গঙ্গারিডি, প্রাসী প্রভৃতিকে প্রথমত পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বাসভূমিকে এক-একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বা জনপদ হিসেব উল্লেখ করেছেন। মক্কো-কলিঙ্গকে প্লিনি হিমালয়ের নিকটবর্তী হিমবান (Imans) জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রতীরে কলিঙ্গী, তারপর উত্তরদিকে যথাক্রমে অন্ধ্র, তাম্রলিপ্ত, মল্ল প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হলে এদের পূর্বদিকে হবে গঙ্গারিডি রাজ্য এবং তা গঙ্গার শেষাংশে অবস্থিত হলে টলেমি-বর্ণিত সীমাটিকেই মেনে নিতে হয়। উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্ররাজ্য একদা গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে পুণ্ড্রবর্ধন বা পৌণ্ড্রবর্ধন দেশরূপে অভিহিত হয়েছিল। বৃহত্তর গাঙ্গোপদীপ বা দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গঙ্গারিডি দেশরূপে অভিহিত। উপবঙ্গের বাইরে মূল পুণ্ড্রদেশকে গঙ্গারিডি বলা হত না। দেশীয় সূত্র 'কৌটিলীয় অর্থ-শাস্ত্র' থেকে জানা যায় যে, মৌর্য-চন্দ্রগুপ্তের আমলে পুণ্ড্রদেশে রাজত্ব করতেন সোমদত্ত। সেই পুণ্ড্রদেশ ছিল উত্তরবঙ্গে পদ্মা-মেঘনার উত্তরে। প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর; প্রাচীনকালে স্থানীয় ভাষায় (পূর্বী-প্রাকৃতে) যাকে বলা হত 'পুড়্‌গল'। উক্ত পুড় শব্দ সংস্কৃত উচ্চারণে 'পুণ্ড্র'। সমসাময়িককালে পুণ্ড্রের পূর্বদিকে ছিল 'বঙ্গ'। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের সূত্র অনুসারে সেখানকার রাজা ছিলেন শতানন্দ। এঁদের কাউকে গঙ্গারিডির রাজা বলা হত না। সুতরাং প্রাচীন পুণ্ড্র ও বঙ্গ (অর্থাৎ বর্তমান উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গ) বাদে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন ও চন্দ্রদ্বীপকেই গঙ্গারিডি বলা হয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বর্তমান মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিহারের পূর্বদিকের সামান্য কিছু অংশ, মুর্শিদাবাদ জেলা, বর্ধমান জেলার পূর্বভাগ (অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল), হুগলি ও হাওড়া জেলায়, মেদিনীপুর জেলার পূর্ব-দক্ষিণে হুগলি নদী-তীরবর্তী অঞ্চল, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা, কলকাতা, উত্তর চব্বিশ-পরগনা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা ছিল গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দরবনের মধ্যে ঘন জঙ্গলে ঢাকা প্রাচীন ঘরবাড়ি
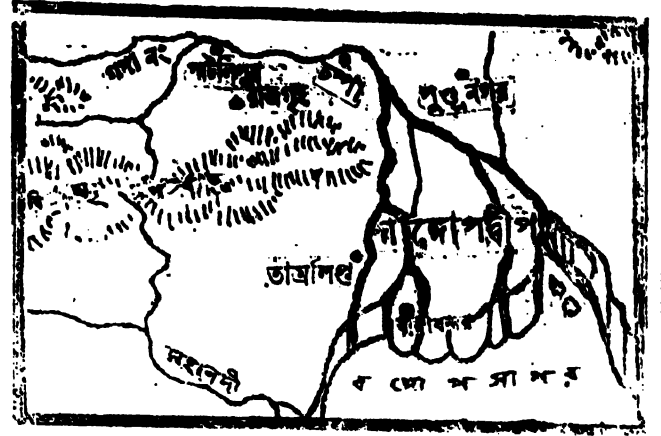
গাঙ্গোদ্বীপের প্রাচীন রেখাচিত্র

এই প্রাচীন গাঙ্গোপদ্বীপ বা উপবঙ্গের সমগ্র অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল টলেমির ম্যাপে বর্ণিত গঙ্গারিডি রাষ্ট্র। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার গঙ্গাসাগর তীর্থ-নগর ও গঙ্গা-জনপদকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এই দেশ। 'গঙ্গারিডি' শব্দের উৎস 'গঙ্গাঋদ্‌' (অর্থাৎ, গঙ্গাঋদ্ধ। জাতি অর্থে গ্রিক ভাষায় গঙ্গাঋদ্‌ শব্দের বহুবচন 'গঙ্গাঋদৈ' (Gangaridai) ল্যাটিন বানানে 'Gangaridai', যার ইংরেজি উচ্চারণ 'গঙ্গারিডি।' ঐতিহাসিক ডঃ অতুল সুরের মতে, বৈদেশিক শব্দ 'বঙ্গৃদ' এবং 'গঙ্গাঋদ্‌' শব্দ একইভাবে গঠিত। ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে সব্য ঋষি বলেছেন—"ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠযাতিথিগ্বস্য বর্তনী। ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনত্‌পুরোহনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বমা।।"—ঋগ্বেদ সংহিতা, ১/৫৩/৮। অর্থাৎ "শত্রুকরঞ্জ ও পর্ণয়কে তুমি তেজস্বী বর্তনী দ্বারা বধ করেছ অতিথিগ্ব নামক রাজার জন্য। বঙ্গৃদ্‌ নামক শত্রুর চারিদিকে বেষ্টিত শত নগর তুমি অনুচররহিত হয়েও ভেদ করেছিলে ঋজিশ্বান নামক রাজার দ্বারা।" বঙ্গৃদের ন্যায় গঙ্গাঋদ্‌ ইন্দো-এরিয়ান শব্দ। বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েও উত্তরকালে বঙ্গৃদ্‌ শব্দটির ব্যবহার যেভাবে লোপ পেয়েছে, সেভাবে গঙ্গাঋদ্‌ শব্দের ব্যবহার লোপও অসম্ভব নয়। গঙ্গারিডি শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে ডঃ সুরের এই মতটি ডঃ সুকুমার সেনের অভিমত দ্বারা সমর্থিত। ডঃ সেনের মতে, পণ্ডিতগণ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় 'reid' নামক একটা ধাতুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন, যে ধাতু-উৎপন্ন শব্দ গ্রিক ল্যাটিন ভাষায় আছে, যার অর্থ অবলম্বন করা/পোষণ করা (Indo-Germanisches worterbuch, Pokorny, 861)। এই ধাতু-উৎপন্ন শব্দ গঙ্গাঋদ্‌, যার অর্থ গঙ্গাঋদ্ধ বা গঙ্গাপুষ্ট। একইভাবে বঙ্গৃদ শব্দের অর্থ বঙ্গঋদ্ধ বা কার্পাসপুষ্ট। সুতরাং বৈদিক শব্দ বঙ্গৃদের ন্যায় গঙ্গোঋদ্‌ শব্দটি ইন্দো-এরিয়ান্‌ ভাষা সম্ভূত। —(বঙ্গভূমিকা—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১২)।

দুর্ধর্ষ গঙ্গারিডিদের বীরত্বের সুনাম ছিল সারা বিশ্বজুড়ে। মগধ ও গঙ্গারিডির যুক্ত সৈন্যবল ও তাদের সুনিপুণ রণহস্তীবাহিনীর সংবাদে আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ী সৈন্যদল মগধ আক্রমণ না করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়েছিল। রোমান মহাকবি ভার্জিল তাঁর 'জর্জিস' কাব্যগ্রন্থে গঙ্গারিডি সৈন্যদের যুদ্ধের প্রশস্তি করে লিখেছেন যে, তিনি তাঁর জন্মস্থান সেন্টুয়া নগরে ফিরে গিয়ে একটা মর্মর সৌধ

গঠন করে তাতে রোমসম্রাট কুইরিনিয়ামের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তার সিংহদরজায় স্বর্ণ ও গজদন্তসহকারে গঙ্গারিডিদের যুদ্ধের দৃশ্য উপস্থাপন করে রাখবেন। বিদেশি সূত্রে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গাঙ্গেয় নিম্নবঙ্গবাসীদের গঙ্গারিডি নামে অভিহিত করা হয়েছে। সে হিসেবে ওই সময় পর্যন্ত যে সব সম্প্রদায় এ অঞ্চলে বসবাস করত, তাদের সকলকেই বলা যেতে পারে, গঙ্গারিডি জাতি (Nation of Gangaridae)। এই সময়ের মধ্যে এখানে ব্রাহ্মণগণেরও আগমন ঘটেছিল জানা যায়। 'যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা ও যূপের ছবি'-যুক্ত নাম মুদ্রার পাঠোদ্ধার করে প্রসিদ্ধ লেখতত্ত্ববিদ ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রাক্‌গুপ্ত যুগে এ অঞ্চলে বৈদিক ধর্মের প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে হিসেবে এই প্রাচীন বংশীয় ব্রাহ্মণদের বংশধররাও গঙ্গারিডিদের উত্তরপুরুষ। প্রসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক ডঃ অতুল সুরের মতে, 'বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে গৃহীত লেখক-বৃত্তিধারী 'করণ' ও উচ্চপদস্থ 'কায়স্থ' পূর্বে জাতিনাম হিসেবে গণ্য হত না; খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দী থেকে কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য করতে শুরু করেছে। সে হিসেবে কায়স্থ ও করণদের পূর্বপুরুষগণের অনেকেই ছিলেন গঙ্গারিডি জাতির অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন উপবঙ্গ বা গাঙ্গোপদ্বীপ অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধন ও চন্দ্রদ্বীপে যারা বসবাস করত, তাদের বংশধররা বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশুদ্র, রাজবংশী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, মল্লক্ষত্রিয় প্রভৃতি যোদ্ধৃজাতি এবং দলুই, কর্মকার, কৈবর্ত, মাহিষ্য, গোপ, সদ্‌গোপ, হাড়ি, কাওরা, কুম্ভকার, নাপিত প্রভৃতি প্রাচীন বংশীয়েরা এবং কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, ধর্মান্তরিত মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতি ও কোলজাতীয় আদিবাসীবৃন্দ। এদের মধ্যে তৎকালে গঙ্গা বন্দর সন্নিহিত নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে যাদের সংখ্যাধিক্য ছিল, তারাই ছিল মূল গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠীর সূত্রধার—যাদের রাজা (দলপতি) বাস করতেন গঙ্গা বন্দরে। কিন্তু একদা সেই সীমিত জনপদ ও রাজ্যের আয়তন অতিক্রম করে সুসমৃদ্ধ সুসংহত প্রবল-পরাক্রান্ত বৃহত্তর গঙ্গারিডি কনফেডারেশনও মহাজাতি গঠনে বৃহৎ বঙ্গ এবং সমূহ প্রাচীন বাঙালি জনগোষ্ঠীর অবদান ছিল। সেই প্রাচীন বাঙালিদের রক্ত বর্তমান বাঙালিদের শিরা-উপশিরায় এখনও প্রবহমান।

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের মত পৌণ্ড্রগণ প্রাচীন ভারতের একটি প্রসিদ্ধ জনগোষ্ঠী। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পৌণ্ড্রদের সঙ্গে ওড্র, দ্রাবিড়, দরদ, কিরাত, খস, মাহিষক প্রভৃতি প্রাচীন ক্ষত্রিয়ধর্মী জাতিসমূহের নাম পাশা-পাশি উল্লিখিত হয়েছে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত সিন্ধুসভ্যতা ছিল দ্রাবিড় সভ্যতা যা প্রাক্‌-দ্রাবিড় সভ্যতা। আর নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত গঙ্গারিডি বা গাঙ্গেয় সভ্যতা ছিল প্রাচীন পৌণ্ড্র-সভ্যতা। প্রাচীনকালে পূর্বভারতে ও দক্ষিণ ভারতে দুর্ধর্ষ পুণ্ড্রগণের আধিপত্য ছিল। পূর্বভারতের পুণ্ড্রদেশ একদা পুণ্ড্রবর্ধন নামে প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রকূল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তারা পৌণ্ড্র এবং পুণ্ড্রবর্ধনীয় নামে অভিহিত। উত্তরবঙ্গের পুড়ণগল বা পুণ্ড্রনগর (বর্তমান বাংলাদেশের মহাস্থানগড়) ছিল তাদের রাজধানী। কালক্রমে পুণ্ড্রনগর থেকে হঠে এসে তারা দক্ষিণ-পুণ্ড্রবর্ধনের গাঙ্গেয় নিম্নবঙ্গের অরণ্য অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার ব্যাপক এলাকা জুড়ে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। এই এলাকার আদিবাসিন্দা হিসেবে এই পুড় বা পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর লোকেরা 'গঙ্গা' নামে একটা কৌম জনপদ গঠনে সক্ষম হয়েছিল এবং গঙ্গানগরে তাদের নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিল। সমগ্র গাঙ্গেয় বদ্বীপগুলি তাদের অধিকারে ছিল। গ্রিক ও রোমান লেখকগণ তাদের গঙ্গারিডি জনগোষ্ঠী (Tribe of Gangaridae) নামে অভিহিত করেছেন। পুণ্ড্রজাতির রক্তধারা কেবলমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংখ্যাগরিষ্ঠ পুড় বা বাঙালি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দেহে প্রবাহিত নয়, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের ন্যায় প্রাচীন পুণ্ড্রদেরও রক্তধারা বৃহত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সংমিশ্রিত হয়েছে এবং বাণিজ্য ও যুদ্ধ উপলক্ষে প্রবাসী গাঙ্গেয়-পৌণ্ড্ররা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালী জাতি আলপাইন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত; এদের সঙ্গে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলয়েড এবং নার্ডিক অর্থাৎ বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্য নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং আর্য হোক, অনার্য হোক—বাংলার উন্নত বর্ণহিন্দু, তপশিলি জাতি ও উপজাতি, অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী, (ওবিসি), বাঙালি মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ যাই-ই হোক, এরা সকলেই আন্তর্জাতিক ও বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন গাঙ্গেয় মহাজাতি গঠনের রূপকারদের বংশধর। সে হিসেবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবনসহ বৃহৎ বঙ্গের অধিবাসী বিভিন্ন স্তরের মানুষ আমরা সকলেই সেই বিবিধের মধ্যে মহামিলনপ্রয়াসী গঙ্গারিডিদের গৌরবময় ঐতিহ্যের মহান উত্তরাধিকারী। গঙ্গারিডি সভ্যতার সময় থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বৃহত্তর গঙ্গাভূমির ইতিহাসই বাঙালি মহাজাতির উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। সেই বাস্তব ইতিহাসের আলোয় যখন উদ্ভাসিত হবে বৃহত্তর গঙ্গাভূমির বাঙালি মহাজাতি, তখন সারা বিশ্বের দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হবে এই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগরসঙ্গতা পুণ্যতোয়া আদিগঙ্গার বিস্তীর্ণ অববাহিকায়।[১৭]

তথ্যসূত্র

১. দক্ষিণ চব্বিশ [illegible] ইতিহাসের উপকরণ—কৃষ্ণকালী মণ্ডল (পৃঃ ৯—১১)।
২. বাংলার নদনদী—[illegible] (পৃঃ ২২)।
৩. The Early H[illegible] of [illegible] F.J.Monahan. (P.3)
৪. The Periplus [illegible] Sea—(Tr.) H. Schoft) P. 47).
৫. বর্ধমান : ইতি[illegible] সং[illegible]—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (পৃঃ ২৬১)।
৬. ঐ (পৃঃ ২৮০)
৭. বাংলার নদনদী [illegible] (পৃঃ ২২-২৩)।
৮. Memoir of [illegible] of [illegible]than of Mughal Empire—J. Rennel (p. 54).
৯. বাঙালীর ইতিহাস (কিশোর সংস্করণ, ১৩৩৯)—নীহাররঞ্জন রায় (পৃঃ ২৮)।
১০. বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি-১—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (পৃঃ ২৭০)।
১১. The Early History of Bengal—F.J. Monahan (P. 18).
১২. পুরাতনী (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ সংখ্যা), পৃঃ ২৪—২৮।
১৩. বর্ধমান : ইতহাস ও সংস্কৃতি—১—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (পৃঃ ২৬৯)।
১৪. দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্য ভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৮।
১৫. সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ—ধূর্জটি নস্কর (ভূমিকা : ডঃ অতুল সুর, পৃঃ ৭)।
১৬. গঙ্গারিডি : ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ—নরোত্তম হালদার (পৃঃ ১৬-১৭)।
১৭. গঙ্গারিডি : আলোচনায় ও পর্যালোচনা—নরোত্তম হালদার (পৃঃ ১২০)।

লেখক পরিচিতি : গঙ্গারিডি সংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক ও একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা।

রেবতীরঞ্জন ভট্টাচার্য

আদিগঙ্গার আদি থেকে অন্ত

কথায় বলে যে অনুরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে। আমারও হয়েছে ঠিক ওই একই দশা। ৭৫ বছর বয়সে আদিগঙ্গার আদি থেকে অন্তের ইতিহাস লিখতে হচ্ছে। বিগত প্রায় ১৫ বছর যাবৎ আমি কালীঘাটের আদিগঙ্গা নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছি। আদিগঙ্গা নিয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই আমার মনে পড়ে যায় ভূপেন হাজারিকা মহাশয়ের একটি গান—

"গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা,
(যাঁর) দুই পাশে দুই জলের ধারা মেঘনা, যমুনা।।"

কালীঘাটের এই আদিগঙ্গা সত্যিই আমার মা, যদি বলেন কেন? এই প্রসঙ্গে আমার বাল্যকালের একটি কথা মনে পড়ে। তখন আমরা থাকতাম—গঙ্গার একদম কিনারে একটা মাটির বস্তিবাড়িতে। গঙ্গা তখন কানায় কানায় জলে ভর্তি থাকত। এরই তীরে একদিন আমি কাগজের নৌকো জলে ভাসাতে গিয়ে ডুবে যাই। তখন আমার বয়স প্রায় ৭/৮ বছর হবে। অনেক কষ্টে আমাকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছিল। তখন কিন্তু আমি বুঝিনি যে মাগঙ্গা কেন আমাকে বাঁচিয়ে তুললেন। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে বুঝতে পারছি যে মাগঙ্গা বুঝেছিলেন যে তাঁর ভবিষ্যতে কি দুর্দশা হবে এবং কে তাঁকে আবারও উদ্ধার করবে। সাগর রাজার পুত্র ছিলেন ভগীরথ। অর্থাৎ একজন রাজপুত্র। আর আমি মাত্র একজন ভাগ্য বিড়ম্বিত বাস্তহারা গরিব ব্রাহ্মণপুত্র। সে কথা যাক। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম যে—

"বাড়ি আমার ভাঙ্গন ধরা অজয় নদের বাঁকে,
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।।"
আমার বাড়ি কিন্তু এই পচা, গলা, আদিগঙ্গার ধারে,
(যেথায়) মশা, মাছি, পোকা, মাকড়, সদাই নৃত্য করে।।

এই আদিগঙ্গা কিন্তু কখনও এমন ছিল না। ছেলেবেলায় দেখেছি যে এই গঙ্গা দিয়ে বিশাল বিশাল নৌকা ইট, বালি, টালি এবং নানাবিধ পণ্য বোঝাই হয়ে চলাচল করত। মাঝে মাঝে গাদাবোট খড়বোঝাই লম্বা লম্বা শালতি এমন কি এক হাজার, দু' হাজার বাঁশ বেঁধে ভেলার মতন করে নিয়ে আসত মাঝিরা এই গঙ্গা দিয়ে। চাঁদনী রাতে মাঝে মাঝে তাদের ভাটিয়ালি গান শোনা যেত। এই সমস্ত বাঁশ, টালি, হোগলা, দরমা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা বিরাট বাজার। যাকে বলা হয় টালিগঞ্জের বাজার। বৈঠকখানা বাজারের পরেই ছিল এই বাজারটি। যার বয়স প্রায় ২২৫ বছর।

এই আদিগঙ্গা কিন্তু কখনও এমন ছিল না। ছেলেবেলায় দেখেছি যে এই গঙ্গা দিয়ে বিশাল বিশাল নৌকা ইট, বালি, টালি এবং নানাবিধ পণ্য বোঝাই হয়ে চলাচল করত। মাঝে মাঝে গাদাবোট খড়বোঝাই লম্বা লম্বা শালতি এমন কি এক হাজার, দু' হাজার বাঁশ বেঁধে ভেলার মতন করে নিয়ে আসত মাঝিরা এই গঙ্গা দিয়ে। চাঁদনী রাতে মাঝে মাঝে তাদের ভাটিয়ালি গান শোনা যেত। এই সমস্ত বাঁশ, টালি, হোগলা, দরমা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা বিরাট বাজার। যাকে বলা হয় টালিগঞ্জের বাজার। বৈঠকখানা বাজারের পরেই ছিল এই বাজারটি। যার বয়স প্রায় ২২৫ বছর।

কুদঘাট থেকে দক্ষিণে একটি শাখা চলে গিয়েছিল এই গঙ্গার যাকে বলা হয় কেওড়াপুকুরের খাল, যা এখন মৃত। মাত্র একটি রেখা পড়ে আছে।

গড়িয়া থেকে দক্ষিণে এর একটি ধারা চলে গিয়েছে বোড়াল, রাজপুর, হরিনাভী, কোদালিয়া, আটিমারা, বারুইপুর, মাজিলপুর এবং ছত্রভোগ প্রভৃতি হয়ে একদম শতমুখীতে গঙ্গাসাগরের দিকে। বিখ্যাত বণিক চাঁদ সদাগর তাঁর ভাগলপুরের বাড়ি থেকে নৌকাযোগে রাজঘাট, ছত্রঘাট, নদিয়া এখন নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত বন্দর, ত্রিবেণী, কালীঘাট হয়ে পূর্বোক্ত পথে গঙ্গা দিয়ে তাঁর বাণিজ্য তরী নিয়ে চলে যেতেন সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দেশে। একথা লেখা আছে "মনসার ভাসান" কাব্যে, লিখেছেন বিখ্যাত কবি বিপ্রদাস পিপলাই। চৈতন্য মহাপ্রভু, পুরীধামে গমনকালে এই পথেই গিয়েছিলেন, একথা লেখা আছে "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থে, লিখেছেন কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী। আরো একটি "মঙ্গলকাব্য" লিখেছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। রাধারমণ মিত্রের "কলকাতা দর্পণ" নামক বইতেও উপরোক্ত পথে

কালীঘাটের আদিগঙ্গার [illegible]রের পুরনো মানচিত্র (প্রথম প্রকাশ : ১ জুলাই ১৮৯১)

গঙ্গা যেখানে বিস্তৃত কক্ষ

আদিগঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এই কথা লেখা আছে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা "সুরধনী" কাব্যেও উপরোক্ত পথে আদিগঙ্গা প্রবাহিত এই কথা লেখা আছে।

খৃস্টজন্মের প্রায় ৬৪০ বছর আগে যখন বুদ্ধদেব দেহরক্ষা করেন, ঠিক সেই সময় আমাদের এই বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন সিংহবাহু। তাঁরই ছেলে বিজয় সিংহ যখন প্রজাপীড়নের দায়ে দেশ থেকে নির্বাসিত হন তখন তিনি তাঁর ৭০০ অনুচর নিয়ে এই পথেই সিংহল যাত্রা করেছিলেন। তখন আমাদের এই আদিগঙ্গা ছিল বিশাল এবং বিস্তৃত। এই কথা লেখা আছে The Physical geography নামক বইতে, যা লিখেছেন S. A. Hill সাহেব। আরো একখানা Physical geography, যেটা লিখেছেন H. F. Blanford সাহেব, তাতেও ওই একই কথা লেখা আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মহাশয়ের লেখা "চণ্ডী" কাব্যেও উপরোক্ত পথে এই গঙ্গা প্রবাহিত ছিল এই কথা লেখা আছে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা "কলকাতা এখনও যেমন" নামক বইতেও আদিগঙ্গার উল্লেখ তো আছেই, এমনকি ৩০০ বছর আগের ম্যাপ তাতেও দেওয়া আছে। আরো অসংখ্য বই আছে তাতে আদিগঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহলে "এটা টালি নালা" কি করে হল, সেই কথাতেই আসছি।

প্রায় ৪৫০ বছর আগে দিনেমার অর্থাৎ Dutch-রা আমাদের দেশে বাণিজ্য করতে আসে। এই আদিগঙ্গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে যেতে তাঁদের খুবই কষ্ট হত। একে তো পুরো অঞ্চলটিই ছিল সুন্দরবনের অন্তর্গত।

বাঘ এবং অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের উপদ্রব তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল ডাকাত এবং ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাত। তাই তাঁরা সহজ এবং নিরাপদে সমুদ্রে যাবার জন্য দিল্লির বাদশাহের অনুমতি নিয়ে খিদিরপুর থেকে মেটিয়াব্রুজ ও বজবজ হয়ে হাওড়া জেলার সাঁকরাইলে সরস্বতী নদীর প্রবাহের সঙ্গে একটি ছোট্ট খাল কেটে ভাগীরথী নদীকে জুড়ে দিলেন। মানে ওই পথে গঙ্গার জলধারা প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করল। যাকে বলা হয় "কাটি গঙ্গা"। এই গঙ্গার জলে কিন্তু আমাদের কোনওই পূজার্চনা হয় না। এই পথেই তখন থেকে সমুদ্রগামী সমস্ত জাহাজ চলাচল করতে লাগল। যার মানে আদিগঙ্গার স্রোত গেল কমে। এবং পলিমাটি পড়ে অতি তাড়াতাড়িই এই গঙ্গা বুজে গেল। এমন অবস্থা হল যে নৌকো আর চলে না। অবশ্য বোট ক্যানালও এই জন্য দায়ী। ইংরাজেরা বেনের জাত। এ দেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে, কিন্তু কপালগুনে পেয়ে গেল গোটা একটা রাজত্ব। কিন্তু রাজত্ব পেলে কি হবে? নৌবাণিজ্য কি ছাড়তে পারে? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ Mazor willium Tolly-র স্ত্রী মিসেস আন্না মারিয়া (Mrs. Anne Maria)-র ছিল একটা নৌ-বাণিজ্য। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে ছিল তাঁর ধান, চাল, পাট প্রভৃতির ব্যবসা। সেটি প্রচণ্ডভাবে মার খেতে থাকায় Mazor Willium Tally এই আদিগঙ্গার পলি মুক্ত করলেন এবং গড়িয়া থেকে Salt Lake-এর মধ্য দিয়ে বানতলা হয়ে তাড়দহ নামক স্থানে অর্থাৎ শামুক পোতার বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে একটা ছোট খাল কেটে যোগ করে ছিলেন আদিগঙ্গার প্রবাহকে। ফলে তাঁদের নৌ-বাণিজ্য আরো সহজ হয়ে গেল। তখন এই তাড়দহ বা শামুকপোতা ছিল একটা ছোট বন্দর। এখানে তৈরি হত প্রচুর নৌকো। সেই সমস্ত নৌকো যাঁরা তৈরি করাতেন এখনও তাঁদের বংশধরেরা কেউ কেউ সেখানে আছেন। কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলে এর সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। আবহমানকাল থেকে এখানে একটি বনবিবির থান আছে। এই বনবিবির থানে পুজো দিয়ে এ অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে যায়। এইখানে সেই সময় পর্তুগিজরা জাহাজ মেরামতের কারখানাও তৈরি করেছিলেন এবং নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য একটা হলঘরও তৈরি করেছিলেন। ওই হলঘরটি ছিল কলকাতার বড় বড় ঠাকুরদালানের ধাঁচে। সামনেও বড় বারান্দা। তৎসহ গোলাকৃতির বড় বড় থাম বা পিলার। স্থানীয় লোকেরা একে বলতো "সাহেবদের নাচঘর"। কিন্তু এখন আর সে সমস্ত কিছুই নেই।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মন্দির, মসজিদ, গীর্জা

বিদ্যাধরী পর্যন্ত কাটা খাল চলে গেছে
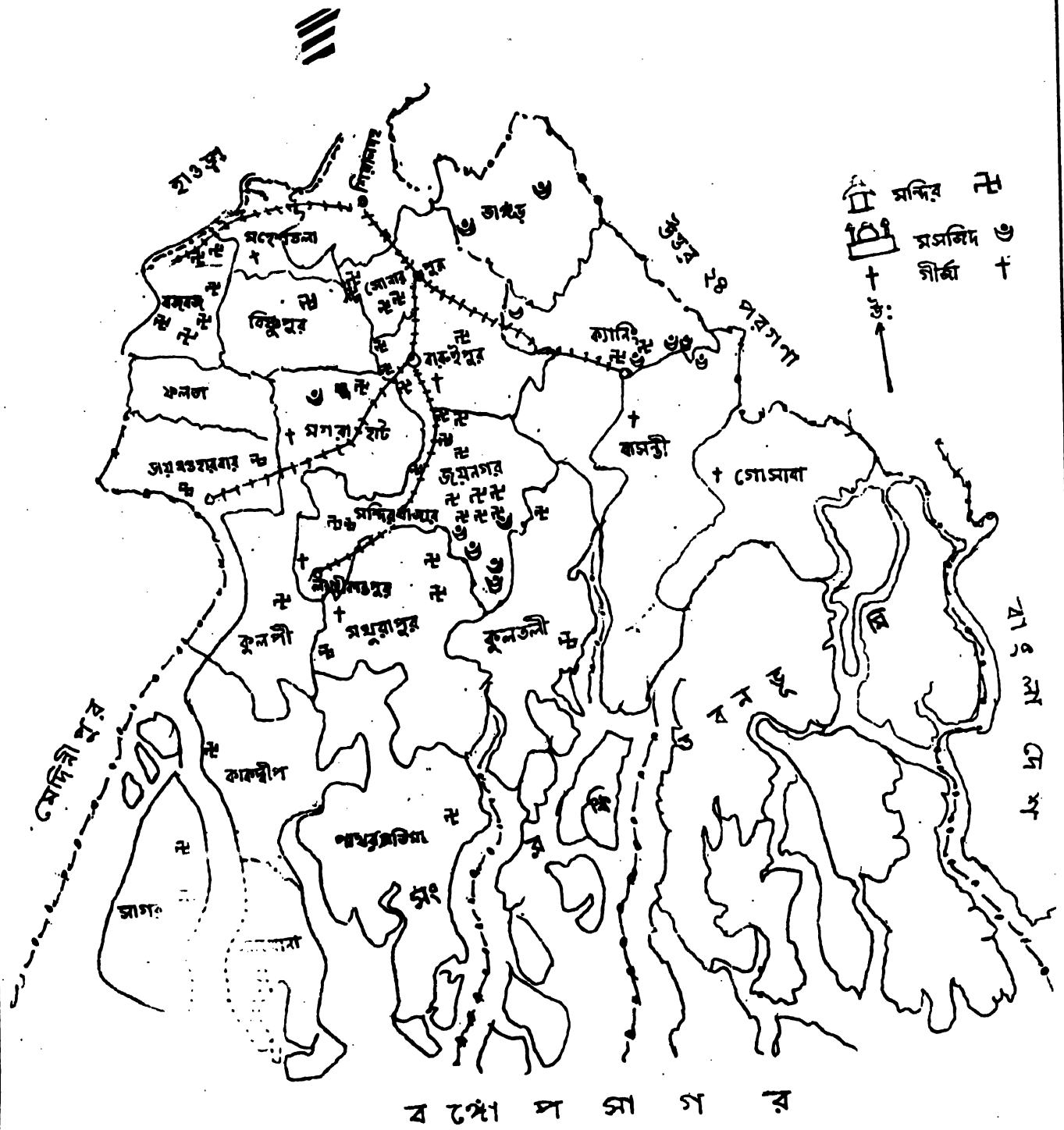
আমার যখন ১৪/১৫ বছর বয়স তখন এই কালীঘাটে ঠাকুররাজ স্মৃতিতীর্থ নামে একজন অতিসজ্জন প্রায় ৯০ বছর বয়স্ক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আমার বাবাকে বাবা বলে ডাকতেন এবং প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। এবং তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে যে সমস্ত কাহিনী আমাকে শুনিয়েছিলেন তারই কিছুটা আমি এখানে উল্লেখ করলাম।

যে সময় Mazor willium Tolly এই আদিগঙ্গার পলি মুক্ত করেছিলেন এবং গড়িয়া থেকে বিদ্যাধরী পর্যন্ত ছোট্ট একটি খাল কেটেছিলেন সেটা ছিল 1775 খ্রিস্টাব্দ। ওই খালটি কাটার পরে আবার 1st July, 1777 থেকে এই পথে পুরোদমে নৌ-বাণিজ্য চলাচল শুরু হল। একথা লেখা আছে The Rivers in gangetic Delta নামক বইতে, যা লিখেছেন Adams willium. তখন থেকেই ইংরেজেরা একে টালিনালা বলতে শুরু করে। কিন্তু আদৌ এই গঙ্গা টালিনালা নয়। পূর্বোক্ত বইটিই তার প্রমাণ। এটা গঙ্গারই কণা অংশ, তাই আদিগঙ্গা।

যখনকার কথা আমি বলছি তখন আমাদের কলকাতা তথা কালীঘাট এবং আদিগঙ্গা অধ্যুষিত সমস্ত এলাকাটাই ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বেতবন, কেওড়াবন, শেওড়াবন, এবং নানা জাতীয় গাছ গাছড়ায় ভর্তি ছিল। ছিল প্রচণ্ড জলাভূমি। হিংস্র জন্তুজানোয়ার, সরীসৃপ প্রভৃতিতে ভর্তি ছিল এই অঞ্চল। মনুষ্য বসবাসের মোটেই যোগ্য ছিল না। গঙ্গার তীরে ছোট একটি কুটিরে ছিল মায়ের মন্দির। ২/৪ জন সাধু-সন্ন্যাসী ও আদিবাসী অবশ্য মাঝেমধ্যে থাকতো। জঙ্গলের মধ্যে সরু একটা পায়ে চলা রাস্তা ছিল। যার নাম পরে হয় রসা রোড্ এবং এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং দেশপ্রাণ শাসমল রোড। ওই পথে লোকে দলবদ্ধ হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলাচল করতেন। মাঝেমধ্যে ২/১টা নরবলি দিয়েও মায়ের পূজা হত। সে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ ছিল, যা বর্তমানে কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। আমাদের কালীঘাট আগে উপনগরে পরিণত হয়েছিল এবং পরে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মিউনিসিপাল আইন অনুসারে কলকাতার অন্তর্গত হয়।

মেজর উইলিয়ম টালি এই আদিগঙ্গা সংস্কারের পরে এর তীরে গড়ে ওঠে অসংখ্য ঘাট। যেমন (১) বলরাম বসুর ঘাট, (২) মুখার্জির ঘাট, (৩) বামরিক ঘাট, (৪) হিন্দু মিশন ঘাট, (৫) কালীঘাট বাজার ঘাট, (৬) মায়ের মন্দিরের ঘাট, (৭) সোনার কার্তিকের ঘাট (অবশ্য সোনার কার্তিক এখন আর নেই), (৮) নেপাল ভট্টাচার্যর ঘাট, (৯) ঘটক ঘাট, (১০) প্রসন্নময়ী ঘাট, (১১) কেওড়াতলা শ্মশানঘাট। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জেনে রাখা ভাল যে আগে এই গঙ্গার তীরে কোনওই শ্মশানঘাট ছিল না। যার যেখানে খুশি সেইখানেই গঙ্গার ধারে শবদাহ করা হত। এমন কি বহু সতীদাহও হয়েছে এই গঙ্গার তীরে। রোদে পুড়ে এবং বৃষ্টিতে ভিজে যে লোকের কি কষ্ট হত, সেটাই উপলব্ধি করে এক মহিয়সী মহিলা যাঁর নাম বিশ্বময়ী দেবী, প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মা, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই নিজস্ব জমিতে গড়ে ছিলেন এই কেওড়াতলা মহাশ্মশানঘাট। কলকাতা কর্পোরেশন কিন্তু এটা করে দেয়নি। পরে কলকাতা হাইকোর্টের Bench clerk শশিভূষণ বসু মহাশয় এখানে একটা বড় বিশ্রামাগার করে দেন। যেহেতু আগে মেয়েরা শ্মশানে আসতেন না—তাই এখানে তাঁদের জন্য কোনওই শৌচাগার নেই। (১২) এর পরে মহীশূরের রাজার ঘাট, (১৩) ক্ষীরোদ মিত্রের ঘাট, (১৪) রাসবাড়ির ঘাট, (১৫) তর্পণ ঘাট, (১৬) করুণাময়ী শ্মশানঘাট, (১৭) কুঁদঘাট (১৮) রথতলা ঘাট ইত্যাদি অনেক ঘাট হয়। এখন অবশ্য ঘাটের সংখ্যা অসংখ্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আদিগঙ্গার মজা স্রোত বরাবর এমনই প্রচুর ঘাট লক্ষ করা যায়।

প্রসিত রায়চৌধুরী নামক একজনের লেখা "আদিগঙ্গার তীরে" নামক বইতে অনেক তথ্যই আছে। তা ছাড়া অজিত মুখোপাধ্যায় নামক একজনের লেখা "অমৃত মন্থন" নামক বইতেও এই আদিগঙ্গার উল্লেখ আছে।

এই আদিগঙ্গার তীরে আগে দুটো খেয়াঘাট ছিল। একটা মায়ের সদর ঘাটে এবং অপরটি কুঁদঘাটে টালিগঞ্জে। আগে বলা হত রসা। খেয়া ঘাটের ভাড়াছিল প্রথমে ১ পাই পরে ½ আধা পয়সা, পরে ১ পয়সা, এর পরে ২ পয়সা তারপরে ৫ পয়সা এবং বর্তমানে ১০ পয়সা। এখন আর সাধারণত খেয়াপার করতে হয় না। দুটো নৌকো আড়াআড়ি করে পাতা আছে। সোজা হেঁটে লোকে চলে যান।

১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের পরে এই আদিগঙ্গার প্রকৃতপক্ষে কোনওই সংস্কার হয়নি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের পর্যন্ত এই পথে নৌবাণিজ্য চালু ছিল। এর জলও বেশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এখানে এসে পড়ায় যে যেখানে পারে জমি দখল করে ঘরবাড়ি বানিয়ে নিতে লাগল। তখন থেকেই কিছু উদ্বাস্তু এবং সুযোগসন্ধানী কিছু লোকেরা ইচ্ছামতন যে যেখানে পারে

এর তীর দখল করে গড়ে তুলল নিজেদের আস্তানা। তাদেরই মলমূত্র এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থে ভরে গেল এই গঙ্গার তলদেশ। এ ছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনও তাদের অসংখ্য নর্দমা এর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। চিড়িয়াখানা, সেন্ট্রাল এবং প্রেসিডেন্সি জেল ও তাদের নর্দমাগুলো এই আদিগঙ্গাতেই যুক্ত করে দেওয়ায় এর জল হয়ে উঠেছে ভীষণভাবে কলুষিত। মশা, মাছি, সাপ, ব্যাঙ, আরো কত কিছুরই সূতিকাগার হয়ে উঠেছে এই আদিগঙ্গা। ফলে শহরে বেড়ে গিয়েছে ম্যালেরিয়া, কলেরা, আন্ত্রিক, জন্ডিজ ও টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ। অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারো কোনওই দৃষ্টি নেই।

একজন পরিবেশবিদ হিসাবে আদিগঙ্গার দূষণের জন্য জনগণের কি কি দুর্ভোগ হচ্ছে এবং এর সুষ্ঠু সংস্কার হলে কি সুবিধা হবে সেই সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে আমি এই প্রতিবেদন শেষ করব।

দূষণের দুর্ভোগ

১। দেশ বিভাগের ফলে বহু লোক এদেশে আসেন এবং জায়গা না পেয়ে এই গঙ্গার পাড় দখল করে নিজেদের সুবিধা মতন বাড়িঘর তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করলেন।

২। সেই সুযোগে কিছু স্থানীয় সুবিধাবাদী লোক তাঁরাও কিছু বাড়িঘর তৈরি করে ভাড়া খাটাতে লাগলেন। এঁদের মল, মূত্র এবং বর্জ্য পদার্থ সমস্তই এই গঙ্গাতেই ফেলা হতে লাগল।

৩। গঙ্গার পাড়ের কিছু কিছু বাড়ির মালিকেরা, এই সুযোগে নিজেদের জমির সীমানা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিয়ে পাড়টা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে নিলেন। ফলে গঙ্গা সংকুচিত হয়ে গেল। গঙ্গার স্রোত কমতে থাকল।

৪। কিছু গোয়ালা এই সুযোগে গরুমোষ এনে এই পাড়ে খাটাল বানিয়ে ফেললেন। পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট অনুযায়ী হেস্টিংস থেকে গড়িয়া রেলব্রিজ পর্যন্ত এই সমস্ত খাটালের সংখ্যা ৭২। মোট বাড়িঘরে সংখ্যা ৭৮৫১। এদের সমস্ত নোংরা এই গঙ্গাতে ফেলা হতে থাকায় গঙ্গাগর্ভ বুজে গেল। মাঝে মাঝে খানাখন্দ হয়ে মশা, মাছি, সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, বিছা, বড় বড় ইঁদুরের আখড়া হয়ে উঠল এবং গঙ্গার পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়ে পড়ল।

৫। বর্ষার সময় বানের জলে দুকূল প্লাবিত হয়ে মানুষের ঘরে প্রবেশ করতে লাগল, ফলে লোকের দুর্ভোগের সীমা রইল না।

৬। চিড়িয়াখানা, সেন্[illegible] ও প্রে[illegible]শি জেল, আশেপাশের গজিয়ে ওঠা কল-কার[illegible] নর্দ[illegible] এই গঙ্গায় জুড়ে দেওয়া হল। এমন কি ক[illegible] তাদের অসংখ্য নর্দমা এতে জুড়েছিলেন।

৭। ফলে এর জ[illegible] হয়ে পড়ল যে জলের রঙ আলকাতরার [illegible] গেল। জলের দূষণ পরীক্ষায় দেখা গেল যে [illegible]টার জলে গ্রিজের পরিমাণ শতকরা ২০% পর্যন্ত চলে, সেখানে এই জলে ৮৫% থেকে গ্রীষ্মকালে ১৩৫% পৌঁছে যায়, যেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণভাবে মারাত্মক।

৮। ফলে এর দু-পারের লোকেদের ম্যালেরিয়া, কলেরা, আন্ত্রিক না ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, জন্ডিস্, টাইফয়েড এমন কি নানাবিধ চর্মরোগও হতে লাগল। অসংখ্য লোক এই সমস্ত রোগে মারা গিয়েছেন এবং শহরে এই সমস্ত রোগের মহামারী দেখা দিয়েছে।

৯। অসংখ্য তীর্থযাত্রী কালিঘাটে রোজই আসেন এবং এই জলে স্নান করে এই সমস্ত রোগজীবাণু নানা দেশে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন।

১০। এই নদীপথে আগে নৌ-বাণিজ্য চলতো, কিন্তু এখন তা বন্ধ। ফলে যেখানে নৌ পরিবহনে এক টাকা খরচা, সেখানে রেল পরিবহনে তার ১০ গুণ বেশি লাগছে আর সড়ক পরিবহনে ৮০ থেকে ৯০ গুণ বেশি খরচা পড়ছে। ফলে জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে এবং আমাদের বিদেশ থেকে ঋণ করে তেল কিনতে হচ্ছে। অথচ কারো এদিকে দৃষ্টি নেই।

সংস্কার হলে কি কি সুবিধা হবে

১। হাইকোর্টের নির্দেশে সমস্ত নর্দমা হটানোর কাজ যদি সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তা হলে এই নদীর জলের দূষণ বন্ধ হবে।

২। সমস্ত জবরদখল যদি তুলে দেওয়া যায় তাহলে স্থায়িভাবে এর দূষণবন্ধ হবে। লোকে এই জলে স্নান করতে পারবেন এবং এ অঞ্চলের জলকষ্ট অনেকটা লাঘব হবে।

৩। যদি চওড়া এবং গভীর করে এই নদীটি কাটা হয়, তা'হলে নৌ-বাণিজ্য চলতে পারবে। সুলভে পণ্য পরিবহন করা যাবে।

৪। যদি মোটর লঞ্চ সার্ভিস চালু করা যায়, তাহলে শহরের পরিবহনের অনেকটা সুরাহা হবে।

৫। জলের স্রোত যদি বাড়ানো যায় তাহলে আর বানের সময় দুকূল প্লাবিত হয়ে লোকের ঘরে প্রবেশ করবে না এবং লোকের আর সাপ, ব্যাঙ এবং কাঁকড়াবিছার ভয় থাকবে না।

৬। জল যদি বারো মাস থাকে এবং নদী যদি খরস্রোতা হয় তাহলে আর মশা, মাছির সৃষ্টি হবে না এবং তা হলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, আন্ত্রিক, জন্ডিস, টাইফয়েড্ ইত্যাদিরও আর ভয় থাকবে না। অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

৭। মৎস্য চাষেরও উন্নতি হতে পারবে।

৮। পর্যটনও বাড়বে এবং সরকারেরও কিছু উপার্জন হবে।

৯। কিছু বেকার যুবকের অন্নের সংস্থান হতে পারবে।

লেখক পরিচিতি : অবসরপ্রা[illegible]ষ্ট্রীয় [illegible]র কর্মচারী ও পরিবেশবিদ, আদিগঙ্গার ওপর দীর্ঘদিনের গবেষণাকারীও। আদিগঙ্গা সংস্কার বিষয়ে উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব।

মনোরঞ্জন রায়

চব্বিশ পরগনা জেলা ঃ হাতিয়ারের কথা

(আদিমকাল থেকে বিংশ শতাব্দী)

কথাটা স্মরণে আনা দরকার। এই শতকের প্রথমার্ধে দুটি বিশ্ব- যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় পরদেশ দখলকারী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। সংগ্রামরত পরাধীন দেশগুলি স্বাধীন হয়। বিশ শতকের শেষার্ধে দেখা গেল—সাম্রাজ্য খোয়ানো দুর্বল রাষ্ট্রগুলির প্রধান হয়ে আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার জন্য মারণাস্ত্র চালিয়েছে। জাপানের শহর দুটিতে অ্যাটম বোমার ধ্বংসসাধন ছাড়া এর আগে কোনও যুদ্ধে এমন ধ্বংসসাধনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি।

যুদ্ধাস্ত্রর বর্তমান অবস্থার আগে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে আসার শুরুতে ফিরে যাব। তার আগে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ ও আধুনিককালের সন্ধিক্ষণে মহান সিপাহিগণ যে দুবার বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছিলেন তার সলতে পাকানোর কাজটা এই জেলাতেই সংগঠিত হয়েছিল।

প্রথমটি ১৮২৪ সালে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছে। ৪৭ নং বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রিকে বিদেশ যাবার আদেশ হয়েছে। কেননা ইংরেজরা বার্মা দখল করতে যুদ্ধ জয়ে যাবে। সমুদ্রযাত্রায় বাঙালি সিপাহিরা তালিকাভুক্ত ছিল না। সুতরাং স্থলপথে মার্চ শুরু হবে। পূর্ব প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষারত। এমন সময় চট্টগ্রামের সীমান্ত ঘাঁটিতে ইংরেজ সেনাদের এক বিপর্যয় ঘটে গেল। ওই খবর সকল বাহিনীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দুর্গম রাস্তা। অতিক্রম করার জন্য গরুর গাড়ি ও গরুর অভাব। গাড়ি এবং গাড়োয়ান ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধের সরঞ্জাম বইতে কটা গাড়ি জুটেছিল। তাদের অত্যধিক দাবি মেনে নিলেও রুগ্ন গরুগুলি দ্বারা ভার বহন সম্ভব ছিল না। বাহিনীর পদযাত্রা বন্ধ হয়ে আছে। জাহাজে রেঙ্গুন যাবে স্থির হল। কিন্তু বেঙ্গল রেজিমেন্ট শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করল,—তারা সমুদ্রপারে যাবে না। নিয়োগকালের শর্ত অনুসারে তারা স্থলপথে যুদ্ধযাত্রার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

৩০ অক্টোবর। প্যারেড চলার সময় গোটা বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঘোষণা করল দু'গুণ ভাতা অগ্রিম নিয়েও তারা সমুদ্রযাত্রা শুরু করবে না।

১ নভেম্বর আবার প্যারেড অনুষ্ঠান, তখন সিপাহিদের আচরণ আরও প্রতিবাদী। কমান্ডার-ইন-চিফ্ স্যার এডওয়ার্ড প্যাগেট এই দৃশপটে হাজির। সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই রেজিমেন্ট য়্যুরোপীয় সেনা। আর কে ব্যাটারি বৃটিশ আর্টিলারি এবং গভর্নর জেনারেলের দেহরক্ষীদের এক বাহিনী। পরদিন সকালে—বিদ্রোহী বাহিনীকে নিয়ে এসে ইউরোপীয়ান বাহিনীর সামনা-সামনি দাঁড় করাল। কিন্তু তখনও বিদ্রোহী বাঙালি রেজিমেন্ট তাদের প্রতিজ্ঞায় অটল। সুতরাং অস্ত্র জমা দিতে বলা হল। বিদ্রোহীরা বিপদ বুঝতে পারেনি। কামান গোলাভরা অবস্থায় আছে। ছোড়ার জন্য সাহেব কামানদাগিয়েরা প্রস্তুত হয়ে আছে এবং তাক আছে বিদ্রোহীদের দিকে। একথা বলে বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সাবধান করা হয়নি। কোনও প্রতিরোধ না করে বিদ্রোহীরা হাতের অস্ত্র পাশের হুগলি নদীতে ছুঁড়ে দিল। সাহেব সৈন্যরা বিদ্রোহীদের গোলা দেগে মারল। কয়েকজন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবল। যারা ভাসল, গুলি করে মারা হল। বাকি বেঁচে যাওয়া বিদ্রোহীদের ওই খানেই ফাঁসি দেওয়া হল। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৪৭ নং'কে আর্মি লিস্ট থেকে কেটে উড়িয়ে দেওয়া হল এবং সেই থেকে বেঙ্গল বাহিনী উঠে গেল। কেরি'স হিস্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার, ভল্যুম-১, পৃঃ ২২৬—২৬৯। স্বাধীনোত্তরকালে কথা উঠে ছিল, কিন্তু জহরলালজি বাঙালিদের স্বতন্ত্র বাহিনী গঠনে আমল দেননি।

৫৫/৬০ বছর আগের ঘটনা, সদ্য হাসিল জমিতে হরিণ শুয়োর আমন ধানের চারা নষ্ট করতো রাত্রে। পূর্ণিমাতে কৃষকেরা তীর এবং বর্শা দিয়ে মারতো। গোলপাতার ছাউনির তলা থেকে কৃষককে ঘুমন্ত অবস্থায় কুমীর তুলে নিয়ে পাশের গাঙে যাবার সময় হইচই পড়ে যেত যুবকদের মধ্যে। মরা কোটালের দিন হলে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে একটা কুমির না মারা পর্যন্ত শান্ত হত না। আবার দেখা যেত মোহনার ভাসমান জাহাজ থেকে ডাকের থলি নিয়ে বল্লম দুলিয়ে আওয়াজ শুনিয়ে সুন্দরবনের পিচ্ছিল পথে মাঝে মাঝে খেয়া পেরিয়ে রানারের দৌড়। সঙ্গে ধনুর্ধর এবং ডুগডুগি বাজিয়ে।

ডায়মন্ডহারবার পুরনো কেল্লায় পরিত্যক্ত কামান

দ্বিতীয়টি ছিল, ১৮৫৭ সালে মহান সিপাহি বিদ্রোহ। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছিল। এই বিদ্রোহের সলতে দমদমে পাকানো হয়েছিল আর বিস্ফোরণ শুরু বারাকপুরে। বিস্তরিত পাওয়া যাবে,—'ফরেস্ট হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিয়ান মিউটিনি'। কেয়িস হিস্ট্রি অব দি সিপাহি মিউটিনি'। এবং 'দি রেড প্যাম্ফলেট'। এই শেষের বইটি ১৮৫৭ 'দি মিউটিনি অব দি বেঙ্গল আর্মি' বাই ওয়ান হু হ্যাজ সার্ভড্ আণ্ডার চার্লস নেপিয়ার' টাইটেলে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে ওই সময়ের বারাকপুরের ঘটনাগুলির চিত্র স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন।

রাইফেলে ব্যবহৃত তৈলাক্ত কাগজের মোড়কে রাখা কার্তুজগুলি ফোর্ট উইলিয়ামের শস্ত্রাস্ত্র ভাণ্ডারে তৈরি হত। এই নতুন হাতিয়ার ব্যবহার করার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার শুরু দমদমের সৈনিক কেন্দ্রে। তৈলাক্ত জিনিষটি শুয়োর, গরু অথবা উভয়ের চর্বিযুক্ত। সিপাহি বিদ্রোহগুলি আধুনিক যুগের শুরুর কথা। বিগতকালে ফেরা যাক্।

এই জেলাতেও আদিমকাল থেকে সকল প্রাণীদের মতোই মানুষ খাদ্য, বিপদাশঙ্কায় রক্ষা, দখল, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, রেষারেষি, ঝগড়া, লড়াই, সংঘর্ষ, যুদ্ধের সহজাত ঐতিহ্য বহন করে এসেছে।

পুরাবস্তু দ্বারা জ্ঞাত প্রমাণ যে, আদিতে প্যালিওলিথিক প্রস্তর যুগে অমসৃণ পাথরের হাতিয়ার ছিল কাজ করার উপকরণ। ছিল কাঠও হাড় খণ্ডের তৈরি যা নষ্ট [illegible]য়েছে। পা[illegible]য়া গেল ডায়মন্ডহারবার সংলগ্ন দেউলপোতায়। এ যুগ [illegible] বছর। এই অস্ত্র উপকরণ, অন্যান্য কাজের খর[illegible] এগিয়ে দিয়েছিল মসৃণ কাটা পাথরের নিওলিথিক [illegible] এই [illegible] যুগের মাঝামাঝি মেসোলিথিক যুগের অপেক্ষাকৃত ছো[illegible] যন্ত্রাদির প্রচুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা [illegible]ক যুগ কয়েক হাজার বছর। দু'হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে [illegible]ক যুগের জের মেগালিথিস আত্রেঞ্জিখেরা, ইউ, [illegible]ক পুরাবস্তুগুলি অজয় নদের উপরে পাণ্ডুরাজার [illegible]র একটানা সম্পর্কের অভাব।

যেহেতু এই [illegible] পলিজ ভূমিপৃষ্ঠের ব-দ্বীপ এবং দক্ষিণপূর্ব সমুদ্র সং[illegible] [illegible]ভাঙা-গড়া ও নিমজ্জন ঘটেছে অসংখ্যবার। ভূকম্পনজনিত রোলিং ও ঝাঁকানিতে ফুলে উঠে সমুদ্রের কোলে ঢলে পড়েছে। নদীগুলি তাদের নিজ প্রক্রিয়ায় পলি দ্বারা স্রোত প্রণালীগুলিকে বন্ধ করে জেলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কতবার স্রোত পরিবর্তন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলছে।

আমরা জানি তলোয়ার, গদা, লাঠি যোদ্ধার পক্ষে বা বিপক্ষে, জয় বা পরাজয়, একটা পর্যায়ে আর চলল না। নিজের দেহ রক্ষা বা বিনাশ করার জন্য দূরত্ব বজায় রাখতে শস্ত্র এল। তীরধনুকের উন্নতিতে মানুষকে মনোযোগ দিতে হল। আবার এমন আয়ুধ যা উভয়বিধ কাজ। যেমন একই আয়ুধ বর্শা বা বল্লম। এটা অস্ত্র এবং শস্ত্র। শক্ত হাতে শত্রুর কাছে দাঁড়িয়ে লড়াই করা এবং দূর থেকে ছুঁড়ে শত্রুকে মারা যায়। আবার ছুঁড়ে মারার চক্র যন্ত্র। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেই ঘোড়া দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে গিয়েছিল, এটি মূল্যবান হাতিয়ার সওয়ার হওয়ার জন্য। হাতির মূল্য আরো বেশি। রাজকীয় এবং সেনাদলে ব্যবহার হত, সাধারণ মানুষের সাধারণ বাণিজ্যবস্তু ছিল না। মগধের বিম্বিসারের বিচিত্র উপাধি ছিল সেনীয়া, 'সেনা দল সহ'। তিনি এক ধাপ উঠে কমাণ্ডার-ইন-চিফ (সেনাপতি) পদ প্রথম সৃষ্টি করেন। মহাভারতে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ, চক্রযন্ত্র চালানো এবং রথচালকের মতো সাধারণ কাজ, এই কৃষ্ণকল্পিত বৃত্তান্তগুলি আমরা গলাধঃকরণ করেছি। ট্রাইবাল জনপদের মাল্লাস টাইবরা মল্ল অর্থাৎ কুস্তিবাজ বা কসরতে নিপুণ। আলেকজান্ডারের আক্রমণকারী সেনা দলের ব্রোঞ্জ নির্মিত বর্ম। তাদের সূক্ষ্মমুখ লৌহফলকযুক্ত ২১ ফুট দীর্ঘ দণ্ড বর্শা হাতে অশ্বারোহীদের সামনে তখনও যুদ্ধে রথ ব্যবহারকারী, ধাতুর স্বল্পতার জন্য ঢাল, চামড়ার বক্ষাবরণ, কদাচিত ধাতুর হেলমেটধারী ভারতীয়রা অসহায়। যদি দ্রুত চালনা যায় তাহলে ভারতীয় যুদ্ধহস্তী যে কোনও পদাতিক সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করতে পারে। একটা হাতি আতঙ্কে পক্ষের লোকদেরও পায়ে দলবে যেমন করে সে শত্রুকে পদপৃষ্ঠে থেঁতলে দেয়, এদের প্রশিক্ষণের দরকার ছিল আক্রমণোদ্যত হাতি যতক্ষণ না বৃত্তাকারে শত্রুদের নিকটবর্তি হচ্ছে ততক্ষণ তাদের পাগুলিকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত অশ্বারোহী সেনা এবং ধনুর্ধারী পদাতিক সেনাদের পর্দার ন্যায় আড়াল দ্বারা হাতিদের সুরক্ষিত রাখতে হবে যাতে হাতি আহত না হয়। ভারতীয়দের প্রাধান্য ছিল একমাত্র ধনুক। একটা ছ'ফুট লম্বা শস্ত্র যার থেকে ছোঁড়া একটা তীর অপ্রতিহত লক্ষ্যে ঢাল এবং বক্ষ বেষ্টনীতে সজ্জিত একজন লাফিয়ে চলা গ্রিক ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাকে নিহত করতে পারে। আলেকজান্ডারের সাংঘাতিক ক্ষত এই রকম একটি তীর থেকে হয়েছিল, যেটি অনেক নিকট থেকে ছুঁড়েছিল, বর্ম ভেদ করে বক্ষপঞ্জরের গভীরে বিঁধে গিয়েছিল, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রাণহানিকর বলে মনে হয়েছিল, পরে ফিরতি পথে জ্বরাক্রান্ত হয়ে মারা যান।

এই জেলায় বরাবর অসংখ্য দ্বীপের জঙ্গল। জলে কুমির ও দস্যু, ডাঙায় পশুকুলের রাজত্ব। পাষাণ মুগুর, পাষাণ কুড়াল, গদা, ধনুক, রণহস্তী, বর্শা, তলোয়ার, কামান আর দুর্গের ব্যবহার হয়েছে এখানের মাটিতে।

কৃষকবিদ্রোহীরা নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা করে আঠার শতকে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে। জমির লড়াইয়ে তেভাগা বিদ্রোহ ছিল সশস্ত্র সংঘর্ষ। জগদ্দল, তাড়দহ, ধুমঘাট, ময়দা সাগর
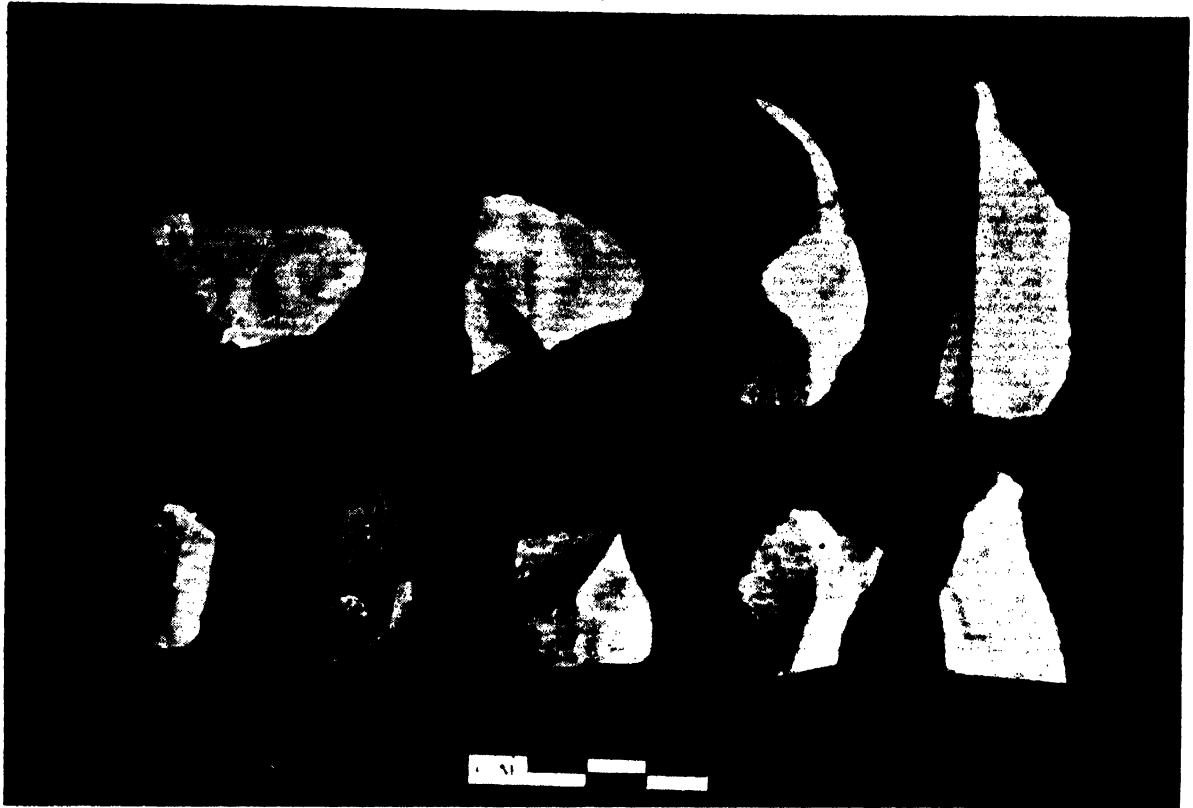
দেউলপোতা থেকে আবিষ্কৃত মধ্যাশ্মীয় আয়ুধ, রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালার সৌজন্যে

দ্বীপের দুর্গ ছিল প্রতাপাদিত্যের। বজবজে মুঘল ফোর্ট। ক্লাইভের সাথে যুদ্ধে মনিকচাঁদ হেরে যায় এখানে। পর্তুগিজদের আর্মাডা ঘাঁটি ডায়মন্ডহারবার ক্রিক এবং মুড়িগঙ্গায় ছিল। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতায় এবং ডায়মন্ডহারবারে 'চিংড়িখাল ফোর্ট', ফলতা এবং বরানগরে ডাচ দুর্গ।

হাতির পিঠে চড়ে মানিকচাঁদ বজবজের লড়াইয়ে হারের পর ইংরেজরা ১৭৭৩ সালে মুঘল কামানগুলি তুলে নিয়ে যেমন ফোর্ট উইলিয়ামে রেখেছে, তেমনই ১৯৮৬ সালে স্বাধীন ভারতের সেনারা ডায়মন্ডহারবারের ব্রিটিশ কামানগুলি তুলে নিয়ে কলকাতার ফোর্টে রেখেছে।

জার্মান কোম্পানির দুর্গটি ছিল বারাকপুরে নদীর ধারে গ্রাম বাঁকীপুরে। সেখানে মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে উল্লেখ করার মতো যুদ্ধ হয়েছিল। এইতো বছর চারেক আগে এই কোম্পানির ৩০টি কামানসজ্জিত নিমগ্ন জাহাজের একটিকে ডায়মন্ডহারবারের নদীতলে পাওয়া গেল। কুলপীর নদীবক্ষে ইংরেজ ও ডাচদের জাহাজের উপরে থেকে পরস্পরে কামানের লড়াই। ডাচেরা ইংরেজদের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং ইছাপুরের ডাচ নিয়ন্ত্রিত গান পাওডার কারখানাটি ইংরেজরা দখল নেয়।

৫৫/৬০ বছর আগের ঘটনা, সদ্য হাসিল জমিতে হরিণ শুয়োর আমন ধানের চারা নষ্ট করতো রাত্রে। পূর্ণিমাতে কৃষকেরা তীর এবং বর্শা দিয়ে মারতো। গোলপাতার ছাউনির তলা থেকে কৃষককে ঘুমন্ত অবস্থায় কুমীর তুলে নিয়ে পাশের গাঙে যাবার সময় হইচই পড়ে যেত যুবকদের মধ্যে। মরা কোটালের দিন হলে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে একটা কুমির না মারা পর্যন্ত শান্ত হত না। আবার দেখা যেত মোহনার ভাসমান জাহাজ থেকে ডাকের থলি নিয়ে বল্লম দুলিয়ে আওয়াজ শুনিয়ে সুন্দরবনের পিছিল পথে মাঝে মাঝে খেয়া পেরিয়ে রানারের দৌড়। সঙ্গে ধনুর্ধর এবং ডুগডুগি বাজিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে ভারতে প্রথম ১৮৫১ সালে ডায়মন্ডহারবারে প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ দফতরে পৌঁছে দিত। তাদের লাগাতার দৌড় ছিল ৮ মাইল অন্তর। হাত বদলে থলি আসতো ডায়মন্ডহারবার। আবার একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখা যাক।

প্রাচীন যুগে তীরে ফলা তৈরির শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। পুরু সেনার তীরের আঘাতে আলেকজান্ডারের ক্ষতজনিত মৃত্যু ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ১৩ জুন তারিখে। তাঁর বয়স তখন ৩৫ বছর হয়নি।

লোহা এবং ইস্পাতের উন্নতির সঙ্গে ধারালো তলোয়ার, বল্লমের অগ্রভাগ, তীরের ফলা তৈরির উন্নতমান আরম্ভ করেছিল এদেশীয় মানুষ। ভারত বারে বারে শত্রুদের দ্বারা সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই পরাজিত হয়েছে। পরিহাসের কথা যে, শত্রুদের হাতিয়ারগুলির কাঁচামালের জন্য তারা ভারতের উপরেই নির্ভরশীল ছিল।

ইউরোপীয়রা ক্ষমতাবান হয়ে প্রত্যেকটি ভারতীয় যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের পরাজিত করে। তখনও তারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল ভারতে উৎপাদিত নিটার বা সোরা (নিটার বা সল্ট পেল্ট পিটার) বা পটাশিয়াম নাইট্রেট বা পটাশের আধারীভূত দ্রব্য সরবরাহের উপর। বা সোরার মধ্যে সারের খোল। বহির্ভারতে ভারতের স্টিল 'য়ুটস্' নামে প্রচলিত। পরে ওই একই স্টিলের তলোয়ার টলেডোতে

উৎপাদন হত। ভারতীয়দের তলোয়ার ছিল অঙ্গ, মাথা এবং দেহের বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলার জন্য নানা ডিগ্রির কোনযুক্ত বেশি সুবিধা জনক। টিপ যুক্ত তরবারি শত্রুদেহ এফোঁড়ওফোঁড় করা, কেবল সোজাসুজি বিঁধত। গঠনের আকারে তলোয়ারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে কোনও বিরাট পরিবর্তন আনতে পারেনি। উত্তরপুরুষেরা পিতাপ্রপিতামহদের হাতিয়ার ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল না।

ভারতে আগ্নেয়াস্ত্রের শুরু ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক। তাঁর কামানকে 'ফিরিঙ্গী কামান' বলতো। বাবরের জীবন চরিত 'বাবরনামা' গ্রন্থে স্থানীয় পাঠান শাসকগণের আগ্নেয়াস্ত্রের কথা লিখে রেখেছেন। পূর্বসূরি ফিরিঙ্গি ভাস্কো-দ্য-গামার কিছুকাল পরেই পর্তুগিজ আর্মাডাগুলি এই জেলার উপকূল খাঁড়িগুলিতে কামান ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ১৮ শতক অবধি। ইউরোপে আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতির মূলে—নৌ-যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের দূরত্ব জয়কারী হাতিয়ারের আবশ্যক ছিল। মুঘল আমলে বাবর প্রথম ভারতবর্ষে গান ফাউন্ডি ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেন। সুপারিনটেনডেন্ট কুলি খান এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আকবর নিজে তাঁর আগ্রার ফ্যাক্টরিতে কামান তৈরি পর্যবেক্ষণ করতেন। ভারতের আগ্নেয়াস্ত্র আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার হত বেশি। আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কেল্লার প্রাচীরের উপর বসানো থাকত। গোয়ালিয়র ফোর্টের উপর আজও দেখা যাবে কাশীপুর গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির তৈরি সারিবদ্ধ কামান বসানো আছে। বড় কামানগুলি ব্যবহার করা সর্বদা সম্ভব নয়। ডায়মন্ডহারবার ফোর্টে বিশালাকার কামানগুলি আক্রমণের আশাঙ্কায় বসানো থাকত নদীর দিকে মুখ করে। আর বৎসরে একবার ১৫ উর্ধ্ব বয়সের সেনা স্কুলের ইংরেজ ছাত্ররা বারাসত থেকে ডায়মন্ডহারবারে এসে কামান দাগা প্রাক্টিস করত। কারণ এখানকার নদী ৮০০০ ফুট প্রশস্ত। নদীর উভয় পারে জঙ্গল তখন। ঘাড়ের উপর যুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়লে কামান সামান্যই কাজে লাগে। যে জন্য বোফর্স কেনা। হাল্কা, ছোট ও পরিবহনযোগ্য এবং বিভিন্ন কোনে ঘুরিয়ে ৩০ মাইল দূরের লক্ষবস্তুর উপর আঘাত হানা যায়। অথচ খুবই শক্তিশালী, ওজন কম, অল্প

হাল্কা পরিবহনযোগ্য কামান

দৈর্ঘ্যের এবং দূরপাল্লার কামান তৈরিতে পশ্চিমী দেশগুলি অনেক উন্নত হয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র উৎপাদন করে বিক্রির জন্য।

আকবরের সময় থেকে ভারতে বন্দুকধারী সৈন্যদের যুদ্ধে প্রাধান্য বেড়েছে। সেখানে তখন উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের শাসকগণ কামান চালনার সঙ্গে পরিচিত ছিল। রাজপুত রাজারা ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল। এবং তারা আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনী গঠনের প্রতি বেশি মনোযোগী ছিল না।

১৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রিচার্ড বেল তাঁর বিবরণে মুঘলদের অস্ত্র কারখানার চুলা পরিদর্শনকালে দেখেছিলেন—এতে ২৫০ টন ধাতু গলাতে পারে এবং ৮টি কামান ও ৪টি মর্টার ঢালাই এক সময়ে হতে পারে। প্রাচীনকালে কাঁসা (Bronze) ঢালাই করে কামান তৈরি হত। ঢালাই লোহা এবং কাস্টিং লোহা (Cast iron ও Wrought iron) দিয়েও কামান তৈরির বহুল প্রচলন ছিল। কামানগুলির বহিরঙ্গ সুসজ্জিত এবং সমতাপূর্ণ সঞ্চালক শক্তি বজায় রেখে চক্রাকারে গঠন কৌশলপূর্ণ। কামান নির্মাণকারীর নাম কামানের নলের উপর হামেশাই লেখা থাকত।

১৭৫৭ সালে 'জমজমা' নামে কামান তৈরি করে লাহোরে বসানো হয়। এটি ছিল ১৪ ফুট ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা নলের ভিতটা ৯$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ফাঁপা এবং এটি ছিল তৎকালীন দুনিয়ার সর্বোত্তম কামান।

১৬১৮ সালে হজেসের রিপোর্টে তিনি লাহোরে ৫টি খুব বড় পিতলের তৈরি কামানের কথা লিখে গিয়েছেন। যার একেকটির ওজন ৩১ থেকে ৪৪ হন্দর, ৯$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি নলের ভিতরের গোলাই। এদের মধ্যে কয়েকটি ১৬১৮ সালে বা তারও আগে গোয়ায় তৈরি হয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যাক, পর্তুগিজ শাসক আলবুকার্ক ১৫১০ সালে ভারতের পশ্চিম উপকূলে আক্রমণ চালিয়ে গোয়া দখল করেন। তিনি উল্লেখ রেখে গেছেন—বিজয়নাগ্রাম রাজ্যে শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের কথা। বিজয়নগরের রাজা এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল (১৫০৯—৩৯)। রাজা কৃষ্ণদেব রায় তখন দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত শাসক। সিকান্দরের পুত্র ইব্রাহিম লোদি (১৫১৭—২৬) তখন দিল্লির সিংহাসনে। পর্তুগিজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে পর্তুগিজরা পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্যকুটি এবং ঘাঁটি তৈরির অনুমতি পেল শুল্ক লাভের বিনিময়ে। শুল্কের লোভ, সম্ভোগ, রাজায়-রাজায় বিদ্বেষ-হিংসায় মেতে থাকতেন। সমসাময়িক কালের রাশিয়ান ভ্রমণকারী আথানা শিয়ুষ নিকিতিন'র বৃত্তান্তে জানা যায় "এই দেশের ধন-সম্পদ কয়েকজন মাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সম্ভোগ এবং বিলাসবহুল জীবনে ব্যয়িত হত।" ভারতের সর্বত্রই এই অবস্থা। পর্তুগিজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফল হল যে, পর্তুগিজরা সুরাট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের সমস্ত বাণিজ্যবন্দর ও ঘাঁটি দখলে আনতে পেরেছিল। রাজা তাদের ঘাঁটি তৈরির অনুমতি দিয়েছিলেন। বিজয়নগর রাজার অবিবেচনা বাণিজ্য এবং রাজনীতিতে অনেক দুর্ভোগের কারণ হয়েছিল। ভারতীয় শাসকেরা ওই সময় লোভী ও বিদ্বেষে মেতে থাকতেন বলে বছর দশেক আগে গামা কর্তৃক কালিকটের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিতে পারেননি, যদি তা নিতেন দেশের ভবিষ্যৎ অন্যদিকে মোড় নিত। 'যাঁরা ইতিহাস জানেন না, ইতিহাসের ভুলগুলি তাঁরাই করেন'।

কথায় কথায় মোড় ঘুরে যায়। ফেরা যাক জেলার কথায়। ১৭৬৯ সালে ক্লাইভের নির্দেশে ক্যাপ্টেন ডু'গ্লস তৈরি করেন একটি
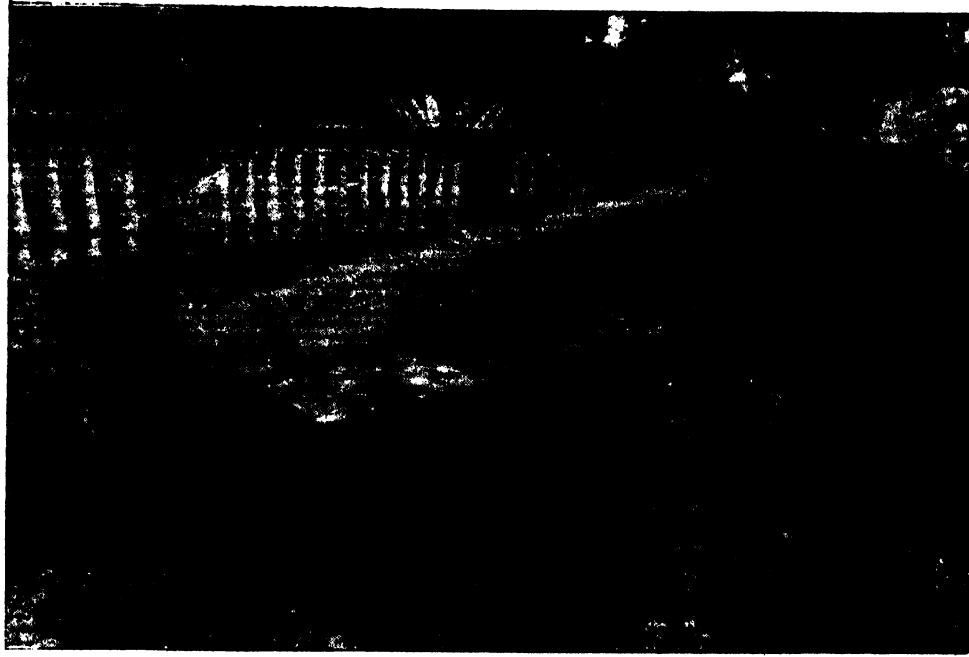
ফলতা থানায় রক্ষিত ফলতা দুর্গের পরিত্যক্ত কামান ছবি : সাগর চট্টোপাধ্যায়

গান ফাউন্ড্রি ফ্যাক্টরি। পর বছর ১৭৭০ সালে সেটি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে স্থানান্তরিত হয়। আবার ফোর্ট উইলিয়ামের ব্রাস গান ফাউন্ড্রি ১৮৩৪ সালে গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরি নামে এই জেলার কাশীপুরে (কলিকাতা-২) উঠে আসে।

১৮৪০ এবং ১৮৫০ সালের মধ্যে কাশীপুর তৈরি করল :—

আয়রন গান'স	১২ পাওণ্ডার,	১৮ পাওন্ডার ও ৩২ পাওন্ডার	
ব্রাস গান'স	৩ ঐ ,	৬ ঐ	৯ ঐ
আয়রন হাউইট্জার ৮´´	৪ পাঃ	৮ ইঞ্চি ৫ পাঃ ১০ ইঞ্চি	
ব্রাস ঐ	১২ পাঃ মাটস্টেনগান	১২ পাওডার এবং ২৪ পাঃ	

আদিতে গুলি বা ছর্‌রার জায়গায় পাথর বন্দুক থেকে ছোঁড়া হত। আকবরের সময় থেকে আংশিকভাবে পাথরের স্থানে শিসের গুলি অথবা কাঁচা লোহার ছর্‌রা ব্যবহার হতে থাকে। এরই সঙ্গে সঙ্গে এল ১৮৪০-৫০ সালের আগুনের গোলা। এই জেলায় আগুনের গোলা প্রথম ইংরেজরা ব্যবহার করল ভারতের শাসকদের বিরুদ্ধে। এই আগুনে-গোলাতে স্টার'স অব 'ভালেন সিয়েনেনস' কম্পোজিসন দ্বারা ভরা হত। গোলা পাঠাতে পারবে এবং শীঘ্র দাহ্য হয়ে ফাটাবে ব্ল্যাক পাওডার। নিশ্চিত করে জানা নেই কার দ্বারা এবং কোথায় বা কখন গান-পাওডার বা ব্ল্যাক-পাওডার অবিষ্কার হয়েছিল। এটা যান্ত্রিক মিশ্রণের সল্ট পিটার বা সোরা (Potassiam Nitrate), গন্ধক এবং কাঠকয়লা চূর্ণ। ধরা হয় সম্ভবত ২০০০ বছর আগে এর উৎসদেশ চীন। তবে বিশ্বাস করার কারণ আছে মালবার গুপ্ত রাজারা পঞ্চম শতাব্দীতে জানতেন। যাঁরা বাজি পুড়িয়ে আনন্দ পাবার জন্য গান-পাওডার ব্যবহার করতেন। রকেট বা হাউইবাজি এর একটা অংশ ছিল। ভারতীয় সেনারা এই জাতীয় অস্ত্র ছুঁড়ে শত্রু দুর্গে আগুন জ্বালাত।

সবাই জানেন যে জোব চার্নক পাটনায় বসে সোরা বা সল্ট পিটার সংগ্রহ করে জাহাজে ইংল্যান্ড পাঠাতেন। এটা স্বীকার করতে হবে যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতে তৈরি গান পাওডার ইউরোপীয় পাওডার অপেক্ষা নিম্ন মানের। কারণ এদেশে রসায়নবিদ্যার উপর কম দখল। আলফ্রেড নোবেল কর্তৃক ধোঁয়াহীন পাওডার আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত সব দেশেই ব্ল্যাক পাওডার দিয়ে গান পরীক্ষা চলতো। ইতলিয়ান রাসায়নিক এসকেনিও সবরেরো ১৮৪৬ সালে নাইট্রোগ্লিসারিন আবিষ্কার করেন। আলফ্রেড নোবেল নাইট্রো-গ্লিসারিনের উপর গবেষণা করে বিভিন্ন টাইপের ডিনামাইট এবং ১৮৭৫ সালে জিলাটিনাস নাইট্রো-গ্লিসারিন প্রচলন করেন। একটি নাইট্রো-সেলিলোজ এবং নাইট্রো গ্লিসারিনের মিশ্রণ, যাকে বলা হয় 'ব্লাস্টিং জিলেটিন'। তাঁর আরও একটি আবিষ্কার হল চক্রাকারে অগ্নিনিক্ষেপক, যাকে বলে ব্যালেস্টাইন, ১৮৮৭ সালে। ভারতবর্ষে ১৯০০ সাল থেকে এই জিনিস তৈরি হচ্ছে, বলে 'করডাইট'। ১৯০৪ সাল থেকে রাইফেল এবং গান অ্যামুনিশনের জন্য। এটি হচ্ছে প্রেরণাকারী, এর প্রয়োজন আধুনিক কার্তুজ, গুলি এবং যুদ্ধের আগ্নেয়াস্ত্রে লাগানোর জন্য। করডাইট প্রচলন হয়ে গান পাওডার মহত্ত্ব হারাল। ক্রমে করডাইটের বিকল্প বেরুল।

এই জেলায় ইংরেজরা ৫টি যুদ্ধ সরঞ্জামের কারখানা নির্মাণ করেছিল। যার ৪ টিতে অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি হয়ে গোলাবারুদ সহ সৈন্যদের জন্য সরবরাহ হত।

গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরিতে কামান, অর্ডন্যান্স, ফিটিংস, সেল, ফিউজ, কার্টিজ মেটাল ইত্যাদি। ১৯১১ সালে এইখানে কাজ করতো ১২৭১ জন শ্রমিক। পরবর্তীকালে কর্মিসংখ্যা ৮০০০ হাজারের বেশি বৃদ্ধি পায়।

দমদম অ্যামুনিশেন ফ্যাক্টরি চালু হয়েছিল ১৮৪৬ সালে। এখানে টোটা বা গুলি, ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র যেমন পিস্তল, মাস্কেট ইত্যাদি তৈরি হত। দমদম বুলেট কথাটি বহুকালব্যাপী মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে।

মহান সিপাহি বিদ্রোহের শুরু এখান থেকেই। দমদম একটি সফট্-নোজড্ বুলেট, যা বাড়ে এবং টুকরো-টুকরো হয়ে লক্ষ-বস্তুকে আঘাত করে, দমদমে তৈরি হত বলে 'দমদম বুলেট'। ১৯১১ সালে এই কাজে নিযুক্ত কর্মিসংখ্যার দৈনিক গড় ছিল ২,৬৪১ জন।

দি রাইফেল ফ্যাক্টরি ইছাপুর। গড়ে উঠেছিল ডাচদের তৈরি পুরানো গান পাওডার ফ্যাক্টরির জায়গায়। রাইফেল উৎপাদন শুরু হয় ১৯০৭ সাল থেকে। ২,০৫০ শ্রমিককে ১৯১১ সালে কাজ করতে দেখা যায়। এই ফ্যাক্টরির প্রবেশদ্বারের উপর মার্বেল পাথরের ফলকে সেই যুগের ডাচ সুপরিনটেনডেন্টদিগের নামগুলি এই লেখক দেখেছিল, হয়তো আজও তা আছে। অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন্ট ফারকুহার দিয়ে সেই ফ্যাক্টরির শুরু। সেই দিনের কয়েকটি ডাচ বিল্ডিং আজও আছে। রাইফেল উৎপাদনের খুঁটিনাটির নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যাবে ২৭সেপ্টেম্বর ১৯০৮ সালের কলকাতার 'স্টেটসম্যান' দৈনিকে "দি এনফিল্ড অব ইন্ডিয়া" শিরোনামে। রাইফেল বিষয়ে কৌতূহলগণ পড়ে দেখতে পারেন।

বন্দুক বা মাস্কেট ভারতীয়দের হাতে আসে আকবরের শাসনকালে, যদিও তার ব্যবহার জানা আছে অনেক আগে থেকে। ১৭৪২ সালে কোম্পানির ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল দাক্ষিণ্যাত্যের স্থানীয় বাজার থেকে ১২০টি মাস্কেট এবং ৫০০ তরবারি-ফলা কিনেছিল। এগুলি ভারতীয়দের দ্বারা দেশীয়ভাবে তৈরি। ১৭৫৭ সালে আধুনিক যন্ত্রকলা ব্যবহার করে ত্রিবাঙ্কুর মহারাজার উদয়গিরি ফ্যাক্টরীতে মাস্কেট এবং তলোয়ার তৈরি হত। বাংলার নবাব মীর কাশেমের মুঙ্গের কারখানায় উঁচু মানের ফ্লিন্টলক স্মল আর্মস উৎপাদন হত। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের ব্রিগেডকে সাজানোর জন্য গ্রেট ব্রিটেন থেকে ১০,০০০ হাজার ফ্লিন্টলক স্মল আর্মস (বন্দুক) এখানে আমদানি করেছিল। ১৭৬৮ সালে ইংরেজরা জানতে পেরেছিল যে, অযোধ্যার সুজা-উদ্-দৌল্লা ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রের উৎপাদনে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। হায়দরাবাদ এবং মহীশূরে শ্রীরঙ্গপটনমের ফ্যাক্টরিগুলোতে ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি, সম্পূর্ণ করা, মেরামত করার কাজে ব্যস্ত আছে। তখনো পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশে কোনও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির ফ্যাক্টরি গড়ায় মন দেয়নি। ১৯০৫ সালে ইংরেজরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পুরনো গান পাওডার ফ্যাক্টরিকে বদলাতে হবে। সেইমত ইছাপুরের গান পাওডার ফ্যাক্টরি রাইফেল ফ্যাক্টরিতে পরিণত হল। ১৬০২ থেকে ১৯০৮ এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী ভারতবর্ষের মানুষের বিরুদ্ধে এবং ভার[illegible] ইংরে[illegible] বাণিজ্য এবং শোষণ লুণ্ঠনের জন্য ইংরেজরা যে আ[illegible]গুলি [illegible]গ করে এসেছে তা সবই তাদের দেশে তৈরি এবং [illegible] শিল্প গড়ে উঠেছিল। ২৪ পরগনার জমিদারি ইংরেজ[illegible]নে দিয়েছিল তার থেকেই তারা ভারত সাম্রাজ্যের [illegible]

১৭৬৯ ই[illegible] পাটনায় গান ফাউন্ড্রি খোলে। এর আগে নবাব মীর [illegible] মুঙ্গেরে। এরই জবাবে ইংরেজদের গান নির্মাণ। পা[illegible] উইলিয়াম। পরে গান অ্যান্ড সেল কাশীপুরে স্থায়ী [illegible]ল। এখানে তৈরি হত পিতল এবং লোহার কামান [illegible]। ১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়ান যুদ্ধে ইংরেজরা প্রথম [illegible] লোডেড্ রাইফেলিং সহ পিতলের কামান, অবশ্য [illegible]ই চালু হয়।

১৮৯২ সালে ভারতে প্রথম ষ্টিল উৎপাদন হয়েছিল কাশীপুরের গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরির উপেন-হার্থ ফার্নেসে আধুনিক পদ্ধতিতে। স্টিলের কামানের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। কেননা, ইতিমধ্যে জার্মানিতে স্টিল ব্যারেল কামান তৈরি শুরু হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরি স্টিল উৎপাদনের সম্প্রসারণ হল একটি রোলিং মিল স্থাপন করে এবং এটি প্রয়োজন মেটাত মেরিন, সিভিল, ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, রেলওয়ে, মিলিটারি ওয়ার্কস সার্ভিস, অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি সমূহ এবং ভাণ্ডারগুলির। ১৯০০ সালে আয়রন অ্যান্ড স্টিল ফার্নেস, গান ফোর্জিং, শেল ফোর্জিং, স্টিল বার মিল, কার্তুজ মেটাল রোলিং এবং অন্য সকল প্ল্যান্ট এবং মেটালজিক্যাল বিভাগগুলি গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরি থেকে ইছাপুরে মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরিতে ১৯০৫ সালে বসানো হয়।

১৮৫৩ সালে দমদম ফ্যাক্টরিতে গুলি উৎপাদন বন্ধ হয়। ওখানে থেকে গেল বেঙ্গল আর্টিলারি আর ওখানেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের রাইফেলের জন্য প্রথম গ্রিজড্ কার্তুজ প্ল্যান্ট বসালো। ১৮৫৪ সালে দমদমে পারকুশন ক্যাপ ম্যানুফ্যাক্টরি তার ক্ষমতার সর্বোচ্চ উৎপাদ দিচ্ছিল, কিন্তু ইংরেজরা দ্রুত সেনাসংখ্যা বাড়াচ্ছিল। সে তুলনায় প্রয়োজনমত চাহিদা এখানে মেটাতে পারছিল না। যে জন্য দমদম ফ্যাক্টরি আরো বাড়ানো হল। কাশীপুরের গান অ্যান্ড সেল ফ্যাক্টরি দমদমের বুলেট ফ্যাক্টরির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বুলেট সরবরাহ করতো। দমদমে যে গ্রিজ লাগানো কার্তুজ উৎপাদন হত, প্রকৃতই তা ছিল গরু এবং শুয়োরের চর্বি।

তদানীন্তন সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই সিপাহিদের বিদ্রোহের বন্যা বয়ে গেল দমদম, বারাকপুর আর চট্টগ্রামে। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল মীরাটে। লণ্ডভণ্ড করেছিল উত্তর ভারতে ইংরেজদের অবস্থান। গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র খোলাখুলি যুদ্ধ হয়েছিল। এই মহান বিদ্রোহের পরেই পুনার কাছে কারকীতে ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১৮-১৯ সালে দমদম এবং কারকী এই উভয় ফ্যাক্টরি মিলে ১২০.১ মিলিয়ন রাউন্ড বুলেট উৎপাদন করেছিল, তখন দুটি ফ্যাক্টরি মিলিয়ে মাত্র ১১৯ জন স্টাফ সংখ্যা এবং শ্রমিক সংখ্যা ৮,৮১৬।

২৪ পরগনার জমিদারি পেয়ে ইংজেরা কেবল ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীতে তাদের দখল কায়েম ও সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। এই জেলায় যুদ্ধ সরঞ্জামের ৫টি কারখানা করে থেমে থাকেনি, তারা ক্রমান্বয়ে সারা ভারতবর্ষে ২৩টি কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এইগুলির আধুনিকীকরণ হয়। এখানে অভিজ্ঞ কারিগর এবং নিপুণ শ্রমিক ও স্টাফ দ্বারা ভারতের অন্যত্র কারখানাগুলি চালু হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে এখন ৩৯টি আয়ুধ ও সরঞ্জাম কারখানা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পরাধীন যুগের ৪টি ছাড়া স্বাধীনোত্তরকালে কোনও নতুন কারখানা হয়নি। উপরন্তু বেসরকারিকরণের কাজ শুরু হয়েছে। তবে স্বাধীন ভারতের জন্য এসব কথা সামরিক সংক্রান্ত বলেই প্রকাশ সম্ভব নয়।

লেখক পরিচিতি : লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও গ্রন্থ প্রণেতা।

কৃষ্ণকালী মণ্ডল

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস সমগ্র জাতীয় ইতিহাসেরই অঙ্গমাত্র, কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জনজীবনের প্রবাহধারায় প্রাণবন্ত স্বকীয়তা ও সৃষ্টির উন্মাদনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম দেয়। মানুষই ইতিহাস তৈরি করে আর ইতিহাস আমাদের অতীত জীবনের পরিচয় বহন করে। অতীতের ঐতিহ্য ও গৌরব বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজকে আলোকিত করে উন্নীত করে, পথ দেখায়। ভুলত্রুটিকে সংশোধিত করে জীবনধারাকে ক্রমোন্নতির পথে বহমান্‌ রাখে। প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তৎকালীন ঐতিহ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিক্ষাচর্চা সহ সামগ্রিক জীবনধারা আমাদের সামনে উদঘাটিত করে বহুর মধ্যে একতা, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার সহাবস্থান এবং ধর্মীয় উন্মাদনাহীন এক মহামানবজীবনের।

আদিম মানুষের জীবনে ধর্মবলে কিছু ছিল না। খাদ্যের অনুসন্ধান, বেঁচে থাকার জন্য পাথরের অস্ত্র-হাতে শিকার করা এবং প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণীর সঙ্গে লড়াই-ই ছিল তাদের জীবনধারা। তারপর তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট গোষ্ঠী আর স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল। তারপর আগুন জ্বালানো ও কৃষি আবিষ্কারের ফলে জীবনে কিছুটা স্থিতিশীলতা আসে। এরপর আসে যাদু, ইন্দ্রজাল ও নানা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস। শিল্প-সংস্কৃতি বলতে তখন ছিল শিকারের নানা ছায়াচিত্র, পাথরে ও গুহায় অঙ্কনচিত্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বজ্রপাত, রোগ-শোক, মহামারী, খাদ্যের অভাবকে তখন মানুষ মনে করত অন্য গোষ্ঠীর কারসাজি। এই ভয় থেকেই জন্ম নেয় আত্মরক্ষার উপায় খোঁজা। যাদু প্রভাব এবং এক শ্রেণীর বিজ্ঞ মানুষের কব্জায় পড়ে গোষ্ঠী মানুষ। ধীরে ধীরে জন্ম নেয়—ধর্ম। বৃক্ষ, কাঠ, পাথর প্রভৃতি পূজার সেই আদিম টোটেম পদ্ধতি আজও আমরা খুঁজে পাই আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনচর্চায়। প্রচলিত হয় সর্পপূজা, বৃক্ষপূজা, ধর্মঠাকুর, মুণ্ডপূজা, ও নানামূর্তি পূজা। এর বহু বহু বছর পর যাযাবর-আর্য সভ্যতা আসে। বিশেষ করে বাংলা তথা দক্ষিণবঙ্গে। সংমিশ্রণ ঘটে জীবনধারায় এবং স্বভাবতই ধর্মীয় বিশ্বাসে। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের মধ্যেই জন্ম নেয় দুটি প্রতিবাদী ধর্ম—জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। আমাদের আলোচ্য বিষয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে ছিল কিনা এবং কতটা।

বৌদ্ধ পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রভৃতির বিবরণে সমতট, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মঠ, সংঘ, ও বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন কেন্দ্রের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এসমস্ত অঞ্চলই বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাছাকাছি যা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গারিডি জাতির শক্তিমত্তা, গঙ্গে বন্দরের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি, পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি, ব্যাঘ্রতটী অঞ্চল প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করে যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনা শুধু এক সুসভ্য প্রাচীন জনপদই ছিল না, নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চল ছিল

আজকের সুন্দরবন ও সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা যদিও বহুলোকের কাছে বাদাবন, জলাময় খণ্ড-বিখণ্ড নদীনালায় পূর্ণ জঙ্গল, সাপ-বাঘে ভরা অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও এখান থেকেই আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বহু নিদর্শন, যেগুলো এই অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক ঐতিহ্যের পরম্পরাকে নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে যে সমস্ত প্রত্ন সামগ্রী পাওয়া গেছে তার মধ্যে বেশ কিছু প্রত্নবস্তু আছে যা মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন যুগের বলে প্রত্ন বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন এবং এই বস্তুগুলোতে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। দেব-দেউল, মঠ-মন্দিরে ভরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বোড়াল, বেহালা, মাহিনগর, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, আটঘরা, বাইশহাটা, ঘোষেরচক, জটারদেউল, কঙ্কণদিঘি, মণিরতট, হরিনারায়ণপুর, রায়দিঘি, ছত্রভোগ, খাঁড়ি, দেউলপোতা, কাঁটাবেনিয়া, পাকুড়তলা, পুকুরবেড়িয়া, কাকদ্বীপ, সাগর, মনসাদ্বীপ, রাক্ষসখালি, বকুলতলা সহ অন্যান্য অঞ্চল এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণগুলি থেকে

দ. ২৪-প.—৮
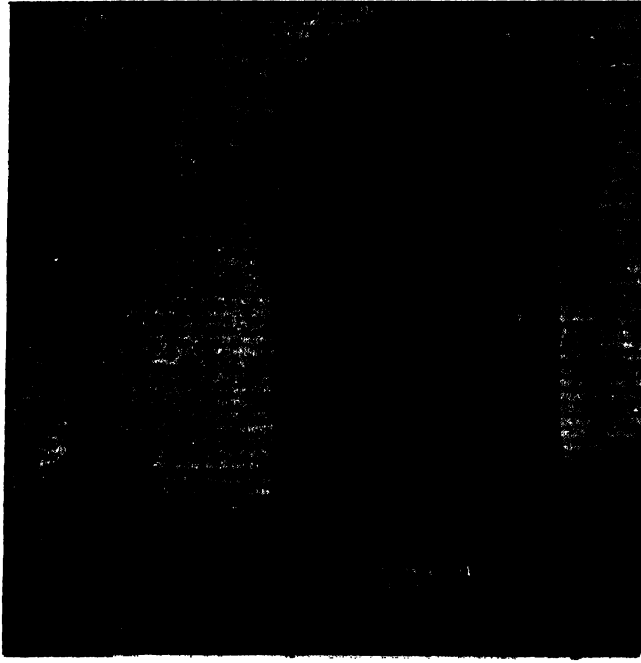
পার্শ্বনাথ জৈন (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) *ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল*

অনুমান করতে পারি যে তৎকালীন সমাজ, শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি ধর্ম তথা সমগ্র জনজীবনের চালচিত্রে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এক অপরিসীম প্রভাব ছিল। শুধু তাই নয় ওই সমস্ত অঞ্চলে প্রত্ন উৎখননের ফলে মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরবিন্যাসে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র, মুদ্রা, ভাস্কর্য, ধাতুমূর্তি ও বিভিন্ন তাম্রলিপি থেকে যে সমস্ত প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে তা তৎকালীন এক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে।

বৈদিক যাযাবরী প্রভাব যখন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেই ভারতীয় সভ্যতা বলে প্রতিষ্ঠিত হল, তার বহু পরে অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষ দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের আচারসর্বস্বতা, যাগযজ্ঞ পশুবলির আড়ম্বর, নিম্ন শ্রেণীর প্রতি উচ্চ শ্রেণীর অপরিসীম ঘৃণা যখন মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করতে লাগল এবং সর্বতোভাবে রাজানুগ্রহের ফলে 'পুরোহি[illegible] [illegible]ণ্যধর্ম' যখন ক্রমশ সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে [illegible] যে দুটি প্রতিবাদী মানবধর্ম প্রবল আকার ধারণ করে [illegible] ও বৌদ্ধধর্ম। লক্ষণীয় যে এই প্রতিবাদী ধর্ম প্রচার[illegible] [illegible]ণ শ্রেণী থেকে আসেননি, এসেছেন ক্ষত্রিয় শ্রেণী [illegible]।

জৈনধর্ম প্রবর্তক[illegible] [illegible] হয়। জৈন সূত্রানুসারে মহাবীর ছিলেন চব্বিশ [illegible]কর। প্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভদেব বা আদিনাথ [illegible] প্রবক্তা ছিলেন ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বা [illegible]থ প্রবর্তিত মূল জৈনধর্মের নীতি ছিল অহিংসা, অ[illegible], [illegible]তা, চুরি না করা এবং এই ভাবেই সিদ্ধি লাভ করে [illegible]। শেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর ছিলেন কুণ্ডপুরের জ্ঞাত্রি[illegible]। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ জাতিতে ক্ষত্রিয়, মাতা ত্রিশলা [illegible] ও বৈশালীর রাজপরিবারের আত্মীয়া। মহাবীর ৫[illegible] খ্রিস্ট[illegible] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জৈনধর্মকে যুগোপযোগী [illegible] প্রচা[illegible] একে 'নিগ্রন্থ' (সম্পূর্ণ মুক্ত) নামে অভিহিত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন বলে লোকে তাঁকে 'জীন' বলত। সেই থেকে তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম রূপান্তরিত হয়ে জৈনধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর—এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন।

একই সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ। তরাই অঞ্চলের শাক্যজাতির নায়ক শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ, মাতা মায়াদেবী। তিনি জরা, বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে মুক্তির উপায় খোঁজার প্রচেষ্টায় দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধন করেন। পরে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে দেহমনকে আত্মস্থ করে ধ্যানমগ্ন হন এবং 'বুদ্ধত্ব' লাভ করেন। তাঁর ধর্মমত সহজ, সরল ও গৃহীজীবনের পক্ষে সহজে পালনীয়। তাঁর মতে মানুষের অজ্ঞানতা ও আসক্তিই দুঃখের কারণ। সর্বতোভাবে সৎজীবন যাপনই বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। এইভাবেই নির্বাণ বা দুঃখকষ্টের হাত থেকে 'মুক্ত' হয়ে পুনর্জন্মের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এঁরা মূর্তিপূজার বিরোধী। নিরীশ্বরবাদী এবং জাতিভেদে বিশ্বাস করে না। তবে দার্শনিকতাবাদ, মানবতাবাদ, সংঘের অপরিহার্যতা স্বীকার করে, যদিও জৈনধর্মের মতো কৃচ্ছ্রসাধনের উপর গুরুত্ব দেয় না। পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা হীনযান, মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতি মতবাদে বিভক্ত হয়ে পড়েন। যেহেতু দক্ষিণ বিহারে ব্যাপকভাবে এই দুটি ধর্মমত প্রসার লাভ করেছিল সংলগ্ন বঙ্গদেশেও অবধারিতভাবে এর ব্যাপ্তি ঘটে। যদিও রাঢ় অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রচারের সময় বিরুদ্ধ-ব্রাহ্মণবাদীরা প্রচারকদের বিরুদ্ধে কুকুর পর্যন্ত লেলিয়ে দিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে সামাজিক পরিবেশ, ধর্মীয় অত্যাচার, রাজানুগ্রহের অভাব, বিশৃঙ্খলা বা রাজনৈতিক শৈথিল্যই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে জৈন, বৌদ্ধধর্মের আওতায় আনে। এখন প্রশ্ন হল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এত ঘাত প্রতিঘাত, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক এত ব্যাপক উত্থান-পতন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবকিছু ধ্বংস ও অবলুপ্তি, নদীর নাব্যতা হ্রাস ও গতিপরিবর্তন বা অবলুপ্তি; সমুদ্রের সম্প্রসারণ বা পশ্চাৎ অপসারণ ইত্যাদি—শত সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কেমন করে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব টিকে রইল। এর দুটো কারণ। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসারের প্রথম ও প্রধান কারণ হল দীর্ঘকালীন রাজানুগ্রহ। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত থেকে দক্ষিণ ভারতের গঙ্গ, কদম্ব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজবংশ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তেমনই মৌর্য্য সম্রাট অশোক থেকে কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন এবং বাংলার পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের একটি স্থানীয় ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন ধর্ম সংঘাতের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার মতো এই দুটি ধর্মের সহনশীলতা ছিল। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতার স্থলে লোকায়ত সমাজের প্রয়োজনীয় সহজ সরল জীবনাদর্শ এবং সকল মানবকেই সম-অধিকার প্রদান করে এই দুই ধর্ম সর্বজনীন ধর্মমত হয়ে উঠেছিল।

এই বৃহৎ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই আমরা বিচার করব বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীন জনপদের লোকায়ত সমাজের কোনও কোনও উপকরণকে, সেগুলোর মাধ্যমে আজ আমরা পৌঁছে পেতে পারি জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবিত তৎকালীন দক্ষিণবঙ্গ তথা বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগনায়।

বৌদ্ধ পর্যটক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রভৃতির বিবরণে সমতট, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মঠ, সংঘ, ও বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন কেন্দ্রের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এসমস্ত অঞ্চলই বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাছাকাছি বা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গারিডি জাতির শক্তিমত্তা, গঙ্গে বন্দরের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি, পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি, ব্যাঘ্রতটী অঞ্চল প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করে যে দক্ষিণ চব্বিশপরগনা শুধু এক সুসভ্য প্রাচীন জনপদই ছিল না, নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চল ছিল। মৌর্য, গুপ্ত, পাল এমনকি সেন রাজাদের আমলেও দক্ষিণ চব্বিশপরগনার এই সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা সমন্বয় স্বাভাবিকভাবেই লোকজীবনে চলমান অবস্থায় ছিল। যার কারণ হিসাবে বলা যায় যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অনেক পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু সাদৃশ্য বা সমান আচরণীয় ব্যাপার রয়েছে। হিন্দুদের মতো জৈনরাও লক্ষ্মী গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করেন। হিন্দুরা গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীরকে অবতার বলে স্বীকার করেন। হিন্দুধর্মের অহিংসানীতি, জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মমতে বিশ্বাস করা হয়। বৌদ্ধ বা জৈনরা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলেও মঠ, চৈত্য, বিহার ও সংঘের সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। সুতরাং আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যবাদিতায় বীতশ্রদ্ধ কৃষিসমাজ, মৎস্যজীবী ও নিম্নবর্গীয় লোকায়ত সমাজ এবং আদি কৌম সমাজ, যারা দক্ষিণ চব্বিশপরগনার মূল বাসিন্দা, তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েন। এছাড়া মানবতাবাদ, আধ্যাত্মিকতা, দর্শন, প্রাচীনভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন, সংকলন ও ধর্মের সহজবোধ্যতা এবং শ্রমণ ও ভিক্ষুদের নম্র ব্যবহার ও বিনয় স্থানীয় মানুষের হৃদয়ে বিশেষ আসন লাভ করেছিল বলেই ওই ধর্মের চিহ্নগুলি আজও পাওয়া যাচ্ছে।

বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক কারণ হল—সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের নদী ও সমুদ্রবন্দরগুলির অবস্থান এবং প্রাচীন গঙ্গে বন্দর দেউলপোত, হরিনারায়ণপুর এবং গঙ্গাসাগর তীর্থ প্রভৃতি অঞ্চলের অবস্থিতি। বহির্গামী নৌ-অবস্থিতি ও যোগাযোগের ফলে মধ্য এশিয়া, চীন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয়েশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা পরবর্তীকালে ক্ষীণ হয়ে এলেও যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং বিদেশি যাত্রী ও বণিকদের দিকে নজর রেখেই মঠ, চৈত্য, সংঘারামগুলিতে শিক্ষা, দার্শনিক চিন্তাভাবনা ও পঠন-পাঠন দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছিল। এছাড়া শেষদিকে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতাবাদ যথা, মহাযান, হীনযান, বজ্রযান ইত্যাদি প্রথার প্রবর্তন হলে এগুলি সহজেই হিন্দু উপাসনা ও মূর্তিপূজার গণ্ডিতে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাচারীগণ প্রায় একই জায়গায় এসে অবস্থান করে ছিল। ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাবের কথা কালিদাস দত্ত মহাশয় বিস্তৃতভাবে বলেছেন। বৃহৎ বঙ্গ, বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, তাম্রলিপ্ত, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ সম্বন্ধে কেউ কিছু তথ্য দিলেও দক্ষিণবঙ্গ তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ থেকেই গেছে।

পাথরপ্রতিমা থানায় দিগম্বরপুর বলে একটা গ্রামের নাম আজও আছে। স্পষ্টতই এটি একটি জৈন নাম। সুদূর প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের লোকেদের আধিক্য ও ধর্মাচরণ কেন্দ্র থাকায় এই গ্রামটির নামকরণ দিগম্বরপুর হয়েছিল বলে বিশ্বাস। পাথরপ্রতিমায় পাওয়া গেছে পাথরের জৈন মূর্তি এবং একটি ধাতব বৌদ্ধ মূর্তি। এখানকার নারায়ণী পূজা ও মেলা বিখ্যাত। জৈনরা অনেক হিন্দু দেবদেবীর মতো লক্ষ্মী, গণেশ ইত্যাদির পূজা করত। শ্রদ্ধেয় শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "জৈন ও বৌদ্ধ চারণেও শ্রী (লক্ষ্মী) দেবীর বিশেষ প্রভাব রয়েছে।" এই নারায়ণী অতীতে সেরূপ কোনও দেবী থেকে রূপান্তরিত হওয়াও সম্ভব। সোনারপুর থানার সুভাষগ্রাম স্টেশনের কাছে মাঠের মধ্যে যে 'হাড়ি ঝি চণ্ডী দেবী' আছেন তাও বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী 'হারিতি' বলে মনে করার ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বহুস্থানে এরকম নারায়ণী, বিশালাক্ষ্মী, চণ্ডী ও গণেশ মূর্তি আছে যা জৈন বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব দেবী থেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হিন্দু দেব দেবী হিসাবে পূজিত হচ্ছেন। জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধমূর্তি থেকে শিব, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন, প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবী হিসাবে পরিবর্তিত হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন। আবার

জয়নগর থানার বহড়ু গ্রামে 'পঞ্চানন' ছবি : জয়ন্ত হালদার

কঙ্কণদিঘিতে প্রাপ্ত জৈন মূর্তি

বিপরীত ক্ষেত্রে অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু দেবদেবী থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছেন। অর্থাৎ একটা বিরাট সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মিশ্রণ ঘটে গেছে। প্রসঙ্গত বলি—"কয়েক শতাব্দী পূর্বে তন্ত্রযান বৌদ্ধ ধর্মের এবং তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের বিশেষ সংমিশ্রণ ঘটে। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ মহাযান হইতে বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিকরূপ পরিগ্রহ করে এবং এই বিবর্তনে বহু ব্রাহ্মণ্য হিন্দু দেবদেবী বজ্রযান বৌদ্ধরূপে পরিবর্তিত হয়। অপরদিকে কোন কোন বৌদ্ধ দেবতা তান্ত্রিক হিন্দু দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে।......বোধিসত্ত্ব ও অবলোকিতেশ্বর প্রধানত বিষ্ণুর রূপান্তর বলিয়া গৃহীত হইলেও ইহা সত্য যে তাঁহার কোন কোন মূর্তি ভেদ যথা সিংহনাদ লোকেশ্বর, বালকণ্ঠ, পদ্মনাভেশ্বর ইত্যাদি শিবের বিভিন্নরূপ কল্পনা হইতে সঞ্জাত। অন্য পক্ষে নৈরাত্মা এবং বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বজ্রযান বৌদ্ধ দেবতার হিন্দুরূপ যে কালী এবং ছিন্নমস্তা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প।" (*পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, অখণ্ড, পৃষ্ঠা* ৩৩১) এইভাবেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের একটা [illegible] সংমিশ্রণ হওয়ার ফলেই পাল যুগ বা তার পূর্ববর্তী কাল থেকে [illegible] ও [illegible] সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটেছিল। পরবর্তীকালেও বিভিন্ন [illegible] মাধ্যমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তা আমরা দেখতে পাই। [illegible] যান বৌদ্ধমূর্তি যে এ অঞ্চলে পূজিত হত বর্তমানকালে [illegible] মূর্তিই তার প্রমাণ। একথা অবশ্যই বলা চলে যে [illegible] চব্বিশ পরগনার লোকায়ত জনগণ ও তাদের ধর্ম [illegible] নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। অস্ট্রিক ও কৌম সভ্য[illegible] জাতি এবং তাদের উত্তরসূরী পৌণ্ড্রজনাধিক্য হওয়ায় [illegible] জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তারা কিছুটা নির্লিপ্ত ও [illegible] সম্পন্ন ছিল। বর্তমানকালেও লোকায়ত ধর্ম বনবিবি [illegible] রায়, বারাঠাকুর, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, শীতলা, পী[illegible] নারায়ণী, সত্যপীর, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর মধ্যে [illegible] এরা অপরাপর বৈদিক বা আর্য এবং জৈন ও [illegible] তায় আকৃষ্ট হয় এবং ওই সব দেবদেবীদের প্রতি য[illegible] প্রদান করে। এই সহাবস্থান বিচিত্র হলেও সত্য। [illegible] ধর্মের বিবর্তিত অবস্থায় ওই সব মূল বাসিন্দারা ধ[illegible] বৌদ্ধ বা জৈন হিসাবে পরিগণিত হত। সেন যুগে আবার হিন্দুধর্মের রাজানুকূল্য থাকায় ওই সমস্ত মানুষের উত্তর পুরুষগণকে বৌদ্ধ বা জৈনধর্মীয় সত্তা সহ রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে হয়েছিল।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আটঘরা, দমদমাব ঢিবি, বোড়াল, বাইশহাটা, মণি নদীর তট অঞ্চল, রায়দিঘি, কঙ্কনদিঘি, জটা, খাড়ি-ছত্রভোগ, কাঁটাবেনিয়া, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, সাগর, পাথরপ্রতিমা অর্থাৎ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বহু জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি মুদ্রা, ভগ্নমঠ, স্তূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেগুলো থেকে একথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে ওই অঞ্চলে একটা বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাঞ্চল (বলয়) গড়ে উঠেছিল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে প্রায় হাজার বছর পূর্বেও ২৪-পরগনার নানা স্থানে বৌদ্ধ বিহার ছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতরা তখন সেখানে পুঁথি-পাঁজি লিখতেন ও ধর্মপ্রচার করতেন এমনকি এখন যে হাতিয়াগড় ও বালাণ্ডা পরগনা নগণ্য পরগনার মধ্যে গণ্য সেখানেও বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল ও পণ্ডিতরা তথায় প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চা করতেন তার নিদর্শন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের কথাও প্রণিধানযোগ্য—"য়ুয়ান চোয়াঙের পর বাংলা জৈন বা নিগ্রন্থ ধর্মের অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার মতো কোনও গ্রন্থ-প্রমাণ বা লিপি-প্রমাণ কিছু উপস্থিত নাই। তবে গুপ্তোত্তর মূর্তি-প্রমাণ কিছু আছে এবং তাহা সমস্তই পাল ও সেন পর্বের। য়ুয়ান-চোয়াঙের পর হইতেই নিগ্রন্থধর্ম যে বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, এই জৈন প্রতিমাগুলিই তাহার প্রমাণ। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এক সুন্দরবন অঞ্চল হইতেই প্রায় দশ বারোটি জৈনমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।...........মূর্তিগুলি সাধারণতঃ ঋষভনাথ, আদিনাথ, নিমিনাথ, শান্তিনাথ এবং পার্শ্বনাথের; পার্শ্বনাথের প্রতিমাই সকলের চেয়ে বেশী। মূর্তিগুলি প্রায় সমস্তই দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের" (*বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৫৩৭-৫৩৮*)। উল্লিখিত সুন্দরবন অঞ্চলে যে দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তির কথা বলা হয়েছে, তা সবই প্রায় বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার।

সভ্যতা গড়ে ওঠে, ধ্বংস হয়। মাটির স্তরে স্তরে জমতে থাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির লেখমালা। মানুষের আধিভৌতিক দেহ বিলীন হলেও তৎকালীন সংস্কৃতির, সভ্যতার, শিল্পচর্চার রেশটুকু পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাসের রুক্ষতার আড়ালে আমাদের শোনায় অতীতের গীতিআলেখ্য, জীবনবোধ। ইতিহাসের ধারাবাহিক পরিবর্তন আমাদের সামনে উদঘাটিত করে বিচিত্র পরিবেশে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক জীবনগাথা। এর মধ্যে থেকেই তাই আমাদের সামনে উদঘাটিত হয় হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থান।

বোড়ালে খননকার্যের ফলে যে বহু মাটির পাত্র ও ভাণ্ড ভগ্ন বা প্রায় ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে যার অনেকগুলি মৌর্য বা শুঙ্গ যুগের বৌদ্ধ শ্রমণরা ব্যবহার করত। এই অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস যে ছিল তাও ব্যবহৃত পাত্রাদি থেকে এবং দশম-একাদশ শতাব্দীর মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় বোঝা যায়। অন্যান্য মূর্তিগুলি ছাড়াও রয়েছে বৌদ্ধ সাধনভিত্তিক তারামূর্তি। বোড়ালের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে, ছত্রভোগে এবং আশুতোষ মিউজিয়ামে এগুলি দেখা যাবে। ডিঙেলপোতা থেকে পাওয়া গেছে দশম-একাদশ শতকের মৃৎপাত্র। মাহিনগর থেকেও পাওয়া গেছে তৃতীয়-চতুর্থ শতকের এবং দশম-একাদশ শতকের মৃৎপাত্র এবং মাটির জালা জাতীয় পাত্র।

পুরন্দরপুর হালদার চাঁদনীর জোড়াশিবমন্দির সংলগ্ন আদিগঙ্গার খাতে মাটি কাটার সময় ছোট্ট কয়েকটি বৌদ্ধ তান্ত্রিকমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। দমদমার ঢিবি (আটঘরা, সীতাকুণ্ড) উৎখননের সময় প্রাপ্ত উষ্ণীষ পরিহিত খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের বুদ্ধমূর্তিটি গুপ্তযুগের বলে নির্দেশিত (*দ্রঃ ২৪ পরগণার অতীত, কালিদাস দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২. চিত্র ১, ২য় সংখ্যক ছবি*)। এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির পাত্র, পোড়ামাটির বোধিসত্ত্ব মূর্তির মুখ, হাড় ও পাথরের প্রত্নদ্রব্যগুলি পাল, গুপ্ত, কুষাণ, শুঙ্গ এমনকি মৌর্য যুগের বলে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রত্নবস্তুগুলির অনেকগুলিই বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণদের বলে নির্দেশিত হয়েছে। বারুইপুর সংগ্রহশালা, আশুতোষ মিউজিয়াম, কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা, রাজ্য প্রত্ন সংগ্রহশালায় এগুলো দেখা যাবে। এছাড়াও নির্দিষ্টভাবে রয়েছে দমদমা ঢিবির ১নং খাদের ১.১১ মিটার গভীরে ২নং স্তরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির একটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি। এটি কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান এবং কিছুটা ভগ্ন। উচ্চতা ছয় সেমি। এছাড়াও ওই খাদেই ১.১২ মিঃ গভীরে ৩নং স্তরে অনুরূপ আরও একটি পোড়ামাটির জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা এগুলোকে পালযুগের বলে অনুমান করেছেন। নিকটস্থ সীতামার পুকুরে প্রাপ্ত কালো রঙের একটি মৃৎভাণ্ড বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই ভাণ্ডটি বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণদের 'ভিক্ষাভাণ্ড' (Begging Bowl) বলেই তাঁরা মনে করেন। পাল যুগের একটি চমৎকার ভাস্কর্য—গৌতমবুদ্ধের মহানির্বাণ দৃশ্য পাওয়া গিয়েছে। ধূসর কালো বেলে পাথরে তৈরি পদ্মপাপড়ির উপর সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুহ্যমান শোকের দৃশ্য। মোটামুটি তিনফুট থাকে মূর্তিটি তৈরি। পরবর্তী সেন যুগে অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি ধাতব বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে পাথরপ্রতিমা থেকে। মূর্তিটি বুদ্ধের ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বসা ধ্যানমূর্তি। সম্প্রতি পাথরপ্রতিমার শ্রীনারায়ণপুরে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এটি পাথরপ্রতিমার ধ্বংসপ্রাপ্ত সংঘারামটিও হতে পারে। এটি সম্ভবত গুপ্ত বা পাল যুগের তৈরি। কাকদ্বীপের পুরাতত্ত্ব গবেষক শ্রীনরোত্তম হালদার একটিকে হাতিয়াগড় দুর্গ বলেছেন। এছাড়া অযত্নে রক্ষিত অথচ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে বিশেষ

দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত জৈন মূর্তি

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রাপ্ত দীপলক্ষ্মী

মূল্যবান একটি জৈন মূর্তি রয়েছে দক্ষিণ বারাসাত রেল স্টেশনের কাছে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পশ্চিমদিকে সেন পাড়ায়। ঈষৎ লাল বেলে পাথরে নির্মিত বহু বহু প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তিটি বেশ বড় প্রায় তিন ফুট উচ্চতার। মস্তকে ছত্রাকারে বিশাল বহুমুখ সর্পফণা, নিচের দিকে দুই অনুগত শিষ্যের মস্তকে দুটি হাত, নিচের পাদপীঠ ভীষণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত। উর্ধ্বে দুই পার্শ্বে দুটি সর্প। এটি গুপ্তযুগে নির্মিত জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি বলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মত দিয়েছেন। এক্ষণে এটি একটি নতুন তৈরি বেদীতে শায়িত অবস্থায় আছে এবং মনসারূপে পূজিত হচ্ছে। কালিদাস দত্ত মহাশয় সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং হরিনারায়ণপুর ও আটঘরা অঞ্চলে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ যুগের জোড়ামাটির নানামূর্তি, বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনী আলেখ্য, ব্যবহার্য নানারকম মৃন্ময়পাত্র এবং সহস্রাধিক তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা-সহ জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন। এগুলো থেকেই বোঝা যায় যে এ অঞ্চলের সেই সময়কার অধিবাসীরা কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র প্রভৃতির অধিবাসীদের তুলনায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত কোনও অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। তাছাড়া পাথরপ্রতিমায় প্রাপ্ত ওই ধাতব বৌদ্ধমূর্তিটি শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য এত বেশি যে একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় তৎকালীন অধিবাসীদের সঙ্গে ওই সমস্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ননীগোপাল মজুমদারও বলেছেন যে বর্তমান চব্বিশ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি

পরগনার দক্ষিণ অংশে গুপ্ত ও পালযুগের বহু উন্নত গ্রাম ও নগর বিদ্যমান ছিল। আর তাদের সঙ্গে সমুদ্রপথে রোম, ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ, ক্রীট দ্বীপপুঞ্জ, মিশর, সিরিয়া, ব্যাবিলন এবং প্রাচ্যের দিকে চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান হত।

বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কাঁটাবেনিয়ায় প্রাপ্ত জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের যে বিশাল আকৃতির প্রস্তর মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে সেটিই এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত জৈন মূর্তিগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। এই বিশাল প্রস্তর মূর্তিটি বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে অনন্তদেব হিসাবে পূজিত হচ্ছেন। আজও এই অনন্তদেবরূপী পার্শ্বনাথের পূজায় আপামর জনসমাগম হয়। পুজো পাঠ চলে। বন্ধ্যা নারীরা সন্তানকামনায় উলঙ্গ মূর্তিটির লিঙ্গ ধোয়া জল যেভাবে পরম বিশ্বাসে পান করেন তা আমাদের কাছে সুদূর অতীতের হিন্দু জৈন-বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতির পারস্পরিক আত্মীকরণের এক সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। সম্ভবত এখানকার জাগ্রতদেবী বিশালাক্ষ্মীও বৌদ্ধ মহাযান, দেবী। সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিশালাক্ষ্মী, দীপালক্ষ্মী এবং মনসাদেবী বিভিন্নরূপে এক বিশেষ পূজিতা দেবী। অনেকের মতে এরা বৌদ্ধদেবী এবং এই লোকায়ত বৌদ্ধদেবীরাই আত্মীভূত হয়ে পরবর্তীকালে হিন্দুদেবী হিসাবে পূজিতা হচ্ছেন। ...ভাবে ...খা যায় শিব, বুড়োশিব, এবং ধর্মঠাকুরের অবস্থান ... ...চব্বিশ পরগনা জুড়ে। শিব ও বুড়োশিব ছিলেন মূলত ...যুগের ...দেবতা। কিন্তু পরবর্তীকালে এখানেও বৌদ্ধ প্রভাব ...। ফলে শিব এবং বুড়োশিব (বুদ্ধশিব > বৃদ্ধশিব > ... পূজা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান বুদ্ধপূর্ণিমা বা বৈশাখী ... হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ব্যাপক অঞ্চলের সাধা... ...পূর্ণিমার দিনটিকে স্মরণীয় ও পূণ্যদিন বলে মনে ক... ...পূজা, সিন্নি এবং নানা উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন ... আরোপণ ইত্যাদি ব্যাপারে মতবিরোধ আছে এবং ... ...পারে কিন্তু এটা ঘটনা যে এই সমস্ত জৈন-বৌদ্ধ প্রভা... চলে ...আছে।

আগেই বলা হ... ...শিল্পের মতো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কঙ্কণদিঘি, ...হিকা ও জটার দেউলকে কেন্দ্র করে সম্ভবত এক ... ...জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মঠ বা ধর্মানুশীলন কেন্দ্র গ... ...বৃত্তের পরিধির মধ্যে ছিল ঘোষের চক বা বাইশ... ...ছাটুয়া নদী সংলগ্ন অঞ্চল, জটা, রায়দিঘি, কঙ্কণদিঘি, মণিরতট, নলগোড়া, দেলপড়ী, মাধবপুর, মইপীঠ, খাড়ী, ছত্রভোগ, কাঁটাবেনিয়া, পাথরপ্রতিমা এবং সাগরদ্বীপ। জটার দেউল নির্মাণ করান দশম-একাদশ শতাব্দীতে রাজত্বকারী চন্দ্র বংশীয়দের এক রাজা জয়ন্তচন্দ্র, ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। দক্ষিণবঙ্গের এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে এঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। Hunter সাহেব তাঁর Statistical Account-এ জটার দেউলকে একটি বৌদ্ধ মন্দির বলে নির্দেশ করেছেন (Vol-I, Page-38)। এসিয়াটিক সোসাইটির বিবরণে ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বরে Mr. Swinhoe এটিকে উল্লেখ করেছেন—"The temple is of the Buddhist type of Architecture". তাছাড়া জটার দেউল পূর্বমুখী হওয়ায় অনেকেই এটিকে বৌদ্ধ মন্দিরই বলতে চান কেননা হিন্দু মন্দির সাধারণত পূর্বমুখী হয় না। জটার দেউলের আরও কয়েকটি বৌদ্ধ লক্ষণের কথা উল্লেখ করি। এর খিলানগুলি হিন্দু মন্দিরের মতো নয়—অনেকটা গির্জার খিলানের মতো। দেওয়ালও খুব পুরু প্রায় দশ ফুট চওড়া, গর্ভভাগ ৭-৮ ফুট নীচে, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে হয়। মন্দিরের প্রাচীর সাধারণ হিন্দুপীঠের মতো নয়, একেবারে গর্ভগৃহের প্রাচীর থেকে গেঁথে তোলা। পাতলা চওড়া ইট দিয়ে কালো মর্টারে গাঁথা। ভিতরের দেওয়ালে গর্ভগৃহের কাছে বেশ কয়েকটি বড় বড় গাঁথা র‍্যাক দেখে মনে হয় যে এখানে সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত। বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতেই এগুলি সম্ভব। এছাড়া নিকটেই রয়েছে উত্তর-পূর্বাংশে একটি বড় কুয়া এবং উত্তরাংশে ভূ-নিম্নে একটি প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ। এছাড়া বাইশহাটা ঘোষের চকে দুটি বড় বড় বৌদ্ধস্তূপ রয়েছে। এগুলি বৌদ্ধ মঠ ও সংঘারাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মূলত এগুলি ধ্বংস হয় তুর্কি ও পাঠান আক্রমণে। ছাটুয়া নদীর প্রবাহ পথে ১১৬ নং লাটের পশ্চিমদিকে ও ছাটুয়া নদীর পূর্ব পারে একটি স্তূপ এবং জটার দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রায় এক কিমি দক্ষিণে আরও একটি বড় ইটের স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি প্রায় ২৫ ফুট উঁচু এবং ২-৩ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এই স্তূপ ও মঠগুলি ছিল বৌদ্ধ শ্রমণ, ভিক্ষু বা শিক্ষার্থীদের বাসগৃহ। এছাড়া ওই ছাটুয়ানদী থেকে বহু বছর আগে মাতলার এক ধীবর মাছ ধরার সময় প্রায় ৩ ফুট উঁচু কালো পাথরের বহু পুরোন একটি দিগম্বর তীর্থঙ্করের মূর্তি পেয়েছিলেন যেটি এখন ক্যানিং-এর বোলবামনি গ্রামে ধর্মঠাকুর বলে পূজিত হচ্ছে। এটি এ অঞ্চলের জৈন প্রভাবের আরও একটি নিদর্শন—একটি অতীব সুন্দর জৈনমূর্তি। মূর্তিটি নগ্ন, দিগম্বর সম্প্রদায়ের। মাথার উপর সর্পছত্র, ছত্রের দুপাশে দুটি চামরধারী পুরুষমূর্তি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। তীর্থঙ্করের ডান ও বাম উভয় পাশে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের বিশেষ লাঞ্ছনচিহ্ন দুটি সাপ এবং পাদপীঠের উপরও একটি সাপ খোদিত আছে।

জটার দেউলের দক্ষিণ-পূর্বে ঠাকুরানী নদীর পূর্বে ১১৭ নং লাট মইপীঠে যে বৃহদাকৃতি ইটের স্তূপটি পাওয়া গেছে সেটিও একটি বৌদ্ধ স্তূপ। এছাড়া খাড়িও একটি উন্নত প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রাম। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে খাড়ির উল্লেখ আছে। এখানে প্রাচীন গৃহের ধ্বংসাবশেষ, দ্বার, বাজু, থাম প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এখানে ১০-১২ টি ব্রোঞ্জের ও ২০০টি কালোপাথরের হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে শৈব ধর্মাবলম্বী মহারাজ শশাঙ্ক খাড়ির বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব করার জন্য বড়াশীতে অম্বুলিঙ্গ শিবের প্রতিষ্ঠা করে আদি মন্দিরটি

নির্মাণ করান বলে কথিত। কঙ্কণদিঘি অঞ্চলেও বহু জৈন ও বৌদ্ধ নিদর্শন পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির বৌদ্ধ ভিক্ষাপাত্র, শ্রমণদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং কারুকার্য করা পোড়ামাটির যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি, খেলনা, গাড়ি, মেষ, বৃক্ষ প্রভৃতির প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। খাড়িতে দীনবন্ধু নস্কর মহাশয়ের সংগ্রহ শালায় মণিরতট-কঙ্কণদিঘি থেকে পাওয়া প্রচুর পোড়ামাটির জিনিস এবং পাথুরে নিদর্শন রয়েছে যেগুলি জৈন ও বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করার যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি করে। তাঁর সংগৃহীত ওই সময়কার বেশকিছু মুদ্রাও রয়েছে। বিভিন্ন লিপিযুক্ত ফলকও এই সময়কার প্রমাণ দেয়। কঙ্কনদিঘি অঞ্চল থেকে তাঁর সংগৃহীত সুন্দর সুন্দর কালো ও ধূসর পাথরের বুদ্ধমূর্তিগুলো প্রাক্‌ পালযুগের বলেই মনে হয়। তাঁর সংগ্রহের সবথেকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি হল একটি ভগ্নপ্রাপ্ত জৈন প্রস্তরফলক। এই ৩"×৪"-র মসৃণ ফলকটিতে রয়েছে আদিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রমুখ তিনজন জৈন তীর্থঙ্করের অতি সুন্দর নগ্নমূর্তি। এটি একটি সম্পূর্ণ ২৪ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি অঙ্কিত প্রস্তরফলকের অংশবিশেষ বলেই ধারণা করা যুক্তি যুক্ত। কালো পাথরে খোদিত তিনটি মূর্তির পরই ফলকটি খণ্ডিত। খুব বেশি মোটা পাথর নয়। মূর্তি তিনটির নিচে বৃষ, সর্প ও ঘট জাতীয় লাঞ্ছন চিহ্ন আছে। স্পষ্টতই এটি জৈন উপাসনাগৃহে রক্ষিত বা কোনও ধর্ম স্থলে স্থাপিত দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের চব্বিশজন ধর্মগুরু বা তীর্থঙ্করের মূর্তিফলক। কঙ্কণদিঘি থেকে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে বারুইপুর সুন্দরবন সংগ্রহশালায় রক্ষিত কালো পাথরের বেশ পুরোন ও বড়ো আকারের বরাহি নামক চতুর্ভুজা একমূর্তি। এর দক্ষিণ ঊর্ধ্ব হস্তে অস্ত্র এবং দক্ষিণ নিম্নহস্তে ভিক্ষাপাত্র সমন্বিতা। বরাহ মুখাবয়ববিশিষ্টা স্ফীতোদরা, প্রায় নগ্না স্ত্রীমূর্তিটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হিসাবে চিহ্নিত। এখান থেকে পাওয়া গেছে গুপ্তযুগের একটি সুন্দর পোড়ামাটির ফলকে পদ্মাসনে ধ্যানরত বুদ্ধমূর্তি, চারিপাশে (জটার দেউলের মতো) লম্বা দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট শত শত বৌদ্ধ মঠ। এটিকে প্রবুদ্ধ মূর্তি বলা হয়েছে। জটার দেউলের উত্তরে ২৯ নং লাট নলগোড়ায় যে স্তূপটি রয়েছে তাকে নলগোড়ার মঠবাড়ি বলে। এটি প্রায় ৩০ ফুট উঁচু এবং ৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিকটেই ২৮ নং লাট মণিরতটে প্রায় ৮ মাইল লম্বা একটি

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রাপ্ত পঞ্চবুদ্ধ
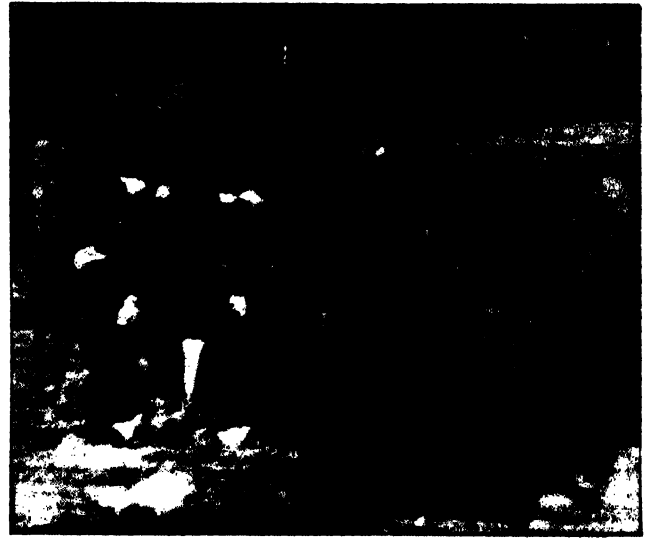
দক্ষিণ বারাশতের সেনপাড়ায় প্রাপ্ত সর্পছত্রতলে জৈন মূর্তি

গড় আছে। বর্তমানে এটি মণি নদীদ্বারা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ধ্বসডাঙা পর্যন্ত ৫ মাইল লম্বা, এখনকার মণিনদীর দক্ষিণ থেকে নলগোড়া পর্যন্ত প্রায় ২ মাইল লম্বা এবং আরও কিছু অংশ খাড়ি আবাদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (মণি নদীর পশ্চিমে) রাধাকান্ত পুরে অবস্থিত—যেটিও প্রায় ১ মাইল লম্বা। এই গড়ের প্রাচীরের প্রস্থ প্রায় ১৩৫ ফুট থেকে ১৪৫ ফুট এবং উচ্চতা ২৫ ফুট থেকে ৪০ ফুট। এই গড়ের নলগোড়া অংশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পূর্বোক্ত মঠবাড়ি (স্তূপ) থেকেই ভূমি খনন কালে ৭টি ব্রোঞ্জের মূর্তি, ২টি কালো পাথরের মূর্তি ও একটি সুন্দর কারুকার্য করা হংসাসন (নতুন ধরনের) পাওয়া গেছে। এই ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলির মধ্যে ২টি বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হারিতির মূর্তি রয়েছে। এই গড়ের উত্তর-পূর্বে, জটার দেউলের ১৫-১৬ কিমি উত্তরে অবস্থিত বাইশহাটার ঘোষের চকে দুটি সুবৃহৎ মঠবাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ দুটিকে স্থানীয় মানুষেরা এখনও মঠবাড়িই বলে। মঠবাড়ি দুটো প্রায় পাশাপাশিই অবস্থিত। এখান থেকে গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১৭৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে রেনেল সাহেব জরিপের সময় এখানকার মানচিত্রে এই মঠবাড়ি দুটিকে অরণ্যমধ্যে অবস্থিত সুবিশাল Pagoda বলে উল্লেখ করেছেন। কালিদাস দত্ত বলেছেন যে, "বড় স্তূপের Pagoda বা বৌদ্ধ মন্দিরটি জটার দেউলের ন্যায় একটি উত্তুঙ্গ মন্দির ছিল।" বর্তমানে এই স্তূপগুলি প্রায় ৪০ ফুট উঁচু এবং ৪-৫ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বর্তমানে ভগ্ন এই দুটিকে বৌদ্ধ মন্দির ও শ্রমণদের বাসস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আটঘরা প্রভৃতি অঞ্চলে উৎখননের পর এই মঠ দুটিতে উৎখনন চালান। রাজ্য প্রত্ন বিভাগ ভগ্নস্তূপগুলির বয়স এক হাজার বছরের কম নয় (১০ম-১১শ শতাব্দীর) বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বৌদ্ধ মন্দির দুটির পাশেই রয়েছে কয়েকটি কুয়োর ধ্বংসাবশেষ। মন্দির এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুদের আবাসস্থলটির একটি চওড়া ইটের রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত ছিল। ড্রেনের সুব্যবস্থা ইত্যাদিও দৃষ্ট হয়। রায়দিঘি ও তৎসহ অঞ্চলে অর্থাৎ জটার দেউল, নলগোড়া প্রভৃতিতে যে সমস্ত স্তূপের ধ্বংসাবশেষের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সবই

বৌদ্ধশ্রমণদের আবাসস্থল বলে রাজ্য প্রত্নবিভাগ অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র অনুমান করেছেন যে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ বিহার ছিল। পাল রাজত্বের পূর্বে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েঙ সাঙ সমতটে যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন এগুলি তার অন্তর্গত ছিল। এই বাইশহাটা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরনির্মিত চতুর্মুখ বৌদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধধর্মের একটি দিগদর্শনই বলা চলে। আর এই বাইশহাটার মঠবাড়ির উত্তরে ডলির-দমদমা পাণ্ডপুকুর গ্রামে যে অনিন্দ্যসুন্দর মুদ্রায় পাঁচটি বুদ্ধমূর্তি ও একটি ছোট্ট স্তূপ চারিদিকে খোদিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এটির গুরুত্ব ও সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এটি বৌদ্ধযুগের স্তূপের আকৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কুলুঙ্গির মধ্যে খোদিত বিভিন্ন মুদ্রায় বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি আলেখ্য, একটি গোল বেলে পাথরে তৈরী, এর গায়ে পাঁচটি বুদ্ধমূর্তি খোদিত। বর্তমানে এটি জয়নগরের কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই সংগ্রহশালাতেই আছে কঙ্কনদিঘিতে প্রাপ্ত ছোট বেলে পাথরের একটি প্রবুদ্ধ মূর্তি। ধ্যানরত বুদ্ধ এবং তাঁর চারপাশে শত শত মঠ ইত্যাদির ভাস্কর্যের চিহ্ন যুক্ত। গুপ্তযুগের এই মহামূল্যবান নিদর্শনগুলি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব যে সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই চলে আসছে তার পাথুরে প্রমাণগুলি ক্রমশই আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। এছাড়াও পাকুড়তলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ব্যবহার্য জিনিসপত্র, নানা প্রকার পাত্র, পুতুল ইত্যাদি মৌর্য-কুষাণ-শুঙ্গ যুগের বলে স্থির হয়েছে। এখান থেকে প্রাপ্ত মৌর্যযুগীয় তাম্র মুদ্রার (Punch Mark) একদিকে হাতি এবং অপরদিকে বৃক্ষ, চৈত্য ইত্যাদি দেখা যায়। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এগুলো বৌদ্ধ প্রতীক। গাছ ও স্তূপের চিহ্ন স্পষ্টতই বোধিবৃক্ষ এবং বৌদ্ধস্তূপের প্রতীক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাইশহাটা, মণিরতট, কঙ্কনদিঘি, জটার দেউল, হাতিয়াগড়, ঘাটেশ্বর, কাঁটাবেনিয়া, আটঘরা প্রভৃতি জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এক বিশাল জৈন-বৌদ্ধ জনজীবন যা তৎকালীন উন্নত গ্রাম-নগরগুলি ছাড়িয়ে যে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সম্ভবত এই ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ থেকে আদিগঙ্গা, মাতলা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি নদীবাহিত [illegible] প্রভাব বিস্তার করেছিল। অন্তত বোড়াল, বেহালা প[illegible] নজির পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের [illegible] পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত মৌর্য যুগ থেকেই খুবই সমৃদ্ধশা[illegible]র পশ্চাদপট আজকের কলকাতা থেকে সমগ্র চব্বি[illegible]পুত্র, মগধ পর্যন্ত বিস্তৃতি হওয়ায় এবং বহির্বাণিজ্যের [illegible] ভোগ করায় বৌদ্ধ ও রোমান প্রভৃতি সব রকমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটেছিল। অপরপক্ষে শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, জাভা, মালয়, সিংহল, চীন প্রভৃতি দেশে যেমন বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল বেশিরভাগ এই সমস্ত বন্দর দিয়ে; তেমনই ভারতে বৌদ্ধধর্মের দুর্দিনে ওই সমস্ত অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় স্রোতও সুন্দরবনের এই অঞ্চল দিয়েই অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল।

শেষ করব এক বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক মূর্তি আবিষ্কারের কথা বলে, যা থেকে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় এই দুই প্রতিবাদী ধর্মের সর্বজনীন চেহারালাভের এক দীর্ঘকালীন অবয়বকে নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। জায়গাটি লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ঘাটেশ্বর বা ঘাটেশ্বরা গ্রাম। ৭০-৮০ বছর আগে এখানে পুকুর কাটার সময় বহু প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত তিনটি জৈন মূর্তি পাওয়া যায়। সংস্কারবশে একটি পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়, একটি কোথাও উধাও হয়ে যায় এবং তৃতীয় মূর্তিটি কালিদাস দত্ত মহাশয় নিজে সংগ্রহ করে পরে আশুতোষ মিউজিয়ামে দান করেন। এ এক অপূর্ব আকর্ষণীয় প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি। মূর্তিটি নগ্ন, সুগঠিত, অপূর্ব শান্ত ভঙ্গিমায় সর্পফণার ছত্রতলে দণ্ডায়মান। মূর্তিটি বেশ বড়, উচ্চতায় সাড়ে তিন ফুট ও প্রস্থে পৌনে দু ফুট। মূর্তিটির দুই পাশে ১২ জন করে মোট ২৪ জন তীর্থঙ্করের ছোট ছোট মূর্তি খোদিত। তার নিচে ছয় জন করে বারোজন তীর্থঙ্করের যোগাসনে বসা ছোট ছোট মূর্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথের এই মূর্তিটির পাদপীঠের উপর আদিনাথের বিশেষ লাঞ্ছনচিহ্ন, একটি উপবিষ্ট বৃষ মূর্তি দেখা যায়।

সুতরাং জৈন-বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতি লাঞ্ছিত তৎকালীন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এই অঞ্চল যে এক সমৃদ্ধশালী নগরাঞ্চল ছিল তার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পাই। নদী সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হওয়ায় যাতায়াতের সুবিধা, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য যে আদানপ্রদান এবং এক একটি শান্ত ও নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন তা এই অঞ্চলের তৎকালীন পরিবেশ, নৌ যাতায়াত বাণিজ্য সুবিধাজনিত অবস্থায় ছিল। সর্বোপরি ছিল রাজানুকূল্য ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে পাল, সেন যুগ পর্যন্ত সৃষ্ট এবং এই অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, ওজন করার বাটখারা, ফলক, মূর্তি, স্তূপ, জৈন ও বৌদ্ধ মৃন্ময়মূর্তি, ইট এবং গৃহ নির্মাণের গঠনরীতি আমাদের পরিষ্কার বলে দেয় যে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকেই দীর্ঘ সময় ধরে জৈন-বৌদ্ধধর্মের গতি অব্যাহত ছিল।

তথ্যসূত্র

১। বাংলা ও বাঙালী[illegible]—[illegible]পুর।
২। বাঙালীর ইতিহাস [illegible]
৩। বাঙলার ইতিহাস—[illegible]পাধ্যায়।
৪। দেবায়তন ও [illegible] চট্টোপাধ্যায়।
৫। দক্ষিণ চব্বিশ-প[illegible]দাস দত্ত।
৬। দঃ ২৪ পরগণা [illegible]সের উপকরণ— কৃষ্ণকালী মণ্ডল।
৭। নিম্ন গাঙ্গেয় অ[illegible]—সুধীন দে।
৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন।
৯। Corpus of Bengal Inscriptions—Mukherjee & Maity.
১০। গঙ্গারিডি গবেষণাপত্র মাসিক পত্রিকা সংকলন (১৯৯১-৯৬)—নরোত্তম হালদার।
১১। গঙ্গারিডি আলোচনা ও পর্যালোচনা—নরোত্তম হালদার।
১২। লেখকের ক্ষেত্রানুসন্ধান।

লেখক পরিচিতি : আঞ্চলিক ইতিহাস ও প্রত্ন-গবেষক।

সুন্দরবনের সংরক্ষিত অঞ্চলের প্রশাসনিক ইতিহাস (ব্রিটিশ-পর্ব)

১

"বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত বঙ্গোপসাগর কূলবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগের নাম, সুন্দরবন।।" ২১°৩১´–২২°৩৮´ উত্তর; ৮৮°৫´–৯০°২৮´পূর্ব। নিম্ন বঙ্গে গঙ্গা যেখানে বহুশাখা বিস্তার করে সাগরে এসে মিশেছে, প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদসংকুল চরভাগ সুন্দরবন নামে পরিকীর্তিত। পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহানা থেকে পূর্বে মেঘনার মোহানা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। মেঘনার মোহানারও পূর্বে অর্থাৎ নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলার এবং হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত বনভাগকেও কেউ কেউ সুন্দরবনের অন্তর্গত বলে মনে করেন। এই অংশ বর্তমানে চব্বিশ পরগনা, খুলনা এবং বাখরগঞ্জ—এই তিনটি জেলার অন্তর্গত এবং এই তিনটি জেলার যে-অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তাধীন, তার দক্ষিণভাগে অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিমে সুন্দরবনের দৈর্ঘ্য ১৬০ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে এর প্রস্থ পশ্চিম দিকে ৭০ মাইল থেকে পূর্ব দিকে ৩০ মাইলের বেশি হবে না। গড়ে বিস্তৃতি ৫০ মাইল ধরলে, সুন্দরবনের পরিমাণ ফল দাঁড়ায় ৮ হাজার বর্গমাইল। পশ্চিমে ভাগীরথী থেকে কালিন্দী নদী পর্যন্ত চব্বিশ পরগনা, কালিন্দী থেকে মধুমতী নদী পর্যন্ত খুলনা জেলা এবং মধুমতী নদী থেকে মেঘনার মোহানা পর্যন্ত বরিশাল জেলার অন্তর্গত।"(১)

১৭৭০-এ ক্লড রাসেল সুন্দরবন আবাদ করলেন। এরপর ১৭৮৪-তে টিলম্যান হেংকেলের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৭-তে ২৩ নং রেগুলেশান অনুসারে সুন্দরবনের শাসনব্যবস্থা পৃথকভাবে দেখানো হয় এবং উক্ত বিধানবলে "Commissioner's of Sundarbans' পদের সৃষ্টি হয়ে সুন্দরবনের শাসনব্যবস্থা শৃঙ্খলিত হয়। ১৮২২-৩০ এর মধ্যে লেফটেন্যান্ট হজেস সুন্দরবন জরিপ করেন। আলিপুর হল সর্বপ্রথম সুন্দরবনের Head quarter। আর জানা গেল যে, সুন্দরবন পূর্বে সংরক্ষিত ছিল না। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে সমগ্র বনবিভাগ জমিদারদের ভোগদখলে ছিল। তখন বনবিভাগের জন্য কোন সরকারি অফিস স্থাপিত হয়নি। গেজেটিয়ার প্রণেতা Mr. O'malley-র মতে, "১৮৬৬ খৃঃ অব্দের পূর্বে সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আদায়ের কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।"

খ্রিঃ ১৮৭৩ অব্দে নির্মিত এলিসন (Ellison) সাহেবের 'সুন্দরবন' নামক মানচিত্রের ওপরে চব্বিশ পরগনা জেলার শেষতম দ্বীপ 'দুলভাসানি' ('পূর্বাশা' বাদে) থেকে স্কেল ফেলে দেখা গেছে, উত্তরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৪ মাইল। সমগ্র বসিরহাট, বারাসাত ও বনগ্রাম মহকুমা সমেত সমগ্র অঞ্চল সেদিনের সুন্দরবনের মধ্যে ছিল, তা ওই মানচিত্র থেকে জানা যায়। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী : "(1) A vast tract of forest and swamp, extending for about 170 miles along the seaface of the Bay of Bengal from the estuary of the Hooghly to that of the Meghna and running in land to a distance of from 60 to 80 miles. The most probable meaning of the name is the 'forest of sundri' (Heritieralittoralis), this being the characteristic tree found here. The tract lies between 21° to 31' and 22° 38'N. and 88°5' and 90°28'E. With an area of 6,526 square miles of which 2,941 are included in the District of Twenty four Parganas, 2,688 in Khulna, and 897 in Backergunge.(২)

(2) "Lat. 21° 30' 40" to 22° 37' 30"N Long 88° 4' 30" to 91°14'E. The Sundarbans occupy an area of 7532 square miles; their extreme length along the coast is about 165 miles and their greatest breadth from north to south about 81 miles."(৩)

আরেক দিকে এগিয়ে এলেন দুই দিকপাল ইংরেজ মিঃ ডাম্পিয়ার ও মিঃ হজেস। এঁরা দুজনে মিলে সুন্দরবনের চতুঃসীমা নির্ধারণের কাজ আরম্ভ করেন ১৮২২ সালে ও শেষ করেন ১৮৩০ সালে। সেই মানচিত্রে দেখা যায় যে, সুন্দরবনের সীমা উত্তর-পূর্বে বসিরহাট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কুল্পির নিকটবর্তী হুগলী নদী পর্যন্ত, পূর্বে ইছামতী, কালিন্দী ও রায়মঙ্গল নদী। আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে হুগলী নদী। এখানে উল্লেখ্য যে, মিঃ ডাম্পিয়ার ও মিঃ হজেস খুশীমত এই সীমা নির্দেশ করেন নি। সেদিনে যে ভূভাগটুকু সুন্দরবন নামে পরিচিত ছিল, সেটাকেই রেখা টেনে তাঁরা সীমায়িত করেছেন। পরে সেইটাই 'ডাম্পিয়ার-হজেস লাইন' প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পূর্বোক্ত এলিসন সাহেবও সম্ভবত মোটামুটিভাবে ওই লাইনকেই অনুসরণ করে তিনি তাঁর মানচিত্র তৈরি করেন। এই সুন্দরবন মোট পনেরোটি থানা নিয়ে গঠিত; যথা,—(১) সাগর (২) কাকদ্বীপ (৩) নামখানা (৪) মথুরাপুর (৫) পাথরপ্রতিমা (৬) জয়নগর (৭) কুলতলি (৮) ক্যানিং (সাবেকী নাম মাতলা) (৯) বাসন্তী (১০) হাড়োয়া (১১) মিনা খাঁ (১২) সন্দেশখালি (১৩) গোসাবা (১৪) হাসনাবাদ ও (১৫) হিঙ্গলগঞ্জ। এই ১৫টি থানার মোট আয়তন ৯,৬২৯.৯ বর্গ কিলোমিটার। তন্মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৪,২৬৩.১ বর্গ কিঃ মিঃ। গত ১লা মার্চ, ১৯৮৬ তারিখে ২৪-পরগনা জেলা বিভক্ত হয়ে 'উত্তর-চব্বিশ পরগনা' ও 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা' নামে দু'টি জেলায় পরিণত হয়। উত্তর ২৪-পরগনায় মোট থানা ৬টি : হাড়োয়া, মিনা খাঁ, সন্দেশখালি, গোসাবা, হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ (বসিরহাট মহকুমা) আর দক্ষিণ ২৪-পরগনার অন্তর্গত বাকী ৯টি (ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুর (সদর) মহকুমা। সৌভাগ্যবশত উক্ত 'ডাম্পিয়ার-হজেস' লাইনটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই পড়েছে। এ-সম্বন্ধে তৎকালীন সরকারের রিপোর্ট হলো এই যে—"Mr. W. Dampier, Sunderban Commissioner, and Lieutenant Hodges, Surveyor, 1828,-Mr. William Dampier, who had held charge of the sundarbon office for some five months in 1827 was again appoi... to ... February 1828, when revised scheme was ... Lieutenant Alexander Hodges was appoint... ...or in January 1828, and the instructions ... were to accompany Mr. Dampier and su... ...dary of the forest as the latter defined i...

(Chapter V–D... the Boundry of the Sunderbans Forest, ... 23—Revenue History of the Sundarbans—... 1870"—by Frederick Eden Pargiter, B.A. ... Service, Commissioner in the Sunderbans. ...

কিন্তু এসবই বিভা... ও পশ্চিম নিয়ে এই হিসাব। বিভাগ-উত্তর পর্বের হি... আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব। ব্রিটিশ-রাজত্বের ... ভাঙা-গড়ার ইতিহাস রচিত হয়েছে, বলাবাহুল্য যে, ...-পূর্ব পর্বে।

সুন্দরবনের আয়... নং নিয়ে রেকর্ডে রেকর্ডে কিছু মতান্তর থাকলেও ... হাসিলের সঙ্গে সঙ্গে এর

সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল

নতুন নতুন জরিপে আয়তনের সীমারও পরিবর্তন ঘটে গেছে। সুন্দরবনের বর্তমান মানচিত্রগুলি খুললে দেখা যায়, লট নং গুলি কেবলমাত্র বন-হাসিল করা আবাদী বা বাসযোগ্য অঞ্চলগুলির ওপর প্রযুক্ত হয়েছে এবং এগুলি দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সীমাবদ্ধ হয়েছে। পূর্বাঞ্চলে লট নং সামান্যই পড়েছে। ইংরেজি অক্ষর A থেকে L পর্যন্ত মোট ১২ টি প্লটে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনকে ভাগ হয়েছে এবং মোট লট নং ১৬৩টি, স্থানান্তরে (মানচিত্রে) ১৬৭টি।

এই সুন্দরবন, যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের পতনের (খ্রিঃ ১৬০৮/১০) পর দীর্ঘকাল সভ্য সমাজের লোকচক্ষুর অন্তরালেই পড়েছিল। এমনকি আবুল ফজলও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরি' (খ্রিঃ ১৫৮৬)-তেও এর উল্লেখ করেননি। প্রথম সূত্রপাত করলো বৃটিশ প্রশাসন, তা প্রজা-হিতৈষণার জন্য হোক অথবা রাজত্বের আয় বৃদ্ধির জন্যই হোক। তাই বলতে হয়, ইংরেজ আমলেই সুন্দরবনের পুনরভ্যুদয়ের সূচনা।

ইংরেজ সরকার কেবল সুন্দরবন নয়, ভারতের সমস্ত প্রাচীন বনাঞ্চল নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। তাদের ইতিহাস তৈরি করেছেন এবং দেশের কল্যাণে বনকে সুরক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

ডঃ অ্যান্ডারসনের পদত্যাগের পর। খ্রিঃ ১৮৬৮/৬৯ সালে সুন্দরবনের অরণ্য সংরক্ষণের প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু ভারত সরকারের কাছ থেকে এর জন্য অতিরিক্ত কার্যালয় স্থাপন ও কর্মচারী নিয়োগের আদেশ না আসা পর্যন্ত বঙ্গদেশ সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সুন্দরবনের বন সংরক্ষণের প্রশ্নটি স্থগিত রাখতে মনস্থ করলেন। ১৮৭৬ সাল থেকে বন বিভাগ বিভিন্ন বনাঞ্চল পর্যবেক্ষণের কাজে অধিকতর সময় ব্যয় করতে থাকেন এবং এর ফলে ৩,৩৯০ বর্গ মাইল এলাকা সংরক্ষিত সরকারি বনভূমি বলে নথীভুক্ত হয়। বাংলার বনদপ্তর, যে ক'টি বনবিভাগ নিয়ে সেদিন গঠিত হয়েছিল, 'সুন্দরবন বিভাগ' ছিল ৪ নং এবং এর সংরক্ষিত অঞ্চলের আয়তন ছিলো ১৫৮১ বর্গমাইল।
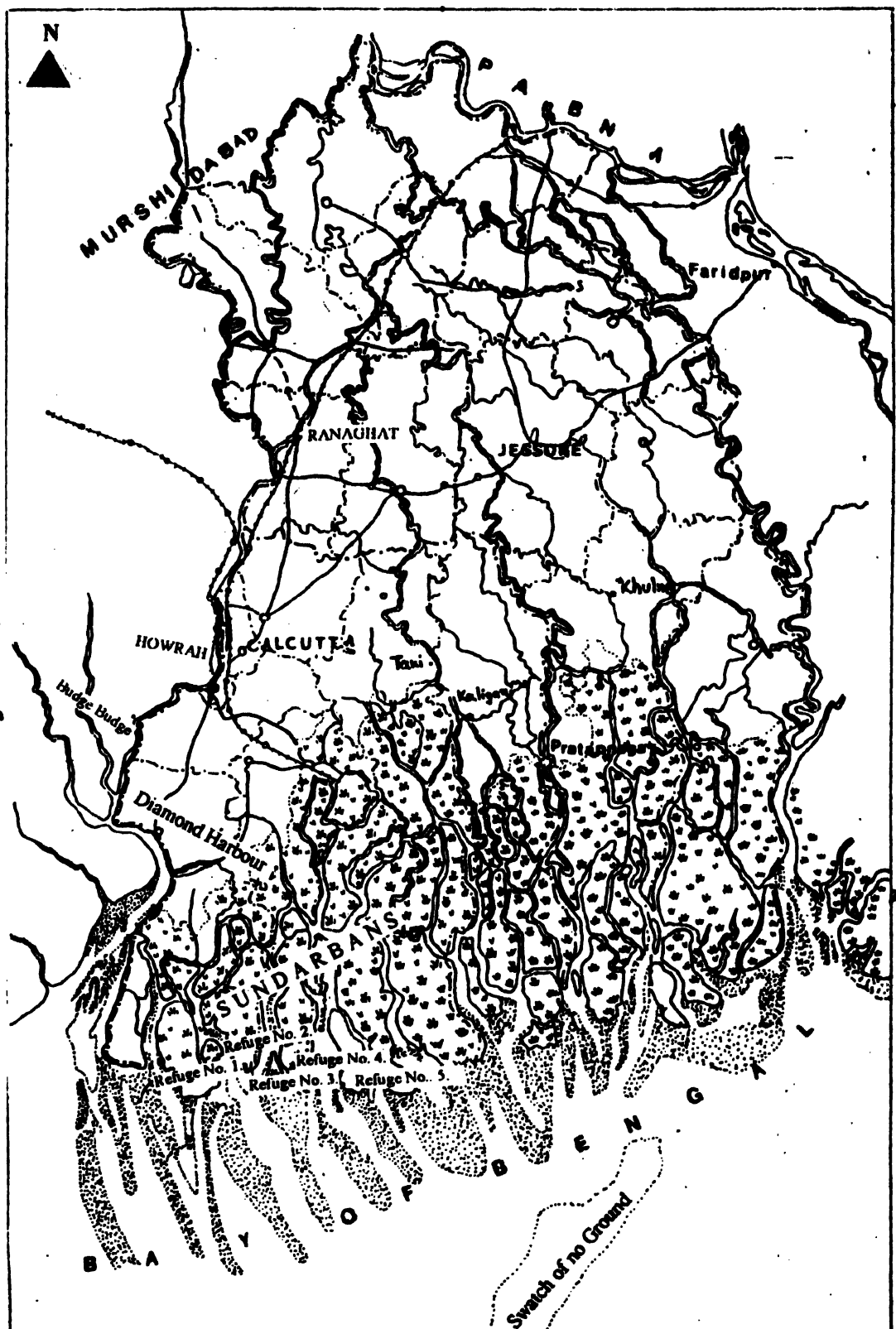
Map - 5. The Presidency Division
(Comprising the Districts of 24 Parganas, Nadiya & Jessor)
Under The Jurisdiction of the Lieut Govt. of Bengal
(Source : W.W. Hunter (1875). A Statistical Acount of Bengal, Volume - I.)
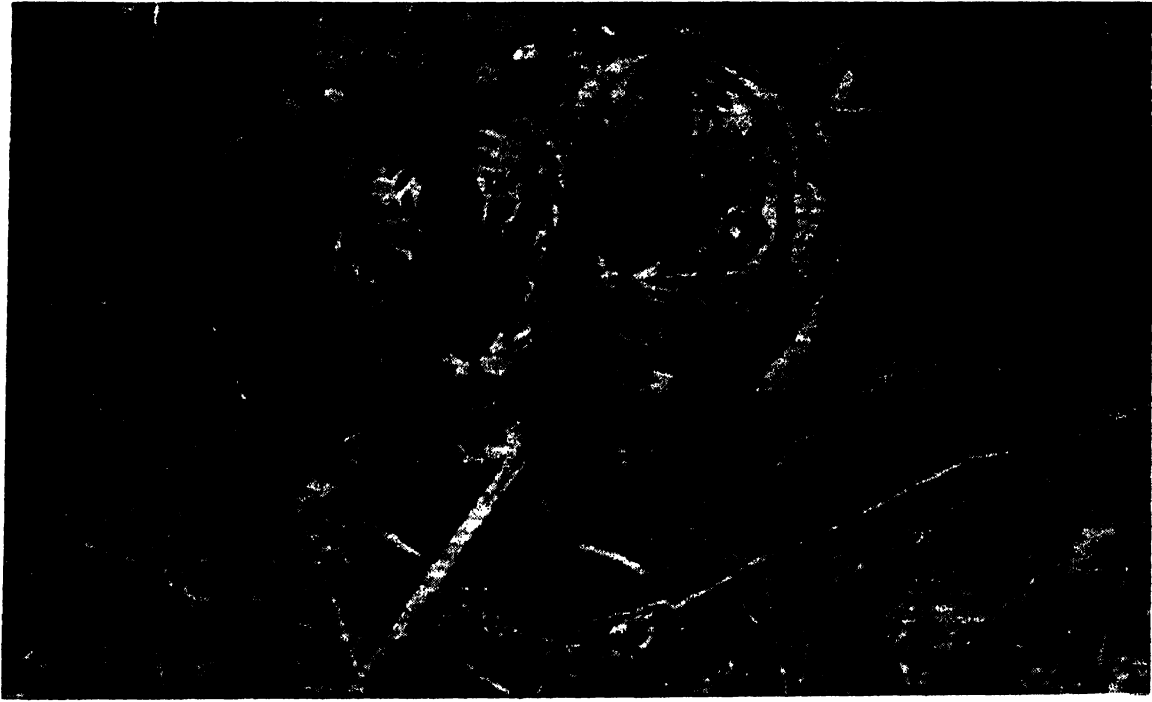
বন্যেরা বনে সুন্দর

১৯০৫-৬ সালে তথাকথিত বঙ্গ বিভাগের পর জলপাইগুড়ি, বক্সা ও চট্টগ্রাম—বনবিভাগের ভার পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের ওপর অর্পিত হল। ১৯১২ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে আলাদা করে বিহার ও ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হল। বিহার ও ওড়িশায় অবস্থিত বনবিভাগগুলি ওই নব গঠিত প্রদেশের মধ্যে চলে যায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গ বনবিভাগ, যেগুলি ১৯০৫-০৬ সালে হস্তান্তরিত হয়েছিল, সেগুলি আবার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ফিরে আসে। যতগুলি বিভাগ নিয়ে 'বেঙ্গল সার্কেল' গঠিত হয়, তার মধ্যে সুন্দরবন হচ্ছে ৬ নং।

১৯২৭ সালের ১৬ই ... 'বেঙ্গল সার্কেল'কে উত্তর ও দক্ষিণ, এই দু'টি ভাগে ভা... যতগুলি বিভাগ সাদার্ন সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত হয়, সু... ...নং।

১৯৩৬ সালের জুন ... বিভাগ' (utilisation Division) খোলা হল এবং ... দার্জিলিং থেকে এনে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা ... ...লের ১৫ই অগাস্ট বঙ্গ বিভাগ এবং ১৯৫৩ সালে ... ...চ্ছেদের ফলে। ১৯৪৭ ও ১৯৫৩ সালে বন-প্রশাস... পুনর্বিন্যাস সাধিত হল। ১৯৪৭ সালে চারটি বড় বড় ... বিভাগ রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়। সেই চারটি হল— ... পার্বত্য অঞ্চল, খুলনা ও বরিশাল জেলার অন্তর্গ... ...গর অংশ এবং ঢাকা—ময়মনসিং বিভাগ। অপর ... ডিভিশন ও সেন্ট্রাল ডিভিশান নামে দুটি নতুন ... ...ল।

'সুন্দরবন বিভাগে'র ... ...বঙ্গের মধ্যে পড়ে তার নামকরণ হয়—"২৪-পরগ... পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ৯ই জুলাই সরকারি ... ...০ দ্রষ্টব্য] ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট বঙ্গ বিভা... ... সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের বন-প্রশাসনিক সংগঠনে দক্ষিণ কেন্দ্র ২৪-পরগনায় এক বন অধিকর্তা (Director of Forest)-র পদ সৃষ্ট হয়।"[৪]

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুন্দরবনের বিস্তৃতি ছিলো পশ্চিমে, পঃ বঙ্গের হুগলী নদী থেকে পূর্বে ২৪-পরগনার মধ্য দিয়ে যমুনা, বাখরগঞ্জ পর্যন্ত। এই সমস্ত জেলার স্থিরীকৃত উত্তর সীমানাই ছিল সুন্দরবনের উত্তর সীমানা। এখানে কেবল ২৪-পরগনার অরণ্যের কথাই বলা হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাতক্ষীরা মহকুমা ছিল ২৪-পরগনার একটা অংশ। কিন্তু সাতক্ষীরা বর্তমানে 'বাংলাদেশে'র অন্তর্গত হওয়ায় ওই অঞ্চলকে আলোচনার বাইরে রাখা হচ্ছে।

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সমগ্র ভূখণ্ড, মায় কলকাতার উপকণ্ঠ পর্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ, অনাবাদী ছিল। খ্রিঃ ১৭৭৩ সালে কালেকটার জেনারেল মিঃ ক্লড রাসেল জঙ্গল হাসিল করে চাষাবাদ করার জন্য এই ভূভাগ কিছু কিছু লোককে ব্যক্তিগতভাবে ইজারা দেন। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল, ব-দ্বীপের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই বিস্তীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড, যা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যা জলদস্যু এবং হিংস্র বন্যজন্তুদের আবাসস্থল, তাকে রাজস্ব-প্রসূত ভূ-ভাগে পরিণত করা।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত জমিগুলির, সুন্দরবনের ধার বরাবর পাশে কোনও অপরিবর্তনীয় সীমারেখা ছিল না। বন হচ্ছে সরকারের সম্পত্তি। সুতরাং, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় সে পড়েনি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত এর সঠিক আয়তন জানা ছিল না। এর আয়তন ৩,২০০ বর্গ মাইল মনে করা হত। ১৮১৭ সালে রাজস্ব বিভাগের নজরে আসে যে, স্থানীয় জমিদারেরা লবণকর এবং বনকর বাবদ বেশ কিছু টাকা বনাঞ্চল থেকে আদায় করছে। ১৮১৮ সাল

নাগাদ ব্রিটিশ সরকার রেগুলেশন ৩নং আইন প্রবর্তিত করে এই সমস্ত জঙ্গলে সরকারের মালিকানা পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ প্রমাণ ছিল, সেই সব অংশকে আইনের বাইরে রাখা হয়। কিন্তু এর বহুকাল পরে ১৮৫৩ সালে সরকার ঘোষণা করেন যে, সুন্দরবন-সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য হল, যত শীঘ্র সম্ভব বনহাসিল করে জমিতে চাষাবাদ করা এবং এর দ্বারা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩০-এর দশকে জমিবিলি (grant rules) আইন সংশোধন করা হয়। এই বাবদ প্রচুর দরখাস্ত আসতে থাকে, যার অধিকাংশই কলকাতায় বসবাসকারী ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে। তাঁরা সুন্দরবনের বিভিন্ন অংশ হাসিল করে আবাদ করতে চান। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে সরকার এই রকম বহু দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। ১৮৩২ সালে ব্রহ্মদেশের (বর্মা) কনজারভেটার অব্ ফরেস্ট ডঃ ব্র্যান্ডিস একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন এবং বাংলার অরণ্যসমূহকে রক্ষা করার অভিপ্রায় তাতে প্রকাশ করেন। এই সময় ২৪-পরগনার অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন ছিল ১৮৬০ বর্গমাইল। ডঃ ব্র্যান্ডিসের প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকার বন হাসিল করার জন্য নতুন দরখাস্ত অনুমোদন বন্ধ করে দেন এবং 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি' নামক একটি সংস্থাকে জঙ্গলগুলির কার্য পরিচালনার ভার দেন। এর ফলে, নানা কাজে যারা জঙ্গলে আসা-যাওয়া করত, তাদের ওপর 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি'র কর্মচারিদের অত্যাচার এবং জুলুমবাজি খুব বেড়ে গেল। প্রধানত এই কারণেই ১৮৬৮ সালে এই বন্দোবস্ত বাতিল হয়ে যায়।

১৮৭২-৭৩ সালে মিঃ হোম্ (সহ বনরক্ষক) এবং ডঃ স্লিচ (বনরক্ষক), এই দুজনে মিলে একটি সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনায় বনকে রক্ষা করা অপেক্ষা বনজ সম্পদের রপ্তানী-সংক্রান্ত বিধি-নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। এই সময় সরকার নিয়ন্ত্রিত বনের আয়তন ধরা হয় ১৭২৩ বর্গমাইল। ১৮৭৮-৭৯ সালের মধ্যে, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৮ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিতে ২৪-পরগনা জেলার বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার এবং বারুইপুর মহকুমায় ১৮৫১ বর্গমাইল অঞ্চলকে সংরক্ষিত বন ("Protected forest") বলে ঘোষণা করা হয়। তার ভৌগোলিক বিভাগগুলি নিম্নোক্ত রূপ ঃ

বন বিভাগের মহকুমা			
বন বিভাগের মহকুমা...	ডায়মণ্ডহারবার...	আনুমানিক...	৫৩০ বর্গমাইল
" "	বারুইপুর	"	৩২১ " "
" "	বসিরহাট	"	১০০০ " "
	মোট		১৮৫১ " "

১৮৭৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২৪ বর্গমাইল পরিমিত নতুন এলাকা সংরক্ষিত এলাকার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এর ফলে মোট সংরক্ষিত বনাঞ্চল দাঁড়ায় ১৮৭৫ বর্গমাইল। ১৯২৮ সালের ৯ই অগাস্ট তারিখের নোটিফিকেশন ১৫,৩৪০ ফরেস্ট নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বসিরহাট মহকুমায় ৭০,১৭৮০ একর বা ১০৯৭ বর্গমাইল নিষিদ্ধ ("Protected") জঙ্গলকে সংরক্ষিত ("Reserved forest") বলে পুনরায় নতুন করে ঘোষিত হয়। বর্তমানে এই বিভাগের (Sunder vana Division) মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ হল ১৬৪৬ বর্গমাইল। যার মধ্যে ১৬৩০ বর্গমাইল

একটি মৎস্যজীবী পরিবার

সংরক্ষিত ("Reserved"), ১৫ বর্গমাইল হল নিষিদ্ধ ("Protected") এলাকা এবং ১ বর্গমাইল এলাকা নাম-গোত্রহীন সরকারি বন ("1 sqr. mile of Unclassed state forest.")।

এর থেকে দেখা যায়, গত ৬৩ বৎসরের মধ্যে ২২৯ বর্গমাইল বনাঞ্চল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন সব উদ্দেশ্যে, যার সঙ্গে বন-সংরক্ষণের কোনও সম্পর্ক নেই। আবার ১০০ বছরের হিসেব নিলে দেখা যাবে, এই হ্রাসের পরিমাণ ৫০০ থেকে ৬০০ বর্গ মাইলে এসে দাঁড়ায়। এই সমস্ত এলাকার মধ্য দিয়ে বহু নদী, খাল এবং খাঁড়ি প্রবাহিত হয়েছে। এই গুলির জল-আয়তন (Water area) ৬৮৭ বর্গ মাইল। বর্তমান মোট ১৬৪৬ বর্গ মাইলের বনাঞ্চলের মধ্যে এই ৬৮৭ বর্গ মাইলও ধরা হয়েছে। এছাড়া, নদী বা খাঁড়ির ধার বরাবর যেখানে জঙ্গল নেই, সেখানে বালু, চর, যার আয়তন আনুমানিক ৫৯ বর্গমাইল। ফলে, ঠিক বন বলতে যা বোঝায় তার, আয়তন মাত্র ৯০০ বর্গ মাইল।

১৮৭১-৭২ সালে সহকারী বনরক্ষক মিঃ এ এল হোম সুন্দরবনের গরান জঙ্গল পরিদর্শন করেন। তৎকালীন বাংলার ছোট লাট রিচার্ড টেম্পলও এই জঙ্গল দেখে যান এবং বনরক্ষক মিঃ স্লিচ এখানে কয়েকদিন কাটিয়েও যান। মিঃ স্লিচ মন্তব্য করেন যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি জমে জমে সুন্দরবন গঠিত হওয়ায় এর সমুদ্রের ধারবরাবর সীমা সব থেকে নীচু এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক ক্রমশঃ উঁচু ইত্যাদি। এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৭১ সালে সুন্দরবন, জেলা চব্বিশ পরগনার সঙ্গে যুক্ত হল। পরবর্তী আর একটি সরকারি দল যখন বন পরিদর্শনে যায়, তখন আর সুন্দরী (বা সুঁদ্রী) এবং গোলপাতার গাছ একেবারেই নেই। আর যেগুলি আছে, তার উচ্চতাও অপেক্ষাকৃত কম। সুন্দরবনের ৯০০ বর্গমাইলের মধ্যে আছে খর্বাকৃতি গরান জাতীয় গাছের জঙ্গল।"

লেখকের মতে—"ভূতত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে সুন্দরবন অঞ্চলের জন্ম বেশ সাম্প্রতিক। এর গঠনপ্রণালী বাংলার অন্যান্য অংশের মতই অর্থাৎ নদীবাহিত পলিমাটি জমে গড়ে উঠেছে। হিমালয়

SUNDARBANS OF BANGLADESH

থেকে নদীর প্রবাহের ফলে মাটির যে ক্ষয় হয়েছে, তাই জমে জমে পলিমাটির স্তরে পরিণত হয়েছে। অনুমান করা হয়, ছয় থেকে সাত হাজার বছর আগে সমস্ত সুন্দরবনাঞ্চল সমুদ্রগর্ভে ছিল। (উল্লেখ্য যে, "ছয় থেকে সাত হাজার বছর আগে"—এই সময়সীমা ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত) এই পলি জমে ওঠার ক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। ভাটার সময় নদীর জলের টানে মা [illegible] পসাগরে পড়ছে আর জোয়ারের সময় সমুদ্রের স্রো [illegible] কে ঠেলে ডাঙার দিকে নিয়ে আসছে। এই টানা-পোড়ে [illegible] টকে যাচ্ছে, সেই পলি জমে জমে নিত্য নতুন চর [illegible]

এই হল মোটামুটিভাবে [illegible] কথা। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অরণ্যগুলিকে সেদিনকা [illegible] বে একেকটি ভাগে বা বিভাগে বিভক্ত করে তাদের [illegible] য় একজন করে কর্তা বা অধিকর্তাকে বসিয়ে অরণ্য [illegible] প্রশাসনিক স্তরে উন্নীত করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে [illegible] রে সেই কাহিনী আমরা শুনলাম। এইবার আমরা সে [illegible] ত্রে অবতীর্ণ হব, দেখব কেমন করে ও কীভাবে রা [illegible] আদালতের আওতায় এনে এর প্রশাসনকে দৃঢ় ক [illegible]

২

খ্রিঃ ১৮৬৮/৬৯ সালে [illegible] প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে: কিন্তু বন হাসিলের [illegible] এই কাজ সুরু হয় অরণ্য সংরক্ষণ প্রচেষ্টারও ঢের আগে [illegible], ১৭৮১ সালে টিলম্যান হেংকেল সুন্দরবনের সীমা [illegible] নির্ধারণ করেন এবং সুন্দরবনের উন্নয়নে উদ্যোগী হন। ইনিই সেই যশোহর জেলার (অধুনা 'বাংলাদেশ') প্রথম জজ ম্যাজিস্ট্রেট হেংকেল সাহেব, যিনি নিজ নামে 'হেংকেলগঞ্জ' নাম দিয়ে সুন্দরবন আবাদের জন্য প্রধান একটি নগর স্থাপন করেন। সেই নগরের আজকের নাম 'হিঙ্গলগঞ্জ'; এই জেলার পূর্ব সীমান্তের হিঙ্গলগঞ্জ বর্তমানে একটি বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র।

১৭৮৫ সালে সমস্ত সুন্দরবনকে কাকদ্বীপের নিশ্চিন্তপুরের পশ্চিমে ১নং লাটধানী, উত্তর চন্দননগর থেকে আরম্ভ করে ১৬৭টি লটে (lot) বিভক্ত করা হয় ও ৯৯ বছরের জন্য বিভিন্ন লটদারকে লিজ (Lease) দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ইংরেজ আমলে সুন্দরবন জরিপ করে যে-মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়, তাতে সেই জরিপ করা ভূখণ্ডকে ইংরেজি অক্ষর A থেকে L পর্যন্ত, মোট ১২টি প্লটে এবং ১৬৭টা অংশে বিভক্ত করা হয়। এই অংশগুলিই Lot বা লাট নামে খ্যাত—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তবে এই জরিপটা হয়েছিল এই জেলার (২৪-পরগনা) দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ দিক থেকে পূর্বদিকের কিছুটা পর্যন্ত। বসিরহাট মহকুমার হেমনগর, সামসের নগরের দক্ষিণে ক্ষীণকায়া নদীটির পরপার পর্যন্ত পূর্বদিকে লট নং শেষ। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে শোনা গেল, নদীটার নাম, জেল্লা।

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজের ভার ১৮১৬ সালের রেগুলেশান নং ৯ অনুসারে, ওই বছর থেকেই একজন কমিশনারের ওপর ন্যস্ত হয়। ওই কমিশনারকেই জমি-রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে সুন্দরবনের প্রশাসনিক কাজকর্ম জেলার সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে একই রকম রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হলে পর, ওই আগের ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়। এরপর বেশ কিছু দিন ডিস্ট্রিক্ট অফিসার সুন্দরবনের প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, বস্তুতপক্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণের পর ১৭৭০ সালে ২৪-পরগনার কালেক্টার জেনারেল মিঃ ক্লড রাসেল (Mr. Claud Russell) প্রথমে সুন্দরবন হাসিল করে লোকবসতির ব্যবস্থা করেন। তারপর টিলম্যান হেংকেল অবতীর্ণ হন ১৭৮১ সালে। (যদিও ১৮৩০ সালের পূর্বে ব্যাপকহারে অর্থাৎ চোখে পড়ার মতো মনুষ্য বসতির নিদর্শন এই ব্রিটিশ পর্বে পাওয়া যায় না) এ বিষয়ে মিঃ ফ্রেডারিক ইডেন পার্জিটার সাহেব, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এ রেভিনিউ হিস্ট্রি অব্ দি সুন্দরবন্‌স্' (১৯৩৪) গ্রন্থে লিখেছেন, "২৪ পরগণা যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হয়, তখন এই জেলা এমন কি কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও অনাবাদী। এই অঞ্চল হাসিল করে চাষাবাদের উদ্দেশ্যে তৎকালীন কালেক্টর জেনারেল মিঃ ক্লড রাসেল ১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যে কিছু লোককে ব্যক্তিগত ইজারা দেন। এই ইজারা অবশ্য কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে দেওয়া হয়েছিলো।"[৩]

১৮৩০ সালে জরিপ করে জমিদারীর পত্তন করা হয়। পরে একটি আইনের বলে ঘোষণা করা হল যে, ৩০ বছরের মধ্যে লীজ গ্রহীতাদের $\frac{১}{৮}$ অংশ বন হাসিল করে জমিকে কৃষি উপযোগী করতে হবে।

১৯০৫ সালে সুন্দরবন-আইন (Bengal Act. I) বিধিবদ্ধ হয় এবং এর দ্বারা ১৮১৬ সালের Regulation-9 আইন বাতিল হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন কমিশনারের পদটিও বাতিল বলে গণ্য

হয়। আর ওই কমিশনারের কার্যভার খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ২৪-পরগনার কলেক্টারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কেননা, এই তিনটি জেলার মধ্যেই সুন্দরবনের বিস্তৃতি। দেশ স্বাধীন হবার (১৯৪৭) পূর্ব পর্যন্ত ১৯০৫ সালের এই বন্দোবস্তই কার্যকর থাকে। ১৯১৩ সালের ১৫ই অক্টোবর জেলার সীমানা পুনরায় সংশোধন করা হয়। তারপর ১৯৪৭ সালের ১২ই অগস্ট ঘোষিত হল, 'র‍্যাডক্লিফ-অ্যাওয়ার্ড'।"

১৯১৫ সালে নতুন একটি আইনবলে সমগ্র সুন্দরবনকে 'রায়তি' ব্যবস্থার অধীনে আনা হল। খাসমহল বিভাগে এদের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকর্তা ছিলেন। এইটাই ছিল সুন্দরবনের শেষতক বিলি-ব্যবস্থা।

এতক্ষণ ধরে কেবল প্রশাসনিক বিবরণটুকু জানা হল। জরিপের বিবরণ এখনও পুরোপুরি জানা হয়নি। সে-ইতিহাস আরও দূর বিস্তৃত এবং সুন্দরবন সম্পর্কে কিছু ভিন্নতর।

৩

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ১৭৬৫ সালে যখন এই জেলার (২৪-পরগনা) শাসনের কাজ শুরু করেন, তখন বেশি দূরে নয়, এই ডায়মন্ডহারবারও (প্রাচীন নাম, হাজিপুর) ছিল বনময়। আবাদী জমি ছিল বললেই হয়, বিশেষত পূব দিকে। "গ্রামের সাত মাইলের মধ্যে ছিলো সুন্দরবনের সীমা।"[৭] আর আজকের কলকাতার গড়ের মাঠে সেদিনকার লর্ড ক্লাইভ যে বাঘ শিকার করেছিলেন, এ কথা তো অনেকেই জানেন।

শাসনকার্য শুরু করার আগেই ইংরেজরা এ অঞ্চলের জরিপের কাজে মনোযোগ দেন। এই দুঃসাধ্য অথচ অপরিহার্য কাজটির সূচনা করেন উইলিয়াম ফ্র্যাংক ল্যান্ড ১৭৫৮ সালে। অতঃপর রবার বারকার ১৭৫৯ সালে। বারকার সাহেব লবণহ্রদ (Saltlake) থেকে মাতলা নদীর মোহানা হয়ে কুল্পি পর্যন্ত পর্যটন করেন। বারকারের পরে ১৭৬১ সালে হিউ ক্যামেরন এই অঞ্চলের জরিপদার (Surveyor) নিযুক্ত হন। তিনি তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৭৬৪) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬১-৬২ সালে রচিত তাঁর মানচিত্রটি পরবর্তীকালে বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়েছে। এমনকি ১৭৬৭ সালে জরিপের সময় প্রখ্যাত সার্ভেয়ার জেমস রেনেল এই মানচিত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন।

[জেমস্ রেনেল। পরমোপকারী আমাদের এই ইংরেজ বন্ধুটি সম্পর্কে এখানে কিছু বললে কি খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে? যদি হয়, তো অকৃতজ্ঞতার চেয়ে বেশি দোষ নিশ্চয় হবে না। জেমস রেনেলের জন্ম ৩ ডিসেম্বর, ১৭৪২ সালে, ইংলন্ডের চাডলা গ্রামে। তিনি বাংলায় আসেন ১৭৬৩ বা ১৭৬৪ সালে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে, রাজ্যপাল ভ্যানসিটার্ট এঁকে ১৭৬৪ সালে ১৬ই, মতান্তরে ২১শে মার্চ ক্যামেরনের স্থলাভিষিক্ত করেন। ইনি হন সার্ভেয়ার জেনারেল অর্থাৎ নতুন ভূখণ্ডের সার্ভেয়ার (Surveyor of the East India Company's dominion in Bengal i.e. the new lands)-রূপে নিযুক্ত হন। ১৭৬৪ সালের ৬ই মে তিনি জরিপ করার আদেশ পেলেন। তাঁকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত একটি নাব্য নদী খুঁজতে বলা হল। তিনি গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ ধরে পূর্ণিয়া থেকে শ্রীহট্ট পর্যন্ত সমীক্ষা করেন। মিঃ রেনেল ভুটান থেকে রাজশাহী ও ঢাকা থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত সমীক্ষা চালান এবং পরিশেষে প্রভূত পরিশ্রমে ও অদ্ভুত কর্মনৈপুণ্যের ফলস্বরূপ তিনি বাংলার এবং সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার মানচিত্র অংকন করে শুধু কোম্পানিকেই নয়, এই দেশবাসীকেও উপহার দিয়ে গেছেন। সে সব মানচিত্রের প্রত্যেকটি অমূল্য সম্পদরূপে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৭৭৫ সালে রেনেল অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অক্লান্ত সেবার পুরস্কার-স্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাৎসরিক ৪০০ পাউন্ড বৃত্তি মঞ্জুর করে বিলেতে পাঠিয়ে দেন। ১৮৩০ সালের ২৮শে, মতান্তরে ২৯শে মার্চ নিজ বাসভবনেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সে যুগের ওই সব অঞ্চলের নদ-নদী অবস্থান সম্বন্ধে জানতে গেলে রেনেলের মানচিত্র আজও অপরিহার্য]
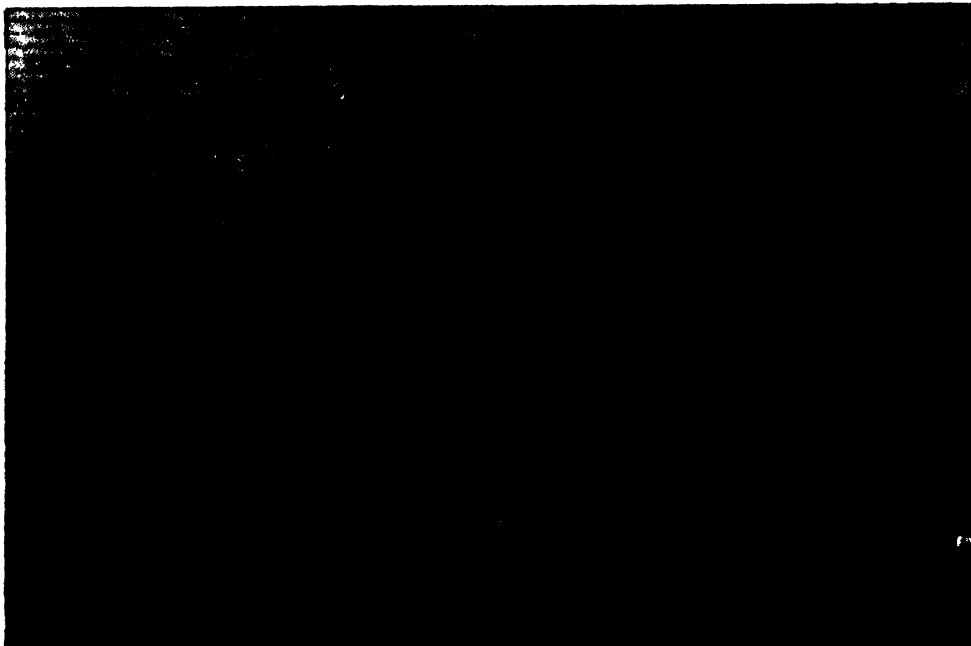
খড়ের ছাউনি নিচু চালা ঘর সুন্দরবনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য

ক্যামেরন, তাঁর মানচিত্রে তৎকালীন যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী ভূখণ্ডকে বলেছেন—"A fine Country belongs to the Company" এবং ওই নদীর বামতীরবর্তী ভূখণ্ড হল,—"The Nawab's Country." লবণহ্রদের একটি খালের গায়ে তিনি লিখে রেখে গেছেন,—This way Honey and wax are brought to Calcutta." এবং সুন্দরবনের ওপরে লেখা আছে—"Here those who come to gather wax and Honey in their season, sacrifice to Jagger nauth"

ক্যামেরন, তার রিপোর্টে বলেছেন যে, "গঙ্গার পূর্ব তীর দিয়ে ভ্রমণ করার সময় তিনি কুল্‌পি ও সাগরদ্বীপের মাঝে কোথাও কোথাও পাকা ধানের বড় বড় ক্ষেত দেখতে পেয়েছেন"। তিনি দেখেছিলেন, "অসংখ্য গরু আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল।" তিনি অবশ্য দেশের অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করেননি।"[৮]

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) বহির্ভূত সুন্দরবন—অঞ্চলে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য অপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা 'ডিয়ারা সার্ভে' নামে খ্যাত। এই জরিপের সমুদয় নকশা ৪" ইঞ্চির সমান এক মাইল স্কেলে প্রস্তুত। ১৮৬২ থেকে ১৮৮৩ সালের এই জরিপ ১৮৪৭ সালের 'দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন ও ডাইলুভিয়ান অ্যাক্ট' অনুযায়ী জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় ও রাজস্ব নির্ধারণের জন্য পরিচালিত হয়। এই জরিপ বিজ্ঞানভিত্তিক। ১৯২৩ সালে ডিরেক্টার মিঃ জেমসনের নেতৃত্বাধীনে এই দপ্তরটি 'রাইটার্স বিল্ডিংস্' থেকে উঠে এসে নবনির্মিত 'আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং'এ স্থানান্তরিত হয়।"[৯]

এতদিন পরে সুন্দরবনের আয়তন ও সীমানা-সহরন্দ কিছু-দিনের জন্য স্থিতি লাভ করে। "১৮৯৮ সালের একটি হিসাব থেকে জানা যায়, সুন্দরবনের পূর্ব ও পশ্চিমের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ ও উত্তর-দক্ষিণে গড় প্রায় ৫০ মাইল। মোট আয়তন ৯,৬৩০ বর্গ কিঃ মিঃ। এর মধ্যে ৪,৬৬৩ বর্গ কিঃ মিঃ বনভূমি। সরকারি বনভূমি ৪০ লক্ষ ৪ হাজার, ৯৭ একর।"[১০] আরেক জনের মতে—

"মহারাণী ভিক্[illegible] ১৮[illegible] অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর এ দেশের শাসনভার ই[illegible]নির হাত থেকে নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং তখন [illegible]ত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। সে সময় অবিভ[illegible] পশ্চিমে সুন্দরবনের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৮০ মাইল এবং [illegible] বিস্তৃত জায়গার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০ মাইল। বর্তমা[illegible] খুলনা ও বরিশাল (বাখরগঞ্জ) জেলার দক্ষিণ প্রান্তেই [illegible] ও ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল এবং এখনও আছে।" [illegible]তে,—

"প্রাচীন যুগের [illegible]তন প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এবং অধিকাংশ ভূভাগ মা[illegible] হাসনাবাদ, হাড়োয়া, ডাঙ্গড় ও রাজারহাট-এর মধ্যে [illegible]।"[১২]

তাহ'লে দেখা [illegible] সময়ে এই বনভূমির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। কালে-কালান্ত[illegible] এসে বিভিন্নভাবে এর সীমা নির্ধারণে প্রয়াসী হয়ে[illegible] প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও এর পিছনে কাজ করেছে। এবা[illegible] ও ভূমি-রাজস্বনীতি' ও তার রূপায়ণের চিত্রটি [illegible]

৪

ভূমি ও ভূমি-রাজস্বনীতি

সুন্দরবনের ভূমি ও ভূমি-রাজস্বনীতিকে বুঝতে গেলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শাসনাধীন সমগ্র বাংলার রাজস্ব-নীতির কাঠামোটা কেমন ছিল, আগে সেটা জানতে হয়। তা নইলে কেবল সুন্দরবনের কথা বললে ছবিটার সবটুকু দেখা যাবে না। তাই সমগ্র বাংলার পরিপ্রেক্ষার কথা সংক্ষেপে বলা হল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা আমিনদের সঙ্গে নিয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েন। প্রাথমিক উদ্দেশ্য, মুঘল আমলের জমি বন্দোবস্তের রীতি-নীতি, কলা-কৌশল, জমির উর্বরতা এবং চাষের পদ্ধতি-সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা। এই সব কর্মচারী ও আমিনদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে জমিদারী ১৭৭৭ থেকে ১৭৮০ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত বাৎসরিক বন্দোবস্ত দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হল না। ১৭৮১ সালে এই রকম বন্দোবস্তের পদ্ধতি বাতিল করা হয়। ১৭৮১ সালের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বাতিল করে একটি রাজস্ব কমিটি গঠন করা হয় এবং যাবতীয় রাজস্ব-সংক্রান্ত দায়িত্ব এই কমিটির হাতে অর্পিত হয়। এই কমিটি সমস্ত জেলায় কালেক্টারের অফিস স্থাপন করে কাজের তদারকির জন্য মুঘল আমলের 'কানুনগো' পদটির সৃষ্টি করা হয়।

এই রাজস্ব কমিটি, কালেক্টারের মাধ্যমে মুখ্যত জমিদারদের সঙ্গে এক থেকে তিন বছরের মেয়াদে জমি বন্দোবস্ত দিতে থাকেন। এই ব্যবস্থা ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ রইল। ১৭৮১ সালের আদায়ীকৃত রাজস্ব অপেক্ষা আরও বেশি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৭৮৪-৮৬ সাল পর্যন্ত জমি বাৎসরিক বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। অতঃপর ১৭৮৪ সালের ১৫ই অগাস্ট তারিখে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে 'পিটস্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' পাশ হয়। এই অ্যাক্টকে বাস্তবায়িত করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গ ১৭৮৬ সালে গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড কর্নওয়ালিশকে নিয়োগ করে এদেশে পাঠান। তিনি এদেশে এসেই পাঁচসালা বন্দোবস্তের ব্যর্থতা লক্ষ্য করেন। উল্লেখ্য যে, বাৎসরিক বন্দোবস্তের প্রথা তুলে দিয়ে ৫-সালতক বন্দোবস্ত প্রথা চালু করা হয়েছিল। কর্নওয়ালিশ সেই ব্যর্থতা লক্ষ্য করে, পূর্বে কয়েক বছরের আদায়ীকৃত রাজস্বের যথার্থ পরিমাণ নির্ধারণ এবং স্থায়ীভাবে কত রাজস্ব নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, তা স্থির করেন।

এই সময় থেকেই প্রথম দশ বছরের মেয়াদে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া শুরু হয়। তিনি সেই থেকে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগের প্রশাসনিক উন্নতিকল্পে ১৭৮১ খ্রিঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজস্ব-কমিটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে সে-স্থানে পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ' ১৭৮৬ অব্দে স্থাপন করেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৯ অব্দে 'বেঙ্গল ডেসিনিয়াল সেটেলমেন্ট রেগুলেশন' পাশ হয়। এইটাই 'দশ সালা' বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এর পর থেকে সরকার সরাসরি ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন এবং পক্ষান্তরে জমিদারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রাজস্ব নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রাজকোষে জমা-পড়া বাধ্যতামূলক হল। সেই বাধ্যতা এমনই ছিল যে, নির্দিষ্ট দিনের সূর্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব না দিলে জমিদারী অবশ্যই সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। এটি 'সূর্যাস্ত আইন' নামেও আখ্যাত হয়।

এর পর কিন্তু জমিদারেরা পতিত জমি উদ্ধারে খুব বেশি যত্নবান হন। এই দশ-সালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অগ্রদূত। ১লা মে, ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট রেগুলেশান' বা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন' পাশ হয়। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ বিধান অনুযায়ী এদেশে ভূমি ও ভূমি-রাজস্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় এবং মুঘল আমলের নিয়ন্ত্রণ প্রথার পূর্ণাঙ্গ অবলুপ্তি ঘটে।"(১৩)

৫

সুন্দরবনের বিশেষ কথা

১৮৩০ সালে আরেকটা জরিপ হয় এবং এরপর সুন্দরবনের লটে লটে জমিদার নিয়োগ করা হতে থাকে। ১৮৪৬/৪৭ সালে 'থাকজরিপ' মৌজাওয়ারি। এই জরিপেও দাগ (plot) নং পড়ল না, পড়ল গিয়ে সেই ১৯২৭/২৮ সালে। 'থাকজরিপের ওই ম্যাপগুলি আছে আলিপুরস্থ (সদর) মহাফেজখানার রেকর্ডরুমে, 'কুইন কুইনাল' নামক রেকর্ডের মধ্যে।

এরপর একটি আইন করে বলা হল যে, ত্রিশ বছরের মধ্যে লীজ গ্রহীতাদের ১/৮ অংশ বন হাসিল করে জমিকে আবাদযোগ্য করতে হবে। এ সময় সরকার নামমাত্র খাজনার বিনিময়ে জমি বিলি করতেন। কখনও বা বিনা খাজনাতেও জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হত; তবে সর্ত ওই, বন হাসিল বাধ্যতামূলক। এ-সম্পর্কে পূর্বোক্ত পার্জিটার সাহেবের কথা হল : "প্রথম সাত বছরে ইজারাদারকে জমির জন্য কোনও খাজনা দিতে হবে না। তারপর জমির গুণানুযায়ী ক্রমবর্ধমান বার্ষিক খাজনা নির্ধারিত হবে। গুণগত শ্রেণী অনুযায়ী খাজনা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেলেও তার সর্বোচ্চ পরিমাণ কখনই বার্ষিক বারো আনা, আট আনা ও ছ'আনার বেশী হবে না। প্রথম দুই শ্রেণীর জন্য জমার শতকরা ৭৫ ভাগ এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য শতকরা ৭০ ভাগ সরকারকে রাজস্ব দিতে হবে।

সর্বশেষে, প্রতি দশ বছর অন্তর জমি জরিপ করা হত এবং আবাদী জমির পরিমাণ অনুযায়ী পূর্বোক্ত হারে খাজনা নির্ধারিত হত। এই ভাবে বিলি করা জমিকে 'পতিত-আবাদী তালুক' বলা হত। জমি জরিপের কাজ বঙ্গাব্দ ১১৮২ (ইং ১৭৭৫-৭৬) এবং ১১৮৬ (ইং১৭৭৯-৮০) সালে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বারের জরিপ একেবারে মূল্যহীন; কারণ, আমিনরা তাদের মাইনে পেত তালুকদারদের কাছ থেকে। সেজন্য তাদের কাজগুলি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। অধিকন্তু, অবস্থা দেখে সন্দেহ হত, দুটো জরিপের একটাও নির্ভুল কিনা।

বিলি করা জমি প্রথম ঠিকভাবে মাপা হয় ১৭৮৩ খ্রি: অব্দে (বাংলা ১১৯০ সাল)। সেই সময়ে সমগ্র চব্বিশ পরগনা জেলা সাধারণভাবে জরিপ করা হয়। ওই জরিপের ওপর নির্ভর করে এই জেলার সমস্ত জোতের দশ বার্ষিক পরিমাপ স্থিরীকৃত হয় ১৭৯০ সালে। এই জরিপ 'পতিত আবাদী মহলে'র, ১৭৮৩ সালের মাপ অনুযায়ী চাষযোগ্য জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছিল এবং ইজারার অন্যান্য সর্ত—যেমন, চাষ বৃদ্ধির অনুপাতে খাজনা বৃদ্ধি ইত্যাদি অপরিবর্তিতই ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই মহলগুলির শ্রেণীবিন্যাস কোনও বাছ-বিচার না করে সাধারণ জমিদারদের অধিকৃত জমির মতই করা হয়। এই সব পতিত আবাদী মহল সম্পর্কে ১৮০৩ সালে কালেক্টার একবার একটি মন্তব্য করেছিলেন; কিন্তু তারপর "১৮১৩ সাল পর্যন্ত মহলগুলি সরকারি নজরের মধ্যে আসেনি।"(১৩)

—"That settlement (1790) extended, as regarded the patitábádi mahalls, in reality to there lands only which were recorded as cultivated in the measurement papers of 1783 and other conditions of the lease....as regarded the assessment with revenue of increased Cultivation still held good. But in fact the mahalls were classed indiscriminately with the ordinary Zamindari lands, and except for an isolated reference by the collector in 1803, the rights of Dovenment dropped out of sight and lay dormant untill 1813."(১৩)

এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণটি হল, চকবিলির এক বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনদাতা, সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের শেষতম ভূখণ্ড 'ধবলাট' নামক তালুকের জমিদার কেদারনাথ দত্তের। ঠিকানা—৭ নং, সিকদার পাড়া লেন, পোঃ—বড়বাজার, কলিকাতা এবং আবাদ ধবলাট, পোঃ-ডায়মন্ডহারবার, ২৪-পরগনা জেলা। বিজ্ঞাপনে কোনও তারিখ নেই; তবু মনে হয়, খ্রি: ১৮৯০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে কোনও এক সময়ে প্রচার করা হয়েছিল। এই বিজ্ঞাপনটির প্রচারপত্রের প্রারম্ভে জমিদার বংশের কুলদেবী শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী মাতার উল্লেখ আছে এবং ওই দেবীর একটি মন্দিরও ধবলাটে আজও আছে।

"শ্রীশ্রী বিশালাক্ষী মাতা শরণং।

চকবিলির বিজ্ঞাপন।"

জেলা ২৪-পরগনার মধ্যে ডায়মন্ডহারবারের অন্তর্গত কুলপি থানায় ও টেংরা সব-রেজিস্টারির অধীন সাগরদ্বীপের দক্ষিণ ভাগে প্রসাদ দাস দত্ত মহাশয়ের আবাদ ধবলাট নামে যে তালুক আছে তাহার মধ্যে কালা জঙ্গলজমি নীচের লিখিত বন্দোবস্তমত চকবিলি করা হইবেক।

১ম দফা.........বিঘা প্রতি সেলামী.........৵ (পাঁচ) আনা মাত্র

২য় দফা..........করশূন্য................প্রথম পাঁচ বৎসর..............

৩য় দফা..........(রসদ) ....

৬ষ্ঠ বৎসর................বিঘাপ্রতি খাজনা ৵. (দু) আনা হবে।

৭ম বৎসর.................... ,, ... ,, ।৹ (চার) ,, ,,

৮ম বৎসর.................... ,, ... ,, ।৵. (ছয়) ,, ,,

৯ম বৎসর.................... ,, ... ,, ।।৹ (আট) ,, ,,

১০ম বৎসর.................... ,, ... ,, ।।৵. (দশ) ,, ,,

১১শ বৎসর.................... ,, ... ,, (বার) ,, ,,

১২শ বৎসর .... ,, ... ,, ।।৵. (চৌদ্দ) ,, ,,

১৩শ বৎসর..... .... ,, ... ,, ১৲(এক) টাকা।

১৪শ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত ১।৹ (একটাকা চার আনা) হারে খাজনা দিতে হইবে।

৪র্থ দফা, —যে সকল লোক গাঙ ধারের জমি লইবেন, তাঁহারা ২০ বৎসরের আরও ৫ বৎসর ১।৷৹ (দেড় টাকা) হারে খাজনা দিবেন।

৫ম দফা,—প্রথম পাট্টার মেয়াদ ফুরাইলে পর আরও ২০ বৎসরের জন্য হারাহারিমত খাজনার নূতন পাট্টা পাইবার স্বত্ত্ব থাকিবে।

৬ষ্ঠ দফা, — ১ পাট্টার ১০০ হইতে ১,০০০ বিঘা পর্যন্ত জমি দেওয়া যাইবেক। ১,০০০ বিঘার উপর জমি লইবার জন্য আমার নিকট আসিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিব।

৭ম দফা,—(এই দফায় অন্য প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে)

৮ম দফা,—আবাদ ধবলাটে এক্ষণে যে সকল প্রজা আছেন, নূতন চকদার বা পাট্টা গ্রহীতা, তাহাদিগের কাহাকেও জমি বিলি করিতে পারিবেন না। চকদার নিজে অথবা নিজের আনিত প্রজা দ্বারা চাষ করিতে পারিবেন।

৯ম দফা,—চকদার বা পাট্টা গ্রহীতা নিজ ব্যয়ে জঙ্গল কাটাইয়া, বাঁধ, পোল, ঘেরি ইত্যাদি তৈয়ারি করাইয়া লইবেন এবং জঙ্গল কাটাইয়া যে কাষ্ঠ (কাষ্ঠ) হইবেক, তাহা চকদার পাইবেন।

১০ম দফা,—জলবায়ু, আবাদ ধবলাটে অনেক দিন হইতে চাষ আবাদ চলিতেছে ও তথায় পানীয় মিঠা জল পাওয়া যায় এবং সমুদ্রের কূলে অবস্থিত বলিয়া তথাকার আবহাওয়ায় অনেকে দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সাধারণ প্রজাগণের স্বাস্থ্য ভাল।

১১শ দফা,—আবাদ ধবলাটে যাইবার পথ, কলিকাতা হইতে প্রতি দিবস রাত্রি ৪টার সময় ষ্টিমার ছাড়িয়া গেঁওয়াখালি, কুকুর হাটি, হাজিপুর বা ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী, টেংরা বাজার, ঝিকুর খালি ও ঘোড়ামারা হইয়া কচুবেড়ে হাট পর্যন্ত যায় ও প্রতিদিন ঐ সকল স্থান দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসে। কচুবেড়ে হাট হইতে নৌকা বা বোটে করিয়া ২/৩ ঘন্টায় ধবলাটে যাওয়া যায়। অথবা ঐ সকল স্থান হইতে নৌকা করিয়া যাওয়া যায়। ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রতি বুধবার গভর্ণমেন্টের ডাকবোটেও যাওয়া যায়। ভাড়া লোকপ্রতি।৷ (আট) আনা মাত্র। গঙ্গাসাগরে [illegible] অনেক নৌকাই ধবলাট দিয়া সাগর সঙ্গমে যায়। যাঁহা[illegible] অঞ্চল হইতে আসিবেন, তাঁহারা কাঁথির পূর্ব-পারে শাঁখ[illegible] সহজেই ধবলাটে পৌঁছিতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন আর [illegible] হইলে আমার নিচের ঠিকানায় আমাকে অথবা আমার [illegible] বিহারী দত্তকে সাং আবাদ ধবলাট, পোঃ আঃ ডা[illegible]নায় পত্র লিখলে সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রী কেদার নাথ দত্ত।
[illegible]নং সিকদার পাড়া লেন।
[illegible] আঃ বড়বাজার কলিকাতা।

দ্রঃ—আপনার [illegible], এই বিজ্ঞাপনখানি যাঁহার প্রয়োজন হইবে অন[illegible]কে দিবেন এই অনুরোধ।"(১৬)

সুন্দরবনাঞ্চলে [illegible] হাজার হাজার দৃষ্টান্তের মধ্যে এটি একটিমাত্র উদা[illegible] যে, এই ব্যবস্থা বে-সরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের। সরকারি ক্ষেত্রে বন কেটে বসত করার যুগে আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, পার্জিটার সাহেবের উপরোক্ত বিবরণীর মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময়েই অর্থাৎ ১৮শ শতাব্দের ত্রিশের দশক থেকে ১৯শ শতাব্দের প্রথম পাদ পর্যন্ত সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে বন হাসিলের কাজ চলে। এই কাজের জন্য বেশি করে দরকার হল, বাংলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের। রাঁচি অঞ্চল থেকে এঁদের আনা হয়েছিল। হিংস্র জন্তুর আক্রমণে, বিষাক্ত সাপের কামড়ে, চিকিৎসাহীন ব্যাধির প্রকোপে কত সহস্র মানুষের জীবন-আহুতিতে সুন্দরবনের মাটি চাষ এবং বাসযোগ্য হয়, তার ইয়ত্তা নেই।

৬

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রণালী দিয়ে বয়ে আসা পলিমাটির ওপর গড়ে ওঠা আমাদের এই উর্বর বাংলা। এই বাংলা সুন্দর বনাঞ্চলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ। গহন অরণ্যাবৃত হিংস্র শ্বাপদ সংকুল, বিষাক্ত সর্প সমাকীর্ণ ভারতভুক্ত পশ্চিম সুন্দরবনের বিপদসংকুল অঞ্চলে মানব-বসতির কল্পনাই ছিল অসম্ভব। কিন্তু এর উর্বরতা মানুষকে আর্কষণ করছিল বহুকাল থেকেই। প্রমাণ বলে যে, খ্রি: ১৭৭০ সাল থেকেই কিছু কিছু দুঃসাহসিক মানুষ উত্তর থেকে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে যেতে শুরু করে। আর সেই বসতি আইনানুগ পথে সুশৃংখলভাবে বাড়তে লাগল ১৮৩০ সালের পর থেকে।

সুন্দরবনের উত্তর দিকের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভূমি চাষ ও সংশোধনে'র গ্রান্ট—আইন অনুসারে তখন থেকেই সুন্দরবনের এই অংশকে বেসরকারিভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিলি করা শুরু হয়েছিল। ১৮৩১ সালের 'সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া' 'ডাম্পিয়ার—হজেস' রেখার দ্বারা সুন্দরবন এলাকার সীমানা নির্দিষ্ট করে দেবার পর এখানে সুবিন্যস্তভাবে মানব-বসতির পত্তন শুরু হয়। এই 'ডাম্পিয়ার ও হজেস্' রেখা টেনে চব্বিশ পরগনা থেকে সুন্দরবনের যে সীমা সু-নির্দিষ্ট করা হয়েছিল পূর্বে সে-কথা বলা হয়েছে। সেই ৬৩০ বর্গমাইল এলাকা গহন অরণ্যাবৃত, মনুষ্যবসতিহীন এবং সরকারিভাবে সংরক্ষিত এলাকা অর্থাৎ সরকারের বনবিভাগের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষিদ্ধ।

"খ্রি: ১৯১৫ অব্দে নতুন একটি আইনে সমগ্র সুন্দরবনকে রায়তি ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। এই সব রায়তদের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকর্তা হলো খাসমহল বিভাগ। এটাই ছিল সুন্দরবনের শেষ বিলি ব্যবস্থা। রায়তদের সংখ্যা ছিল ১লক্ষ, ৬৫ হাজার। অধস্তন রায়ত ৩৬ হাজার ৪৮৫ জন। এছাড়া চকদারের সংখ্যা ৮ হাজার ২শত, ২৬ জন। ১৮৯৮ সালের একটি হিসেবে থেকে জানা যায়। সুন্দরবনের পূর্ব ও পশ্চিমের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণের গড় প্রায় ৫০ মাইল। মোট আয়তন ৯ হাজার, ৬শত, ৩০ বর্গ কিমি। এর মধ্যে ৪ হাজার, ৬শত ৬৩ বর্গ কিমি বনভূমি। সরকারি বনভূমি ৪০ লক্ষ, ৪ হাজার, ৯৭ একর।"(১৭)

সুন্দরবনাঞ্চলের অধিবাসিদের প্রাত্যহিক চিন্তা—'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস।' অতি সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরের বিশাল ও বিপুল তরঙ্গের গর্জন দিবানিশি চলছে তো চলছেই। তদুপরি, অভ্যন্তর ভাগে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড়, মাঝারি নদীর বিপুল

প্রবাহ। কাজেই এতদঞ্চলের মানুষের যে, প্রাণটুকু হাতে নিয়েই বাঁচতে হয়, একথা বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। তাই দুর্দমনীয়া প্রকৃতিকে দমন করতে নদীর তীরে প্রয়োজনমাফিক ছোট-বড় বাঁধ দিতে হয়েছে বিস্তর। প্রবল বাত্যাতাড়িত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত লবণাক্ত জলরাশি অসংখ্য খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে পথ করে এসে প্রায়শ এখানকার অপেক্ষাকৃত নিচু জমিগুলিকে প্লাবিত করত, নিশ্চিহ্ন করত মানুষের বসতিকেও। এর প্রতিরোধে ইজারাদারেরা তখন মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করে জমিগুলিকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। এইভাবে এই এলাকায় গড়ে উঠেছিল বিরাট বিরাট দৈর্ঘ্যের বহু বাঁধ। এইভাবে সুখে-দুঃখে, পতনে-উত্থানে এক রকমে এদেশবাসীর বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। তারপর এল স্মরণীয় ১৯৪৭ সাল।

৭

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট। ভারতবর্ষ এদিন প্রায় ১শত ৯০ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হল এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের নেতৃবৃন্দ দেশের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নব নব রূপায়ণে ব্রতী হলেন। তার প্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, দেশ থেকে জমিদারী প্রথা তথা মধ্যস্বত্বের উচ্ছেদ সাধন। প্রায় ১শত ৭৭ বছর ধরে (১৭৭৭-১৯৫৪) জমিদার, তালুকদার, চকদার, ইজারাদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারীরা যে স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন আর তিক্ততায়, মধুরতায়, সুখে-দুঃখে ভরা সাধারণ প্রজাদের মনে যে স্থিতি-স্থাপকতা এসেছিল, গড়ে উঠেছিল একটা ঐতিহ্য, তা' ১৯৫৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে জাতীয় সরকারের একটি কলমের খোঁচায় একই সঙ্গে সব নস্যাৎ হয়ে গেল, ধ্বসে পড়ল তাসের ঘরের মতো।

"বৈষম্য দূর করার জন্য স্বাধীনভারত, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয়। পঃ বঙ্গে ১২.২.১৯৫৪ তারিখে "পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন, ১৯৫৩", রাজ্য বিধান মণ্ডলে পাশ করা হয়। এই আইনটি 'কলিকাতা পৌর আইন, ১৯৫১"—এর ১নং অনুসূচীতে বর্ণিত অঞ্চল, যা উক্ত আইনের ৫৯৪ ধারা অনুসারে সংশোধিত বলে বিবেচিত। তা ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দফায় দফায় চালু করা হয়।"

"পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ বিল, ১৯৫৩," কোলকাতা ঘোষণা পত্রের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৫ই মে প্রকাশিত হয় এবং ৭ই মে, ১৯৫৩ তারিখে রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হয়। বিধান পরিষদের সম্মতি-সহ বিলটি 'সংযুক্ত প্রবর সমিতি'র (Joint Select Committee) কাছে প্রেরিত হয়। এরপর বিভিন্ন কক্ষের বিভিন্ন টেবিল ঘুরে আইনটি বলবৎ হয়। আর বঙ্গাব্দের ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে আইনটি কার্যকর হলো।" পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। উল্লেখ্য যে, সমগ্র পঃ বঙ্গে 'কলিকাতা' নামক নগরীটি এই আইনের আওতা থেকে অদ্যাপি মুক্ত আছে।

অতএব সুন্দরবনের বাঁধ-সংরক্ষণের কাজে আমাদের জাতীয় সরকারকেই হাত দিতে হল। ১৯৫৫ সালে মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করার পর পশ্চিম সুন্দরবনের সুদীর্ঘ ৩ হাজার ৫শ' কিলোমিটার বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এসে পড়ল পঃ বঙ্গ সরকারের ওপর। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় বাঁধগুলির কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হলেও সমুদ্রের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব, তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কা ও ঝড়ের দুর্দান্ত গতিবেগকে রোধ করার ক্ষমতা প্রায়শঃই তার থাকে না। ফলে সৃষ্টি হয় বাঁধের ভাঙন, ঢুকে পড়ে লবণাক্ত জলরাশি, নষ্ট হয় মাঠের পর মাঠের সবুজ শস্য এবং তার সঙ্গে মানুষের ঘর-বাড়ি এবং জীবনও বাদ যায় না। এখানে প্রকৃতি যেন মানুষকে ডেকে বলে, তোমাদের এখানে প্রবেশ নিষেধ, বলে যেন—তোমাদের কৃত্রিমতার কালিমায় আমার অকৃত্রিম শোভাকে নষ্ট কোরো না।

কিন্তু গোটা পৃথিবীটাই তো একদিন অকৃত্রিম শোভায় মণ্ডিত ছিল, মানুষের ধী-শক্তির কাছে তাকে অনেক জায়গায় পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। যেমন আমাদের কলকাতা। সেখানে যেমন করে অরণ্য পিছু হটে নগর বসেছে, কিছু ভিন্নভাবে হলেও, তেমনি করেই এখানে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা বোধ এসেছে বা ভবিষ্যতে আসতে পারে। কিন্তু কেমন করে? সে ভিন্ন কথা। তবে পূর্বোক্ত পার্জিটার সাহেবের উক্তিতে প্রমাণ মেলে যে, "বারংবার জলপ্লাবনে সুন্দরবনাঞ্চল শস্যশূন্য হয়েছিল এবং সরকারের রাজস্ব এই অঞ্চল থেকে ক্রমাগত কমতে থাকে। গঙ্গানদীর প্রধান জলস্রোত ভাগীরথী থেকে পদ্মায় প্রবাহিত হওয়ায় এই সমৃদ্ধ অঞ্চল পরিপ্লাবিত হয়। ১৭শ শতকের শেষার্ধে ও ১৮শ শতকের প্রথম দিকে পর্তুগীজ ও মগজলদস্যুদের অত্যাচারে এই সব অঞ্চল (সুন্দরবন) জনশূন্য হয়ে পড়ে,— "It is believed that one time the Sundarbans was for more extensively inhabited and Cultivated than at present..........It is said that in 1737 the people then inhabiting the Sundarbans deserted it is consequence of devasted state of the Country, and Rennell's map of lower Bengal (1772) the Backergunj Sundarbans is shown as de-populated by the Maghs." [১৮]

৮

পরিশিষ্ট

এখানে কিছু আগের কথা শেষে বলছি

টোডরমল্লের রাজস্ব তালিকা খ্রিঃ ১৫৮২ অব্দে প্রণীত হয়, সে কাজের বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন যশোহরাধিপতি বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়—এই দুই ভাই (পশ্চিমবঙ্গের ২য় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এই রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর)। এই রাজস্ব তালিকায় সুন্দরবনের কোথাও রাজস্ব নির্ধারিত হয়নি। সুলতান সুজা ১৬৫৮ খ্রিঃ অব্দে একটি তালিকার পুনর্বিন্যাস করেন। টোডরমল্ল বঙ্গদেশকে ১৯টি সরকার বা জেলায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক জেলায় কতকগুলি পরগনার সৃষ্টি হয়। তখন দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারকে বঙ্গদেশের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,০৬,৯৩,১৫১ টাকা। এই রাজস্ব ১০ বৎসরের জন্য নির্ধারিত ছিল; এবং ৭৬ বৎসর পর্যন্ত চালু থাকে। সুজার সময় এই রাজস্ব ১০৭ লক্ষ টাকা থেকে বর্ধিত করে ১৩১ লক্ষে দাঁড়ায়। ১৭২৫ খ্রিঃ অব্দে বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ১৪২ লক্ষ টাকা বঙ্গদেশের রাজস্ব নির্ধারিত করেন। খলিফাতাবাদ দেশের অন্যতম সরকার বা জেলা ছিল পূর্ববঙ্গে। এই সরকার শাহসুজার সময় (মৃত্যু ১৭৪০) দুই পরগনায় বিভক্ত হয়; যথা—আকলা—গোচারণ ভূমি এবং বুনজের বা বনভূমির ফসল।

সুন্দরবনকে তখন মোরাদখানা ও জেরাদখানা বলা হত। এর রাজস্ব ছিল নামমাত্র ৮,৪৫৪ টাকা। বাখরগঞ্জের সুন্দরবন বোজর্গ উমেদপুর পরগনাভুক্ত ছিল। তখন পর্যন্ত অধুনা সুন্দরবন পরগনার সৃষ্টি হয়নি। যাই হোক, এই হল সুন্দরবনের প্রাক্-ব্রিটিশ পর্ব বা ব্রিটিশ পর্বের মোটামুটি প্রশাসনিক ও তৎসহ ভূমি ও ভূমিরাজস্বের ইতিহাস। তাহলে এ পর্যন্ত আমরা কী দেখলাম?

যা দেখলাম, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, ১৭৭০-এ ক্লড রাসেল সুন্দরবন আবাদ করলেন। এরপর ১৭৮৪-তে টিলম্যান হেংকেলের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। ১৮১৭-তে ২৩ নং রেগুলেশান অনুসারে সুন্দরবনের শাসনব্যবস্থা পৃথকভাবে দেখানো হয় এবং উক্ত বিধানবলে "Commissioner's of Sundarbans' পদের সৃষ্টি হয়ে সুন্দরবনের শাসনব্যবস্থা শৃঙ্খলিত হয়। ১৮২২-৩০ এর মধ্যে লেফটেন্যান্ট হজেস সুন্দরবন জরিপ করেন। আলিপুর হল সর্বপ্রথম সুন্দরবনের Head quarter।

আর জানা গেল যে, সুন্দরবন পূর্বে সংরক্ষিত ছিল না। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে সমগ্র বনবিভাগ জমিদারদের ভোগদখলে ছিল। তখন বনবিভাগের জন্য কোন সরকারি অফিস স্থাপিত হয়নি। গেজেটিয়ার প্রণেতা Mr. O'malley-র মতে, "১৮৬৬ খৃঃ অব্দের পূর্বে সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আদায়ের কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।"

সর্বপ্রথম 'পোর্টক্যানিং কোম্পানিকে বাৎসরিক ৮ হাজার টাকায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৮৬৯-এ গভর্ণমেন্ট সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৭২-এ ডেপুটি কনজারভেটার অব্ ফরেস্ট মিঃ শ্লিচ বনবিভাগের আর্থিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ১৮৭৪-এ তৎকালীন গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল সুন্দরবনের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত করে পার্শ্ববর্তী জেলার অধিবাসীদের পক্ষে সুন্দরবন যে অতি প্রয়োজন, তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। জনসাধারণ এই সময় সুন্দরবনের কিছু কিছু জায়গায় চাষাবাদের জন্য জমি তৈরি করছে।

মধ্যে একবার সুন্দরী কাঠের অভাব দেখা দিলে জঙ্গল হাসিল করে চাষাবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আপত্তি উঠল। এ বিষয়ে সরকারিভাবে তদন্ত করবার পর সুন্দরী বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য সরকারে স্বতন্ত্র বনবিভাগ সৃষ্টি হল ১৮৭৪-৭৫ অব্দে। ৮৮৫ বর্গ মাইল 'সংরক্ষিত জঙ্গল মহল' রূপে প্রথমে ঘোষিত হল। তারপর ১৮৭৫-৭৬ অব্দে আরও ৩১৪ বর্গ মাইল = মোট ১১৯৯ বর্গমাইল অখণ্ড বাংলায় 'সংরক্ষিত জঙ্গল মহল বলে ঘোষিত হল। এরপর সরাসরি সরকারি তত্ত্বাবধানে এসে লোকালয়ের আইন-কানুন সুন্দরবনাঞ্চলেও প্রবর্তিত হতে থাকল। পরে এর আয়তন বাড়তে বাড়তে ২৪-পরগনা (অখণ্ড) জেলার অংশে এসে দাঁড়িয়েছে ৩০৮৯ বর্গ মাইল।

পরগনা সুন্দরবন

সবশেষে একটি তথ্য পাঠককে উপহার দিতে চাই। তথ্যটি সকলের না হলেও অনেকেরই অজানা। তথ্যটি হল 'সুন্দরবন' নামে একটি পরগনা ছিল। পরগনাটি সৃষ্টি কবে এবং কার দ্বারা হয়েছিল, তা জানা যায়নি। তবে আদি পরগনার নামগুলি আত্মসাৎ করে যে, নিজ নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। কোনও গেজেটিয়ারে বা সেন্সাস রিপোর্টে কথাটার উল্লেখ নেই; কারণ সুন্দরবনকে নিয়ে ২৪-পরগনা জেলা ভূমিষ্ঠ হয়নি অর্থাৎ যে ২৪টি পরগনা নিয়ে এই জেলার সৃষ্টি, তার মধ্যে 'সুন্দরবন' নেই; কিন্তু ছিল। নানা কারণে অনুমিত হয়, পরগনাটির সৃষ্টি ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। যাই গোটা দু-দিন উদাহরণ দিচ্ছি District Settlement ১৯২৪-২৮ সালে রচিত রেকর্ড (পরচা থেকে),

(১) থানা-জয়নগর। জে. এল. নং ১১৮, লট নং ৪২, খতিয়ান নং ৫১, তৌজী ১৪৬৫, মৌজা কৈলাস নগর, পরগনা—সুন্দরবন। (২) থানা-জয়নগর, মৌজা-আলিটা খালি, জে এল নং ১২৬, লট নং ৩৯ (পিয়ারগঞ্জ)। তৌজী ২৯৮-বি-১, খতিয়ান নং ৪৪, পরগনা—সুন্দরবন। (৩) থানা—ক্যানিং, মৌজা আমঝাড়া, জে এল নং ৭৩, লট নং ১৩৩, তৌজী নং ২১৪-বি-১, পরগনা-সুন্দরবন..........ইত্যাদি। খুঁজলে পর আরও দৃষ্টান্ত মিলবে। এবার এই সুন্দরবনকে সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী দুটি সারণির দ্বারা নানা দিক থেকে দেখে এ-প্রসঙ্গ আপাতত শেষ করব।

তথ্যসূত্র :

(১) যশোহর-খুলনা ... চন্দ্র মিত্র, ১ম খণ্ড, ১৯৬৩ সাল, পৃঃ ৪৫।

(২) Imperial (... Provincial Series, Bengali, Vol-I, Page-371/USHA ...

(৩) The Imperi... Gazetteer ... India, Sir, W.W.Hunter, Vol-XIII, 2nd Ed, Page 107, T... & ... London, 1887.

(৪) West Beng... Directorate, Government of West Bengal. Centenary Co... ...me. 1964. Published 1966. History of Forest Organis... W... ...—by S.P. Mullick. Conservator of Forest. P.P.73-76.

(৬) Ibid. Fores... ...—A.K. Banerjee, Deputy Conservator of Forests. P.P. ...59

(৭) Origin and ... Patitābādi taluks in 24-Parganas, 1770-1793.—Frederic... ...—A Revenue History of the Sundarbans (1934). I... 1765 ... P.1.

(৮) Calcutta ... Pargiter.

(৯) Historical Records of the Survey of India, Vol-I, 18th Century by Col. R.H. Philimore.

(১০) ভূমি রাজস্ব ও জরীপ— টোডরমল, ১৩৮৮, পৃঃ ১২৯-৩০।

(১১) অনুকূল চন্দ্র দাস, দৈঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, তাং ২৬.৭.১৯৮২।

(১২) পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন—বিনোদবিহারী দাস। 'দিনকাল' ১৫, আগস্ট, ১৯৮২, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সম্পাদক—নির্মল মাইতি, নামখানা, দঃ ২৪-পরগনা।

(১৩) চব্বিশ পরগনা ও কলিকাতা—ডঃ শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০০।

(১৪) ঐ, পৃঃ ৫৬-৫৭।

(১৫) Ibid, P.1.

(১৬) বিজ্ঞাপনটি উক্ত কেদারনাথ দত্তের বংশধর, বারুইপুর (দঃ ২৪ পরগনা) মুনসেফ কোর্টের প্রাক্তন মুনসেফ শ্রীপিয়ারীলাল দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

(১৭) ঐ ঐ

(১৮) The Imperial Gazetteer of India, Vol-I, P. XXII.

লেখক পরিচিতি : অশীতিপর প্রবীণ, লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

গোকুলচন্দ্র দাস

ঔপনিবেশিক আমলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভূমিব্যবস্থার বিকাশ

যে চব্বিশটি পরগনার সমবায়ে আমাদের জেলা গঠিত, পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে সেগুলি ছিল নদিয়া, যশোর কিংবা বর্ধমান রাজস্ব বিভাগের অন্তর্গত। তারও আগে সপ্তদশ শতকে এই পরগনাগুলি সরকার সাতগাঁও বা সপ্তগ্রামের অধীন। সুন্দরবন সে সময় কোনও পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সুতরাং এর রাজস্ব নির্ধারণেরও প্রশ্ন ছিল না। যাকে ঘিরে 'পলাশীর ষড়যন্ত্র' বিকশিত হয়েছিল, সেই মীরজাফর কৃতজ্ঞতাবশে নবাব হওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা জমিদারিসহ কলকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত মোট ২৪টি পরগনা উপঢৌকন দেন। এর আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গ মাইল[১]। প্রচলিত রীতি অনুসারে কোম্পানি নবাব সরকারকে এই জমিদারির সনদের জন্য ২০,১০১ টাকা পেশকাস ও বার্ষিক ২,২২,৯৫৮ টাকা রাজস্ব দিতে রাজি হয়েছিল[২]। এই জমিদারি লাভের ফলে অবশ্য কোম্পানির অর্জিত অধিকার আর পাঁচজন সাধারণ জমিদারের চেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু এর দুবছর পর ১৭৫৯ সালে মুঘল সম্রাটের এক ফরমানবলে কোম্পানি এক ব্যক্তি হিসাবে ২৪- পরগনার জমিদারির বংশানুক্রমিক ভোগদখলের বিশেষ অধিকার পেয়ে গেল। আবার ওই বছরই মীরজাফর ২৪-পরগনার জমিদারির উপর রাষ্ট্রীয়-রাজস্ব-অধিকার ত্যাগ করে তা ক্লাইভকে দান করলেন। এর ফলে কর্মচারী ক্লাইভ হয়ে বসলেন তাঁর নিয়োগকর্তা জমিদার-কোম্পানির প্রভু। আমৃত্যু, ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত ক্লাইভ এই জমিদারির রাজস্ব ভোগ করেছিলেন। এর পর মুঘল সম্রাটের আর-এক ফরমানবলে ২৪-পরগনার জমিদারি শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানির খাস সম্পত্তিতে পরিণত হয়।[৩] যে চব্বিশটি পরগনা নিয়ে বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ কোম্পানির জয়যাত্রা শুরু, সেগুলি হল : আকবরপুর, আমীরাবাদ, কলকাতা, পৈখান, আজিমাবাদ, বালিয়া, বারিদহাটি, বসনদারি, দক্ষিণ সাগর, গড়, হাতিয়াগড়, ইখতিয়ারপুর, খাড়িজুড়ি, খাসপুর, মেদনমল্ল, মাগুরা, মানপুর, ময়দা, মুড়াগাছা, পাঁচকুলি, সাতাল, শাহনগর, শাহপুর ও উত্তর পরগনা। ইংরেজ কোম্পানির জয়যাত্রা শুরু হল। একই সঙ্গে শুরু হল আধুনিক চব্বিশ পরগনারও এগিয়ে চলার ইতিহাস।

কোম্পানি লগ্নি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ২৪-পরগনা সংলগ্ন সুন্দরবন হাসিল ও আবাদিকরণের মাধ্যমে নতুন রাজস্ব সৃষ্টির উদ্যোগ শুরু হতে আর দেরি হয়নি। সাত বছরের মধ্যে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় দেওয়ার শর্তে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল কলকাতার কাছে হরিণঘাটা নদী থেকে পূর্বে রায়মঙ্গল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে লিজ নেন। জঙ্গল হাসিলের প্রয়োজনে হেঙ্কেল ফৌজদারি বন্দীদের ব্যবহার করার অনুমতিও পেয়েছিলেন।

এই চব্বিশটি পরগনার সবগুলিই এখন বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত। এখন ডায়মণ্ডহারবারের কুলপী পর্যন্ত অনেক গ্রামের নামের মধ্যে এই পরগনাগুলির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কলকাতার উত্তরে বর্তমান ব্যারাকপুর, বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত পরগনাগুলি ১৭৫৭-এর পরও বহুকাল যশোর ও নদিয়া রাজস্ব বিভাগের অন্তর্গত ছিল।[৪] কলকাতা ও চব্বিশ পরগনার প্রথম কালেক্টর Franclin বা Frankland ১৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে নবাব নিযুক্ত আমিনের সাহায্যে প্রথম জমিদারী জরিপ করান। তাঁর তৈরি রিপোর্টে জমিদারির গ্রাম, তালুক ও রাজস্বের বিবরণ আছে।[৫] এই বিবরণ থেকে অষ্টাদশ শতকে আদিগঙ্গার তীরবর্তী বিচ্ছিন্ন অথচ বর্ধিষ্ণু কিছু জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ভূখণ্ডই ছিল সংলগ্ন সুন্দরবনের সম্প্রসারিত অংশ—ঘন জঙ্গলে ঢাকা, হিংস্র বন্যজন্তু, লুঠেরা ও জলদস্যুদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।[৬]

Frankland-এর জরিপ থেকে দেখা যায় যে চব্বিশ পরগনা জমিদারির মোট ৮,১৬,৪৪৬ বিঘা জমির অর্ধেকটাই প্রায় নিষ্কর কিংবা পতিত। মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫,৫৪,৬০৪ টাকা।[৭] জমি যে কোম্পানির আয়ের একটা সূত্র হতে পারে, প্রথমে ইংরেজদের এ ধারণা ছিল না। কিন্তু কলকাতা জমিদারির অভিজ্ঞতা থেকে তারা দ্রুত বুঝে গিয়েছিল যে জমিদারি আয় এ দেশে কোম্পানির লগ্নি সমস্যার কিছুটা সুরাহা করতে পারে।

সুতরাং ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি প্রথমে পছন্দমত এ দেশীয় পরিচিতদের মধ্যে জমি বিলি-বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ক্লাইভের ইচ্ছানুযায়ী শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য নীলামে সর্বোচ্চ ডাকদাতাদের মধ্যে তিন বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। সফল ডাকদাতাদের মধ্যে অনেকেই ছিল ইংরেজ কর্মচারী।[৮] পরিচালক সভার আপত্তি সত্ত্বেও কোম্পানির কর্মচারীরা এই প্রথম সর্বোচ্চ লাভের তাগিদে এ দেশে জমির ফাটকাবাজিতে অংশগ্রহণ করে। কালক্রমে ক্ষমতার অপব্যবহার ও ব্যাপক দুর্নীতির সাহায্যে ইংরেজরা সুপরিকল্পিতভাবে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য থেকে এদেশীয় বণিক-কারিগরদের নির্মূল করেছিল, তেমনই কলকাতার বণিকদের সঙ্গে যোগসাজশে জমি থেকেও মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার-ইজারাদারদের সরিয়ে দিতে শুরু করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

জমি নীলামে বিক্রি হলেও আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পেল না। জমির প্রকৃত পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় ভেরেলস্ট (Verelst) গভর্নর হয়ে আসার পর জমিদারির আয়তন ও মূল্য সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেন। এই তদন্তের ফলে দেখা যায় যে ২৪-পরগনার মোট আবাদি জমির পরিমাণ ১০,৮৩,৫৪৩ বিঘা এবং নিষ্কর ও পতিত জমির পরিমাণ মাত্র ২,৬৩,৭০২ বিঘা। ফলে আদায়যোগ্য মোট রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় তেরো লক্ষ টাকা।[৯] ১৭৫৯-এর বন্দোবস্ত চুক্তি শেষ হওয়ার পর চব্বিশ পরগনা জমিদারি কোম্পানীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছিল দীর্ঘ দশ বছর। এর পর ভেরেলস্টের নির্ধারিত মোট রাজস্বের ভিত্তিতে এই জমিদারি ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। হেস্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্ত পরে কর্নওয়ালিসের আমলে দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (১৭৯৩) রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য অবশ্যই ছিল রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধি। কিন্তু সেই সঙ্গে এই পর্বে রায়তদের অধিকার সম্পর্কে কোম্পানির যথেষ্ট সতর্কতা ছিল মনে হয়। কোম্পানির জমিদারিতে বন্দোবস্ত গ্রহীতারা যাতে রায়তদের কাছ থেকে বাড়তি-খাজনা বা আবওয়াব (উপকর) আদায় করতে না পারে কিংবা জমি থেকে রায়ত[illegible] উৎখাত করতে না পারে সে বিষয়ে কোম্পানি সতর্ক দৃষ্টি [illegible]।[১০] [illegible] প্রতিবেশী জমিদারি থেকে রায়তরা দলে দলে কো[illegible] জ[illegible]তে চলে আসতে শুরু করে এবং চব্বিশ পরগনার [illegible] শতকের শুরুতে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ভেরেলস্টের শা[illegible] [illegible]রি এলাকার পতিত জমি উদ্ধার ও আবাদিকরণে[illegible] [illegible]য়। কিন্তু পুরাতন জমিদারি এলাকার আবাদি জমি[illegible]র যে শর্ত ছিল, জঙ্গলাকীর্ণ জমির সেই শর্তগুলি ছি[illegible] খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেল [illegible]র্তী জঙ্গল-জমি কতগুলি শর্ত সাপেক্ষে প্রথম লিজ [illegible]ক করেন। প্রধান শর্ত ছিল: প্রথম সাত বছর খাজন[illegible] উদ্ধারকৃত বন্দোবস্তি জমির খাজনা অষ্টম বর্ষ থেকে[illegible] জমির গুণানুসারে বিঘাপ্রতি ১২, ৮ ও ৬ আনায় স্থি[illegible] বছর অন্তর নতুন আবাদকৃত অতিরিক্ত জমিকে এই [illegible]ভুক্ত করা হবে। রাসেলকৃত বন্দোবস্তের এলাকাগু[illegible] পতিতাবাদী তালুক নামে পরিচিত হয়।[১১] ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এই তালুকগুলির প্রথম জরিপ হয়েছিল। এই জরিপের ভিত্তিতে এগুলির দশশালা ও পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। সুন্দরবন কমিশনার পার্জিটার (Pargiter) ২০টি পতিতাবাদী তালুকের উল্লেখ করেছেন:[১২] শোভানগর, হরিসাল, গঙ্গাধরপুর, বেলপুকুরিয়া, লাখীপুর, রামতনুনগর, লাখীপাশা, শিবপুর, ভৈরবনগর, খুদাদাদপুর, শ্যামনগর, গোবিন্দপুর, রাধাকান্তপুর, রামলোচনপুর, রাঙাফুলিয়া, ধানখোলা, কাশীনগর, ভগবানপুর, কৃষ্ণরামপুর ও রামচন্দ্রপুর। এই তালুকগুলি লবণহ্রদ এলাকা থেকে দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত পুরাতন জমিদারি এলাকা ও সুন্দরবনের মধ্যে অবস্থিত ছিল। আলিপুর সদর মহকুমার (এখন আলিপুর, বারুইপুর ও ডায়মন্ডহারবার) মধ্যে এগুলির অস্তিত্ব এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলার সমস্ত জমির উপরই কোম্পানির আইনি অধিকার কায়েম হয়েছে। নবাবি শাসনের আবরণ সরিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশে ইংরেজ কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোম্পানি লগ্নি সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ২৪-পরগনা সংলগ্ন সুন্দরবন হাসিল ও আবাদিকরণের মাধ্যমে নতুন রাজস্ব সৃষ্টির উদ্যোগ শুরু হতে আর দেরি হয়নি। সাত বছরের মধ্যে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় দেওয়ার শর্তে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল কলকাতার কাছে হরিণঘাটা নদী থেকে পূর্বে রায়মঙ্গল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে লিজ নেন।[১৩] জঙ্গল হাসিলের প্রয়োজনে হেঙ্কেল ফৌজদারি বন্দীদের ব্যবহার করার অনুমতিও পেয়েছিলেন।[১৪] এই অনুমোদনের পেছনে নতুন রাজস্ব লাভ ছাড়াও সরকারের উদ্দেশ্য ছিল আবাদি এলাকা সম্প্রসারণের সাহায্যে চালের মজুতভাণ্ডার গড়ে তোলা।[১৫]

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি এলাকার দক্ষিণ সীমা তখনও নির্ধারিত না হওয়ায় জমিদারেরা হেঙ্কেলের উদ্ধার করা জমি তাদের জমিদারিভুক্ত বলে দাবি করতে শুরু করে। জমিদারদের অত্যাচারে হেঙ্কেলের আবাদ ছেড়ে নতুন বসতকারী কৃষকরা পালাতে বাধ্য হয়।[১৬] হেঙ্কেল চেয়েছিলেন সরকারের প্রত্যক্ষ অধীনে অসংখ্য স্বাধীন রায়তি কৃষক তৈরি করতে। কিন্তু রাজবল্লভ রায়, রামরতন মিত্র, শঙ্করী দাসী প্রমুখ জমিদারদের তীব্র বিরোধিতার ফলে ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু নয়া আবাদ এলাকার রায়ত ও নদীপথে চলাচলকারী বণিকদের সুবিধা ও সুরক্ষার জন্য কালিন্দী ও যমুনা নদীর সঙ্গমে যে বাজার ও ফাঁড়ি হেঙ্কেল তৈরি করেছিলেন, সেই স্থান হেঙ্কেলগঞ্জ, উচ্চারণপ্রমাদে হিঙ্গলগঞ্জ নামে আজও প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি বহন করছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারদের সুন্দরবনের উপর অন্তহীন দাবির সুনির্দিষ্ট মীমাংসা হতে অনেক সময় লেগেছিল। ১৮১১-১৮ সালে মরিসন ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম সুন্দরবনের নদীনালার জরিপ করেন। এই সময় এক তদন্তে দেখা যায়, যে বাঁশড়া থেকে হোসেনাবাদ (হাসনাবাদ) পর্যন্ত প্রায় ৯০,০০০ বিঘা জমির মাত্র ২৫,০০০ বিঘা আবাদি। রায়মঙ্গলের পশ্চিম ও বিদ্যাধরীর দক্ষিণে সব জমি রাজবল্লভ রায়ের এবং পূর্বদিকের বাকি জমি ইলিয়াস নামের আর এক জমিদারের দখলে।[১৭] এই পরিস্থিতিতে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনার কালেক্টর স্কটসাহেব সুন্দরবনের পতিত জমি উদ্ধার সম্পর্কে

মীরজাফর কর্তৃক ক্লাইভকে প্রদত্ত জমিদারির দলিল ও ম্যাপ
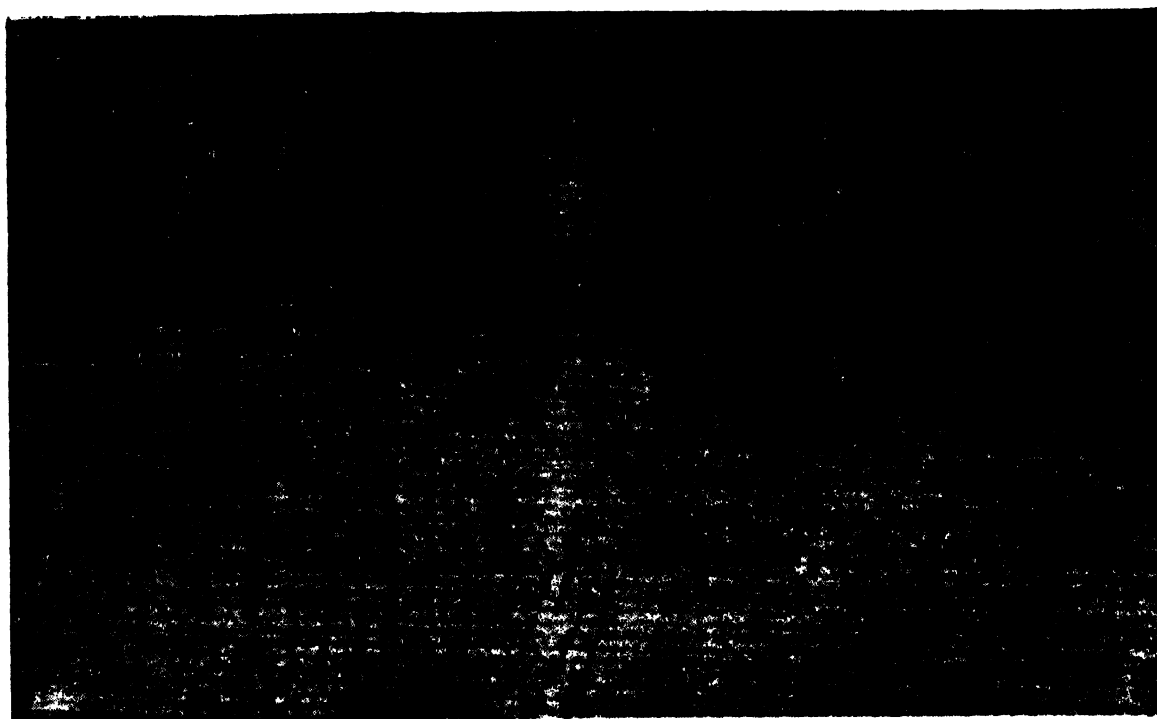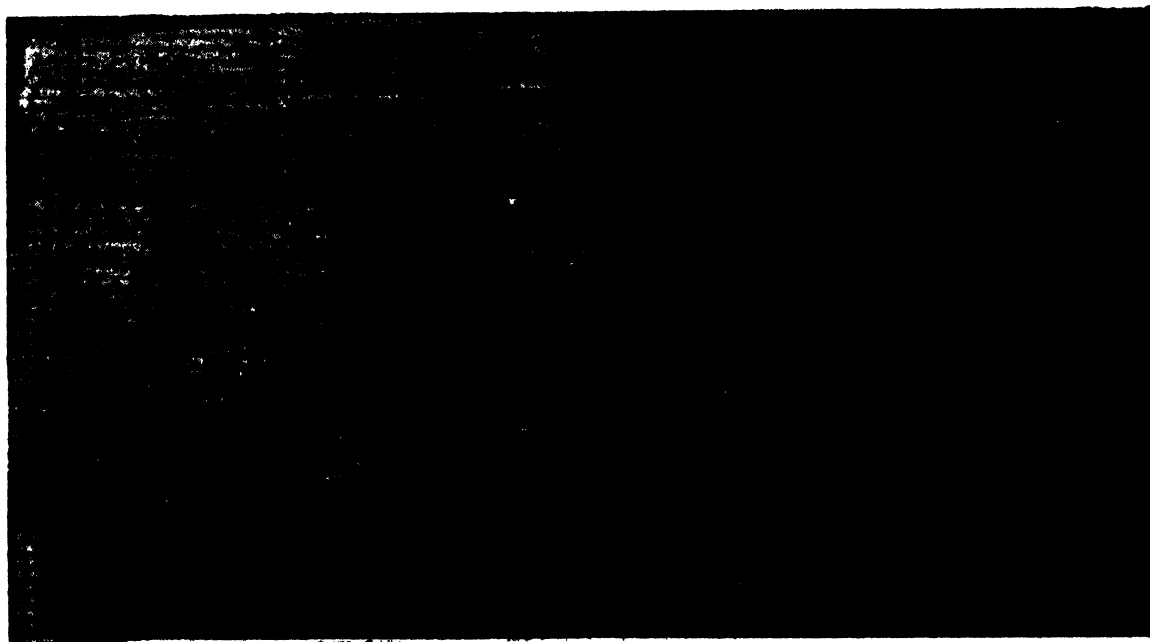
বারুইপুর থেকে কতগুলি নীতির ঘোষণা করেন।[১৮] এতে বলা হয় যে টালির নালা থেকে বোলোদানা পর্যন্ত ১৭৯০-এর পর উদ্ধারকৃত জমি প্রকৃত উদ্ধারকারীকে তালুকদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। স্কটের পরিকল্পনা অনুযায়ী, জমি হাসিলের সাত বছর পর থেকে বিঘাপ্রতি পূর্ণমাত্রার খাজনা হবে আট আনা। কিন্তু জমিদারদের বিরোধিতার ফলে এই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়েছিল। স্কট এই সময় দেখেছিলেন, এই অঞ্চলে জঙ্গল হাসিল করেছিল প্রকৃতপক্ষে মলঙ্গীরা কিন্তু জমি আবাদযোগ্য হওয়ার পর জমিদারেরা তাদের জমি থেকে উৎখাত করেছিল।[১৯] স্কটসাহেব পরে সুন্দরবনের কমিশনার হয়ে (১৮১৬) মাত্র ১৯টি পতিতাবাদী তালুক ও ৩টি কাটকিনা তালুকের[২০] অংশ বিশেষ জরিপ করতে পেরেছিলেন। কাটকিনা তালুকগুলি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত—জমিদারদের এই দাবি মেনে নিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে মারাঠা যুদ্ধ, বাণিজ্য ও মূলধনি বাজারে মন্দা ইত্যাদি কারণে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কোম্পানি সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[২১] সুতরাং নতুন গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস (ময়রা) রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধির উপর নজর দিতে বাধ্য হলেন। ২৪-পরগনার পুরাতন জমিদারদের সংলগ্ন বনাঞ্চলের উপর সীমাহীন দাবি, এবং হেঙ্কেল-স্কট পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনের উত্তরসীমা নির্ধারণের বিষয়টি এইবার সবিশেষ গুরুত্ব পেল। সরকারের নির্দেশক্রমে সরকারি আমিন এন সাইন প্রিন্সেপ ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে যমুনা থেকে পিয়ালী নদী এবং তার পরের বছর পিয়ালী থেকে কুলপী (হুগলি নদীর ওপর) পর্যন্ত জরিপ করে সমগ্র বনাঞ্চলকে নির্দেশক সংখ্যাসহ কতগুলি 'লট' বা 'ব্লক'-এ বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে (১৮৩০) প্রিন্সেপের জরিপের উপর ভিত্তি করে লেফটেনান্ট হজেস সুন্দরবনের যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, তাতে প্রিন্সেপের এই লটগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এই সময় পরিচালক সভার আপত্তি সত্ত্বেও ভারতের ইংরেজ সরকার 'হস্তান্তরিত ও অধিকৃত প্রদেশসমূহে (উত্তরপ্রদেশ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। রচয়িতার নামানুসারে [illegible] 'ম্যাকেঞ্জি পরিকল্পনা' সুন্দরবন আবাদিকরণের ক্ষেত্রেও প্রয়ো[illegible] সিদ্ধা[illegible] হয়।[২২] এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৮৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দে [illegible] মোট ৯৮টি লট স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। ব[illegible]সারে প্রথম ২০ বছর নিষ্কর থাকার পর একুশতম [illegible]-চতুর্থাংশের খাজনা নির্দিষ্ট হয়েছিল বিঘাপ্রতি আট [illegible]ম পাঁচ বছরের মধ্যে মোট জমির এক-চতুর্থাংশ জঙ্গ[illegible] [illegible]শ্যিক শর্ত ছিল। মূলত এই হাসিল শর্ত না মানার জন[illegible]বস্তই পাঁচ বছর পর বাতিল হয়ে গিয়েছিল।[২৩]

সুতরাং ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে [illegible] উ[illegible]র্তর নতুন আইন তৈরি হল। এই আইনেই 'কুখ্যাত' [illegible] লিজ ও ক্রমবৃদ্ধিমূলক (Progressive) খাজনার ক[illegible]ল, মোট জমির এক-চতুর্থাংশ বসত ইত্যাদির জন্য [illegible]ক্ত থাকবে এবং বাকি তিন-চতুর্থাংশের জন্য ২১তম [illegible]প্রতি দুপয়সা দিয়ে শুরু করে ৫০তম বর্ষে পূর্ণ খাজনা [illegible] দুই [illegible] এই আকর্ষণীয় শর্তের সঙ্গে অবশ্য বন হাসিলের বা[illegible] প্রথম ১০ বছরে এক-চতুর্থাংশ, ১২ বছরে অর্ধেক [illegible] ১[illegible]র মধ্যে জমির তিন-

সুন্দরবনের গভীর ম্যানগ্রোভ অরণ্য
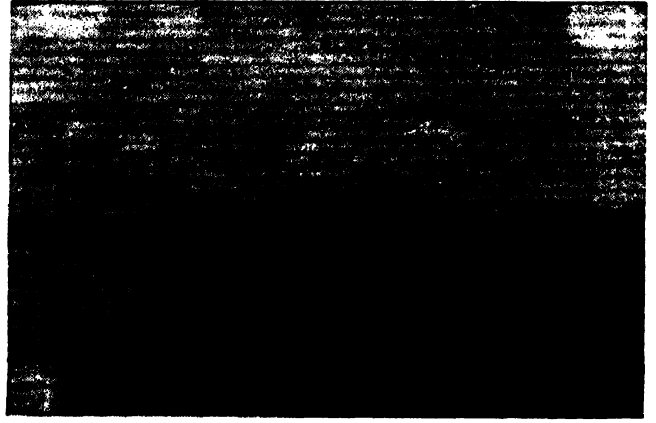
চতুর্থাংশ জঙ্গলমুক্ত ও আবাদি করতে হবে। অন্যথায়, লিজচুক্তি বাতিল হবে। ১৮৫৩-এর এই 'পতিত জমি আইন' খাজনার নিম্নহারের জন্য লিজ গ্রহীতাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। ২৪-পরগনা সুন্দরবনের অনেক লিজগ্রহীতাই ১৮৩০-এর স্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা ত্যাগ করে ১৮৫৩-এর আইনের সুবিধা গ্রহণ করেছিল। কার্যত লিজ-গ্রহীতারা এর ফলে এক একটি জায়গিরের মালিক হয়ে উঠল।[২৪]

ইতিমধ্যে কোম্পানির শাসনের অবসান হল (১৮৫৮)। কিন্তু ব্রিটিশ সংসদীয় শাসনেও রাজস্ব বৃদ্ধির ঔপনিবেশিক লক্ষ্যের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। লর্ড ক্যানিং ১৮৬৩তে দুটি নতুন বিধানের প্রচলন করলেন। এর একটিতে ছিল সরাসরি বিক্রির প্রস্তাব এবং দ্বিতীয়টিতে এককালীন থোক টাকার বিনিময়ে লিজগুলির সম্ভাব্য সমুহ খাজনা মকুবের প্রস্তাব। উভয় ক্ষেত্রেই পতিত জমির প্রাথমিক খাজনা ধরা হয়েছিল একরপ্রতি আড়াই টাকা। এই আইনের প্রধান সুবিধা ছিল এই যে এতে জঙ্গল হাসিলের কোনও বাধ্যকতামূলক শর্ত ছিল না।

কিন্তু দুর্গম বন হাসিলের কষ্টসাধ্যতা ও লাভের অনিশ্চয়তা থাকায় এককালীন একটা বড় অঙ্কের অর্থ দিয়ে পতিত জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার মতো খুব বেশি প্রস্তাব পাওয়া গেল না। ফলে, এক বছর পর ১৮৫৩-এর বিধিব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হল। কিন্তু তারপরও বন হাসিলের কাজ খুব বেশি দূর এগোয়নি। আবাদিকরণের জন্য নির্দিষ্ট মোট ৫৫১৯ বর্গ মাইল অখণ্ড সুন্দরবনের মধ্যে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মাত্র ৭৮৭ বর্গ মাইল জঙ্গল হাসিল করা গিয়েছিল।[২৫] তা ছাড়া, ১৮৪২, ১৮৬৪, ও ১৮৮৭-এর বিধ্বংসী বন্যা ও সামুদ্রিক ঝড় বন হাসিলের কাজে বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল।[২৬]

মেয়াদি বন্দোবস্ত

ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাদের সর্বশেষ লড়াই ছিল ১৮৬৭-এর 'ফি সিম্পল' আইন। উনিশ শতকের ষাটের দশকে সরকারের সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতি আর এই বন্দোবস্তের অনুকূল ছিল না। তীব্র মুদ্রাস্ফীতি ও রৌপমূল্যের দ্রুত অবনতির ফলে সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।[২৭] ১৮৬১-এর শেষে রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ায় ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর চার্লস উড উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্বকে চিরকালের মতো নির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়ার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ১৮৬৭ সালে ভারত সরকারকে পাঠানো এক বার্তায় তিনি নতুন

কোথাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণে উদ্যোগী না হতে পরামর্শ দেন।[২৮] এর ফলে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারণা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই বছরই পতিত জমি উদ্ধারের বিধান রচনার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্ট ও সুন্দরবন কমিশনার গোমেসের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব বোর্ড ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরবনে বিলি-বন্দোবস্তের জন্য বৃহৎ পুঁজিবাদী ও ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী নামে দুরকম বিধান ঘোষণা করে। এই বিধানগুলি সুন্দরবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারণের সব রকম সম্ভাবনা নির্মূল করে দিয়েছিল।

চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনের প্রায় সব বন্দোবস্তই এর পর বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানের উপর ভিত্তি করে হয়েছিল।[২৯] এই বিধানে একটি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে জমির উর্ধ্বসীমা ছিল প্রথমে ৫,০০০, পরে ১০,০০০ বিঘা এবং মেয়াদ ছিল ৪০ বছর। ১৮৫৩-এর বিধানমত বন্দোবস্তি জমির এক-চতুর্থাংশ বসতি ইত্যাদির জন্য স্থায়ীভাবে নিষ্কর ছিল। বাকি তিন-চতুর্থাংশ জমির জন্য বন্দোবস্তের দশ বছর পর থেকে খাজনা নির্দিষ্ট ছিল একরপ্রতি এক টাকা। কিন্তু বন্দোবস্তের দাবিদার বেশি হলে সর্বোচ্চ খাজনা প্রদানকারীকেই মাত্র বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। বন হাসিলের আবশ্যিক শর্তগুলি অবশ্য ছিল ১৮৫৩-এর অনুরূপ। এই বিধানে বন্দোবস্ত এলাকার মধ্যে পথঘাট, নদী ও নদীবাঁধের উপর লটদারের কোনও স্বত্ব মানা হয়নি।

ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জমির উর্ধ্বসীমা ছিল ২০০ বিঘা; বন্দোবস্তের সময়সীমা ৩০ বছর। খাজনার কোনও সুনির্দিষ্ট হার ছিল না। বন্দোবস্তের তৃতীয় বর্ষ থেকে সংলগ্ন এলাকার প্রচলিত খাজনার উপর ভিত্তি করে খাজনা নির্দিষ্ট করার নিয়ম ছিল। প্রতি ৫ বছর অন্তর নতুন জরিপের সময় সংলগ্ন বনাঞ্চলের অতিরিক্ত আবাদি জমির খাজনা নির্ধারণের সুযোগ ছিল। বাখরগঞ্জ সুন্দরবনেই এই ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী বিধান বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল।[৩০]

১৮৭৯-১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উপরোক্ত দুই বিধান অনুযায়ী বিলিযোগ্য মোট ২,৩০১ বর্গ মাইল বনাঞ্চলের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ১,২২৮ বর্গ মাইল জমি বন্দোবস্ত দেওয়া গিয়েছিল। চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনে আপাতত ৭০,৩২৯ টাকা কিন্তু কালক্রমে বৃদ্ধিযোগ্য পুঞ্জীভূত খাজনার জন্য মোট ২,৩৫,১১১ টাকা মূল্যের ১৮৮টি বৃহৎ পুঁজিবাদী লিজ দেওয়া হয়েছিল।[৩১]

বাখরগঞ্জ মডেল ২৪-পরগনায় প্রয়োগের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। এখানে একাধিক লটের সমবায়ে বৃহদায়তন জমি বৃহৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ইজারা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ২৪-পরগনার ইজারাদাররা কম সময় ও কম খরচে বেশি লাভবৃদ্ধির আশায় জমি ছোট ছোট খণ্ডে পত্তনি (Sub-lease) দিতে শুরু করে। এর ফলে জমির ফাটকাবাজি শুরু হয়ে যায়।[৩২] পত্তনিদার একইভাবে অধস্তন পর্যায়ে আর একজনকে জমি বিক্রি করে দেয়। জমি এভাবে দ্রুত হাতবদল হওয়ায় ও প্রত্যেক জমি-মালিকের দ্রুত লাভ বৃদ্ধির লক্ষ্য থাকায়, বন হাসিলের সমূহ দায়িত্ব পড়েছিল শেষ পর্যন্ত প্রকৃত কৃষকের উপর।[৩৩] ওম্যালি (O'Malley) সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন, ইজারাদাররা প্রথমে সহজ শর্তে একদল কৃষককে বন হাসিল ও আবাদের জন্য একখণ্ড জমি দিত; কিন্তু জমি আবাদযোগ্য হওয়ার পর তাদের তাড়িয়ে উচ্চতর খাজনার ভিত্তিতে নতুন কৃষকদের জমি বন্দোবস্ত দিত।[৩৪] নোনা জল আটকাবার নদীবাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ইজারাদারদের। কিন্তু অনেকেই সে দায়িত্ব পালন করত না।[৩৫] অনেকে আবার জমির নির্দিষ্ট খাজনার সঙ্গে অনির্দিষ্ট উপকর বা 'আবওয়াব' দাবি করত। ফলে কৃষকের দুর্দশার অন্ত ছিল না।[৩৬]

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত

এই পরিস্থিতিতে ১৯০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বৃহৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্থগিত রেখে ২৪-পরগনার কোনও কোনও এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে আবাদকারী প্রকৃত কৃষককে বন্দোবস্ত দেওয়া জমির পরিমাণ ছিল ১০ থেকে ৭৫ বিঘা। সরকার বন্দোবস্ত এলাকায় মিষ্টি জলের পুকুর খনন, নদীবাঁধ নির্মাণ ও জঙ্গল হাসিলের জন্য অর্থসাহায্যের আশ্বাস দেয়। চব্বিশ পরগনার নারানতলায় (ফ্রেজারগঞ্জ) ১৯০৪-৫ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনার সান্ডারের (Sunder) উৎসাহে রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় বন হাসিল ও বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এই কাজ এতই দুরূহ ও ব্যয়বহুল ছিল যে শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান ও উর্বরতার জন্য এক সঙ্গে বাঁধ নির্মাণ, বন হাসিল ও চাষবাদ না করলে শুধু হাসিল করা জমি পরের বছর আবার জঙ্গলে ঢেকে যেত। সান্ডার প্রথম বছর ৬৫,১৭৫ টাকা ব্যয় করে মাত্র ২,৬১১ একর জমি হাসিল করতে পেরেছিলেন। ওই বছর মাত্র ২৫টি কৃষক পরিবার হাসিল করা জমিতে বসতি শুরু করে। পরের বছর ১,৪৯,৭১২ টাকা ব্যয় হয়েছিল কিন্তু বসতির জন্য এসেছিল মাত্র ২টি কৃষক পরিবার।[৩৭] ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ফ্রেজারগঞ্জের মোট ২৮,২৫৫ বিঘা জমির মধ্যে মাত্র ১,৯০০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত দেওয়া গিয়েছিল। অনিশ্চিত জীবন, পরিশ্রমসাধ্য বন হাসিলের কাজ ও সর্বোপরি কম পারিশ্রমিকের জন্য কৃষকরা ফ্রেজার-গঞ্জের সরকারি ব্যবস্থাপনায় আসতে চায়নি। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত এইভাবে ২৪-পরগনায় ব্যর্থ হলে ১৯১০ সালে সুন্দরবনের অবশিষ্ট অঞ্চলে জমি বন্দোবস্তের জন্য আবার বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানকেই পুনরুজ্জীবিত করা হল।

বিশেষ বন্দোবস্ত

শেষ পর্যন্ত সাগরদ্বীপে বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হলেও এখানকার ভূমিব্যবস্থায় কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। হুগলি নদীতে নৌচলাচলের নিরাপত্তার জন্য, বিশেষত দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজিদের সাময়িক বিনোদনের ক্ষেত্র হিসাবে এই দ্বীপকে গড়ে তোলার জন্য উনিশ শতকের শুরু থেকেই একটি সরকারি উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।[৩৮] ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে গঠিত সাগরদ্বীপ সোসাইটিকে সমস্ত দ্বীপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩৩-এর ঝড়ে সাগরদ্বীপের উত্তরাংশে সোসাইটির গড়ে তোলা ৪টি উপনিবেশ মার্ডপয়েন্ট, ফেরিটোস, ট্রাওয়ারল্যান্ড ও শিকারপুর এবং দক্ষিণের ধোবলাট ধ্বংস হয়ে যায়। হান্টার, হেয়ার, ক্যাম্পবেল ও ম্যাকফারসনের পরবর্তী প্রয়াসও ৬০-এর দশকের ক্রমাগত ঝড়ে ব্যর্থ হয়েছিল। এরপর উন্নততর সুউচ্চ বাঁধ ও ঘেরপুকুর তৈরির আবশ্যিক শর্তের ভিত্তিতে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে নিলামে এককালীন নগদ টাকার বিনিময়ে সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে উপরোক্ত ৫টি এস্টেটের আবাদি জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। ১৮৯৭ সালে বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানে দ্বীপের
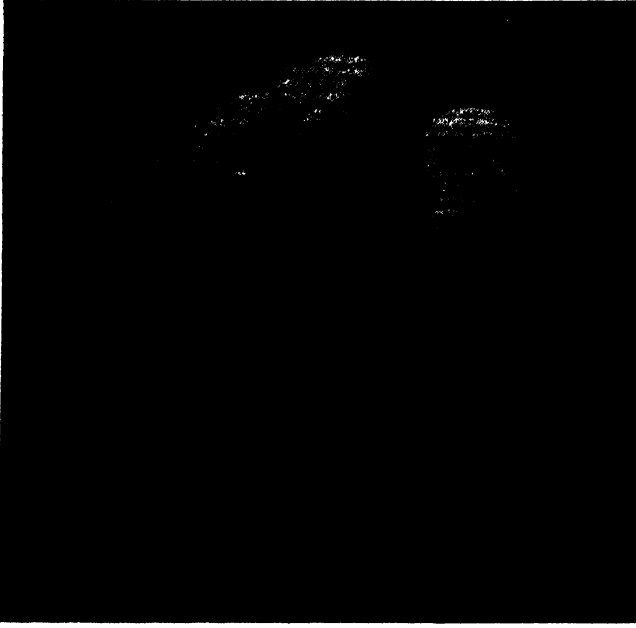
সুন্দরবনের পরিযায়ী পাখি

বাকি অংশের মোট ২০,৩৬২ একর জমি ৬ জন আবেদনকারীর মধ্যে বণ্টন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষ বন্দোবস্তটি ছিল ক্যানিংয়ে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে হুগলি নদীর নাব্যতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় সুন্দরবনে মাতলা ও বিদ্যাধরী নদীর সংযোগস্থলে কলকাতার বিকল্প হিসাবে একটি বন্দর গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়।[৩৯] এই উদ্দেশ্যে সরকার ৫৪ নং লটটি মূলত লিজগ্রহীতার কাছ থেকে ১১,০০০ টাকার বিনিময়ে কিনে নেন। ৫৪ ও সংলগ্ন ৫৫ নং লটের অংশবিশেষে মাতলা নদীর উপকূলে ৮ মাইল দীর্ঘ একটি বন্দর শহরের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজও দ্রুত শুরু হয়। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে এই কাজ পরিচালনার জন্য একটি মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হলে সরকার সমূহ ওই মিউনিসিপ্যালিটিকে হস্তান্তরিত করে। এর পরের বছরই ক্যানিংকে কলকাতার [illegible] যুক্ত [illegible] একটি রেলপথও চালু হয়ে যায়। লটগুলির বা[illegible] [illegible] [illegible] হাসিল ও জমি আবাদিকরণের জন্য ১৮৬৫ [illegible] [illegible] হয় পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, রিক্রেমেশন অ[illegible] [illegible] [illegible] লিমিটেড নামে আর একটি সংস্থা। পোর্ট ক্যানিং [illegible] [illegible] উল্লিখিত অংশকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ক[illegible] [illegible] [illegible] জন্য বন্দোবস্ত দেয়। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক শিল্পব[illegible] [illegible] [illegible] করতে না পারায় এবং জাহাজ কোম্পানিগুলি ক্যানি[illegible] [illegible] [illegible] আগ্রহ হারিয়ে ফেলায় ষাটের দশকের শেষে এ[illegible] [illegible] [illegible] পরিত্যক্ত হয়।[৪০] মিউনিসিপ্যালিটি ও ডক কো[illegible] [illegible] [illegible] আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সরকার মিউনিসিপ্যালিটির [illegible] [illegible] [illegible] বাজেয়াপ্ত করে সরকারি সম্পত্তি হিসাবে ২৪-পরগনা[illegible] [illegible] [illegible] বিলি-বন্দোবস্তের দায়িত্ব দেয়।[৪১] ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে পো[illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানি ভেঙে গিয়ে পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড কোম্পানি না[illegible] [illegible] হয়। বোম্বাইস্থিত পার্শী কোম্পানির পরিচালনায় এ[illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানি সুদীর্ঘকাল ক্যানিং অঞ্চলে জমি লেনদেনের [illegible] [illegible] ছিল।

মূল্যায়ন

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনের যা লক্ষ্য—কম সময়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ, সেই লক্ষ্যেই কোম্পানি ও সংসদীয় শাসনের আমলে ইংরেজ সরকার সুন্দর বনের ভূমিব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সুন্দরবনসহ চব্বিশ পরগনার সর্বোচ্চ রাজস্ব স্থির করতেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই শেষ পর্যন্ত বৃহৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভাবন। Ascoli প্রদত্ত ১৯০৪-এর এক হিসাব অনুসারে, সেই সময় পর্যন্ত নানা ব্যবস্থায় বন্দোবস্ত দেওয়া মোট জমির পরিমাণ ছিল ৭,৭০,০৩১ একর এবং তার মধ্যে বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানের অধীন বন্দোবস্ত জমির পরিমাণ ছিল সর্বাধিক, ৩,২৫,৬৭০ একর। এককালীন সমূহ সম্ভাব্য মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেওয়া (Redeemed) ২৪টি এস্টেটের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১,১৭,১১৩ একর।[৪২] প্রথম দিকে ইজারাদার কেউ কেউ ছিলেন পুরাতন জমিদার, যেমন রাজবল্লভ রায়, মহম্মদ শামী প্রমুখরা। কিন্তু পরে শহরের বেনিয়া ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা ২৪-পরগনা ও সুন্দরবনের জমিদার বিনিয়োগকে নিরাপদ ও লাভজনক মনে করে। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বেশির ভাগ অবশ্যই ছিল ইংরেজ কর্মচারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জমি শিল্পের বিকল্প মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় জমিভিত্তিক সামাজিক সম্পর্কের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সামন্তপর্বের জমিদার-কৃষক সম্পর্কের মধ্যে যে স্বার্থ ও সম্পর্কের বন্ধন ছিল তা হারিয়ে যেতে শুরু করে।

সরকারি ইংরেজ কর্মচারীদের কাছে সুন্দরবন শোষণের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫৩-এর বিধানে মোট ১৭৮টি বন্দোবস্তের মধ্যে ৩০টির গ্রহীতা ছিল ইউরোপীয়। সাগরদ্বীপের ৬টি বৃহৎ পুঁজিবাদী বন্দোবস্তের সবটার গ্রহীতা ছিল ৪ জন ব্রিটিশ। পোর্ট ক্যানিং এলাকার বিশাল জমিদারি পেয়েছিল বোরাডাইল অ্যান্ড কোং (Boradaile & Co.)। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অনেক গ্রামের সঙ্গে এই সব ইংরেজ লিজগ্রহীতাদের নাম জড়িয়ে আছে।

বিধানের পর বিধান তৈরি হয়েছে; কিন্তু কোনও বিধানেই কৃষকের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি। লটদার ও প্রকৃত কৃষকের মধ্যে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হওয়ায় কৃষকের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। লটদার বা লাটদার চকদারকে, চকদার বা গাঁতিদার রায়তকে নগদ অর্থে জমি বন্দোবস্ত দিত। রায়ত-নির্দিষ্ট খাজনা ও সেলামির বিনিময়ে কৃষককে জমি বিলি করত। বাখরগঞ্জের তুলনায় জমির এই ক্রমিক হস্তান্তর (sub-infewdation) অবশ্য ২৪-পরগনায় ঘটেছিল কৃষকের ওপরের স্তরে মাত্র দুটি পর্যায়ে।[৪৩] কিন্তু বাখরগঞ্জে যেভাবে রায়তি কৃষকের উদ্ভব ঘটেছিল, ২৪-পরগনায় তা হয়নি।

ঔপনিবেশিক সরকারের সাধারণ ঝোঁক ছিল বৃহৎ পুঁজি-পতিদের দিকে। ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী বিধানের চেয়ে বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানে অনেক বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী আইনে আমল-নামার দিন থেকে প্রথম চার বছর খাজনা ছাড় ছিল। কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে এই ছাড় ছিল ১০ বছর। লিজের সময়সীমা প্রথমটির চেয়ে শেষেরটির ক্ষেত্রে ১০ বছর বেশি ছিল। খাজনার ক্ষেত্রেও বৃহৎ পুঁজিপতিরা ক্ষুদ্রদের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কম দিত।

ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী বিধানই পরে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের পথ করে দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৯-এর ক্ষুদ্র পুঁজিবাদী বিধান অনুসারে একজন

উদ্যোগী লিজগ্রহীতা সংলগ্ন বনাঞ্চল হাসিল করে নিজে জোতের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারত। এইভাবে ক্রমগত জোতের আয়তন বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুঁজিপতিও তালুকদার বা হাওলাদারের মর্যাদা পেয়েছে।[৪৪] কিন্তু কৃষকের বঞ্চনা ও শোষণ কোনও ক্ষেত্রেই কম ছিল না। লাটদার, হাওলাদার বা তালুকদাররা বসতি ও আবাদ এলাকার প্রান্তিক ও আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে আইনগতভাবে বাধ্য ছিল না। ফলে, লাটদারের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর কৃষকদের নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।[৪৫] স্বহস্তে হাসিল করা জমি থেকে নানা অজুহাতে কৃষকদের উৎখাত করা নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধানের পুনরুজ্জীবনের সময় ২৪-পরগনা সুন্দরবনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) প্রয়োগ ঘটিয়ে নতুন বন্দোবস্ত এলাকাগুলিকে গ্রামের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং কৃষকেরাও আবাসিক রায়তের মর্যাদা লাভ করে। সেই সঙ্গে নদীবাঁধ সংরক্ষণের উপর জেলা কালেক্টরের নজরদারির সুপারিশ করা হয়। কিন্তু কখনোই এই বিধানগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি সদিচ্ছা ছিল বলে মনে হয় না।

২৪-পরগনা সুন্দরবনে রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের প্রচলন (১৯০৫) নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল। কেননা, এই প্রথম কৃষিকে এক বিনিয়োগযোগ্য বাণিজ্যসম্পদ হিসাবে দেখা হয়েছিল।[৪৬] সরকার রায়তি এলাকায় জঙ্গল হাসিল ও বসতি স্থাপনের পরিকাঠামো নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ভুল পরিকল্পনা, সরকারি অর্থকৃচ্ছ্রতা ও দ্বিধাগ্রস্ততার জন্যই ফ্রেজারগঞ্জে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়েছিল। জঙ্গল হাসিল ও সমুদ্রবাঁধ নির্মাণের চেয়ে সাভারসাহেব স্বদেশীয়দের জন্য উপকূলবর্তী বিনোদন ক্ষেত্র (Seaside resort) নির্মাণে বেশি মনোযোগী ছিলেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনার

অরণ্য-সংগীত
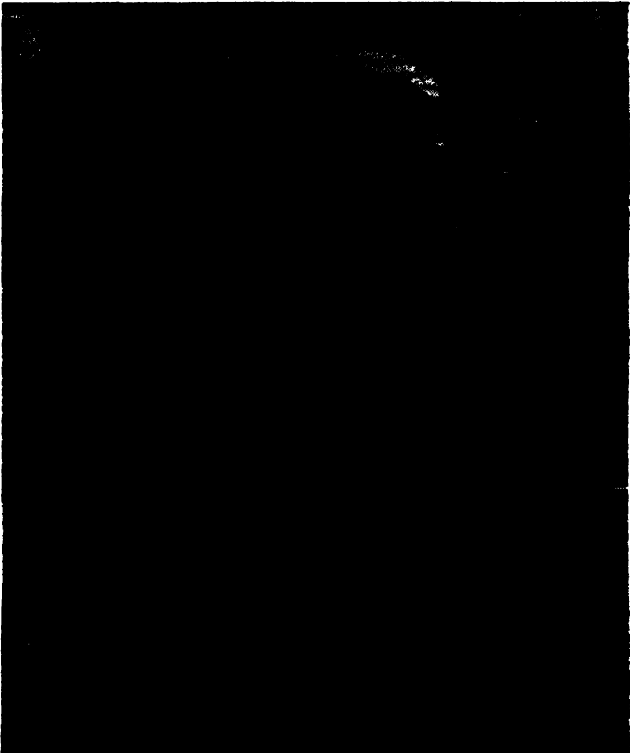
কালেক্টর স্টিভেনসন মুরী (Stevenson moorie) সুন্দরবন পরিভ্রমণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ফ্রেজারগঞ্জের ব্যর্থতা সমগ্র ২৪-পরগনায় রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত বর্জনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হতে পারে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ফ্রেজারগঞ্জ ছাড়াও সরকারে পুনর্ন্যস্ত (resumed) চব্বিশ পরগনার অন্য ১৮টি এস্টেটে সরাসরি সরকারি ব্যবস্থাপনায় রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল। কিন্তু মুরী দেখেছিলেন ১৯০৪ থেকে ১৯১৫-এর মধ্যে ১১ বছরে এই সব অঞ্চলের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ জমি জঙ্গলমুক্ত ও আবাদযোগ্য করা গিয়েছিল। এবং সরকার এই সব অঞ্চলে ওই ১১ বছরে বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাত্র ৬৪৯ টাকা ৮ আনা ব্যয় করেছিল।[৪৭]

মুরীর প্রবল আপত্তির ফলে রাজস্ব বোর্ড ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বৃহৎ পুঁজিবাদী বিধান চূড়ান্তভাবে বাতিল করে চব্বিশ পরগনায় কিছু সংশোধনসহ রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের বাখরগঞ্জ মডেল প্রবর্তনের সুপারিশ করলে, সরকার তা গ্রহণ করে। বাখরগঞ্জ মডেলের উপর যে সংশোধন করা হয়, তাতে বলা হয় যে বন্দোবস্ত এলাকায় রায়তদের স্থায়ী বসবাসের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রায়তদের উপর বর্তাবে। ১৯১৯-এর পর ব্রিটিশ শাসনকালের অবশিষ্ট সময়ে রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবনের পশ্চিম ও পূর্বাংশের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান, মাটির উর্বরতা ও ফসলের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে পার্থক্যের দরুন কৃষি সম্পর্কেরও পার্থক্য তৈরি হয়েছিল। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে চব্বিশ পরগনায় কৃষি জোতদার-বর্গাদারে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু বাখরগঞ্জে অনুকূল পরিবেশ ও বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে পাটচাষের আনুকূল্যে অনেক স্বাধীন ছোট ও মধ্য চাষি টিকে গিয়েছিল।[৪৮] হান্টার (Hunter) সেই ১৮৭০-৭২ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনায় জোতদারি ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন।[৪৯] মধ্যস্বত্বভোগী চকদার, গাঁতিদাররা এমনকী, রায়তি কৃষকরা বিশাল পরিমাণ জমি নিজহাতে কিংবা নিজ তত্ত্বাবধানে মজুর লাগিয়ে চাষ করার চেয়ে নগদ অর্থে কিংবা অর্ধেক ফসলের 'বিনিময়ে জমি ভাগে বিলি করাকে বেশি লাভজনক মনে করছিল। বিশেষত উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে চালের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সেই কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্যের ক্রমাগত দামবৃদ্ধির ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা ফসলের বিনিময়ে জমি ভাগচাষে দেওয়া বেশি পছন্দ করত। হান্টারের ধারণা, উনিশ শতকের শেষেও ২৪-পরগনায় স্বত্ববান প্রজাই বেশি ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে কৃষকদের এক-পঞ্চমাংশ ছিল স্বত্বহীন প্রজা। 'আধিভাগ জোতদার', অধুনা বর্গাদার নামে খ্যাত ভাগচাষীরা মূলত ছিল এই স্বত্বহীন প্রজা। উৎপাদনের সব উপকরণের সঙ্গে শ্রম বিনিয়োগ করেও বর্গাদাররা অর্ধেক ফসলের বেশি দাবি করতে পারত না। এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বাজার ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার, যুদ্ধের অভিঘাত ও অস্বাভাবিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নগদ অর্থের খাজনা জমিদার-জোতদারদের কাছে আদৌ আর লোভনীয় ছিল না।[৫০] সুতরাং ২৪-পরগনায় ভাগচাষের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল।

কিন্তু একই সময়ে জমির খণ্ডিতকরণ, আয় হ্রাস, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি

ও মহাজনি শোষণ ইত্যাদি কারণে চাষির জীবনে সংকটও বেড়েছিল দ্রুত। এই সংকট আরও তীব্র হয়েছে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝায় বসতি ধ্বংস হয়ে গেলে, কিংবা জমিদার-জোতদারদের ইচ্ছাকৃত অবহেলায় নদী-বাঁধ ভেঙে গেলে। লোনা জল একবার ঢুকে গেলে লবণাক্ত কৃষিজমি কয়েক বছর অনাবাদি পড়ে থাকত। অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার এই ইতিহাসই স্বাধীনতার প্রাক্কালে ২৪-পরগনা বিশেষত জেলার পূর্বতন সুন্দরবন অংশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছিল।

সূত্র নির্দেশ :

১। Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Bengal, Vol. I, New Delhi, 1984, p. 357

২। Huq Majharul, East India Company's Land Policy and Commerce in Bengal, 1698-1704, Dacca, 1964. p. 40

৩। Mukherjee R. K., Indian Land System in Report of the Land Revenue Commission, Bengal, 1940, Vol. I, p. 178

৪। De Barun, West Bengal District Gazetteers, 24-Parganas, Calcutta, 1994. p. 88

৫। Mukherjee R. K. op. cit, p. 178

৬। "The western, southern and eastern boundaries of 'the pestilential tract near Calcutta, which afforded a home for wild animals and shelter to smugglers and pirates' were admittedly the river Hooghly. The Bay of Bengal and the river Meghna."
Ascoli F.D., A Revenue History of the Sundarbans, Calcutta, 1921, p. 3

৭। Letter to the Court of Directors from Bengal, dt. December 31, 1758. Aso, Huq M. op. cit. p 41

৮। Bengal Revenue Consultation, Fortwillium, 29 the April, 1762.

১০। Huq, op. cit., p. 45

১১। Pargiter F. E., A Revenue History of the Sundarbans, 1765 to 1870, Calcutta, 1934. p. 1

১২। Ibid.

১৩। Letter from the Court of Directors to Bengal, dt. 8th April, 1789

১৪। Ibid

১৫। Imperial Gazetteer, op. cit. p.375

১৬। O'Malley L. S.S., Bengal District Gazetteers, 24 Parganas, Calcutta, 1914. p. 178

১৭। Pargiter, op. cit. p. 6

১৮। Board of Revenue to Mr. Scott. dt. 3 and 17 March and 28 April, 1815.

১৯। Pargiter, op. cit. p. 7

২০। পতিত বা জঙ্গলাকীর্ণ জমি [illegible] উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলিকে পতিতাবাদী তালু[illegible]
Lahiri A.C., Final Repor[illegible] nd Settlement Operations in the Distric[illegible] nas, 1924-33, Calcutta, 1936. p. 107
জমিদার বা তালুকদারের [illegible] জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া ছোট আয়তনের [illegible] লুক বলা হত। Statistical Account of [illegible] 155)-এ এই তালুককে বলা হয়েছে "a le[illegible] tate for a term of years."
কার্যত এই দুরকম তালুকে[illegible] পার্থক্য ছিল না। দুই ক্ষেত্রে পাট্টা ছিল এক[illegible]

২১। Tripathy Amalesh, Trad[illegible] Commerce in Bengal Presidency 1793-1833, [illegible] p. 178 1

২২। Guha A. C., Land Syste[illegible] Bengal [illegible] Behar, Calcutta, 1915. p. 197

২৩। O'Malley. op. cit., p. 1[illegible]

২৪। "Short of granting jagirs", Wrote Major Jack, "the terms of 1853 were the most generous possible".—quoted by Ascoli F. D., op. cit. p. 19

২৫। Ascoli F. D., op. cit. p. 13

২৬। মিত্র সতীশচন্দ্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, ২য় সং, কলিকাতা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। পৃঃ ৫৭ ও ৫৮

২৭। Stokes Eric, The English Utilitarians and India, Oxford, 1959. p. 118

২৮। Wood to Frere, 25 Dec. 1861. Quoted by Amalesh Tripathy in "Financial Policy of British Rad", Bengal Past and Present, July-Dec. 1970. p. 228

২৯। Lahiri A. C., op. cit. p. 115

৩০। Ascoli, op. cit. p. 20

৩১। O'Malley, op. cit. p. 175

৩২। Lahiri, op. cit. p. 70

৩৩। সেন সুনীল, বাংলার কৃষক সংগ্রাম, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৫

৩৪। O'Malley, op. cit. p. 175

৩৫। পুঁজিবাদী বিধানে নদীবাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের কোনও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব লাটদারের উপর বর্তায়নি। ফলে, লাটদারের করুণার উপর কৃষকদের নির্ভর করতে হত। Ascoli, op. cit. p.20

৩৬। সার্ভে ও সেটেলমেন্ট রিপোর্টে ১০ রকম আবওয়াব বা উপকরের কথা আছে। এমনকী কৃষকের বাড়িতে কোনও বিবাহ অনুষ্ঠান হলে ও প্রীতি অনুষ্ঠানের জন্য ৩ থেকে ৪ টাকা লাটদারের প্রাপ্য ছিল। কোনও কোনও লাটে জমিদার-লাটদারের দেয় সরকারি রাজস্বের কিছুটাও কৃষকের কাছ থেকে আদায় হত।
Lahiri, op. cit. p. 74

৩৭। Ascoli, op. cit. p. 135

৩৮। Ibid, p. 23

৩৯। বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স প্রথম হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারাই মাতলা নদীর ওপর একটি বন্দর নির্মাণের প্রস্তাব করেছিল।
Bengal Chamber of Commerce to Govt. of Bengal, dt. 27th May, 1853. Paper on Port Canning.

৪০। Imperial Gazetteer of India, op. cit. p. 384

৪১। O'Malley, op. cit. p. 225

৪২। Ascoli, op. cit. p. 122

৪৩। Lahiri, op. cit. p. 70

৪৪। Ascoli, op. cit. p. 19

৪৫। Ibid. p. 20

৪৬। Ibid. p. 36

৪৭। Ibid p. 40

৪৮। সরকার সুমিত, আধুনিক ভারত, ১৮৮৫-১৯৪৭, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৪.

৪৯। Hunter W. W., A Statistical Account of Bengal, Vol. I London, 1875. Reprinted in India, Delhi, 1913. p. 338

৫০। Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. VI, Calcutta. 1940. Memorandum by Bangiya Provincial Krishak Sabha, p. 46.

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক*

পূর্ণেন্দু ঘোষ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা। তিনটি শব্দের সমাহারে গড়ে উঠেছে আমাদের এই ভূখণ্ডের নাম। এই নামের উৎপত্তি-সন্ধানে খুব বেশি দূর পিছিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, কালের নিরিখে নামটি অর্বাচীন কালের। শব্দ তিনটিকে উলটে নেওয়া যাক; পরগনা চব্বিশ দক্ষিণ। পর পর পড়ে গেলেই ইতিহাসের পারম্পর্য উঠে আসে। সেই পারম্পর্য পাঠান শাসক শেরশাহ্ থেকে শুরু করে অস্তগামী বিশ শতকে এসে পৌঁছায়। এর মাঝখানে আছে ইংরেজ আমল। স্থানবাচক চব্বিশ-পরগনা শব্দটি তৈরি হয় এই আমলেই। এখন আমরা চব্বিশ-পরগনার একটা অংশকে শিরোভূষণ 'দক্ষিণ' শব্দ উপহার দিয়ে আলাদা করে ফেলেছি। এতে বড় ভূখণ্ড ছোট হয়ে চলে আসে হাতের মুঠোয়। ক্ষতির কোনও প্রশ্ন নেই এক্ষেত্রে; বরং প্রশাসনিক সুবিধা হয় তাতে। মানুষের পাঁচমিশেলি প্রয়োজনের সুরাহা হয়।

ওপারে উত্তর, এপারে কালাপানি বঙ্গোপসাগরের কোল ছোঁওয়া দক্ষিণ। মাঝখানে নেই বিন্ধ্য পর্বতের বাধা, অথবা তারকাঁটা। ওপারের মানুষ খোঁড়া বিদ্যাধরী, মাতলা, করাতিয়া পেরিয়ে চলে আসে এপারের হাটে-মাঠে-লোকালয়ে। এপারের মানুষও যায় ওপারে। কখনও বা কলকাতা শহর ডিঙিয়ে উভয়েরই দেখা হয় দক্ষিণের সদর আলিপুরে। তারপর কথা হয়। কত কথা। ঐতিহ্যের রোমন্থন চলে পরস্পরের মধ্যে।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকুর প্রয়োজন হয়ে পড়ল আমাদের আলোচ্য জেলাটির সুমহান ঐতিহ্যের সূত্রে। নামে অর্বাচীন হলেও এ জেলার ভূতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্ন-ঐতিহ্য ও সর্বোপরি লোকায়ত সংস্কৃতি অতীব সুপ্রাচীন। যদিও সেগুলোকে যুগপরম্পরা অনুসারে গ্রথিত করা আজও সম্ভব হয়নি। সমস্ত উপাদানগুলোই এখানকার প্রায়-বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড

সম্প্রতি জেলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত গেজেটিয়ারে থানাভিত্তিক আদিবাসী জনবিন্যাসের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলার পাঁচ-ছটি থানা তথা মন্দিরবাজার, কুলপি, মগরাহাট, ফলতা, ডায়মন্ডহারবার ও বিষ্ণুপুর বাদে সুন্দরবন-সংলগ্ন থানাগুলোতেই আদিবাসীদের সংখ্যা সর্বাধিক। আদিবাসীদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায় গোসাবা থানায়। সংখ্যায় প্রায় কুড়ি হাজারের মতো। এর পরই সংখ্যার ক্রম অনুযায়ী আছে—ক্যানিং, বাসন্তী, কুলতলি ও জয়নগর। এই থানাগুলো ছাড়াও এ জেলার প্রায় সর্বত্রই আদিবাসীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করে।

দ্বীপমালার মতোই ইতস্তত বিক্ষিপ্তরূপে রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। অথবা আকস্মিক ভূমি অবনমনের ফলে পাণ্ডব-পোড়া মাটির সঙ্গে ভাব জমিয়ে আত্মগোপন করে আছে মাটির তলায়। সেই রত্নসম উপাদানগুলোর সার্বিক উদ্ধার সম্ভব হলেই প্রচলিত বাংলার ইতিহাস নড়েচড়ে উঠবে। কিংবা ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ের সংশোধন জরুরি হয়ে উঠতে পারে। তথাপি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ও ডিগ্রিহীন আঞ্চলিক গবেষকরা ইতিহাসের যেসব মালমশলা উদ্ধার করেছেন— তা মোটেই অপাঙক্তেয় নয়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার কথা উত্থাপন করলেই খুব স্বাভাবিক-ভাবেই সুন্দরবনের প্রসঙ্গ চলে আসে। দখনে মানুষের উচ্চারণে সুন্দরবন হয়ে গেছে সোঁদরবন। আরও সহজ কথায় 'বাদা'। অরণ্যভূমি সুন্দরবন নামের প্রচলন শুরু হয় ষোড়শ শতকে। অবিশ্যি পৌরাণিক যুগেও সুন্দরবনের অবস্থিতি ছিল। ভারতের তেরোটি প্রসিদ্ধ মহারণ্যের মধ্যে আঙ্গীরিয়বনের কথা পাওয়া যায়। যে অরণ্যের বিস্তৃতি ছিল বঙ্গোপসাগরের তটভূমি থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত। সুন্দরবন ছিল এই আঙ্গীরিয়বনের অন্তর্গত। এখন কথা হল, আরণ্যক সম্পদে ভরা নদীনালার পলিবিধৌত নিম্নবঙ্গের এই অঞ্চলটিতে মানুষ কবে থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে? সুদূর অতীত কাল থেকেই নিশ্চিত এই অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের কয়েকটি পঙক্তি স্মর্তব্য। তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশ'-এর প্রথম পর্ব 'মৃত্তিকা'য় সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে মানব-উপনিবেশের এক সুন্দর চিত্র উৎকীর্ণ করেছেন। কথাশিল্পী লিখছেন : "পৃথিবী বাড়িতেছে। দিনের পর দিন নদীর মোহনামুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে আর ক্রমে ক্রমেই সেই স্তরের উপর দিয়া সুন্দরবন

প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়ে লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।''

তবে উপন্যাসের এই তথ্য দিয়ে উনবিংশ-বিংশ শতকের সুন্দরবনে মানব-উপনিবেশের প্রক্রিয়া ও অভিবাসনের চলচ্ছবি তৈরি হয়; আদি জনগোষ্ঠীর পদধ্বনি ধ্বনিত হয় না। একথা ঠিকই যে, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা তথা সুন্দরবনের আদি জনগোষ্ঠী কিংবা অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃতি স্বরূপ ও জীবনপ্রণালী আজও সম্যকরূপে জানা সম্ভব হয়নি। অনেকেই আপ্তবাক্যের মতো বলে থাকেন, এ জেলায় মানুষের আগমন সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। অধিকন্তু ভূতত্ত্বের কারবারি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এখানে মাটিই তো ছিল না; মানুষ থাকবে কোত্থেকে। এখানকার ভূমির প্রাচীনত্ব বড়জোর ছ-সাত হাজার বছর। তার বেশি নয়। অবশ্য ভূতাত্ত্বিকদের নিজেদের মধ্যেই বিস্তর মতানৈক্য লক্ষ্য করার বিষয়। কেউ কেউ মাটির নাড়ি পরখ করে বলেছেন, কলকাতার উত্তর অঞ্চলের চেয়েও সুন্দরবনের দক্ষিণের কিছু কিছু অংশ প্রাচীনতর। আর তা নাকি প্রাচীন গণ্ডোয়ানা রাজ্যের একাংশ ছিল। তা হলে কোনটা সিদ্ধান্ত হবে? এখানকার মাটির নবীনতা নিয়ে যাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন, তাঁদের কণ্ঠস্বরে কিন্তু বাদ সাধছে এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্যগুলো। এখানকার মাটির পাতাল থেকে উঠে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক আদিপ্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ করে কুষাণ, মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল ও সেন যুগের বিবিধ প্রত্ন-উপাদান। এরই পাশাপাশি আছে পৌরাণিক সাহিত্য এবং বিদেশি গ্রিক-রোমান লেখক-পর্যটকদের অজস্র বিবরণ।

বক্ষ্যমান অধ্যায়ে সেই সব সাক্ষ্য দিয়ে এখানকার প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলোর একটা দিকনির্দেশক মুখবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। অবশ্য পৌরাণিক সাহিত্যগুলো আমাদের ব্যবহার করতে হবে অতি সাবধানে। কারণ পুরাণ-আশ্রয়ী নানাধরনের গল্পে আর্য জনগোষ্ঠীর দিগ্বিজয়ী রাজ-রাজড়াদের যশোগাথাই কীর্তিত হয়েছে। আর সেই যশোগাথাকে মহীয়ান করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এসে পড়েছে এখানকার জনগোষ্ঠীগুলোর কথাও। পুরাণকাররা তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখলেও সেকথা অনুক্ত রাখতে পারেননি। সেই রাজ-মাহাত্ম্য-কীর্তিত শ্লোক থেকেই [illegible] আনতে হবে সেকালের মানুষের কণ্ঠস্বর। কারণ কোনও [illegible] ইতিহাস তো কেবলমাত্র রাজা-ভূস্বামী-অমাত্য শ্রেণীর [illegible] রচিত হতে পারে না। পরন্তু সেই ইতিহাসকে বিজ্ঞা[illegible] হতে হলে পারস্পরিক উৎপাদন সম্পর্কে সম্পর্কিত [illegible] মানুষের কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনেতিহাসের লুপ্ত অধ্যা[illegible] কাঙ্ক্ষিত।

প্রথম আর্য :

প্রসঙ্গক্রমে আর্যদের [illegible] আলোকপাত করে নেওয়া যাক। বাঙালি হিন্দুসমাজের [illegible] অঞ্চলের বৈদিক আর্যদের দ্বারা প্রবর্তিত [illegible] ভাবনাকে আজও এদেশের জনমানস থেকে [illegible] সম্ভব হয়নি। আজকের দিনের যাবতীয় জাতপাতের [illegible] সম্প্রদায়িকতার ধ্যানধারণা এই চাতুর্বর্ণ্য থেকেই উদ্ভব [illegible] করেছে। গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে গঠিত চাতু[illegible] একেবারে গোড়ার দিকে আদৌ ছিল না। সম্ভবত এ কারণেই ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তটি ছাড়া অন্য কোনও ঋকে এর নামগন্ধের বালাই নেই। কোনও কোনও পণ্ডিত এই পুরুষ সূক্তকে ঋগ্বেদের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ এই সূক্তটি রচিত হয়েছিল সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরবর্তীকালে।

'বর্ণ' অর্থে কেউ কেউ গাত্রবর্ণ ধরলেও ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, বর্ণের সঙ্গে গায়ের রঙের কোনও সম্পর্ক নেই। এঁরা উভয়েই বর্ণের অর্থ করেছেন—Class ; Caste নয়। সম্ভবত বৈদিক আর্যদের বিভিন্ন শ্রেণী একে অপরের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে বিভিন্ন রঙের গাত্রাবরণ বা পোশাক পরিধান করত। আর তা থেকেই পরবর্তীকালে তৈরি হয় চাতুর্বর্ণ্যের ভাবনা-বীজ।

আমাদের আলোচ্য ভূখণ্ডে যে সমস্ত পুরাণ-কথিত রাজাদের বিজয়োল্লাস তাঁরা প্রত্যেকেই আর্য বংশসম্ভূত। তাঁদের নামগুলি পর্যন্ত সংস্কৃত শব্দসঞ্জাত। বেদবর্জিত এই ম্লেচ্ছ দেশে তাঁরা নিতান্ত দায়ে না পড়লে পদার্পণ করতেন না। তাঁরা আসতেন যখন যজ্ঞের ঘোড়া হারিয়ে যেত, মৃগয়ার শখ হত, দেশজয়ের বাসনা হত কিংবা সাগর-সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যি অর্জনের ইচ্ছে জাগত। তবে আর্যকুলোদ্ভব রাজারা এই ম্লেচ্ছভূমিতে পা দেওয়ার ফলস্বরূপ তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতেন। প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য কুলপুরোহিতের নির্দেশানুসারে রাজকীয় ব্যয়বহুল যজ্ঞ করে শুদ্ধ হতেন তাঁরা। সে যজ্ঞের নাম 'পুনোষ্টম'। তাঁদের চোখে এতটাই ঘৃণিত ছিল সেকালের ম্লেচ্ছদেশ—দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা।

রামায়ণের 'বালকাণ্ড' ছাড়াও বহু পৌরাণিক গ্রন্থে উপকূলস্থ বঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার পরিচয় পাতাল বা রসাতল নামে। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা ভাগে গঙ্গাসাগরকে অতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তীর্থক্ষেত্রে প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির এসেছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন মুক্তবেণী গঙ্গার সাগর-সঙ্গমে অবগাহন করে সমুদ্রতীর ধরে কলিঙ্গনগরাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। পদ্মপুরাণের ক্রিয়া-যোগসারে উল্লিখিত আছে, সুষেণ নামে চন্দ্র-বংশীয় জনৈক রাজা গঙ্গানদীর মোহনা-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। আর সেখানকার অরণ্যে দীপান্বিনগরের রাজনন্দিনী ও তালধ্বজনগরের রাজকুলবধূ সুলোচনা পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে ভীমনাদ নামে একটি গণ্ডার বধ করেছিলেন।

পৌরাণিক এসব গল্পকে অতিকথন বলে উপহাস করা যায়; কিন্তু তীর্থস্থান গঙ্গাসাগরের মাহাত্ম্য তাতে কোনক্রমেই খর্ব হয় না। অন্তত গুপ্তযুগের পূর্বেই গঙ্গাসাগর ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল—হলফ করেই একথা বলা যায় এই তীর্থস্থান নিরীশ্বরবাদী দর্শনের প্রবক্তা সাংখ্যকার কপিলমুনির স্মৃতিবাহী। বায়ুপুরাণ অনুসারে জানা যায়, মহর্ষি কপিল বেদের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করায় আর্যাবর্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে সাগরদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ তথ্য ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলে, এ জেলার প্রথম আর্য অভিবাসী হলেন কপিলমুনি। তিনি কি একাই এসেছিলেন? সম্ভবত নয়। কারণ কোনও দার্শনিক-মত আপনা-আপনি ব্যাপ্তিলাভ করতে পারে না। তার সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষণা কিংবা শিষ্যমণ্ডলী। কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে, সাংখ্য-মতের কিছু

এই জেলার প্রথম আর্য অভিবাসী কপিলমুনি (?)

সুহ্মরাজকে পরাস্ত করে সাগরতীরবর্তী ভূখণ্ডে আসেন এবং সেখানকার অধিবাসী ম্লেচ্ছদের জয় করেন।

এই ম্লেচ্ছ কারা? গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সঙ্কলিত 'শব্দসার'-এ ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ সংস্কৃত ভিন্ন ভাষাভাষী অসভ্য জাতি,—কিরাত শবর পুলিন্দ যবনাদি।' ম্লেচ্ছদের সম্পর্কে 'মুদ্রারাক্ষস'-এ আছে "গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে, সর্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ মানেই সদাচারহীন দেশ। কিরাত, শবর, পুলিন্দ, যবনসহ অনেকগুলি কৌম নিয়ে তৈরি হয়েছিল ম্লেচ্ছ পরিচয়। আবার বায়ুপুরাণেই ম্লেচ্ছ অর্থে আরও কয়েকটি কৌমের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তথা : নাগ, রাক্ষস ও অসুর। অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মনে করেন, সাগরদ্বীপ অঞ্চলে কিরাত গোষ্ঠীর বসবাস ছিল। ত্রিপুরা রাজবংশের 'খাবি' ও কের পূজক চন্তাই ও দেওড়াইগণ এখান থেকেই ত্রিপুরায় চলে গেছেন বলে এরকম মতও প্রচলিত আছে। উপরোক্ত কৌমগুলির প্রধানত জীবিকা ছিল মৎস্য শিকার এবং সুন্দরবনে জঙ্গল থেকে মধু ও কাঠ সংগ্রহ করা। অধিকন্তু মহাকবি কালিদাস চতুর্থ শতকে রচিত তাঁর রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং 'নৌসাধনোদ্যতান' অধিবাসীদের নৌযুদ্ধে পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত কালিদাসের সাহিত্যেই বাদা অঞ্চলের দখনে মানুষের পরাক্রমতা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হল। অবশ্য দিগ্বিজয়ী রঘুর কাছে শেষ পর্যন্ত বাদার অধিবাসীরা পরাস্ত হয়। আর মহারাজ রঘু নতুন জনপদ জয়ের স্মৃতিস্বরূপ 'গঙ্গা-স্রোতহন্তরে' বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। রঘুর সময়কাল প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর।

অনুসারী ভক্ত শরণার্থী কপিলকে সঙ্গ দিতেই চলে এসেছিলেন এই রসাতলে। অর্থাৎ মহর্ষি কপিল ও তাঁর ভক্তমণ্ডলীদের দিয়েই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় প্রথম আর্য অভিবাসনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। কপিলের আবাসস্থল সাগরদ্বীপ। এখানেই আছে কপিলমুনির আশ্রম। সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া অনুসন্ধানে এসে এখানেই কপিলের ক্রোধে ভস্মীভূত হন সগরের ষাট হাজার পুত্র। আর তাঁদের উদ্ধারেই ভগীরথ পুণ্যতোয়া গঙ্গাকে মর্ত্যে আবাহন করে নিয়ে আসেন।

ম্লেচ্ছ বিবরণ

শরণার্থী কপিলকে কারা সেদিন আতিথ্য দিয়েছিল? এখানে তখন কারা বসবাস করত। এরই ইঙ্গিত কিছুটা মেলে মহাভারতে। যথা—

"সমুদ্র সেনং নির্জিত্য চন্দ্র সেনং চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চরাজানাং কর্বটাধিপতিং তথা।।
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসীনঃ।
সর্বান ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।।"

অর্থাৎ পাণ্ডুতনয় ভীম দিগ্বিজয়ার্থে পূর্বভারতে এসে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তরাজ, কর্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গের রাজাদের ও

গঙ্গারিডি এবং গঙ্গারিডি

এবারে আসা যাক গঙ্গারিডির প্রসঙ্গে। এই জাতির শৌর্য-বীর্যের খ্যাতি প্রকাশ পায় মৌর্যযুগে। দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার গঙ্গারিডি রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসী হননি। প্রথম-দ্বিতীয় শতকের কার্টিয়াস রুফাসের রচনা, গ্রিক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা, অজ্ঞাতনামা গ্রিক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস মারিস ইরিথ্রিয়াই' ইত্যাদি গ্রন্থে এই গঙ্গারিডি জাতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। ইতালির মহাকবি ভার্জিল তাঁর 'জর্জিক্স'-এ গঙ্গারিডিদের বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। গঙ্গারিডিদের রাজ্য ছিল গঙ্গানদীর মোহনায়। রাজধানী ছিল বন্দর-শহর 'গঙ্গে'। এই বন্দরে অর্ণবপোতে করে সমবেত হতেন দেশবিদেশের বাণিজ্যকুশলী নাবিকরা। এবং এখান থেকেই তাঁরা জাহাজের খোল ভরিয়ে তুলতেন তেজপাতা, সুগন্ধী গাঙ্গেয় অঞ্জন তেল, মুক্তা, প্রবাল ও উৎকৃষ্ট জাতের গাঙ্গেয় মসলিনে। গঙ্গারিডি জাতির মানুষেরা ধর্মে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন। গঙ্গারিডিদের সম্পর্কে যা কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, তা সবই বিদেশিদের রচনায়। এদেশের শাস্ত্র, সাহিত্যে তার কোনও উল্লেখ নেই। ফলে গঙ্গারিডি জাতির দেশীয় নাম কী ছিল, আজও আমরা জানি না। পৌরাণিক যুগের ম্লেচ্ছদের সঙ্গে গঙ্গারিডিদের যোগসূত্র নিয়েও ইদানীং ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। কোনও কোনও গবেষক এ জেলার অন্যতম আদি বাসিন্দা ও বৃহত্তম জনগোষ্ঠী পৌণ্ড্রদের সঙ্গে গঙ্গারিডির দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

প্রাক্-ইতিহাসের কয়েকটি নমুনা

এ জেলার বহু স্থান থেকেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। যার সিংহভাগ সংগ্রহ করেছিলেন ঐতিহাসিক কালিদাস দত্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নির্দেশক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। এঁদের সংগৃহীত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে আদিপ্রস্তর, মধ্যপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন ধরনের মনুষ্য-ব্যবহৃত হাতিয়ার ও মানবসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান।

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বারুইপুরের হরিহরপুর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন আদিপ্রস্তর যুগের চপার চপিং, হাতকুঠার ও ছুরি। এসব পুরু-নিদর্শনের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছিল বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ। এ থেকেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, বারুইপুর সন্নিহিত এলাকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল আদিপ্রস্তর যুগের অনেক পরে। পরবর্তীকালে ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডঃ আর ভি যোশির সঙ্গে তিনি দেউলপোতা ও হরিনারায়ণপুরে খননকার্য চালান। এবং সেখান থেকে অসংখ্য প্রত্নায়ুধ সংগ্রহ করেন। হরিনারায়ণপুরে কালিদাস দত্ত বারোটি নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এইসব প্রত্নসাক্ষ্য থেকেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মনুষ্য বসবাসের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। অনুমান করা যায় এ প্রত্নায়ুধ নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষেরা ব্যবহার করত। অর্থনীতির দিক দিয়ে এরা ছিল জলচর। অন্যান্য হাতিয়ারের সঙ্গে চার কোণে পাথর বাঁধা একটা জালও পাওয়া গিয়েছিল। এই আদিম জাতি মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ, গুগলি ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করত।

উচ্চবর্ণের অভিবাসন

উচ্চবর্ণের জনগোষ্ঠী ঠিক কবে থেকে এই জেলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন ইতিহাসে তার কোনও সাল-তারিখ দেওয়া নেই। তবে মুদ্রা এবং অন্য পুরা-নিদর্শন থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় কুষাণ যুগ থেকে একটানা গুপ্ত, পাল ও সেনযুগ পর্যন্ত ভিন্ প্রদেশের ব্যাপক উচ্চবর্ণের মানুষ রাজকার্য অথবা জাতিচ্যুত হয়ে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় বসবাস করেছেন। চন্দ্রবংশের রাজা জয়ন্তচন্দ্র ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে কঙ্কণদিঘিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জটার দেউল। মথুরাপুর থানার বিস্তৃত ... রাজা সুবুদ্ধি রায় ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে 'রায়নগর' রাজ্য প্রতি... রায়নগরের রাজারা রায়দিঘি ও কঙ্কণদিঘির প্রতিষ্ঠা ক... খ্রিষ্টাব্দে। চন্দ্র ও রায়রা উচ্চবর্ণের মানুষ। 'রায়নগর' রা... জনশূন্য হয়। ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় (নকুলেশ্... উপন্যাস কুমুদানন্দ) বিভিন্ন ভূমিদানপট্টেও উচ্চ... উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাস... শর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণের কথা পাওয়া যায়।

যশোহররাজ প্র... বোড়শ শতক। তাঁর রাজ্যের পশ্চিম বিভাগ সাত... সীমানা ছিল বারুইপুর পর্যন্ত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ... থেকে আগত দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূ...ছিলেন বর্তমান ক্যানিং থানার হোমড়া গ্রামে। প্রতাপ... অব্যবহিত পরে এই ব্রাহ্মণরা রাজপুর, হরিণাভি, ...-মজিলপুর ও দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে ছড়িয়ে পড়েন। ১৫... খ্রিষ্টা... নদিয়াদুলাল শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন বারুইপুরের কাছে আটিসারা গাঁয়ের অনন্ত আচার্যের আশ্রমে। এ জেলায় কুলীন-কায়স্থদের মধ্যে অন্যতম বসু ও দত্তরা। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পূর্বপুরুষ গোপীনাথ বসু এখানে এসেছেন গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ্‌র সময় থেকে। মজিলপুরের দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ মুনশি চন্দ্রকেতু দত্ত খুলনা জেলার চাঁপাফুলি গ্রাম থেকে চিরতরের জন্য চলে আসেন ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে। জয়নগরের সর্বাপেক্ষা পুরাতন পরিবার মতিলাল ও মিত্ররা। মতিলালদের পূর্বপুরুষ গুণানন্দ মতিলাল যশোহরের বিক্রমপুর থেকে প্রায় তিনশ পঞ্চাশ বছর পূর্বে এখানে আসেন। জনশ্রুতি এরকম, তিনি জঙ্গলের মধ্যে জয়চণ্ডী দেবীর প্রস্তরমূর্তি পেয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে উক্ত দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম হয় জয়নগর। মিত্ররা এসেছিলেন বেহালার বড়িশা থেকে।

সুলতানি আমলে গৌড় রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন চক্রপাণি দে। তাঁর কন্যার উপর নবাবের দৃষ্টি পড়ায় তিনি হুগলি জেলার মহানাদ থেকে সুন্দরবনের জঙ্গলে পালিয়ে এসে আত্মগোপন করেন। উক্ত চক্রপাণি দে হরিণাভি গ্রামের পত্তন করেন। রামনগর গ্রামের প্রথম কায়স্থ রতিকান্ত দাস (সরকার)। তিনি এসেছিলেন হাওড়ার সাঁকরাইল থেকে। তাঁর পুত্র রামভদ্র দাসসরকারের নামানুসারে গ্রামের নাম হয় রামনগর। মথুরাপুরের সিংহ বংশের আদিপুরুষ সুবিখ্যাত রণপণ্ডিত গন্ধর্ব সিংহ। এই বংশের কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বর্গীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একমাত্র পুত্র রামেশ্বরকে নিয়ে চলে আসেন মথুরাপুরে। কৃষ্ণবল্লভের নবাবি উপাধি ছিল খাঁ। সিংহ পরিবার পরবর্তীকালে মথুরাপুর থেকে ছড়িয়ে পড়ে বহড়ু ও সিংহেরচক গ্রামে।

বহড়ু গ্রামের ভঞ্জদের পূর্বপুরুষ রত্নেশ্বর ভঞ্জ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার নলতা গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁর প্রপৌত্র অনন্তরাম মুলদিয়া গ্রামে চলে আসেন। এঁরই পুত্র শ্যামসুন্দর ভঞ্জ প্রায় তিনশ বছর পূর্বে বহড়ুতে বসবাস করতে থাকেন। ভঞ্জ পরিবারের হরনাথ ভঞ্জ রচনা করেছিলেন 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়'। এঁর সঙ্গে সেকালে বিশেষ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঋষি রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে।

বজবজ এলাকায় জঙ্গল কেটে প্রথম বসতি করেন সারাঙ্গাবাদের হালদার (পদবি 'দেব' এবং মুর্শিদাবাদ থেকে আগত হালদাররা, পদবি 'রায়')। এঁদের পরে আসেন পাঁজালরা। এরও পরে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হুগলির আগনা থেকে বজবজে আসেন হরিনারায়ণ ঘোষ।

লক্ষ্মীকান্তপুরের পুততুণ্ড পরিবারের আদি নিবাস বরিশাল জেলায়। তখন এঁদের পদবি ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বংশের জনৈক লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ১৬১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দে এখানকার জঙ্গল হাসিল করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর নামানুসারেই গ্রামের নাম হয় লক্ষ্মীকান্তপুর। কালক্রমে পুততুণ্ড পরিবার সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চলের জমিদারি প্রাপ্ত হন।

'পিছড়ে বর্গ' সমাচার

হিন্দুসমাজের অন্তর্গত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বসবাসকারী অন্যান্য অন্ত্যজ বর্ণের মধ্যে পড়ে—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, কৈবর্ত, ব্যগ্র ক্ষত্রিয়, সদ্গোপ, উগ্রক্ষত্রিয়, তিলি, সূত্রধর, কাওরা, রাজবংশী, যুগী, কামার, শুঁড়ি ইত্যাদি।

সুন্দরবনের শ্রমজীবী মানুষ

● সুন্দববনেব শ্রমজীবী নারী কাঁকড়া ধবতে গভীর জঙ্গলের পথে,

● মৌলীরা মধুসংগ্রহ করতে গভীর বনে ঢুকছেন

ছবি : হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল
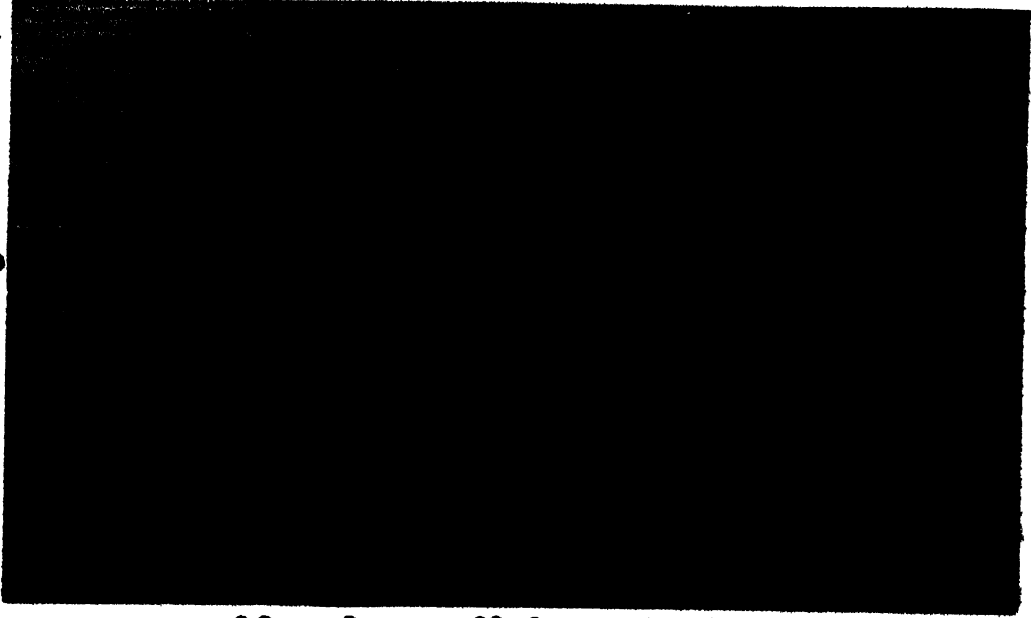
● চিংড়ি মাছের মীন ধরছেন শ্রমজীবী মহিলারা ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল

সুন্দরবন অরণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ মাটির ক্ষয়রোধে, নদীর ঢেউ প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনে উপজীবিকার অন্যতম অবলম্বন নৌপরিবহন

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ জেলার মোট জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ হল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠী। প্রাচীন বাংলার পৌণ্ড্রবর্ধননগরী এঁরাই গড়ে তুলেছিলেন। পুণ্ড্রদেশ বা পৌণ্ড্রবর্ধননগরী বাংলার ইতিহাসে আদিকাণ্ড বলেই ধরা হয়। পোদ্ সম্প্রদায়ের কেউ কেউ নিজেদেরকে পদ্মরাজ বলেও পরিচয় দেন। এ জেলায় পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের কয়েকটি সমাজ আছে। যেমন; মেদিনীপুরি ও বারুইপুরি। এ ছাড়াও আছে ভাসা পোদ কৈবর্ত বা কেবট জাতি 'কেবর্ত' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কৈবর্ত শব্দের প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (৩/৪/১২)। কৈবর্তদের প্রধানতম জীবিকা নৌচালন ও মৎস্য শিকার। পরবর্তীকালে নদী-পুকুর-জলাশয় থেকে এঁদের একটা গোষ্ঠী কৃষিকাজে নিয়োজিত হয়। তখন কৈবর্তরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে তৈরি হয় হালিয়া কৈবর্ত ও জালিয়া কৈবর্ত। কেবট ও কৈবর্তরা একই জাতি। কিন্তু কালক্রমে উভয়ে পৃথক জাতি বলে পরিচিত হয়েছে।

মাহিষ্যদের আদি বসবাসস্থল রাঢ়-তাম্রলিপ্ততে। এই জাতি মূলত কৃষিজীবী। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় মাহিষ্যরা আসেন একাদশ শতকে। বজবজ থানার বাওয়ালির মণ্ডল জমিদাররা মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। সদ্গোপ জাতির জীবিকা ছিল শাক-সবজি উৎপাদন। কেউ কেউ রাজকার্যে অংশ নিয়ে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা লাভ করতেন। এ জেলায় সদ্গোপদের পরিচয় দুগ্ধদোহনকারী গোয়ালা নামে। মৎস্যজীবী আর একটি জাতির নাম ব্যগ্রক্ষত্রিয় অর্থাৎ বাগদি। এঁদের শরীর বেশ কর্মঠ। স্বভাব-সাহসী। বাগদিদের আদি বাসভূমি দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু। পরবর্তীকালে এঁদের কোনও শাখা চলে আসে রাঢ় অঞ্চলে। এখানেই গড়ে উঠেছিল বাগদিদের নিজস্ব রাজ্য বাগড়ি। এ জেলার বাগদিরা রাঢ় অঞ্চল থেকেই এসেছেন। এই সম্প্রদায় এখানে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত। যথা; তেঁতুলিয়া, দুলে, জেলে, তিবর এবং মেটে বাগদি। ষোড়শ শতকে এ জেলার অন্যতম পোর্তুগিজ নৌঘাঁটি তাড়দহর নৌকর্মজীবী জেলেরা অধিকাংশই এসেছেন হুগলি নদী-তীরবর্তী হালিশহর থেকে। গোসাবা থানার মালোরা এসেছেন বাংলাদেশের খুলনা থেকে। অবিভক্ত সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বসবাস করেছেন রাজবংশী সম্প্রদায়। এঁদের আদি আবাসভূমি উত্তরবঙ্গ। বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্য তাঁর দুর্জয় সেনাবাহিনীতে উত্তরবঙ্গের বহু রাজবংশীকে নিয়োগ করেন। তাঁরাই এখানে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে রয়ে যান শেষ পর্যন্ত। বাসন্তী-গোসাবা থানার বিস্তৃত অংশে রাজবংশীরা বসবাস করছেন।

নম বা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে রচিত 'শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্র'-এ। অসমসাহসী এই জাতির বীরত্বের প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এঁদের উপাধি বা পদবী দাশ, মৃধা, শিকদার, ঢালী, মণ্ডল, বরকন্দাজ, চৌধুরী, তালুকদার ইত্যাদি। জেলার ক্যানিং, বাসন্তী, কুলতলি, গোসাবা, নামখানা, সাগর ইত্যাদি এলাকায় নমঃশূদ্রদের বসবাস লক্ষ্য করা যায়।

এ জেলার কয়েকটি থানা তথা সাগর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ ও মথুরাপুরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছেন মৃৎশিল্পী বা পটুয়া সম্প্রদায়। তবে নিজেদেরকে এঁরা 'চিত্রকর' নামে পরিচয় দেন। অনেকের হিন্দু ও মুসলমান দুটো করে নামও আছে। এয়োতী স্ত্রীরা হাতে শাঁখা পরেন, আবার সিঁথিতে সিঁদুরও দেন। এই সম্প্রদায়

মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন। এখন আর কেউ পট আঁকেন না। মাটির ঠাকুর তৈরি করেন।

জেলার অন্যান্য কয়েকটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'হাড়ি' সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত জীবনযাপন করে। এঁদের অর্থনৈতিক মানও অনেক নিচে। এ জেলার হাড়িরা সম্ভবত এসেছেন রাঢ় অঞ্চল থেকে। মধ্যযুগের সামন্ত রাজাদের হাতি-ঘোড়া পরিচর্যার কাজে হাড়িদেরকেই নিযুক্ত করা হত। হাড়ি সম্প্রদায়ের উপবিভাগগুলি হল : ভুঁইমাল, কুলহাড়ি, কাহার, মেথর ও কদমা। ধাত্রীবিদ্যায় হাড়ি সম্প্রদায়ের মেয়েদের খুবই হাতযশ। সুভাষগ্রামের কাছে পিতাম্বরীর মাঠে অবস্থিত 'হাড়ি ঝি চণ্ডী'র থান হাড়ি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ছাড়া সোনারপুর থানার চাকবেড়িয়া গ্রামের কাছে আছে 'হাড়িপুকুর'।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সমাজ-অর্থনীতির কাঠামোয় আরও কয়েকটি জনগোষ্ঠীর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন; কাওরা, মুচি, ডোম, যুগী, শঙ্খবণিক, মোদক, সূত্রধর, সাপুড়িয়া বেদে, কামার, কুমোর ইত্যাদি। আলোচনার পরিসর সীমাবদ্ধ হওয়ায় এখানে তাঁদের কথা তুলে ধরা গেল না।

ভিন্ প্রদেশের ভাগ্যান্বেষী

ভিন্ প্রদেশের বহু জনগোষ্ঠি এ জেলায় বসবাস করেন। তাঁদের সম্পর্কে সামান্যতম আলোচনা হয়েছে বলে বর্তমান নিবন্ধকারের জানা নেই। সেই হেতু তাঁদেরকে নিয়ে স্বল্প আলোকপাত করা উচিত। কলকাতার জনবিস্ফোরণের চাপে বিহারের ছাপরা ও মুঙ্গের থেকে রুটিরুজির সন্ধানে আসা হিন্দুস্থানি সম্প্রদায়ের বহু মানুষ কলকাতা ছেড়ে এখন এ জেলার আধা-শহর ও গঞ্জে বসবাস করছেন। এঁদের পূর্ববর্তী বংশধরগণ বাদা অঞ্চলেই ঘর বেঁধেছেন। এখানকার অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও মিশে গেছেন কেউ কেউ। এঁদের পূর্বপুরুষরা অনেকেই এসেছিলেন সুন্দরবনের চকদার, গাঁতিদারের পেয়াদা বা লাঠিয়াল হিসেবে। উত্তরপ্রদেশের কনৌজি ব্রাহ্মণ ও অন্য সম্প্রদায় এসেছিলেন এরকমই জমিদারি সূত্রে। কালক্রমে মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন এঁরাও। মারোয়াড়িরা সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। এখনও এঁরা রক্ষণশীলতা বজায় রেখে চলেছেন। পারতপক্ষে এঁদের ছেলেমেয়েরা অন্য কোন[illegible] সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। তবে এ[illegible] যে কোনও হেরফের ঘটছে না—তা বলা যাবে না। এ[illegible] ঘটি[illegible] অবশ্যি সেই বিদ্রোহী সন্তানের শাস্তি—তাকে সম্পূর্ণত ত[illegible]। [illegible]বের কেউ তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

রাজপুতানার জয়[illegible]ও এসেছিলেন কেউ কেউ। আনুমানিক একশ বছ[illegible]লেন মহাদেব সিংহ। ইনি অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয়। পাঁ[illegible] ঠা[illegible] সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। এঁর বংশধরগণ পরে 'রায়' [illegible] ব্যব[illegible]রেন। বসবাস করেন ক্যানিং থানার বাঁশড়া গ্রামে। বি[illegible] বাঁশড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রামের হীরাবল্লভ রায়ও এসেছিলে[illegible]শ্চি[illegible] থেকে। এঁর বংশধরগণ পরে মুসলমান ধর্মসহ নাম [illegible] এঁরা হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত।

একদা বাংলা-বিহা[illegible]ড়িষ্যা [illegible] ছিল একটাই 'সুবে বঙ্গাল'। সেই সূত্রে উড়িষ্যার সঙ্গে [illegible] টান বজায় ছিল। সুন্দরবনে বসবাসরত ওড়িয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে বিশেষ ক্ষেত্রসমীক্ষা হয়নি। অথচ ক্যানিং-বাসন্তী-গোসাবা থানার ব্যাপক অংশে ওড়িয়া জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ বসবাস করেন। ফেলে আসা পিতৃভূমির সঙ্গে মৃদু সম্পর্ক কোনও কোনও পরিবার আজও রক্ষা করে চলেছেন। তবে অনেক পরিবারের সেই বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। কেউ কেউ পালটে ফেলেছেন নিজেদের পদবিটাও। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এখানে ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে। এঁরা চকদারি আমলে মূলত এসেছিলেন চকদারবাবুদের পালকির বেহারা অথবা রাঁধুনে হিসেবে। গঞ্জ এলাকায় কেউ কেউ করেছেন মিষ্টির দোকান, পানের দোকান, হোটেল, কেউ করেছেন জল বওয়ার কাজ। মানুষের কাছে এঁদের পরিচয় 'জলের ভারী' নামে। দক্ষিণের এই জংলো দেশে গুঁও-পান ও গুড়াখু-তামাকের প্রচলন—উড়িষ্যাবাসীদেরই অবদান।

সম্প্রীতির নয়া ফসল

এবারে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে আসি। দক্ষিণের জঙ্গল অধ্যুষিত নদী-নালা কিংবা পীরের থানে কান পাতলেই শোনা যাবে "গাজীর মিএগর হাজোত/সিন্নি সম্পূর্ণ হল। হিন্দুগণে বল হরি,/মোমিনে আল্লা বল॥" ধর্মে মুসলমান হলেও এই সম্প্রদায়ের মানুষজন জনগোষ্ঠীগত দিক দিয়ে বাঙালির ব্রাত্য অংশ থেকেই নবতর মরুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর নেপথ্যের ইতিহাসে আছে উচ্চবর্ণের মানুষের সামাজিক নিপীড়ন, অবহেলা ও অবজ্ঞা। এ জেলায় ইসলাম ধর্ম এসেছিল পীর, গাজি, সুফিদের হাত ধরে। সুফি মতবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। তখন থেকেই হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বাদী চিন্তাভাবনা সমাজমানসে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ব্রাত্য সম্প্রদায়ের হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থে সুফি-চিন্তার দ্বারস্থ হন। পুরানো হরিমন্দিরের পাশেই গড়ে উঠে গাজিসাহেবের দরগা-মসজিদ। হিন্দুর ভগবতী গোধন রোগশোক থেকে রেহাই পায় মানিক পীরের গান-গাওয়া ফকিরের চামর-ছোঁয়ায়। মাঝিমাল্লারা দুরন্ত নদী পাড়ি দেওয়ার সময় তাদের নৌকায় একই সঙ্গে তুলে নেয় মা গঙ্গা ও বদর পীরকে। এই সমন্বয়বাদিতার প্রকৃষ্ট ফসল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বনবিবি, বিবিমা ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবী। দক্ষিণের মানুষ এর বিকল্প কোনও দিন চায়নি। আজও চায় না।

পালাবদলের সূচনা : আদিবাসী পর্ব

ষোড়শ শতকের স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্য রায়ের অনিবার্য পরাভবে একেবারে জনমানবশূন্য হয়ে যায় দক্ষিণের এই তল্লাট। প্রতাপাদিত্যের কীর্তিবহুল রাজ্যপাট—গড়, দিঘি আর লোকালয়ের উপর পলির আস্তরণ পড়ে তৈরি হয় শক্ত মাটি। আর সেই মাটির গভীরে শিকড় চালিয়ে ঘন পত্রপল্লব ডালপালা সমেত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। এই জঙ্গল হাসিলের উনিশ শতকীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে ব্যাপক মানুষের অভিবাসন জরুরি হয়ে পড়েছিল যেন। একথা বলা বাহুল্য, এই ব্যাপক মানুষের মধ্যে আদিবাসীদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। জেলার সুন্দরবন-সংলগ্ন লবণাক্ত ঊষর এলাকাগুলিকে শস্যশ্যামলে পরিণত করার অভিপ্রায়ে তারাই প্রথম নদীর নোনা জলের ঢেউকে প্রতিহত করার জন্য দ্বীপের চতুর্দিকে ভেড়ি বেঁধেছিল, হাসিল করেছিল সুন্দরী, গরান, বাইন, ক্যাওড়া, ধুঁদুল, পশুর, তর্জন আর হেঁতাল বা বোগড়া পাতার জঙ্গল। অকল্পনীয় কায়িক

পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তারা মাটি থেকে উপড়ে ফেলেছিল লবণাক্ত গাছগাছালির গুলো আর শিকড়। এই কর্মযজ্ঞ সেদিনের নিরিখে খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। ভৌগোলিক দুর্গমতা তো ছিলই, যেহেতু সভ্য নগর থেকে বিচ্ছিন্ন বদ্বীপের সমগ্র শরীরজুড়ে ছিল শিরা-ধমনীর মতোই অসংখ্য নদীনালা-সুঁড়িখালের বিস্তার। তদুপরি ছিল পানীয় জলের হাহাকার, খাদ্যাভাব। গাছের কাছে মাথা কুটে মরলেও খাদ্য মেলে না। চারদিকে ওৎ পেতে থাকা ভয়াল মৃত্যু-বিভীষিকার মধ্যেই আদিবাসীদেরকে আবাদ-পত্তনের নয়া ইতিহাসে সামিল হতে হয়েছে। বিশ্বের যে কোনও লোমহর্ষকর অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর পাশে জঙ্গল হাসিলের সেই অধ্যায় বোধ করি কম রোমাঞ্চকর নয়। আশ্চর্যের হলেও সত্য, ইতিহাসে রেনেল, হান্টার, স্মিথ, হেঙ্কেল, বেভারিজ, হ্যামিল্টন, ফ্রেজার প্রমুখ শ্বেতাঙ্গ সাহেবসুবো এবং জমিদার, চকদার ও লাটদারের কথা লেখা থাকলেও কালো মানুষ আদিবাসীদের কথা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ এই আদিবাসীরাই জেলার বাদা অঞ্চলের ভূমিসন্তানের প্রকৃত দাবিদার।

ভূমি বন্দোবস্ত : আদিবাসী আগমন

আনুমানিক সত্তর হাজারের মতো আদিবাসী মানুষ এ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এ ছাড়াও প্রতি বছরের নির্দিষ্ট মরসুমে জেলার শিল্পাঞ্চলে ও ইটভাটা-টালির কারখানায় কয়েক হাজার আদিবাসী ঠিকা শ্রমিক কিংবা রেজাকুলি হিসাবে এসে থাকে।

আদিবাসীদের গ্রামীণ পরিচয়—বুনো। বলা বাহুল্য 'বুনো' শব্দটি মহনীয় অর্থে নয়। শব্দটি ঘৃণাব্যঞ্জক। তপশিলি জাতি ও বর্ণহিন্দুরা এই নামে আদিবাসীদের অভিহিত করে থাকে। যদিও ভদ্রবাবুদের অবজ্ঞা নিয়ে আদিবাসীরা মাথা ঘামায় না। বরং তারা 'বুনো' বা 'বনুয়া' বলতে নিজেদেরকে গর্ববোধ করে। জেলার যে কোনও আদিবাসী অধ্যুষিত পাড়ায় প্রবেশ করলে, খুব সহজেই বুনোপাড়া হিসাবে চিনে ফেলা যায়। পাড়াগুলির অবস্থান গ্রামের একেবারে শেষ সীমানায় সাধারণত হয়ে থাকে। বেশ কয়েকটি পাড়া তৈরি হয়েছে গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও নাবাল জায়গায়। আবার কোনও পাড়া হয়তো বা গড়ে উঠেছে গাঙ-ভেড়ির পাশে, নদীর চরে কিংবা খালের বাঁধে। ঘরগুলো ঘুপচি টাইপের। মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের ছাউনি দেওয়া। অনেক সময় জানালাও থাকে না ঘরে। আলের

এই জেলার আদিবাসীদের বাড়িতে এখনও ঢেঁকির ব্যবহার দেখা যায়

ছবি : শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়
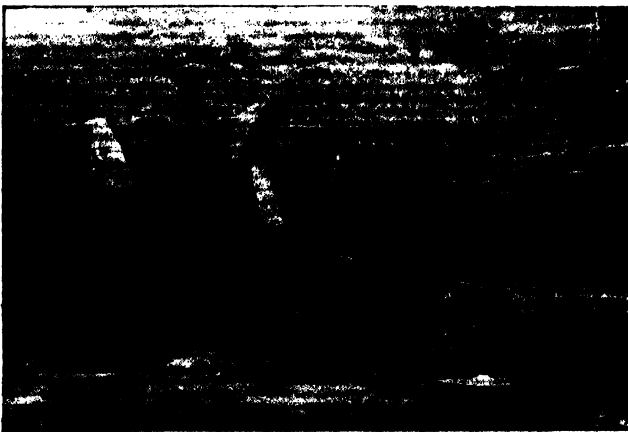
মতো মেটে রাস্তার পাশে খোঁটায় বাঁধা শুকরের পাল। দু-চারটে মোরগ-মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিউতি। নাড়া-পোড়া ছাইয়ের গাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে আদিবাসী ন্যাংটো বালক-বালিকারা। কেউবা ভিন্-গাঁয়ের পথিক মানুষকে দেখে অবাক চোখে থমকে আছে চিত্রার্পিতের মতো।—এই হল বুনোপাড়া। বসবাসের এই অবস্থান থেকে বুনোদের অবজ্ঞাত জীবন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে নিশ্চিত। অবশ্য ভদ্রহিন্দুদের থেকে একটু দূরে থাকার প্রবণতাও এর মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয়। নিজেদেরকে আড়ালে আড়ালে রাখার মধ্যেই যেন স্বস্তি পায় আদিবাসী বুনোরা। এর হেতু কারণ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

এখানে আদিবাসীদের প্রথম আগমন সূচিত হয় ইংরেজ আমলে, প্রায় দুশো বছরেরও আগে। এই আগমন আরও দ্রুততর হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে। শুধুমাত্র এ জেলাই নয়; ১৮৮২ সালের 'ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট' এবং 'ইনল্যান্ড ইমিগ্রেশন অ্যাক্টে'র সূত্রে 'ইনডেনচার লেবার' হিসাবে আদিবাসীরা ছড়িয়ে গিয়েছিল—কয়লাখনি অঞ্চলে, বাংলাদেশের নীলচাষের এলাকায়, আসামের চা-বাগিচায়, মরিশাসে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনি-এলাকায়।

জনশ্রুতি এই—সাঁওতাল উপজাতিরাই সর্বপ্রথম এখানে কুলি হিসাবে এসেছিল। বাদাই ছিল সাঁওতালদের শেষ উপনিবেশ। এর পরে আর অন্যত্র সাঁওতাল উপনিবেশ গড়ে উঠেছে বলে শোনা যায়নি।

আদিবাসীদের এই অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছিল দালাল বা আড়কাঠিয়া ও গিরমিটে-এর (Agreement-এর ছোটনাগপুরিয়া রূপ) মাধ্যমে। আপাতনিরীহ কালো রঙের কৌম মানুষগুলির নিজভূম থেকে দেশান্তরী হওয়ার প্রাক্-পটভূমিতে সে সময় উত্তাল হয়েছিল কয়েকটি গৌরবময় আদিবাসী প্রজা বিদ্রোহ তথা চুয়াড়, কোল, ভূমিজ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, তিলকা মাঝির আন্দোলন, খারওয়ার বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, মেলি আন্দোলন ইত্যাদি। দুষ্ট মহাজনের মহাজনি শোষণ আর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মুহুর্মুহু নির্মম অত্যাচার আদিবাসীদের ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্তে ইন্ধন জোগায়। এর মধ্যেই ঘটে যায় ১৭৭০ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত উপর্যুপরি কয়েকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যার ফলশ্রুতিতে আদিবাসী কৌম মানুষ সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্য দুনিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতনের পরে ১৭৫৭ সালের ১৫ জুলাই মীরজাফরের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক সন্ধি হয়। এই সন্ধির নয় নম্বর শর্তানুসারে কলকাতাসহ দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত জঙ্গলময় এলাকা ইংরেজ কোম্পানির অধিকারে আসে। কোম্পানির কাছে জঙ্গলময় এলাকার পরিচিতি ছিল 'পতিত আবাদি তালুক' নামে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত বাংলার কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে দেশীয় বাণিকি পুঁজির জমিতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ইঙ্গিত সাফল্যে আহ্লাদিত হয়ে ইংরেজ কোম্পানি পতিত আবাদি তালুকগুলির বন্টন-ব্যবস্থার কর্মসূচি গ্রহণে ভীষণ তৎপর হয়। যদিও যশোরের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেলসাহেব ততদিনে জঙ্গলাকীর্ণ তালুকের কিছু অংশ হাসিল করে রায়তদের কাছে সরাসরি বন্দোবস্ত দিয়ে ফেলেছেন। এঁরই আবাদি করা তালুকের নামে হেঙ্কেলের তালুক

আদিবাসীরা মেহনতের জমি ধরে রাখতে পারেননি

বা হেঙ্কেলগঞ্জ (বর্তমানে 'হিঙ্গলগঞ্জ', উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত)।[২]

হেঙ্কেলের পরে চব্বিশ পরগনার কালেক্টর ক্লড রাসেলের সময়ে সুন্দরবনে চালু হয় জমি বন্দোবস্তের ইজারা প্রথা। আর এই প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জমির ইজারা নেওয়ার জন্য শহরের উঠতি মধ্যবিত্ত, মৎসুদ্দি ও বেনিয়াদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। টাকীর জমিদার কালীনাথ মুনশি, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ঝামাপুকুর রাজবাটির দিগম্বর মিত্র প্রমুখ স্বনামখ্যাত ধনী ভূস্বামীরা যেমন এখানে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন; আবার এঁদের আগে-পরে জমিদারি করতে এসেছিলেন কৃষ্ণনগরের পালচৌধুরী (বাসন্তী), ভবানীপুরের মহেশ চৌধুরী (বাসন্তী), খুলনা জেলার তারাপদ ঘোষ (মঠেরদিঘি), বারুইপুরের রায়চৌধুরী (এঁদের জমির সীমানা-সংক্রান্ত একটি প্রবাদ : 'আঠার ভাঁটি শ্বেত বোগড়া'), পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি (মাতলা অঞ্চল থেকে মিনাখাঁ-উচিলদহ পর্যন্ত), পামার অ্যান্ড ম্যাকিন্টস্ (সাগরদ্বীপ), ড্যানিয়েল ম্যাকিনন্ হ্যামিল্টন (গোসাবা) সহ বহু ব্যক্তি [illegible] জমিদার[illegible] প্রতিষ্ঠান।

মূল জমিদারের [illegible] স্বত্বভোগী চকদার-লাটদার-গাঁতিদার সম্প্রদায় [illegible] জন্য আড়কাঠিয়া নিযুক্ত করেছিলেন। আর এ[illegible] টোপ ও পরামর্শ পেয়ে আদিবাসীরা চলে এসো[illegible] এদেরই ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ও ঘামের বিনিময়ে এখান[illegible] মাটি ক্রমশ কৃষির উপযোগী হয়ে ওঠে। শর্তসাপেক্ষে [illegible]ও পেয়েছিল। কিন্তু অনেকেই মেহনতের সে জমি ধ[illegible]। কালক্রমে আড়কাঠিয়া ও তাদের সাগরেদ ছোট[illegible]দাররাই আদিবাসীদের জমি থেকে উৎখাত করে [illegible]ক্র গড়ে তুলেছিল। জমিচ্যুত হওয়া ছাড়াও আঁতাত[illegible]য় নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনার সীমা-পরিসীমা ছিল [illegible] এলাকার চকদার (ডাকসাইটে জমিদার) ও তার [illegible]র কর্তা সেজে শোষণ আর অপশাসনের মৃগয়াক্ষে[illegible]। এর ধারা একটানা অব্যাহত ছিল স্বাধীনোত্তরকালে[illegible]টের [illegible] পর্যন্ত। আদিবাসীদের সারল্য, অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে জমি বিক্রির কেবালায় জাল টিপসই কিংবা দাদনিপ্রথা চাপিয়ে চকদারদের জমি হস্তগত করার ঘটনা যেমন এখানে আছে ; তেমনই নেশার ভক্ত আদিবাসীদের সামান্য একবাটি পচানি বা হাঁড়িয়া খাইয়ে জমি লিখিয়ে নেওয়ার ঘটনাও এখানে বিরল নয়।

যার পরিণাম ধরেই দক্ষিণের নোনা মাটির বুকে এক সময় তৈরি হয় তেভাগা আন্দোলনের রক্তঝরা অধ্যায়। স্বভূমিতে সংগঠিত অতীত বিদ্রোহের যে উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে এসেছিল তারা, সেই উত্তরাধিকার নিয়েই নতুন এক আন্দোলিত অধ্যায়ের সঙ্গে সামিল হয়েছিল আদিবাসী জনসম্প্রদায়।

রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে আগের সেই শোষণ লুপ্ত হলেও তার ছবি ধরা থাকে মানুষের গানে-গল্পে-বহতা জীবনের সংস্কৃতিতে। এ কথাই পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিল সেদিন কুলতলি থানার সাঁওতালপাড়ায় শোনা ঝুমুর গানটি :

বন জঙ্গল কাটিকুটি
ভেড়িয়ানে দিলি মাটি
এহ বনেক মাটিরে হলাক খাঁটি
রে বুনুয়া জাতি......
এহ বন কাটলি
বাঘ হরিং কুদালি
যার দুরা বাঁধলি
কিছুদিন বসবাস করলি
আধা মূলে লে লেঁলায় বাঙালি।

এখানকার যে কোনও আদিবাসী পল্লীর বাতাসে কান পাতলেই এ রকম আরও গান শুনতে পাওয়া যায়। কথা ও সুরের সামান্য হেরফের থাকলেও গানের মর্মার্থ কিন্তু একই থাকে। বদলায় না। ওরাঁও সম্প্রদায়ের এক বয়স্কা মহিলা শুনিয়েছিলেন এরকমই একটি গান :

বন জঙ্গল কাটিকুটি
বাঘ সিংহ কোঁদাকুদি
বানুয়াকে জমিন লিলেচ বাঙালি।
হায়রে ওঁরাও জাতি—
দশটা ট্যাকা দিলা
জমি সব কিনা লিলা
বানুয়াকে জমিন লিলেচ বাঙালি।
নারায়ণ দাশ কহে
একথা মিছা নহে
বনুয়াকে জমিন লিলেচ বাঙালি।

কৌম সম্প্রদায়ের বিন্যাস

আদিবাসীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। আপাতদৃষ্টিতে কোনও সম্প্রদায়কেই উপর থেকে দেখলে, কিছু বোঝা যায় না। ভাষা-সংস্কৃতি-পরবভিত্তিক অনুষ্ঠান আচার-বিচার-বিশ্বাস ও সংস্কারগত দিক থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু মিল পাওয়া গেলেও সুস্পষ্টভাবে অমিল বা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এককলমায় জেলার আদিবাসী জনবিন্যাসের যথার্থ ছবি পাওয়া যাবে—এমন কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র আমাদের হাতে আপাতত নেই।

সম্প্রতি জেলা পরিষদ থেকে প্রকাশিত গেজেটিয়ারে থানাভিত্তিক আদিবাসী জনবিন্যাসের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলার পাঁচ-ছটি থানা তথা মন্দিরবাজার, কুলপি, মগরাহাট, ফলতা, ডায়মন্ডহারবার ও বিষ্ণুপুর বাদে সুন্দরবন-সংলগ্ন থানাগুলোতেই আদিবাসীদের সংখ্যা সর্বাধিক। আদিবাসীদের সবচেয়ে বেশি দেখা যায় গোসাবা থানায়। সংখ্যায় প্রায় কুড়ি হাজারের মতো। এর পরই সংখ্যার ক্রম অনুযায়ী আছে—ক্যানিং, বাসন্তী, কুলতলি ও জয়নগর। এই থানাগুলো ছাড়াও এ জেলার প্রায় সর্বত্রই আদিবাসীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করে।[৫]

সরকারি পরিসংখ্যানে আদিবাসীরা স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু এ জেলার কোথাও কোথাও আদিবাসীদের কোনও কোনও সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, তার কোনও শুলুকসন্ধান এই গেজেটিয়ার থেকে পাওয়া যায় না। আবার কুলতলি থানায় আদিবাসীর সংখ্যা ৪,৩৫৫ জন উল্লেখিত হলেও কুলতলির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে আদিবাসীর কোনও স্বীকৃতি নেই। অথচ এখানকার এক ব্যাপক এলাকাজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছে সাঁওতাল ও কোরামুদি সম্প্রদায়। এখানে পল্লীর হাটে-মাঠে ঘুরে আদিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারলে, বহু সম্প্রদায়ের হদিস পাওয়া যায়। সাধারণত এখানে এক একটা সম্প্রদায়কে ভিত্তি করে পৃথক পৃথক পাড়া গড়ে ওঠে। এক পাড়ায় দুটো সম্প্রদায়ের একত্র বসবাস সচরাচর চোখে পড়ে না।

জেলার মানচিত্রে বহু স্থানের নামকরণের মূলে বহু রাজা, ভূস্বামী, চকদার ও লাটদারের অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। যেমন; মেদনমল্ল, রাজপুর, পুরন্দরপুর, মাহিনগর, প্রতাপনগর, রায়দিঘি, কঙ্কণদিঘি, লক্ষ্মীকান্তপুর, বাসন্তী, ডেভিসাবাদ, দেবীপুর, লয়ালগঞ্জ, বাপুলিরচক, দাঁড়িয়া, ভরতগড়, কামরাবাদ, রানিগড়, হিরণ্ময়পুর ইত্যাদি। খোদ ক্যানিং শহরের নামকরণ হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের নামে। অথচ জঙ্গল হাসিলকারী আদিবাসীদের কোনও ব্যক্তির নামে নামাঙ্কিত কোনও গ্রাম এখানে চোখে পড়ে না। তবে বয়ারমারি ও ঘটিহারানিয়া গ্রাম-নামের নেপথ্যে আদিবাসীদের ঘটনাপ্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। ক্যানিং শহরের পূর্বে মাতলা নদীর ওপারে 'খেঁড়িয়া' নামের গ্রামটি সম্ভবত খেড়িয়া সম্প্রদায়কে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। গ্রামটি বর্তমানে বাসন্তী থানার অন্তর্গত। এছাড়া 'গোঁড়েরহাট' জায়গাটি নিশ্চিতভাবে 'গোন্ড' বা 'গোঁড়' উপজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

জেলার আদিবাসীদের মধ্যে প্রধানত সাঁওতাল, ভূমিজ, বেদিয়া, ওরাঁও, মুণ্ডা, খেড়িয়া, লোধা, মাহাত, ঘাসি, কোরা ও তুরি সম্প্রদায়কে দেখতে পাওয়া যায়।

সাঁওতালদের বেশি পাওয়া যায় কাকদ্বীপ, সাগর, গোসাবা (সাতজেলিয়া, বিজয়নগর, আমলামেথি) এবং কুলতলি থানার ৬ নং দুর্গাপুর ও বোসেরঘেরিতে। মুণ্ডা সম্প্রদায়কে পাওয়া যায় প্রথমোক্ত তিনটি থানা ছাড়াও ক্যানিং থানার সাতমুখী ও কুলতলি থানার কাঁটামারিতে। এই কাঁটামারিতে মাহাত, ওরাঁও ও কোল সম্প্রদায়ের মানুষকেও দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও এই গ্রামে খাঞ্জার মুড়া ও কম্পাট মুড়া সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। আদতে এরা মুণ্ডা সম্প্রদায়-ভুক্ত। মুণ্ডাদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে, যেমন, হুলদি মুণ্ডা, খাড়িয়া মুণ্ডা, খান্‌কী মুণ্ডা ইত্যাদি। মথুরাপুর থানার কঙ্কণদিঘি, কাকদ্বীপ ও গোসাবা থানার ভূপেন্দ্রনগর ও শম্ভুনগরে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষকে লক্ষ্য করা যায়। ওরাঁও সম্প্রদায়ের সর্বাধিক বসবাস ক্যানিং থানার হেড়োভাঙা, নলিয়াখালি, ডাবু-জয়রামখালি, তুরঙ্গপাড়া এবং গোসাবা থানার পালপুর ও দয়াপুরে। ক্যানিং ২নং ব্লকে ভবানন্দ মৌজায় (সারেঙ্গাবাদ অঞ্চল) বেদিয়া সম্প্রদায় বসবাস করে। বেদিয়া সম্প্রদায় মূলত কূর্মি মাহাত। অতীতে মাহাতদের মধ্যে যারা খাদ্য আহরণকারী যাযাবর গোষ্ঠী ছিল, তারা বেদিয়া-কূর্মি নামে পরিচিত এবং যারা অসামাজিকভাবে জীবন শুরু করেছিল তারা পরিচিত ছিল 'ছোট কুর্মি' নামে। কিন্তু মূল চাষি গোষ্ঠী মাহাতরা মাহাত হিসাবেই থেকে গেল। সমগ্র ছোটনাগপুর মালভূমি জুড়ে এই মাহাত, বেদিয়া ও ছোট কুর্মিদের টোটেমিক ক্ল্যান একই। যথা; বাঁশিয়ার, টিকিয়ার, হাসন্তোয়ার, বানোয়ার, হিন্দোয়ার, চিলবিনধা, পুনুড়িয়া, হেমব্রম, কাটিয়ার, কাড়ুয়ার ইত্যাদি।

বর্তমানে বেদিয়া সম্প্রদায়ের কেউ কেউ নিজেদেরকে ভূমিজ বলে পরিচয় দিচ্ছে। বারুইপুর, সোনারপুর ও ভাঙড়ে বেদিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস আছে। ইদানীং অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভর কিছু কিছু মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আদিবাসী কলকাতার কাছাকাছি গড়িয়া, বাঘাযতীন অঞ্চলেও বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। বাসন্তী থানার চাতরাখালি ও গোসাবা থানায় ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে পাওয়া যাবে। তুরি সম্প্রদায়ের বসবাস কুলতলি থানার মাধবপুরে। পাড়তাঁতি বা তাঁতিবারাইক ও চিকবারাইককে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখতে পাওয়া যায় কুলতলি থানার শ্যামনগর এবং ক্যানিং থানার মঠেরদিঘি অঞ্চলে। এই মঠেরদিঘি ও কাছাকাছি এলাকা দেউলি, বয়ারমারিতে পাওয়া যায় মাহাত সম্প্রদায়কে। ১৯৩১ সালে মাহাতরা আদিবাসী তালিকা থেকে বাদ পড়ে। কিন্তু এখানকার কয়েকজন মাহাত যুবকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের সূত্রে বর্তমান নিবন্ধের আলোচক জানতে পেরেছে—তপশিল নয়, তাঁরা আদিবাসীই থাকতে চান।

কোরামুদি সম্প্রদায়ের বড় আবাসস্থল কুলতলি থানার চুপড়িঝাড়া, ভাসা-গুড়গুড়ে, পাতাপচার গোড়া, সোনাটিকিরি ইত্যাদি এলাকায়। এঁদের মূল আবাসভূমি ছিল সিউড়ি, মানভূম ও পুরুলিয়া। এরা পদবি হিসাবে ব্যবহার করে 'মুদি'। অবিভক্ত জেলায় সাঁওতালরা প্রায় সবাই হাজারীবাগ থেকে এসেছে বলে গ্রিয়ারসন মন্তব্য করেছেন।[৬] কিন্তু কুলতলি থানার ৯৬ বছর বয়স্ক সাঁওতাল অভিরাম সরদারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলাম,—তাঁরা এসেছেন মধ্যপ্রদেশের নাগপুর অঞ্চলের 'রাহে তামাড়' জায়গা থেকে। সাঁওতাল যুধিষ্ঠির সরদারের (বয়স ৮৫) পূর্বপুরুষরাও এসেছেন নাগপুর থেকে। জেলার অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি এসেছিল মূলত বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর ডিভিশন, হাজারীবাগ, রাঁচি, সিংভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, উড়িষ্যা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ, কেঁওনঝড়, সুন্দরগড় এবং মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও ছত্তিশগড় থেকে।

এই অধ্যায়ে আলোচিত আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি ছাড়াও সাগর দ্বীপের 'সাগর আইল্যান্ড স্টক কোম্পানি' ১৮১৮ সালের কিছু পরে লবণ ও চামড়া ব্যবসার সুবিধার্থে অন্যান্য কৌম সম্প্রদায়ের সঙ্গে টোটো, টোডী, হো সম্প্রদায়ের আদিবাসী মানুষকে নিয়ে এসেছিল। এরা প্রথমদিকে সাহেবদের বাংলো পাহারা দিত এবং জঙ্গল হাসিলের কাজ করত। পরবর্তীকালে ব্যবসায় আশানুরূপ মুনাফা না হওয়ায়

আদিবাসীদের কেউ কেউ বাগদার মীন বা কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন

স্টক কোম্পানির সাহেবরা সাগরদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তবে সাহেবদের পাততাড়ি গোটাবার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত কৌম মানুষজন এই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মথুরাপুর থানার কোনও কোনও জায়গায় ঘাসিদের বসবাস আছে। সংখ্যায় এরা খুবই কম। ইংরেজ শাসনকালে এরাও ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকেই এসেছিল। শারীরিক গঠন ও জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্যে এরাও অন্যান্য কৌমের মতোই। ঘাসিরা প্রথমদিকে উপ[illegible] তালি[illegible]ভুক্ত হলেও পরবর্তীকালে তপশিল জাতির তালিকা[illegible]। এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানবার প্রয়োজন আছে [illegible]র চাপে ঘাসিদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণু[illegible] এদের সমাজে মাতৃপূজার প্রচলন আছে। কার্তিক[illegible] নতুন ধান ওঠার পরই এই পূজা পালিত হয়। মাতৃপূ[illegible] মাতোয়ারা হয় নাচগানে।

ভাষা

সাঁওতালি কিংব[illegible] অ[illegible] এ জেলায় বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষাগত [illegible] একসময় এদের সকলকেই খেরওয়ার বা খারওয়ার [illegible]।' একই উৎসজাত হলেও বিবর্তনের ধারায় মূল [illegible] ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেয়েছে। এখানকার আদিবাসীরা [illegible]তালি, মুণ্ডারি, কুরুখ, কুর্মালি, পাঁচপরগনিয়া, গোলওয়া[illegible] ও [illegible]রিয়া ভাষায়। এই শেষোক্ত ভাষাটিকে গ্রিয়ারসন [illegible]ন সাদরি। সাঁওতাল ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীর আদিবা[illegible] মধ্যে [illegible]ভাষা হিসাবে সাদরি অত্যন্ত আদৃত হয়। যখন পাড়ায় পাড়ায় পূজা-পরব-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, নিজেদের মধ্যে সমাজ বসে, তখন এই ভাষাকেই আদিবাসীরা প্রাণখুলে কথা বলে। মূলত বিহারের রাঁচিকে কেন্দ্র করে সাদরি বিকাশলাভ করে। এই ভাষার প্রথম সার্থক ব্যাকরণ রচনা করেছেন পিটার শান্তি নাওরঙ্গি। জেলায় প্রচলিত বাংলা ভাষার দোখনো রূপের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে আদিবাসীদের কথ্যভাষা সাদরিতেও তার প্রভাব পড়ছে। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এখানে এক ভিন্নতর সাদরি জন্ম নেবে। তবে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বলার এক ধরনের অনীহা আছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় আলোচকের এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে আনন্দের কথা, আদিবাসী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এই ভাষার অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যেমন, ক্যানিং থানার নলিয়াখালি গ্রামের শ্রীকালিপদ সরদার সাদরি শিক্ষার জন্য ১৯৯৫ সালে 'সাদরি পাড়হা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটির প্রকাশক মারাংবুরু প্রেস। জেলার আদিবাসীদের মধ্যে এ বইটির ব্যাপক প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন।

এখানে 'বেদিয়া' গোষ্ঠীর এক তরুণের কাছ থেকে সংগৃহীত সাদরি ভাষার সামান্য নমুনা পেশ করলাম :

"হামরাক আদিবাসীরাকের জ্যে বাসকেরেখ জায়গারেহি ছটনাগপুরেৎ মালভূমিমাকে এহে সব জায়গায়। সব দেশেক ভাষা একেই নিহি। অনেক রকম। হামরাক ডক্টর সুকুমার সেন যাকে ঝাড়খণ্ডেক বনুয়ারাকের নিজেক জায়গা কেহেলায়। এহে জায়গাগুলা বিহার রাজ্যেক ছটনাগপুরে আহেই।"

জীবিকা ও সমাজবন্ধন

আদিবাসীরা পরিশ্রমপ্রিয় জাতি। এদের উপজীবিকা মূলত চাষবাস। যাদের নিজস্ব জমি নেই তারা অন্যের জমিতে খেতমজুরি করে। কেউ কেউ ভাগচাষি। আবার নিরক্ষর অথবা স্বল্প সাক্ষর আদিবাসী তরুণরা ভিন রাজ্যে শ্রমিক হিসাবেও রওনা দিচ্ছেন বর্তমানে। কেউ কেউ ট্রাকচালক কিংবা গরিব খালাসিও হচ্ছেন। আদিবাসীদের মধ্যে ওরাঁও এবং মাহাতরা শিক্ষার দিক দিয়ে একটু প্রাগ্রসর সম্প্রদায়। ফলে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা কোনও কোনও পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। এই দুটো সম্প্রদায়ের দু-চারজন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। কুলতলি থানার কোরামুদি সম্প্রদায়ের মাত্র একজন আদিবাসী শিক্ষকতায় নিযুক্ত।

যারা শিক্ষার আলো পায়নি তারা নদীর চরে বাঁধ বেঁধে কিসারি করে, বাগদার মীন ধরে কিংবা কাঁকড়া ধরে। আবার কেউ কেউ বর্তমানে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাচ্ছে, বেপাসি হয়ে মধুও ভাঙছে। অনেকেরই নিজস্ব জাল নৌকো নেই।

আদিবাসীদের অন্যান্য ছোটখাটো জীবিকার মধ্যে আছে শূকর-পালন, মোরগ লড়াইয়ে কাঁতিদারি (যারা মোরগের পায়ে ছুরি বাঁধে) করা কিংবা জঙ্গলের নৌকায় বাউলে গুনিন হিসাবে যাওয়া।

জঙ্গলের অন্যতম সাঁওতাল গুনিন যুধিষ্ঠির সরদারের কাছ থেকে সংগৃহীত দুটি মন্ত্র :—

(ক) চণ্ডী সার (জঙ্গলে নামার সময়)
লায়েতে মালে দিলাম পা
রক্ষা করবেন আড়ি চণ্ডীমা
দোহাই বাবা গাজী সাহেব
দোহাই মা নারায়ণী
দোহাই মা বনবিবি
ডাইনে বাঁয়ে হও রাজি
তোমার পায়ে দিলাম রাজসভা
দোহাই বাবা দোহাই তোমার।।

(খ) চালান
আসমান তারা জমি বন্ধ
এ বনের মাটি বন্ধ
হেঁড়ে মাতাল লতাকানি
এ বনে তোর কিসের থানা
এ বনেতে দখিন বনে যা
হরিণ বরা ধরে খা
কার আজ্ঞে
এ লাখ চব্বিশ হাজার
পাইকোম পীরের দোহাই তকাৎ যা

গ্রামে কখনও কখনও পঞ্চায়েতী কাজকর্মের সূত্রপাত হলে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচিতে মাটি কাটার কাজেও অংশ নিচ্ছে আদিবাসীরা। আদিবাসী মহিলারা খেজুর ও হোগলা পাতার মাদুর বা ক্যাতলা, ধান মাপার খুঁচি, পালি ও ধামা তৈরিতে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। এগুলোকে এখানকার আদিবাসী লোকশিল্পও বলা যায়। গ্রামের অনেক আদিবাসী সমিতিতে এঁরা সীবন শিল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করছেন। জেলার বাটিক প্রিন্টের নামকরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্যানিং শহরের 'সুন্দরবন খাদি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি' এবং বারুইপুর থানার চম্পাহাটিতে 'গ্রামীণ শিল্প উন্নয়ন সংস্থায়' বহু আদিবাসী মহিলা কাজ করছেন। কেউ কেউ এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে বাড়িতে বসেও কাজ করেন। বাসন্তী গঞ্জের খাদি সংস্থায় বহু আদিবাসী মহিলারা কাজ করছেন।

আদিবাসীরা তাদের মূল সাংস্কৃতিক অঞ্চল থেকে বর্তমানে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন। পুরানো দিনের প্রবীণ মানুষরা একসময় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করত। আজ আর তা নেই। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং দারিদ্র্যের জন্য আদিবাসীরা পশ্চিমবাংলার কাছাকাছি রাঁচি, ছোটনাগপুর এলাকায় বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করতে পারে না এখন। রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়জনের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার দুখে আদিবাসীরা বিবশ হয়। তাদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিতেও তার ছাপ আছে। একটু স্মৃতিমগ্ন হলেই তারা আপন-মনে গেয়ে ওঠে :

(ক) মইলিলিন গে
কাঁহা মইলিন বাজে করতাল।
কাঁহা মইলিন বাজে
নাগরালি সান সুঁদার
কাঁহা মইলিন........।
যে ভরি জানলি
হেরি গুণা গাওলি
মইলিলিন গে.......।

ধান মাপার খুঁচি, পালি ও ধামা তৈরিতে দক্ষ আদিবাসী মহিলা

(খ) কে তরা গো মইয়া করত দুলারি
রোপনি রে পতে মইয়া
বাহিকে উলারি।
ভাইয়ে তরা গারি দেল
ভৌজি তরা মারি দেল
কে তরা গে মইয়া.....।
মায়ো বাপো মরি গেল
জনমে টুয়ারা ভেল
কে তরা গে মইয়া.....।

পূর্বে আদিবাসী সমাজে যে আঁটোসাটো বন্ধন ছিল, বর্তমানে তা আর নেই। অনির্দিষ্ট জীবিকা যেমন এর মূলে আছে, তেমনই অর্থনীতি, রাজনীতির পালাবদল এবং সর্বোপরি অ-আদিবাসী সমাজের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে আদিবাসী সমাজে শৈথিল্য এনে দিয়েছে। তার ফলে এই সমাজে অহেতুক নিজেদের মধ্যে মারামারি, পরিবারের সদস্যদের প্রতি নৈতিক দারিদ্র্য এড়িয়ে যাওয়া, অসবর্ণ বিবাহ, যৌন অনাচার ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। গ্রামের পাহান-মোড়লদের পূর্বের সেই বিচার-আচার—সবই স্মৃতি হয়ে গেছে। গ্রামের মধ্যে কোনও অনাচারকে কেন্দ্র করে বিচারের আসর বসলেও তার জাঁক অতিশয় ক্ষীণ। বৃদ্ধরা বড়জোর মতামত জানাতে পারে, সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারে না। ফলে আদিবাসী সমাজের বিটলাহা বা চরম শাস্তি এখানে অচল। সমাজের নিজস্ব ধাঁচের মোড়লি প্রথার জায়গায় এখন অনেক বেশি সক্রিয় এবং কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা। সমাজবন্ধনের শৈথিল্যের কারণে জেলার বহু আদিবাসী সম্প্রদায় খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বাসন্তী থানার বহু স্থানে খ্রিস্টান আদিবাসী মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়।

খেলাধুলা, পূজা ও পরব

শিথিল সমাজ হলেও অন্যান্য জাত বা সম্প্রদায়ের তুলনায় আদিবাসীরা যূথবদ্ধতায় প্রচণ্ড বিশ্বাসী। এই যূথবদ্ধতা জমে ওঠে খেলা, বিবিধ পূজা-পালাপার্বণ এবং গানের পরিবেশ রচনা করার সময়। একা একা তার কি[illegible] [illegible]লো [illegible] না। তার যা কিছু বিনোদনী কলাকৃষ্টি, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, [illegible] দু[illegible], [illegible]কান্না সবই স্ব স্ব গোষ্ঠীর দলবাঁধা ভিড়ের মধ্যেই প্র[illegible] পায় [illegible]সীদের কৌমসংস্কৃতির কিছু কিছু লোপ পেলেও সব[illegible] [illegible] জেলা থেকে। এই অধ্যায়ে আদিবাসী সমাজের অন্য[illegible] [illegible] [illegible]য়ে যৎসামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে।

মোরগ লড়াই : [illegible] [illegible] খাড়া হয়ে 'মোরগ লড়াই' খেলাটি আদিবাসীদের [illegible] [illegible] খেলা 'মোরগ লড়াই' থেকে এসেছে। বর্তমানে এই [illegible] [illegible] [illegible]ড়াও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রসারলাভ করেছে [illegible] [illegible] নিয়ে একটি প্রচলিত লোক-পুরাণ এরূপ : কংসের [illegible] কৃ[illegible] [illegible]রতর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কে কাকে হত্যা করবে, তাই [illegible] উ[illegible] [illegible]রে চলছে নানান পরিকল্পনা। কৃষ্ণের গতিবিধি লক্ষ্য [illegible] [illegible] [illegible]স নিয়োগ করেছেন অনেক অনুচর। আর সেই অ[illegible] [illegible]ই [illegible] [illegible]মোরগ। কেউ কাউকে পর্যুদস্ত করতে পারছেন না। [illegible] [illegible] শেষে কৃষ্ণ একবার মারতে গিয়েছিলেন কংসকে। [illegible] মো[illegible] তখন কঁক্কঁর কঁ করে ডেকে

আদিবাসীদের প্রিয় খেলা মোরগ লড়াই *ছবি : শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়*

কংসকে জাগিয়ে দেয়। কৃষ্ণ ভিন্ন উপায়ের চিন্তা করতে লাগলেন। অগত্যা কংসকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে তাঁর মোরগ অনুচরদের মগজে ঢুকিয়ে দিলেন অবিশ্বাস আর পারস্পরিক সন্দেহ। তখন থেকেই নাকি মোরগরা নিজেদের মধ্যে খুনখারাবি লড়াই নিয়ে মেতে উঠল।

জেলার সুন্দরবন অধ্যুষিত এলাকায় মোরগ লড়াইয়ের শুরু কোজাগরি লক্ষ্মীপূজার দিন থেকে এবং শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিনে। সাধারণত হাটসংলগ্ন খোলা পরিসরে খেলার আসর বা 'আখড়াই' বসে।

লড়াই শুরু করানোর আগে মোরগবাহক খেলুড়েরা নিজেদের মোরগ নিয়ে সমকক্ষ জোড় খোঁজার জন্য অন্যান্য মোরগের সামনে রেখে পরীক্ষা করে নেয়। সমান সমান জোড় তৈরি না হলে লড়াই হয় না। লড়াইয়ের জাত হিসাবে মোরগের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন রকম। যেমন; ঝিঝরি, মালা, জংলি বা বাগা, কাওরা, উচ্ছরা ইত্যাদি। জাত মোরগ ভালো দামে বিক্রিও হয়। এমনকী একটা মোরগ কিনতে আদিবাসীরা অনেক সময় বাড়ির ঘটি-বাটি-জমিও বন্ধক দিয়ে ফেলে।

লড়াইয়ের আসরে খেলুড়েরা হাঁড়িয়া খেয়ে মত্তমাতাল হয়, অপরদিকে রক্তমাতাল হয়ে লড়াইয়ের জন্য ঘাড়ের পালক ফুলিয়ে তৈরি হয় মোরগ। মোরগকে রাগি করার নানাপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় আগে থেকে। আসরে মোরগ নিয়ে আসার সময় কতকগুলি বিধিনিষেধ খেলুড়েরা পালন করে থাকে। যেমন; (ক) গায়ের চাদর, গামছা বা কাপড় দিয়ে মোরগকে ঢেকে রাখা (খ) পথিমধ্যে কারোর সঙ্গে কথা না বলা (গ) প্রস্রাব পেলে চেপে রাখা (ঘ) পিছন ডাকে সাড়া না দেওয়া, ইত্যাদি।

প্রত্যেক আসরে মোরগের পায়ে অস্ত্র বাঁধার জন্য অনেক কাইতকার বা কাঁতিদার থাকে। কাঁতিদার চটের উপর কাঁত, চামড়ার টুকরো, ন্যাকড়া ও সুতো সাজিয়ে বসে থাকে। কাঁতিদারের সহকারীর নাম 'বুড়ি'। কাঁত বা অস্ত্র নানান ধরনের। যথা; বেঁকি, সোজা কলি, বেঁকা কলি, সোজা ডাঁট। ইস্পাতের তৈরি ছোট ছোট অস্ত্রগুলিতে তুঁতে মাখানো থাকে। ঘায়েল হওয়া মোরগের শরীরে জ্বালা ধরানো জন্য।

লড়াইয়ে বিজয়ী মোরগের নাম জিৎকার এবং পরাজিত মোরগের নাম পাউড়। লড়াইয়ের পর কাঁতিদার কাঁত বেঁধে দেওয়ার দরুন পারিশ্রমিক হিসাবে পায় এক টাকা থেকে দু-তিন টাকা। এর সঙ্গে ফাউ হিসাবে জোটে পান-বিড়ি। আসরে লড়াই যখন তুঙ্গে ওঠে তখন দর্শকদের হাততালি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনেক সময় মোরগ লড়াইকে কেন্দ্র করে আদিবাসীদের মধ্যে খিস্তিখেউড়, বচসা ও মারামারি লেগে যায়। তখন প্রাণঘাতী দ্বন্দ্ব সামলাতে ছুটে আসতে হয় পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা হাট কমিটির লোকজনকে।

জলা-জঙ্গল-সমতলভূমির দেশ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা—মিশ্র সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডারবিশেষ। এখানে পাহাড় নেই, জঙ্গল আছে। তবে এই জঙ্গলের রূপবৈশিষ্ট্য ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের জঙ্গল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ফলে জেলার মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে অবধারিতভাবেই পড়ছে। আবার বিপরীতক্রমে আদিবাসীদের সংস্কৃতিও অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে। এইভাবেই চলছে আদান-প্রদান ও পারস্পরিক লেনদেন। ফলত অ্যাকালচারেশনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র জেলার লোকসংস্কৃতিও ভিন্ন পথে বাঁক নিয়ে অদূর-ভবিষ্যতে অন্যতর রূপ পরিগ্রহ করবে নিশ্চিত।

এখানকার আদিবাসী সমাজে, বারো মাসে তেরো পার্বণের জায়গায় ছত্রিশ পার্বণ লেগে থাকে সবসময়। আদিবাসীরা বছরের বিভিন্ন সময় যৌথ সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে—করম, জিতুয়া, দাঁসাই, সোহরাই, বাঁধনা সারহুল, গ্রামপুজো ইত্যাদি পূজা ও পরব পালন করে থাকে।

ঘাসিদের মধ্যে মাতৃপূজার যেমন প্রাবল্য তেমনই বেদিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাগলপূজা, মনসা, হাঁসপূজা, মুরগি বা আষাঢ়ী পূজা, গোরু বা গোয়াল পূজা; ওরাঁওদের মধ্যে সূর্যাহি পূজা; সাঁওতালদের মধ্যে বড়পাহাড়ি ডাবরি; কোরামুদিদের মধ্যে গোষ্ঠপূজা, জাঁতাল উৎসব; মাহাতোদের মধ্যে শ্যামাকালী পূজা, ষষ্ঠীপূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি পূজানুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। টুসুপূজা সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত।

আদিবাসীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত টুসু পূজা *ছবি : শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়*

মুণ্ডাদের মধ্যে সহরাই বোঙ্গা এবং পাহাড়ের দেবতা বুরুকে পূজা করার প্রচলন আছে। এ ছাড়াও জঙ্গলে কাঠ বা মধু আহরণের সময় এরা জল-জঙ্গলের দেবতা ইকিরকে পুজো দেয়। এই পূজা খাল বা নদীর পাড়ে হয়ে থাকে। গ্রামের কেউ অসুখ-বিসুখে পড়লে বুরু দেবতার শরণাপন্ন হন। এই দেবতার পূজা হয় কোনও উঁচু ঢিবি অথবা গাছের তলায়। সহরাই বোঙ্গা পুজো পালিত হয় কার্তিক মাসে। প্রধানত গরু-বাছুরের মঙ্গল কামনা করে এই পুজো দেওয়া হয়। এসব পুজোয় ইলি বা হাঁড়িয়া খাওয়ার প্রচলন আছে।

উপরোক্ত পুজোআর্চা ছাড়াও সুন্দরবনের জলহাওয়ার সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াবার নিমিত্ত আদিবাসীরা বর্তমানে গঙ্গা, চণ্ডী, বাশুলী, কালী, দশহরা, ষষ্ঠী, বনবিবি, আটেশ্বর, দক্ষিণরায়, নারায়ণী, শীতলা, পীর-গাজী ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দেবতার পূজা ও পরব পালন করছেন। কুলতলি থানার ভাসাগুড়গুড়িয়াতে আদিবাসীদের রথের মেলাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে বর্তমানে। এখানে আদিবাসীদের নিজস্ব রথ আছে। বহু পূজাতে এখানে মুরগি বলি হয়। মুরগির রঙ হয় লাল। যদিও আদিবাসীদের মূল উৎসভূমিতে সাদা মুরগি প্রচলিত। সম্ভবত জেলার পীরদরবেশদের দরগা বা থানে উৎসর্গীকৃত লাল মুরগির ব্যবহার, আদিবাসী সমাজে এই রং পছন্দের বিশেষ অভ্যাস গড়ে তুলেছে।

অখণ্ড চব্বিশ পরগনা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার আদিবাসী সমাজ মূর্তিপূজার প্রতি তেমন টান অনুভব করে না। যেহেতু আদিবাসীদের সংস্কৃতি হচ্ছে মূলত প্রকৃতি অর্থাৎ গাছ, গাছের ডাল, মাটির বেদি ও শিলাপাথরকে বিভিন্ন দেবতার রূপ আরোপ করে পূজা করা। বর্তমানে জেলার কোনও কোনও স্থানে আদিবাসী তরুণ সমাজ জোট বেঁধে দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা সাড়ম্বরে পালন করছেন।

পরিসরের স্বল্পতার কারণে এখানে আদিবাসী সমাজের সমস্ত পূজার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সে কারণে কয়েকটি পূজা-ভিত্তিক যৌথ সংগীত ও অন্যান্য গানের বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সংগীতপ্রিয় সম্প্রদায় আদিবাসীদের গান মানেই লোকসংগীত। এ গান তাদের বই-কেতাবে লেখা থাকে না। স্বভাবকবিদের মতোই এরা যখন-তখন মুখে মুখে গান রচনা করতে পারে। হিন্দু কিংবা মুসলমান জনসমাজের কাছে এ গান কোনও কদর পেলো কি পেলো না তা নিয়ে আদিবাসীদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কোনও প্রচারমূলক সরকারি মিডিয়ার আশীর্বাদধন্য হওয়ার সামান্যতম ইচ্ছাও পোষণ করে না আদিবাসীরা। গান তাদের কাছে কেবলমাত্র বিনোদনী বস্তু নয়। জীবনসংগীতও বটে। নিজস্ব কৌমসংস্কৃতির অস্তিত্বের স্বার্থেই আদিবাসীরা তাদের গান বাঁচিয়ে রেখেছে। শাস্ত্রীয় ঘরানার ব্যাকরণ এ গানে নেই সত্য কথা, তবে আদিবাসী গানের নিজস্ব একটা ঘরানা নিশ্চয়ই আছে; নচেৎ এ গানের কথা হারিয়ে যেতে কবে। নির্দিষ্ট সুরও যেত হারিয়ে।

আদিবাসীদের ঘরের দাওয়া এবং উঠোনটাই রঙ্গমঞ্চ। কৃত্রিম মঞ্চে গান গাইতে উঠলে আদিবাসী গায়করা ততটা সাবলীল হয় না। বর্তমানে আদিবাসীদের গান অন্যান্য জনসমাজের কাছেও জনপ্রিয়তা

অর্জন করেছে। আদিবাসী মেলা ছাড়াও এই জনপ্রিয়তার মূলে অন্যান্য কয়েকটি আধুনিক মেলার ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যেমন; সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি সম্মেলন (গোসাবা), কৃষ্টি মেলা (ক্যানিং), সুন্দরবন মেলা (ক্যানিং), সুন্দরবন আদিবাসী সাংস্কৃতিক মেলা (মল্লিকাটি, ক্যানিং), দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা লোকমেলা (চম্পাহাটি) ইত্যাদি। এ ছাড়াও রায়দিঘি, কাকদ্বীপ, নামখানা ও ডায়মণ্ডহারবারে আয়োজিত কিছু কিছু মেলায় আদিবাসী গান পরিবেশিত হয়েছে। মালদহের সরকারি মঞ্চে আদিবাসীরা প্রথম গান গাওয়ার সুযোগ পান ১৯৯৩ সালে। উদ্যোক্তা মজিলপুরের 'লোকসংস্কৃতি সংসদ'। গানের দলটি ছিল কুলতলি থানার ভাসাগুড়গুড়িয়া অঞ্চলের। ছোটনাগপুরের 'বুলবুল' নামে পরিচিত প্রখ্যাত ঝুমুর গানের শিল্পী সিন্ধুবালা দেবী, এই দলের গান শুনে তাঁর কাছে যাবার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক কারণে এঁরা সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি।

টুসু ঃ আদিবাসীদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব হল 'টুসু'-দেবীর পূজা। আর এই টুসুদেবীকে ঘিরে পরিবেশিত গানই—টুসুগান। টুসু কৃষিসভ্যতার উর্বরতার প্রতীক। নৃতাত্ত্বিকেরা টুসু শব্দের নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন, কথ্যভাষায় ধানের খোসা অর্থাৎ 'তুষ' থেকেই টুসুর উৎপত্তি। আবার অনেকের মতে ওড়িশার 'ওষা' ব্রতের রূপান্তরই হল টুসু। বাঙালিদের 'তুষ-তুষলি' ব্রতের সঙ্গেও এর মিল পাওয়া যায়।

সে যাই হোক, রাঢ় কিংবা মানভূম এলাকার মতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে এখানে টুসু পুজো শুরু হয় না। বাঙালি-হিন্দুদের 'নবান্ন' উৎসবের মতোই আদিবাসীরা টুসু পরব পালন করে পৌষ মাসের মকর-সংক্রান্তির সন্ধ্যায়। এই জন্য এই পুজোকে পৌষ-লক্ষ্মী পরব বা পৌষ-পরব বলা হয়। আদিবাসীদের ধারণা, অন্নের দেবী টুসুকে পূজা করলে সংবৎসর তাদের আর অন্নকষ্ট থাকবে না। এই পূজা করার পনেরো দিন আগে থেকে 'সরা জাগান' শুরু হয় গ্রামে। অন্যান্য প্রদেশে বা জেলায় চতুর্দোলাকে যেমন 'টুসু' হিসাবে পুজো করা হয়, এখানে তেমন হয় না। এখানে লক্ষ্মী ও গঙ্গা প্রতিমার সঙ্গে টুসু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আবার অনেক জায়গায় সরা ও ঘট টুসু হিসাবে পূজিত হয়। এ পূ[illegible] মেয়েদেরই প্রাধান্য। আগে থেকে মৃৎশিল্পী বা পোটোর সঙ্গে কথ[illegible] করা হয় প্রতিমার জন্য। মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসে [illegible] স্থাপন করে পূজা করা হয়। তারপর সারারাত ধরে [illegible] পূজায় কোনও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। ছেলেমেয়ের[illegible] পূজারি হতে পারে। পূজার উপচার হল—ধূপ, দীপ, ফুল, [illegible] গম অথবা ধান। আর থাকে একটা ঝিঙে (কোথাও [illegible])। ঝিঙে বা পেঁপেকে পশুর মতো কাঠির পা তৈরি [illegible] সামনে বলি দেওয়া হয়। টুসু পূজার আর একটা দিক [illegible]নো।

পরদিন হয় ঠাকুর বিস[illegible] পাক ঘুরিয়ে বিসর্জন দেওয়ার আগে ঠাকুরকে পাড়া[illegible]তে ঘোরাতে হয়। একে বলা হয় 'পাড়া ভোলান'। এই [illegible] সময় টুসুব্রতীদের হাতে থাকে শাঁখ, কাঁসর ও ঘন্টা। [illegible] জন্য অনেক জায়গায় মাইকের ব্যবস্থা থাকে। ছেলেরা [illegible] পাল্লা দিয়ে রাত জাগে। টুসু গানে ধর্মীয় চিন্তার প্রক্ষে[illegible] গার্হস্থ্য সংসারের নানান ধরনের সমস্যা, অভাব-অভিযোগ, পুরাণ-আশ্রিত কাহিনীমালা এমনকী টুকিটাকি রঙ্গরসিকতাও এ গানের কথায় ফুটে ওঠে। এককথায় সমাজজীবনের বাস্তব ছবি খুঁজে পাওয়া যায় এই গানে।

প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হয় টুসু-বন্দনা :

(ক) শাঁখ দিলাম সলিতা দিলাম
সঙ্গে দিলাম বাতি গো (২)
একে একে সন্ধ্যা নিন মা লক্ষ্মী সরস্বতী গো।
সন্ধ্যা দিয়ে বাহির হলেন ঘরের কুলবতী গো
গাই এলো বাছুর এলো ভগবতী গো।।

(মাহাত সম্প্রদায়)

(খ) রাম ছেড়েছে যজ্ঞের ঘোড়া
অশোক বনের কাননে
লব কুশে ধরেছে ঘোড়া
সীতা বলে দাও ছেড়ে।
সীতা মরলে সীতা পাবো
ভাই মরলে কোথায় পাবো (২)
চল সীতা অরণ্য বনে
ভাইকে নিয়ে ঘরে যাবো। *(মাহাত সম্প্রদায়)*

(গ) সাপ তুলেছি লোতাপাতায়
(বলি) শ্মশানেরই ডালে গো (২)
কি সাপে দংশাইলো মাগো
বিষেতে জ্বরজ্বর। *(কোরামুদি সম্প্রদায়)*

(ঘ) আম কলেক থপা থপা
বলি তেঁতের কলেক বাঁকা
জয়নগরে দেখুন আলি
রাঁড়ির হাতেক শাঁখা।
শামনগরে রাঁধমু বাড়মু
জয়নগরে খিঁরামু
জয়নগরের ছোঁড়াছুঁড়ির
জাল ভাংকুনে বাতাস কেরবই *(সাঁওতাল সম্প্রদায়)*

(ঙ) ক্যানিং-তে শুইন্যে আলি
শিকড়ে বেল ধরিছে
চললো বেল দেইখতে যাব লো
ওই মাটিতে কি আছে।
কাঁচা লঙ্কা গরম মুড়ি
ভাতের মজা তরকারি
লইডন পিন্নিভের মজালো
চইখে চইখে ঠারাঠারি। *(বেদিয়া সম্প্রদায়)*

করম পূজা ঃ আদিবাসী লোকপুরাণ অনুসারে করম গাছ নাকি বিশ্বপিতার প্রথম সৃষ্টি। বীরভূমের চাকলতা গাছই সেই পুরাণ-কথিত করম গাছ। করম মূলত শস্যসম্ভাবনার উৎসব। রাঢ় অঞ্চলে ইন্দ্রদ্বাদশীতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে অথবা এ মাসেরই শেষ দিনে। এখানকার কোরামুদি সমাজে করম পূজার প্রচলন না থাকলেও সাঁওতাল, বেদিয়া ও ওরাঁও সম্প্রদায়ের মধ্যে করম পূজা জাঁকজমক সহকারে পালিত হয়। করম হল বৃক্ষপূজা। করম গাছের পরিবর্তে কদম গাছের ডাল

লাগে এ পূজায়। অন্য উপকরণের মধ্যে থাকে নানা রকমের শস্যদানা।' করম ডাল স্থাপনা করে তাকে ঘিরে চলে নাচগান।

করমের বন্দনা

(ক) হামে মাইগো যায় অবোঁ
করমেক সেবাকি ধনি ধনি
সোনা ভরি আঁকলি
কিয়া ভরি পিঁধলি
হামে মাইগো......
আঁখোড়া বনধোনা বের্জ নারী
মদনে ঝুমের লাগোল ভারি
ছোটমট আঁখোড়া
গোটায় পাড়ায় ভাঁত্তরা। *(বেদিয়া সম্প্রদায়)*

(খ) দোহায় ও করম রাজা
তকে হামরা কেরি পূজা
সেখাল ধানে দেঁখাই দেঁলেই কলা
মানুষেক জনমে ক্যারে খেলা।
মাই বেহিন দাঁড় ধরি
করম রাজা পূজা কেরি
ছেল্যা মাথায় ভিঁজায় রাখলাম পানিমে
করমে দাঁড় ধরলাই ভাই বেহিনে। *(বেদিয়া সম্প্রদায়)*

(গ) ছটক সময় বিহা দেঁলাক
কেউ নিহি দেখে গ্যাঁলাক
(ভুঁার) কেহি দোবাক গো মোর বাপকে
মোর মাইকে
বেড়ি দুখ বিপদ হামর গ্যাঁলাই
নারায়ণ দশ কহে
এ কথা মিছা নহেক। *(বেদিয়া সম্প্রদায়)*

সমরেই গান ঃ সমরেই গান আদিবাসী সমাজে মশা তাড়ানোর গান নামে পরিচিত। কালীপূজার অমাবস্যা তিথিতে এ গানের আসর বসে পাড়ায় পাড়ায়। গানের দল কালীপূজার রাতে গ্রাম পরিক্রমা করতে করতে প্রত্যেকটা ঘরের চাল থেকে সংগৃহীত খড় এক জায়গায় জড়ো করে পোড়ানো হয়। প্রচলিত বিশ্বাস—এই জাদুক্রিয়ার মাধ্যমে মশার প্রকোপ কমে যাবে। মাহ্যত, ওরাঁও ও বেদিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত। গান গাওয়ার সময় আসর জমানো রংলাই সুর কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। এখানে দুটি মাত্র গান রাখা হল :

(ক) কাল্লা কে আহে বাবা
উঁচা উঁচা বাখরি
কাল্লাকে নাম ধরে ডাকি রে—
ও ওহিরে....
নেই আলিও থাইক লোভে
নেই আলিও পিয়েক লোভে
হামে আলিও
লুছমানকে সেবা মে
ও ওহিরে..... *(মাহ্যত সম্প্রদায়)*

(খ) খঁজতে খঁজতে যাঁহো
পুছতে পুছতে যাঁহো
ভালা লঙ্কা যারা কেতেই ধুরা রে
তর ঘারে আহোঁ ভালা
তুলশিকা পিঁড়া হো।
উপরে ঘুরত হাঁসা রাজা রে
রে রহি রে..... *(বেদিয়া সম্প্রদায়)*

ঝুমুর গান ঃ ঝুমুরকে বাদ দিয়ে আদিবাসীদের কথা ভাবাই যায় না। ঝুমুরের আভিধানিক সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে, কেউ বলেছেন—নূপুরের ঝুমঝুম শব্দ থেকে ঝুমুর কথার উৎপত্তি, আবার কেউ বলেছেন, ঝুমুরের অর্থ শৃঙ্গারভরা রাগিণী। লোকসাহিত্যের গবেষকরা বলেন,—প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদে আদি কুড়মালি ঝুমুরের নমুনা পাওয়া যায়। সুরের বিভিন্নতা ও আঞ্চলিক ভেদে ঝুমুর কোথাও কোথাও ডোঙ্কচ, খেমটা দাউড়ির রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে সুন্দরবন ঘেঁষা এলাকার ডোঙ্কচ, খেমটা ও দাউড়ি এক ধরনের ঝুমুর বই অন্য কিছু নয়।' ঝুমুর গানের দলে,. ঢুলি বা মাদল-বাজিয়ে মাঝখানে থাকে। আর তাকে বেষ্টন করে চলে ঝুমুর নাচ ও গান।

মূল গায়ক প্রথমে শুরু করে বন্দনা :

সরস্বতী স্মরণ করি আউলি আখড়া মে
ডোঙ্কচ লাগায়ে দিলি
ঝুমরো লাগায়ে দিলি
করে সব মিনতি।

বন্দনার পরেই একটার পর একটা গান গাওয়ার পালা এগিয়ে চলে।

(ক) (আজ) বুড়াবুড়ি ধান রোপে কাঁপামে
দেখলো মোয় বাধা বনে
(আজ) ছেঁচোরা পেটিয়া লেলাই মুড়নে
দেখলো মোয়.....
(আজ) রাঙা ছোরা ছুতায় দিল্যাই আয়নে
দ্যাখলো মোয়..
নারায়ণ দশ কহে
ঝুমরি গো বানায় মোরে
দ্যাখলো মোয়.....। *(বেদিয়া সম্প্রদায়)*

(খ) ছেল্যা করে মায় মায়
খাতে ধুতে কিছু নায়
ছেল্যার মায় গেলছে দাদনে
ছেল্যা কাঁদে ধাতকার বনে
কাঁদুক ছেলে বুঁঝাই লিতে পারি গো
ছেল্যার বাপে মার খাতে লারি
ছেল্যার মা খাঁইয়েছিল ঝিঙা
ছেল্যা হলো ভিড়িংড়িঙা
ছেল্যা কেলে আগেই ভাঁড় ধরে। *(কোরামুদি সম্প্রদায়)*

(গ) আদিবাসী সাংস্কৃতি
চরচা কেভ্রমে গীতি
শুনি লেঁবা রে আদিবাসী
নাগপুর রাঁচীলে আলি
মাতৃভাষাকে ভুঁলাই গেলি

শুনি লেঁবা রে বুনোয়া জাতি
বুনোয়াকে ভুলাখাঁয়ে বাঙালি
শুনি লেঁবা রে আদিবাসী।
জমি জায়গা লুঠকুন লেঁলায় রে বাঙালি
বেটি বহিন লেহ খাঁয়ে রে বাঙালি
দলেক নিশাঁয় রে ভুলায় রইলি
কেও নেহি দেখাঁয় রে পরিচয়
রে বুনোয়া জাতি.....।

(সাঁওতাল সম্প্রদায়)

মনসা পূজার ঝাঁপান গান ঃ মনসা পূজা উপলক্ষে ঝাঁপান গানের আসর বসে। মনসার মূর্তি বা সিজ-মনসা গাছের ডাল বেদিতে সংস্থাপন করে আদিবাসী মেয়েরা এই গানে অংশ নেয়। পূজায় হাঁস বলি দেওয়ার রীতি আছে কোথাও কোথাও। পূজা শুরু হয় সন্ধ্যায়। তারপর সারারাত ধরে চলে গান। ঝাঁপান গানের একটি চরণ বারবার ঘুরেফিরে গাওয়া হয়। একে 'জাতকাটা' বলে। এখানে ঝাঁপান গানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল। গানগুলির সবই মাহাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত।

(ক) চলো মাকে আনিতে যাবো
ক্ষীর নদীর কূলে
হাতে দিবো লাল গামছা
চরণে দিবে গ্যাঁদা ফুল।

(খ) টামটুম বাজনা বাজে
চাঁদবেনের ঘরে
চাঁদ মামার বেটার বিয়ে
সুচম্পাই নগরে।

(গ) মায়ের শিঙ গদামুরা
হাড়ের মালা গো
ভোলানাথের বিনে মায়ের
সাজালো কে.....

(ঘ) ও কালো সাপিনী রে
তোর গৌরবরণ আঁখি
মা মনসার দোহা[illegible] আছে
ফিরে দাঁড়া দে[illegible]
কালো সাপিনী [illegible]।

এইভাবে কিছু গান গা[illegible] পর [illegible]র মন্ত্র বলা হয়। মন্ত্রটা দ্রুত বলাই রীতি। ঝাড়নের ম[illegible] সংস্কৃত শ্লোক—'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পর[illegible] সর্বদেবতা।' এই মন্ত্র উচ্চারণের পর পুনরায় [illegible] বলা হয় 'চালাও ঝাঁপান।'

ঝাঁপান গানের আসরে [illegible] সংস্কার আছে। রাত শেষ হলে পরদিন সকালে মূর্তি বিস[illegible] মূর্তি রেখেও দেওয়া যায়। তবে ঘট অবশ্যই বিসর্জন [illegible] হয়।

কাঠিনাচের গান ঃ [illegible] সাধারণত আদিবাসীরা গেয়ে থাকে দুর্গাপূজার আগে [illegible] মাসে। কিন্তু এ জেলার মাহাত সম্প্রদায় দোল উৎসবে [illegible] সময় [illegible]নাচের আসর বসায়। এ গানের বড় অংশজুড়ে থাকে [illegible] মূলত রাধাকৃষ্ণের

কুলতলি থানার কোরামুদি সম্প্রদায়ের গানের আসর *ছবি ঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ*

প্রেমলীলা-বিষয়ক। আসর ছাড়াও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেও গান গাওয়া হয়। গানের দলে থাকে মেক আপ করা রাধা, কৃষ্ণ, গোপিনীবৃন্দ ও একজন জোকার। বাদ্য-বাজনার মধ্যে থাকে মাদল বা ঢুলি, কাঁসি ও বাঁশি। গোপিনীদের হাতে থাকে দুটো করে কাঠি। প্রথমে আসর বন্দনা। যথা :

জয় জয় জয় মাগো জগৎ জননী গো
যম অভয়তর সে ত্রিগুণ ধারিণী
ভৈরবী ভবানী মা অধর অম্বিকা উমা
আদ্যাশক্তি মহামায়া কে বুঝে গো তব মায়া
শিব ও সীমন্তিনী শ্যামা শ্মশানবাসী

এর পরই শুরু হল মূল গান :

(ক) চড়িলে আমার তরী
চাই ওগো দান কড়ি
যত সব গোপী নারী
এসেছে হেথায় গো
করি আমি মাঝিগিরি
ঝিকা মেরে পার করি
এখনি ছাড়িব তরী
চিন্তা কিসের তায় লো।
কেন হও তুমি উতলা
খোল দেখি আগে ডালা
পচা ননী হইলে ধনি
নেবো না নৌকায় গো।।

(খ) পাহাড়ে পাহাড়ে রাখাল
গাই চরালি কোথায় রে
গরুর খুরে নাই যে কাদা
জল খাওয়ালি কোথায় রে।

বিয়ের গান ঃ যে কোনও সমাজে বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো আদিবাসী সম্প্রদায়ের

বিবাহ অত্যন্ত জটিল এবং বহুল আচারসর্বস্ব। আদিবাসীদের সব সম্প্রদায়ের বিবাহরীতি এক নয়। এমনকী গানের কথা ও সুর এক নয়। সঙ্গত কারণেই বিয়ের বিস্তৃত বর্ণনায় না গিয়ে এখানে শুধু কোরামুদি সম্প্রদায়ের দুটি গান উল্লিখিত হল :

(ক) চললো বরের পিসি
জল সইতে যাবো
পথে আছে শ্যামের কড়ি
শুনে শুনে যাবো
দেশে গুলিতাইলো বর
দেশ লাড়ু পাকা কদম
পাকের ভিতর।

(খ) বনে বনে আলিস ছুঁড়া
কি খাঁয়্যে আলিস
পেটা ডাবাক ডুবুক
শিয়াল খাঁয়্যে আলিস
বনে বনে......
ঠারে দাঁড়ালিস
চ্যালা কাঠের মার খাঁয়্যে রে ছুঁড়া
সোঁদরে সাঁধালিস।

উপসংহার □ আদিবাসী-অধিবাসী সংঘাত :

এতক্ষণ ধরে আলোচনার সূত্রে একথা মনে করার কারণ নেই যে এ জেলার আদিবাসীদের জীবন খুবই সহজ গতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে আদিবাসীরা নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রীকে নিয়ে পৃথক আদিবাসী দপ্তর আছে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য। লোকসংস্কৃতিবিদ সুধী প্রধানের পরিচালনায় 'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র' সদাই নিয়োজিত আদিবাসীদের জন্য। বেসরকারী উদ্যোগে এবং সংস্কৃতিপ্রিয় কিছু কিছু মানুষের বিশেষ বদান্যতায় গড়ে ওঠা কয়েকটি সংগঠনও এ জেলাতে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করছেন। যেমন: লোকসংস্কৃতি সংসদ (জয়নগর মজিলপুর), ২৪-পরগনা আদিবাসী জনকল্যাণ সমিতি (হেড়োভাঙা, ক্যানিংথানা), আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র (পূর্ব- গুড়গুড়িয়া, কুলতলি), হেদিয়া-ভবানন্দ আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি (মল্লিকাটি, ক্যানিং), চুপড়িঝাড়া লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র (কুলতলি) এবং সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি সংস্থা (গোসাবা)।

এসব সংস্থার মাধ্যমে আদিবাসীরা নিশ্চয়ই উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু যে কোনও বেসরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা আছে। প্রধানত অর্থকরী অসুবিধাই এই সীমাবদ্ধতার কারণ। আবার এই সংস্থাগুলো ছাড়াও এ জেলায় এমন কিছু ব্যক্তিপ্রধান সংস্থা আছে যারা সর্বদাই আদিবাসীদের নামে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে। আদিবাসীদের নামের তালিকা নির্দিষ্ট জায়গায় পেশ করে আর্থিক কোটাও বেরিয়ে আসছে। অথচ সেই টাকার ছিটেফোঁটা পরিমাণও তৃণমূল স্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। অতএব সরকারি প্রচেষ্টায় এখন থেকে এই দুষ্ট সংস্থাগুলোকে চিহ্নিত করা একান্ত জরুরি।

বর্তমান সরকার দ্বারা পরিচালিত পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা অনেকখানি জনমুখী, সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র জনমুখী নয়, পরন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার পঞ্চায়েতগুলোকে আরও বেশি আদিবাসীমুখী হতে হবে।

জেলার ভূমিপুত্র আদিবাসীদের দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর উপর নতুন করে তৈরি হয়েছে আদিবাসী-অধিবাসী সংঘাত। এই 'অধিবাসী' শব্দের মধ্যে আছে বর্ণহিন্দু ও অন্যান্য তপশিল সম্প্রদায়। অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের উপর তপশিল হওয়ার চাপ সৃষ্টি হচ্ছে কোথাও কোথাও। আবার কোথাও কোথাও আদিবাসীদের উপর শমন জারি হয়েছে—হাঁড়িয়া তৈরি করা যাবে না, মাদল বাজানো চলবে না ইত্যাদি। তবে হাঁড়িয়ার পরিবর্তে চোলাই মদ কিংবা মাদলের পরিবর্তে ঢোল চলতে পারে।

সুন্দরবনে মহল করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত আদিবাসীদের বহু পরিবার এখনও সরকারি ক্ষতিপূরণের আশায় দিন গুনছেন। জঙ্গল করতে যাওয়া আদিবাসী পুরুষরা নতুন করে লাইসেন্সও পাচ্ছে না বর্তমানে।

এখনকার 'আদিবাসী আইন' অনুযায়ী আদিবাসী জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু অনেক জায়গায় গোপনে জমি হস্তান্তরের ঘটনা ঘটছে। পূর্বে হারানো 'বেআইনি হস্তান্তর জমি' ও 'খাইখালাসি জমি' উদ্ধারের জন্য আদিবাসীরা তদ্বিরও করেছেন সরকারি দপ্তরে। কিন্তু 'আঠারো মাসে বছর ঘোরার' নীতিতে সেইসব ফাইলগুলো ঝুলে আছে বছরের পর বছর। দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করার পরেও জমির পড়চা পাচ্ছে না আদিবাসীরা। ফলত বিভিন্ন সমস্যায় আদিবাসী সম্প্রদায় দীর্ণ হচ্ছে।

জেলার আদিবাসীদের হয়ে কথা বলবার মতো সারদাপ্রসাদ কিস্কু নেই, নেই সিধু-কানু কিংবা বাবা তিলকা মাঝি। অতএব পথ চেয়ে বসে থাকা। আদিবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের এ সমস্যার আঁধার ছিন্ন করে একদিন-না-একদিন প্রভাত-রশ্মির উদয় হবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

প্রবন্ধে ব্যবহৃত মন্ত্র ও গানগুলি লেখক কর্তৃক সংগৃহীত। সংগ্রহের সময়কাল ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৭ সাল।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাঁরা আতিথ্য নিয়ে আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি বুঝতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নামের তালিকা দীর্ঘ। অতএব একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হল :

আনন্দদুলাল ভকত	—	(মঠেরদিঘি)
নগেন্দ্রনাথ সরকার	—	"
তপনকুমার সরদার	—	(ভবানন্দ, সারেঙ্গাবাদঅঞ্চল)
সরস্বতী সরদার	—	"
নিরঞ্জন মাহাত	—	"
অভিরাম সরদার	—	(৬ নং দুর্গাপুর, কুলতলি)
সন্তোষ সরদার	—	"
যুধিষ্ঠির সরদার	—	"
দেবলা সরদার	—	"
অভিরাম সরদার	—	"
রাবণ সরদার	—	"
তারারানী সরদার	—	"
রেণুপদ সরদার	—	"

অনেক জায়গায় গোপনে আদিবাসী জমি হস্তান্তরের ঘটনা আজও ঘটছে

আরতি সরদার — „
মঙ্গলা সরদার — „
জলধর সরদার — „
ভগবতী সরদার — „
প্রতিমা মুদি — (চুপড়িঝাড়া, কুলতলি)
আঙ্গুরবালা মুদি — „
বিলাসী মুদি — „
সুভদ্রা মুদি — „
বীণাপাণি মুদি — „
মানিক মুদি — „
বসন্ত মুদি প্রমুখ — „

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—জে. ভি. স্তালিন (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি)

ভূপেন্দ্র রচনাবলী ...ও মূল্যায়ন—সম্পাদনা : রাধারমণ মিত্র (১ম খণ্ড)

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-... করণ (১৩৩৫)

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক ...সুর (জিজ্ঞাসা)

বাংলার সামাজিক ...স—...সুর (জিজ্ঞাসা)

দক্ষিণ চব্বিশ পর... ম খণ্ড)—কালিদাস দত্ত

রাঢ়ের জাতি ও ... (১ম ...)—মানিকলাল সিংহ

সুন্দরবনের লো... —ধূর্জটি নস্কর (শ্যামলী পাবলিকেশন)

জাতি-কথা ও আ... —নগেন্দ্রনাথ মিত্র

বজবজের ইতিহা... বর্তমান—নকুড়চন্দ্র মিত্র

লক্ষ্মীকান্তপুরের ই... কুমার বৈদ্য

মহানাদ (২য় খণ্ড... প্রভা... বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩৮

বিষ্ণুপুরের ইতিবৃত্ত—কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, তত্ত্ববিনোদ (১৩৫০)

ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন—পশুপতিপ্রসাদ মাহাত

প্রাচীন জরিপের ইতিকথা—অরুণকুমার মজুমদার

পরিচয় ও তথ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা—জেলা তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ

কালিদাস দত্ত জন্মবার্ষিকী (১৯৮৪)—স্মারক পত্রিকা

শতবার্ষিকী স্মারক—জয়নগর ইনস্টিটিউশন শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি

স্মরণিকা : দ্বারকানাথ ভঞ্জের স্মৃতিচারণ—সম্পাদনা : দীপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ (১৯৭৭)

ইংরেজি

Linguistic Survey of India ; Vol. IV–G.A.Griarson.

Statistical Account of Bengal ; Vol. I–W.W.Hunter.

সূত্র

১ ঝাড়খণ্ডের বিদ্রোহ ও জীবন—পশুপতিপ্রসাদ মাহাত।
২ প্রাচীন জরিপের ইতিকথা—অরুণকুমার মজুমদার।
৩ পরিচয় ও তথ্যে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা।
৪ Linguistic Survey of India ; Vol. IV–G.A.Griarson.
৫ রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খণ্ড)—মানিকলাল সিংহ।
৬ দ্রষ্টব্য : মধ্যাহ্ন (১৯৮৬)/প্রবন্ধ : সুন্দরবনের মুণ্ডা উপজাতি সমাজ—মিহিরকান্তি ন্যায়বান।
৭ বর্তমানে জেলার খ্রিস্টান আদিবাসীগণ ভিন্ন ধরনের করম পূজা করছেন। এঁরা করম গাছের তিনটি ডাল একত্র করে, তাতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতীক রেখে খ্রিস্টান ধর্মযাজক দিয়ে পুজো করান। এক্ষেত্রে করম রাজার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে যীশু। লেখক।।
৮ "সমারূঢ় ব্যতিক্রম' (বইমেলা, ১৯৯৫) দ্রষ্টব্য; মৎপ্রণীত প্রবন্ধ : 'লোকায়ত ঝাড়খণ্ডীর সংস্কৃতি ও সুন্দরবন"।

লেখক পরিচিতি : আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি গবেষক ও ছোটগল্পকার।

কমলকুমার ভদ্র
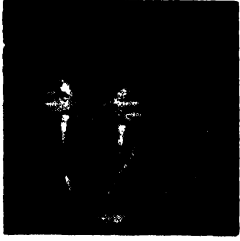
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : কৃষিচিত্রে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

জেলার অবস্থান :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে এই জেলা অবস্থিত যার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে কলকাতা এবং পূর্বে ও পশ্চিম যথাক্রমে মাতলা ও হুগলি নদী পরিবেষ্টিত আছে। সমগ্র জেলাটি আলিপুর ও ডায়মণ্ডহারবার এই দুটি মহকুমা নিয়ে গঠিত এবং জেলার সদর শহর আলিপুর হুগলি নদীর পূর্ব তীরে ২২°৩০' উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°৩০' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৬·৪ মিটার। সম্প্রতি প্রশাসনিক স্তরে কাকদ্বীপ, ক্যানিং এবং বারুইপুর এই তিনটি মহকুমা ঘোষিত হয়েছে।

জেলার দক্ষিণ প্রান্তে সুন্দরবন জীব-পরিমণ্ডলের উত্তর ভাগ ড্যাম্পিয়ার হজেস্ লাইন দ্বারা চিহ্নিত। জেলার দক্ষিণ-পূর্বের ১৩টি ব্লক এবং উত্তর ২৪-পরগনার ৬টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল ২১°৩২' থেকে ২২°৪০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০৫' থেকে ৮৯° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিম হুগলি নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং ইছামতী, কালিন্দী ও রায়মঙ্গল সুন্দরবন অঞ্চলের সীমানা নির্দেশ করে।

মাটির শ্রেণীবিভাগ :

বর্তমানে ২৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত দক্ষিণ ২৪-পরগনার মাটি প্রধানত পাঁচ প্রকার—

(১) গঙ্গা-অধ্যুষিত পলিমাটি (Gangetic Alluvium)—বজবজ, মহেশতলা, যাদবপুর, সোনারপুর, বারুইপুর, জয়নগর ১নং ব্লক এলাকার বেশিরভাগ।

(২) নোনা মাটি (Saline)—ডায়মণ্ডহারবার ১নং ও ২নং, মগরাহাট, জয়নগর ২নং এবং কুলতলি ব্লক এলাকার মাটি।

(৩) ক্ষার-যুক্ত নোনা মাটি (Saline-Alkaline)—সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, মন্দিরবাজার, গোসাবা ব্লক এই ধরনের মাটি দ্বারা গঠিত।

(৪) ক্ষার যুক্ত নোনাবিহীন মাটি (Non-Saline Alkali)—ভাঙড় এলাকার মাটি

(৫) উৎকর্ষতা হ্রাস-প্রাপ্ত ক্ষারীয় মাটি (Degraded-Alkali)—ক্যানিং ব্লক এলাকা বর্তমান কোনও কোনও ব্লকে অম্লমাটি বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত মাটির পি এইচ (PH) ৬·৫ থেকে ৭·৫-এর মধ্যে থাকে। উপকূলবর্তী ক্ষারযুক্ত নোনা মাটির দ্রবণীয় লবণের মাত্রা ৩ থেকে ১৮ মিলিমোস/সেমি থাকে। উল্লিখিত শ্রেণীর মাটি সামগ্রিক ভাবে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত পলি ও কাদা নিয়ে গঠিত যার উৎপত্তি হয়েছে ডলোমাইট, ম্যাগনেসাইট এবং অভ্রযুক্ত খনিজ পদার্থ থেকে। বৃষ্টির জল এবং সমুদ্রের নোনা জল এই মাটির সহিত মিশ্রিত হয়।

বিগত প্রায় দুই দশক ধরে ব্যাপক ভূমি সংস্কার ও ক্ষুদ্র-মাঝারি কৃষকদের বন্টনের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে এই জেলার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সেচ-দফতরের দ্বারা স্লুইস্ গেট নির্মাণ ও নদী-বাঁধ তৈরির ফলে কিছু এলাকাতে নোনা জল পরিবাহিত হওয়া বোধ করা গিয়েছে, যদিও সাইক্লোন, জোয়ার ইত্যাদিতে অনেক সময় বাঁধ ভেঙে কৃষি জমি নোনা জলে প্লাবিত করে।

কৃষি জলবায়ু :

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৭০০ মিলিমিটার যার শতকরা ৮০ ভাগই জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে সমুদ্র-উপকূলবর্তী হওয়ায় ঝড়-ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন, নিম্নচাপ ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় মাঝে মধ্যেই যা কৃষিজীবী মানুষের ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ যা বিভিন্ন ফসলে রোগ, পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। প্রতিদিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৬° সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৬° সেন্টিগ্রেড (এপ্রিল, মে) এবং ১৩·৬° সেন্টিগ্রেড থেকে ১৪·২° সেন্টিগ্রেড (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) থাকে।।
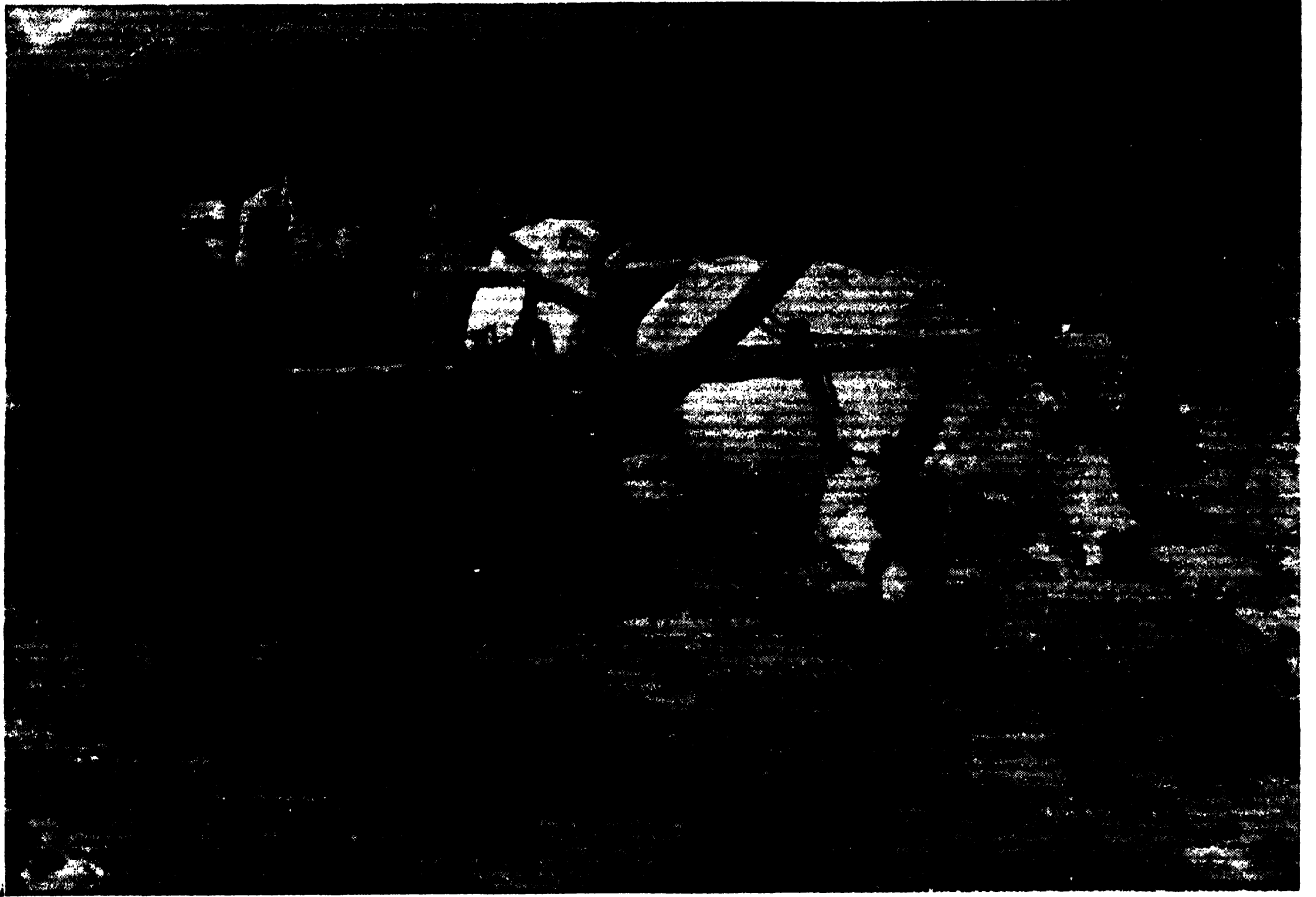
[illegible] চব্বিশ পরগনার কৃষকের এখনও হাল-বলদই চাষের প্রধান উপকরণ

জেলার সামগ্রিক পরিচিতি

১।	মোট ভৌগোলিক আয়তন	:	৮,১২,৮১৮ হেক্টর
২।	কৃষি-বহির্ভূত জমি	:	২,৪৫,৫০৫ ,,
৩।	বনাঞ্চল	:	১,৭০,৫৮০ ,,
৪।	পতিত ও অযোগ্য চাষ জমি	:	৫,২২৪ ,,
৫।	স্থায়ী পশুচারণ ক্ষে[illegible]	:	৬৩৫ ,,
৬।	(ক) ফল, ফুল ই[illegible] বা[illegible]	:	১০,২৪৫ ,,
	(খ) অন্যান্য গাছ[illegible] বৃক্ষ	:	১,৯৮০ ,,
৭।	চাষযোগ্য পতিত [illegible]	:	৪,৫৩০ ,,
৮।	কর্ষিত অনাবাদী [illegible]	:	২,৫০০ ,,
৯।	কৃষিকার্যে ব্যবহৃত [illegible]	:	৩,৯২,৭৯৫ ,,
১০।	একের অধিক ফ[illegible]	:	১,৪৯,৬১৭ ,,
১১।	মোট কৃষিকার্যে ব[illegible]	:	৫,৪২,৪১২ ,,
১২।	সেচসেবিত জমি	:	১,১৭,৬৩৫ ,,

[জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারি[illegible] ২৪-পরগনা হইতে গৃহীত]

অতীত দিনের চাষ [illegible] :

সাগর উৎক্ষেপিত [illegible] লে এই জেলার বেশিরভাগ জমি নোনা জলে ভেসে [illegible] বৃষ্টিনির্ভর আমন ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ প্রায় [illegible] এই ধরনের নোনা-মিঠেন নিচু জমিতে রূপশাল, পাটনাই, বেনীশাল, কুমারগোড়, কার্ত্তিকশাল, মাতলা, হ্যামিলটন, সাদা মোটা ইত্যাদি লম্বা উচ্চতা বিশিষ্ট দেশি জাতের চাষ হত বছরে একবার এবং ফলনও ছিল কম (হেক্টর প্রতি এক থেকে দেড় টন), রবিশস্য বলতে খেসারি, তিল, কলাই এবং বিক্ষিপ্তভাবে সবজি চাষ হত কোনরকম পরিচর্যা ছাড়াই। জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে খাল, বিল, নদী-নালা পরিবেষ্টিত অনেকগুলি দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে যা অতীতে অপ্রবেশ্য ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমন ধানের জমিতে এবং নদী-নালা-খালে, মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভাবেই সৃষ্টি হত (বর্তমানে নানা কারণে এই সংখ্যা ক্রমশ কমছে) যা এই জেলার বহুলাংশ মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় হত। সুদূর অতীতে (সপ্তদশ শতাব্দী) অবিভক্ত বাংলা তথা ২৪-পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জমিদারি/জায়গিরদারি স্বত্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকরা ধান ছাড়াও আখ, তুলা, সরিষা, পান (বারুজীবী সম্প্রদায়) ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন দ্বারা কর, খাজনা ইত্যাদি পরিশোধ করত। পরবর্তীকালে এদের বেশ কিছু অংশ আরাকান দস্যুদের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়।

বর্তমান কালের চাষ :

জেলার মূল অর্থনৈতিক উন্নতি বৃষ্টিনির্ভর আমন ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। জুলাই-আগস্টের (আষাঢ়-শ্রাবণ) অতিরিক্ত
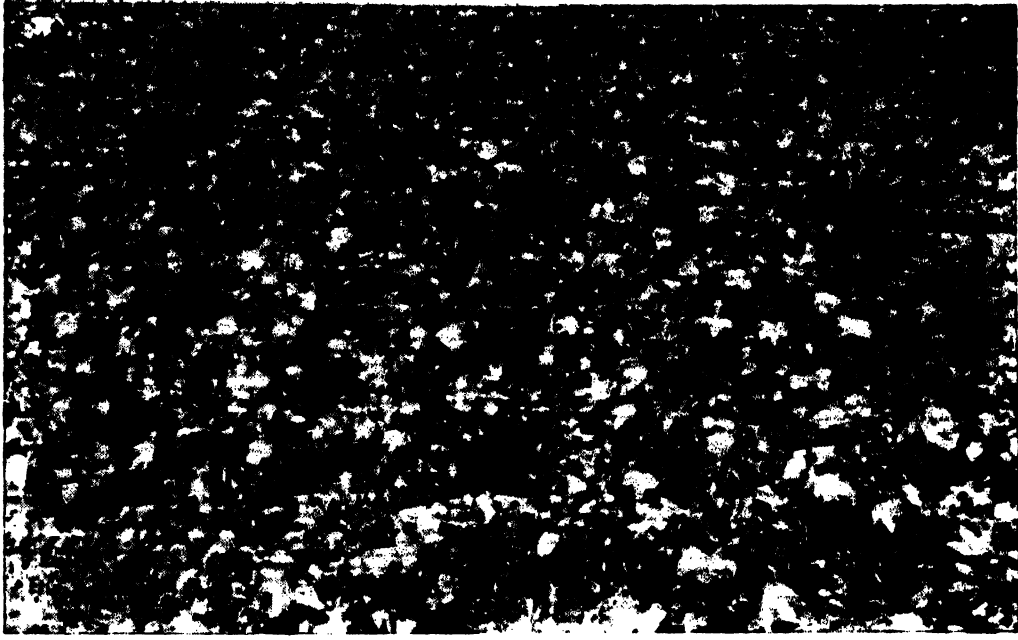
তুলা চাষ, জয়নগর ২নং ব্লক কমলপুর রামকৃষ্ণ কৃষক সমিতি

বৃষ্টিপাত আমন ধান রোপণে সহায় হলেও বেশিরভাগ জমিতে জল নিষ্ক্রমণের বিশেষ সুবিধা না থাকায় দেশি বা স্থানীয় জাতের ধান প্রথাগত ভাবেই কৃষকেরা রোয়া করে। মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট (১২০-১৩০ সে.মি.) উচ্চ ফলনশীল জাত যেমন পঙ্কজ, শালিবাহন, বিপাশা, আই আর ৪২ ইত্যাদি মাঝারি নিচু (৫০ সে.মি. বা প্রায় ১½ ফুট জল দাঁড়ায়) জমিতে বেশ কিছু ব্লকে চাষ করা সম্ভব হলেও বেশি নিচু (১ মিটার বা প্রায় ৩ ফুট জল দাঁড়ায়)। জমিতে মালাবতী, এস আর ২৬-বি, পাটনাই-২৩, ইত্যাদি জাত এখনও প্রচলিত আছে। বর্তমানে এই ধরনের জমির উপযোগী কয়েকটি জাত যা ধান্য গবেষণা কেন্দ্র চুঁচুড়া, হুগলি থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে—যেমন সবিতা, পূর্ণেন্দু, জিতেন্দ্র, গোলক, সুবীর ইত্যাদি মিনিকিট ও ফ্রন্ট-লাইন প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করা হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় লবণাক্ত জমির উপযোগী গবেষণা কেন্দ্র, ক্যানিং থেকে উদ্ভাবিত লবণ-সহনশীল কয়েকটি জাত যেমন সি এস আর ১, সি এস আর ৪ (মোহন), সি এস আর ৬, ক্যানিং ৭ ইত্যাদি এই জেলার বিভিন্ন ব্লকে আমন এবং বোরো ধান হিসাবে চাষ করা যাচ্ছে। কয়েকটি দেশি ধানের জাত এই জেলায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য এখনও প্রচলিত ভাবে চাষ হয়, যেমন দুধের সর, রূপশাল (সরুচাল); দা-শাল, কামিনী (সুগন্ধি) এবং কনকচূড়—জয়নগরের মোয়া তৈরিতে এই ধানের খই ঐতিহ্য রক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিগত প্রায় দুই দশক ধরে ব্যাপক ভূমি সংস্কার ও ক্ষুদ্র-মাঝারি কৃষকদের বণ্টনের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে এই জেলার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সেচ-দফতরের দ্বারা স্লুইস্ গেট নির্মাণ ও নদী-বাঁধ তৈরির ফলে কিছু এলাকাতে নোনা জল পরিবাহিত হওয়া বোধ করা গিয়েছে, যদিও সাইক্লোন, জোয়ার ইত্যাদিতে অনেক সময় বাঁধ ভেঙে কৃষি জমি নোনা জলে প্লাবিত করে।

ক্ষুদ্র সেচ এলাকা (পুষ্করিণী খনন, স্যালো টিউবওয়েল ইত্যাদির দ্বারা) বৃদ্ধির ফলে এবং হুগলি নদীর পরিবাহিত জল ব্যাক্‌ফিডিং পদ্ধতিতে (জোয়ারের সময় নদীর জল উল্টোদিকে ঠেলে দেওয়া হয়) কাজে লাগিয়ে বোরো ধান-চাষের এলাকা বেড়ে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর হয়েছে। এই এলাকা সমগ্র রাজ্যের বোরো চাষ এলাকার প্রায় ৪.৩ শতাংশ মাত্র এবং জেলার উত্তর-পশ্চিমের ১৫টি ব্লক বোরো ধান চাষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের ৯২·৫ শতাংশই ধান থেকে আসে। মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ৪·৫ শতাংশ গম থেকে এবং ১·৫ শতাংশ ডালশস্য ও তৈলবীজ থেকে পাওয়া যায়। এই জেলার মাটি ও আবহাওয়া গম চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল না হওয়ায় গড় ফলনও আশানুরূপ নয়।

ডালশস্যের মধ্যে মুগ, মুসুর, খেসারি, কলাই, অড়হর ইত্যাদি চাষ হয় অল্প সেচে, বিনা সেচে, পয়রা ফসল এবং মিশ্র ফসল হিসাবে। সুন্দরবন অঞ্চলের বেশ কিছু ব্লকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের দ্বারা ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত 'নির্মল' (B-1) জাতটি পয়রা ফসল হিসাবে আমন ধানের জমিতে বিনা পরিচর্যায় উল্লেখযোগ্য ফলনের নজির রাখে।

এই জেলায় তৈলবীজ হিসাবে সরিষা, সূর্যমুখী, তিল, তিসি, বাদাম চাষ হলেও তার এলাকা ও ফলন কম। ভাঙড় ১নং ও ২নং ব্লক সরিষা চাষের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং গড় ফলনও বেশি।

সমগ্র রাজ্যের শাকসব্‌জি চাষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই জেলাও সব্‌জি চাষের উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব-রকম সব্‌জি যেমন লঙ্কা, বেগুন, উচ্ছে, ঝিঙে, ঢ্যাঁড়শ, লাউ, কুমড়ো পেঁপে, চিচিঙ্গে ইত্যাদি ফলিয়ে এই জেলার

উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ, নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
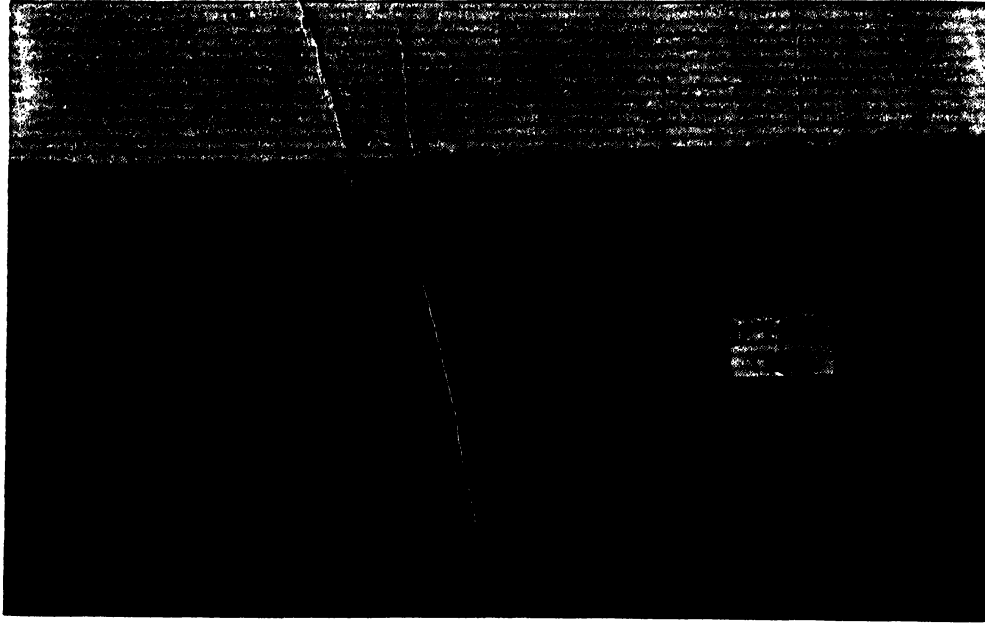
নিচে আউস, আমন ও বোরো ধানের বিগত ৮ বছরের পরিসংখ্যানগত তথ্য দেওয়া হল

	আউস ধান			আমন ধান			বোরো ধান		
সাল	এলাকা (হেক্টর)	মোট ফলন (টন)	প্রতি হেক্টরে ফলন (কিলো)	এলাকা (হেক্টর)	মোট ফলন (টন)	প্রতি হেক্টর ফলন (কিলো)	এলাকা (হেক্টর)	মোট ফলন (টন)	প্রতি হেক্টরে ফলন (কিলো)
১৯৮৮-৮৯	১৬০৪	৫৪৯০	৩৪২৩	৩,৭৪,৪২৪	৮,৩৩,০৬০	২২২৫	৩৪৫৯৫	১,৪৯,৪৪০	৪৩২০
১৯৮৯-৯০	১২০০	৩৮৬০	৩২১৭	৩,৭৫,৪২৮	৯,০৮,৩৬০	২৪২০	৩৫৩৬৮	১,৪৪,৮৩০	৪০৯৫
১৯৯০-৯১	২০৯০	[illegible]	৩০৬২	৩,৭৬,৪৩১	৫,৮৭,৮৫০	১৫৬২	৩৯৪০৩	১,৭০,২৫০	৪৩২১
১৯৯১-৯২	১৪৮৯	[illegible]	৩৯৫২	৩,৭৪,৫৫৮	৯,৬৫,৬৬০	২৫৭৮	৪৮০৩৯	২,০২,০০০	৪২০৫
১৯৯২-৯৩	১০৭১	[illegible]	৩৯৬৮	৩,৭৫,৭৪৭	৯,৫১,১৫০	২৫৩১	৪৭৮৫০	১,৮৫,৬৯০	৩৮৮১
১৯৯৩-৯৪	১৮৭৬	[illegible]	৩২৩০	৩,৮২,৩৮১	৮,৭৫,৮০০	২২৯০	৫০৫০৪	১,৭৬,৬৬০	৩৪৯৮
১৯৯৪-৯৫	২১১২	[illegible]	৩৫২৭	৩,৮৪,১০৯	১০,১৯৫০	২৬০৮	৫০৯৮১	১,৮৪,২১০	৩৬১৩
১৯৯৫-৯৬	২৪১০	[illegible]	৩০০৮	৩,৭০,৫৩৯	৭,৮৪,৫৫০	২১১৭	৫২,৯১১	২,০৯,৭৩০	৪০৪০

(পরিসংখ্যান-তথ্য-কৃ[illegible] শাখা (Evaluation Wing) থেকে সংগৃহীত)

কৃষকেরা বেশ লাভবান হয়। প্রত্যন্ত ব্লকগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হলে আগামী দিনে সবজি চাষ আরও বৃদ্ধি পাবে। ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষের বেশ কিছু এলাকা বর্তমান সবজিচাষে ব্যবহৃত হয়।

সব্জি চাষের অগ্রগতির চিত্র দেওয়া হল

সাল	এলাকা (হেক্টর)	ফলন (মেট্রিক টন)
১৯৮৫-৮৬	৩৩,০০৯	৩,৬৮,৮৯০
১৯৯২-৯৩	৫০,৬৪৩	৬,৯৭,২৬০

(মুখ্য কৃষি আধিকারিক, দক্ষিণ ২৪-পরগনা বার্ষিক বিবরণী হইতে গৃহীত)

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আলু চাষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটলেও এই জেলায় এলাকা ও গড় ফলন কম, তার কারণ প্রথমত উপকূলবর্তী মাটি হুগলি, বর্ধমান ইত্যাদি জেলার মতো আলু চাষের পক্ষে তেমন সুবিধাজনক নয় এবং দ্বিতীয়ত, সার প্রয়োগ (জৈব ও অজৈব) করা হয় নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম। গোসাবা, ভাঙড়, পাথর প্রতিমা, সাগর ইত্যাদি ব্লকে আলুর চাষ বেশি হয়।। এই জেলায় আলুর চাষের চিত্র নিম্নরূপ।

সাল	এলাকা (হেক্টর)	মোট ফলন (টন)	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (কিলো)
১৯৯৩-৯৪	১২২৬	১৬,২৭০	১৩,২১৭
১৯৯৪-৯৫	১৪৭০	২৪,৬১০	১৬,৭৪১
১৯৯৫-৯৬	১২১৪	২৩,৭১১	১৯,৫৩১

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় এলাকাভিত্তিক বিশেষ ফলন হিসাবে সাগর, নামখানা ব্লকে পান ও তরমুজ চাষ, বাসন্তী, ক্যানিং ব্লকের সূর্যমুখী জাতের কাঁচালঙ্কা, নামখানা, কাকদ্বীপের শুকনো লঙ্কা (সুন্দরী জাত), রায়দিঘি (মথুরাপুর) অঞ্চলের পটল ইত্যাদি পরিচিত।।

এই জেলার প্রায় সব ব্লকেই কম-বেশি নারিকেল ও সুপারি গাছ বিক্ষিপ্ত অথবা পরিকল্পিত ভাবে আছে। অতীতে লম্বা জাতের

সুন্দরবনে লংকা চাষ, নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

নারিকেল, জেলার অনুকূল মাটি ও পরিবেশে বিনা পরিচর্যায় মোটামুটি ফলন দিলেও বর্তমানে জৈব ও রাসায়নিক সারের অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে জেলা ও ব্লক স্তরে মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট নারিকেল, চারা গাছ ও উন্নত মানের সুপারি চারা বিতরণের ফলে এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নিচে উল্লিখিত হল।

ফলের চাষ :

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে ও পুষ্টি বর্ধনে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এর থেকে ভিটামিন 'এ', 'সি', খনিজ লবণ, শর্করা (Carbohydrate) এবং বিভিন্ন উৎসেচক (Enjyme) পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক লোকের বছরে ৩৪ কেজি বিভিন্ন ফল খাওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন উৎসবে, পূজা, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলাবাসীর কাছে ফল খাবার প্রবণতা প্রাচীন কাল থেকে থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয় এবং ফল চাষে ব্যবহৃত জমি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমির প্রায় ২ শতাংশ মাত্র। জেলার বারুইপুর ব্লক ফল চাষে সব চেয়ে উন্নত এবং জেলার মোট ফল চাষ এলাকার

সাল	নারিকেল			সুপারি		
	এলাকা (হেক্টর)	ফলন নারিকেল প্রতি হেক্টরে	মোট ফলন (মোট নারিকেল সংখ্যা)	এলাকা (হেক্টর)	ফলন প্রতি হেক্টরে (কিলো)	ফলন শুকনো/ছাড়িয়ে (টনে)
১৯৯২-৯৩	৩২৬৫	১৫,০০০	৪,৮৯,৭৫,০০০	৭৮৮	১৫০০	১১৮২
১৯৯৩-৯৪	৩৪৫০	১৫,০০০	৫,১৭,৫০,০০০	৭৮৮	২০০০	১৫৭৬
১৯৯৪-৯৫	৩৪৫৫	১২,০০০	৪,১৪,৬০,০০০	৭৯০	২০০০	১৫৮০
১৯৯৫-৯৬	৩৪৭০	১২,০০০	৪,১৬,৪০,০০০	৮০০	২০০০	১৬০০

প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৬২০ হেক্টর) এই ব্লকের আছে। বারুইপুরের পেয়ারা ও লিচু রাজ্য ও দেশবাসীর কাছে অজানা নয়। এছাড়া আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু (বাতাবি, কাগ্‌জি) কলা, সবেদা, করমচা, জামরুল ইত্যাদি প্রায় সব রকম ফলের গাছ এই জেলার বিভিন্ন ব্লকে কম-বেশি এলাকায় আছে। জয়নগর ১নং ব্লকের কিছু সবেদা এবং বারুইপুর ব্লকের করমচা প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করে অন্য রাজ্যে রপ্তানি হয়। কম পরিচিত কয়েকটি ফল যেমন, লোকাট বা লকেট ফল, ফলসা, ঘটিজাম, চালতা, কামরাঙা, গোলাপজাম এই জেলায় জয়নগর, বারুইপুর, মথুরাপুর, মগরাহাট ইত্যাদি স্থানে বহু অতীতকাল থেকে আছে।

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক মৎস্য চাষ, পশুপালন কুটির শিল্প ইত্যাদি দ্বারা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষে নিম্নলিখিত গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ শিবির এই জেলায় অবস্থিত আছে।।

মাশরুম চাষ, কমলপুর রামকৃষ্ণ কৃষক সমিতি

১। কেন্দ্রীয় লবণাক্ত জমির উপযোগী গবেষণা কেন্দ্র, ক্যানিং—I.C.A.R. পরিচালিত (Central Soil Salinity Research Institute)।
২। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, নিমপীঠ (জয়নগর) ও কাকদ্বীপ—
৩। কেন্দ্রীয় নোনা-মিঠেল জলে মৎস্য/চিংড়ি চাষ কেন্দ্র—কাকদ্বীপ—C.I.B.A. Bangalore. (Central Institute for Brackish-water Aquaculture)
৪। লবণাক্ত জমিতে ধান্য গবেষণা কেন্দ্র (গোসাবা)—ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়া, হুগলি-এর তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত।
৫। লোকশিক্ষা কেন্দ্র, নরেন্দ্রপুর,—রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত।
৬। আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র, কাকদ্বীপ (বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত)।
৭। মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র, বীজ পরীক্ষা কেন্দ্র, ফসলের রোগ, পোকা, ছত্রাক আক্রমণ প্রতিরোধ কেন্দ্র—টালিগঞ্জ, রাজ্য সরকার পরিচালিত।
৮। কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরেন্দ্রপুর রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত।
৯। সুন্দরবন ডেভলপমেন্ট বোর্ড।
১০। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ-নীগমের শাখা, ডায়মন্ডহারবার।
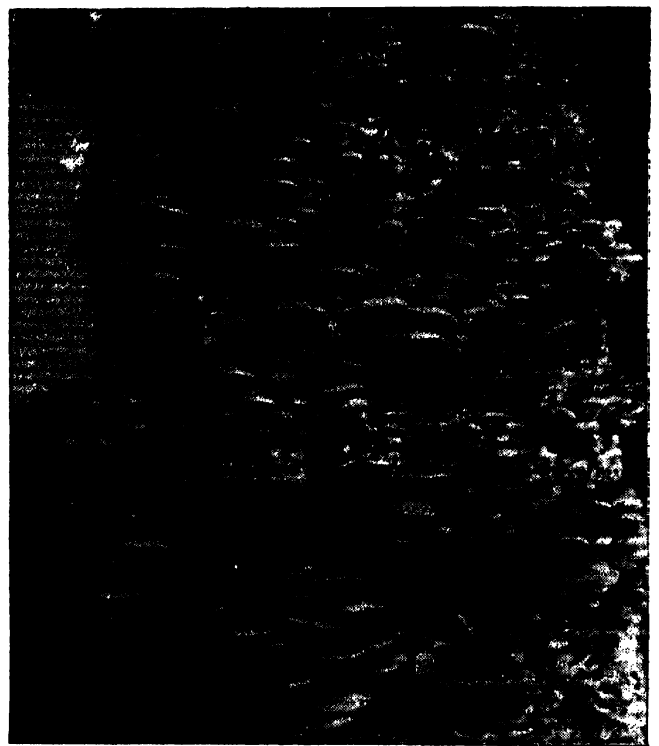
নিচে গম ডালশস্যের ৪ বছরের এবং তৈলবীজের ৩ বছরের পরিসংখ্যানগত তথ্য দেওয়া হল :

	গম			ডালশস্য			তৈলবীজ		
সাল বৎসর	এলাকা (হেক্টর)	মোট [illegible] ([illegible]	[illegible] হেক্টরে ফলন (কিলো)	এলাকা (হেক্টর)	মোট ফলন (টন)	প্রতি হেক্টরে ফলন (কিলো)	এলাকা (হেক্টর)	মোট ফলন (টন)	প্রতি হেক্টরে ফলন (কিলো)
১৯৯২-৯৩	৫১	[illegible]	[illegible]৩৫৩	৮৬৮২	৩৬৫৯	৪২১			
১৯৯৩-৯৪	২৮	[illegible]	[illegible]৮৬৪	১০৭১৯	৬৮১৫	৬৩৬	৫৪১১	৩৮১৮	৭০৬
১৯৯৪-৯৫	৩২	[illegible]	[illegible]৫৬৩	৭৮৯৫	৪৭৯৬	৬০৭	৮২৮৭	৬১০৯	৭৩৭
১৯৯৫-৯৬	২১	[illegible]	[illegible]৩৮১	৫৩৭৭	৩২৩৫	৬০২	৩৪৭৩	২৪৬১	৭০৯

সাগরদ্বীপে সৌরশক্তি প্রকল্প — *ছবি : সুমন্ত্র পত্রনবিশ*
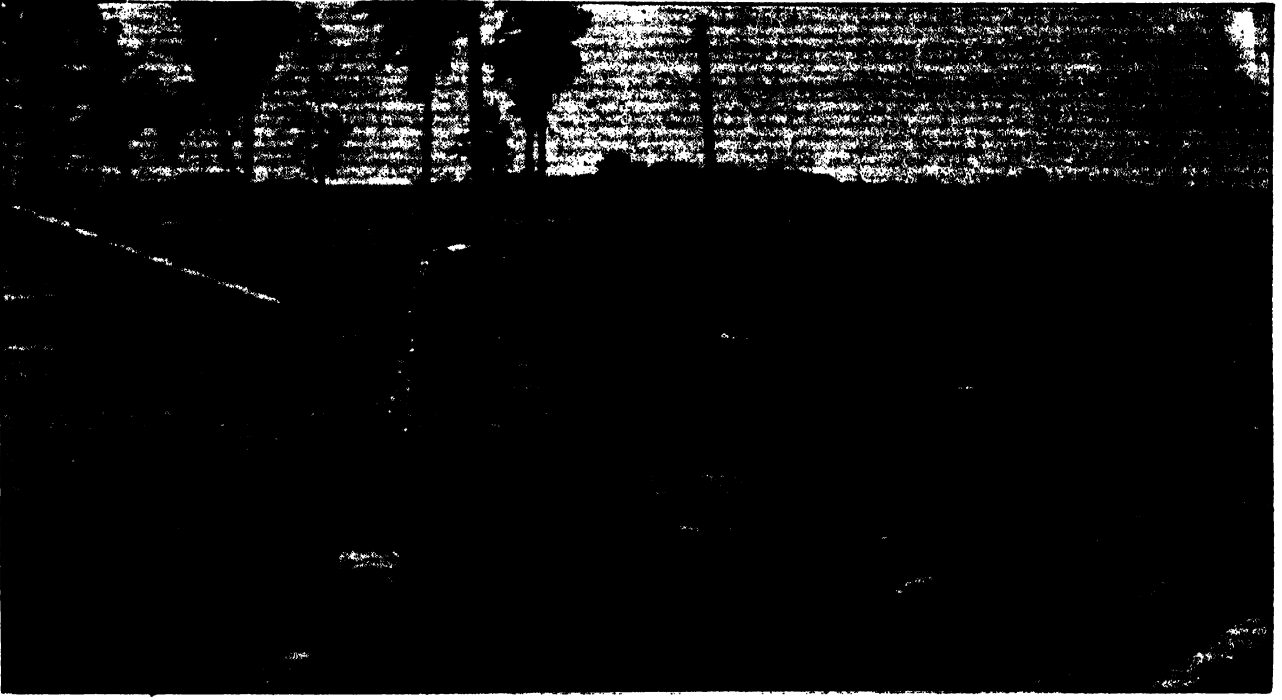
উল্লিখিত কেন্দ্রগুলি ছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা N G O'S. —যেমন টেগোর সোসাইটি, লুথরান ও সারভিস, W W F, আশা ওয়েলফেয়ার, S.E.D.P ইত্যাদি কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত আছে। কৃষকদের উন্নত মানের বীজ সরকারি মূল্যে দেওয়া ও নতুন নতুন ফসলের সম্ভাবনা নিয়ে ফলিত গবেষণার জন্য অন্য জেলার মতো এই জেলাতেও একটি জেলা বীজ ফার্ম আছে মন্মথনগরে (গোসাবা ব্লক)। এছাড়া বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, সাগর, বিষ্ণুপুর ২নং ও মথুরাপুর ১নং-এ একটি করে ব্লক সীড় ফার্ম আছে।।

এই জেলায় লবণাক্ত জমিতে আমন ধানের পর রবিখন্দে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে অতীতে তুলা ও পরবর্তী কালে সুগার বীট (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল, স্পিরিট, ইথানল ইত্যাদি তৈরির জন্য) চাষের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়া, পোকা আক্রমণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারজাত করার মধ্যে সমন্বয় না ঘটায় অর্থাৎ বিপণনের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করানো যায়নি এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এই ফসলের বীজ বোনা থেকে আরম্ভ করে একে শিল্পজাত করার মধ্যে নানা প্রকার অসুবিধা থাকায় বাস্তবায়িত হয়নি।

কৃষির উন্নতি বিধানে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় জানানো হল।

১। আমন ধানের জমিতে ধইঞ্চা জমি তৈরির আগে প্রয়োগ করুন এবং ধান রোয়ার এক মাস পরে চাপান সার না-দিতে পারলেও অন্তত শিষ বের হবার ২৫-৩০ দিন আগে চাপান সার হিসাবে বিঘা প্রতি ২-৩ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করুন। জমিতে জল বেশি থাকলে কাদার বল করে দিন।

২। রোগ-পোকা দমনের জন্য রাসায়নিক কীটঘ্নের যথেচ্ছ ব্যবহার না করে সুসংহত রোগ পোকা দমনের কৌশল কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সাহায্য নিয়ে প্রয়োগ করুন, এতে জমির স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে।

৩। ডালশস্য চাষে 'রাইজোবিয়াম' নামক জীবাণু সার ব্যবহার করলে শেকড়ে গুঁটির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ফলন বাড়ে।

৪। লঙ্কা চাষে 'এনথ্রাকনোজ' রোগ প্রতিরোধে 'কার্বেনিডাজাইম' জাতীয় ঔষধ বীজতলা ও প্রধান জমিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

৫। শাকসব্জি চাষে রাসায়নিক কীটঘ্নের (রোগ-পোকা দমনের ঔষধ) যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ একেবারেই বন্ধ করা দরকার। জৈব-কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করুন।

৬। নারিকেল ও সুপারি গাছে বর্ষার আগে বা পরে নির্দিষ্ট মাত্রায় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা দরকার।

৭। ধানের ক্ষেত্রে একান্তই কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হলে পরিবেশের পক্ষে কম ক্ষতিকারক কীটনাশক যেমন এন্ডোসালফান, মনোক্রোটোফস, ম্যালাথিয়ন, ফসফোমিডন, নিমজাত কীটনাশক, জীবাণুঘটিত কীটনাশক ব্যবহার করুন।

ভবিষ্যৎ কৃষি পরিকল্পনা :

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার লোকসংখ্যা প্রায় ৪৬ লক্ষ (১৯৮১ জনগণনা) থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৭ লক্ষে (১৯৯১ জন-গণনা অনুযায়ী)। এই দশ বছরের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ বাড়তি লোকের খাদ্য জোগানোর লক্ষ্যে এবং জেলায় অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য কৃষির উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন। শুখা মরসুমে সেচের অভাব এখনও বেশির ভাগ জমিতে ২য় বা ৩য় ফসল চাষ করা সম্ভব হয় না। এই জেলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষির সঙ্গে মৎস্যচাষ,

গো-পালন, হাঁস, মুরগি পালন, কৃষি বনাঞ্চল (Agro-forestry), ফল চাষ ইত্যাদি, বহুবিধ উপায়ে করতে হবে। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের সমবায়ভিত্তিক চিন্তাভাবনার দ্বারা অতীতে গোসাবার উন্নতি ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল।

১। সাধারণভাবে নদী বাঁধ তৈরি করে (দ্বীপ অঞ্চল) এবং ছোট জলাধার, পুষ্করিণী খননের দ্বারা বৃষ্টির জল ধরে রেখে অল্প সেচের ফসল-ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষের এলাকা বাড়ানো সম্ভব। জলাধারের মাটি দিয়ে জমিকে কিছুটা উঁচু করে উচ্চফলনশীল ধান ছাড়াও অন্য রবিশস্য ফলানো এবং পুকুরপাড়ে সবেদা, পেয়ারা, করমচা, আমলকি ইত্যাদি লবণ-সহনশীল ফলের গাছ বসানো যেতে পারে।

২। জ্বালানি সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইউক্যালিপটাস, সুবাবুল, আকাশমণি ইত্যাদি গাছ গ্রামীণ রাস্তার পাশে, পুকুরপাড়ে বসানো যেতে পারে।

৩। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঠিক রূপায়ণ করে রাস্তার পাশে নারিকেলের সাথে বেল, আমলকি, তেঁতুল ইত্যাদি ফলের প্রসার ঘটানো সম্ভব।

৪। সার ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ানো প্রয়োজন। বিশেষ করে সবুজ সার, অ্যাজোলা (ফার্ন-জাতীয়) ও 'রাইজোবিয়াম' নামক ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে যথাক্রমে ধান ও ডালশস্যের ফলন বাড়ানো প্রয়োজন।

৫। এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ফুল—যেমন বেল, জুঁই, চাঁপা, জবা ইত্যাদি চাষ করে, এবং পরিকল্পিত ভাবে গৃহস্থ মহিলাদের দ্বারা গৃহমধ্যেই খাদ্যোপযোগী মাশরুম 'বা ছত্রাক চাষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায়।

৬। নানা প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ যেমন-বাকস, তুলসী, থানকুনি, নয়নতারা, গাঁদাল, কালমেঘ ইত্যাদি এই এলাকায় অনুকূল পরিবেশে প্রাকৃতিক ভাবে জন্মায়। ক্ষুদ্র এলাকাধীন কৃষকেরা এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে আগামী দিনে প্রয়োজন মেটাতে পারে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যায় যে কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে দ্রব্যগুণ সম্পন্ন যে-সব লতা, শিকড়, পাতা, ফুল ইত্যাদি দুর্মূল্য রত্নের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তার অনেকটাই এই জেলা থেকে যায় এবং এই ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে বেশিরভাগ এই জেলারই মানুষ।

৭। সেচসেবিত গঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলে হাইব্রিড সবজি—যেমন ঢ্যাঁড়শ, টমেটো, বেগুন, লঙ্কা ইত্যাদি ফলিয়ে এবং বোরো মরশুমে হাইব্রিড ধানের এলাকা বাড়িয়ে সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

জেলার চাষীভাইদের পরিশ্রমের সুফল ও অগ্রগতির খতিয়ান আমরা শস্য ফলনে নিবিড়তা (Cropping intensity) থেকে জানতে পারি যা শতকরা ১২৮ (১৯৮৬-৮৭) থেকে বেড়ে হয়েছে শতকরা ১৪৫ ভাগ (১৯৯৪-৯৫)। পরিশেষে কৃষির উন্নতি বিধানে এই জেলার দুইজন বিশিষ্ট মানুষের অবদানের কথা জেলাবাসীর উদ্দেশ্যে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথম জন বোড়ালের শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৪ সাল)—যিনি তাঁর ছাত্রাবস্থায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য পান। কৃষির উপর কোনও ডিগ্রি ছাড়াই আজীবন ফল, ফুল, সবজি ইত্যাদির উপর গবেষণা করে আন্তর্জাতিক মানের গোলাপ, শরবতি পালং, চিরসবুজ ফুলকপি ইত্যাদি সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি ছিলেন দার্শনিক, গবেষক, সমাজসেবী এবং কবি। প্রথমদিকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরবর্তী কালে তাঁর ৮১ বছর বয়সে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ডি এস সি উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করে। কৃষির কিংবদন্তি পুরুষ সত্তর বছর ধনের সাধনার দ্বারা আমাদের নিত্যনতুন আশ্চর্য আবিষ্কার উপহার দিয়ে ১৯৯৫ সালে প্রয়াত হন। অপরজন ডাঃ বলাইচাঁদ কুন্ডু—যিনি এই জেলার জয়নগর গ্রামে জন্মেছেন ১৯০৫ সালের ১৮ এপ্রিল। উদ্ভিদ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে ইংলন্ডের লিড্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও আর ডি প্রিস্টনের অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। ইনি অবিভক্ত ভারতের নবগঠিত জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম ডাইরেক্টর হন। তার রচিত 'জুট ইন ইন্ডিয়া' বইটি পাট শিল্পের গবেষকদের কাছে খুবই মূল্যবান। লন্ডনের লিননিয়েন সোসাইটির তিনি ফেলো ছিলেন এবং পরবর্তীকালে বোটানিক্যাল সার্ভে, বসু বিজ্ঞান মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বহু সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করেন। এই বিজ্ঞানী ও সেবাকর্মী ১৯৮৯ সালের ২২শে জানুয়ারি প্রয়াত হন। এঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা এই নিবন্ধ শেষ করছি।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। Rice in ... B... Vol I, III, & IV
২। A Rev... ...oil ... ...ater Research in India
৩। Annual ...— ... 24-Parganas, P. A. O. 1986-8... ...94, ...
৪। Evalua... W... Director of Agriculture, Annual ...
৫। Proble... ... P...ilities of Agro-Forestry in Sunder...—P... ... Chowdhury
৬। Standa...tion ... fruit Cultivation in Salt-affecte... ...—R. ... Pathak
৭। Strateg... for ...ing food-grain production in W.B.—Dr. ... Mondal
৮। Soils of West Bengal—M.N. Basak
৯। Farming System Res-Ext.—Project Report, R.K. Mission Loksiksha Parishad, 1987-92
১০। Horticulteure in W.B., 1985
১১। Status of Agriculture in W.B. 1995
১২। যশোহর খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র।
১৩। দেশ পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৮৬
১৪। নব নিম্নবঙ্গ, ২৮ পৌষ, ১৩৯৯
১৫। বাঙালির ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়।
১৬। সুসংহত উপায়ে ধানের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ, মুখ্য কৃষি আধিকারিক, হুগলি।

লেখক পরিচিতি : সহকারী উদ্ভিদবিদ, ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়া, হুগলি।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

স্বাধীনতার প্রাক্কালে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে চব্বিশ পরগনা

কৃষক জনগণের ওপর শোষণ-নিপীড়ন, অবিচার-বঞ্চনা ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যে মনোভাব এই শতাব্দীর বিশের দশক থেকে দেখা যাচ্ছিল তাকে একসূত্রে গ্রথিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একই খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমানকালের সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছে। সূচনারও থাকে এক ইতিহাস—সামাজিক কারণ ও তার লক্ষণগুলি যা অনিবার্য করে তোলে।

পরাধীন ভারত। অবিভক্ত বাংলা। এখনকার বনগাঁ মহকুমাকে বাদ দিয়ে চব্বিশ পরগনা। এখন দুই চব্বিশ পরগনা হলেও উত্তরকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কৃষক আন্দোলন, তার সংগঠন নেতৃত্ব ও আন্দোলনের বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা খেই পাবে না। জেলার কৃষক আন্দোলন অনুজ—শ্রমিক আন্দোলনই নিয়েছে অগ্রজের ভূমিকা। বিশের দশকে বজবজ, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি এলাকার শিল্পাঞ্চলে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন দানা বাঁধতে দেখা গিয়েছিল। ক্রমে তা কৃষকদের মধ্যে গ্রাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

'কৃষকসভার ইতিহাস' রচয়িতা আবদুল্লাহ্ রসুল লিখেছেন :

"বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কর্মীরা ১৯২৫-২৬ সন থেকেই কৃষকদের শ্রেণী আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এসেছেন।" অবৈধ না হলেও কমিউনিস্ট পার্টির নামে খোলাখুলি কাজ করায় ছিল নানান বাধা ও অসুবিধা: গোপন পার্টিতে যে সব সিদ্ধান্ত হতো সে সব কাজ করা হতো ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির মধ্যে থেকে। এই পার্টির মুখপত্র 'গণবাণী' ১৯২৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সংবাদ দিয়েছে :

"২৪-পরগনা কৃষক সঙ্ঘের অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে। পরে মহকুমাগুলি থেকে নিয়মিত কমিটি গঠিত হবে। এই উপলক্ষে ২রা সেপ্টেম্বর (১৯২৮) বাগুইহাটির নিকট কৃষক ও শ্রমিকদের বিশাল সভা হয়। কৃষক সঙ্ঘের ১০০ প্রতিনিধি তাতে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তা ছিলেন মুজফ্ফর আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার, ধরণী গোস্বামী, কালীকুমার সেন এবং ইয়ং কমরেড লীগের কয়েকজন মেম্বর।"

জেলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ শুরু করার প্রথম পর্বেই কমিউনিস্টদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত নেমে এল। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্ফর আহ্‌মদ সহ কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। এই অবস্থা চললো ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই সদ্য জেল থেকে মুক্ত হবার পর মুজফ্ফর আহ্‌মদের উদ্যোগে ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে এক কনভেনশনে বঙ্কিম মুখার্জিকে আহ্বায়ক করে বঙ্গীয় কৃষক সংগঠনী কমিটি তৈরি হয়েছে। এই কমিটির উদ্যোগেই ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসের শেষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়েরে।

নির্বাচনে জয়ী হয়ে বঙ্কিম মুখার্জি তখন আইনসভার সদস্য। আবদুল্লাহ্ রসুল লিখেছেন : "নির্বাচনের পর জেলাগুলিতে সভার প্রাথমিক মেম্বর সংগ্রহের কাজ চলে। হাওড়া, খুলনা, ২৪-পরগনা ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়।"

আন্দোলনের চাপে ১৯৩৬-৩৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক বড় অংশ জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসেন। তাঁদের অনেকেই জেলখানায়

সুন্দরবনের লাটদার-গাঁতিদারদের লোভের লালসা দিন-দিনই বাড়তে থাকে। কৃষকের খাজনা বাড়ে। সেই সঙ্গে 'কাকতাড়ানি', 'খামার-চাঁচানি', 'দারোয়ানি', 'নিকোনি', 'পাহারাদারি', 'পার্বণী', 'সেলামী', 'কয়ালি', 'চোবানি', 'নজরানা' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বাড়তি আদায়ের জুলুম। হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল জোতদারের গোলায় তুলে সুন্দরবনের চাষী অভাবে মরে। নতজানু হয়ে 'দেড়োবাড়ি', 'দুনো-বাড়ি'-তে ধান কর্জা নিতে বাধ্য হয়। এক বস্তা ধান নিয়ে দেড় বস্তা শোধ দেবার কড়ার—দেড়োবাড়ি, দু'বস্তা—দুনো-বাড়ি।
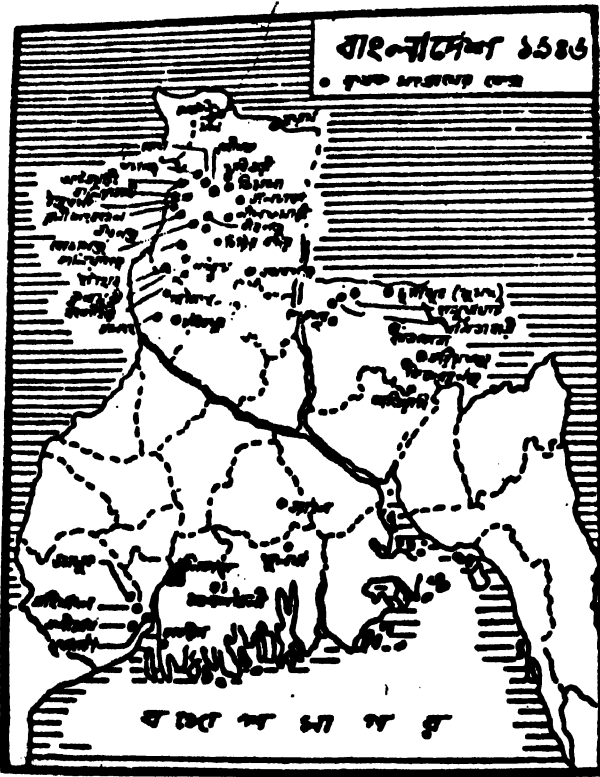
তেভাগা সংগ্রামের এলাকা

মার্কসবাদ গ্রহণ করেছেন। সদ্যমুক্ত প্রভাস রায় ১৯৩৬ সালে বুড়ুলে নিজের জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি থানা এলাকায় কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তখনকার জেলা কংগ্রেসের নেতা মুরারিশরণ চক্রবর্তী ও ফলতার মহিরামপুর গ্রামের যতীশ রায়। পাত্রসায়েরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম সম্মেলনে ২৪-পরগনা জেলার প্রতিনিধি হিসাবে মুরারিশরণ চক্রবর্তী যোগ দেন ও বক্তব্য রাখেন। ১৯৩৭ সালের ২৭-২৮ মার্চ বঙ্গীয় কৃষকসভার প্রথম সম্মেলনে আলোচনা করে বলা হলো : চব্বিশ পরগনার ক্যানিং, হাড়োয়া ও সন্দেশখালি এলাকায় পোর্ট ক্যানিং ইংরেজ কোম্পানি চাষীদের জমি ও ভিটে [illegible] করে [illegible]ড়িয়ে নিচ্ছে। এই জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে [illegible]

সম্মেলনের আগে [illegible] [illegible]ন্দু দত্তমজুমদার, সৌমেন ঠাকুর প্রমুখ নেতা কৃষক[illegible] করতে বজবজ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি প্রভৃতি থানার [illegible] করেছেন। সৌম্যেন ঠাকুর নিয়মিত সংযোগ রক্ষা ক[illegible] থানার মুচিশা, উমেদপুর, নস্করপুর প্রভৃতি গ্রামে। ন[illegible]প্রভা [illegible] নার্সের চাকরি ছেড়ে এসে সন্দেশখালি, হাড়োয়া, মী[illegible] প্র[illegible] [illegible]কায় কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন।

চব্বিশ পরগনার প্র[illegible] [illegible]হমন্ত ঘোষাল সেই দিনকার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন : [illegible] [illegible]উদপুর গাববেড়েতে সভা করতে এলেন নলিনীপ্রভা [illegible] ও [illegible] ঘোষাল। গোপনে এলেন, চলে গেলেন। যে করেই [illegible] স[illegible] [illegible] জমিদারের কানে উঠল। উমাশংকর আর তারিনী—[illegible] [illegible] পরিবার। তাদের বাড়িতে সভা হওয়ার অপরাধে জমিদার লাঠিয়াল পাঠিয়ে তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিল। গ্রামের মানুষ দেখলেন।

সহ্যেরও সীমা আছে!

সুন্দরবন অঞ্চলকে 'লট' হিসাবে ভাগ করে যাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল তারাই ছিল চলতি কথায় লাটদার। অনেক ইংরেজ সাহেবও সুন্দরবনের জমি ইজারা নিত। অধীনস্থ গাঁতিদার পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের মারফত তারা নিজেদের খাজনা বুঝে নিত। সরকার ও একেবারে নিচের কৃষকের মধ্যে এইভাবে গড়ে উঠেছিল স্তরের পর স্তরের পরগাছা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী।

সুন্দরবনের লাটদার-গাঁতিদারদের লোভের লালসা দিন-দিনই বাড়তে থাকে। কৃষকের খাজনা বাড়ে। সেই সঙ্গে 'কাকতাড়ানি', 'খামার-চাঁচানি', 'দারোয়ানি', 'নিকোনি', 'পাহারাদারি', 'পার্বণী', 'সেলামী', 'কয়ালি', 'চোবানি', 'নজরানা' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বাড়তি আদায়ের জুলুম। হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল জোতদারের গোলায় তুলে সুন্দরবনের চাষী অভাবে মরে। নতজানু হয়ে 'দেড়াবাড়ি', 'দুনো-বাড়ি'-তে ধান কর্জা নিতে বাধ্য হয়। এক বস্তা ধান নিয়ে দেড় বস্তা শোধ দেবার কড়ার—দেড়াবাড়ি, দু'বস্তা—দুনো-বাড়ি।

খাজনার চাপ, বাড়তি আদায় এবং কর্জা ধান শুধতে না পারলে জমি চলে যায় লাটদার-জোতদারদের কাছে। জমি খাস করে তারা ভাগে দিয়ে চাষ করায়। সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করা কৃষক ভিড় করে ভূমিহীনদের দলে।

ইংরেজ পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির জমিদারিতে ছিল কৃষকদের জমি খাস করে নেবার জুলুম। ইংরেজ লাটদার। প্রজারা 'টুঁ'শব্দ করতে সাহস পায় না।

পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবি তোলা হলো। জঙ্গল হাসিল করে যারা সুন্দরবনে সোনার ফসল ফলিয়েছে তাদের ভূমিহারা করা চলবে না—কৃষকদের জমি ফেরত চাই।

জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানার উচিলদা, ব্রাহ্মণচক, কামারগাঁতি প্রভৃতি গ্রামে বিক্ষোভ, ছোট ছোট মিছিল, গ্রাম বৈঠকে প্রতিবাদের আওয়াজ। সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের প্রথম সংগ্রামী ঝাণ্ডা উঠেছিল ১৯৩৬ সালে হাড়োয়ার উচিলদা গ্রামে। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন সংগঠিত করতে এগিয়ে এলেন বঙ্কিম মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ও তরুণ কৃষককর্মী মনোরঞ্জন শূর। আন্দোলন এগিয়ে যেতে ডঃ ভূপেন দত্ত, সৌমেন ঠাকুর, নলিনীপ্রভা ঘোষ, প্রভাস রায় এবং হেমন্ত ঘোষালও আন্দোলনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে বঙ্কিম মুখার্জি জয়ী হয়ে এম এল এ হয়েছেন। উচিলদার জনসভায় উদাত্তকণ্ঠে কৃষকদের ওপর জমিদারি জুলুম বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বঙ্কিম মুখার্জি বক্তৃতা করলেন। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে পরিচিত শ্রীশ মণ্ডল, বিশ্বম্বর বাছাড় ও তাঁর স্ত্রী কুন্তি বাছাড় তখন স্থানীয় নেতা-নেত্রী হয়ে উঠেছেন। কৃষকদের জমি ইংরেজ পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির খাস করে নেবার বিরুদ্ধে চব্বিশ পরগনা জেলা শাসকের কাছে বঙ্কিম মুখার্জির নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়া হলো। ইংরেজ জেলা শাসক উচিলদায় এসে সরেজমিন তদন্তের দিন ধার্য করলেন। জমিদারি কোম্পানিকেও তদন্তে হাজির থাকার খবর পাঠানো হলো।

পশ্চিমবঙ্গের বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চার নেতা ঃ- মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ, বঙ্কিম মুখার্জি, পি সি যোশী, সোমনাথ লাহিড়ী

জেলা শাসক তদন্তে আসছেন। সাহেব লোক। ইংরেজ পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি জেলা শাসককে অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করলো।

যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদেরই শামিয়ানার নিচে বসে তদন্তের অর্থ কি। তদন্তের দিন ভোরবেলায় শ্রীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে গ্রামের কৃষকরা দলবদ্ধভাবে মণ্ডপ ভেঙে শামিয়ানা খুলে দিলেন। মহিলাদের নেতৃত্ব দিলেন কুন্তি বাছাড়। কাছারির দারোয়ান বাধা দিতে এলে কৃষকদের ভয়ঙ্কর রোষের মুখে তার মুণ্ডু ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। দারোয়ানের দেহ এবং মণ্ডপের যাবতীয় জিনিস ভাসিয়ে দেওয়া হলো বিদ্যাধরী নদীর জলে।—শুরু হলো কৃষকদের ওপর পুলিসী আক্রমণ।

ঘটনা যখন ঘটেই গেছে কৃষকরা যখন সংগ্রামে আগুয়ান, কৃষক নেতারা নিশ্চুপ থাকতে পারে না। চব্বিশ পরগনা জেলায় লিগাল এইড কমিটি গঠন করে মামলা পরিচালনার জন্য সাহায্য সংগ্রহ চললো। তদন্তকারী পুলিস একজনকেও মামলার সাক্ষী দাঁড় করাতে না পারায় আসামীরা বেকসুর খালাস পেলেন।

ব্রাহ্মণচকে ১৯৩৮ সালে উচ্ছেদ-বিরোধী সংগ্রাম আরো তীব্রতা পেল। বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিতে এলেন বঙ্কিম মুখার্জি, সৌম্যেন ঠাকুর এবং সর্বভারতীয় কৃষকনেতা ইন্দুলাল যাজ্ঞিক। কামারগাঁতিতে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় কুপখালির আদিবাসী মেয়ে তরুবালা দারোগার রিভলভার কেড়ে নিল। নতুন কর্মী হিসাবে কৃষক আন্দোলনে এগিয়ে এলেন রাম দাস, বিশু প্রামাণিক, সুধাংশু দত্ত প্রমুখ। পোর্ট ক্যানিং জমিদারি কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনের বহু বছর পর স্বাধীন দেশে এই পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগনা জেলায় জমির আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুধাংশু দত্ত ১৯৭০ সালের ১৭ জুলাই খুন হয়েছেন। কুপিয়ে তাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করে শত্রুরা তাদের দীর্ঘকালের প্রতিহিংসা মেটাতে চেয়েছে।

প্রবীণ কৃষকনেতা হেমন্ত ঘোষাল বলেছেন ১৯৩৭ সালে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে চব্বিশ পরগনা জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল। জেলার দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলন হয় ১৯৩৮ সালে বাদুড়িয়া থানার গন্ধর্বপুরে। সম্পাদক নির্বাচিত হন জয়নগর-মজিলপুরের ভূতনাথ ভট্টাচার্য।

এই সময়েই ১৯৩৮ সালে ফলতা-ডায়মন্ডহারবার থানা সীমান্তে প্রভাস রায়, যতীশ যায়, মুরারিশরণ চক্রবর্তী, হেমন্ত ঘোষাল প্রমুখের নেতৃত্বে চলে বলরামপুর-কাঁটাখালি খাল কাটার আন্দোলন।

তখনকার বজবজ থানার বুড়ুল। বুড়ুল থেকে মাইল তিনেক দূরে কাঁটাখালি থেকে ভাগীরথী নদীর সঙ্গে যুক্ত খাল। ফলতা সীমান্ত পার হয়েই ডায়মন্ডহারবার থানার মধ্যে বলরামপুর। মজা খাল। সংস্কারের অভাবে কৃষকদের নিদারুণ দুর্দশা। বলরামপুর-কাঁটাখালি খাল কাটা আন্দোলনের বিষয়ে লিখতে গিয়ে চব্বিশ পরগনা জেলার প্রবীণ কৃষকনেতা পলাশ প্রামাণিক এক পুস্তিকায় ('তেভাগা আন্দোলন ও যতীশ রায়) লিখেছেন : "এর প্রভাব ডায়মন্ডহারবার, বজবজ, বিষ্ণুপুর, ফলতা এইসব এলাকায় যে মানুষরা চরম দুর্দশার মধ্যে-সারা বছর জলের মধ্যে ডুবে থাকত, মাঘ মাস পর্যন্ত জলে ডুবে থাকার জন্যে প্রতি বছরই ফসল নষ্ট হত, প্রতি বছরই যাদের দুর্দশা বাড়ত, কমত না—সমস্ত স্তরের সেই কৃষকরা স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এই ব্যাপারটাকে ধরে নিয়ে কৃষক সমিতি সঠিকভাবেই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি এই আশু দাবির আন্দোলনটাকে ধরতে পেরেছিল এবং সফলও হয়েছিল।"

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে এবং সাধারণভাবে সারা বাংলায় ১৯৩৯ সালে 'হাটতোলা' বা 'তোলাগন্ডী' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে—হাটগুলি ছিল জমিদারদের। বিক্রেতাদের কাছ থেকে হাট মালিকরা তাদের চাপিয়ে দেওয়া 'তোলা' হিসাবে ইচ্ছামাফিক অর্থ আদায় করতো। 'নায়েবের তোলা', 'ঝাড়ুদারি', 'ঈশ্বরবৃত্তি', গমস্তাগণের 'লেখাই খরচ' ইত্যাদির নামে ক্রেতা-বিক্রেতাকে বাড়তি টাকা-পয়সা বা পণ্যসামগ্রী দিতে বাধ্য করা হতো হাটের মালিকদের পক্ষ থেকে।

কৃষক নেতা প্রভাস রায়

কৃষকসভা এই বাড়তি আদায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দালন গড়ে তোলে। চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ডহারবার, ফলতা প্রভৃতি এলাকায় আন্দোলন তীব্র হয়। যতীশ রায় ছিলেন বিশিষ্ট নেতা। সরকারি মধ্যস্থতায় কৃষকদের সুবিধাজনক শর্তে হাটের মালিকরা আপস করতে বাধ্য হয়। কৃষক আন্দোলন "জয়ের পথে এগিয়ে চলে।

শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কৃষকদের সংগঠিত করতে উদ্যোগী কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি। ১৯৪১ সালের ২১ জুন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করলো। প্রশ্ন দেখা দিল, মানবতার পরমতম শত্রু ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া যুদ্ধের চরিত্র গোটা জনগণের যুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয় তবে ভারতের শোষিত শ্রমিক-কৃষক জনগণের কর্তব্য বি[illegible] পা[illegible]

এই জটিল অবস্থার [illegible] কিষাণ কাউন্সিল ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে [illegible] যুদ্ধকে 'ফ্যাসি-বিরোধী' যুদ্ধ আখ্যা দিলে চব্বিশ প[illegible] সমিতি ফ্যাসি-বিরোধী প্রচার ও জনরক্ষা কমিটি [illegible] তু[illegible]কে।

এই অবস্থায় ১৯৪২ [illegible] মাসে সমুদ্র উপকূলবর্তী মেদিনীপুরের কাঁথি এবং [illegible] সুন্দরবন এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে গেল এক প্রবল [illegible] নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও তার আনুষঙ্গিক কারণে [illegible] প্রাণ দিলেন, অসংখ্য গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটল, হাজার হ[illegible] ধান ও গাছপালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল। এর প[illegible] ৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। সুন্দ[illegible] অবস্থা শোচনীয়। বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি প্রগতি[illegible] বুদ্ধি[illegible] ও বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে আর্ত মানুষদের সেবায় পিপ্‌ল্‌স রিলিফ কমিটি গড়ে তুলেছে। চব্বিশ পরগনার প্রভাস রায়, যতীশ রায় প্রমুখ নেতারা ছিলেন এই কমিটিতে। সুন্দরবনের ক্ষুধার্ত মানুষ। ফ্রেন্ডস অ্যাম্বুলেন্স সোসাইটির বিদেশি মহিলা প্রতিনিধি ভ্যান টাওয়ারের মতো দরদী মানুষরাও ত্রাণের কাজে নেমেছেন। প্রভাস রায়, যতীশ রায় প্রমুখ কৃষকনেতা ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে সুন্দরবন এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ত্রাণের কাজে যুক্ত হয়ে কাকদ্বীপ থানার বুদাখালি গ্রামের যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি, জগন্নাথ মাইতি প্রমুখ কর্মী, পরবর্তীকালে সরকারি খাতায় 'তিন বিপজ্জনক মাইতি' কৃষক অন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেন। জগন্নাথ মাইতি অবশ্য পরবর্তীকালে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

দুর্ভিক্ষ ত্রাণকে সামনে রেখে কৃষকসভার কাজের প্রসার ও যোগাযোগ গড়ে উঠল কাকদ্বীপ, সন্দেশখালি, ক্যানিং, ভাঙড়, সোনারপুর, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি থানার গ্রাম এলাকায়। কৃষক আন্দোলনের তখন প্রথম কাজ কৃষককে বাঁচাও। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার ষষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের মে মাসে ময়মনসিং জেলার ললিতাবাড়িতে। সম্মেলনের রিপোর্টে লেখা রয়েছে, "২৪-পরগনা এতদিন কতকটা দিশেহারা অবস্থায় থাকিয়া নানা কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তবে আবার নূতন করিয়া কাজে জোর দিবার চেষ্টা করিতেছে।"

সীমাবদ্ধ এলাকায় হলেও ১৯৪২-৪৩ সালে চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে আর এক কৃষক আন্দোলন স্মরণে রাখার মতো। জাপানের বর্মা দখলের পর ভারতের ব্রিটিশ সরকার সমুদ্রতীরের জেলাগুলিতে ১৯৪২ সালের ১ মে 'ডিনায়েল পলিসি' চালু করে আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় নৌকা, সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন হুকুমদখল করে। অনেক নৌকো জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়। উপকূল এলাকার জেলাগুলিতে কৃষক সমিতির নেতৃত্বে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার দাবিতে আন্দোলন শুরু করা হয়। চব্বিশ পরগনা জেলার সত্যনারায়ণ চ্যাটার্জি তখন প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের সভ্য। এই জেলাতেও সংগঠিত বিক্ষোভ এবং কৃষকনেতাদের তৎপরতা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। সরকার নতিস্বীকার করে ক্ষতিপূরণ প্রকল্প চালু করতে বাধ্য হয়।

কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের যে সব লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছিল এবং বিশেষত ১৯৩৬-৩৭ সালে গোটা প্রদেশে এবং জেলায় জেলায় কৃষক সমিতি গঠনের প্রথম পর্বে চব্বিশ পরগনা জেলায়ও কৃষক আন্দোলনে ঢেউ তুলেছিল। ফ্যাসিস্ট হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণের পর বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বদলের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক আন্দোলনকে মানবজাতির পরমতম শত্রু ফ্যাসিস্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করতে হলো। সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্ত মানুষদের ত্রাণ। নিদারুণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চব্বিশ পরগনার কৃষকনেতারা দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ছোট-বড় ঘটনায় সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং ফ্যাসিস্ট শক্তি জাপানি আক্রমণ প্রতিরোধ করার সংকল্পে কৃষকদের স্বেচ্ছাবাহিনী

গড়ে তুলেছেন। ১৯৪৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত সেনার বার্লিন জয় এবং সেপ্টেম্বরে জাপানের আত্মসমর্পণের পর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। এলো আন্দোলনের নতুন মেজাজ। চব্বিশ পরগনা জেলাতেও বিস্ফোরণের অবস্থা। চারিদিকে আওয়াজ উঠেছে, 'এখনি স্বাধীনতা চাই'। চাষীদের মধ্যেও চঞ্চলতা। নিষ্ঠুর শোষণ-নিপীড়ন কৃষকরাও মেনে নিতে চাইছে না। এলো ১৯৪৬ সালের ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের যুগ। চব্বিশ পরগনাও পেছিয়ে নেই।

কলকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ক্রেদাক্ত দাঙ্গাকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে। সেই পটভূমিকায় সেপ্টেম্বর মাসের শেষে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা 'এই মরসুমেই তেভাগা চাই' ডাক দিয়েছিল। শুরু হলো আন্দোলনের প্রস্তুতি। আন্দামান বন্দিনিবাস থেকে সদ্যমুক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী সুনীল চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৬ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখের 'স্বাধীনতা' কাগজে এক প্রতিবেদনে লিখেছেন :

"গত ৮ নভেম্বর কাকদ্বীপ পৌঁছে বুদাখালি গ্রামে যাই। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির লালঝাণ্ডার উড়ছে খবর পেয়েছি। সুন্দরবনের সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক এই লালঝাণ্ডা নিচে দাঁড়িয়ে সরকার, জমিদার ও মহাজনের চক্রান্ত ব্যর্থ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দাবি তুলেছে—জমিদারের খামারে ধান তুলব না, দশ আনা ধান চাষীর—ছ' আনা জমিদারের, ভাগচাষীর স্বত্ব স্বীকার করতে হবে।....."

কাকদ্বীপের ডাকবাংলো ময়দানে (১৯৪৬ সালের ১৮ নভেম্বর) সুনীল চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। লাঠির মাথায় লালঝাণ্ডা বেঁধে শত শত স্বেচ্ছাসেবক কৃষক। ভাগচাষীদের দাবির সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন কংসারী হালদার, যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি, রাজকৃষ্ণ মণ্ডল ও মানিক হাজরা। কংসারী হালদার তখন ডায়মন্ডহারবার মহকুমা কৃষক সমিতির সম্পাদক। দেশ স্বাধীন হবার পর কাকদ্বীপ কৃষক আন্দোলনে অভিযুক্ত মানিক হাজরাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটতে হয়েছে।—কাকদ্বীপে জনসভার মাত্র ক'দিন আগে বুটাখালির যতীন মাইতির ভাগচাষের জমির ধান কাটতে জোতদারের লাঠিয়াল বাহিনী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিরোধে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

কাকদ্বীপের 'সি প্লট' অঞ্চলের শিবরামপুর। বহু কালের প্রথা ভেঙে ভাগচাষী নিজে খামার তৈরি করে ধান তুললেন। ক্ষিপ্ত জোতদার লাঠিয়াল পাঠিয়ে ভাগচাষীকে কাছারিতে বেঁধে নিয়ে এলো। সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামে। সহস্রাধিক কৃষক ও স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত কাছারিবাড়ি হাজির। জুলুমের প্রতিকার চাই।

জোতদার নতজানু হলো। তেভাগার দাবি মেনে নেবার কড়ারে ও তখনি ভাগচাষীকে ছেড়ে দিয়ে জোতদার রেহাই পেল।—জয়ী হবার আত্মবিশ্বাসে তেভাগা আন্দোলন গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক তখন রাসবিহারী ঘোষ। কাকদ্বীপ এলাকায় নেতৃত্বের প্রধান ভূমিকায় যতীন মাইতি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট জমির মালিকরা তেভাগার দাবি মেনে চাষের মাঠেই বিচালিশুদ্ধ ধান ভাগ করে নিলেন। বড় জমির মালিকরা

তেভাগা আন্দোলনের নেতা কংসারি হালদার ছবি : রাজকুমার বেরা

বেপরোয়া। ধান কাটতে ভাগচাষীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তারা জোর করে ধান কেটে তোলার চেষ্টা চালালো। তখনকার কাকদ্বীপ থানার 'বেয়ার লাট' এলাকার গোবিন্দরামপুর গ্রামে ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জোতদারের কাছারিবাড়িতে গুলি চললো। গুলির আঘাতে কার্তিক খাঁড়া শহিদের মৃত্যু বরণ করলেন। তেভাগা আন্দোলনে চব্বিশ পরগনা জেলার প্রথম শহিদ কার্তিক খাঁড়া।

জোতদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক রাসবিহারী ঘোষ এলাকার কৃষকনেতা মন্মথ ঘড়ুইকে সঙ্গে নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তীব্র বিতর্ক বাধল। ইংরেজ আমলা এই 'ঔদ্ধত্যের অপরাধে' দু'জনকেই একদিনের জেল হাজতবাসের শাস্তি দিয়েছে।

তেভাগার আন্দোলন চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন মহকুমায় বিস্তার পেয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। আন্দোলনের কর্মী ও নেতারা পরিচিত হচ্ছে 'তেভাগাওয়ালা' বলে।

কাকদ্বীপের কৃষককর্মী গুণধর মাইতি নেতা হয়ে উঠেছেন। সমিতির সিদ্ধান্তে যাচ্ছিলেন মথুরাপুর এলাকার কুয়েমুড়ি গ্রামে এক সভায়। তেভাগার দাবি আদায় করতে হবে। হাঁটা পথ, খেয়া পার।

চকদার রজনী প্রধানের গুণ্ডাবাহিনী পথের মাঝে ওত পেতে থেকে গুণধর মাইতিকে লক্ষ্য করে বন্দুকের তাগ করলো। গুণধর মাইতিকে রক্ষা করতে এলাকার ভাগচাষী যতীশ হালদার ঝাঁপিয়ে

সামনে এসে গুলির আঘাতে প্রাণ দিলেন। তেভাগা আন্দোলনের শহিদের তালিকায় যুক্ত হলো যতীশ হালদারের নাম।

বাংলা সরকারের গোপন সারকুলারের উত্তরে ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক 'অত্যন্ত গোপনীয়' মার্কা ২৮/৪৭, ১০.৩.৪৭ তারিখের চিঠিতে জানাচ্ছেন : "বর্গাদাররা সমস্ত উৎপন্ন ফসল নিজেদের খামারে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভাগ দিতে চাইছে ফসলের তিন ভাগের একভাগ। জমিদাররা তা নিচ্ছে না।" মহকুমা শাসক মন্তব্য করেছেন, লাটদার-জোতদারদের চরম উদাসীনতার কারণেই আন্দোলনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। "বহিরাগত কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে স্থানীয় লোকরা এই আন্দোলনে নেমেছেন। আন্দোলন ক্রমেই রক্তাক্ত পথ নিচ্ছে।

আলিপুর মহকুমায় তেভাগা আন্দোলন ব্যাপক হলো ক্যানিং থানার মঠেরদীঘি, দেউলি, কালিকাতলা, বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা, আমঝাড়া প্রভৃতি এলাকায়। সরকারি রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে গোসাবার পাঠানখালি অঞ্চলেও তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাগচাষীরা তাঁদের দাবি আদায়ে সক্ষম হন। গোসাবা থানা তখন ছিল বসিরহাট মহকুমার মধ্যে। মঠেরদীঘির বরুণ পাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা নিলেন।

বারাসত মহকুমায় আমডাঙা থানার মরিচা ইউনিয়ন ও পাশাপাশি গ্রামগুলিতে তেভাগা আন্দোলন দানা বাঁধে। কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্রামে গ্রামে 'তেভাগা সংগ্রাম কমিটি' গড়ে তোলেন। আন্দোলন গড়ে উঠল হাবড়া থানার মছলন্দপুর, গোবরডাঙা এবং দেগঙ্গা থানার চাঁপাডাঙায়। রাজ্য সরকারের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত বারাসত মহকুমা শাসকের গোপন চিঠিতে সরকারকে জানানো হচ্ছে : বাইরের কমিউনিস্টরা ১৯৪৬ সালের অক্টোবরের পর বনগাঁ মহকুমা থেকে এসে গোবরডাঙায় স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তেভাগা আন্দোলন পরিচালনা করছেন। স্থানীয় নেতারা হলেন পাঁচকড়ি চৌধুরী, নিতাই মণ্ডল ও বেণী তিত্তর।'

—বেণী তিত্তর, আসল নাম বেণী অধিকারী পরে ঘাতকের হাতে খুন হয়েছেন।

বসিরহাট মহকুমায় সন্দেশখালি, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি থানায় তেভাগা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। হিঙ্গলগঞ্জের বিশপুর, বাইলানি, শ্যাণ্ডেলবিল, দুলদুলি প্রভৃতি এলাকায় কৃষকরা সংগঠিত হয়ে তেভাগার দাবিতে সোচ্চার [illegible]। [illegible]খালি থানার হাটগাছা, বেড়মজুর, সুকদোয়ানি, পাথ[illegible] দী[illegible], ছোট আজগড়া প্রভৃতি গ্রামে চাঞ্চল্য—মাঠে মাঠে [illegible] করো। ছোট ছোট জমির মালিকরা তেভাগা মেনে নি[illegible] প্রধান সেনাপতি হেমন্ত ঘোষাল। মনোরঞ্জন শূর, আ[illegible] এবং সরদার প্রমুখরা সঙ্গে আছেন। কৃষকদের দাবি আ[illegible] সং[illegible]চালনায় তাঁরাও অগ্রণী।

বড় জোতদার শ্রীনা[illegible] জমাদার, বিধু সরকার প্রমুখরা আন্দোলন ভাঙতে [illegible]ছে। তেভাগার দাবি তারা মেনে নেবে না। পাকা ধা[illegible]টিতে বর্গাদারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ১৪৪ [illegible]ড়ি, কাছারিবাড়িতে পুলিস ক্যাম্প। নেতা ও কর্মীদের [illegible] মি[illegible]লায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। পুলিস গ্রেপ্তার করতে গ্রামে [illegible] কাঁসর-ঘণ্টা-শাঁখ-মাদল বাজিয়ে বিপদ সংকেতের [illegible] থেকে কৃষকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া যাবে [illegible]

ধুতুরদহের জোতদার বিধু সরকারদের কাছারিবাড়ি ছিল বেড়মজুরে নদীর পাড়ে। বড় বড় ধানের গাদার খামার। খামারবাড়িতে পুলিস মোতায়েন।

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নাগালে পেয়ে ক্যাম্পের পুলিস কয়েকজন কৃষককে গ্রেপ্তার করে খামারবাড়ি নিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে বিপদের সংকেত বেজে উঠল। কৃষকরা দলে দলে জড়ো হলেন। প্রতিবাদ মিছিল বার হলো—কাছারির পাশ দিয়ে মিছিল। হেমন্ত ঘোষাল মিছিলে আছেন। আছেন অন্য নেতারাও। ১৯৪৭ সালের ৮ মার্চ সন্দেশখালি থানার বেড়মজুর।

কৃষকের ক্ষোভ ও ঘৃণার প্রকাশ ঘটলো কাছারিবাড়িতে। ভেতর থেকে পুলিসের বেপরোয়া গুলি। শহিদ হলেন বেড়মজুরের রবিরাম সরদার, পাগলু সরদার, রাজবাড়ির চামু বিশাল, বৈরা সরদার এবং ছোট-আজগড়া গ্রামের রতিরাম সরদার। আবার সুন্দরবনের মাটিতে রক্তের ছাপ।

শুরু হলো অকথ্য পুলিসী অভিযান এবং হিংস্র বর্বরতা। এইভাবে চললো এপ্রিল মাস পর্যন্ত। ক্রমে তেভাগা আন্দোলনের ঝড় থেমে গেল। জাতীয় নেতারা তখন স্বাধীনতার স্বাদ পেতে ব্যস্ত।

'স্বাধীনতা' কাগজ ৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ সালের এক খবরে লিখছে :

"কাকদ্বীপ (৪ঠা এপ্রিল)—সুন্দরবন অঞ্চলের লালগঞ্জ ও হরিপুর হইতে পুলিশ ও জোতদারদের গুণ্ডাদের অত্যাচারের রোমহর্ষক কাহিনী পাওয়া যাইতেছে। নেতা ও কর্মীদের খোঁজ না দেওয়ায় পুলিস ঘর থেকে মহিলাদের টেনে বার করছে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে দাঁড় করিয়ে রেখে তামাসা দেখছে।

"বিবস্ত্র অবস্থাতেই জানকী দাসী ও তারিণী দাসীকে বেত মারা হয়। উভয়েই অজ্ঞান হয়ে যান। ভূষণ মাইতির স্ত্রীর উপরও এইভাবে নিপীড়ন চলে। কোথাও কোথাও রাত্রিকালে হানা দিয়ে কৃষক রমণীদের বিবস্ত্র করা হয় এবং নগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর টর্চের আলো ফেলিয়া পাষণ্ডের দল বিকৃত লালসা চরিতার্থ করে।"

শৈশবের এই ঐতিহ্যময় পথ ধরেই যুক্ত চব্বিশ পরগনার কৃষক আন্দোলন স্বাধীনতার পরও বিরামহীন ভূমিকায় অগ্রসর হয়েছে। এই পথ ধরেই খাদ্য আন্দোলন, মজুতদারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ভাগচাষী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বড় জমির মালিকদের কৃষক ও গণতান্ত্রিক জনগণের কাছে জমিচোর, খাদ্যচোর ও সমগ্র জনগণের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করার পটভূমিকায় কৃষক আন্দোলনের উচ্চতম ধাপে চব্বিশ পরগনার জমির আন্দোলনে বিকাশ ঘটেছে।

চব্বিশ পরগনা জেলায় ভূমিসংস্কারের সাফল্য, বর্গাদারদের নিরাপত্তা, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং গ্রামাঞ্চলে জনগণের সর্বাপেক্ষা নিপীড়িত অংশের মধ্যে আজকের জাগরণের পশ্চাৎভূমিতে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সংগঠিত কৃষক আন্দোলনকে অস্বীকার করা যাবে না। স্বাধীনতাপরবর্তীকালে জেলার কৃষক আন্দোলনের সুমহান গৌরব ও দীর্ঘ ইতিহাসের রয়েছে আর এক অধ্যায়।

লেখক পরিচিতি : দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী

অক্ষয়কুমার কয়াল

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুথিপাতড়া

মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের আগে ভারতবর্ষে নানাভাবে লেখাপড়ার কাজ চলত। শিলালিপি, তাম্রলেখ, মৃৎফলক প্রভৃতি ছাড়াও তালপাতা, গাছের ছাল, তুলট কাগজ, কাপড়, চামড়া বা কাঠের তক্তির ওপর লেখাজোখা হত। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও তৈরি হত। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কিছু অংশ বাদে সারা ভারত জুড়ে তালপাতার ওপর লেখার চলন ছিল। উত্তর ভারতে প্রধানত কালিকলম দিয়ে তালপাতায় লেখা হত, আর দক্ষিণ ভারতে তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দিয়ে প্রথমে তালপাতার ওপর লেখা হত পরে তার ওপর কালি বুলিয়ে লেখাগুলি স্পষ্ট করা হত। এইভাবে কতকগুলি পত্রে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে পাতাগুলির মধ্যভাগে একটা ছিদ্র করে সুতো দিয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে এক সঙ্গে রাখা হত। সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউএন সাঙ ভারতের সর্বত্র তালপাতার পুথি দেখেছেন বলে জানিয়েছেন তালপাতার মতো গাছের ছালেও গ্রন্থাদি লিখিত হত। সংস্কৃতে একে বলা হত ভূর্জপত্র। ভূর্জপত্রে লেখা পুথি উত্তর ও পূর্ব ভারতে পাওয়া গেছে। তবে বেশির ভাগই পঞ্চদশ শতক বা তার পরের লেখা একাদশ শতকে আলবেরুণী এরকম বহু পুথির সন্ধান পেয়েছিলেন। কাপড়ের ওপরও লেখাপড়ার কাজ চলত। কাপড়টাকে সাইজ মতো টুকরো-টুকরো করে কেটে তার ওপর চালের গুঁড়ি বা ময়দার লেপ দেওয়া হত। তারপর শাঁখ বা কড়ি দিয়ে ঘসে সেটাকে মসৃণ করা হত। তখন লেখার উপযুক্ত হত। রাজস্থানের দৈবজ্ঞরা এর বহুল ব্যবহার করতেন। এরকম ৯৩ সিট বা টুকরো কাপড়ের ওপর লেখা শ্রীপ্রভাসুরির 'ধর্মবিধি'র একটি পাণ্ডুলিপি অনহিলবাড়ের জৈন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য কাপড়ের ওপর লেখা রাজার নির্দেশনামার কথা জানিয়েছেন (১।৩১৯ শ্লোক)। পশ্চিম এশিয়া বা ইউরোপে চামড়ায় লেখার চলন থাকলেও ভারতে তার নিদর্শন বিরল। বৌদ্ধ সাহিত্যে এর কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবন্ধুর বিশাখ দত্ত চামড়ার ওপর লেখার কথা বলেছেন। কাগজের ওপর লেখা প্রাচীনতম পুথি একাদশ শতকে শতপথ ব্রাহ্মণের একটি কাশ্মীরি প্রতিলিপি। গুজরাট থেকে ত্রয়োদশ শতকের কাগজের পুথিও মিলেছে। তুলট কাগজের ওপর লেখা পুথির কথা অনেকেই জানেন। ভারতের কোনও কোনও স্তম্ভ বা গুহায় কাঠের ওপর পুরনো দিনের নির্দেশনামা দেখা যায়।

উত্তর ২৪-পরগনার রাজারাম দাস কবি কৃষ্ণরাম দাস যেমন বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পাঁচালি রচনা করেছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কবি রাজারাম দাস ও সেরূপ কয়েকটি দেবদেবীর পাঁচালি রচনা করেন। আমরা তাঁর তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। ধর্মের গীত ও সত্য নারায়ণের পাঁচালি ও নারায়ণীমঙ্গল।

অবিভক্ত বঙ্গদেশে বেশ কিছু পুথিশালা স্থাপিত হয়েছে। অধুনা বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, রংপুর সাহিত্য পরিষৎ, কুমিল্লার রামমালা লাইব্রেরি এবং পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমান সাহিত্যসভা, কুচবিহার স্টেট লাইব্রেরি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর ২৪-পরগনার মধ্যে বরানগর পাঠবাড়ির পুথিশালার কথা সর্বাগ্রে বলতে হয়। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় কালিদাস দত্ত ও ঠাকুরপুকুর গুরুসদয় মিউজিয়মের পুথিসংগ্রহের কথা জানা যায়। এছাড়া মন্দির বাজার থানার জগদীশপুর গ্রামের প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু খাঁ-নস্কর পরিবার, বজবজ থানার বাওয়ালি গ্রামের বিখ্যাত মণ্ডল জমিদারবাড়ি এবং মগরাহাট থানার বেলে গ্রামের হরেন্দ্রনাথ প্রামাণিকের ব্যক্তিগত পুথি-সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় কিছু পুথি রক্ষিত আছে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা প্রধানত সংস্কৃত পুথিরই চর্চা করতেন। তাঁরা দেশীয় ভাষাকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে বেশির ভাগ সংস্কৃত পুথিই মেলে। তবুও তার মধ্যে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ যেমন কৃত্তিবাস ওঝা, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখ লোকায়ত সমাজের জন্য সংস্কৃতের অনুবাদ বা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বাইরেও দেশের একটা বিশাল সমাজ। তাদের মন

ব্রাহ্মণ্য রীতির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? নানাগোষ্ঠীর মানুষ মিলে একটা মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এদেশে। তাদের মনের চাহিদা মেটাতে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের অনুবাদ, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্যরচনার প্রয়োজন হয়েছে। বাংলার মাটিতে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ যত না স্থান পেয়েছেন, তার থেকে বেশি স্থান পেয়েছেন মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, কালী, শীতলা, শিব প্রভৃতি।

উত্তর ২৪ পরগনায় যেমন বিপ্রদাস পিপিলাই, ভাগবতাচার্য রঘুনন্দপন্ডিতের মতো শক্তিমান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিম্নাঞ্চলে সেরকম শক্তিশালী কবির অভাব তবুও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েকজন কবির যৎসামান্য পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি। কলকাতাকে যদি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে ধরা যায়, তা হলে প্রথমেই নাম করতে হয় সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশেরা।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ ভাগবতপুরাণের মূলানুগ অনুবাদ করেন। কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবনবিদিত রামচন্দ্র।।
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষা ভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা।।

(৯ম স্কন্ধ)

কাব্যরচনাকাল—

বসু চন্দ্র ঋতু শশী শাক পরিমিতে।
নিবসেন পদ্মবন্ধু মিথুন রাশিতে।।

(৪র্থ স্কন্ধ)

অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দে বা ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে চতুর্থ স্কন্ধ রচিত হয়।

অথবা—

গজ শশী রস চন্দ্র শাক পরিমিত।
কমলিনীপতি বেশে বৃশ্চিক রাশিতে।।
কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি উশনা বাসরে।

(৫ম স্কন্ধ)

অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দে বা ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে পঞ্চম স্কন্ধ রচিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (বিবিধার্থ সংগ্রহ), দীনেশচন্দ্র সেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) বসন্ত রঞ্জন রায় (বঙ্গবাসী প্রকাশিত ব... ভূমিকা) সনাতন চক্রবর্তী নামে এক কবির ভাগবত... বলেছেন। আমাদের ধারণা সনাতন চক্রবর্তী ও সনাতন ঘোষাল একই ব্যক্তি। উভয়ের কাব্যের ভনিতা একই রকম। যথা

পরিপূর্ণ ... অধ্যায়।
সনাতন ... ভাষায়।।

—চক্রবর্তী

চতুর্থ ... অধ্যায়।
সনাতন ... ভাষায়।।—ঘোষাল

সনাতন ঘোষাল ... ভাগবতের অনুবাদ করেন। বিশ্বভারতী থেকে অধ্যাপক ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দুটি খণ্ডে সনাতন ঘোষালের ... স্কন্ধ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। (১৯৮৬-১৯৮৯)

প্রাণরাম চক্রবর্তী কবিবল্লভ :

প্রাণরাম চক্রবর্তী কবিবল্লভ একজন অর্ধবিস্মৃত কবি। ১৮৭২ সালের এডুকেশন গেজেট, বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৭৮১ শক), লঙ সাহেবের বাংলা পুস্তকের তালিকা, রেভারেন্ড ওয়ার্ডের History Literature of Mythology of the Hindoos প্রভৃতি গ্রন্থে এবং পত্রিকায় কবিবল্লভের কালিকামঙ্গলের উল্লেখ থাকলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথাযথ মূল্য আজও নিরূপিত হয়নি। ১২৪৩ সনে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক সংশোধিত হয়ে প্রাণরামের কালিকামঙ্গল প্রথম 'শিবাদহে মুদ্রিত' হয়। তাতে প্রকাশকের একটা বিজ্ঞাপনে ছিল—বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ। তদন্তর কৃষ্ণরাম নিমিতা যার বাজ।।.... দীনেশবাবু লোক মুখে শুনে কিংবা অসাবধানে পঙ্‌ক্তিটিকে এইভাবে বদলালেন—

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমিতা যার বাস। এবং মন্তব্য করলেন প্রাণরাম ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কবি দীনেশবাবু যদি উক্ত মুদ্রিত পুস্তকখানা দেখতেন, তা হলে সেখানে এই শ্লোকটি দেখতে পেতেন—

শকে বসু বসু বাণ চন্দ্র সমন্বিত।
কালিকামঙ্গল তথি হইল বিদিত।।

এবং শ্লোকটির পরে অঙ্কে দেওয়া আছে '১৫৮৮ শক'। আমাদের সংগৃহীত ১১৮০ সনের প্রাণরামের পুথিতেও ওই একই শক আছে। মৎসম্পাদিত কবিবল্লভের কালিকামঙ্গলে (১৯৯১) রচনা কালের পুথিচিত্র দ্রষ্টব্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রাণরাম কালিকামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি।

প্রাণরামের কাব্যের পুথি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাওয়ালি, টালিগঞ্জ, ঘাটেশ্বরে (লক্ষ্মীকান্তপুর লাইন) পাওয়া গেছে। তাঁর কাব্যের সংশোধক রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের বাড়িও কলকাতার দক্ষিণে হরিনাভি গ্রামে।

প্যারিসে বিব্লিওথেক ন্যাসিওন্যালে (৯৬৮।২৯৮) :

কবিবল্লভের কালিকামঙ্গলের একটি খণ্ডিত পুথি আছে। দুঃখের বিষয় সেটি আমরা ব্যবহার করতে পারিনি।

প্রাণরামের কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। কালিকামঙ্গলে তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যকাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাব্যটিতে বহু রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।

উত্তর ২৪-পরগনার রাজারাম দাস কবি কৃষ্ণরাম দাস যেমন বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পাঁচালি রচনা করেছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কবি রাজারাম দাস ও সেরূপ কয়েকটি দেবদেবীর পাঁচালি রচনা করেন। আমরা তাঁর তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। ধর্মের গীত ও সত্য নারায়ণের পাঁচালি ও নারায়ণীমঙ্গল। ধর্মের গানে কবি বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। আমরা কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি।

পশ্চিমে মাগুরা সীমা পূর্ব্বে মেদনমল।
মধ্যস্থানে ভাগীরথী সুধাসম জল।।
গঙ্গার পশ্চিম কূল যেন সুরপুর।
উত্তম শিহরবালি শোভাতে সুন্দর।।
পিতামহ গোকুল বসতি পূর্ব্বাপর।
দশরথ নাম পিতা গুণের সাগর।।
তনয় উত্তম তিন রাজারাম জ্যেষ্ঠ।
অভিরাম জয়কৃষ্ণ ভাজন কনিষ্ঠ।।
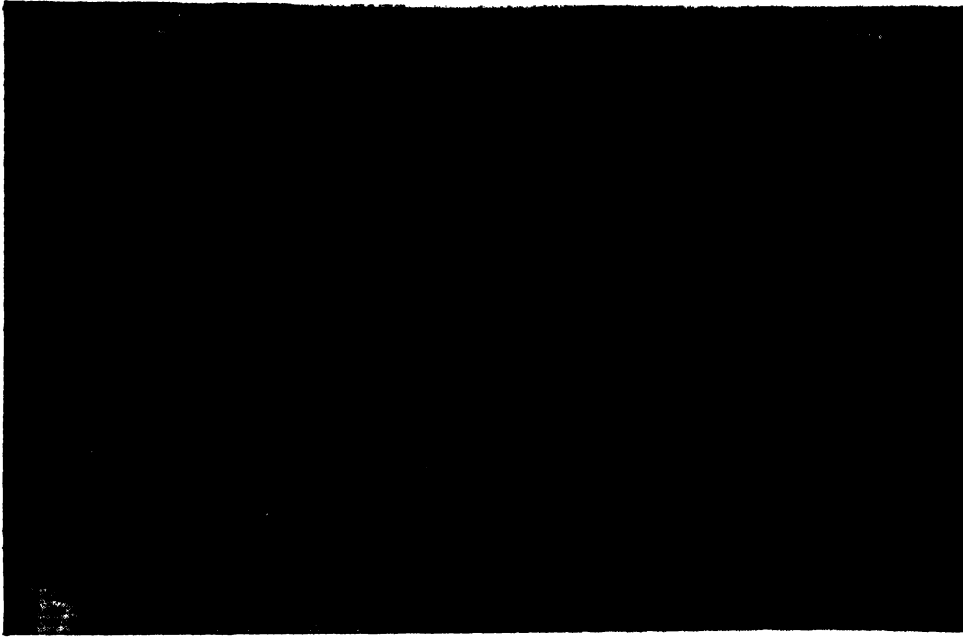
বহড়ু বসু পরিবারে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথি — *ছবি : দেবাশিস ভদ্র*

রাজারাম তাঁর প্রতিবেশীর কথাও কিছু বলেছেন—

বাড়ির উত্তরে পূর্ব্বে কাএস্থ ব্রাহ্মণ।
রাঘব খেতাবি তাহে পণ্ডিত ভাজন।।
কালীর মঙ্গল গাই তাহার আলয়।

কাব্যরচনা কাল—

পক্ষ পক্ষ রস মহি শক সম্বৎসর।
বাদসাহা তারঙ্গসাহা দিল্লির ঈশ্বর।।

অর্থাৎ ১৬২২ শকাব্দে বা ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের আমলে রাজারাম ধর্মের গীত রচনা করেন। ওই পাঁচালি থেকে সমসাময়িক কিছু খবরও পাওয়া যায়।

নবাব আজমতারা হইল ঘোষণা।
হুজুরে থাকিয়া আইসে লইয়া পরনা।।
ফৌজদার মহম্মদরেজা পাঠাও হুগলি।
সপ্তগ্রাম মুলুকের প্রথম আমালি।।
জগাতি কাটিল পথে শুনি বড় দম্ভ।
জমিদার কানগুই থরথর কম্প।।
হুগলির কোর্টে আসি পড়িল চাপান।
বাজারের যত লোক হইল বিধান।।
ইঙ্গিতে কথার ছলে করে গুণাগার।
প্রতাপ শুনিয়া কাঁপে যত জমিদার।।
কেহবা মিলিল আসি বুকের ভরসা।
কেহবা হাজির নহে মানিয়া বিদশা।।

রাজারামের ধর্মের গীতে হরিশচন্দ্র পালায় মৌলিকতা আছে। কবি ধর্মঠাকুরকে কুষ্ঠরোগীর বেশে ভক্তের সামনে হাজির করেছেন। ১৩৭৫ সালের মাঘ চৈত্র সংখ্যা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই পাঁচালির বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

কৃষ্ণরাম দাস লিখলেন 'রায়মঙ্গল' অর্থাৎ দক্ষিণরায়ের পাঁচালি। আর রাজারাম দাস লিখলেন 'নারায়ণী মঙ্গল'। নারায়ণী হলেন দক্ষিণবঙ্গের এক লৌকিক দেবী। আমরা এই কাব্যের কিছু অংশের পরিচয় দিই। নারদের কল্যাণে হর-পার্বতীর মধ্যে কোন্দল বাধল। পার্বতী রাগ করে কৈলাস ছেড়ে মায়ানদীতে দেহবিসর্জন করে বিংশালিনগরে অনন্ত কাপালির ঘরে জন্ম নিতে চললেন। অনন্ত কাপালির স্ত্রী বিমলার কোনও সন্তান হয়নি। সে ভক্তিভরে উমার পূজা করে। দেবী তাকে স্বপ্ন দিলেন তিনি তার কন্যারূপে জন্মাবেন।

এতেক বলিয়া গৌরী শ্বেতমাছি রূপ ধরি নাসাপথে পশিল উদরে।

স্ত্রী বিমলা অনন্তকে সব বলল কিন্তু স্ত্রীর কথায় অনন্তর বিশ্বাস হল না।

হাসিয়া অনন্ত বলে অসম্ভব বাণী।
বুড়া কালে কন্যা হয় কভু নাহি শুনি।।
পাকিল মাথার কেশ নাহিক দশন।
তবে যদি হয় কন্যা বিধির লিখন।।

পাড়াপড়শিরা বলল—

কেহ বলে কাপালিনী ছিল আঁটকুড়া।
ঋতুহীন বহুদিন পতি তোর বুড়া।।
কেমনে হইল গর্ভ অসম্ভব বাণী।
বিনি ফুলে ফলে গাছ কভু নাহি শুনি।।

বিমলা বলল—

সময় পাইলে বৃক্ষ ধরে ফুল ফল।
কিবা যুবা কিবা বৃদ্ধ নির্বন্ধ কেবল।।

বিমলা যথাসময়ে কন্যা প্রসব করল।

শশিকলার মতো সেই কন্যা বেড়ে উঠতে লাগল। বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হল। কেউ কেউ তার বিয়ের প্রস্তাব

তুললেন। নারায়ণী মহেশের পূজা করেন। একদিন শিব ছদ্মবেশে কাপালির বাড়ি উপস্থিত হলেন এবং বিমলার কাছে নারায়ণীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাব শুনে—

কাপালিনী বলে বাপু একি মহালাজ।
শুনিলে হাসিবে মোর জ্ঞায়াতি সমাজ।।
কাপালি যোগীতে বিভা কোন্ শাস্ত্রে কয়।
অবুঝ যোগীর ছাল্যা নাহি লাজ ভয়।।

আমি রাজাকে বলে তোমার শাস্তিবিধান করব। তখন—

যোগী বলে চণ্ড বড় কাপালিনী মায়্যা।
এতদিন মোর মাও রাখ লুকাইয়া।।
কোন্ শাস্ত্রে বলে ইহা মাও নিবে বাধা।
কানা খোড়া স্বামী কিবা কুরুণ্ডিয়া গোদা।।

নারায়ণী বায়ুরূপে শিবের কানে কানে বললেন, আমরা পরস্পরকে জানি, কিন্তু আমি এখন কৈলাস ফিরব না। বারো বছর পৃথিবীতে থেকে বিংছালি নগরের রাজা ভরতের পূজা নেব। শিব নারদের শরণ নিলেন। নারদ বিংছালিনগরে অনন্ত কাপালির বাড়ি গিয়ে উপবাস শুরু করলেন। দেবীর মন আর্দ্র হল। স্থির হল নারায়ণী থোড় মোচা, কলা প্রভৃতি নিয়ে বিংছালিনগরের বাজারে পসরা দেবেন। সেখানে নগরের রাজা ভরত এসে মন্দির নির্মাণ করে দেবীর স্থাপনা করবেন। সেইভাবে দেবী রাজাকে স্বপ্ন দিলেন।

বাজার বকুলতরু শাখা পল্লব চারু বিকিছলে বসিব তথাত্র।
থোড় চুকা কলা কিছু পসারে সাজিব পিছু
নররূপে দেখিবে আমাত্র।।
সেই স্থান অতিরম্য ক্ষিতি মাঝে মহাগম্য
পূজা কর স্থাপিয়া দেউল।
খণ্ডিব কলুষচয় এড়াইবে দুঃখ ভয় ধর্ম অর্থ সম্পদ অতুল।।

স্বপ্নের কথামতো রাজা বাজারে এলেন। নারায়ণীর সঙ্গে দ্রব্যাদির দরদস্তুর করলেন। হঠাৎ সিংহপৃষ্ঠে চতুর্ভুজা দেবী রাজাকে দর্শন দিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন। রাজা মন্দির নির্মাণ করে নারায়ণীর প্রতিষ্ঠা করলেন এবং কাতর কাপালিকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিলেন। এরপর জাগরণ পালা সে কাহিনী এখন থাক।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা[illegible] কবি [illegible]ধ্যারাম দাস সত্য নারায়ণ পাঁচালির প্রথম পরিচয় [illegible] [illegible]র্গত কালিদাস দত্ত মহাশয় (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি[illegible] [illegible] ৪ পৃঃ ১৭) তখন কবির এই নিবাস ও কাল জানা [illegible] [illegible]লে আমরা কবির মহীরাবণ পালার একখানি খণ্ডিত [illegible] [illegible] তাতে কবির বাসস্থান ও কাব্যরচনাকাল জানা গে[illegible]

অযোধ্যারামেতে [illegible] [illegible]—
জাহ্নবীর পূর্ব্বেতে [illegible] [illegible]ম।

সমুদ্রে বাণক্ষয় দেখ [illegible] হরের আনন তারপর।
রন্ধ্রের বর্জ্জিত রাম [illegible] বুঝহ সকল ধীর নর।।
পশ্চিমে জাহ্নবী মাই [illegible] গোবিন্দপুরেতে নিকেতন।
অযোধ্যারামেতে গায় [illegible] মহীরাবণের উপাক্ষণ।।

[সমুদ্র ৭, বাণ [illegible] ৫, রন্ধ্র ৯, রাম ৩, বিধু ১] অঙ্কস্য বামাগতিতে ১৬[illegible] [illegible] ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে অযোধ্যারাম মহীবারণ পালা রচনা [illegible]। [illegible] [illegible]বাস ছিল।

আদিগঙ্গার পূর্বতীরে গোবিন্দপুর গ্রাম (বারুইপুর লাইন)। মহীরাবণের পালা বাঙালী রামায়ণ পাঠকের সুবিদিত।

দয়ারাম দাশ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষ না হলেও চাকুরি সূত্রে বহুদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বাস করেন এবং এখানে বসেই ভাগবতের উদ্ধবসংবাদ রচনা করেন। উদ্ধব সংবাদ 'সন হাজার এক শত একাব্বই (১১৯১) সালের অগ্রহায়ণ মাসে সমাপ্ত হয়। গ্রন্থের শেষে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু কথা জানিয়েছেন।

পরগনেতে মুড়াগাছা কাছে হাত্যাগড়।
মুস্তফীর তালুক গ্রাম গোপালনগর।।
তাহার নাইবি লয়্যা করি প্রয়োজন।
রচিতে উদ্ধব কথা হইল সঙরণ।।
বাঞ্ছারাম মাটীর বাড়িতে করি বাস।
পূর্ব্বদ্বারী পিড়ার চালেতে নাহি ঘাস।।
এই শূন্য ঘরে থাকি রজনী দিবসে।
বসুদেব মাটী আসি সদাই জিজ্ঞাসে।।
সঙ্গেতে মুহুরি মূর্তিমন্ত কাশীপাল।
রাজকার্য্যে ভট্টাচার্য্য বুদ্ধি শরজাল।।
নাম নায়িবিতে আছি নাহি রোজগার।
আপন ওদন বস্ত্র জোড়াইতে ভার।।
বড়র আশ্রয় আছি এইমাত্র গুণ।
নোনা দেশে আসিয়াছি নাহি মিলে নুন।।
বাড়ি বুলি মালসা জ্বালি প্রজাতো মলঙ্গী।
খোশবাস খাজা যত সভে তার সঙ্গী।।

কবির নিজ নিবাস খোসালপুর পরগনার কাদোয়া গ্রাম। পিতার নাম জীবন। জাতি বৈদ্য। কুল্পির নিকট গোপালনগর গ্রামে তিনি বাস করতেন।

ধনঞ্জয় দাস

অষ্টাদশ শতকের শেষে ধনঞ্জয় দাস পঞ্চানন্দের পাঁচালি রচনা করেন। কবির নিবাস ডায়মন্ডহারবার থানার কড়াইবেড়ে গ্রামে। জাতিতে কৈবর্ত।

ভনিতা-পঞ্চানন্দ দয়াবান ঘটে ইও অধিষ্ঠান নায়েকের পূর্ণ কর আশ।
কৈবর্ত্তকুলেতে জন্ম সদ্যবৃত্তি চাষকর্ম্ম বিরচিল ধনঞ্জয় দাস।।

মদনরায়ের পালা, গাজীর গান, কালুরায়ের গীত প্রভৃতির আলোচনা থেকে আমরা বিরত রইলাম। উনবিংশ শতকের কবিওয়ালাদের কথাও আমরা বললাম না।

দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে পুরনো পুথি পাঠকের বড়ই অভাব—যদিও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে পুরনো পুথি পাঠ একান্ত প্রয়োজন। পুথি পড়ার অভ্যাস না থাকায় অনেকে হাস্যকর পাঠ উপস্থিত করেছেন এবং করছেন। যাঁরা পুথি পড়তে ইচ্ছুক, তাঁরা হ্যালহেড সাহেবের 'এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' বইখানা পড়লে উপকৃত হবেন।

লেখক পরিচিতি : প্রবীণ পুথি গবেষক সম্পাদিত গ্রন্থ : ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল

প্রতীপকুমার ভট্টাচার্য

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প

সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে সমাজজীবনের একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি সজীব, সরল, সচল, প্রাণবন্ত জনগোষ্ঠীর নিত্য বহমান এক জীবন্ত সংস্কৃতি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সমাজজীবনের যে প্রাচীন চিত্র প্রত্নগবেষকদের কাছ থেকে জানা গেছে, তা মূলত আদিগঙ্গা জুড়েই পরিব্যাপ্ত। আদিগঙ্গার এই নিম্নতম প্রবাহ সম্বন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মহাভারত ও টলেমির ভৌগোলিক বিবরণীতে।

ভগীরথ সগররাজার পুত্রদের প্রাণরক্ষার জন্য গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের পুরাকাহিনী মৎস্যপুরাণে উল্লেখ আছে। আবার মহাভারতে উল্লেখ আছে ভাগীরথীর এই জলপথে যুধিষ্ঠির সাগর সঙ্গমে (গঙ্গাসাগর) তীর্থস্নান করেছিলেন। টলেমির বর্ণনায় নিম্নবঙ্গের জলপথের বিবরণী আছে। টলেমির বর্ণনায় আরো পাওয়া যায় যে, তাম্রলিপ্ত একটি প্রাচীন বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। গঙ্গারিডিরও উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানে, কিন্তু কোথায় গঙ্গারিডি— সে বিতর্কে না জড়িয়ে একথা বলা যায় যে প্রাচীনকালে আদিগঙ্গার তীর বরাবর মানব বসতি ছিল। যেহেতু সভ্যতার আদিরূপ নদীভিত্তিক।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পূর্বে বৈদিকযুগ থেকে ধরা হত, বর্তমানে মহেন-জো-দাড়োর যুগ থেকে ধরা হয়। ইতিহাসের এই হিসাবের নিরিখে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রত্ন আবিষ্কারের ও গবেষণার যে কাজ হয়েছে, তা কেবলমাত্র ডায়মন্ডহারবারের আম্বালপুরে ডক্টর পরেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে। তারও বহু পূর্বে ঐতিহাসিক কালিদাস দত্ত জেলার সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেশ কিছু প্রাক্- বৈদিক যুগের আয়ুধ, কুঠার ইত্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। এই আবিষ্কার পরেশবাবুর আবিষ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়াও জেলার অন্যান্য প্রত্নস্থল যেমন—হরিনারায়ণপুর, কঙ্কণদিঘি, আটঘরা, ঘোষের চক প্রত্নস্থল থেকে বহু প্রাচীন পুরাবস্তু সংগৃহীত হয়েছে। এসব পুরানিদর্শনই জেলার প্রাচীন জনসমাজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নির্দেশিকা দেয়।

জেলাভিত্তিক লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের সমস্যা ও প্রসার ঘটানো নিয়ে আলোচনা বর্তমান সরকারের সাধু চিন্তাপ্রসূত। কৃষিজীবী মানুষের সার্বিক উন্নয়নের এই বিভাগটি জেলার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের এই উদ্যোগ যাঁদের শ্রম চিন্তা পরিকল্পনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক-সংস্কৃতিচর্চায় নতুন উপাদনগুলি (গাজন—পালাগান বনবিবি-পাঁচালি প্রভৃতি) আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে— সেই গুণী ব্যক্তি সর্বজনশ্রদ্ধেয় লোকশিল্পীদের আত্মজ সুধী প্রধান ও মানিক সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের পণ্ডিত মহলের ধারণা ছিল বাংলার নিম্নাংশ সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পরবর্তীকালে চরভূমি জেগে ওঠে এবং অরণ্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের সূত্রে অবিভক্ত জেলার নিম্ন অঞ্চলে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমৃদ্ধ জনবসতিপূর্ণ জনপদ আবিষ্কৃত হয়েছে।

পণ্ডিতদের মতামত যাই হোক না কেন, এ জেলা থেকে যেসব পুরাবস্তু সংগৃহীত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পোড়ামাটির পাত্র, চুলকি ছাপযুক্ত হাতে তৈরি মৃৎপাত্র, ছাগমুণ্ড আকৃতির নারীদেহ (বর্তমানে ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত), জীবাকৃতির মুণ্ডমূর্তি (বারামূর্তি), টেপা পুতুল (ছাঁচে নয়), শিশুকোলে মা (মাতৃকা দেবী)—যা প্রাক্‌বৈদিক যুগের মাতৃকাপূজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

জেলার মূল জীবিকা হল কৃষি। কেবলমাত্র প্রজননের তাগিদেই কৃষি প্রজনন—এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ, তখন চাষের জন্য প্রচুর জমি ছিল, প্রচুর কৃষিশ্রমিক ছিল না। লোকশক্তির সামাজিক চাহিদা ছিল, তাই প্রয়োজন হয়েছিল মানব প্রজননের। সেইহেতু লোকশিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে সে কথারই প্রচার করে গেছেন। শিবদুর্গার পট্টম-ই (লিঙ্গযোনি পট্টম) তার প্রতীক। এখানে শিব পুরুষ এবং দুর্গা প্রকৃতি। এই লোকভাবনা নিয়ে নানা কাহিনী ও গীত রচিত হয়েছে। এখন আমরা যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনের কথা ভাবছি, তখন কিন্তু তা লোকভাবনায় স্থান পায়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক

(Archecologist) গবেষণা ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের (Anthropology) গবেষণায় জানতে পারা যায় যে আদিম মানব নানাবিধ বিপদ, অকালমৃত্যুর হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কিম্ভুত আকৃতির কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করে অপদেবতা আখ্যায় নানা উপচারে, আচারে বন্দনায় আত্মসন্তুষ্টি খুঁজে পেত। এই সব দেবতাদের মধ্যে এক প্রকার ভয়ঙ্কর মুণ্ডমূর্তি যা এ জেলায় বারামূর্তি হিসাবে পরিচিত। এখন আমরা জেলার লৌকিক দেবদেবীর বিষয়ে আলোচনায় যাব। যার উপর ভিত্তি করে জেলার লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

জেলার লৌকিক দেবদেবী

বারাঠাকুর ঃ বহু প্রাচীনকাল থেকে একপ্রকার ভয়ঙ্কর আকৃতির মুণ্ডপূজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমুণ্ড উল্টানো ঘটের উপর চোখ, নাক, মুখ, মাথায় পাতা আকারের মুকুট। প্রত্নবস্তু হিসাবে এই জাতীয় যে সব মুণ্ড সংগৃহীত হয়েছে তাতে পাতা আকারের মুকুট পাইনি।

বর্তমানে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে দক্ষিণদ্বার নাম নিয়েও ১ মাঘ পল্লীঅঞ্চলে পূজিত হন। সঙ্গে স্ত্রী বারটিকে কোথাও নারায়ণী বা কোথাও দক্ষিণ রায়ের শক্তি বা স্ত্রীরূপে মনে করে।

ধর্মঠাকুর, মন্দির বাজার, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর
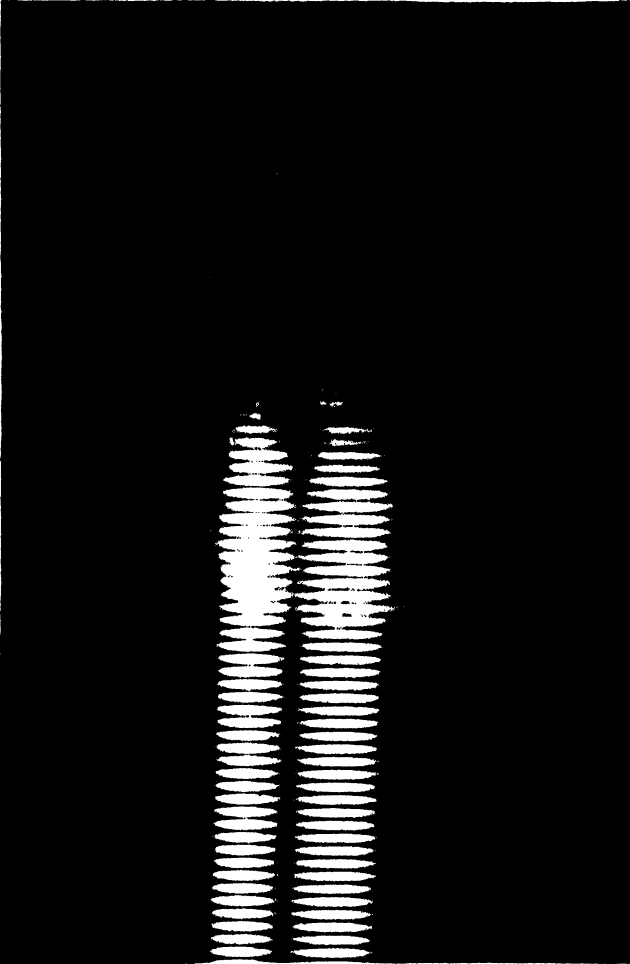
বারামূর্তি, হেমেন মজুমদারের সৌজন্যে

বারাঠাকুর এক প্রাচীন মুণ্ডপূজার নিদর্শন বলে মনে হয় যখন সারা বিশ্বজুড়ে ছিল মুণ্ডপূজার প্রচলন। ইতিহাসে প্রথম পূজা প্রচলনের আদি কথা যে মুণ্ডপূজার উল্লেখ পাই—এসই মুণ্ডপূজার প্রতীক।

দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজীর যুদ্ধ দক্ষিণ রায়ের শিরচ্ছেদ— এবং সেই কাটা মুণ্ডই বারা এ কথা মেনে নিতে খটকা লাগে। ১০৫৭ খৃস্টাব্দের পটভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' রচনায় উল্লেখ পাই—সাধুধনী সুন্দরবনে বছর বছর মহাল করতে যাবার সময় কালুরায় ও দক্ষিণ রায়ের পূজা দিতেন। সাধুধনীর পূজায় কালু রায়-দক্ষিণ রায় তুষ্ট ছিলেন বলে বাঘ ও কুমিরে তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারতো না।

তাই বারাঠাকুর আর দক্ষিণ রায় যদি একও হয় তা হলে মুসলিম পীর বা গাজীদের সঙ্গে কোন দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধ হয়েছিল? এ প্রশ্ন এখনও অজানা।

ধর্মঠাকুর ঃ বাংলার লৌকিক দেবতাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও বহুল পূজিত ধর্মঠাকুর।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'Discovery of Living Buddis of Bengal' প্রবন্ধে ধর্মঠাকুর কে বৌদ্ধদেবতা বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার এই লৌকিক দেবতাটিকে নিয়ে বহু আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। অল্প কথায় ধর্মঠাকুরের আলোচনাও সম্ভব নয়।
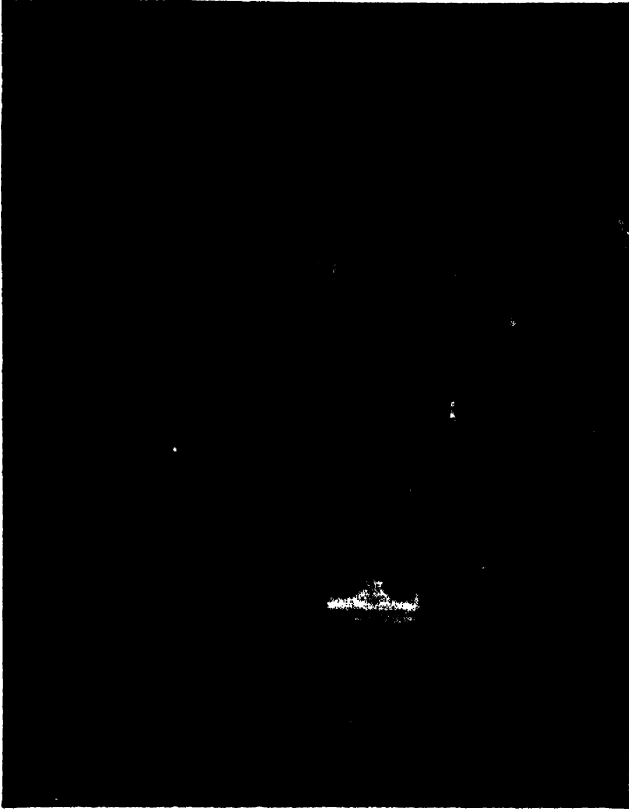
দক্ষিণ রায়, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর সংগ্রহ

ধর্মঠাকুর শূদ্র ও নিম্ন হিন্দুবর্ণের দেবতা হিসাবে পূজা পান। তারকেশ্বর শিবতন্ত্র পুঁথিতে উল্লেখ আছে—

বহুদেব বহুমঠ না হয় কখন।।
নীচ জাতিগৃহে দেখ ধর্মসনাতন।।
বৌদ্ধধর্ম বৌদ্ধচর্চা করিতে নির্মূল।
এতাদৃশ অনুষ্ঠান করে সাধুকুল।

আদিমকালে ধর্মঠাকুরের সূর্য দেবতা হিসাবে পুজো হতো। তার কোনও মূর্তি ছিল না, প্রস্তরখণ্ড বা মাটির ঢেলা প্রতীক হিসাব পূজা হতো। প্রাচীন এই দেবতাটিকে নিয়ে বহু মতামত আছে। এই সূর্য, দেবতা—ধর্মঠাকুর পরে শিবঠাকুর হয়ে কি শাস্ত্রীয় মর্যাদা পেয়েছেন?

বর্ণহিন্দুরা শাস্ত্রীয় বিধিমতে মন্দিরে মূর্তির পূজার্চনা করে থাকেন। এ জেলায় এখনও ধর্মঠাকুর পল্লী এলাকায় নিজ মহিমায় একক থানে বহুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে পূজিত হন। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা—গাজন-চড়ক খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

৯২২ শকাব্দে ১০৫৭ খৃস্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেনের মেয়ে" রচনায় সাঁত গায়ের রাজা রূপা বাগ্‌দি গাজন ও উৎসবের যে বর্ণনা দিয়েছেন—তা এই ধর্মঠাকুরের বলে মনে হয়। শিবের গাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে। লোকসংস্কৃতির গাজন আলোচনায় ধর্মরাজের গাজন নিয়ে কিছু বর্ণনা দেবার ইচ্ছা থাকলো। বাংলায় ইসলামিক অনুপ্রবেশের পর তার প্রভাব ধর্মরাজ ঠাকুরের উপরও পড়েছে। এ জেলার কয়েকটি থানে বুটজুতা পরা ইসলামিক পোশাকে ধর্মঠাকুরের প্রতিমা দেখেছি।

বাবাঠাকুর : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাবাঠাকুর নামে লৌকিক দেবতাটি বাংলার পঞ্চানন্দ—পঞ্চানন নামে পরিচিত। জেলা পল্লী অঞ্চলে এমনি কি শহর অঞ্চলেও শাস্ত্রীয় দেবতার সমান পূজিত হন। গ্রাম এলাকায় বাবাঠাকুরের থান দেখতে পাওয়া যায়। ওই থানে নিম্নবর্ণের লোকেরাও পুরোহিত হিসাবে দেবতার পূজা করেন।

বাবাঠাকুরের আকৃতিও বেশভূষা মহাদেবের আকৃতির আদলে হলেও অনেক অমিল আছে। ঠাকুরের দেহের বর্ণ লাল, দেহ স্থূল ও বলিষ্ঠ—চোখ-মুখ উগ্র, মাথায় জটা, কানে ধুতরাফুল। তিনটি চোখ বিশাল, গোলাকার ও রক্তবর্ণ। মোটা গোঁফ কান পর্যন্ত টানা। পরনে একটুকরো ব্যাঘ্র চর্ম—বক্ষ প্রবিত রুদ্রাক্ষের মালা, বালা তাগা ও পরান। কোথাও কোথাও ত্রিশূল ও ডমরু থাকে। থানে ছাড়াও পল্লী অঞ্চলে অশোক, বট, শেওড়া গাছের তলায় পূজিত হতে দেখা যায় বাবাঠাকুর শিশুরক্ষক দেবতা হিসাবে পরিচিত। মৃতবৎসল নারী তাঁর সন্তান কামনায় দেবতার কাছে মানত করেন—আঞ্চলিক, কথায় বলতে শুনেছি বাবাঠাকুরের দোরধরা তাই নাম পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ ইত্যাদি।

মানসিক পূজাগুলি খুব জাগ্‌জমকের সঙ্গে হয়ে থাকে এবং পশুবলিও হয়।

শহর অঞ্চলে শাস্ত্রমতে যে পূজা হয় তার মন্ত্র—

পঞ্চাননং মহাদেবং রক্তবর্ণং দিগম্বরং
পদ্মাসনাস্থং দ্বিভুজং নানালঙ্কার ভূষিতম।
প্রবলম্ব বাহু সুবলং পট্ট যজ্ঞোপবীতকম্
শিরে পিঙ্গ জটাভারং শিশুগ্রীবারি মর্দনং
বাম হস্তে শিশু ধরং দক্ষ হস্তে ত্রিশূলম্
গোমৃগ বাহনম্ চৈব বেষ্টিতং মণি মণ্ডলং
কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালাং য শোভিতং রক্তলোচনং
উগ্র তেজোময়ং রুদ্রং রুক্ষীষ্ঠং চ তপস্বীনং
ধ্যায়েৎ পঞ্চাননং দেবং ভক্তানুগ্রহ কারকম্।

আটেশ্বর : জেলায় লুপ্তপ্রায় লৌকিক দেবীর মধ্যে আটেশ্বরের নাম করতে হয়। জঙ্গল হাসিলের সঙ্গে সঙ্গে জনবসতি ঘন হতে থাকে তখন অনেক দেবদেবীর প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। আটি কথার অর্থ জঙ্গল বা বন। আটেশ্বর বনের দেবতা। বনবিবি দক্ষিণ রায় কালু রায়ের মতো লৌকিক দেবদেবীর প্রচার বৃদ্ধি পাওয়ায় আটেশ্বর এর প্রচার কমে যায় বলে মনে হয়।

এখনও এই জেলায় আটেশ্বরের যে থান আছে তার মধ্যে মথুরাপুর থানার আটেশ্বরতলার থানটি উল্লেখযোগ্য।

আটেশ্বরের মূর্তি বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ মূর্তি। দেহের বর্ণ সবুজ, মাথায় পাগড়ি হলুদ রঙের, কাপড় মল্লের মতো করে পরা, হাতিয়ার কাঁটার মুগুর, বিরাট গোঁফ। এনার বাহন মহিষ। আটেশ্বর শাস্ত্রীয় বিধানমতে পূজা পান। নৈবেদ্য নিরামিষ—গাঁজা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। পূজার মন্ত্র হল :

আটেশ্বর মহাকায় শ্যামলবর্ণ সনাতন।
মহিষ বাহনং দেব হস্ত মুদগর বিরাজিত।
প্রসন্নং বদনং দেব আটেশ্বর বরপ্রদম্।।

দক্ষিণ রায় : কেবল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেই নয়, সারা বাংলা দেশের লৌকিক দেবদেবী কুলে দক্ষিণ রায় বহু বিতর্কিত দেবতা। দক্ষিণ রায় কোনও গৃহদেবতা নয়। সুন্দরবন অঞ্চলের কোনও কোনও

বর্ণহিন্দুপ্রধান এলাকায় পূজিত হয়ে থাকেন। দেবতার আকৃতি সুশ্রী ও সুপুরুষ, হরিদ্রা বর্ণ, মাথায় বাবরি চুল, তার উপর মুকুট, কপালে রক্ততিলক। চোখদুটি বিশাল ও রক্তাভ, গোঁফজোড়া আকর্ণ বিস্তৃত। পোশাক শিকারির ন্যায়, হাতে তীরধনুক। কোথাও কোথাও মুঙ্গেরি বন্দুকও দেখা যায়। আবদুল গফুরের গাজিসাহেবের গানে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা—

ধুতি এক পরিলেক লম্বা আশিগজ
মস্তক উপরে দিল আশিমণ তাজ।
সহস্র মনের এক জিঞ্জির কোমরে
কষিয়া বান্ধিল বীর ধুতির উপরে।

এই বর্ণনা থেকে দক্ষিণ রায়ের দৈহিক বর্ণনার কিছুটা অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ রায় এখনও এ জেলায় বহুল পূজিত বিশেষ করে বনজীবী মানবসমাজে আজও ১ মাঘ খুব সমারোহে পূজা হয়। কোনও পুরোহিত থাকে না—নিজেরাই পূজা দেন এই মন্ত্র বলে—

"চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়
সারদুল বাহন দক্ষিণ রায়
ঢাল তরোয়াল টাঙ্গি হস্তে
দক্ষিণ রায় নমস্তুতে।"

বীজমন্ত্র ব্যবহার হয়—ওঁ দম্ দম্ দম্। সুন্দরবনের কোনও কোনও অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তির গভীর রাতে জাঁতাল পূজা হয়। এই জাঁতাল পূজা লোকপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত। এখানে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে কালু রায়ও পূজা পান। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করেছেন—খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১০৫৭ খৃস্টাব্দে ৯২২ শকাব্দের পটভূমিকায় রচিত "বেনের মেয়ে"-তে দক্ষিণ রায় ও কালু রায়ের উল্লেখ করেছেন। দক্ষিণ রায় ও কালু রায় উভয়ই প্রাচীন লৌকিক দেবতা। বাংলার মুসলিম অনুপ্রবেশের পরে নানা কাব্যে দক্ষিণ রায়কে ব্যবহার করে গাজি, পীর-বনবিবিকে দেবদেবীর সঙ্গে মিলেমিশে এক করা হয়েছে।

কালু রায় : জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের বহু পল্লীতে কালু রায় লৌকিক দেবতা হিসাবে পূ[illegible] হন। কালু রায় কুমিরের দেবতা। মূর্তি সুপুরুষ ও বীরোচিত; [illegible] দেহের বর্ণ সাদা, বেশভূষা পৌরাণিক যোদ্ধার, চওড়া [illegible] তিলক, চোখ দুটি বড় বড়। হাতে টাঙ্গি ও ঢাল, পি[illegible] বাহন ঘটক। সুন্দরবনের বেশ কিছু থানে কালু [illegible] রায়ের যৌথ থান আছে। সুন্দরবন এলাকায় সর্বত্র [illegible] ন্যায় কালু রায়ও জনপ্রিয়। হিন্দুদের কুমির দেবতা [illegible] মানদের মগর পীর কালু শাহ্য।

বাংলায় মুসলমান [illegible] লক্ষ্য করা যায় যে ইসলাম ধর্ম প্রচারকরা বহুল জন[illegible] দেবীর উপর ভর করে পল্লী বাংলায় নিজেদের ধর্ম[illegible] তৈরি করেছেন। ক্ষমতাসীন রাজশক্তির সুযোগ নি[illegible] অনীহাকে কাজে লাগিয়ে এ কাজ অতিসহজেই [illegible]।

সুন্দরবন এলাকা[illegible] র এলাকায় দক্ষিণ রায় এবং কালু রায়কে যথাক্রমে [illegible] কুমিরের দেবতা হিসাবে পাশাপাশি দেখে এসেছি—কিন্তু মোহাম্মদ খাতের বনবিবি "জহুরানামা" পাঁচালিতে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে শাজঙ্গলি এবং বনবিবির সঙ্গে নারায়ণী যুদ্ধের উল্লেখ আছে—কালু রায়ের কোনও উল্লেখ নেই। বনবিবি যখন দুখেকে বাড়ি পাঠাচ্ছেন সেকো কুমিরের পিঠে। কুমিরও বনবিবির অনুগত— কালু রায় কোথায়? তার কোনও উল্লেখ পাই না।

আবদুল গফুরের "গাজি সাহেবের গান"-এ রাজা শাহ্য-সেকান্দারের পালিতপুত্র কালু শাহার উল্লেখ পাই। এটা পাঁচালি গানে আরও উল্লেখ আছে যে শাহ্য সেকান্দারের পুত্র জন্ম নিলে কালুকে পরিত্যাগ করেননি—নিজপুত্র বড় খাঁ গাজি শাহ্য একসঙ্গেই মানুষ হতে থাকেন। পরে বড় খাঁ গাজি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে ফকির হয়ে গৃহত্যাগ করলে কালু শাহ্য তার সঙ্গী হয়েছিলেন।

এই কালু শাহাই বা কে? বাংলার লৌকিক দেবদেবী মুসলমান অনুপ্রবেশের পর কেমন যেন মিলেমিশে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তবে একথা বলা যায় যে বাংলার মুসলমান অনুপ্রবেশের বহু আগে থেকেই আঠারো ভাটি বা সুন্দরবন এলাকায় দক্ষিণ রায় ও কালু রায় লৌকিক দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মাকালঠাকুর : মাকাল বা মাকালঠাকুর মৎস্যজীবীদের উপাস্য লৌকিক দেবতা। কেবল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় নয়, বাংলার সর্বত্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে মাকালঠাকুর পরিচিত। এই ঠাকুরের নির্দিষ্ট কোন থান বা মন্দির নেই। কোন মূর্তিও নেই। মৎস্য শিকারে যাবার আগে জলাশয়ের ধারে একটি মাটির বেদি তৈরি করে তার উপর দুটি মাটির ঢিবি (অনেকটা উল্টানো গ্লাসের মতো) তৈরি করে মাকাল ঠাকুরজ্ঞানে পূজা করেন। পূজার উপকরণে সামান্য চাল-কলা ও বাতাসা।

উক্ত মাটির ঢিবি দুটি সিঁদুর দিয়ে তার উপর ফুলবেলপাতা দিয়ে পুজো হয়। মৎস্যজীবীদের পল্লীতে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে মাকালঠাকুর স্থান পেয়েছিল কোথাও কোথাও। সেখানে একটি মাটির বেদি তৈরি করে তিনটি ধাপ (সিঁড়ির মতো) তৈরি করে উপরে দুটি মাটির স্তূপ বা ঢিবি তৈরি করা হয়। বেদির চারপাশে চারিটি তীরকাঠি (কঞ্চি) পোঁতা হয় এবং লাল সুতো দিয়ে এই তীরকাঠি ঘেরা হয়। তীরকাটির চারকোণে একটি লাল কাপড়ের চাঁদোয়াও দেওয়া হয়।

এই লৌকিক দেবতাটি পূজা প্রচলন লুপ্তপ্রায় হলেও এক সময়ে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে সমভাবে পূজা পেতেন। মধ্যযুগের লেখা ধর্মকাব্যে মাকাল ঠাকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তারকেশ্বর শিবতত্ত্বে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে মাকালঠাকুরের প্রসঙ্গ আছে—

"ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভৃতি দেবতা।
যাহার যেরূপ ভক্তি সেরূপ গঠিতা।।
কোথায় ওলাইচণ্ডী মাখাল জলায়।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু স্থান দৃশ্যপ্রায়।।

মহীশূরের মৎস্যজীবীদের উপাস্য দেবী কানিয়াম্মার সঙ্গে এ জেলার মাকাল ঠাকুরের মিল পাই—কিন্তু কানিয়াম্মা দেবী (The village Gods of South India Rev. white head-এর উল্লেখ আছে)।

ঘণ্টাকর্ণ-ঘাঁটু-ঘেঁটু ঃ বাংলার মেয়েরা ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে রাস্তার ধারে বা মাঠে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক লৌকিক দেবতার পূজা করে থাকেন।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার পল্লী অঞ্চলে ঘেঁটু নামে এই দেবতা ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে বয়স্কা মহিলাদের দ্বারা পূজিত হন।

ঘেঁটুঠাকুরের মূর্তি বিচিত্র। একটি ভুসোযুক্ত মাটির হাঁড়ি উপুড় করে তার উপর গোবর দিয়ে ঘেঁটু তৈরি হয়, কড়ি দিয়ে চোখ-নাক-মুখ। কপালে থাকে সিঁদুরের তিলক। একটুকরো কাপড় হলুদ জলে ভিজিয়ে ঘেঁটুর গায়ে দেওয়া হয়।

যিনি পূজা করেন অর্ঘ্যাদি বাম হাতে ঘেঁটুকে অর্পণ করেন। এখানে বাম হাতে পূজা দেওয়াটার কারণ হিসাবে বিষ্ণুর শাপের কাহিনী—

"শোন শোন সর্বজন ঘাঁটুর জন্ম বিবরণ।
পিশাচ কুলে জন্মিলেন শাস্ত্রের লিখন।।
বিষ্ণুনাম কোনমতে করবে না শ্রবণ।
তাই দুই কানে দুই ঘণ্টা করেছে বন্ধন।।"

বিষ্ণুর শাপে তার পিশাচ কুলে জন্ম হয়েছিল। তাই যে হাতে বিষ্ণুকে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয় সেই হাতে বিষ্ণুবিদ্বেষী ঘেঁটুকে পূজা করা চলে না। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের কথা স্মরণ হয়।

এ জেলা ছাড়া বাংলার অন্য জেলায়ও ঘেঁটু পূজার প্রচলন আছে। নৈবেদ্য খুবই সামান্য—সিদ্ধচাল, মুসুর ডাল ও বাতাসা দেওয়া হয়।

পূজার মন্ত্র—ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ বলে ভাট ফুল (পল্লী অঞ্চলে ঘেঁটুফুল বলে) দূর্বা দিয়ে পূজা করা হয়।

ঘেঁটুর মূর্তিটি গৃহস্থের বাড়ির প্রবেশপথের দরজার মাথায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। হলুদ জলে ভেজানো কাপড়ের টুকরোটি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গায়ে, চোখেমুখে বুলিয়ে দেওয়া হয় এবং কামনা করা হয় যেন এদের চর্মরোগ না হয়। পূজা শেষ হলে ছেলেরা লাঠি দিয়ে ওই হাঁড়িটি ভেঙে দেয়। ঐ ভাঙা হাঁড়ির ভুসো লাগা অংশটি পল্লীবধূরা সংগ্রহ করে কাজলের সঙ্গে ওই ভুসো মাখিয়ে শিশুদের চোখে কাজল পরান এবং বিশ্বাস করেন যে তাতে শিশুর চোখ সুস্থ থাকবে।

জেলার কিছু কিছু অংশে ঘেঁটুকে শিবের চর হিসাবে ব্রাহ্মণরা পূজা করে থাকেন। চব্বিশ পরগনা জেলার পুরোহিতগণ ঘেঁটুপূজায় এই মন্ত্রটি ব্যবহার করেন—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন।
বিষ্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল।।

স্কন্দপুরাণে ঘণ্টাকর্ণ নামে শিবের এক অনুচরের কথা উল্লেখ আছে। ইনি কাশীধামে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনিই শিবের গণোত্তম। (স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড—উত্তরার্ধ—৫৩ অধ্যায়)।

নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শিবপুরাণ থেকে একটি বচন উদ্ধার করেছেন—ঘণ্টাকর্ণ শিবের গণ "ঘণ্টাকর্ণো গণঃ শ্রীমান্ শিবস্যাতীব বল্লভঃ। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব থেকে প্রমাণ হয়েছে যে ঘেঁটু খোস-প্যাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ নিরাময়ের দেবতা হিসাবে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকে শিবের অনুচর হিসাবে পূজিত হতেন।

পাঁচুঠাকুর ঃ জেলার পল্লীবাসীদের ধারণা পাঁচুঠাকুর শিশুরক্ষক দেবতা। ক্রুদ্ধ স্বভাবের দেবতা। পাঁচু ঠাকুরের আকৃতি অতি ভয়াবহ ও বীভৎস। গায়ের রং কালো—মাথায় জটা, চোখ দুটি বড় বড় গোলাকার এবং লাল। কপালে তিলক, পুরু ঠোঁট, দাঁতগুলি বড় বড় এবং বের করা—পরনে একটুকরো হলুদ কাপড়। সারা গায়ে সাদা ও লাল ফোঁটা। ইনি সর্বদা স্ত্রী বা শক্তিকে সঙ্গে রাখেন। যিনি পাঁচী ঠাকুরানী বলে পরিচিত। তিনিও স্বামীর সঙ্গে পূজা পান। পাঁচী ঠাকুরানীর আকৃতি ভয়াবহ নয়—গায়ের রং হলদে, সিঁথিতে সিঁদুর, হাঁটু পর্যন্ত লাল পাড় শাড়ি। নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, দাঁতগুলি বেশ বড় বড় এবং বের করা।

যে সব নারী মৃত সন্তান প্রসব করেন, যাঁদের সন্তান শৈশবে রিকেট (পল্লীগ্রামে একে পেঁচোয় ধরা বা পুঁয়ে ধরা রোগ বলে) বা ধনুস্টঙ্কার-এ ভোগে তাঁরা এই লৌকিক দেবতার পূজা করেন। সুস্থ সন্তানের কামনায় পল্লীবধূরা এই ঠাকুরের কাছে মানত করেন। মনের ইচ্ছা পূরণ হলে পাঁচুঠাকুর ও পাঁচী ঠাকুরানীর মূর্তি তৈরি করে পূজা দেন। পূজার পরে মূর্তিটি গ্রামের লৌকিক দেবদেবীর থানে রেখে দিয়ে আসেন। পাঁচুঠাকুরের দোরধরা সন্তানের নাম পাঁচু দিয়ে রাখার চলন আছে। এনার পূজা বর্ণহিন্দুরা করেন না। পূজার বিশেষ কোনও মন্ত্র নেই— শনি মঙ্গলবার পূজার প্রশস্ত দিন। ওই জেলায় পল্লী অঞ্চলে এখনও পাঁচুঠাকুরের পূজার বহুল প্রচলন আছে।

জ্বরাসুর ঃ লুপ্তপ্রায় এই লৌকিক দেবতার আলাদা কোনও থান বা মন্দির নেই। শীতলার থানে এনার পূজা হতে দেখা যায়। জ্বর এবং বিকাররোগ নিরাময়ের দেবতা। তাই পল্লীর মানুষ জ্বর নিরাময়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে এই দেবতার পূজা করেন।

মূর্তির বিবরণ : গায়ের রং ঘন নীল। তিনটি মাথা, নটি চোখ, ছটি হাত, পা তিনটি। এই দেবতার কোনও বাহনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বে সুন্দরবন এলাকার কোথাও একক থানে পূজা হতো। জ্বর ও বিকারের নিরাময় দেবতা হিসাবে পূজিত হন।

"মানিক বলে জ্বরাসুর বাত বলি তোর
তুমি গিয়া দেহ বার ভক্তের উপর।"

জেলার অরণ্য অঞ্চলে জ্বরাসুরের অন্য আকৃতির মূর্তিও দেখা যায় যা অতি বীভৎস—কবন্ধ, পেটের উপর মুখ। শীতলার সঙ্গে জ্বরাসুরের একটা সম্বন্ধ পাই—কাহিনীটা শীতলার পূজা প্রচলনের ক্ষেত্র তৈরির কাজে শীতলা জ্বরাসুরকে ব্যবহার করেছিলেন। পরিকল্পনাটা এইরূপ জ্বরাসুর—আগে গিয়ে জ্বর দেবে তারপর শীতলা বসন্তরোগ দেবে।

শীতলার থানে যে জ্বরাসুরের মূর্তি থাকে, সেখানে বর্ণহিন্দুরা শীতলার সঙ্গে জ্বরাসুরের পূজা করে থাকেন। ইসলামি বাংলা সাহিত্য পীরমাহাত্ম্যে মানিকপীর নিজ মাহাত্ম্য প্রচারে জ্বরাসুরকে ডেকেছেন।

মানিকপীর ঃ মানিকপীর পশুরক্ষক দেবতা, বিশেষ করে পল্লীগ্রামে গোয়ালাদের কাছে বেশি পূজা পেয়ে থাকেন।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের "মানিকপীর" রচনায় এক ফকিরী গানের উল্লেখ আছে—

"সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ে কুবুদ্ধি ঘটিল।
বাথানিতে দুগ্ধ রাখি পীর কে ভাঁড়াইল—"

বিবিমার থানে সাতবিবি *ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল*

গোয়ালার মেয়েটি খুবই বুদ্ধিমতী—কিন্তু গ্রহের ফেরে কুবুদ্ধি হল—ফকির বেশি মানিকপীরকে দুধ থাকা সত্ত্বেও—দুধ নেই বলে তাঁড়াল। ওই গোয়ালার মেয়ে জানতো না যে ফকির আর কেউ নন, স্বয়ং মানিকপীর।

এই ঘটনার পর ওই গোয়ালাপাড়ার সব গরু-বাছুর মরে যায়। ফকিরের রোষে সব গরু-বাছুর মারা গেছে—তখন ওই গোয়ালপাড়ার সব লোক ওই ফকিরের সন্ধানে ছুটলো। নদীর তীরে ফকিরও যেন এঁদের আসার অপেক্ষায় ব[illegible]। [illegible]বাসীরা যখন সবাই ফকিরের দোয়া মাঙলো—মানিকপী[illegible] তাঁর পূজা ও হাজোতের প্রবর্তন করার জন্য [illegible] করে উক্ত গ্রামের গরুবাছুরগুলিকে বাঁচিয়ে [illegible]

দক্ষিণ চব্বিশ-পর[illegible] বহুল প্রচলন আছে। এখনো পল্লী অঞ্চলে মা[illegible] মানিকপীরের থান দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় প্রতি [illegible] একবার পীরের থানে পুজো হয়—সিন্নিপ্রসাদ উভয় স[illegible]ভাবে গ্রহণ করেন।

মানিকপীরের মূর্তি[illegible] যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে, সে তুলনায় এ জেলায় এখ[illegible] বহু থানে বা দরগায় মানিকপীরের সঙ্গে অন[illegible] বা হাজোত কম নয়। মানিকপীরের মূর্তি সুন্দর[illegible]। কোথাও কোথাও মেঘের মত ধূসর। কালো রঙের [illegible] টুপি বা পাগড়ি, হাতে আসাদণ্ড আর জপমালা।

মানিকপীরের হাজোত বা পূজা বৃহস্পতিবার কোথাও কোথাও শনি-মঙ্গলবার হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে বাংলায় পীর প্রচলন ও জনপ্রিয়তা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল—ইসলামিক বাংলা সাহিত্যে পীর মাহাত্ম্য গাথা ওই সময়ের রচনা। পাঁচালি গানের আলোচনায় তার কিছু ব্যাখ্যা দেবার ইচ্ছা থাকল।

বড় খাঁ গাজি : ইনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লৌকিক দেবতা। এ জেলায় বহু অঞ্চলে গাজির থানে বড় খাঁ গাজির পূজা হয়। উভয় সম্প্রদায়ই পূজা ও হাজোত দেন। উক্ত থানগুলিতে বনবিবি দক্ষিণ রায়, কালুরায়ের সহাবস্থান দেখা যায়।

বড় খাঁ গাজি একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষ অশ্বারোহী যোদ্ধৃবেশ—গায়ের রং সাদা, পয়ে বুট জুতো, এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম। ইনি ব্যাঘ্রকুলের দেবতা হিসাবে পরিচিত। গাজির দরগায় হাজোতের পরে ফকির সুর করে এই ছড়াটি গেয়ে থাকেন—

"গাজি মিএগর হাজোতে সিন্নি সম্পন্ন হল।
হিন্দুগানে বল হরি মোমিনে আল্লা বল।।"

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রামে বামুন গাজির থান বহু পরিচিত ও জনপ্রিয়—হাজার ভক্ত আজও এই থানে মানত করেন—পূজা দেন দৈব নানাবিধ ভেষজ ওষুধ-কে নির্ভর করেন—জনশ্রুতি, অনেকে নিরাময়ও হন। এক ব্রাহ্মণ ....এ অঞ্চলে খুব পূজা-অর্চনায় ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবায়

খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। এই ব্রাহ্মণের জনপ্রিয়তার মাধ্যমে নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করেন—ব্রাহ্মণ পরাজয় মেনে নিয়ে গাজির প্রস্তাবে রাজি হন—এবং সেই থেকে বামন গাজি উভয় নামে থানটি পরিচিতি পায়।

নদনদীনালার সুন্দরবনে নৌজীবী মাঝিমাল্লারা গাজি পীরদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন—এখনও নৌকো ছাড়ার সময় মনে মনে এই ছড়াটি গেয়ে যাত্রা শুরু করেন—

"আমরা আজি পোলাপান।
গাজি আছে নিখা বান,
শিরে গঙ্গা দরিয়া,
পাঁচ পীর বদর বদর।

সত্যপীর : নারায়ণ বা সত্যনারায়ণ বর্ণহিন্দুদের বহু প্রাচীন দেবতা হলেও বাংলার মুসলমান অনুপ্রবেশের পর থেকে সত্যপীর নামে এই লৌকিক দেবতা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছেন। বাংলার নিম্নবর্ণ হিন্দু ও বৌদ্ধরা মুসলিম অনুপ্রবেশের সময় থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের ত্যাগ ধর্মের সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি—এই সেই না পারার নমুনা সত্যপীরের পূজা বলে অনুমান।

পূজার যে সিরনি ও মোকাম (পাঁচটি থাকে) তা হিন্দুদের আর কোনও দেবদেবীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই পাঁচটি মোকাম কি পাঁচপীর কে স্মরণ করে? হিন্দুদের সত্যনারায়ণ আর মুসলিমদের পীর মিলেমিশে সত্যপীর হয়ে গিয়েছেন। শঙ্করাচার্যের সত্যনারায়ণ পুঁথি থেকে পাওয়া যায়—

"একদা বৈকুণ্ঠ ধামে চিন্তে নারায়ণ।
মর্ত্যেতে কলহ সকল ধর্মের কারণ।।
সকল আপদের সেরা ধর্মের কলহ।
পৃথিবী ভাসিয়া যায় রক্ত অহরহ।।
মিলাতে সকল ধর্ম কামনা আমার।
সত্যপীর রূপে আমি হব অবতার।।
ফকিরের বেশে আমি ধরায় যাইব।
নরধর্ম রীতি শিক্ষা প্রচার করিব।।
কেহ বা ডাকিবে মোরে সত্যপীর বলি।
পীর আর নারায়ণ একই সকলি।।"

বাশুলী বা বিশালাক্ষ্মী : বাংলার বহুল প্রচলিত বাসলী—বাশুলী—বিশালাক্ষ্মী বা বাসলী নামে বেশি জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধও। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই দেবীমন্দির ও থান আছে। প্রতিমার আকৃতি শাস্ত্রীয় দেবীর মতো সুশ্রী সৌম্য, বর্ণ হরিদ্রা—এলোকেশী (কোথাও কোথাও মাথায় মুকুট পরিহিতা দেখা যায়) ত্রিনয়না, দ্বিভুজা, এক হাতে প্রহরণ, অন্য হাতে বরাভয় মুদ্রা। রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধানে—গলে ও কটিদেশে নরমুণ্ডমালা। পাদদেশে বা পাশে শিব বা শিবের আকৃতিতে মহাকাল ভৈরব বা সিদ্ধপুরুষ দেখা যায়। এনার পূজা শাস্ত্রমতে অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরগুলিতে বা থানে নিত্যপূজার প্রচলন আছে। বিশেষভাবে শনি মঙ্গলবারে পূজা হয়। বৈশাখ মাসে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা হয়। বাশুলী নামে এই দেবী বহু প্রাচীন বলে মনে হয়। সুন্দরবনে বসবাসকারী আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় যে তারা বাশুলী নামে এই দেবীকে বহুদিন ধরে পূজা করে আসছেন। প্রাক্-

হাড় ঝি চণ্ডী, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর সংগ্রহ
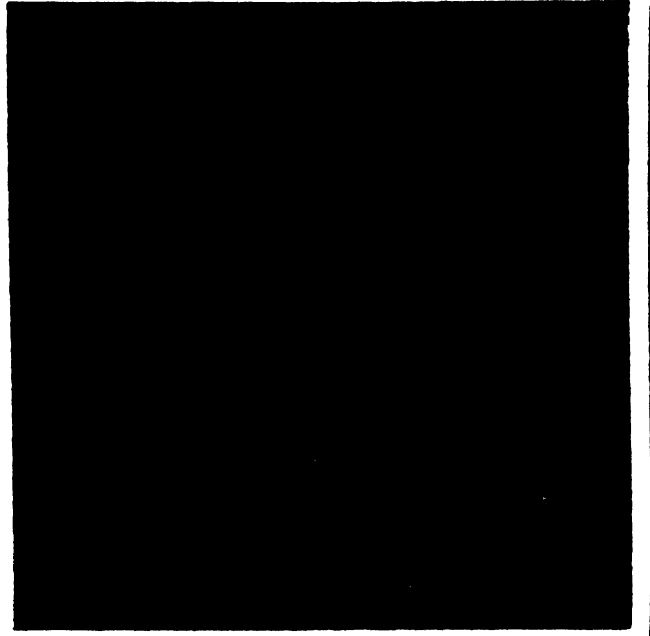
বৈদিক যুগের সময়কাল থেকেই মনে হয় এই দেবীর পূজা প্রচলন ছিল। বৈশাখ মাসে বিশেষ-পূজা বৌদ্ধ দেবীর সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয়। কবে থেকে শাস্ত্রীয় বা তন্ত্রসারের মধ্যে দেবী মর্যাদা পেয়েছেন তার ইতিহাস জানা নেই।

বাশুলী বিশালাক্ষ্মী হয়ে বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

ধর্ম পূজা বিধানে বিশালাক্ষ্মীর তিনটি রূপের উল্লেখ পাই—প্রাতঃকালে কুমারী, মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়া এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধা।

ধর্মপূজা বিধানে বাশুলী বা বাসুলীর পৃথক মন্ত্রের উল্লেখ আছে। এখানে বাশুলীর সঙ্গে বাগেশ্বরী ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা।

বাংলা মঙ্গল কাব্যেও কবি মুকুন্দ মিশ্র বাসুলীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন—সময়কাল সম্ভাবত ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে। (বাশুলীমঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) বিশালাক্ষ্মী নিয়ে অনেক গবেষণা ও তথ্য আছে যা বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। লৌকিক এই দেবী জেলার প্রায় সর্বত্র পূজিতা।

নারায়ণী : নারায়ণী, নারায়ণ বা বিষ্ণুর স্ত্রী নন। দেবকুলের সঙ্গে এনার কোনও সম্পর্ক নেই। ইনি দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় লৌকিক দেবী। লৌকিক দেবীকুলে মর্যাদাও বেশি। বিনয় ঘোষ পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি গ্রন্থে খাড়ি গ্রামের মথুরাপুর থানার নারায়ণীতলার উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে ডাকার্ণবে খড়ির এই নারায়ণীতলা চৌষট্টি পীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ বর্লে উল্লেখ করা হয়েছে। বহুল জনপ্রিয়তার সুবাদে বর্ণহিন্দুরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে পৌরোহিত্য করেন। মন্ত্র সংস্কৃতে যা ব্যবহার করেন তা ঠিক এই দেবীর জন্য রচিত বলে মনে হয় না। মন্ত্রটি এই রূপ—

"সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং
রক্তবস্ত্র পরিধানাং বালার্ক-সদৃশী তনুং
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে
প্রফুল্ল কমলেরূঢ়াং ধ্যায়ত্তাং ভবসুন্দরীম্।

উক্ত ধ্যানমন্ত্রের নারায়ণীর আকৃতির সঙ্গে কিছু সাদৃশ্যও আছে। নারায়ণীর আকৃতি শাস্ত্রীয় দেবী জগদ্ধাত্রীর মতো। গায়ের বর্ণ রক্তাভ হরিদ্রা, চতুর্ভুজা, মাথায় মুকুট— পরিধানে রক্তবস্ত্র। এনার বাহন সিংহ কোথাও কোথাও ব্যাঘ্র। সুন্দরবন অঞ্চলে বেশির ভাগ নারায়ণী মূর্তিই ব্যাঘ্রবাহিনী। সাধারণত প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার এনার পূজা হয়। পৌষ সংক্রান্তি বা ১ মাঘ খুব জাঁকজমকের সঙ্গে নারায়ণী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

নারায়ণী ও বনবিবি নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। রায়মঙ্গল কাব্যে বনবিবির 'জহুরানামা' থেকে জানা যায় বনবিবির সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধের কথা। সেই কাহিনীতে উল্লেখ আছে খুদাতালার হুকুমে বনবিবি ভাঁটি দেশ অধিকার করতে এলে নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বনবিবি নারায়ণীকে পরাজিত করে সন্ধি স্থাপন করেন। সেই থেকে নারায়ণী ও বনবিবি সুন্দরবনের আঠার ভাঁটি ভাগ করে নেন।

বনবিবি বলে সই শুনো মন দিয়া।
সকলে আঠার ভাঁটি লইব বাটিয়া।।

সেই থেকে নারায়ণী এবং বনবিবি আজও সমভাবে পূজা ও হাজোত পেয়ে থাকেন।

অষ্টনাগ. গোপেনকৃষ্ণ বসুর সংগ্রহ

হাড়িঝি চণ্ডী : হাড়িঝি চণ্ডী বা হাড় চণ্ডীর লৌকিক দেবী হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি না থাকলেও এই জেলায় কিছু কিছু এলাকায় হাড়িঝি চণ্ডীর থান আছে। ওই থানগুলির মধ্যে দুটি থান খুব জনপ্রিয়।

প্রথমটি সোনারপুর থানার সুভাষগ্রামের উত্তরাংশে চাংড়িপোতা মাঠের মধ্যে ইষ্টকনির্মিত থানে হাড়িঝি চণ্ডীর পূজা হয়। এখানে কোনও মূর্তি নেই। একটি গোলাকার কালো পাথরে রূপোর চোখ-নাক-মুখ খোদাই করা দেবীর প্রতীক। এই প্রস্তরখণ্ডটি দেবীজ্ঞানে পূজা হয়।

প্রস্তরখণ্ড পূজায় প্রাক[illegible]দিক যুগের আদিম দেবদেবীর কথা মনে পড়ে। এতদঞ্চলে হাড়িঝি [illegible] খুবই [illegible]প্রিয়। বহু বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের মহিলারা অঘ্রান মাসে ও [illegible] মাসে[illegible] শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারগুলিতে চণ্ডীর ব্রত পালন ও [illegible] দেন। এই ব্রতকে কুলি মঙ্গলবারের ব্রত বলে। উ[illegible]তে কেবল জেলার ভক্তরা নন দূর দূর থেকে অনে[illegible] দিতে আসেন।

দ্বিতীয় থানটি সুন্দ[illegible]বিরল দমদমা কাওড়াখালি অঞ্চলে। থানটি ইটের দে[illegible] উ[illegible]র চাল—এই অঞ্চলে অন্য কোনও দেবদেবীর প্রচল[illegible]ব। এখানেও কোনও মূর্তি নেই। চারপায়া বেলে পা[illegible] উচ্চতা-৮" প্রস্থ ১২" লম্বা (আনুমানিক) দেবীর প্র[illegible]হিন্দুরা পূজা করেন না। গ্রামবাসীরাই নিজেরা পূ[illegible]রেন।

প্রত্নসংগ্রহে অনুরূ[illegible]দি[illegible]র বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। আশুত[illegible] রক্ষিত আছে। আমাদের ধারণা ছিল—দেবদেবী চৌকি বা আসন। এই বেদি কিভাবে হাড়িঝি চণ্ডীর প্রতীক হল তা কেউ বলতে পারেনি।
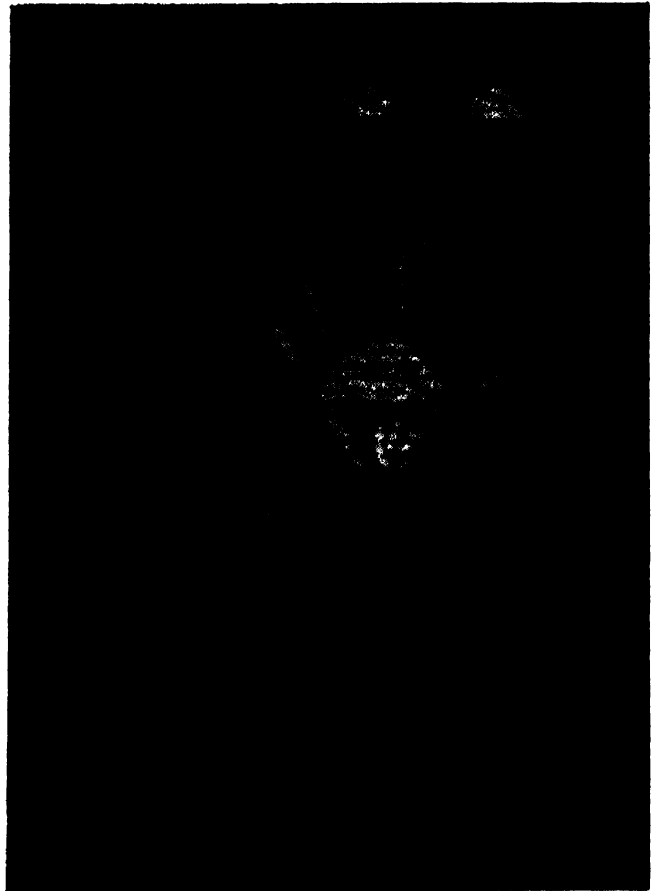
সাতবিবি : জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিমার থান দেখতে পাওয়া যায়।

প্রায় প্রতিটি গ্রামেই এই থান যেখানে নানাবিধ লৌকিক দেবদেবীর সমারহ একই সঙ্গে পূজা পান। দেবদেবীদের মধ্যে তিন বিবি, সাত বিবি কোথাও কোথাও ২২বিবির সমারোহ। সাত বিবি বা এই সব বিবি দেবীদের মূর্তি শাস্ত্রীয় দেবী মূর্তির মতো আবার মুসলিমপ্রধান এলাকায় মুসলিম পোশাকে দেখা যায়। সাত বিবি বিভিন্ন রোগের দেবী। থানগুলিতে নিত্যপূজা হয়। মানত উদ্‌যাপনের সময় মূর্তি তৈরি করে পূজা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সাত বিবির সাত বোন—নাম ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈ বিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, মড়িবিবি বা ঝেঁটুনে বিবি ও আসান বিবি।

গবেষকদের মন্তব্য এই সাতবিবির প্রচলন শাস্ত্রীয় সপ্তমাতৃকা থেকে এসেছে। বাংলায় ইসলামিক ধর্ম প্রচারের সময় সপ্তমাতৃকা সাত বিবিতে রূপ পেয়েছেন।

সাত বিবি সাতটি রোগের নিরাময়ের দেবী হিসাবে পূজা পান যার মধ্যে ওলাউটা বা কলেরা রোগের দেবী ওলাই চণ্ডী বহুল জনপ্রিয়।

ওলাইচণ্ডী ওলাবিবি : এ জেলায় যে সব বিবি দেবী হিসাবে পূজিত হন ওলাবিবি তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও জনপ্রিয়।

ওলাবিবির পূর্ব নাম ওলাইচণ্ডী। মুসলমান অনুপ্রবেশের পর দুই সম্প্রদায়ের মিলনেই ওলাইচণ্ডী ওলাবিবিতে পরিচিত হয়েছেন।

ওলাবিবি ওলাউটা বা কলেরা রোগ নিরাময়ের দেবী।

পল্লী অঞ্চলে সাতবিবি, সঙ্গে ওলাবিবিকে দেখা যায়। কোনও কোনও বিবিমার থানে ওলাবিবির মূর্তির পরিবর্তে স্তূপ প্রতীক হিসাবে পুজো হয়। কেবল গ্রাম অঞ্চলেই নয় বহু শহর এলাকাতেও বিবিমার থান আছে। জেলায় নামখানা, কাকদ্বীপ কুলপি জয়নগর প্রায় প্রতি গ্রামে বিবিমার থান আছে।

কোনও কোনও মন্দিরে বর্ণহিন্দুরা পূজা করেন। বেশির ভাগ থানে মুসলিম মহিলারা পূজা করেন বা হাজোত দেন। ব্রাহ্মণ-কায়স্থপল্লীর বধূরাও বৎসরে একদিন উপবাস থেকে মাগুন করেন—কম করে সাত বাড়ি থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয়—ওই ভিক্ষালব্ধ চাল, পয়সা বিক্রয় করে পূজার সামগ্রী কেনা হয়। জয়নগর থানা রক্তাখাঁ পাড়ায় অনুরূপ একটি থান আছে। এই থানে দুটি স্তূপ—সমাধিস্তূপ একটি দেবীর প্রতীক, অপরটি রক্তাখাঁ গাজির বলে অনুমান করা হয়।

টুসু : জেলার সুন্দরবন এলাকায় বেশ কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় বাস করেন। ওই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে টুসুপূজার প্রচলন আছে। পৌষসংক্রান্তির দিন টুসুপূজা, তার পর দিন ১ মাঘ গঙ্গাপূজা। ওই টুসু পূজা ও গঙ্গাপূজা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে—টুসু আর গঙ্গা প্রতিমা মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি বা পাড়ায় পাড়ায় টুসু গান গেয়ে বেড়ায়।

বেনাকী : বেনাকী এমন একজন লৌকিক দেবী যার কোনও হাল বা মন্দির নেই—নেই কোনও মূর্তিপ্রতিমা। ইনি একজন অস্থায়ী দেবী বলে মনে হয়। কৃষক পরিবারে এই পূজা তার জমির আলে (জমির সীমানা)—কোথাও দু'হাত দু'হাত করে বর্গ বা চার হাত চার হাত—পরিষ্কার করে কাদা দিয়ে লেপা হয়। তার উপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরোহিতই একটি মাটি দিয়ে গোধা বা গোসাপের (গুয়েহাটলে) আকৃতি তৈরি করে পূজা করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপূজার মতো পূজা হয়। কোথাও কোথাও (মন্দিরবাজার অঞ্চলে) লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তিও এই গোধা বাহনার সঙ্গে পুজো হয়। পুজোটা হয় ধান কাটার সময়। বেশির ভাগ ধান কাটা শুরু হয় পুরোহিতকে দিয়ে ধানের প্রথম গোছটি কাটা হয়। অঘ্রান মাসে পুজোটা হয় বেশির ভাগ বৃহস্পতিবার দিন। বেনাকীর উৎস খুঁজতে গিয়ে বড় বিভ্রান্ত হই। যেভাবে পূজা দেখি তাতে মেলাতে পারি না। লক্ষ্মী কখনও গোধা বাহনা পায়নি। গোধাবাহনা মঙ্গল চণ্ডীতে পাচ্ছি। কালকেতুর উপাখ্যানে স্বর্ণ গোধা হিসাবে চণ্ডীকে পাই। কালকেতুর উপাখ্যানে স্বর্ণগোধা হিসাবে চণ্ডীকে পাই। জেলার কৃষকদের পূজা দেখে বুঝলাম পুরোহিতদের হাতে তারাও বিভ্রান্ত। কুলপীতে কয়েক জায়গায় দেখলাম কেবল গোধা তৈরি করে পূজা হচ্ছে। অনুসন্ধান করতে করতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৩ সূক্তে বেন নামক এক দেবতার উল্লেখ পাই। এই বেন দেবতা বৃষ্টি দান করেন, রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদে লিখেছেন—"বৃষ্টিদাতা আলোকময় কোনও দেবকে বেন নামে উপাসনা করা হয়েছে" বৃষ্টি চাষের কাজের প্রয়োজন বুঝলাম, কিন্তু গোধিকা বুঝলাম না। বেন দেবতা বর্ষা বা জলের তার বাহন কি গোধিকা? সন্ধান পাইনি।

বেনাকী নিয়ে আমার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। কুলতলিতে এক কৃষকের কাছে জানা যায়—পূজা দিয়ে শুরু হয় ধান কাটা। পূজার দিনটি বৃহস্পতিবারই ধার্য হয়।

অলক্ষ্মী : কার্তিকী অমাবস্যাকে দীপান্বিতা বলে। এই দিন এই জেলায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ি লক্ষ্মীপূজা ও অলক্ষীপূজার প্রচলন আছে।

লৌকিক দেবদেবীভুক্ত কিনা প্রশ্ন আছে। এই লক্ষ্মীর মূর্তি লৌকিক ভাবনায় তৈরি হয়। পল্লীরমণীরা চালবাটা (পিটুলি) দিয়ে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবের তৈরি করেন। হলুদবাটা মিশিয়ে লক্ষ্মীর দেহ, লাল সিঁদুর দিয়ে লক্ষ্মীর কাপড়, বেলপাতা বাটা দিয়ে সবুজ করা হয় কুবের—নারায়ণ সাদা—কাঠকয়লা গুঁড়ো করে কালো—এই উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং কুবের। গোবর দিয়ে তৈরি হয় অলক্ষ্মী। মেয়েদের ছেঁড়া চুল—ভাঙা নোঁয়া, শাঁখা দিয়ে অলক্ষ্মীকে সাজানো হয়।

পল্লীরমণীদের ভাবনাপ্রসূত, তাই লৌকিক তালিকায় স্থান পেয়েছেন। পূজা শাস্ত্রীয় বিধিমতে হয়। অলক্ষ্মীর ধ্যান-দ্বিভূজা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা, লোহার অলঙ্কারে ভূষিতা, শর্করা চন্দনে চর্চিতা, সম্মার্জনী হস্তা, গর্দভে আসিনা, কলহপ্রিয়া।

এখানে শীতলাদেবীর বাহনের সঙ্গে অলক্ষ্মীর বাহনের সাদৃশ্য সম্মার্জনী হস্তা।

অলক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র—

অলক্ষ্মীত্বং কুরুপাসি কুৎসিত স্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ন পূজাঞ্চ শাশ্বতীম্।
দারিদ্র্য কলহ প্রিয়ে দেবি ত্বং ধননাশিনী।
যাহি শত্রোর্গহে নিত্যং স্থিরাতম ভবিষ্যসি।।
গচ্ছত্বং মন্দিরং শনোর্গৃহীত্বা চাণ্ডভং মম।
মদাশ্রয়ং পরিত্যজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি।।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলার ব্রত পুস্তিকায় অলক্ষ্মীর উল্লেখ করেছেন।

পূজার পর ভাঙা কুলো বা চুবড়ি বা ঝোড়া বাজিয়ে পাটকাটির আগুন জ্বালিয়ে বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়ে আসা হয়। অলক্ষ্মী বিদায়ের সময় মেয়েরা শিশুরা চিৎকার করে—অলক্ষ্মী দূর হ—মা লক্ষ্মী ঘরে আয়.......ইত্যাদি।

মনসা : ভারতে সর্পপূজা নিয়ে অনেক গবেষণা ও মতামত আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব হল না।

পুরাবস্তু সংগ্রহের মধ্যে জেলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে সর্পফণা ও সর্প হাতে বেশ কিছু দেবীমূর্তি সংগৃহীত হয়েছে তা আনুমানিক পঞ্চ-ষষ্ঠ শতাব্দীর। ডায়মন্ডহারবারের আবদালপুর থেকে একটি পোড়ামাটির সর্পফণা সংগৃহীত হয়েছে—সংগ্রহটি প্রাচীন এবং লোকশিল্পের একটি মূল্যবান নিদর্শন।

প্রাক্‌-বৈদিক যুগ থেকেই মাতৃকাপূজা বাংলায় বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আর্যসমাজে স্ত্রীদেবতার বিশেষ প্রচলন ছিল না। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে এবং বাংলা বাদে প্রায় সর্বত্র বাসুকীই নাগদেবতা হিসাবে পূজা পেয়ে থাকেন। বাংলা (বাঙলা) এবং

দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র কয়েকটি স্ত্রী সর্পদেবতার পূজা দেখা যায়। শাস্ত্রীয় পণ্ডিতবর্গের মনসাকে নিয়ে জটিল বিতর্কে না গিয়ে লৌকিক দেবী মনসার কথা কেবল আমরা আলোচনা করব, যা আমাদের জেলার লোকচর্চায় উজ্জ্বল।

বহু পণ্ডিতের মতামতে মনসা অবৈদিক অপৌরাণিক লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃত। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দক্ষিণ ভারতের কানাড়া অঞ্চলে নাগপঞ্চমীর দিন বৎসরান্তে পূজিতা মাঞ্চাম্মা (মাঞ্চাম্মা) নামক স্ত্রীসর্পকে মনসার উৎস বলে উল্লেখ করেছেন (বাংলার মনসাপূজা প্রবাসী আষাঢ় ১৩২৯-পৃ: ৩৯১) ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাসে লিখেছেন "সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজননশক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব—এ তথ্য নিঃসন্দেহ।" বৃক্ষমধ্যে সর্পপূজা আদিম দুই সংস্কারের মিশ্রণ বলে মনে হয়। জেলায় সিজমনসা গাছ মনসাদেবীর পূজার ঘটে ব্যবহার হয়। সংস্কৃতে এই বৃক্ষকে সুহী বৃক্ষ বলে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় এই বৃক্ষ CACTUS সিজ মনসা CACTUS INDIANIS নামে পরিচিত। মেয়েদের ব্রত কথাতেও সিজ মনসার উল্লেখ পাই। সেখানে মনসা নিজ পরিচয় দিয়ে বলেছেন—"আমি মনসা—সিজ মনসাগাছে থাকি।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলায় মনসাপূজা প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ওই প্রবন্ধে বলেছেন "বাংলার মনসাদেবী দ্রাবিড়, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য—এই তিন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ধর্মগত আদর্শের সঙ্কর সৃষ্টি।

এই সর্পদেবী মনসা বর্ণহিন্দুদের ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে উজ্জ্বল মর্যাদা পেয়েছেন।

এ জেলায় মনসাকে নিয়ে তিন প্রকার পূজার উল্লেখ পাই (১) নাগপঞ্চমী (২) দশহরা (৩) অরন্ধন মনসাপূজা (রান্নাপূজা)

(১) নাগপঞ্চমী ঃ আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরে যে পঞ্চমী তাকে নাগপঞ্চমী বলে।

দেবী পুরাণে উল্লেখ আছে—

"সুপ্তে জনার্দনে ... পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়ে মনসা ... ...পসংস্থিতাম।।"

জনার্দন শয়ন করিলে ... ... পক্ষের যে পঞ্চমী সেই নাগপঞ্চমী।

এই পঞ্চমীতে গৃহা... ...উঠানে ... মনসা বৃক্ষ স্থাপন করে তাতে মনসাদেবীর পূজা ... ... এতে অষ্টনাগেরও পূজা কর্তব্য।"

নাগপঞ্চমী পূজা ... ...বিধানে অনুষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই পূজা করে... ...। ... অঞ্চলে প্রায় প্রতি গ্রামে নাগপঞ্চমী পূজা অনুষ্ঠি... ...।

দশহরা ঃ দশহরা ... ...য়ের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত। দশহরা পূজা দিয়েই শু... ... আ... ...বের প্রস্তুতি। দশহরার দিন বৃষ্টি হলে সাপের বিষ ... ...কবিশ্বাস। বৃষ্টি হলে ধানের চারা (বীজতলা) তৈরি... ... ...

দশহরা নিয়ে স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে—

"জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ
ব্যতীপাতে গরানন্দে কন্যাচন্দ্রে বৃষে রবৌ।
দশযোগে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্ব পাপেঃ প্রমুচ্যতে।।"

জ্যৈষ্ঠ মাস, শুক্লপক্ষ, দশমী তিথি, বুধবার হস্তা নক্ষত্র ব্যতীপাত, গরকরণ, আনন্দযোগ কন্যারাশিতে চন্দ্র ও বৃষরাশিতে সূর্য—এই দশবিধ পাপ নষ্ট হয়। ওই দিন গঙ্গাস্নানে সর্ববিধ পাপ নষ্ট হয়। গঙ্গাতীরে দেবীর স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করতে হয়। গৃহস্থগণ ওইদিন স্বভবনে অষ্টনাগের সঙ্গে মনসার পূজা ও মনসাদেবীকে দশবিধ ফল দানের বিধান আছে।"

জেলার প্রায় সমস্ত পল্লী অঞ্চলে দশহরা পূজা হয়—পল্লীর মনসা থানে দশ প্রকার ফল সংগ্রহ করে পূজা দেওয়ার রীতি আছে।

মনসাপূজা (অরন্ধন) ঃ ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন এই পূজা খুব সমারহের সঙ্গে জেলার সর্বত্র মনসাপূজা হয়। বেশির ভাগ গৃহস্থের বাড়ি সেদিন উনান জ্বালান হয় না। ওই দিন গৃহস্থের রান্না বন্ধ থাকে বলে এই পূজা অরন্ধন বা রান্নাপূজা নামে বেশি পরিচিত।

কেবলমাত্র নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যেই নয়, বর্ণহিন্দুদের মধ্যে এই পূজার প্রচলন আছে। কোনও কোনও অঞ্চলে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মধ্যে এই পূজাকে ইচ্ছারন্ধন হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের যে কোনও দিন তাঁরা এই পূজা পালন করতে পারেন।

এই মনসাপূজা রান্নাঘরেই সাধারণত অনুষ্ঠিত হয়। রান্নাঘরে উনান পরিষ্কার করে নানা আলপনায় সাজিয়ে সিজ মনসার জল ও ঘটে মনসাপূজা হয়।

আগের দিন নানা উপকরণে নানাবিধ রান্নার পদ তৈরি করে পূজার দিন বাসি রান্না খাওয়া হয়। গ্রামবাংলায় বিশেষ করে এই জেলায় এই পূজার এত ব্যাপকতা গাজন ছাড়া অন্য কোনও পূজায় দেখা যায় না। বাসিরান্না (পান্তা খাওয়ার উৎসব) আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খুব সমারোহ এই উৎসব পালিত হয়। মা মানসার কৃপায় ভাদ্র মাসের পচা গরমেও বাসিরান্না নষ্ট হয় না, এই বিশ্বাস সর্বত্র।

মনসাদেবীর ভোগে ও পান্তা সহ সর্বপ্রকার ব্যঞ্জন, পিঠা, পায়েস দেওয়া হয়। এখানে লক্ষ্য করায় বিষয় এই যে মনসা যদি বৈদিক দেবী হতেন, তা হলে অব্রাহ্মণ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুকুল কিছুতেই দেবীকে অন্নভোগ দেবার সাহস পেতেন না। দেবীর প্রসাদ পান্তার আমানি (জলটা) অনেক রোগ নিরাময় করে বলে বিশ্বাস।

বাংলার লোকসংস্কৃতি ধারায় মনসাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগ থেকে মনসামঙ্গল কাব্যধারা রচিত হয়েছে—এ বিষয় সুবিদিত। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলায় মনসামঙ্গলে কোনও কবি ছিলেন কিনা, তা এখনও আমরা জানতে পারিনি। এ নিয়ে আন্তরিক তথ্য অনুসন্ধান হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে এ জেলার লোক শিল্পীরা মনসার গান গেয়ে থাকেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সুন্দরবনের ঝড়খালির উত্তর পাশে নেতা-ধোপানির ঘাট নামে একটি ঘাট আছে। বর্তমানে এটা সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে ঐ জঙ্গলে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, যা আজও অনুসন্ধানের অপেক্ষায়।

মনসামঙ্গলের কাব্যকাহিনী সবটাই কাল্পনিক কি না বলতে পারব না—স্থানের নামগুলি এখনও বাস্তবে সাক্ষ্য দেয়।

শীতলা : শীতলা মনসার মতনই একজন লৌকিক দেবী তবে বেশি প্রাচীন নয় বলেই মনে হয়।

পুরাণে বৈদিকশাস্ত্রগ্রন্থে শীতলাকে নিয়ে নানা আলোচনা মতামত আছে। এখানে সরস্বতী, লক্ষ্মী মনসার প্রভাব থেকে শীতলা উৎপন্না। কেউ বলছেন ষষ্ঠীর সঙ্গে মিল আছে।

বৌদ্ধদেবী হারিতী ও শীতলার মধ্যে অনেকে মিল খুঁজেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে হারিতীদেবীর পূজা ব্যবস্থা ছিল। সেই সময়ে ডোমপুরোহিতগণ এই পূজা করতেন। এই হারিতী ও শীতলা উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী। যদিও হিন্দু শাস্ত্রের শীতলা মূর্তি ও হারিতি মূর্তি ভিন্ন। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি লিখেছেন—"শীতলা পণ্ডিতগণের শীতলা করচরণহীনা, সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ বা ধাতুখচিত ব্রণ চিহ্নাঙ্কিতা মুখমণ্ডল মাত্রাবিশিষ্ঠ প্রতিমামাত্র। ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের দেবতা বলা যায়.........................।"

বৈদিক শাস্ত্রীয় দেবী শীতলা নানা পথ ঘুরে শাস্ত্রীয় মর্যাদা পেলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—"পৌরাণিক ষষ্ঠীদেবী কিংবা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিতই হারিতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নেই।......অতএব মনে হয় বৌদ্ধ হারিতী হইতেই পরবর্তী হিন্দু পুরাণের জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সাথে তাঁহার কোনো সম্পর্ক নেই।" (বাংলার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস— পৃঃ ৬৫৭)

শীতলার ধ্যান থেকে তার মূর্তির বিবরণ পাওয়া যায়—
"শ্বেতাঙ্গীং বাসভস্থাং করযুগল বিলসম্মার্জনী পূর্ণকুম্ভাং
মার্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতয়ং জলং তাপশান্তে ক্ষিপন্তীম্।
দিগ্বস্ত্রাং মুগ্নিসূর্পাং কনকমণি গণে ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং
বিস্ফাটাদ্যুগ্রতান প্রশমনকারী শীতলা ত্বাং ভজামি।

শীতলার বাহন গর্দভ। মাথায় কুলা, হাতে ঝাঁটা, কাঁধে জলপূর্ণ কলসি—

ঝাঁটা ও কুলা দিয়ে রোগজীবাণু দূর করেন।

বসন্ত রোগের নিরামক দেবী হিসাবে লৌকিক দেবী শীতলা জেলার কেবলমাত্র পল্লী এলাকায়ই নয় শহরাঞ্চলের বহু স্থানে শীতলা পূজার প্রচলন আছে।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতলার জাত পূজা (জাগরণ) অনুষ্ঠিত হয়।

শীতলার মাহাত্ম্য নিয়ে লোককবিরা নানা পালাগান, পাঁচালি গান রচনা করেছেন।

ব্রতকথা : "ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপ। আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাট্যে-নৃত্যে"—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাংলার ব্রত (বিশ্বভারতী প্রকাশনা) গ্রন্থে উক্ত মন্তব্য করেছেন।

ব্রত নিজ নিজ মনস্কামনার স্বরূপ—কোনও ধর্ম তাকে বেঁধে দিতে পারেনি পরবর্তীকালে অনেক ব্রতই শাস্ত্রীয় তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন—ব্রতের মধ্যেও অনেক লোকদেবদেবী যুক্ত হয়েছেন।

ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙলার ইতিহাস গ্রন্থে ব্রত উৎসব নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় জানা যায় যে ব্রত উৎসব প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় থেকে সুপ্রচলিত ছিল। আর্য ব্রাহ্মণ বা এদেরকে ব্রাত্য বলে অভিহিত করেছেন, ব্রাত্য বা পতিত। অনার্যদের ব্রত আচার, স্ত্রী-আচার সমাজজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

জেলার প্রচলিত কিছু 'ব্রত কথার' তালিকা

(ক) লক্ষ্মীদেবীভিত্তিক ব্রত
(১) ভাদ্র মাসে লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথা
(২) কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথা
(৩) কার্তিক মাসে লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথা
(৪) ক্ষেত্রব্রত কথা
(৫) পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথা
(৬) চৈত্রমাসে লক্ষ্মীর ব্রতকথা
*(৭) ধান কাই—পান কাই

*কথাটা মনে হয় হবে ধান কই পান কই—এ ব্রত পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার আছে, কিন্তু কোথাও লিখিত পাইনি।

ষষ্ঠীদেবী ও তাঁর ব্রত তালিকা

ষষ্ঠীদেবীকে নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা সম্ভব হল না বলে এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে ষষ্ঠীদেবীর জনপ্রিয়তা কম। ষষ্ঠীদেবী গ্রামবাংলার বিশেষ করে এই জেলার জনপ্রিয় ও বহুল পূজিতা লৌকিক দেবী। প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকেই ষষ্ঠীদেবী মানব প্রজননের প্রতীক। তাই ব্রতকথার ভিত্তিমূলই লক্ষ্মী ও ষষ্ঠী দেবী। প্রাক্-বৈদিক যুগের পোড়ামাটির টেপা পুতুল শিশু কোলে মা যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি প্রাচীন ধারায় পল্লীবধূরা চালবাটা (পিটুলি) হলুদবাটা, গাছের পাতা বেটে কাঠ-কয়লা-সিঁদুর দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ, কুবের, ষষ্ঠী তৈরি করে ব্রত-আচার পালন করেন। এই ধারাটি লৌকিক ব্রতকথার ষষ্ঠী কবে কিভাবে শাস্ত্রীয় দেবী হয়েছেন সে বড় ইতিহাস, যা আলোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

ষষ্ঠীর ধ্যান—
ওঁ গৌরাভাং দ্বিভুজাং ষষ্ঠীং
নানালঙ্কার ভূষিতাম। সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্নাং
পীনোন্নত পয়োধরাম।। দিব্য বস্ত্র পরীধানাং
বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্। প্রসন্ন বদনাং
ধ্যায়ে জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদম—

দেবী গৌরবর্ণা, দুটি হাত নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা। বাম ক্রোড়ে একটি শিশু। ষষ্ঠীদেবীকে নিয়ে জেলার ব্রত তালিকা—

(১) অরণ্যষষ্ঠী (২) লটন ষষ্ঠী (৩) চাপড়া ষষ্ঠী (৪) দুর্গা ষষ্ঠী (৫) মূলা ষষ্ঠী (৬) পাটাই ষষ্ঠী (৭) শীতল ষষ্ঠী (৮) অশোক ষষ্ঠী (৯) নীল ষষ্ঠী।

দেবীচণ্ডীকে নিয়ে প্রচলিত ব্রত তালিকা

(১) বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী (২) হরিষ মঙ্গলচণ্ডী (৩) জয়মঙ্গল চণ্ডী (৪) কুলুই (কুলি) মঙ্গলচণ্ডী (৫) সঙ্কট মঙ্গলবারের ব্রতকথা (৬) সুয়ো-দুয়োর ব্রতকথা (৭) মঙ্গল সংক্রান্তির ব্রতকথা (৮) নাটাই চণ্ডীর ব্রতকথা।

কুমারী মেয়েদের ব্রতকথার তালিকা

(১) শিবব্রত (২) পুণ্যি পুকুর (৩) দশ পুত্তল (৪) হরির চরণব্রত (৫) অশ্বত্থপাতা ব্রতকথা (৬) গোকুল ব্রতকথা (৭) পৃথিবী ব্রত (৮) যমপুকুর ব্রত (৯) সেঁজুতি ব্রত (১০) তুষ-তুষলী ব্রত.....প্রভৃতি।

বিবাহিতা (এয়ো) মহিলাদের ব্রততালিকা

(১) এয়ো সংক্রান্তির ব্রত (২) ফল গছানো ব্রত (৩) গুপ্তধন ব্রত (৪) মধু সংক্রান্তির ব্রত (৫) নিৎ সিঁদুর ব্রত (৬) সন্ধ্যামণি ব্রত (৭) রূপ হলুদ ব্রত (৮) অক্ষয় বট ব্রতকথা (৯) অক্ষয়কুমারী ব্রতকথা (১০) অক্ষয় সিঁদুর ব্রত (১১) সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রতকথা প্রভৃতি।

এছাড়া রীল (রাং দুর্গা) দুর্গা, মৌনী অমাবস্যা জিতাষ্টী—বারমেসে অমাবস্যা—মনসার ব্রতকথা—ইতুর ব্রতকথা—শিবরাত্রির ব্রত, ও বিপত্তারিণী ব্রত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ব্রত, জামাইষষ্ঠীর ব্রত।

প্রত্যেক ব্রতে কথা আছে। এ কথা লোককাহিনী। জেলার বহুল জনপ্রিয় ইতুর ব্রত ও বিপত্তারিণী ব্রত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইতু ঃ বহু প্রাচীনকাল থেকে—কেবল প্রাচীন বা বলি কেমন করে সভ্যতার শুরু থেকেই সূর্যকে দেবতাজ্ঞান করে পূজা বা স্তব প্রচলিত ছিল। সূর্য মানবজীবনের সুখদুঃখে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে "মিত্র" নামে এক দেবতার উল্লেখ পাই যিনি "অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণো" এই শ্রুতিবাক্যকে ভিত্তি করে সায়নাচার্য মিত্রকে দিনের দেবতা ও বরুণকে রাত্রির দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর হিন্দু দেবদেবী, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে বলেছেন—"সূর্যরূপী মিত্র হেমন্তে সর্বজনের মিত্ররূপে আবির্ভূত। ফসল ঘরে ওঠার কাল হেমন্ত। তাই এখনও ব্যঙ্গালার পল্লীতে অগ্রহায়ণ মাসে মিত্রপূজা বা ইতুপূজার ব্যাপকতা ঘরে ঘরে।"

একটি মাটির সরায় [illegible] [illegible]র সঙ্গে হিমচে, কলমি—ক্যাজরা—ধান প্রভৃতি [illegible] ইতুর ঘট পাতা হয়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিব[illegible] (মেয়েরা)—উপবাস থেকে ইতুর ব্রতকথা শুনে ঘ[illegible]স ভঙ্গ করেন এবং ওইদিনে নিরামিষ এক অন্ন [illegible]

ইতুর কথা—সেই উম[illegible] সর্বজনবিদিত। ইতুর প্রণাম—

অষ্ট চাল অষ্ট দূ[illegible] থুয়ে
শোনরে ইতুর ক[illegible] হয়ে।
ইতু দেন বর
ধনে ধান্যে দৌ[illegible]তার ঘর।

ব্রতকথায় কিন্তু ধনস[illegible]র প্রজননের আকুতি দেখতে পাই।

বিপত্তারিণী ব্রত ঃ [illegible]পুর থানার রাজপুরে বিপত্তারিণী চণ্ডীর মূর্তি ও মন্দি[illegible]ালবদনা, সিংহবাহিনী, বসন পরিহিতা, আলুলায়িত [illegible] চতুর্ভুজা—নিচের বাম হস্তে ত্রিশূল, উপরের বাম হস্তে খড়্গ, নিচের ডান হাতে বর এবং উপরের ডান হাতে অভয়মুদ্রা। দেবীর হাতে নরমুণ্ড বা গলায় নরমুণ্ড মালা নেই।

দেবীর এই রূপ কালী ও দুর্গার মিশ্রিত রূপ।

বিপত্তারিণীর একক মন্দির জেলায় খুবই কম। পল্লীর মেয়েরা নিকটবর্তী দেবী থানে গিয়ে এই ব্রত পালন করেন।

সম্প্রতি এই ব্রত খুব ব্যাপকতা পেয়েছে। আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ার পর দশমীর মধ্যে শনি-মঙ্গলবারে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ রকমের ফলফুল ও পূজার উপকরণ দিয়ে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি গ্রন্থিযুক্ত লাল ডোর (সুতা) পুরুষরা ডান হাতে এবং মেয়েরা বাম হাতে বাঁধেন। দুর্গা সকল দুর্গতিনাশ করেন এই জ্ঞানে দুর্গারূপেই পূজিতা হন।

অনেক অনুসন্ধান করেও ১৩টি ফল, ১৩টি সুতার গ্রন্থির রহস্য জানতে পারিনি। ব্রতকথা—রাজার পত্নীর সঙ্গে চর্মকারের পত্নীর বন্ধুত্ব। চর্মকার পত্নীর নিকট গোমাংস দেখার লোভ, চর্মকারের পত্নীর গো-মাংস রানীর ঘরে দিয়ে আসা—সেই কথা রাজার কানে গেলে রাজা-রানীর কাছে জানতে চায় কি আছে তোমার ঘরে—যদি সত্য গো-মাংস থাকে তাহলে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেব। রানী এই বিপদে দুর্গাকে স্মরণ করেন এবং বিপত্তারিণী ব্রত করার প্রতিশ্রুতি দেন। দুর্গা ওই বিপদ থেকে রানীকে উদ্ধার করেন এবং গো-মাংসর ঝুড়িটি ফলের ঝুড়িতে রূপান্তরিত হয়।

বাঙলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে যে মূল্যবান কাজ দীনেশ সেন, গুরুসদয় দত্ত, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য করে গেছেন তার মধ্যে ২৪ পরগনার সংগ্রহ ও কাজ আংশিকভাবে আলোচিত হয়েছে। বেশির ভাগটাই পূর্ববঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গের আলকাপ-ছৌ-গম্ভীরা-বোলান এমনি কি রায়বেঁশে নিয়ে কিছু তথ্য ও আলোচনা আছে, কিন্তু চব্বিশ পরগনার সংগ্রহ নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ডঃ ভট্টাচার্যের পরবর্তীকালে বাঙলার লোকসংস্কৃতি নিয়ে যে কাজ হয়েছে বা হচ্ছে তার প্রায় সবটাই ডঃ ভট্টাচার্যের কাজের উপর নির্ভরভিত্তিক হওয়াতে ২৪ পরগনা, বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধিকাংশই অনুপস্থিত। সেই হিসাবে পশ্চিম বাংলার লোকসংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি।

পরবর্তীকালে প্রসাশনিক জেলাভিত্তিক তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ গঠিত হলে আশির দশকে পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিচর্চা তৃণমূলে নিয়ে যাবার জন্য কাজ শুরু হয়েছিল। আগে এটা ছিল না। তখন পশ্চিম বাংলার লোক-উৎসবে জেলার তরজা, ও পুতুলনাচ দৃষ্ট হত। যেন ওর বাইরে আর কিছুই নেই।

বর্তমানে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগগুলি উদ্যোগী হয়ে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি এবং গুণী লোকশিল্পীদের খোঁজ নিচ্ছেন। কারণ, বিভাগীয় লোক-উৎসবগুলিতে যেন জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতার আভাস পাই। কেবল জেলা লোক-উৎসবই নয়, বিভাগীয় ও রাজ্য লোক-উৎসবের গুরুত্ব অনেক।

আগে এমনটি ছিল না। তখন তো একটা পুতুলনাচ, একটা তরজার দল পাঠিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত। তরজা কেমন হল বা পুতুলনাচ প্রশংসা পেল কিনা খোঁজ নেবার প্রয়োজন ছিল না। জেলাভিত্তিক লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের সমস্যা ও প্রসার ঘটানো নিয়ে আলোচনা

প্রাচীন বনবিবির থান *ছবি : কালীকানন্দ মণ্ডল*

বর্তমান সরকারের সাধু চিন্তাপ্রসূত। কৃষিজীবী মানুষের সার্বিক উন্নয়নের এই বিভাগটি জেলার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত ছিল। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের এই উদ্যোগ যাঁদের শ্রম চিন্তা পরিকল্পনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক-সংস্কৃতিচর্চায় নতুন উপাদানগুলি (গাজন—পালাগান বনবিবি-পাঁচালি প্রভৃতি) আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে—সেই গুণী ব্যক্তি সর্বজনশ্রদ্ধেয় লোকশিল্পীদের আত্মজ সুধী প্রধান ও মানিক সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য।

লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলি বেশির ভাগ এসেছে লৌকিক দেবদেবীর পূজা-পার্বণ উৎসবকে কেন্দ্র করে। লোকনাট্য-লোকগীতি-পালাগান-পাঁচালি গান-তরজা, পুতুল নাচ—সবই দেবদেবীকে নিয়েই ছিল। জেলার পল্লী কবিরা দেবদেবী বন্দনাই নয়, সামাজিক নানা সমস্যার দিক্‌গুলি তুলে ধরে সমাজসংস্কারের দায়বদ্ধতাকে পালন করে চলেছেন। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা নিয়ে আলোচনা করলে আরও পরিষ্কার হবে।

গাজন ঃ গাজন জেলার বৃহৎ লোক-উৎসব। এই উৎসব ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে আবার শিবেরও প্রথম গাজন শুরু হয়েছিল ধর্মঠাকুরকে নিয়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর "বেনের মেয়ে" রচনায় যে গাজনের উল্লেখ করেছেন তার সময়কাল ১০৫৭ খৃস্টাব্দ ৯২২ শকাব্দ। উৎসবের দিন বৈশাখী পূর্ণিমা। আজও এ জেলায় বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজা-গাজন-চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। গাজন শব্দটা এসেছে গর্জন থেকে। এ তথ্য বহুজনস্বীকৃত। এ গর্জন কাদের গর্জন? আমরা লৌকিক দেবদেবী আলোচনায় দেখেছি যে ধর্মঠাকুর নিম্নশ্রেণীর বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত দেবতা। যা আগে বৌদ্ধ সমাজের বা তারও আগে অনার্য আদিম মানবের সূর্য দেবতা।

এই গর্জন কি সেই দাসেদের—সেই ক্রীতদাস যারা দিনের পর দিন অত্যাচার আর অত্যাচারে জর্জরিত। যাদের অভিযোগ শোনার মতো গগনের সূর্য ছাড়া সমাজে আর কেউ ছিল না। এপ্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান প্রয়োজন।

'বেনের মেয়ে' রচনায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গাজনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিছুটা তুলে দিলাম।

"গাজন যাত্রা। গাজন প্রায় এক মাইল লম্বা। এ মিছিলে সাতগাঁয়ের রাজা রূপা বাগদি আছে—আছেন বাজন্দার ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া নিয়ে। বাজানদারদের জাত—মুচি। সৈন্য-হাতি, ঘোড়া, বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা, রাজা—তার পাত্র-মিত্র পরিবার—সঙ্গে সঙ্গে মহিষীরা আছেন, আছেন রাজকন্যারাও।........ইহার পর কয়েকখানি গরুরগাড়ীতে সঙ, বানর-রাক্ষস-যক্ষ-কিন্নর, মারসেনা, মারকন্যা..... তাহার পর কতকগুলি চৌপালায় নাটক। বিশেষ বেশন্তর নাটক—এনাটক দেখলে এখনো তিব্বতীয়গণ উন্মত্ত হয়ে উঠে তখনকার বাঙালীদের তো কথাই নাই। এ দেশেরই নাটক তাদের
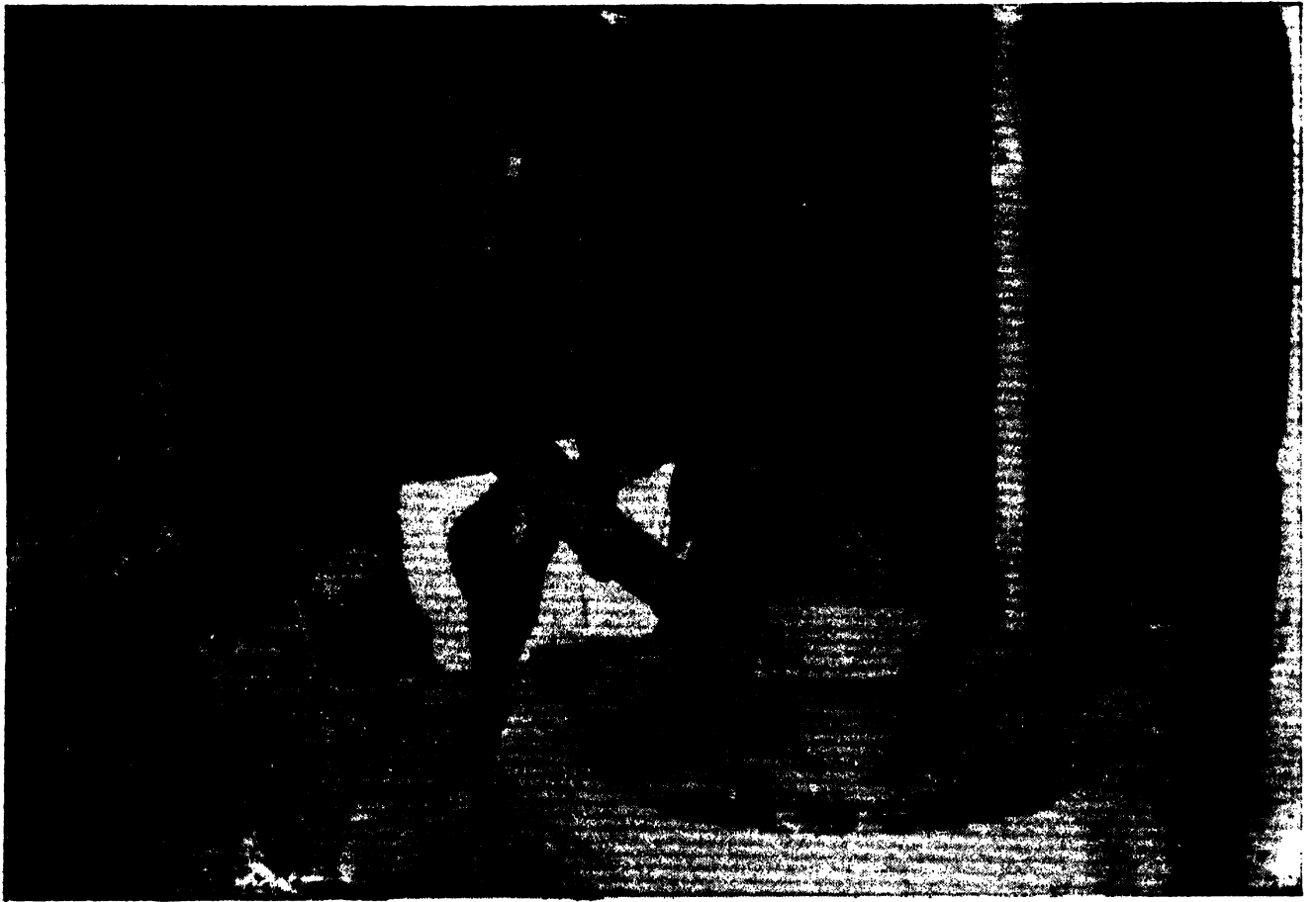
সুন্দরবনের মৃৎপাত্র কারিগর *ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল*

দেশেই লেখা তাদের দেশের লোকই সাজে.....।" এ নাটকের ধারা নিয়েই জেলার লোকনাট্য গাজন বা দেলের গান।

ধর্মঠাকুরের এই গাজন কবে থেকে যে শিবের গাজনে চলে এসেছে, সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

জেলার শিবের গাজন [illegible] ও বহুল প্রচলিত হলেও ধর্মঠাকুরের বেশ কিছু থা[illegible] খুব সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গাজনের [illegible]ন্যাস-ঝাঁপ চড়ক থাকে। কুলতলি থানার ৩৬নং লা[illegible]নে মানসিক করে সন্ন্যাস নেওয়ানো হয় হাজার হাজা[illegible] মালিকরা তাদের গরুকে নিয়ে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ, স[illegible] দেওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন করেন।

ডঃ আশুতোষ [illegible] পার্বণ সঙ্গীত রচনায় বলেছেন—"চৈত্র মাসে ব[illegible] গাজন নামে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বাঙ্গা[illegible]য় উৎসব বলিয়া উল্লেখ করা যায়।"

গাজন উৎসবটি [illegible] চৈত্র [illegible]পী জেলার পল্লী অঞ্চলে প্রতিটি পরিবারে এই উ[illegible]ড় লক্ষ্য করা যায়। কেউ পুরো চৈত্র মাস—কেউ [illegible]—[illegible] বা ৫ দিন এই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন।

প্রায় প্রতি গ্রামে বা পাড়ায় অস্থায়ী শিবের থান তৈরি হয়—এই থানে চৈত্রের শেষ ৪/৫ দিন পূজা-ঝাঁপ-গাজন গান হয়। সন্ন্যাস নেওয়া প্রথা সকলকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক গোত্রীয় করে দেয়। যদি কোন সন্ন্যাসী (যে কোন এলাকার) এই সন্ন্যাস পালনের সময় মারা যান তা হলে সকল সন্নাসী একদিন মৃতের অশৌচ পালন করেন। এই আত্মীয়বন্ধন সমাজজীবনে এক নবপ্রেরণা জোগায়। সন্ন্যাস গ্রহণের কতকগুলি কেন্দ্র আছে, যার যে রকম সুবিধা বা মানসিক মাফিক সেই সব কেন্দ্রে গিয়ে সন্ন্যাস নেন। কেন্দ্রগুলি মাহাত্ম্যপূর্ণ শিবমন্দির যেমন—কেশবেশ্বর মন্দির (মন্দিরবাজার), বানচাপড়া শিবের মন্দির, বড়াশির অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দির, জয়রামপুর শিবের মন্দির আরও ছোটখাটো বহু মন্দির। সন্ন্যাস নেওয়ার দিনগুলিতে মন্দিরগুলিতে প্রচুর লোক সমাগম হয়, মেলা বসে। যিনি সন্ন্যাস নেবেন তিনি উপবাস থেকে ওই মন্দিরের পুকুরে স্নান করে ভেজা কাপড়ে কেউ মন্দির প্রদক্ষিণ করেন কেউ বা মানসিক মতো দণ্ডি কেটে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত যান। (দণ্ডি কাটা—পুষ্করিণী থেকে উঠে ভূমিতে শুয়ে পড়ে যতদূর পর্যন্ত হাত যায়, সেখানে হাত দিয়ে দণ্ডি কাটা হয় আবার উঠে ওই দাগ থেকে শুয়ে হাত বাড়িয়ে দণ্ডি কাটা হয়) পূজা দিয়ে উত্তরী গ্রহণ করা হয় (উত্তরী—সাদা সুতোর গাছি—গলায় মালার মতো পরা হয়)। পুরুষরা নতুন কাপড় গামছা—মেয়েরা শাড়ি জামা

সুন্দরবনে নৌশিল্প অন্যতম জীবিকা *ছবি : অমিমিত্র ঘোষ*

গামছা পরেন—অনেকের হাতে থাকে বেতাসন, কারো কারো লোহার ত্রিশূল আর ভিক্ষাপাত্র মাটির সরা। "বাবা তারকেশ্বরের সেবা লাগে—মহাদেব বম্ বম্ বম্"-বলে চলে ভিক্ষা সংগ্রহ গৃহস্থের বাড়ি থেকে। এই ভিক্ষালব্ধ অন্ন নিশুতি রাত্রে ফুটিয়ে খাওয়া—কোনও শব্দ কানে গেলে খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। এই কঠিন ব্রত পালন কোনও বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা মনে করিয়ে দেয় না। গাজন কিছুতেই শিবদুর্গার বিবাহ অনুষ্ঠান হতে পারে বলে মনে হয় না। এ ছাড়াও আছে বাণ ফোঁড়া—আগুনের উপর হাঁটা—বঁটি ঝাঁপ.....ইত্যাদি।

এ গেল গাজনের ধর্মীয় দিক্—আর আছে সাংস্কৃতিক দিক—গান-নাচ-অভিনয় দিয়ে গাজন ভাটা। এই গাজন ভাটাকে দেল-ভাটা বা দেলের গান বলে। গাজন আসলে লোকনাট্যের এক প্রাচীন ধারা (ফরম)। গাজন উৎসবে গ্রামে বা পাড়ায় অস্থায়ী শিবের থান তৈরি করা হয়। তার পাশেই গাজন গানের আসর পাতা হয়। প্রতি গ্রামে দেলের গানের অস্থায়ী দল গড়ে ওঠে—ফাল্গুন মাসের প্রায় প্রথম থেকেই দল গঠন ও মহড়া চলে। তার পর দেল ভাটা।

গাজন ভাটা বা দেল ভাটা প্রথামাফিক চলে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। একটি গাজন গানের দল উৎসবের ৪/৫ দিন ৬০/৬৫টি আসরে গান করেন। টাকা-পয়সার বায়নায় নয়। যে গ্রামের গাজন দল এ গ্রামে এসে গাজন ভেটে গেল—ঐ গ্রামের দল বিনিময়ে ওদের গ্রামে গাজন ভাটবে। প্রতি আসরে একটি খাতা থাকে, গাজন দলের হাজিরা নথিভুক্তির জন্য, যারা যারা গাজন ভেটে গেল—এদের কাউকে তো সেই সেই আসরে যেতে হবে। সকালে পান্তা খেয়ে সাজগোজ করে শিল্পীরা বেরিয়ে পরেন গাজন ভাটতে—দলে কম করেও জনাপনেরো লোক থাকে। অভিনয় ও বাজনদার (বাদ্যযন্ত্র—হারমোনিয়াম, তবলা, কাড়া-নাকড়া, কত্তাল, বাঁশি.....ইত্যাদি) ছাড়াও ২/৪ জন গ্রামের লোক থাকে। দুপুরে গ্রামের কাছাকাছি কোনও আসরে এসে পৌঁছলে গ্রাম থেকে ভাত যায়—দুপুরের খাওয়া, কারণ আসরে খেতে দেবার রেওয়াজ নেই। আসরে দেল ভাটার দল এলে আসরকর্তা জল, ভিজান ছোলা, আদার কুঁচি (গলা বসে যায় বলে) বাতাসা, বিড়ি দেওয়া হয়।

শিবের থানে প্রণাম করে শিল্পীরা আসরে যান—সেই সময় যদি অন্য দল আসরে গান করেন তা হলে এই দলকে অপেক্ষা করতে হবে। এইভাবে এই কদিন রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত আসর চলে।

আসরে শিবদুর্গা নির্বাক স্থির চরিত্র। দু'জন শিবদুর্গা সেজে আসরে আসেন—শিবদুর্গাকে দাঁড় করিয়ে চলে শিব বন্দনা—এই বন্দনা চারজন কোথাও ছ'জন শিল্পী অংশ নেন। বন্দনার নমুনা—

বন্দনা

দীনের দয়াল তুমি ওগো নারায়ণ
বিপদের থাক সাথে শ্রীমধুসূদন।
এস মহাদেব, এসো ওগো বিধাতা
প্রণামি তোমায় ওগো মুরারি।
তুমি সত্যের সত্য
করেছিলে দেব সৃজন।
তুমি অসুর করিলে গো নিধন, একই কথায় হর-হরি।
প্রণামি তোমায় ওগো মুরারি।
আয় আয় আয়রে সবাই
হরহরি এসেছে আজ আনন্দের আর সীমা নাই।
চৈতে গাজন দল, শিবের মাথায় জল, ভক্ত ঢালে
সন্ন্যাসীরা গায়, বেসুর বলে তাই, বাবার বোলে
করি একমন পূজিব চরণ ভক্ত দলের এই শুধু ডাক।
আনন্দেরই রোল, বাজা কাঁসী, ঢোল গাজন তলে
স্বপন বলে যায়—গানের সুরে তাই অঙ্গ ঢলে
করি একমন পূজিব চরণ ভক্ত দলের এই শুধু ডাক।।

[তুলসীঘাটা মঙ্গলচণ্ডী গীতিনাট্য গাজন সংস্থা বন্দনা থেকে নেওয়া]

বন্দনার পর নানা ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে অভিনয় গানে নৃত্যে গাজন ভাটা চলে। নিজেদের সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার নাট্যরূপ—যা গানে, অভিনয়ে ও নৃত্যে দর্শকমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে।

প্রতি বছরই নতুন নতুন ঘটনা ও ছোট ছোট কাহিনীর অবতারণা হয়, গানও তাই। এ বছরের গাজনে যা সৃষ্টি হল আগামী বছরে তা থাকে না নতুন সৃষ্টি হয়।

এই ধরনের অস্থায়ী ছোট ছোট গাজন দল জেলায় (জয়নগর, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, কুলপি, কাকদ্বীপ, সাগরে) পাঁচ হাজারেরও বেশি। গাজনের এই ঘটনাবহুল কাহিনীই নিম্নবঙ্গের এই অংশের সমাজদর্পণ বললেও ভুল বলা হবে না। লোকনাট্যের চরিত্র বজায় রেখে তাৎক্ষণিক সংলাপ গঠনের দক্ষতাই গাজনের মূল বৈশিষ্ট্য। তাই গাজন লোকনাট্য।
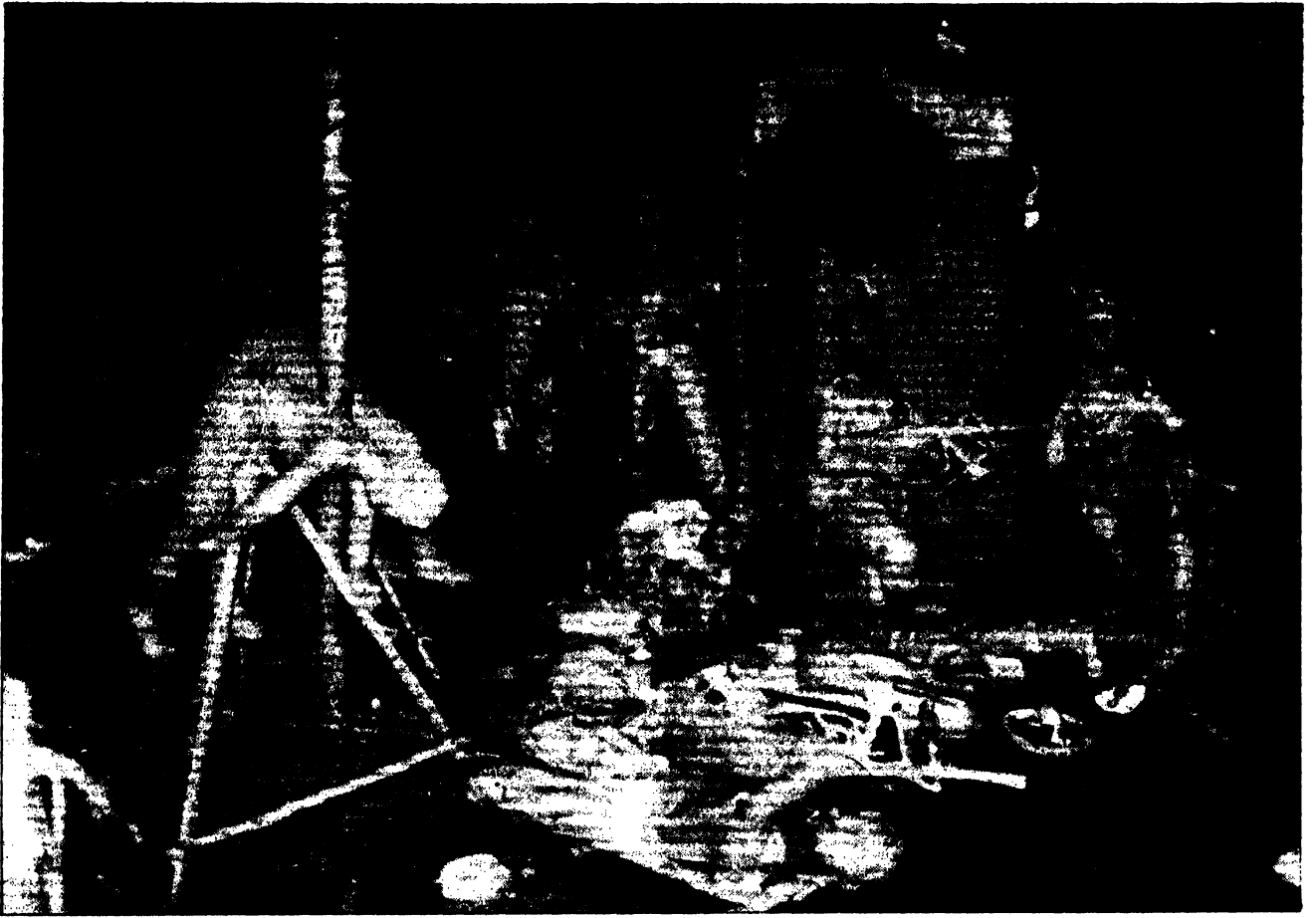
মন্দিরবাজার থানার গোপালনগর গ্রামে মূর্তিশিল্পী (পটুয়া) *ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল*

গাজন জনপ্রিয়তার শীর্ষে—এত ব্যাপকতা লোকসংস্কৃতির কোনও উপাদানেই নেই। দু'দশক আগে থেকেই গাজন অনুষ্ঠানে মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। ইমাম যখন দুর্গা সেজে—রহমান যখন [illegible] সেজে দল ভাটেন—তখন কোথায় থাকে সাম্প্রদায়িকতা—[illegible] তখন মিলে মিশে একাকার—এই তো সং[illegible] নিজেই গাজন দল ভাটেন—অভিনয় করেন—[illegible] র্তোজাগান লিখে খুবই জনপ্রিয়।

গাজনে সবই পুরু[illegible] পুরুষরা স্ত্রী সাজে। আগেই বলেছি গাজন লোকনাট্য [illegible] কাহিনী দিয়ে গাজনের মালা গাঁথা—একটার সঙ্গে অন[illegible]—কোনওটা দুঃখবেদনার কোনও হাস্যকৌতুকের—[illegible] মুখে রচিত হয়ে নাটকের সংলাপ হয়। লোকজীব[illegible]নী। তাই গাজনের কোনও পাণ্ডুলিপি থাকে না।

তবুও গাজনে অ[illegible]সছে। সাজে-পোশাকে-গানে এমন কি সংলাপেও। পা[illegible] বাদ্যযন্ত্রেও। ঢোল-কাঁসি থেকে হারমোনিয়াম, ফ্লুট, আ[illegible] নাকাড়া, করতাল, ঝাঁজ-জুড়ি ইত্যাদি। পরিবর্তনে জন[illegible] পরিবর্তনের ঝোঁকও বাড়ছে। সৃজন প্রতিভার ধারটা[illegible] গাজনে লোকনাট্যের এই চরিত্র কতদিন বজায় থাকবে জানি না। মুখে মুখে রচিত নাটক জেলায় কেন বাংলাতেই দুর্লভ।

গ্রামের খেতমজুর—শ্বশুর কলেরা রোগে মারা গেছেন—স্ত্রীকে জানাচ্ছে আর স্মৃতিচারণ করছে বারমাস্যার ধাঁচে

"কি বলবো মিষ্টির মা
দুঃখে মরি রে—
কলেরা হয়ে শ্বশুর মারা গেল রে—
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিয়ে যেত শ্বশুর
মুখের সামনে তুলে দিত ফালাফালা তরমুজ।
আবার ফাটা ফুটিতে মধু ঢেলে দিত রে—
কি..........
দুর্গাপূজা কালীপূজা পূজা মালক্ষ্মীর
শ্বশুর বাড়ি পোয়াত কত ঝক্কি
ডাল, ডানলা ফুলকো লুচি ধরে দিত রে....
কি..........
দাওয়া সারা মাটি সারা
হতো হাসের মাংস
শশুর বাড়ী গিয়ে খেতো
এই জামায়ের বংশ.
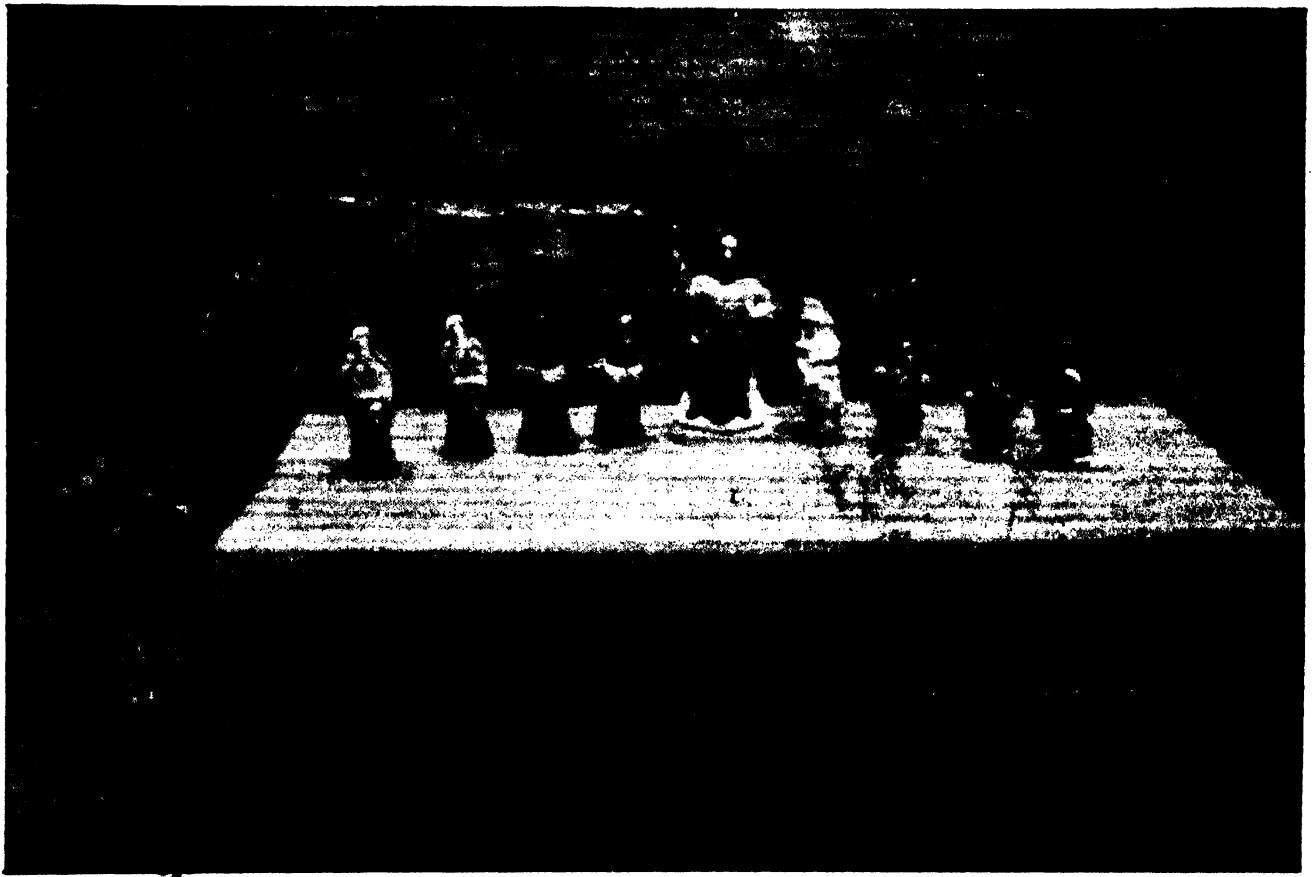
লৌকিক পুতুল শিল্প, পাঁচুগোপাল দাসের সৌজন্যে

চৈত্র সংক্রান্তিতে নতুন পোশাক উপহার দেওয়ার চল ছিল, এখনও আছে।

গাজন গানের কাহিনীগুলিতে চলতি (Current) সমস্যা যেমন হুকার উচ্ছেদ নিয়ে কাহিনী হয়েছে, গানও হয়েছে। স্থায়ী সমস্যা দূরীকরণে—যেমন নিরক্ষরতা—পণপ্রথা—পরিবার পরিকল্পনা—ইত্যাদি নিয়ে সরস কাহিনী কখনও করুণ কখনও বা হাস্যকৌতুকের মধ্যে দিয়ে দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। এইভাবে সামাজিক দায়ভারও পালন করে চলেছে।

পুতুলনাচ ঃ জেলার পুতুলনাচ জনপ্রিয় লৌকিক অনুষ্ঠান। এই পুতুলদণ্ড বা লাঠিপুতুল। এই লাঠিপুতুলের খুব সম্ভব এই জেলাতেই জন্ম। পুতুলগুলিও মানুষ সমান উচ্চতার(man heights)। কবে থেকে শুরু হয়ে ছিল তার কোনও ইতিহাস নেই। ১১৩১ সনের ১৬ বৈশাখ একটি চুক্তিপত্র লিখিত হয় ৮ আনা স্ট্যাম্প পেপারে, তাতে বর্ণনা আছে যে শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র কর্মকার পিতা রামমোহন কর্মকার—জাতি কর্মকার—পেশা—জাতি ব্যবসা সাং—বাজারবেড়িয়া, হাতিয়াগড় থানা—মগরাহাটের নিকট হইতে শ্রীভবসিন্ধু নস্কর পিতা শ্রীমন্ত নস্কর বাজার বেড়ে...সমস্ত পুতুল দলটি (৮০টি নতুন পুতুল-সাজ-সিন্ সহ) বাৎসরিক ৩০ টাকা ভাড়ায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন....ইত্যাদি এই ভারত কর্মকারের পরিবারবর্গ শ্রীপ্রফুল্ল কর্মকার এখনও নিজ দল পরিচালনা করেন। ১১৩১ সনটা ঠিক বলে আমার মনে হচ্ছে না—চুক্তিপত্রের জেরক্স দেখে সালটা ধরা যাচ্ছে না (আবছা)। প্রফুল্ল কর্মকারের পিতা কিশোরী কর্মকার, তাঁর পিতা যদি ভারতচন্দ্র কর্মকার হন, তা হলে কিন্তু সালটা ভুল তোলা হয়েছে (না বুঝে)। আমাদের ধারণা অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুতুলনাচের চলটা শুরু হতে পারে, কারণ ওই সময় এই পুতুল নাচের পুতুলের আদলে কিছু দেবীমূর্তি তৈরির হিসাব পাই—যেমন জয়নগরের জয়চণ্ডী, ধন্বন্তরী কালীমূর্তি।

আড়াইশো বছরের বেশি সময় ধরে এই পুতুলনাচের ধারা চলে আসছে বলে মনে হয়। এখনও জেলার পুতুল সারা ভারতের পুতুলের পাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে—তার প্রমাণ সম্প্রতি সারা ভারত পুতুল নাট্যকর্মশালা যা জেলার ডায়মন্ডহারবারে অনুষ্ঠিত হল। পুতুল তৈরি, পোশাক ও নাচানোর কৌশল নিয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। পালাগুলি বেশির ভাগই পৌরাণিক, বর্তমানে বহু সামাজিক পালা সংযোজিত হয়েছে। সমাজশিক্ষার আধারে, পুতুল নাচ তার সামাজিক দায়ভারও পালন করেছে—সাক্ষরতার কর্মসূচিতেও অংশ নিচ্ছেন।

পালাগান ঃ পালাভিত্তিক নাটক। লোকনাট্য নয়। পালাকার পালা রচনা করেন, নাট্যরূপ দেন—পরিচালনায় অভিনয়ে শিল্পীরা তা উপস্থাপনা করেন—গান বেশি থাকে বলে মনে হয়, নামটা পালা গান। যাত্রাকেও এখানে এখনও যাত্রাগান বলা হয়। পালাগান জেলায় একদিন খুবই জনপ্রিয় ছিল, এখনও কম জনপ্রিয় নয়। যদিও সব পালা সমভাবে জনপ্রিয় হয়নি। প্রায় সব পালাগুলিই লৌকিক দেবদেবী

বা পৌরাণিক কাহিনীকেন্দ্রিক। মনসার পালাগানকে মনসার ভাসানও বলা হয়। মনসার ভাসান গান জনপ্রিয়তার শীর্ষে। পালাগানে আছে শীতলা, চণ্ডী, আছে বনবিবি, মদন রায়ের পালা। গুণাযাত্রা বা গুণাপালা বলে একটা পালার উল্লেখ পাওয়া যায়। তার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাই ব্যাপকতার সুযোগ পায়নি বলে মনে হয়। বনবিবির পালাগানটি এখনও গবেষকদের আকৃষ্ট করে। এই পালাগানটি রচিত হয়েছে সুন্দরবন এলাকার মউল্যে বনজীবী সম্প্রদায়ের অধিদেবতাকে কেন্দ্র করে। মউল্যের বনে মোম ও মধু সংগ্রহ যাদের জীবিকা।

বনবিবির জহুরানামা একটা পাঁচালি যা রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে রচনা করেছিল মোহম্মদ খাতের। এই পাঁচালিকে নাট্যরূপ দিয়ে রচিত হয়েছে বনবিবির পালা বা দুখের পালাগান। কাহিনীটা সংক্ষেপে এইরূপ। মক্কা থেকে আল্লার নির্দেশে বনবিবি ও তার ভাই শা জঙ্গলি ধর্মপ্রচারে ও নিজেকে দেবীরূপ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভাটির জঙ্গলে আসেন (বনবিবি ও তার ভায়ের জন্মকাহিনী আছে পাঁচালিতে—পালাতে ওটা বাদ আছে) প্রথমে ভাঙর শা-র কাছে পরে দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধ—নারায়ণী ও দক্ষিণ রায়ের পরাজয়, পরে সন্ধি। ধনাইমনাই দুই ভাই, দুখে এদের বড় ভাইয়ের ছেলে (যে ভাই মারা গেছে)—মা ভাঙা কোটোর (ধান থেকে চাল তৈরির কাজ) কাজ করে দুখেকে নিয়ে দিন কাটে। এই দুখেকে নিয়ে ধনাইমনাই জঙ্গলে মোমমধু সংগ্রহ করে দেওয়ায় দক্ষিণ রায়ের পূজা না দিয়ে জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়ে মধু, মোম কিছুই পায় না। দক্ষিণ রায় স্বপ্নাদেশ দেয়, দুখেকে বলি দিয়ে দক্ষিণ রায়ের পূজা দিলে তবে মোম, মধু পাওয়া যাবে। দুখেকে দক্ষিণ রায়ের মুখে (এখানে বাঘরূপে দক্ষিণ রায়) দিয়ে সাত ডিঙ্গা মোম, মধু নিয়ে ধনাইরা বাড়ি ফিরলো। এদিকে বাঘের সামনে পড়ে দুখে মা বনবিবিকে ডাকে। বনবিবি এসে দুখেকে রক্ষা করলেন এবং প্রচুর কাঠ, মোম, মধু দিয়ে দুখেকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দেন। এই হ'ল পালার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অভিনয়ে গানে—এবং দুখের প্রতি স্বাভাবিক বেদনাবোধ দর্শকমণ্ডলীকে দারুণ নাড়া দেয়। একই পালা বছরের পর বছর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, কিন্তু জনপ্রিয়তা এতটুকু হ্রাস পায় নি। জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি ম[illegible] ভা[illegible]। জেলার বেশ কিছু দল এই পালা গানের সঙ্গে [illegible]

তরজাগান ঃ জ[illegible] রাতভোর হয়ে যেত এই তরজা গানে—আসর ভা[illegible] [illegible]মাটি তরজার জলুস তেমন আর চোখে পড়ে না। তবু[illegible] [illegible]র তরজার আসরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নামডাক [illegible] [illegible]তা বেতার কেন্দ্রের বাংলার দশটি তরজা দলের মধ্যে [illegible] [illegible]টি দল এই জেলার।

তরজা মূলত প্রশ্নো[illegible] আসর। দু'জন গায়ক একটি ঢোল ও একটি কাঁসি। স[illegible] [illegible]র দল। এ প্রশ্ন করেন ও উত্তর দেন—ও প্রশ্ন ক[illegible] এ [illegible] দেন। সবটাই গানে—অল্প সংলাপও থাকে। প্রশ্নউত্ত[illegible] [illegible]ক হিন্দুর পুরাণ, পৌরাণিক কাহিনী দেবদেবীদের ক[illegible] ঠিক তেমনি আল্লা রসুলের কথা কোরানের কথা, এ[illegible] বাদ যায় না। তাই জেলায় খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীদের [illegible] এখনও তরজার কদর কমেনি। বর্তমানে বেশ কি[illegible] সামাজিক দায়ভারকে স্বীকার করে সমাজসংস্কারমূলক কাজে খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছেন, সাক্ষরতা কর্মসূচিতে তার কিছু প্রমাণ মেলে।

তরজা গান শুরু হয় বন্দনা দিয়ে—দেবদেবী, পিতামাতা, গুরু-নায়েক-শ্রোতৃগুলী বন্দনার পরে শিল্পী পরিচিতি সবই গানে—সূচনা যেখানে যেমন সময় পাওয়া যায় সেখানে সেই সময়ানুযায়ী সূচনার পরে তিন-চারটি প্রশ্ন করে বিপরীত পক্ষকে উত্তর দেবার জন্য আহ্বান করা হয়। যদিও বিপরীত পক্ষ নিজের দলেরই শিল্পী—উনিও বন্দনা দিয়ে শুরু করে নিজের পরিচয়টা দিয়েছেন, পরে এক একে উত্তর দিয়ে আবার কিছু প্রশ্ন প্রথম পক্ষকে করা হয়—এই প্রশ্ন-উত্তর চলটাই তরজা। দু-তিনটি রেষারেষি দলকে আসরে তুলে দিলেই রাতভোর হতে সময় দেয় না।

পাঁচালী ঃ দাদা আর কি আর কি দাঁদা
আরকি আর কি
প্রাণনাথকে নিয়ে
আমি জলে ভেসেছি....................

কৈশোরের স্মৃতি এখনো কানে ধরা আছে, কিন্তু তখন তো ছিল বেহুলার চামরের স্পর্শ লাভের লোভ—পয়সা দিলে (প্রণামি) মাথায় চামরের স্পর্শ, সে পাঁচালি গানের আসর ক্রমে ক্রমে পল্লী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। জেলায় পাঁচালি গানের রমরমা অষ্টাদশ শতক থেকেই বলে মনে হয়, যা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেয়ে এসেছিল। লৌকিক দেবদেবী মাহাত্ম্যই পাঁচালির ভিত্তিসম্পদ—ভক্তি ও শ্রদ্ধা যা লোকমানসে সমাজজীবনের মূল সান্ত্বনা। তার উপর বেঁচে থাকা। প্রকৃতি-নির্ভর এই নিরক্ষর মানবগোষ্ঠীর গাছপালা জড়িবুটি তুকতাক আর দেব ভক্তিই আশা জোগাতো বাঁচার। ঈশ্বর পাটনির মতো সহজ সরল গ্রামবাংলার লোকমানসে "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"র বেশি প্রত্যাশাও ছিল না।

পল্লীবাংলার দৈনন্দিন জীবন বর্ণনা করতে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তার বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"দরিদ্র নিম্নবিত্ত সমাজে বাঙালির সনাতন দুঃখ কষ্ট লাগিয়াই ছিল; হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্যই উপবাস, অথচ ব্যাঙের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্ষুধায় শিশুদের চোখ ও পেট বসিরা গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত শীর্ণ, ভাঙা কলসিতে একফোঁটামাত্র জল ধরে, পরিধানে জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র, সেলাই করিবার মত সূঁচও নাই ঘরে, ভাঙা কুঁড়েঘরের খুঁটি নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির দেয়াল গলিয়া পড়িতেছে—এই সব ছবি সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লভ নয়।"......... ....
....

"দারিদ্র্যাভিশাপক্লিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোধ হয় ছিল গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির পার্বণ, ব্রত, সম্পন্নতর গৃহের পূজা উৎসব এবং দরিদ্রতর স্তরের নানা আদিম কৌমগত যৌথ নৃত্য, গীত ও পূজা। এই সব আশ্রয় করিয়াই মাঝে মাঝে গ্রামের সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের দৈনন্দিন দারিদ্র-দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন।"

তাই পাঁচালির আসরগুলিও থাকতো জমজমাট! বেহুলার বিবাহ রাতের বৈধব্যের কষ্ট গ্রাম্যরমণীর চোখে জল ফেলিয়েছে আবার স্বামীপুত্রের কল্যাণ কামনায় গলবস্ত্র হয়ে সভক্তি প্রণাম জানিয়েছেন দেবদেবীকে।

পাঁচালির জনপ্রিয়তার তালিকায় মনসা, শীতলা, চণ্ডী যেমন প্রাচীন তার পাশে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে বিভিন্ন মিশ্র সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক ভাবনা থেকে যেন পাঁচালির জোয়ার এসেছিল। তবুও মনসা, শীতলা, চণ্ডীর পাঁচালি এতটুকু জনপ্রিয়তা হারাইনি। বনবিবি, মানিক পীর, সত্যপীর, মদন রায়, বাবাঠাকুর, বাশুলী প্রায় সব লৌকিক দেবদেবীর পাঁচালি ছিল, তার মধ্যে জেলায় বনবিবির পাঁচালি (গোসাবা, বাসন্তীতে), মানিকপীর—মদন রায়ের পাঁচালির এখনও বহুল প্রচলন আছে

মদন রায়ের পাঁচালির কিছু অংশ—

মদন রায় তখন মেদনমল্লের রাজা—খাজনার অর্থ সময়মত দিতে না পারায় মোকদ্দমা হয়—মদন রায় নবাবের শায়েস্তা খাঁর রোষে পড়েছেন—তখন মোবারক গাজি মদন রায়কে উদ্ধার করেন। এই মদন রায়ের পালা নামে আলাদা পাঁচালি আছে। এই পাঁচালি থেকে নাট্যরূপ দিয়ে মদন রায়ের পালা বা গাজি সাহেবের পালা রচিত হয়েছে। এই পালায় গাজি নিজ ক্ষমতা জাহির করে জানাচ্ছেন—(এই পাঁচালি ১৩১৩ সনে সীতাকুণ্ড গ্রামের কলিমুদ্দিন গায়েন রচিত)।

তব আশীর্ব্বাদে তাহার কি ফল হইবে।
গাজি বলে মোকদ্দমা ফতে হয়ে যাবে।
....
....
মদন রায় বলে আমার ভাগ্যে এই ছিল।
মেদুনমল্লের রাজা হয়ে পলাইতে হলো।।

(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা)

"গোইলে গান" পাঁচালি ধাঁচে পুঁথি ছিল। জেলায় গোইলে গানের এক সময় ব্যাপক প্রচলন ছিল। আর ছিল মানিক পীরের পাঁচালি—গোইলে গানের যে পুঁথি পেয়েছি, তা আঞ্চলিক কবি শিরোমণি সরকার রচিত—

কপিলা গাইয়ের মর্তে আগমন নিয়ে এই পাঁচালি, গোরুর প্রয়োজন, তাকে যত্নে রাখা দুধের গুণাগুণ প্রচারই পাঁচালির লক্ষ্য।

অতএব সর্বজন শুন দিয়া মন
কপিলার দুঃখের কথা করিব বর্ণন
মর্তে কোন গরু না থাকায় দুধ, মাখন ঘি কিছুই নেই।
ঘৃতবিনা কোন কাজ না হয় কখন।
মর্তে না করিতে পারে দেব আরাধন।।
....

শিব কপিলার কাছে গিয়ে তাকে মর্ত্যে যাবার জন্য অনুরোধ করল।

কপিলারে বলে শিব করি অনুনয়।
মমাদেশে ধরাতলে যেতে আজ্ঞা হয়।।
কপিলা বলে প্রভু যেতে না পারিব।
মর্তের দুর্দশা আমি কেমনে সহিব।।

কপিলাকে রাজি করানোর জন্য দেবতারা অনুরোধ করেছেন তখন কপিলা বলছেন—

কপিলা বলেন এই মর্ত্যে যেতে পারি।
সকল দেবতা যদি থাকে দেহো পরি।।

গাভীতে দেবতাদের আস্থা—এ বিশ্বাস আজও পল্লীবাসীর মনে জাগ্রত—তাই গরু নিয়ে কত ব্রত, কত পুজো।

মানিক পীরের পাঁচালিও বহুল প্রচলিত ছিল—লৌকিক দেবদেবীতে তার আলোচনাও করা হয়েছে। পাঁচালিতে যা পাওয়া যায়—বেহেস্তের খোদা ঘোষণা করলেন

"—সেই জনে দেব আমি দুনিয়ার ভার।
কলিকালে মানিক হবে অবতার।।"

মানিক পীর অবতার হয়ে এলেন—লৌকিক দেবদেবীতে আমরা তাঁকে পশু ও শিশুরক্ষক দেবতা হিসাবে পেয়েছি। মুসলিম ফকিররা এই পাঁচালি গেয়ে গেয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হাতে চামর ও ধুনুচি যা ধুনো দিলে সুগন্ধী ধোঁয়া বেরুতো। মুখে মানিক পীরের পাঁচালিগান—চামর দিয়ে নিয়োগের প্রার্থনা—গৃহস্থকে সাহস জোগাতো। তাই সবাই সশ্রদ্ধ আপ্যায়ন ও যথাসাধ্য চাল, পয়সা, কাপড় দিত।

ভিক্ষা নাহি লিব মাতা তোমার বসরে
থোড়া দুগ্ধ দাও মাতা খেয়ে যাব ঘরে।
দুই দুধ নাই মানিক বলি গো তোমারে,
আছে একটি বাঁজা গাই যাও না দুইয়ে।
কেমন সত্যবাক্ ফকীর দেখিব তোমারে।
বাঁজা গায়ের দুগ্ধ আজ খাইব দুইয়ে।

বিবিধঃ "নামগান" বর্তমানে জেলায় ব্যাপক চলন এবং চাহিদাও খুব। চারজনের একটি গানের দল। দু'জন গান করেন দু'জন বাদ্যযন্ত্রে। খোল—হারমনিয়াম। পাঁচজনার দল হলে কর্তাল থাকে। গানের বিষয় পৌরাণিক ঘটনা—মহাভারতের কথা থাকে—কিন্তু কেন জানি না রামায়ণের কোনও কাহিনী এ গানে থাকে না। উচ্চস্বরে এই গান গাওয়া হয়। লোকের বিশ্বাস এই গানের আওয়াজ গ্রামের যতদূর পর্যন্ত যাবে ওই বছর ওই সব এলাকায় কোনও অমঙ্গল হবে না। তাই প্রতি গ্রামে বছরে একদিন এই অনুষ্ঠান হবেই। এই সব গান যাঁরা করেন তাঁদের একটা গোষ্ঠী আছে। চৈত্র মাসের শেষের দিকে সারা জেলায় কবে কোন গ্রামে কোন কোন দল যাবে তার তালিকা তৈরি হয়ে যায়। বাঁধা বায়না। গ্রামের লোকও জেনে যায়। গ্রামের যে কোনও একজনের বাড়িতে বা গ্রামবাসীর মনোনীত স্থানে চাঁদোয়া টাঙিয়ে আসর তৈরি করা হয়। গ্রামের হিন্দুমুসলমান বা অন্য কোনও সম্প্রদায় থাকলে সবাই মিলে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। কোনও কোনও আসরে ৩/৪টি করে দলের বায়না হয়। কারণ, সারা দিন সারা রাত চলে এই গান—কোনও বিরতি নেই—পরের দিন গ্রাম পরিক্রমা করে শিল্পীদের দুপুরে ভালভাবে খাইয়ে বিধিমত সাম্মানিক দিয়ে বিদায় করা হয়।

গানগুলি নিজেরাই তৈরি করেন। জেলায় সবচাইতে ব্যস্ত লোকশিল্পী এনারাই—গ্রামের মানুষই এনাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। অনেক মহিলা শিল্পীরও এই দল আছে।

জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কত যে লোকাচার ছিল যা আজ লুপ্ত হয়েছে তার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয়নি। ধুলোমাটি—দোর ছাড়াছাড়ি লোকাচারগুলি এখন আর দেখাই যায় না।

"ধুলোমুটি"টা এখনও পল্লী অঞ্চলে কিছু কিছু হয় বলে শুনেছি—দোল পূর্ণিমার পরের দিন কাদা খেলার মতনই এই
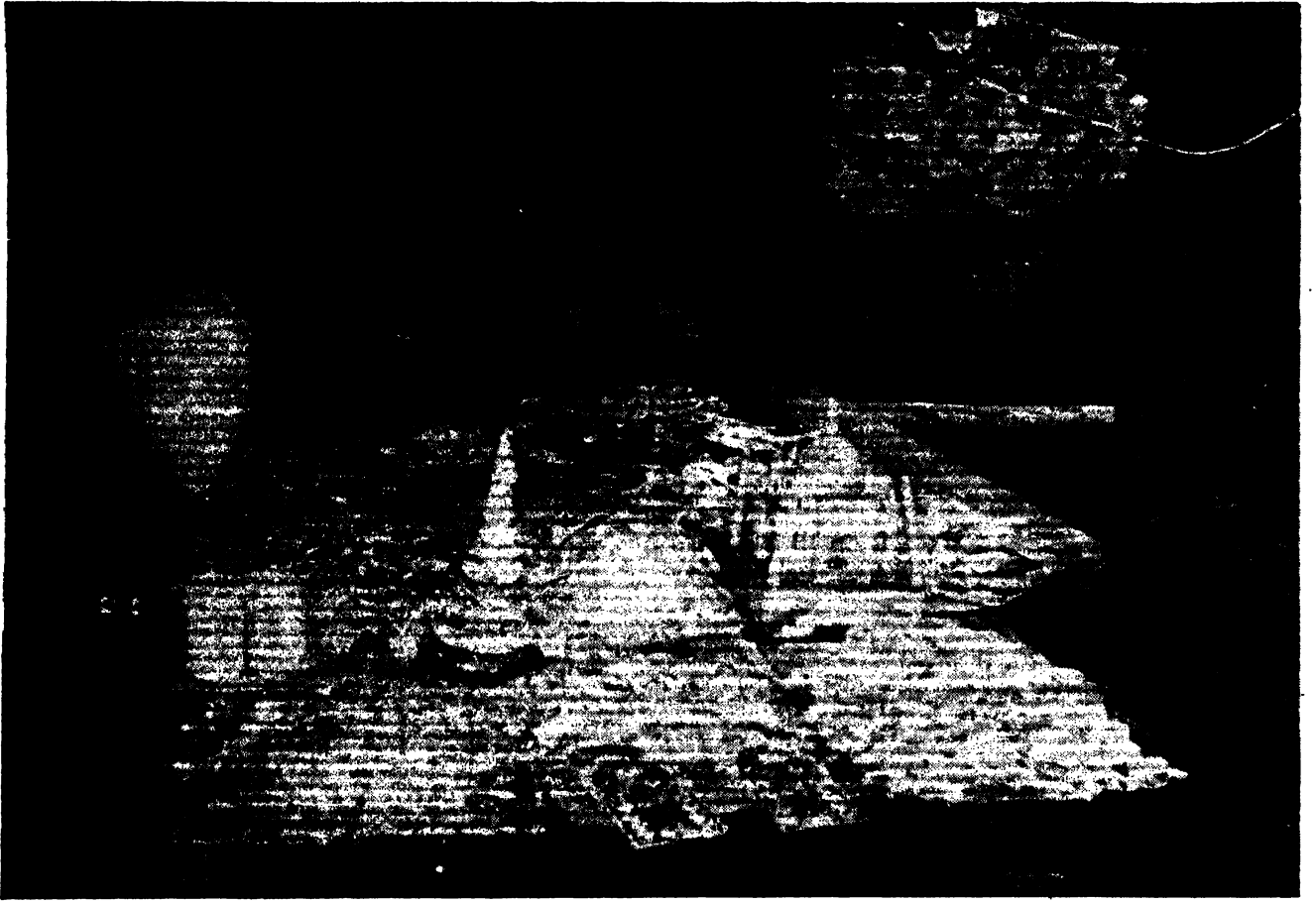
মন্দিরবাজার থানার মহেশপুর গ্রামে শোলা শিল্প — ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল

লোকাচার। লুপ্ত হয়েছে কুলতলি থানার জালাবেড়িয়ার জালা নৃত্য—এই নৃত্যের নামে গ্রামের নাম জালাবেড়িয়া।

লোকশিল্প

মৃৎশিল্প : জেলার [illegible] পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রাক্‌বৈদিক যুগেও এই জন[illegible] হয়েছে। জেলার প্রত্ন সংগ্রহে প্রচুর মৃৎপাত্র যেমন সংগৃহী[illegible] পোড়ামাটির বহু সামগ্রীও পাওয়া গেছে। এমন অ[illegible] পাওয়া গেছে যা পোড়ান নয়—কিন্তু ব্যবহারযোগ্য [illegible] Potery বলা হয়েছে।

এতো বিভিন্ন ধরনে[illegible] মনে হয় অতীতে বিশ্ব বাজরে এ অঞ্চলের মৃ[illegible]।

সুনাম ছিল জেলার [illegible] কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর Traditional Art of [illegible] জেলার পুতুলের উল্লেখ করেছেন—যা বাংলার ধা[illegible]কে ধরে রেখেছে। জেলার দক্ষিণাংশে এই ধারাবাহি[illegible] যায়।

মন্দিরটেরাকোটা [illegible]দিরগাত্রে লাগান আছে যা মাটির তলা থেকে সংগৃহী[illegible] প্রশংসা করতে হয়। হাতে কাঁটা (ছাঁচে নয়) ইট তা[illegible]নৈপুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জেলার প্রায় প্রতি [illegible] জন্য একটা পাড়া নির্দিষ্ট আছে, যাঁদের জীবিকা মৃ[illegible]রিবারে প্রত্যেক সদস্যই এই কাজে যুক্ত। দেবদেবীর পূজায়ও এই সম্প্রদায়কে জোগান দিতে হয় মৃৎপাত্রের নানা সামগ্রী। মেলা পার্বণে পুতুলের বেসাতিও কিছু কম জনপ্রিয় নয়। মৃৎশিল্পীরা সবাই যে কুমোর, তা নয়। কিন্তু 'চাকে যারা মাটির হাঁড়ি, কলসি, সরা, খুরি ইত্যাদি তৈরি করেন তাঁরা সবাই কুমোর। এই সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের কিছু শিল্পী যাঁরা দেবদেবী প্রতিমা তৈরি করেন মাটি দিয়ে তাঁরাও মৃৎশিল্পী। জেলার মাটি মৃৎশিল্পের উপযোগী বর্তমানে বেশ কিছু তরুণ শিল্পী টেরাকোটার কাজ করছেন—তার বাজারও ভাল এবং কাজের প্রশংসাও পাচ্ছেন।

দারুশিল্প : দারুশিল্পের ইতিহাসে বাংলার দারুশিল্পীদের বেশ সুনাম ছিল বলে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। নদীমাতৃক বাংলায় নৌশিল্পেও ব্যাপকতা ছিল। ভারতীয় ঋগ্বেদ, বোধায়ন, ধর্মসূত্র, বাল্মিকী রামায়ণ, মহাভারত, বায়ুপুরাণ, হরিবংশ, মার্কণ্ডে পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, হিতোপদেশ দশকুমার চরিত, কথাসরিৎসাগর এবং জাতককাহিনীতে নৌকোর উল্লেখ পাই।

কালিদাস তাঁর রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাংলাকে সম্বোধন করেছেন—"নৌসাধনোদ্যতান" বলে। সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরে নৌকার নিদর্শন পাওয়া যায়। ডায়মন্ডহারবারের আবদালপুর, কুলপীর হরিনারায়ণপুর ও অন্যান্য জেলার প্রত্নমহল

সুন্দরবনে নৌকা পরিবহণ উপজীবিকার অন্যতম অবলম্বন

থেকে প্রচুর প্যাঞ্চমার্ক মুদ্রা, ঢালাই মুদ্রা পাওয়া গেছে যাতে নৌকা চিহ্ন খোদাই করা। বাংলা সাহিত্যে নৌকোর উল্লেখ হয়েছে চর্যাপদে।

নৌকো তৈরির প্রযুক্তিগত আলোচনা পাওয়া যায় এগারশো শতকে ভোজরাজ লিখিত 'যুক্তিকল্পতরুতে'। আকৃতি অনুসারে এই গ্রন্থে নৌকোর শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে—যথা ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীঘা, পাত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা। বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের রাজ্য নদী, নালা, খাল-বিল অধ্যুষিত হওয়ায় বাংলার এই দক্ষিণ অঞ্চলে নৌশিল্প ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসে নৌসেনাধক্ষ্য তথা অগাস্টাস্ পেড্রো হায়দর মানক্রী এবং মুয়াজ্জিম বেগের কথা লেখা থাকলেও নৌশিল্পীদের কথার কোথাও উল্লেখ নেই।

এই জেলায় এখনও নৌযান-নির্ভর বেশ কিছু অঞ্চল আছে। সুন্দরবনের প্রায় ভাগই এই অঞ্চলে পড়ে। সুন্দরবন এলাকায় নৌকোর যে বিবরণ পাওয়া যায় তার থেকে নৌকোর কিছু গড়নভিত্তিক নাম যেমন—ঘুঘু (ছোট ডিঙি), বেতনাই (গোলপাড়া বা কাঠ বোঝাই করার নৌকো, ছিপ্, পানসি, বালায়, ভাউলে, কিস্তি, ভড়, বজরা ইত্যাদি।

জেলার নৌকো তৈরির কেন্দ্রগুলি তাড়দহ, ক্যানিং, নামখানা, কুলতলি, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার, নুরপুর।

পূর্ব বাংলার বেশ কিছু দক্ষ নৌশিল্পী দেশ ভাগের অনেক আগে থেকেই এই শিল্পকর্মে যুক্ত হয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করেছিলেন।

ক্যানিংয়ে নৌশিল্পীদের স্থায়ী আবাস আছে। গান্ধী কলোনিতে নৌশিল্পীদের বসবাস আছে। অধিকাংশই পূর্ববঙ্গীয়। কাঠ কাটার নৌকো, পানসি, ও লঞ্চ তৈরিতে এরা খুবই দক্ষ। এলাকায় পুরনো শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম রমানাথ রায়, কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, পাঁচু মজুমদার প্রমুখ। দিঘিরপাড় গ্রামের শরৎ সরদার লঞ্চ তৈরিতে যশলাভ করেছিলেন। শরৎ সরদারকে নৌশিল্পের গুরুমহাশয় বলে অনেকে মান্য করেন। দারুশিল্পে পালকি, ডুলি—চতুর্দোলার উল্লেখ পাই—জেলার প্রায় সর্বত্র পালকি ও ডুলির প্রচলন ছিল। এখনও কিছু কিছু পল্লী অঞ্চলে পালকির ব্যবহার দেখতে পাই, বিবাহে বা অন্য কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে।

রথ একটি প্রাচীন দেবযান। জেলার রথশিল্পের দীর্ঘ ইতিহাস। সে আলোচনা সম্ভব নয়। এই রথশিল্পে জেলার সুনাম ছিল। সূত্রধর সম্প্রদায়, কোথাও কোথাও কর্মকারও এই শিল্পে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তার নিদর্শন আজও বর্তমান।

এই কর্মকারশিল্পীরা পুতুলনাচের পুতুল তৈরিতে কম শিল্পশৈলীর পরিচয় দেননি। মন্দিরবাজারে বাজারবেড়িয়ার কিশোরী কর্মকার রথশিল্পে দক্ষ কারিগর ছিলেন। তাঁর বংশধরেরা এখনও পুতুল তৈরি ও পুরনো রথগুলি সারাইয়ের কাজ করেন।

এই শিল্পীরা জেলার যে সব রথ তৈরি করে গিয়েছিলেন যা আজও জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি পৌছে দেয়।

কুলপির—দেরিয়া, শ্যাম বসুর চক, জয়নগর মিত্র পরিবারের রথ, তেলিপাড়ায় নন্দীদের রথ, বহড়ুর রথ, বজবজ মণ্ডল পরিবারের বাওয়ালি, পূজালি বারুইপুর, মগরাহাট ইন্সারপুর, মন্দিরবাজারের জগদীশপুর, মহেশতলার জয়নগর, পার বাংলা, মহেশতলা নুঙ্গী, বনেশ জোড়হাট, সোনারপুরের বনহুগলি, রাজপুরের রথ উল্লেখযোগ্য।

দারুশিল্পে এক সময় এই জেলার যে দক্ষতা ছিল তার কিছু কিছু নমুনা এখনও লুপ্ত হয়ে যায়নি। মন্দিরবাজার থানার মহেশপুরের হালদারদের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের স্তম্ভগুলি তার কিছু সাক্ষ্য এখনও দেয়। যদিও তার বেশিটাই কালের গ্রাসে অবহেলায় অযত্নে নোনা জলহাওয়ায় ও উইপোকায় নষ্ট করে দিয়েছে। কাঠের স্তম্ভে খোদাই করা নানা নক্‌শা পৌরাণিককাহিনী, খোদাই চিত্র এখনও যা আছে তা অপূর্ব। তবে কোন শিল্পীর হাতে এই শিল্প তার কোনও উল্লেখ নেই। অসীম মুখোপাধ্যায় তাঁর "মহেশপুর" রচনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (দেশ—২২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)

তারাপদ সাঁতরা মহাশয় ও তার বাংলার দারু ভাস্কর্য গ্রন্থে জেলার কিছু দারু ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী বা তার কিছু আগে থেকে জেলায় কিছু কাঠের দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয়েছিল। তা ছাড়াও জেলায় বেশ কিছু দেবদেবীর মূর্তিতে দারুশিল্পের নিদর্শন বর্তমান। যেমন ডায়মন্ডহারবারের সরিষা গ্রামের কালীমূর্তি, মদনমোহন, পঞ্চানন্দ, জয়নগরের জয়চণ্ডী, কালী মন্দিরবাজার থানার বিদ্যাধরপুর গ্রামের গোপীবল্লভ, কুলপি থানার করঞ্জলির শীতলা, বিষ্ণুপুর থানার শিবানীপুরে শিবানী, বারুইপুর, মগরাহাট রসিলাবাদ ও সোনারপুর থানার কালিকাপুর ভাঁটাগ্রামের বিশালাক্ষী মহামায়াতলা, সোনারপুরের দুর্গা, বারুইপুরের আটসারা গ্রামের গৌর-নিতাই, জয়নগরের রাধাবল্লভ, মথুরাপুর থানার ত্রিপুরাসুন্দরী, বনমালিপুরের মদনমোহন।

বর্তমানে জেলার দারুশিল্পীদের কাজে সেই শিল্পশৈলী দেখি না। এই সব শিল্পীর বংশধরেরা বেশির ভাগ অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছেন। কিছু কিছু শিল্প যেমন বিষকাঠ, রথের পুতুল ও নক্শা সারাই—পুতুলনাচের পুতুল তৈরির কাজে খুব অল্প কয়েকজন এখনও আছেন।

শোলাশিল্প ঃ জেলার শোলাশিল্প মন্দিরবাজার থানার মহেশপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জেলার একমাত্র এই গ্রামেই প্রতিটি ঘরে শোলার কাজ হয়। এই গ্রামের মেয়েরা বিবাহ সূত্রে অন্য গ্রামে গিয়ে কেবল সংসারই পাতেননি সঙ্গে করে এই শিল্পটাকেও নিয়ে গিয়েছেন। এইভাবেই জেলার বহু গ্রামে শোলাশিল্প ছড়িয়ে পড়েছে। মহেশপুরের শোলার কাজ সারা ভারতের প্রশংসা পেয়েছে।

এই গ্রামের বিখ্যাত শিল্পী বসন্ত হালদার, রবীন হালদার বহু পুরস্কারও পেয়েছেন।

এই শিল্পে বর্তমানে থারমোকোলের অনুপ্রবেশ ঘটায় নতুন এক শিল্পের সংযোজন হয়েছে।

শুভ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে শোলার একটি সামাজিক চাহিদা থাকায় এর বাজারও ভাল। দেবদেবীর সাজ, চাঁদমালা, রাস পূর্ণিমায় কত রকমের ফুল, কদম, ময়ূর, পাখি, বিবাহের টোপর, মুকুট আরও কত কি।

শঙ্খশিল্প ঃ এই শিল্পটি এক সময় খুবই দক্ষতার সঙ্গে রমরমা ছিল। বর্তমানে এই লোকশিল্পটি শেষ হয়ে গিয়েছে। এই শিল্পীদের কেউ কেউ কলকাতা থেকে তৈরি শাঁখা কিনে এনে পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে বিক্রি করেন। নিজেরা আর তৈরি করেন না। শঙ্খশিল্পের বহু গুণী শিল্পীকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে দেখেছি। এখনও কিছু শিল্পী আছেন যাঁদেরকে নিয়ে শিল্পটাকে বাঁচান যায়। শহরের রমণীরা শাঁখার বিকল্প ব্যবহার করলেও পল্লীরমণীরা এখনও শাঁখাকে ছাড়তে পারেননি। তাই বাজারও আছে।

খাল, বিল, নদীনালা জেলার অনেক অংশ জুড়ে, তাই মৎস্য শিকারও এক সম্প্রদায়ের জীবিকা। এই মৎস্য শিকারের জন্য কিছু হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়, যেমন—ঘুনি, পলো, আটল পাটা ইত্যাদি।

তালপাতার ডেগুলে [illegible] নিয়ে সরু কাটি বার করে তা দিয়ে তৈরি হয় ঘুনি মাছ ধরার ছোট [illegible] বাঁশের চ্যাড়া সরু ও পাতলা করে পলো, পাটা তৈরি [illegible] ও মাছ ধরে রাখার কাজে ব্যবহার হয়।

জেলার বাগদি বা ডোমপাড়ায় এই কাজ এখনও খুব দক্ষতার সঙ্গে হচ্ছে।

মাদুর একসময় এই জেলাতেই বোনা হতো—জেলাতে মাদুরের চাহিদা ছিল এখনও আছে (যদিও কিছুটা কমেছে)। ধর্মীয় কাজেও মাদুরের প্রয়োজন। জেলার এই চাহিদা পাশের জেলা মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ভারতের চালানি মাদুর (যা মেসিনে বোনা) বাজার নিয়েছে। জেলার মাদুরশিল্প শঙ্খশিল্পের মতো লোপ পেয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে খেঁজুর পাতার চাটাই—সুন্দরবন এলাকায় আদিবাসীদের গোলপাতা দিয়ে ব্যাঙলা বোনাও চাটাই সত্যই সুন্দর। মাদুরকাঠির চাষটা যদি এ জেলায় করা যেত, তা হলে এই শিল্পীদের পুনর্জীবিত করা অনেক সহজ হতো—এই উদ্যোগ জেলা পরিষদকে নিতে হবে।

জেলায় মুসলিম সম্প্রদায় জনসংখ্যার একটা ভাল অংশ। সাংস্কৃতিকচর্চায় লক্ষণীয়ভাবে বিষয়টি আমাদের ভাবনার মধ্যে আনা আশু প্রয়োজন। জেলার সার্বিক সংস্কৃতি এই সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে তো নয়। তাই এই শূন্যতা দূর করার পরিকল্পনা চাই। সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পীমনের অভাব দেখি না। গাজনে নজরুল, মর্‌তোজা গান লিখছে, ইমাম্‌ রহমন দুর্গা সেজে, কৃষ্ণ সেজে অভিনয় করছেন—শিল্পিমনের দক্ষতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। এই সম্ভাবনাকে আরও ব্যাপকভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার ঘটাতে হবে।

কারণ সংস্কৃতির এই ভিত জেলার সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে চুরমার করে দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র ও ভ্রাতৃত্বের সহাবস্থানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে তা সারা বিশ্বে বিরল।

গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া মুসলমান বা মৌলবাদের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর প্রীতির বাতাবরণ গড়ে উঠেছে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে, লোককবি যাকে কৃষ্ণপয়গম্বর বলেছেন—এ দৃষ্টান্ত আর কোথায়?

কবির বর্ণনায়—

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগ চূড়া টালা
বনমালা ছিলিবিনি তাতে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধেক নীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।।

এই সম্প্রীতির জোরাল ভিতকে টলিয়ে কোনও অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজও জেলাকে বিব্রত করতে পারেনি। এইটাই তো জেলার লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) হরপ্রসাদ [illegible]
(২) ডঃ নীহার[illegible] ইতিহাস (আদিপর্ব)
(৩) যশোর-খুল[illegible] সতীশচন্দ্র মিত্র (শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদক)
(৪) বাংলার [illegible] ভট্টাচার্য
(৫) বাংলার ব্র[illegible] ঠাকুর
(৬) মেয়েদের [illegible] মজুমদার
(৭) বাংলার [illegible] সাঁতরা
(৮) দক্ষিণ চব্বি[illegible]—সত্যানন্দ মণ্ডল
(৯) পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ
(১০) বাংলার লৌকিক দেবদেবী— গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
(১১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ সেন
(১২) হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
(১৩) হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য—ডঃ অতুল সুর
(১৪) ইসলামিক বাংলা সাহিত্য—ডঃ সুকুমার সেন
(১৫) কালিদাস দত্ত প্রবন্ধ সংকলন
(১৬) পুরোহিত দর্পণ—পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

লেখক পরিচিতি ঃ লোক সংস্কৃতি গবেষক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

প্রভাত ভট্টাচার্য

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মঠ-মন্দির, মস্‌জিদ ও গির্জা

মানব সভ্যতার বিকাশের এক বিশেষ স্তরে ঈশ্বর ভাবনার সূত্রপাত ঘটে। এই সূত্রপাত আবার হঠাৎ করে নয়। এর পিছনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার যোগাযোগ আছে। গুহাবাসী আদিম মানুষের সামনে নানান ধরনের প্রকৃতির অজ্ঞাত ঘটনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগেই। যেমন ঝড় দাবানল ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি। এগুলোকেই সে ভয় অথবা ভক্তির চোখে সমীহ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিল। এবং তা ধাপে ধাপে সময়ের বিরাট ব্যবধানে। এগুলোর নেপথ্যে ঘটিত কার্য্যকারণ সম্পর্কের জটিল অঙ্ক তখনও পর্যন্ত তার জানা হয়নি। তবে প্রশ্ন অথবা কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। যুক্তিবিজ্ঞানের বোধশূন্য সেই আদিম পৃথিবীর আদিম মানুষ কেমন করে যেন ভাবতে পেরেছিল যে এগুলোর পিছনে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট শক্তি আছে। পরবর্তী সময়ে এই অনাদি শক্তির সঙ্গে ঈশ্বর ভাবনা বা ঈশ্বর আরাধনা যুক্ত হয়ে যায়। এরও পরে বিমূর্ত ঈশ্বরসুলভ ভাবনা প্রাকৃতিক বস্তু অর্থাৎ বৃক্ষ, পাহাড়, নদী, পাথরের মধ্যে ঈশ্বর খুঁজে পায়। আবার এগুলোই পরে মূর্তি কল্পনায় রূপ নেয়। মূর্তি তখন খোলা আকাশের নিচে। প্রাকৃতিক রৌদ্র, বায়ু, বৃষ্টির পরশ লাগতো তার গায়ে। এভাবেই সময় এগিয়েছে। মানুষের সভ্যতাও এগিয়েছে। গ্রাম সভ্যতা ধীরে ধীরে নগর সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে গৃহবাসী মানুষের মতো মূর্তিও গৃহবাসী হয়েছে।

নিম্নবঙ্গের এক ছোটো ভৌগোলিক খণ্ড দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের এই জেলার মানব বসতির চিহ্ন প্রাগৈতিহাসিক আমলের। একথা বোধ করি বিতর্কের অবকাশ তৈরি করবে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও পরে মৌর্য্য কুশান, গুপ্ত, পাল, ও সেন যুগের বিভিন্ন প্রত্নসাক্ষ্য আজ সুধিজনের সামনে পুরানো ইতিহাসের পৃষ্ঠা মেলে ধরেছে। পণ্ডিতসমাজ যতই এ জেলাকে অর্বাচীন জনপদ বলে উপহাস অথবা অস্বীকার করুন না কেন, হরপ্পা নগরীর মতোই আমাদের জেলাতেও সভ্য মানুষ বিচরণ করতো। চিরকালই এই এলাকা জঙ্গলময় শ্বাপদ অধ্যুষিত ছিল না। মানবসংস্কৃতি নিয়ে আমাদের জেলাও মুখর ছিল একসময়। পরে ইতিহাসের এক বিশেষ অভিশপ্ত লগ্নে জেলার প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর কারণ কেউ বলেন বন্যা, ভূমিকম্প আবার কেউ কেউ বলেন ভূমির অবনমন। বিশেষ করে যোড়শ শতকের পূর্বে এখানকার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতাপাদিত্য রায়ের পতনের পরে তো জেলাকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে যায় পর্তুগিজ, হার্মাদ, জলদস্যু, মগ-আরাকানী উৎপীড়কদের আক্রমণ।

যোড়শ শতকের পূর্বে এখানকার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতাপাদিত্য রায়ের পতনের পরে তো জেলাকে প্রায় শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে যায় পর্তুগিজ, হার্মাদ, জলদস্যু, মগ-আরাকানী উৎপীড়কদের আক্রমণ। হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মীয় মানুষের পাশাপাশি এখানে ইসলাম ও সবশেষে খ্রিষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল একদা। এই প্রস্তাবনা ধর্মীয় স্থাপত্যগুলোকে নিয়ে। যার আলোচনায় এক ধরনের দেশপ্রেম আছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মীয় মানুষের পাশাপাশি এখানে ইসলাম ও সবশেষে খ্রিষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল একদা। এই প্রস্তাবনা ধর্মীয় স্থাপত্যগুলোকে নিয়ে। যার আলোচনায় এক ধরনের দেশপ্রেম আছে। আছে ইতিহাসের প্রতি এক নৈতিক দায়। তবে সবকিছুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্র এটা নয়। সম্ভবও নয়। সেই হেতু সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো। ক্ষেত্র সমীক্ষার বাইরে এ আলোচনা এগোবে না তা আগেভাগেই জানিয়ে রাখা ভাল।

মহর্ষি কপিলমুনির মন্দির :

বর্তমান মন্দিরটি ১৯৭৩ সালে অযোধ্যার হনুমানগড়ীর মহন্ত সমুদ্র থেকে অনেক দূরে নির্মাণ করেন। মন্দিরটি দালানের ওপর মঠ ভাবনার চূড়া নির্মিত। সাংখ্যকার কপিলমুনির মন্দির বহু অতীতকালেও বিদ্যমান ছিল। ১৮৩৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৪৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যস্থ

গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক ওই সিদ্ধর্ষি মুনির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই মন্দিরটি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায় ১৮৬৫ সালে।

কপিলমুনির মাহাত্ম্য ও ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন কাহিনী সম্পর্কে প্রখ্যাত ভ্রমণসাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ লিখেছেন......(১)

"আনুমানিক ২৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে পূর্ত বিশারদ ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেন।" তারপর ধীরে ধীরে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হতে থাকে।

এর মধ্যে আরও একটি মন্দির সমুদ্র গ্রাস করেছে তার তথ্য মেলেনি। ১৯৬১ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মন্দির নির্মাণে এগারো হাজার টাকা চাঁদা তুলে দেন। ওই মন্দিরটির দেওয়াল পাকা, করোগেট চাল এবং মাথার চূড়া অ্যালুমিনিয়ম সিটে তৈরি করা হয়েছিল। সেই মন্দিরটিও সমুদ্রগর্ভে চলে যায়। বর্তমান মন্দিরটি এখনও অক্ষত আছে।

অতীতকাল থেকে গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থ ভারতের সুপ্রাচীন একটি তীর্থস্থান হিসাবে খ্যাত। রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্ম বৈর্বত পুরাণ প্রভৃতিতে গঙ্গাসাগরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুব্যবস্থায় দুর্ঘটনা, মহামারী প্রায় বন্ধ হয়েছে, মকর সংক্রান্তিতে ৫-৬ লক্ষ লোকের সমাগম হয়, সারা ভারতের মানুষ তীর্থ করেন। সারা বছরই সুগম রাস্তা দিয়ে ভ্রমণকারীগণ সাগরে যান।

জটার দেউল :

একদা অরণ্যময় ব্যাঘ্র ও সর্প অধ্যুষিত এলাকা। কঙ্কণদীঘির পরে জটা গ্রামে ১১৬ নং লাটে, বর্তমানে রায়দীঘি থানায় জটার দেউলটি দণ্ডায়মান আছে। দেউলটি রেখদেউল শৈলীতে প্রস্তুত। দেউলটির চূড়া বঙ্গাব্দ ১২৭৪ সনে স্মিথ্ নামক একজন সাহেব যখন জঙ্গল হাসিল করার জন্য এই অরণ্যে আসেন, তিনি জটার চূড়াটিতে কোনও গুপ্তধন আছে অনুমান করে ভেঙে দেন।........(২) বর্তমানে এখনও প্রায় একশত ফুট উচ্চতা আছে। পূর্বে কত ফুট ছিল তা জানা যায়নি। মন্দিরটি আটকোণা, পূর্বদ্বারী প্রবেশপথটি নফুট ছইঞ্চি উচ্চ। অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে ৬/৭ ফুট সিঁড়ি দিয়ে নেমে তার মধ্যে যেতে হয়। প্রত্নবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তা দেখিয়েছেন। প্রত্নপণ্ডিত হান্টার সাহেব একে বৌদ্ধ মঠ বলেছেন। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ওই অঞ্চলের জমিদার দুর্গাপ্রসাদ রায়চৌ[illegible] [illegible] খননকালে একখানি তাম্রফলক উদ্ধার করেন। [illegible] জনৈক রাজা জয়ন্ত চন্দ্র ৮৯৭ শকাব্দে অর্থাৎ [illegible] খ্রি[illegible] দেউলটি নির্মাণ করেন।

অনুরূপ দেউলের আ[illegible] কুলতলা থানার দেউলবাড়ি দ্বীপে। ভগ্ন অবস্থায় এ[illegible]। আরও একটি অনুরূপ রেখমন্দির ছিল পাথরপ্রতি[illegible] [illegible]নগর গ্রামে নদীর তীরে।

বড়শী বা অম্বুলিঙ্গ :

বর্তমান মন্দিরটি [illegible]। কাশীনগর এলাকায় অবস্থিত। গর্ভগৃহে সবস[illegible] থাকে। পুরাণ ও বাংলা সাহিত্যে ওই অম্বুলিঙ্গের উ[illegible]। ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে নিমতা

হাউড়ির হাটের নস্কর পরিবার প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন শিব মন্দির — *ছবি : লেখক*

গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণরামদাস রচিত "রায়মঙ্গল" কাব্যে উল্লেখ আছে।

"অম্বুলিঙ্গ মহাস্থান নাহি যার উপমান
তথায় বন্দিল বিশ্বনাথ।"

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের সময়, চক্রতীর্থে গঙ্গার অন্তর্ধান প্রসঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত চৈতন্যভাগবতে :

"জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্ব্বজনে।।"

বর্তমান কাশীনগরে চক্রতীর্থ একটি মহাশ্মশান। তার চারপাশে মাধবকুণ্ড গোপালকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, মণিকুণ্ড নামে কতকগুলি জলাশয় আদিগঙ্গার খাদে থেকে গেছে। ওইগুলিতে প্রতিবছর চৈত্র মাসে নন্দা তিথিতে কাশীরামের বিশ্বনাথ আবির্ভূত হন ও নন্দার মেলা হয়। হাজারে হাজারে মানুষ ওইকুণ্ডগুলিতে স্নান করেন পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে।

পাটদহ, পাটেশ্বরী মন্দির :

ডায়মন্ডহারবারের কলাগাছিয়ায় অবস্থিত। মন্দিরটি আটচালা, সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে নির্মিত। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে পাটেশ্বরী বিগ্রহ অধিষ্ঠিত।

স্থানীয় কর বংশীয় ভূস্বামীর পূর্বপুরুষ ওই মন্দিরটি স্থাপন করান। অতঃপর ঐ জমিদারি রায়চৌধুরী বংশের হয়। সেই থেকে পাটেশ্বরী তাঁদের কুলদেবী হিসাবে পূজিত হচ্ছেন।

দ্রষ্টব্য : (১) "গঙ্গাসাগ[illegible] [illegible]৪-পরগনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ১৩৮১।

(২) কালিদাস দত্ত লি[illegible] [illegible]সুমতী কার্তিক ১৩৩৪।

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মন্দির — *ছবি : অমিয়ভূষণ দত্ত*

প্রতিষ্ঠাকালের পোড়ামাটির টেরাকোটা (অলঙ্করণ) আর মন্দিরে অবশিষ্ট নেই। মন্দিরটি চারবার সংস্কার করা হয়েছে।

বাহিনচাওড়া বা মন্দিরবাজার মন্দির :

বর্তমান মন্দিরবাজার থানার এলাকায় রাজা কেশব রায়চৌধুরী কর্তৃক বাবা কেশবেশ্বরের বৃহৎকায় আটচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৪৮ খ্রিঃ।

মন্দিরটি নির্মাণের কাহিনী যা প্রচলিত তা নিম্নরূপ : রাজা কেশব অপুত্রক ছিলেন। তাঁর দুই মহিষী দেবাদিদেবের কাছে পুত্রসন্তান লাভের জন্য কঠোর পঞ্চতপা ব্রত পালন করেন। ব্রতের শেষপর্বে মহাদেব রাজা কেশব ও তাঁর মহিষীদের দর্শন দেন এবং পুত্রলাভের বর দান করেন। রাজার বিশেষ অনুরোধে মহাদেব লিঙ্গরূপে তাঁর রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করতে স্বীকৃত হন।

রাজা নিজে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে লিঙ্গমূর্তি বহন করে আনেন এবং সুবৃহৎ সুসজ্জিত মন্দিরটি রামচন্দ্রপুরের শিল্পী বাসুদেবকে নির্মাণের দায়িত্ব দেন। ওই মন্দিরটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় ১৬৭০ শকাব্দে। বোলসিদ্ধি গ্রামের প্রখ্যাত পণ্ডিত সিদ্ধপুরুষ বাণেশ্বর ন্যায়রত্ন ওই মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করেন। ওই মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গে বহু গল্প প্রচলিত আছে।

হাউড়ীর হাটের ভুবনেশ্বর ও যোগেশ্বর মন্দির :

নির্মাণে বৈচিত্র্য আছে। ওড়িশার রেখ ও পীড়ার মন্দিরশৈলীর প্রভাবে এই মন্দির গ্রথিত। একটি মন্দিরের পতন হওয়ায় সেইখানেই অনুরূপভাবে মন্দির হয়েছে। এই সম্পর্কে আমার গুরু প্রত্নবিদ্ কালিদাস দত্ত মহাশয় বলেছেন মন্দিরের বাজারের কেশবেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা এটা পুরানো।

ওই এলাকার নস্কর পরিবারের জনৈক মহিলার নাম হাউড়ী। তাঁর বদান্যতায় দুটি শিবমন্দির ভুবনেশ্বর ও যোগেশ্বর লিঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে তা কলকাতার আহিরীটোলার ভট্টাচার্যদের দান করেন। স্থানীয় একটি পত্রিকা "উদয়ন"-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রতিষ্ঠাকাল আনুমানিক ১০৪০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ।

১৩৭৩ সালের ৮ আশ্বিন রবিবার সকাল ৭টায় ভুবনেশ্বর মন্দিরটি ভেঙে পড়ে। ওই বছরেরই ২ ফাল্গুন, পুরনো মন্দিরের আদলে নতুন মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয়। ওই মন্দিরগাত্রে একটি ফলকে লেখা :—

> "প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্
> মন্দির ভূমিস্মাৎ ৮।৬।১৩৭৩ সাল
> মন্দির পুনর্নির্মাণ ২।১১।১৩৭৩ সাল
> সেবায়েত ডাঃ ভূষণচন্দ্র নস্কর
> হাউড়ীহাট, জগদীশপুর ২৪ পরগনা"

মন্দিরটির নির্মাণকার্য শেষ হয়—১৩৭৬ সালের ৪ চৈত্র বুধবার ৬ চৈত্র শুক্রবার মন্দিরের অভিষেকে পৌরোহিত্য করেন ওই গ্রামের সুপণ্ডিত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণ বারাশতের আদ্যামহেশ মন্দির :

শতবারা পূজিত এই গ্রামের নামই বারাশত। কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে এই দক্ষিণ বারাশতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"সঘনে দামামা ধ্বনি শুনি রায় গুণমণি
বহুড় ক্ষেত্র বাহিল আনন্দে।
বারাশতে উপনীত হইয়া সাধু হরষিত
পূজিত ঠাকুর সদানন্দে।।"

(১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন) তখন দক্ষিণ বারাশত জনপদ পরিচিত। ওই গ্রামের অদূরে "আদ্যামহেশ" শিবলিঙ্গ প্রায় ২০ ফুট নিচে মন্দিরের গর্ভভাগে স্থাপিত।

বাংলার নিজস্ব আটচালা রীতিতে প্রস্তুত করেছিলেন স্থানীয় জমিদার রায়চৌধুরীর পূর্বপুরুষ। ওই বংশের পূর্বপুরুষ ১০১৫ বঙ্গাব্দে নবাবের কাছ থেকে তিনশত বিঘা জমি ও রায়চৌধুরী উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি ওই অলৌকিক শিবলিঙ্গের সন্ধান পান মাটির গভীরে। তাঁর চেষ্টায় লিঙ্গরূপ বজায় রেখে তার চারধার ধরে মন্দির তৈরি হয়। এখনও অন্তঃসলিলা গঙ্গা সবসময় ওই লিঙ্গ বিগ্রহের চারপাশে থাকে। যেমন বড়াশী, মুলীকালী, ময়দাকালী প্রভৃতি বিগ্রহগুলি ওই একই স্তরে জলসংযোগে অবস্থিত আছে।

বোলসিদ্ধির অনাদিশ্বর মন্দির :

আদি অন্তহীন স্বয়ম্ভু শিব। তাই তাঁর নাম হয়েছে "অনাদিশ্বর"। ডায়মন্ডহারবার, রেলপথে গুরুদাসনগর স্টেশনে নেমে পূর্বদিকে দুই কিমি গেলে বোলসিদ্ধি গ্রাম। সেই গ্রামেই অনাদিশ্বর মন্দির। সাবেক মন্দিরটি গর্ভমধ্যে অতিনিচে অনাদিশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। জোয়ারে বড়াশী, ময়দা ও নিম্নগর্ভে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মতো গঙ্গাজল থাকতো বলে প্রাচীনেরা জানান। পুরনো মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেইখানেই ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে বড়িষা গ্রামের প্রিয়নাথ সরকার নতুন একটি আটচালা মন্দির নির্মাণ করেন।
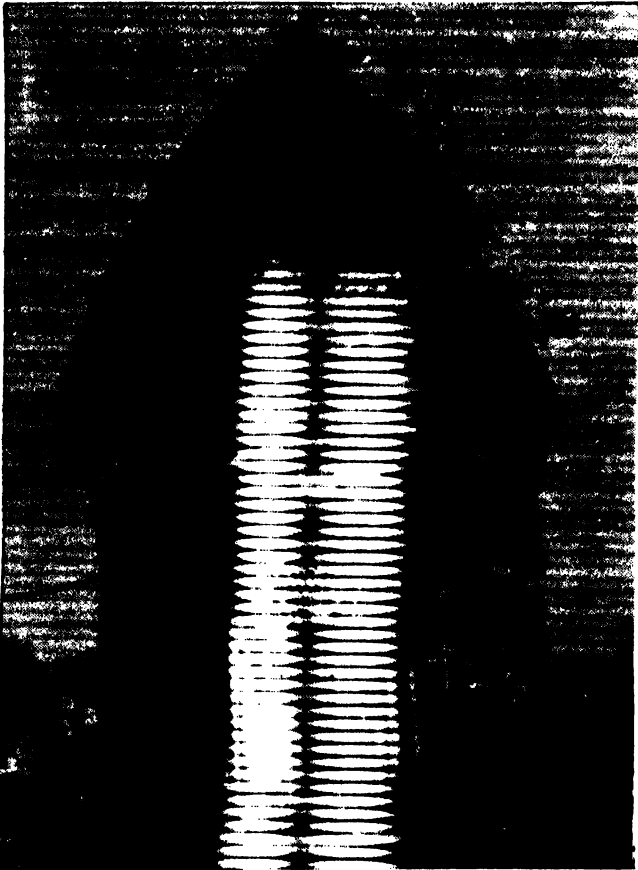
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দোল, গাজন চড়ক, অনাদিশ্বরকে কেন্দ্র করে খুবই জাঁকজমক হয়। বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এইখানে সন্ন্যাসীরা বাণফোঁড় উৎসব পালন করেন চৈত্রের শেষে। অন্যত্র বর্তমানে শিবের গাজন সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ, চড়ক, সাজগোজ করে পালা, গাজন গান, আসর বিনিময়ে হাজার হাজার দল ভ্রমণ করে। কিন্তু বাণফোঁড় দেখা যায় না। এখানে কৃচ্ছ্রসাধনের সন্ন্যাসীগণ বাণফোঁড় উৎসব করেন। পুরু চামড়ায় পাঁচছটা করে লোহার শলাকা গেঁথে ঢাকঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করেন।

মথুরাপুর বাপুলিবাজারের শিব মন্দির

জয়রামপুর, খড়োশ্বর মন্দির :

বিষ্ণুপুর থানার আমতলা হাট থেকে যেতে হয় জয়রামপুর। জনৈক জয়রাম হালদার জলাভূমি থেকে একটি শিবলিঙ্গ উদ্ধার করেন। প্রথমে খড়ের ছাউনি দেওয়া চালাঘরে খড়োশ্বরের পূজা-অর্চনা শুরু হয়। বহু বছর পরে বন্দেলের জমিদার প্রিয়নাথ রায় ও তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারী দেবী ১৩২৯ বঙ্গাব্দে বর্তমান আটচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দিরটি আটচালা হলেও গঠনশৈলীর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। স্থাপত্য ও অলংকরণ চুনের (পঙ্খের কাজ)।

সারা বছর ভক্ততীর্থ যাত্রাদের ভিড় হয়। বিশেষ মেলা শিব চতুর্দশীতে ও চৈত্রমাসের গাজন উৎসবে। হাজার হাজার গৃহী সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন জয়রামপুরের খড়োশ্বরে। আকাশ-বাতাস আলোড়িত হয়—বাবা খড়োশ্বরের জয়গানে। গাজন ও চড়ক, ঝাঁপ উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। জেলার ও সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ভক্ত সন্ন্যাসীগণ এখানে পূজা দিতে আসেন।

পাইকানের বুড়োশিব মন্দির (বজবজ) :

ঐতিহাসিক স্থান ফলতার দুর্গ। যেখানে সিরাজের তাড়া খেয়ে বৃটিশ সৈন্য আত্মগোপন করেছিল। সেইখান থেকে আট কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে শান্তশীতল গ্রাম পাইকান। এইখানেই বুড়োশিব দুই শতাধিক বছরেরও আগে থেকে পূজিত। মন্দির প্রতিষ্ঠার সন তারিখ মন্দিরের সামনের দেওয়ালফলকে লিখিত আছে "১১৮৮ সন"।

প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক ধর্মপ্রাণ গগন নস্কর জলকষ্ট নিবারণের জন্য একটি জলাশয় খনন করান। সেই সময় প্রায় ১৫ ফুট খননের পর এই শিবলিঙ্গ, পূজার থালাবাসন ও শালগ্রাম শিলা পান। ওইগুলি তাঁর বাড়িতেই থাকে। কথিত আছে যে, গগনবাবু একদিন শিবঠাকুরের স্বপ্নাদেশ পান, অতঃপর মন্দির নির্মাণের কাজে হাত দেন। বুড়োশিবের নিত্যপূজা, বাৎসরিক ব্রত দোল-গাজন উৎসব, শিবরাত্রি উৎসব প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য গগনবাবু ৭০-৮০ বিঘার

মতো জমি দেবোত্তর করে দিয়ে যান। সেইসঙ্গে পাইকানের পাশের গ্রাম থেকে শোভারাম ভট্টাচার্য মহাশয়কে বুড়োশিবের নিত্যপূজা ও উৎসবগুলি পালনের জন্য বসবাসের বাস্তুজমি পুকুর ও কয়েক বিঘা ধানীজমি দান করেছিলেন। সেই থেকে ভট্টাচার্যরা বংশ পরম্পরায় ওই বুড়োশিবের নিত্যপূজা করে থাকেন।

বুড়োশিবের বৈশিষ্ট্য গাজন ও ঝাঁপ। শিবের সন্ন্যাসীগণের বঁটি-ঝাঁপ দেখা জন্য হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হন।

পাথরপ্রতিমার আদিশিব ও দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের বুড়োশিব :

একইসঙ্গে দুটি শিবলিঙ্গের আলোচনার কারণ, দুটোর মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। আদিশিব ও বুড়োশিব আচ্ছাদন পছন্দ করেননি। উভয়ই চতুষ্কোণ লিঙ্গমূর্তি।

প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি পুরা সম্পদ। সাধারণ গৌরীপট্টের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য নেই। আপাতদৃষ্টিতে স্তম্ভ বলে মনে হবে। যে কোনও শিলাকে শিবজ্ঞানে পূজা করলেই শিব সন্তুষ্ট হন।

আদিশিব জঙ্গলকাটি পত্তনের সময় উদ্ধার হয়েছেন "মৃদঙ্গভাঙা" নদীর তীরে জঙ্গলের মধ্য থেকে। বুড়োশিব পুরাতত্ত্বের আকর জটার জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছেন বলে অনেক বলেন। আবার কেউ কেউ বলেন শিবগঙ্গা কাটার সময় ওই বুড়োশিব উদ্ধার হয়েছেন। এখন দঃ বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত ওই শিবলিঙ্গ দুটিই গবেষণার বস্তু।

মহেশপুরের গাড়েশ্বর মন্দির :

শিয়ালদহ ডায়মন্ডহারবার রেলপথে ধামুয়া স্টেশনে নেমে পশ্চিমদিকে প্রায় তিন কিলোমিটার গেলে মহেশপুর গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল "গাড়দহ" লোকমুখে অপভ্রংশে গাড়দা প্রচলিত হয়। এই গ্রামের শিবঠাকুর গাড়েশ্বর নামে পরিচিত।

এই প্রসঙ্গে অতীতের কথায় আসার প্রয়োজন বোধ করছি। এই গ্রামের পাশ দিয়ে আদিগঙ্গার প্রবাহ পুরাযুগে বর্তমান ছিল। সেই হেতু গঙ্গার তীরে তীরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সারা জেলা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গ্রামটিও পুরা সভ্যতার তীর্থভূমি।

যে ইষ্টক স্তূপের উপর গাড়েশ্বরের লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত সেইখান থেকেই ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরো, পুরাযুগের ইষ্টক ও একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে।

প্রথম মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। পরের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার সময় ভিত খননে, একটি বিরাট পাঁচিলের ভিত পরিলক্ষিত হয়। সেই শিবতলায় ঢিপির উপর জমিদারের নায়েব তিতু তেলি একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাও ধ্বংসে হয়ে যায়। শেষের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে। শিবলিঙ্গের উচ্চতা ছফুটের মতো। গাড়দা—মহেশপুরের গাড়েশ্বর শিবতীর্থক্ষেত্রে শিবরাত্রি ও গাজন খুব জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

রুদ্রনগরের রুদ্রেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দির :

সাগরদ্বীপে, মহর্ষি কপিলদেবের গঙ্গাসাগর তীর্থ বহু জনপ্রিয়, তা পূর্বে বলা হয়েছে। সাগরদ্বীপের রুদ্রনগর অনেকের মতে রুদ্রেশ্বর শিবের নামেই নামকরণ হয়েছে।
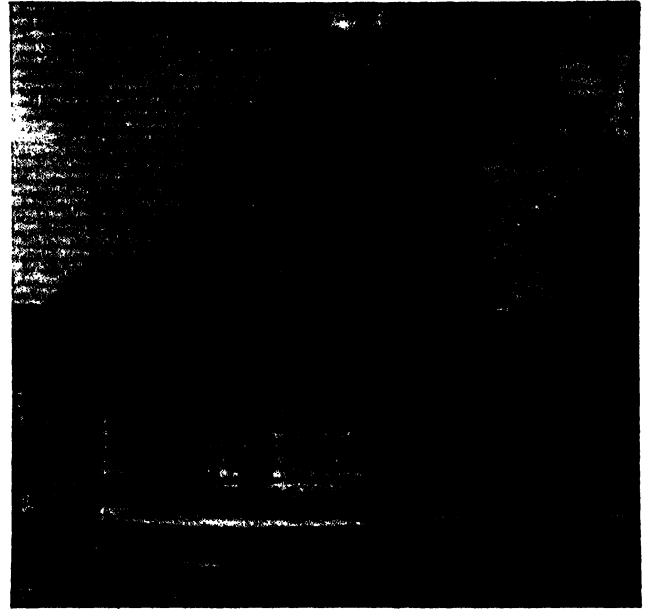
জয়নগর উত্তরপাড়া সরকার বাড়ির বাসুদেব বিষ্ণুমূর্তি

স্থানীয় প্রবীণ মানুষের কাছ থেকে জানা যায় যে, অন্যমতে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে রুদ্রনারায়ণ জানা এখানে শিবের নিত্যপূজা একটি চালাঘরে শুরু করেন। তাঁর নামেই রুদ্রনগর। অতঃপর ১৩৫২ বঙ্গাব্দে এই এলাকার চকদার দেবেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সাগরদ্বীপের সবথেকে বড় গাজনোৎসব ও চড়কমেলা হয়। এরই অদূরে চারচালা ঘরে সিদ্ধেশ্বর প্রতিষ্ঠিত। লোকে বলে ভুটভুটির শিব।

ছত্রভোগের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ও মন্দির :

কৃষ্ণচন্দ্রপুর মোড় থেকে পায়েহাঁটা পথে ছত্রভোগ ও ত্রিপুরাসুন্দরী। বিগ্রহটি দারু নির্মিত (যন্ত্রমূর্তি পাথরের) বর্ণ রক্তাভ হরিদ্রা, চতুর্ভুজা দক্ষিণ ঊর্ধ্বহস্তে কর্কট মুদ্রা, পরিধানে রক্তাভ বস্ত্র। বর্তমান দালান মন্দিরটি কুলপীথানার কামারের চকের ধর্মপ্রাণ ঈশান কামার তৈরি করে দেন ১২৫০-৬০ বঙ্গাব্দ নাগাদ।

ত্রিপুরাসুন্দরীর উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রিপুরা রাজ্যের 'রাজমালা' থেকে। 'পুরাণপ্রসিদ্ধ রাজা যযাতি তাঁর যমুনাতীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগর থেকে স্বীয়পুত্র দ্রুহ্যুকে নির্বাসিত করলে, দ্রুহ্য পিতৃদত্ত ভূখণ্ড সাগরদ্বীপে এসে বাস করার পর মহর্ষি কপিলের আশীর্বাদে ও নিজ শক্তিবলে সাগরদ্বীপকে কেন্দ্র করে বিরাট ভূভাগ অধিকার করেন এবং নাম দিলেন "ত্রিবেগ"। "ত্রিবেগ" গঙ্গারই নামান্তর। ত্রিবেগ অর্থে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যার বেগ প্রবাহিত। হয়তো বা এই ত্রিবেগই কালক্রমে ত্রিপুরা শব্দে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে। দ্রুহ্য ও তাঁর বংশধররা বহুকাল রাজত্ব করার পর এই বংশের রাজা প্রতর্দন এই রাজ্য থেকে বহু দূরের ব্রহ্মপুত্র নদ তীরবর্তী কিরাত রাজ্য জয় করেন। "রাজরত্নাকরের" বক্তব্য, ওই কিরাত রাজ্যই পরে ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়। তাই হওয়া সম্ভব। কারণ, অনার্য কিরাতদের ভাষায় আর্য-ভাষায় ত্রিপুরা শব্দ আসতে পারে না। মনে হয় রাজা প্রতর্দনই
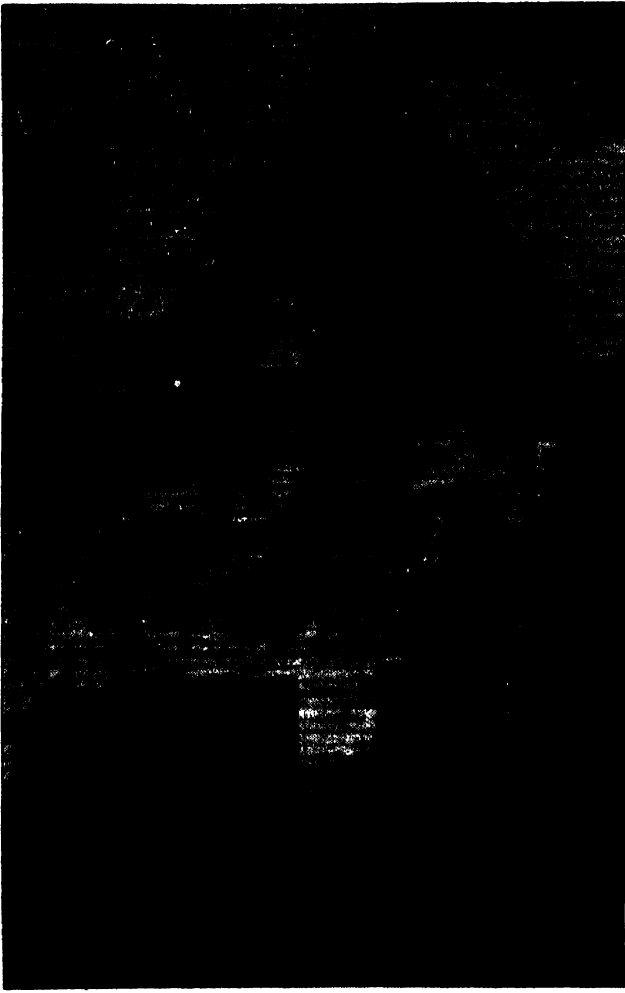
বোড়ালে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির

তাঁর আদি বাসস্থান বা উপাস্যদেবীর নামেই ত্রিপুরা শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন।

ত্রিপুরা রাজ্যর ত্রিপুরাদেবী ও কৃষ্ণচন্দ্রপুর ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা করার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এখানে ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজায় ছাগবলি হয়, বর্তমানে [illegible] পূর্বে শতবলি হত বলে জানা যায়। ওই ছাগ সাধারণের ম[illegible] দাঙ্গা করে যে ছাগটি নিতে পারবে তার হবে, এবং [illegible]। নৃশংসভাবে ছাগবলি ও ছড়প্রথা ত্রিপুরারাজ্যেও ছি[illegible] নৃশংশতার বিরুদ্ধেই ত্রিপুরা রাজ্যের পটভূমিকায় [illegible] টি লিখেছেন। তাই মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগেও [illegible] পূজিতা হতেন।

বর্তমান মন্দিরের পি[illegible] ছিল তা ধ্বংস হয়ে যায়। ওই ইষ্টক স্তূপ থেকে [illegible] কাটা পদ্ম টেরাকোটা যা অতীতকালের সাক্ষ্য, ত[illegible]।

সুন্দরবনের ৭নং লাট শি[illegible]নী[illegible] বিশালাক্ষী মন্দির ও শিবমন্দির :

এই লাটে জঙ্গলকাটি [illegible] জমিদার কালীপদ মল্লিকের (শোভাবাজার কলিকাতা) কা[illegible] কামারের চক গ্রামের ঈশানচন্দ্র কামার বন্দোবস্ত [illegible] জঙ্গল [illegible]ষ্কার করার সময় তিনি বাঘের হাত থেকে বাঁচতে বনদেবীর ওই বিশালাক্ষী পূজার থানে একটি উঁচু গাছে আশ্রয় নিয়ে দেবীর স্মরণ করে প্রাণ রক্ষা করেন। পরদিনই তিনি শোভাবাজার গিয়ে মল্লিকবাড়ি থেকে দুশো বিঘা জমির পাট্টা পান ওইখানে আবাদ পত্তনের জন্য। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে কামারের চকে পৈতৃক বাড়িতে রেখে কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কামারকে সঙ্গে নিয়ে শিবকালীনগরে যান। সেখানে তিনি প্রথমে বিশালাক্ষী দেবীর বিশাল আটচালা মন্দির ১২৮৮ সালে নির্মাণ করেন। সেইখানে তিনি তাঁর বসতবাটি তৈরি করে চিরস্থায়ী বসবাস করতে থাকেন। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, গর্ভগৃহে ছফুট উচ্চতার পিতলের চতুর্ভুজ দেবীমূর্তি বিরাজ করছেন।

ঈশানবাবুর কনিষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণবাবু ১৩৩৪ সালে ওই বিশালাক্ষী মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি পূর্বমুখী আটচালা মন্দির নির্মাণ করেন। ওই শিবের নাম দেন ঈশানেশ্বর। লিঙ্গমূর্তিটি কাশী থেকে আনেন এবং গর্ভমন্দিরের তিনফুট উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশানবাবুর সমাজসেবা দানধ্যানের বহু নজির আছে। ওই গ্রামে একটি বিদ্যালয় তিনিই করেছেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর দালান মন্দিরটি কৃষ্ণচন্দ্রপুরে তিনিই করে দিয়েছেন।

খাড়ি—রাধাবল্লভজীউর মন্দির :

স্মরণাতীত কালথেকে খাড়ি একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, মহারাজা প্রতাপাদিত্যর রাজত্বের মধ্যে। মোঘলের প্রধান সেনাপতি মানসিংহর সঙ্গে মহারাজার যুদ্ধের সময় মহারাজ কতকগুলি রাধাকৃষ্ণমূর্তি স্থানান্তরিত করেন। আদিগঙ্গার প্রবাহে নৌকা করে তাঁর রাজধানীতে ফেরার সময় রাধাবল্লভজীউকে জয়নগরে এবং অপরটি দুর্গাপুরে শ্যামসুন্দর ঠাকুর বিগ্রহকে রেখে যান সামান্য পর্ণকুটিরে।

খাড়িতে ও বর্তমান রাধাবল্লভজীউর মন্দির 'আটচালা' বাংলার শৈলী এখনও বর্তমান আছে। ওই এলাকার নারায়ণী, গাজী সাহেবের থান পুরাকালের স্মৃতিগুলি এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কাকদ্বীপ থানার ১০নং লাটে মহাদেব মন্দির :

একদা আদিগঙ্গার শাখানদী কালনাগিনী নদীর তীরে রামরতনপুর, পাশেই লেবুতলা পুরাবস্তুর ভাণ্ডার হিসেবে চিহ্নিত। ডায়মন্ডহারবার-কাকদ্বীপ বাসরাস্তায় কামারের হাট স্টপেজে নেমে, ও এন জি সির কল্যাণে যে পাকারাস্তা তার শেষে রামরতনপুর গ্রাম ও শিবক্ষেত্রে "মহাদেবতলা" নামে পরিচিত।

পূর্বে জনমানবশূন্য হিংস্র জীব-জন্তুর বিচরণভূমি এই জঙ্গলের মধ্যে একটি উঁচু ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মহাদেব-লিঙ্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। শিবকালীনগরের ভূতনাথ সরদার মহাশয় জঙ্গল কেটে আবাদী করার সময় এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মহাদেব শিবলিঙ্গর সাক্ষাৎ পান। তিনি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপর মন্দির নির্মাণ করে ওই লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ওই মন্দিরে নিত্যপূজা ছাড়া শিবরাত্রি উৎসব চৈত্রমাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব খুবই জাঁকজমকভাবে হয়ে আসছে।

বেলপুকুরের বিশ্বেশ্বর ও রুদ্রেশ্বর মন্দির :

জয়নগরের মতিলাল জমিদারের নায়েব ধর্মপ্রাণ সদাশিব পাত্রর সুযোগ্য সন্তান মহেন্দ্রনারায়ণ পাত্র বিশ্বেশ্বরের মন্দির ১২৮৯ বঙ্গাব্দে

প্রতিষ্ঠা করেন। ওই মন্দিরের দক্ষিণদিকে কিছুটা দূরত্বে আরও একটি শিবমন্দির পরে নির্মিত হয়। বিশ্বেশ্বর মন্দিরের পোড়ামাটির টালির টেরাকোটা আটচালা মন্দিরের সৌন্দর্য দেখার মতো।

কুলপীথানার বেলপুকুরের পাত্র বংশের খ্যাতি অনেককাল থেকেই।

নলগোড়ার বৈকুণ্ঠেশ্বর মন্দির :

আদিগঙ্গার শাখানদী বিখ্যাত মণিনদী। যার তীরে প্রাচীন সভ্যতা বিরাজিত। ডায়মন্ডহারবার রায়দিঘির বাসে চৌদ্দরসি স্টপেজে নেমে তিন কিমি পথ পায়ে হেঁটে মণি নদী পার হলেই নলগোড়া। সামনেই বৈকুণ্ঠ বিদ্যামন্দির, কিছু দূরে শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ বৈকুণ্ঠেশ্বর ও তাঁর আটচালা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠাকালে মণ্ডল বংশের ধর্মপ্রাণ দেশসেবক বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল ১৩৪২ সালে নির্মাণ করেন। পাশেই আছে আর এক কৃতি সন্তান করালীমোহন মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির (১৩৫২)।

নলগোড়ার প্রত্নখ্যাতি প্রত্নপ্রেমিক ও ইতিহাসবোদ্ধাদের অজানা নয়। নলগোড়ার মঠবাড়ি এখন ধ্বংস। সেই স্থানে সরকারের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। স্মরণাতীতকাল থেকে নলগোড়ার প্রত্নবস্তু বিষ্ণুমূর্তি, ব্রোঞ্জের বহু বিগ্রহ, বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রায় শতাধিক বিভিন্ন প্রত্নবস্তু প্রত্নাগারে শোভা পাচ্ছে। অঞ্চলটি কুলতলী থানার মধ্যে পড়ে।

ক্যানিংয়ের মহেশ্বর :

উনিশ শতকের মাঝামাঝি হুগলি-কলকাতার ভাগীরথীতে পলি পড়ে মজে যাচ্ছিল, তখন ক্যানিংকে শহর ও বন্দর করার চেষ্টায় আর্ল অফ ক্যানিং উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রথম রেললাইন হয় শিয়ালদহ-ক্যানিং ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে। এই পোর্ট ক্যানিং শহর করার জন্য শহরের টয়রেল চালু করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রখ্যাত মৎস্য বন্দর ক্যানিং।

সুন্দরবনে কাঠ, মধু, মাছ সংগ্রহের প্রধান পথ ক্যানিং। রুদ্ররূপিনী মাতলা নদীর তীরে ক্যানিং সাহেবের গোলকুঠির (বর্তমানে ধ্বংস) কাছেই আছে মহেশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরটি একতলা দালানকোঠার উপর শিখর মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজকৃষ্ণ নস্কর মহাশয় ১৩৭৩ সালে।

মন্দিরের গায়ে ফলকে লেখা আছে :—

(১) পিতামহ ৺রামতারণ নস্কর
পিতামহী ৺অন্নমণি নস্কর
কাকা ৺ক্ষেত্রমোহন নস্কর
কাকি ৺সৌরভীমণির আত্মার
তৃপ্তার্থে ও স্মৃতি রক্ষার্থে

রাজকৃষ্ণ নস্কর কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত ও মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হল, বাংলা ১৩৭৩ সাল। রাজমিস্ত্রি ফকির নস্কর।

বারুইপুরের নন্দীকেশ্বর মন্দির :

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এখন মহকুমা শহর। স্টেশন থেকে আটঘরা, সীতাকুণ্ডু থেকে আড়াই কিলোমিটার রাস্তা, বাস, রিক্সা অটো করে যাওয়া যায়। সীতাকুণ্ডু একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। আটঘরা প্রাচীন সভ্যতায় "অষ্টগৌড়া" আটঘরা, সীতাকুণ্ড পাশাপাশি গ্রাম।

এখান থেকে বৌদ্ধ প্রাগগুপ্ত, মৌর্যযুগের প্রত্নসম্পদ বারুইপুর প্রত্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সীতাকুণ্ডুর পাশ দিয়ে গেলেই চিত্রশালী মঠের নন্দীকেশ্বর শিবলিঙ্গ ও দালানমন্দির দেখা যাবে।

আদি গঙ্গার বিদ্যাধরী নদীর প্রবাহ এখন স্তব্ধ। কিন্তু তার প্রাচীন সভ্যতার প্রত্নবস্তু ইতস্তত মৃত্তিকার নিচে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়। নন্দীকেশ্বর লিঙ্গটিও প্রত্নবস্তু। ইনি আদিতে ধ্বংসস্তূপ থেকে আত্মপ্রকাশ করেন। জঙ্গল হাসিলের সময় কোনও জমিদার এই লিঙ্গ মূর্তিটি উদ্ধার করেন। পূর্বমন্দির ধ্বংসের ওপরই একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। তাঁর নাম প্রবীণ মানুষেরা বলতে পারেন না। বর্তমান একতলা দালান মন্দিরটি ইন্দুশেখরবাবু নির্মাণ করেছেন। সামনে নাটমন্দির। গর্ভমন্দির কয়েক ধাপ নিচে নেমে লিঙ্গ দর্শন করতে হয়। শিবরাত্রি উৎসব ও চৈত্রগাজন উৎসব মহাসমারোহে হয়।

বারুইপুরের জোড়া মন্দির :

বারুইপুরের পদ্মপুকুর মোড় দিয়ে বারুইপুর-আমতলা বাস রাস্তার পুরন্দরপুর, বারুইপুর কলেজ স্টপেজ নামলেই সামনে জোড়ামন্দির। পোড়ামাটির টেরাকোটার সঙ্গে আটচালা মন্দির। দক্ষিণে প্রথমটি নারায়ণীশ্বর দক্ষিণমুখী দরজা, দ্বিতীয়টি রামনাথেশ্বর মন্দিরটি উত্তরমুখী। মধ্যে ব্যবধান একটি চাতালের। মন্দিরদুটির দ্বার ফলক সাদা পাথরের উপর লেখা :

প্রথম ফলকে "নেত্র যুগাব্ধি তারেশ শাকে
রদং মন্দিরং কৃতম্ নারায়ণীশ্ব
রস্য = শ্রী কালীচরণ শর্ম্মনা।"

দ্বিতীয় ফলকে "ত্রিযুগাব্ধিন্দু শাকেহত্র
নির্ম্মিত মন্দির সুভা রামনাথেশ্ব।।"

প্রথমটির অর্থ—১৭৭৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীকালীচরণ শর্ম্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নারায়ণীশ্বর মন্দির ও শিবলিঙ্গমূর্তি।

দ্বিতীয়টির অর্থ—ওই ১৭৭৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শ্রীকালীচরণ শর্ম্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামনাথেশ্বর মন্দির।

এই কালীচরণ (শর্মা) হালদার ধর্মনগর, ধোপাগাছির জমিদার বংশীয় বংশধর। প্রসঙ্গক্রমে, গোবিন্দপুরে লক্ষ্মণসেনের যে তাম্রশাসন উত্থিত হয়েছিল তাহা পাঠে জানা যায় জনৈক ব্যাসদেব ব্রাহ্মণকে রাজা "বিড্ডরশাসন" গ্রামখানি দান করেন, তার চতুঃসীমা বর্ণনায় বিড্ডরশাসন গ্রামটির উত্তর সীমানায় ধর্মনগর গ্রাম উল্লেখ করেছেন। এই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধর্মনগর বা ধোপাগাছি-ধামনগর বলে পরিচিত।

কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব ও মন্দির :

বারুইপুরের পরের স্টেশন কল্যাণপুর, বারুইপুর থানা। কল্যাণপুরের কল্যাণমাধবের উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে :

"মালঞ্চ রহিল দূরে বাহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণমাধব প্রণমিল।।"

পূর্বের মন্দিরের চিহ্ন নেই, বর্তমান মন্দিরটি পঞ্চচূড়া আকারের হয়েছে। কয়েকটি পিলারের উপর ছাদ আর মধ্যভাগে উচ্চ মঠ শৈলীর চূড়া এবং চারধারে ছোট ছোট চারটি চূড়া রয়েছে। গর্ভগৃহে

কল্যাণমাধব বা বুড়োশিব। সাধারণ শিবলিঙ্গ নয়, বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

বারুইপুরের আটিসারা গৌর-নিতাই মন্দির :

"হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি আটিসারা নগরীতে।।
সেই আটিসারা গ্রাম মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রী অনন্তরাম।।
রহিলেন আসি প্রভু তাহার আলয়।
কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুদয়।।"

বৃন্দাবন দাস কর্তৃক রচিত ১৫৪৮ সালে উল্লেখ আছে, তিনি ১৫১০ খৃঃ আদিগঙ্গার তীরে আটিসারায় সারারাত্রব্যাপী নামসংকীর্তন করেছিলেন। বারুইপুরের পুরানো বাজারের কাছে একটি মন্দির আছে। সেখানে গৌরনিতাইয়ের দারুমূর্তি এবং পাশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন আছে। ওই পুণ্যতীর্থে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। বারুইপুরে বিশালাক্ষী মন্দির ও শিবানী মন্দির আছে। তবে বিশালাক্ষী পূজার খ্যাতি বহু পূর্বে শোনা গেছে।

জয়নগর-মজিলপুর জয়চণ্ডী মন্দির :

জয়নগরের নাম সর্বপ্রথম শোনা যায় পণ্ডিত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাভূষণ) রচিত কুমুদানন্দ গ্রন্থে*। তিনি রায়নগরের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, রায়মঙ্গল বন্দর থেকে সূর্যপুর এবং পশ্চিমে সরস্বতী নদী পর্যন্ত রায়নগর ছিল সুবুদ্ধিরায়ের রাজত্ব। জয়নগরের রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল করদ রাজা হিসাবে এর কিছু অংশ শাসন করতেন। তার ৪০টি রণপোত ও ৪০ হাজার সৈন্য ছিল। হাজার এক সালে জলপ্লাবনে জয়নগর ভেসে যায়, জনশূন্য হয় রায়নগর। নীলকণ্ঠ মতিলাল মগধের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। রাজার ভাই ভবানীনাথ সপরিবারের যশোর জেলার বিক্রমপুর গ্রামে চলে যান। পরবর্তীকালে কয়েক পুরুষ পরে ওই বংশের মহাত্মা গুণানন্দ মতিলাল, পৈতৃক সম্পত্তি ও ইষ্টদেবী জয়চণ্ডী পাষাণমূর্তি উদ্ধার করেন এবং স্থাপন করে [illegible] থাকনে। পরবর্তীকালে দারুশিল্পীর দ্বারা জয়চণ্ডী মূর্তি [illegible] এবং নিত্যপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে রূপপরিবর্তন, পক্ষকাল[illegible] পূজা চলে আসছে।

মহাত্মা গুণানন্দ মতিলাল [illegible] নৌকা লঙ্গর করেন সেখানে স্নানের ঘাট পাতলা [illegible]র পাশেই একটি বড় শিবলিঙ্গ ও ছোট আটচালা [illegible]

মতিলালদের দুর্গাপূজা [illegible] অনুযায়ী ১০০১ সালের পূর্ব থেকে। মতিলাল [illegible] হয় মহাসমারোহে।

জয়নগর মিত্রপাড়ার দ্বাদ[illegible]

জয়নগরে পরবর্তীকালে [illegible]থকে রামগোপাল মিত্র জয়নগরে বসবাসের জন্য [illegible] প্রভৃত ভূসম্পত্তির জমিদারি পান।

রামগোপাল মিত্রর পৌ[illegible]দের মিত্রগঙ্গার তীরে (ওইখান দিয়ে আদিগঙ্গার প্রবা[illegible]) [illegible]দিরের প্রথমটি ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে ক্রমশ অন্য পুরুষগণ একটি করে শিবলিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে একটি নবরত্ন মন্দির, অন্যগুলি আটচালা মন্দির। কয়েকটি মন্দিরে পদ্মফুল টেরাকোটা এবং একটি মন্দিরে মিথুন টেরাকোটা চোখে পড়ে। এখানে দোলমঞ্চ ও আছে, রথ হয়, মেলা হয়।
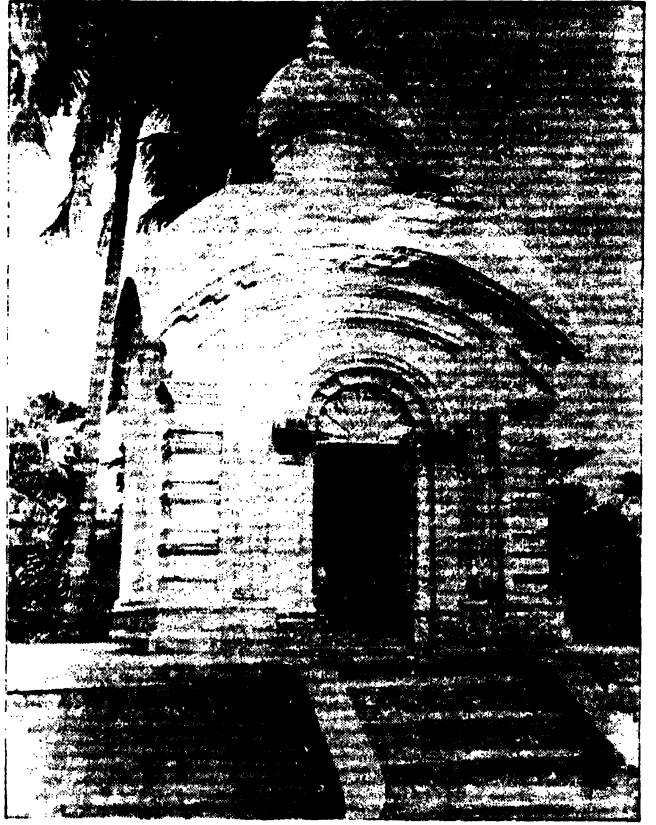
বৈদ্যপুর নলপুকুর স্যামাচরণ মণ্ডল নির্মিত শিবমন্দির ছবি : অমিয়ভূষণ দত্ত

জয়নগর রাধাবল্লভ জীউর মন্দির :

১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মহারাজ প্রতাপাদিত্যর সঙ্গে, মোঘলদের যুদ্ধ হয়, সেই সময় খাড়ি থেকে মহারাজ কয়েকটি কৃষ্ণরাধা বিগ্রহ মোঘল সৈন্যদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য রাধাবল্লভ জীউকে জয়নগরে এনে একটি ছোট মন্দির করেছেন। সেই মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। তারপরই বর্তমান মন্দিরটি শতাধিক বৎসর পূর্বে দক্ষিণ বারাশতের চৌধুরী জমিদারের পূর্বপুরুষ নির্মাণ করে দেন। বিগ্রহ দারুমূর্তিদ্বয় ৪ ফুট উচ্চ।

রাধাবল্লভ জীউর চাঁদনী, দোলমঞ্চ জয়নগরের মিত্র বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণমোহন মিত্র মহাশয় নির্মাণ করেছেন। প্রতিবছর দোলযাত্রা, ও গোষ্ঠ এখানে মহাসমারোহে মেলা ও উৎসব পালিত হয়; নিত্যপূজাও হয়। ওই মন্দিরের পাশেই সম্প্রতি শ্যামাদাস ঘটক একটি শিবমন্দির করে দিয়েছেন। ওই শিবঠাকুর রাধাবল্লভ গঙ্গা থেকেই উত্থিত। এটা "চন্দ্রশেখর শিবলিঙ্গ", একটি প্রত্নবস্তু।

---

*নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ প্রণী[illegible]৪ সালে মুদ্রিত।

জয়নগর দুর্গাপুর শ্যামসুন্দর মন্দির :

জয়নগর পৌরসভার শেষ সীমায় দুর্গাপুরে শ্যামসুন্দর মন্দির বিগ্রহ দারুমূর্তি ৩ ফুটের মতো উচ্চ। দোলমঞ্চ আছে, মন্দিরটি বিরাট ও আটচালা। দোল, গোষ্ঠ, রাস প্রভৃতিতে পূজা ও মেলা হয়।

জয়নগরের বাসুদেব মন্দির

জয়নগর উত্তরপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত বাসুদেবের মন্দির প্রায় শতবর্ষ আগে দালান মন্দির হিসাবে সরকার বাড়ির পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বাসুদেব বিষ্ণুমূর্তি কষ্ঠিপাথরের পাল যুগের। এটি আদিগঙ্গা খাত, বড় জলাশয় খননকালে প্রাপ্ত হয়।

মজিলপুর ধন্বন্তরী কালীমাতা মন্দির :

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যখন এই অঞ্চল দিয়ে আদিগঙ্গার প্রবাহ ছিল, সেই সময় এখানে একটি শ্মশান ছিল। ন্যাতড়া থেকে স্বামী ভৈরবানন্দ নামে একজন সাধক ওইস্থানটিকে সাধনার উপযুক্ত ভেবে এখানে সাধনায় রত হন। তিনি প্রত্যাদেশ পান পাশের পদ্মপুকুরের কোণে আমি আছি আমায় উদ্ধার করে পূজা কর, মঙ্গল হবে। স্বামীজী ওই পুকুরে সন্ধান করে একটি কষ্ঠিপাথরের কালীমূর্তি পান (৮"x৬")। অতঃপর একটি কুঁড়েঘরে পূজা-অর্চনা করতে থাকেন।

ন্যাতড়া নিবাসী রাজেন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি এইখানে নিয়ে আসেন। পূজা-অর্চনা শেখান। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে আদ্যাশক্তি একটি বাতের ওষুধ দেন, তা পানের মধ্যে দিয়ে খেলে বাত থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সেই থেকে এই কালীবিগ্রহটি ধন্বন্তরী কালী নামে পরিচিত। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে বিশেষ পূজা হয়। হাজারে হাজারে মানুষ রোগমুক্তির জন্য মায়ের পুকুরে স্নান করে ওষুধ খান ও পূজা দেন। মায়ের পাশেই একটি শিবমন্দির স্মরণাতীতকাল থেকে রয়েছেন। ইনি মায়ের ভৈরব। মন্দিরের সঙ্গেও আরও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত। সম্প্রতি দালান মন্দিরটির উপর একটি মঠ আকারের চূড়া তৈরি হয়েছে। পাশে একটি শনিদেবতার মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত। প্রতি শনিবার হাজারে হাজারে মানুষ এই মন্দিরে পূজা দেন।

মায়ের আদ্যাশক্তির অনুকরণে একটি বড় দারুমূর্তি পূজিত। ওই মূর্তিকে বৈশাখ মাসে সন্ধ্যাকালে হাত-পা-অঙ্গ বদলিয়ে চণ্ডীমতে ১৫টি দৃশ্যের মাহাত্ম্য পরিবেশিত হয়। মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক শো দোকান, দোলা, ম্যাজিক, চিড়িয়াখানা, খাবার ও মনিহারীর দোকানে অঞ্চলটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

মজিলপুর ভট্টাচার্যপাড়ার মন্দির :

প্রায় ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, মোঘল সৈন্যর অত্যাচার সহ্য করবার ভয়ে (জাতিচ্যুত) মহারাজার মুনসি চন্দ্রকেতু দত্তর সঙ্গে যজ্ঞে পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা ও পুরোহিত রঘুনন্দন পোতা, আদি গঙ্গার ধারা ধরে জঙ্গলের মধ্যে একটি চড়ায় অজ্ঞাতবাস করতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতার ষষ্ঠপুরুষ বৈদ্যনাথ তর্কপঞ্চানন ১৭৩৭ শকাব্দে একটি মন্দির নির্মাণ করেন, নাম "বৈদ্যনাথ"। মন্দিরটি আটচালা। মন্দির শীর্ষে পোড়ামাটির ফলকে লেখা :

"ধীরে গঙ্গাজলে : কদম্ববিটলৈরাম্রৈঃ পলাশৈ দ্বিজৈ—
শ্চাত্রৈ দৈবগৃহে মার্জ্জলপুর উমানাথালয়ং নির্ম্মামে।।
শাকে সিন্ধু শিবাব্ধি সাগর ধরামানে হিরা শিল্পিনা।
কাশীনাথ পদারবিন্দু মধুলিট্ শ্রী বৈদ্যনাথ দ্বিজঃ।।"

*পণ্ডিত, গঙ্গা, কদম্ববিটপাদি, আম্রে, পলাশবৃক্ষ, দ্বিজ, ছাত্র, ও দেবগৃহ সমন্বিত প্রাচীন মজিলপুরে শিক্ষার জন্য অনেক চতুষ্পাঠীও ছিল। রাজা ও ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব থেকে বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হত। এই মন্দিরটি ১৭৩৭ শকাব্দে নির্মিত হয়। বৈদ্যনাথ তর্কপঞ্চানন ইনি শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতার নিম্নতম ষষ্ঠপুরুষ।
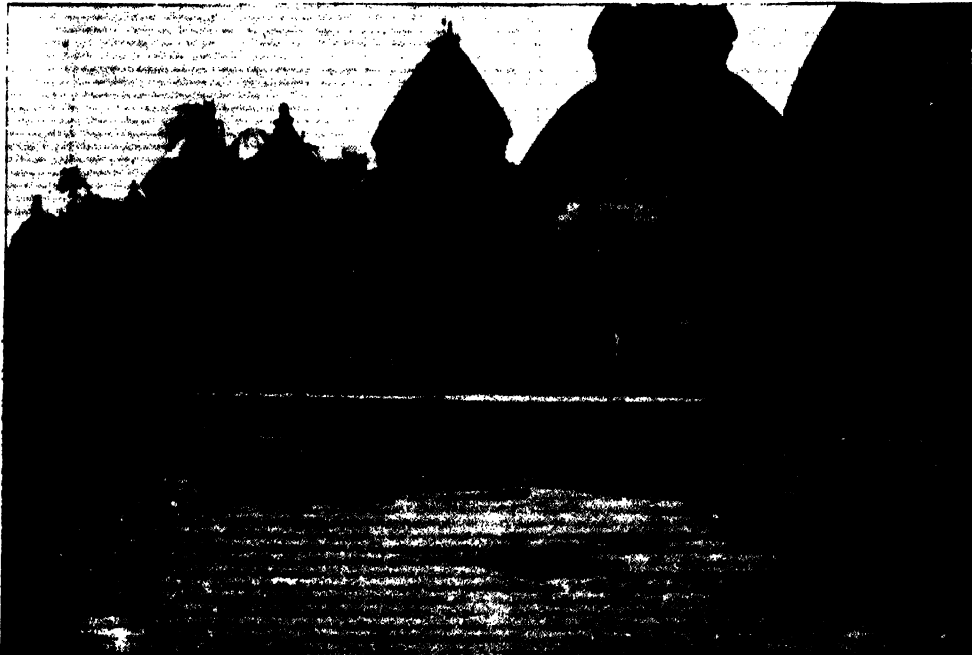
প্রসঙ্গক্রমে জানাতে হচ্ছে ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ার্ড নামে জনৈক ইউরোপীয় পাত্রী তৎকালীন কলকাতা, নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের চতুষ্পাঠীসমূহের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তাতে মজিলপুর ১৭/১৮টি চতুষ্পাঠী ছিল বলে উল্লেখ করেন।

মজিলপুর ভট্টাচার্যপাড়ার শিবমন্দির :

ওই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর, শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা বংশের ৭ম পুরুষ চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ওই বড়ঘাটে আর একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও আটচালা মন্দির।

অনুরূপভাবে সিদ্ধান্ত বাটীর কালিদাস সিদ্ধান্ত মহাশয়ও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও আটচালা মন্দির।

মজিলপুর ব্রহ্মচারীবাড়ির শিবমন্দির ও কালীমন্দির :

এই মন্দির দুটি অভিনব স্থাপত্যশৈলীর। চারধারের ভিত ও দেওয়াল, মাঝে কোনও কড়ি-বরগা নেই। ইসলামিয়া স্থাপত্যের ধারায় মন্দির দুটির একটিতে শিবলিঙ্গ অপরটিতে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত।

দেড়বেড়িয়ার মন্দির :

মজিলপুর দেড়বেড়িয়ায় প্রথম মন্দিরটি শিবমন্দির। তা ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি রেখ আদলে নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় মন্দিরটি কৃষ্ণরাধা (রাধাকান্তযুগল) মন্দির। এটি মন্দিরটি ১৪২৭ সালে ব্রজকৃষ্ণদেব নির্মাণ করেন। বর্তমানে প্রায় শত বৎসর হয়েছে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ কলকাতার এন্টালীতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ওইখানে স্থানান্তরিত করেন এদেরই পূর্বপুরুষ দেবনারায়ণ দেব। বর্তমান মন্দিরটার টেরাকোটা শিল্পকলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বিস্মিত হয়েছেন। ভগ্নদশা মন্দিরটি এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ময়দা কালীমন্দির :

আদিগঙ্গার তীরে ময়দা বহু পুরোনো গ্রাম। ততোধিক প্রসিদ্ধ ও জাগ্রতা "ময়দার কালী"। ময়দার আদি বাসিন্দা প্রয়াত সুনীল সরকার ব্যাখ্যা করেছেন ময়দানব থেকে ময়দা হয়েছে। পুরাণে ময়দানব পাতালপুরে [illegible]। [illegible] অঞ্চল পাতাল ছিল বলে বহু নজির পাওয়া যায়।

কালীমূর্তি কষ্টি [illegible] মন্দিরগহ্বরে প্রোথিত, প্রবাদ আছে যে, এর খননে [illegible] যায়নি। এখনও সেখানে জল থাকে, তার পাশেই কা[illegible] শিবলিঙ্গর আর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। সে গর্ভগৃহে [illegible] প্রস্তর আছে যা প্রত্নবস্তু প্রাগগুপ্তর কথা স্মরণ [illegible] নিত্যপূজা, উৎসব, শক্তিপূজার তিথিগুলিতে সমারোহে [illegible], [illegible] এবং মাঘ মাসের প্রথম তারিখে গঙ্গাদেবী পূজা উপলক্ষে [illegible], হাজারে হাজারে মানুষ পূজা ও কেনাবেচা করেন।

জয়নগর রাধাবল্লভজীউর দোলমঞ্চ
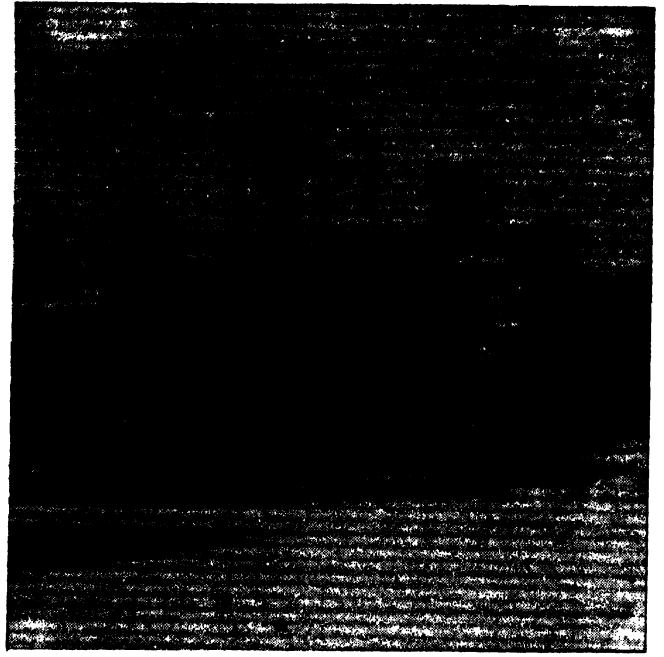
সরবেড়িয়ার মুলীকালী মন্দির :

৮০নং বাসে অথবা হোগলা স্টেশনে নেমে মালীপাড়ায় যাওয়া যায়। মালীকালীর রূপ কালো পাথরের ২$\frac{1}{2}$ ফুট উচ্চ, নিচে শেষ কোথায় তার নাকি কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সেবায়েতরা বলেন প্রতি বছর একটু করে বৃদ্ধি হয়। মন্দিরটি সম্প্রতি মঠের আদলে তৈরি। নিত্যপূজা, মানত, রোগমুক্তি-ভক্তদের স্থির বিশ্বাস যে মা মুক্ত করেন।

মালীকালীর সামনে কুলপী মেইন রাস্তার ওপারে যে বাগানে এখন চাষ হচ্ছে বেশ কিছু বছর পূর্বে চাষের সময় একটি কালোপাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ডঃ পরেশ দাশগুপ্ত তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা। তিনি উপস্থিত হয়ে বেশ কিছু ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করেন। এখানে জমির মালিকদের বাড়িতে কারুকার্যমণ্ডিত চৌকো ও লম্বা থামবিশেষ পূজা হচ্ছে।

খুকীকালী মন্দির (বজবজ) :

বজবজ চিত্রগঞ্জ শ্মশানঘাটের কাছে খুকিকালী মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী আটচালা। মন্দিরে প্রাচীন চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী কালীমূর্তিটি (কষ্টিপাথরের) এক ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। দেবীর পদতলে শিব নেই। ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য দেবী খুকিকালী নামে প্রসিদ্ধ। মন্দির ঘরের মেঝে শ্বেতপাথর দ্বারা মণ্ডিত এবং বাইরের বারান্দা মোজাইক করা। এর সম্মুখে নাটমন্দির অবস্থিত। জানা যায়, স্বামী পূর্ণানন্দ নামে জনৈক সাধক এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে মন্দিরটি বজবজ নিবাসী আশুতোষ ধর মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী বাংলা ১৩৪৩ সনে নির্মাণ করেছিলেন। পরে মন্দিরের সংস্কারকার্য হয়েছে।

দ্রঃ (ক) রবীন্দ্র [illegible] [illegible]কৃষ্ণ বসু লিখিত ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা[illegible] পরগনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ; ১৩৮১।

(খ) ডঃ দীনে[illegible] সেন — [illegible] বঙ্গ ২য় খণ্ড। ত্রিপুর রাজরত্নকম।

* কালিদাস দত্ত লিখিত "মজিলপুর" প্রবন্ধ "বঙ্গ" শারদীয়া পত্রিকা।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দির পুরাকীর্তি

● গোপালনগর গ্রামের প্রাচীন সীতারাম মন্দির ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল

● বাওয়ালির প্রাচীন আটচালা রাধাকান্ত মন্দির স্থাপিত ১৭৭১ খ্রিঃ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দির

● হাউরি হাটের প্রাচীন শিব মন্দির   ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল

● বাওয়ালির মন্দির পরিবেশ   ছবি : দেবাশিস
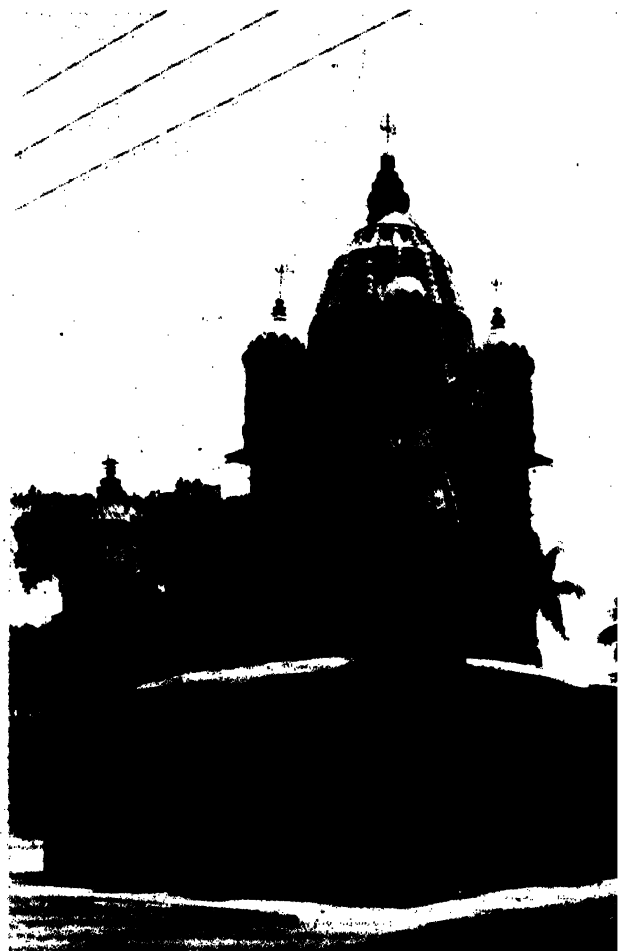
ডায়মন্ড হারবার, শারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল মন্দির

হরিহরধাম মন্দির :

মন্দিরটি টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পূর্বে অবস্থিত। ১২৫৩ বঙ্গাব্দে বাওয়ালি মণ্ডল পরিবারের প্যারীলাল মণ্ডল হরিহরধাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির সংলগ্ন স্থানে আটচালাবিশিষ্ট দ্বাদশ শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাধামদনমোহন জীউর মন্দির :

উক্ত মণ্ডল পরিবারের উদয়নারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির সংলগ্ন আটচালা গঠনের দ্বাদশ শিবমন্দিরগুলি মানিকনাথ মণ্ডল কর্তৃক ১২০০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত হয়েছে।

বাওয়ালির গোপীনাথ জীউর মন্দির :

মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণলিপি থেকে জানা যায় ১২০১ বঙ্গাব্দে এই মন্দিরটি মানিক মণ্ডল মহাশয় নির্মাণ করেন। নাটমন্দিরের সামনে আটকোণাকৃতির রাসমঞ্চ অবস্থিত। এটা পঞ্চচূড়া মন্দির।

রাধাকান্ত জীউর মন্দির :

বাওয়ালি মণ্ডল পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কীর্তি। মন্দিরটি ১৬৯৩ শকাব্দে হরানন্দ মণ্ডল কর্তৃক স্থাপিত। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ শ্বেতপাথরের দ্বারা মণ্ডিত এবং চারপাশের বারান্দা বেলে পাথরের। মন্দিরের দেওয়ালে প্রাচীন পোড়ামাটির শিল্পকর্ম এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।

রাধবল্লভ জীউর মন্দির :

বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাটে এই মন্দিরটি অবস্থিত। আটচালাবিশিষ্ট মন্দিরটি মণ্ডল ভূস্বামীদের জ্ঞাতি কৃষ্ণচরণ মণ্ডল ১২১৯ বঙ্গাব্দে নির্মাণ করেন। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরে কাঠের মঞ্চের উপর কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ এবং পিতলের গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরাতন চাঁদনীর শিবমন্দির :

ক্যানিং শহরের উত্তরে ২নং লঞ্চ জেটিঘাটের কাছে মন্দিরটি অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে বয়সে একশো বছরের কম নয়। কথিত আছে ক্যানিংয়ের পুরাতন ধনী শুকো মহাজন নদীর মধ্যে পাওয়া একটি স্বর্ণমোহর দিয়ে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে হরিমোহন সা নামে জনৈক ব্যবসায়ী মন্দিরের সংস্কার করেন।

মালঞ্চ পঞ্চবটী মন্দির :

আদিগঙ্গার তীরে, মল্লিকপুর-সুভাষগ্রাম স্টেশনের মাঝে ৮০নং রুটে মালঞ্চ স্টপেজ। আদিগঙ্গার তীরে অতীতে একটি বড় ঘাট (ছোট বন্দর) ছিল। স্থানটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নমুনা খনন করে পুরাসভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন। এইখানে একটি পুরাতন কালীমন্দির আছে। কয়েকটি শিবমন্দিরও আছে। তার মধ্যে আকর্ষণীয় পঞ্চশিব। মধ্যে শ্বেতপাথরের একটি শিবলিঙ্গ তার চারপাশে ৪টা শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। মন্দিরটিও অভিনব। বয়সকাল নির্ধারণ করা যায়নি। কিন্তু মালঞ্চ গ্রামের নাম অতীতের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মালঞ্চ পঞ্চশিব :

মল্লিকপুর স্টেশনে নেমে মাহিনগর গ্রাম ফেলে মালঞ্চ গ্রামে যেতে হয়। ৮০নং বাসে পঞ্চবটী স্টপেজ। মালঞ্চ শিবমন্দির পঞ্চশিব, মাঝে শ্বেতপাথরের লিঙ্গ, চারধারে একই বেদীতে চারটি শিবলিঙ্গ একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। নিকটেই আদিগঙ্গার প্রবাহ ছিল, যাওয়ার পথেই কালীমন্দির। স্থানটার নাম "পঞ্চবটী"। মন্দিরটি গোলাকৃতি, চারধারেই খোলা, মাথায় মঠ আদলে চূড়া।

হরহরিতলা হরহরি মূর্তি :

মালঞ্চ থেকে দুই স্টপেজ বাসে হরহরিতলা বিখ্যাত ও প্রাচীন। পূর্বে একটি বটবৃক্ষের ভিতর মন্দিরেই উনি পূজিত হচ্ছিলেন, বর্তমানে স্থানীয় মানুষ একটি মন্দিরঘর করেছেন। নাম কীর্তন, পূজা ও মেলা হয়।

হরিণাভি শিবমন্দির :

রাজপুর পৌরসভায় সামনে দুটি মন্দির আছে গঙ্গাতীরে। হরিণাভি মাঠের উত্তরে একটি দোলমঞ্চ আকারে পরিত্যক্ত মন্দির আছে। ভগ্নদশা, কিছু কিছু পোড়ামাটির টেরাকোটা এখনও ওইগুলির সৌন্দর্য যে পূর্বে ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রাজপুর কালীমন্দির ও বিপত্তারিণী মন্দির :

রাজপুর বাজারের পরের স্টপেজ একটি কালীমন্দির ও বিগ্রহ পূজিতা হচ্ছেন। বিপত্তারিণীর নিত্যপূজা হয়। উভয় কালীর প্রচার ও খ্যাতি আছে।

মথুরাপুর, বাপুলি বাজারে

৫টি মন্দির :

শতাধিক বছর আগে থেকে স্থানীয় বাপুলি জমিদার ব্রাহ্মণ পরিবার, এইখানে বসবাস শুরু করেন। এইখানে পরপর পাঁচটি শিবমন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেইখানে বর্তমানে হাট বসে, মন্দিরগুলির আটচালারীতিতে তৈরি।

বর্তমানে তিনটি মন্দির সংস্কার হয়েছে। এর সামান্য দূরে বাপুলিদের বাড়ির সামনে সম্প্রতি একটি আধুনিককালের মন্দির হয়েছে। এটা শক্তিদেবীর মন্দির।

বোড়াল, ত্রিপুরাসুন্দরী :

৮০ নং বাসে গড়িয়ার গোলের পর, কামাল গাজীর মোড়ে নেমে বোড়াল যেতে হয়। বোড়ালের ত্রিপুরাসুন্দরী অতি প্রাচীন দেবী কিন্তু পুরনো মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। তার ওপর দালান পঞ্চরত্ন আদলে নির্মিত। বোড়াল একটি প্রাচীন ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার স্থান। বহু প্রত্নবস্তু এই মন্দিরচত্বর থেকে পাওয়া গেছে। ওইখানেই সেনদীঘি থেকেও প্রত্নবস্তু যা পাওয়া গেছে তাতেঅনেকের অনুমান বুদ্ধসংস্কৃতির চিহ্ন রয়েছে। ওইগুলি একত্রে সংগ্রহ করে একটি সংগ্রহশালাও গঠিত হয়েছে। বোড়াল মহাশ্মশানে দুটি শিবমন্দির আছে। স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, একটি অতিপ্রাচীন, শ্রীমন্ত সদাগর এই গঙ্গা দিয়ে যাওয়ার পথে পূজা করে যান। অপরটি রানী রাসমনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আটচালা মন্দির।

অবশিষ্ট মন্দিরের তালিকা :

১। জয়নগরে, রামহরি পঞ্চচূড়া মন্দির ও একটি শিবমন্দির।

২। দক্ষিণ বারাশতে বোসেদের তিন শিবমন্দির।

৩। বহড়ু শ্যামসুন্দর মন্দির যার প্রাচীন চিত্র বিখ্যাত।

৪। মথুরাপুর থানার পাশ দিয়ে তিন কিমি দূরে জাতুয়াদের শিবমন্দির।

৫। মাধবপুর স্টেশন থেকে দক্ষিণে তিন কিমি রাস্তা যাদবপুর বৈদ্যপাড়ায় নীলমণি হালদার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির।

৬। উত্তর লক্ষ্মীনারায়ণপুর, সুঁন্ডীর হাটের কাছে বড়বাবুদের শিবমন্দির।

৭। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খাড়ি অঞ্চলে খাঁড়াপাড়ায় দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত।

৮। খাঁড়াপাড়া হাই স্কু[illegible] সাম[illegible] [illegible]মণিদের শিবমন্দির।

৯। কাশীনগর থেকে [illegible] বাহিরকাঞ্চলী গ্রামে মণ্ডল জমিদারদে[illegible] কালীমন্দির।

১০। কৃষ্ণচন্দ্রপুর থে[illegible] গিলার হাঁট গ্রামে একটি শিবমন্দি[illegible]।

১১। ২৭নং লাট কো[illegible] গেলে রাস্তার ধারে হালদারদের শি[illegible]।

১২। লক্ষ্মীকান্তপুর, [illegible]দীঘির পাড়ে একটি শিবমন্দির আছে।

১৩। মজিলপুর, কয়া[illegible]র পূর্বপুরুষ গৌরভদ্র একটি শিবমন্দি[illegible]।

১৪। মজিলপুর, স[illegible] কেদার কাম্যায়ন, পঞ্চচূড়ার শিব[illegible]ন। তারও পূর্বে একটা শিবমন্দিরের ধ[illegible]ন পাওয়া যায়।

১৫। মজিলপুর পোঁড়াপাড়ায় শ্যামসুন্দর যুগলমূর্তি একটি দালান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

১৬। মজিলপুর দত্তবাটীতে শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মন্দির ৩০০ বৎসরের প্রাচীন পঙ্কের কাজে জলুসের স্মৃতি রয়েছে।

১৭। মজিলপুর ঠাকুরপাড়ায় একটি গোপাল জীউর চালা মন্দির ও গোপাল ৩০০ বছরের প্রাচীন।

১৮। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মন্দির।

১৯। হাঁসুড়ি বোসেদের শিবমন্দির।

২০। ডায়মন্ডহারবার, সরিষা, রায়চৌধুরীর মদনগোপাল ও কালীমন্দির।

২১। জয়নগর ঘোষেদের শিবমন্দির ও গোলজীউর দোলমঞ্চ প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে রূপনারায়ণ ঘোষ নির্মাণ করেন।

২২। জয়নগর তিলিপাড়ায় কেদারনাথ পালের পত্নী কাদাম্বিনী পাল ১৩৪৪ সালে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

২৩। জয়নগর তিলিপাড়ায় ডাকাতে কালী (কষ্টিপাথরের), কানাই শ্রীমানী মন্দির ও প্রতিমা ১৩৩৯ সালে কার্তিক মাসে প্রতিষ্ঠা করেন।

২৪। বৈদ্যপুর, নলপুকুর গ্রামে শ্যামাচরণ মণ্ডল কর্তৃক নির্মিত শ্যামাচরণ শিবলিঙ্গ ও মন্দির।

২৫। বহড়ু, বোসেদের আদিগঙ্গার তীরে বর্তমান বাজারের শেষে দুটো শিবলিঙ্গ ও মন্দির আছে।

২৬। মগরাহাট বাজারের কাছে কালীমন্দিরে কষ্টিপাথরের কালী খুবই জাগ্রত, চারচালা মন্দির।

২৭। বনমালীপুর কেটোয়ারা, মদনমোহন প্রতিষ্ঠিত।

২৮। মগরাহাট—রাধাগোবিন্দর মন্দির।

২৯। মজিলপুর, দত্তবাটী ত্রয়ী মন্দির

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মস্‌জিদ ও গীর্জা

সাহী মস্‌জিদ :

প্রসংগত প্রথমে বলে রাখি ২৪ পরগনার বসিরহাট এলাকার চৌরাশী গ্রামের পাশেই, ইছামতী নদীর তীরে "রায়কোলো" গ্রামে নিম্নবঙ্গের প্রথম মসজিদ সাহী রায়কেলা মসজিদ। সাত গম্বুজবিশিষ্ট সাহী মসজিদটি ১১৪২ হিজলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদটি ১১৫ ফুট লম্বা, চওড়া ২৫ ফুট (বাইরে) চারধারের ভিত ও দেওয়াল ছয় ফুট করে। প্রতি তের ফুট অন্তর ৪ ফুট চওড়া আড়াআড়ি খিলান দিয়ে একটি করে গম্বুজ। এইভাবে সাতটা গম্বুজ আছে।

হলটা আগাগোড়া একশোফুট একনাই উপাসনার বা নামাজ পড়ার উপযুক্ত। মধ্যে একটি ছোট সিংহাসন যেখানে প্রধান উপাসকের বসার স্থান রয়েছে।

এখানে শুক্রবারের নামাজে ইমামের খুৎ বা পাঠে ব্যবহৃত হয়। এটা মক্কার কাবা মসজিদের পূর্বদিকে নির্মিত হয়, যেন নামাজের সময় মক্কার দিকে মুখ থাকে।

সাহী সাত গম্বুজ মসজিদটির প্রধান তোরণের সামনে কালো পাথরের ফলক আছে।

তা নিম্নরূপ (বাংলায় উচ্চারণ) :

"বিসমিল্লহের রহমানের রহিম
রায়লাহা এললাল লাহ
মহম্মদ রাসুউল্লা,
হজরত আবুবকার
জহরত উস্‌মার।
জহরত ওমর, জহরত আলি
স্বাহ সৈয়দ মহম্মমোস্তফা
১১৪২ হিজলী।"

সুদুর আরব দেশ থেকে ওই চারজন ধর্মপ্রচারক বাংলাদেশে ওই সাত গম্বুজের মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন বলে আরবি বিশেষজ্ঞগণ লেখককে জানান। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন "১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে অথবা তার কিছু পূর্বে সুলতান রুকনুদ্দীন বরাবকের রাজত্বে সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ঐ সময় বসিরহাটে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।"

সাতগম্বুজ মস্‌জিদ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী গঙ্গাধর সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রয়াত কালিদাস দত্ত মহাশয়, বৃহৎবঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ডে) বসিরহাটের সাহী মস্‌জিদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

নিম্নবঙ্গের এই মসজিদটিই প্রথম মসজিদ।

মগরাহাট জামী মস্‌জিদ :

মগরাহাট স্টেশনের কাছেই এই জামী মসজিদ। বর্তমান মসজিদের ১ম ইমাম প্রতিষ্ঠাতা হাজি রমজান আলী মিয়া বললেন মৌলানা আব্দুল হক সাহেব বড় মিয়া পুরনো মসজিদটি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় নির্মিত। তা জীর্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বর্তমান বিরাট আকারে এই মসজিদে প্রায় ৫০০ মুসলিম একত্রে নামাজ পড়তে পারবেন, সেইমতো এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে।
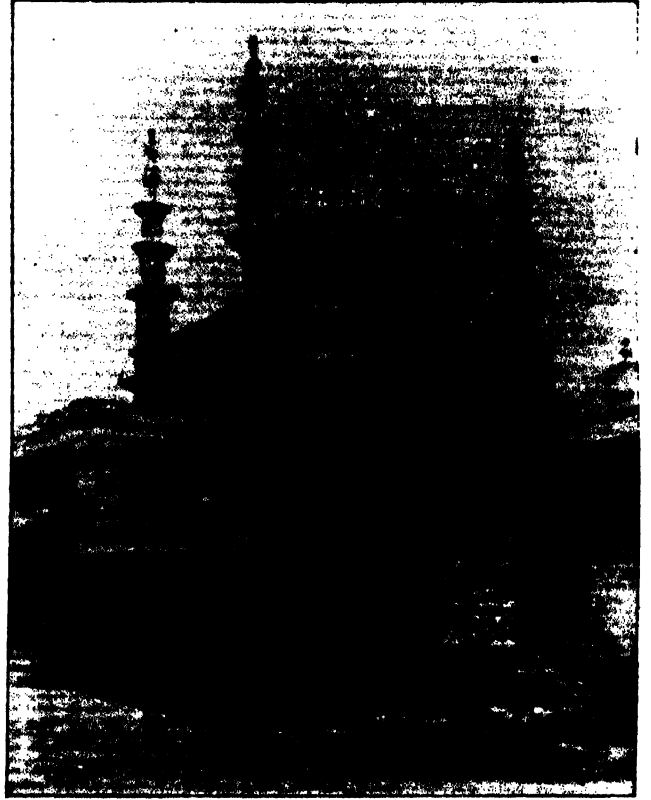
ঘুটিয়া শরিফ, মোবারক গাজির মাজার — ছবি : লেখক

এই মসজিদের নেতৃত্বে কয়েক বছর আগে আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্মেলন কয়েকটি হয়ে গেছে। সেই সময় মগরাহাট স্কুল মাঠ ও তৎসংলগ্ন জমি যুক্ত করে একসঙ্গে দেড় লক্ষ মুসলিম নামাজ পড়েছিলেন। মসজিদে কোনও ফলক নেই। কিছু রেকর্ড আছে, মসজিদ তালিকাও আছে।

তিল্লী জুম্মা বড় মসজিদ :

গোচারণ স্টেশন থেকে ঢোষা, সেইখান থেকে ৪ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে তিল্লী। এইখানকার দ্বিতীয় মসজিদ জুম্মা বড় মসজিদটি ১৩৩১ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা হাজী আব্দুল গফুর সেখ ইনি ১৩৩৭ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। বড়মাস্টার আবুতেএক সেখ বর্তমানে ইমাম সাহেব। মসজিদটি গোলখিলান গাঁথা, পেটানো ছাদ ভিতরের ভাগ। সামনে জমানো ছাদ ৭০ ফুট চওড়া। ওই এলাকায় যক্ষের পুকুর ও বিভিন্ন ঢিবি থেকে প্রচুর প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। যা দেখলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

তিল্লী আহলে হামিদ মসজিদ :

ওইখান থেকে আরও ভিতরে প্রথম মসজিদের সন্ধানে গেলাম। এই মসজিদটির গায়ে ফলকে লেখা ১২০৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মহসীন মন্ডল (বয়স—৯০ বৎসর) (মোয়াজ্জীন) বললেন, হাজি দবিবদ্দিন রাজসাহী থেকে তিল্লীতে আসেন। বর্তমান মসজিদের ইমাম মহম্মদ সিরাজুল ইসলাম। মসজিদটি ৩৩ ফুট চৌকো পুরনো গাঁথুনি, চুন-বালির পলেস্তারা।

চণ্ডীপুর মসজিদ :

ময়দা বুড়ারঘাট দ্বারির জাঙ্গাল বর্তমানে পাকা রাস্তা, ময়দার কাছাকাছি চণ্ডীপুর গ্রাম। মসজিদটির শতবর্ষ হয়নি, পূর্বে একটি চালাটালীর ঘরে নামাজ পড়া হত। অর্ধশত বৎসর পূর্বে উদ্যোক্তা নুর মহম্মদ, কাজীউদ্দিন মিস্ত্রী, দুধ আলী মোল্লা এটা নির্মাণ করেন। বর্তমান ইমাম আব্দুল ওদুদ শেখ (কাকাপাড়া)।

ময়দা উত্তরপাড়া পুরনো মসজিদ :

স্থানীয় প্রবীণ মুসলমানগণ বললেন, মিস্ত্রিপাড়ার মসজিদ শতবর্ষ পার হয়েছে. প্রতিষ্ঠার পেছনে উদ্যোক্তাগণ ছিলেন—মহরুদ্দিন মিস্ত্রি, ধনমণী মিস্ত্রি, আব্দুল মান্নান মিস্ত্রি।

উত্তরপাড়া নীজ কাজীপাড়া মসজিদ :

ময়দা-বহড়ু রাস্তার ধারেই কাজীপাড়া মসজিদ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বললেন ১২০ বছরের পুরনো মসজিদ। প্রতিষ্ঠাতা কাজী আব্দুল মজিদ, কাজী আব্দুল হান্নান, কাজী আব্দুল সহীদুলা।

ফতেপুর গাজী মসজিদ :

মসজিদটি প্রায় শতবর্ষে। পুরনো মসজিদটির সামনে একটি চারকোণা ৫০ফুট চৌকো ঢালাই ও মোজাইক করা। অধুনা নির্মিত।

তিলপির আহলে হামিদ মসজিদ *ছবি : লেখক*
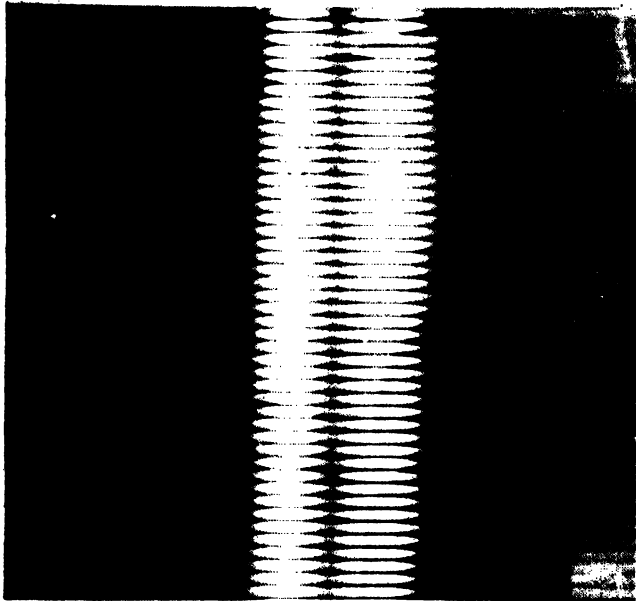
এখন ইমাম আছেন মৌলানা ইস্তাহার বাগানী। জানালেন, নুর হোসেন, বয়স ৭০।

রামকৃষ্ণপুর পুরনো মসজিদ (দর্জিপাড়া) :

প্রায় দুশো বৎসর পূর্বে জনৈক আরপিন সাহেব এখানে আসেন। তিনি কাঁচা মসজিদটি পাকা করেন নিজ অর্থ ও সাধারণের অর্থে। ইতিপূর্বে জমিদার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রর আমলে পশ্চিম থেকে ভজ দর্জিকে তাঁদের জামা সেলাই করার জন্য জয়নগরে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। মিত্ররাই ওই ভজ দর্জিকে এই এলাকায় বসবাসের জন্য জমি দান করেন। তিনি এই মসজিদটি কাঁচায় করেন, তাঁর বংশের খাজাবক্সা (৮০) এই কথা বলেন। মসজিদটির গম্বুজ আছে, ইমামসাহেবের নামাজ পড়ার স্থান মিরাবও আছে। বর্তমান ইমাম—মহম্মদ ইয়া সুতা মিস্ত্রি।

ভাঙ্গড় পীরের মাজার :

ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মৌজায় পীর ভাঙ্গড় সুলতান সাহেবের পাকা মাজার অবস্থিত। শোনা যায় পীঠের প্রকৃত নাম আসগর। মাজারটি শতধিক বছরেরও প্রাচীন। প্রতি বৎসর ১৬ চৈত্র পীরের নামে উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে বহু মানুষের সমাগম লক্ষ করা যায়।

বাবন পীরের মাজার :

ভাঙ্গড় থানার শাঁকশহর গ্রামে বাবন পীরের মাজার অবস্থিত। মাজারটি শতাধিক বছরের প্রাচীন। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায়, বাবন মোল্লা এই গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আবাল্য ধর্মানুরাগী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পীর আখ্যা পান। তিরোভাব দিবসকে উপলক্ষ করে প্রতিবৎসর এখানে হিন্দু-মুসলমান হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। পীরের হাজোত দিয়ে অনেকে এখান থেকে মন্ত্রপূত তেলপড়া সংগ্রহ করেন। মাজারের সামনে দশবারোদিন ধরে মেলা হয়।

ক্যানিং শাহী জামি মসজিদ :

ক্যানিং শহরে অবস্থিত। সুফিসাধক মস্তান বাবাজি ১৯০৫ সালে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদের বর্তমান পাকা দালানটি সাম্প্রতিককালের। মসজিদের পাশে মস্তান বাবাজীর করবগাহ আছে।

ঘুটিয়ারি শরীফ মাজার :

ধর্মপ্রচারক মোবারক পীর সাহেব জঙ্গলমধ্যে ঈশ্বর সাধনায় অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। রাজা মদন দত্ত ছিলেন। বড় জমিদার। তাঁকে বাকি খাজনার জন্য ঢাকার নবাব শায়েস্তা খান কয়েদ করেন। বিচারের দিন মোবারক গাজীর অলৌকিক ক্ষমতায় নবাব রাজসভার চারিদিকে বাঘ দেখেন এবং মদন দত্তকে খালাস করে দেন। লৌকিক গাথা এইরূপ। তখন সুন্দরবনে জল হয়নি। মানুষ, জীবজন্তু জলকষ্টে মারা যাচ্ছে। গাজীসাহেব আল্লার কাছে জল দেওয়ার প্রার্থনায় নিজ দেহ ওইখানে রেখে প্রাণ বা আত্মা নিয়ে আল্লার দরবারে

গিয়াছিলেন। সময়মত ফেরেননি। তাই মরদেহ মাটিতে দেওয়া হয়। মদন দত্ত ওইখানে মাজার ও একটি পুষ্করিণী করে দেন। প্রতি বছর অম্বুবাচির দিন মেলা অনুষ্ঠান হয়।

বড়বাড়ি মসজিদ :

মসজিদটি ক্যানিং থানার আঠারোবাঁকি অঞ্চলের অন্তর্গত। আনুমানিক একশো বছরের প্রাচীন। মেঝে ও দেওয়াল পাকা। আংশিক ছাদ ঢালাইযুক্ত। মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হাজি আলিমদ্দিন বৈদ্য।

৭নং করমদিনি বাটী মসজিদ :

এই মসজিদটি বাসন্তী থানার অন্তর্গত। আনুমানিক একশো বছরের প্রাচীন। ছাদ ঢালাই ও পাকা মসজিদে একসঙ্গে প্রায় ১০০ জন মানুষ নামাজ পড়তে পারেন।

আঠারবাঁকি পুরনো মসজিদ :

ক্যানিং থানার অন্তর্গত। স্থানীয় মানুষের কথায় জানা যায়, মসজিদগৃহটি প্রায় ২০০ বছরের পুরনো। মসজিদের নামে ৬ বিঘা লাখেরাজ আছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গির্জা

বাসন্তীর বড় গির্জা :

এই গির্জার পোশাকি নাম 'চার্চ অফ্ দি সেন্ট টেরেসা অফ দি চাইল্ড জেসাস'; ১৮৭৩ সালে ২৩ অক্টোবর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার ই ডেলপ্লেস বাসন্তীতে পদার্পণ করেছিলেন। মূলত এঁর উদ্যোগে এখানে ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয় ১৮৭৪ সালের পরে। বর্তমান পাকা গির্জাটির নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৩০ সালের পরে। এঁর উদ্যোক্তা ছিলেন ফাদার পল মেসারিক। দোচালার এই বিশাল গির্জাটিতে এক হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা আছে। গির্জার সম্মুখে গাড়ি বারান্দার উপরে লম্বা কুলুঙ্গিতে মাতা মেরীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি আছে।

লক্ষ্মীকান্তপুরের পাকা গির্জা :

ব্যাপ্টিস্ট মিশনের এই গির্জাটি আচার্য জন চেম্বারলেন পেজের উদ্যোগে নির্মিত হয় ১৮৪৫ সালে। অট্টালিকাটি নির্মাণে খরচ হয়েছিল ২,৮০০ টাকা। ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির 'জুবিলি' ফান্ড' থেকে এই টাকা দেওয়া হয়েছিল।

খাড়ির ক্যাথলিক গির্জা :

এই গির্জার পোশাকি নাম 'খাড়ি অ্যাসেন্সান চার্চ'। ১৯২৭ সালে গির্জার পাকা অট্টালিকা নির্মিত হয়। এখানকার প্রথম ধর্মযাজক ছিলেন ফাদার কোমারফোর্ড। বর্তমানে ফাদার শ্যামল বোস।

মোরাপাইয়ের ক্যাথলিক গির্জা :

মগরাহাট থানার অন্তর্গত, গির্জাটির পোশাকি নাম 'স্যাক্রেড হার্ট চার্চ'। 'চব্বিশ পরগনা মিশনের' প্রতিষ্ঠাতা ফাদার ডেলপ্লেস মোরাপাইতে এসেছিলেন ১৮৭৫ সালে। ১৮৮৫ সালে এই গির্জা নির্মিত হয়।

বারুইপুরের রোমক চার্চ :

'খ্রিষ্টধর্ম প্রচার সমিতি' বারুইপুরে শাখা কার্যালয় স্থাপন করে ১৮৩৩ সালে। রেভারেন্ড সি ই ডিব্রারেজ নামে একজন ধর্মযাজকের উদ্যোগে এখানে ১৮৩৫ সালে গির্জা নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮৪৬ সালে।

ঠাকুরপুকুরের প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ :

প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসাবে রেভারেন্ড জেমস লঙ কলকাতায় আসেন। চার্চ সোসাইটির স্কুলে দশ বছর শিক্ষকতার পর তিনি ১৮৫০ সালে ঠাকুরপুকুরের ভার্নাকুলার প্রাইমারি স্কুলে যোগ দেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি এখানে চার্চ সোসাইটির গির্জাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মজিলপুর বুড়োর ঘাট, অ্যাসেম্বলি অব গডচার্চ

বারুইপুরে ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেন্ট পিটার্স গির্জা
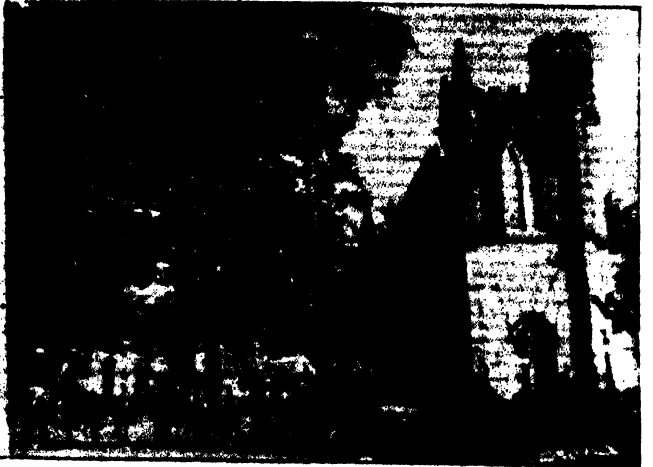
বাসন্তীর বড় গির্জা

হ্যামিলটনের গোসাবা চার্চ :

সুন্দরবনের একটি দ্বীপ গোসাবা, উনিশ শতকের প্রথমদিকে স্যার হ্যামিলটন এই দ্বীপ ইজারা নেন। জনবসতির সঙ্গে সঙ্গে, একটি চার্চ গড়ে তোলেন। কবিগুরু এই দ্বীপেই আতিথ্য নিয়েছিলেন'

অ্যাসেম্বলি অফ গডচার্চ :

জয়নগরমজিলপুরে বুড়োরঘাটে সম্প্রতি একটি অ্যাসেম্বলি অফ্ গডচার্চ গড়ে উঠেছে। প্রতি রবিবার এখানে প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়।

চম্পাহাটি খ্রিষ্ট মন্দির :

খ্রিষ্টান মেথডিস্ট স[illegible]য়ের [illegible] গির্জাটি বারুইপুর থানার চম্পাহাটিতে অবস্থিত। ১৯[illegible] [illegible] নির্মাণের জন্য সুশীলাবালা দাসীর কাছ থেকে এক [illegible] [illegible] টাকায় ক্রয় করা হয়। খ্রিষ্টান সভ্যগণের প্রদেয় [illegible] সংগৃহীত এই জমিতে ১৯৫০-৫১ সালে গির্জার [illegible] গির্জাটি কলকাতার 'সেন্ট জর্জেস চার্চের' অনুকরণে [illegible] ব্যয় হয়েছিল, দুহাজার সাতশো চুরাশি টাকা। ১[illegible] [illegible]টি রেজিস্ট্রিকৃত হয়।

ব্যাপ্টিস্ট মিশন উপা[illegible]য় :

ক্যানিং অঞ্চলে খ্রি[illegible] প্র[illegible] অগ্রদূত ব্যাপ্টিস্ট মিশনের আচার্য জর্জ পিয়ার্স। ১৮[illegible] [illegible]খানে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু হয়। এই মিশনের [illegible]টি ছিল মাটির। তখন এর পরিচিতি ছিল পোর্ট ক্যা[illegible] [illegible]র্চ। [illegible] মিশনের জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় ১৯৩৮ স[illegible] [illegible] [illegible]য়গায় চলে আসে মিশনটি। এখানেই আনুমানিক পঁচি[illegible] [illegible]র আটচালা গির্জাঘর তৈরি হয়। ঝড়ে এটা ক্ষতিগ্র[illegible] [illegible] [illegible]খান দোচালা রীতির পাকা অট্টালিকাটি তৈরি করা [illegible]

সেন্ট গ্যাব্রিয়েলস চার্চ :

ক্যানিং শহরের সর্বাপেক্ষা বড় গির্জা। ইউরোপীয় গথিক শৈলীতে তৈরি এই গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ব্যারাকপুরের প্রথম বিশপ রাইট রেভারেন্ড আর ডব্লিউ ব্রায়ান—১৯৬১ সালের ১৭ ফ্রেব্রুয়ারি। এর আগে এখানে খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি গির্জা ছিল।

নির্বাচিত সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শৈবতীর্থ = ধূর্জটি নস্কর।

২। জয়নগর মজিলপুর (প্রবন্ধ) কালিদাস দত্ত (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫)

৩। কুমুদানন্দ = নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৩১৪)

৪। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (স্মারকপত্র) ১৩৮১। সম্পাদক—প্রসিত রায়চৌধুরী

৫। দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোকশিল্প—সত্যানন্দ মণ্ডল।

৬। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস ও উপাদান—কৃষ্ণকালী মণ্ডল।

৭। বৃহৎ বঙ্গ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন (২য় খণ্ড)

৮। ২৪ পরগনার মন্দির—অসীম মুখোপাধ্যায়।

৯। পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর-জগন্নাথ মাইতি।

পরিশিষ্ট : এই তিন ধর্ম সংস্কৃতি ও সঙ্গে স্মৃতিসৌধগুলি একপ্রকার সমীক্ষা আকারে তথ্যগুলি পরিবেশন করতে পেরেছি বলে মনে করছি। সরেজমিনে উপস্থিত হলেও ওই মন্দির, মসজিদ ও গির্জার পুরোহিত, মালিক, ইমাম, ফাদারগণের বক্তব্য নির্ভর করতে না পেরে গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের কথার উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আবহাওয়ার মধ্যে পাকারাস্তা ছাড়া ইটপাতা রাস্তা, জলপথ, অতিক্রম করে সমীক্ষা করতে হয়েছে। এরফলে বহু ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটি মন্দির ও বিগ্রহের উপর একটি করে বড় প্রবন্ধ করা যায় এবং সমগ্র কাজটি একটি গ্রন্থ আকারে ইতিহাসের উপকরণ হবে, এই বিশ্বাস আছে।

এই সফরে আমার যারা সাথী হয়ে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন তাদের মধ্যে পূর্ণেন্দু ঘোষ, মিন্টু রায়, জয়ন্ত হালদার ও প্রতীপকুমার ভট্টাচার্যর নাম উল্লেখযোগ্য।

— লেখক

লেখক পরিচিতি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্নগবেষণা পথিকৃৎ, প্রয়াত কালিদাস দত্তের সুযোগ্য সহকর্মী।

ধূর্জটি নস্কর

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী-বিবিগাজী-পীরপীরানী ও লোকসমাজ

ভৌগোলিক অনুষঙ্গ :

মময় ভারতের পূর্বাঞ্চলের দক্ষিণতম প্রান্ত ঘেঁষে বঙ্গোপসাগর উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। খণ্ডিতবঙ্গের অখণ্ড জেলা চব্বিশ·পরগনা প্রশাসনিক প্রয়োজনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে ১৯৮৬ সালের ১ মার্চ জন্ম নিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা ও উত্তর চব্বিশ পরগনা, দুটি স্বতন্ত্র জেলা। সেই সঙ্গে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ঘটে গেছে ভারতীয় সুন্দরবন অংশের। সুন্দরবন অঞ্চলের বেশির ভাগ থেকে গেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে। জেলার উত্তর প্রান্ত ছুঁয়ে আছে কলকাতা মহানগরী ও উত্তর চব্বিশ পরগনা। উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর হুগলি নদী প্রবাহিত কলকাতা সংলগ্ন মেটিয়াব্রুজ-বজবজ থেকে গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ পর্যন্ত পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত থেকে দক্ষিণ ভূভাগ ঘিরে আছে যথাক্রমে ইছামতী কালিন্দী রায়মঙ্গল ও বঙ্গোপসাগরের অশান্ত ও অনন্ত জলরাশি। খাল-বিল-ধল, খাড়ি-নদী নালা-ভারানি-দোয়ানি-ফোড়নখাল, বিচিত্র আকারের দ্বীপমালা নদীমোহনা, সাগরবেলা, চরভূমি, সৈকতারণ্য, অভয়ারণ্য, বাদাবনের বাঘের জঙ্গল, জাতীয় উদ্যান, পাখিরালয়, বিশাল-বিস্তীর্ণ লাট ও প্লটসমূহের আবাদিখেত-খামার, গ্রাম-গঞ্জ হাট বাজার, শহর-বন্দর, ভারতখ্যাত গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও রামচন্দ্র খানের স্মৃতিবিজড়িত ছত্রভোগ বন্দরতীর্থ প্রভৃতি বৈচিত্র্যে ও গৌরবে সমৃদ্ধ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, পূর্বভারতের অপার বিস্ময়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসমাজ মূলত গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক। জল-জঙ্গল ও আবাদি খেত-খামারের অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় বলেই এখানকার সমাজে দীর্ঘদিন ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো এক সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। কৃষি এবং জল ও জঙ্গলের উপর নির্ভরশীলতার ফলে লোকসমাজের মধ্যে ঐক্য ছিল সুদৃঢ়। ফলশ্রুতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারাটা ছিল একসময় পর্যন্ত নিটোল। কৃষিক্ষেত্রে এবং জল ও জঙ্গলের জীবনঘাতী জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে একে অপরের নিত্যসঙ্গী ও সহমর্মী বলেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই একাত্মতা অনুভব করে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও দীর্ঘতম নদী গঙ্গা এবং লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় মধ্যবর্তী পৃথিবীর বৃহত্তম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত এই জেলার বেশিরভাগ ভূভাগ সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল নামে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করেছে। নিম্নবঙ্গের নদীমাতৃক মনোরম পরিবেশের বাদাবনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় বাদাবন পরিমণ্ডল বা Mangrove Eco-system। এখানকার মাটি ও জলবায়ু গাছপালা, জলজউদ্ভিদ, জলজ প্রাণীকুল, বনজ উদ্ভিদ, বিচিত্র প্রজাতির পশুপাখি, সরীসৃপ ও মানুষসহ প্রাণীকুলের পরস্পরের মধ্যে আছে সুনিবিড় সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা। বাঘ ও মানুষকে পাশাপাশি বসবাস করতে হয় এখানকার জীবপরিমণ্ডলে।

স্বল্প ইতিহাস :

গঙ্গা, করতোয়া এবং তাদের শাখাসমূহের দ্বারা বাহিত পলি, কাঁকরবালি ও বৃষ্টির মিষ্টি জলের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের প্রবল জোয়ারে উঠে আসা বালিয়াড়ির সংমিশ্রণে ক্রান্তীয় (tropical) অঞ্চলের আর্দ্র-উষ্ণ আবহাওয়ায় এই বদ্বীপ অঞ্চলের জন্ম বলে এখানকার ইতিহাস নিয়ে এক সময় পর্যন্ত যথেষ্ট বিভ্রান্তি ছিল। ভূতাত্ত্বিকগণ নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, বঙ্গোপসাগর গর্ভে পলি জমে এই সেদিন হল এখানকার স্থলভাগের সৃষ্টি। কিন্তু ভূতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ না করে বর্তমান শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অনেক ইতিহাস গবেষক সহজেই বলে দিতেন, নিম্নবঙ্গের এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাচীনত্ব নেই। এই বিষয়ে প্রথমে ভুল ভাঙাতে সমর্থ হন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সন্তান প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত। তিনি এক সময় দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে, ভূতত্ত্বের চোখে হাজার হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ বছরের ভূমিস্তর

প্রাচীন নাও হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের কালসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নয়। মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত ভূমিস্তর ও প্রত্নসম্পদ সাক্ষ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার সন্ধান মিলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'জোয়ারের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত নদীর ধার থেকে আবিষ্কৃত মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ এবং আরও প্রাচীনতর পুরাবস্তুর সঙ্গে এখানে পাওয়া গেছে একাধিক মসৃণ পাথরের কুঠার ও হাতুড়ি, যেগুলি নিঃসংশয়ে হরিনারায়ণপুরের বিলুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক অথবা মৌর্য-পূর্বস্তরের সাক্ষ্য বহন করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ থেকে ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে এই হরিনারায়ণপুরে অনুসন্ধান চালিয়ে পাওয়া গেছে একটি পোড়ামাটির সিল ও অন্যান্য কয়েকটি পুরাবস্তু, যেগুলি প্রাচীনকালের এক বিলুপ্ত নৌবন্দর সংলগ্ন সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্বের সঙ্কেত বহন করে। এই গোলাকৃতি সিলে উৎকীর্ণ রেখাচিত্রে প্রায় দু'হাজার বছর আগের বৈদেশিক ধর্মকল্পনা ও শিল্পশৈলীর স্মৃতি বহন করছে বলে পরেশবাবু অনুমান করেছেন। এই গ্রামে নব্যপ্রস্তর যুগের পোড়ামাটির একটি আদিম মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায়ের বারামূর্তির Prototype বলে কালিদাসবাবু সিদ্ধান্তে এসেছেন।

পুঁথিগত উপকরণে 'পাতাল', 'রসাতল', 'গঙ্গারিডি রাজ্য', 'পুন্ড্রবর্দ্ধন' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতে দেখা যায় এই গাঙ্গেয় অঞ্চল যুগে যুগে। বাল্মীকি রামায়ণে মহর্ষি কপিলের আশ্রম পাতালে অবস্থিত বলে বর্ণিত হয়েছে। আর্যাবর্ত থেকে বহু দূরের দেশ বলেই এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের পরিচয় খুব অবজ্ঞাভরে চিহ্নিত হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র ও সাহিত্যে। এই অনার্যভূমির মানুষদের বলা হয়েছে 'নাগ', 'রাক্ষস', ও 'অসুর'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পূর্বভারতের দেশগুলোকে বলা হয়েছে 'দস্যুদের দেশ'। তাদের ভাষাকে বলা হয়েছে 'অসুর ভাষা' অর্থাৎ দুর্বোধ্য ভাষা। অথচ আর্যাবর্ত্যের তীর্থযাত্রীরা গঙ্গাসাগরে আসতেন পুণ্যস্নান করতে। এই তীর্থযাত্রার সূত্রে আর্যাবর্ত্যের সঙ্গে এই অনার্যদেশের যোগসূত্র গড়ে ওঠে। ক্রমে দিগ্বিজয়ীদের আ[illegible] বাড়ে। মহাভারতের যুগের ভীম দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে এখানকার [illegible]দের [illegible] করেছিলেন। সেই সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের [illegible] ও [illegible]ন ঘটেছে প্রাচীন যুগে। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতি [illegible]ার বহু আগে এখানে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল জৈ[illegible] বৌ[illegible]র।

গ্রিক ও রোমান রাজ[illegible]বিক, ভূগোলবিদ, কবি, ঐতিহাসিকগণের বিবরণ ও ম[illegible] গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের সুসমৃদ্ধ গঙ্গারিডি সভ্যতার [illegible] খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বিশ্বজয়ে অভিলাষী ম্যাসি[illegible]র [illegible] আলেকজান্ডার বিপাশা পেরিয়ে পূর্বভারতের দিকে এ[illegible] আ[illegible]হস পাননি এই গঙ্গারিডি জাতির পদাতিক বাহিনীর [illegible] শৌর্যবীর্যের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে। গঙ্গারিডিদের অন্যতম [illegible] ছিল 'গঙ্গে'। ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার ১৯[illegible] সালে [illegible]ইয়ে অনুষ্ঠিত 'ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে'র ১০ম [illegible] গঙ্গারিডিদের গঙ্গে বা গঙ্গানগরকে (City of Gan[illegible] [illegible]গর সঙ্গমতীর্থনগর বলে চিহ্নিত করেছেন। ডঃ সরকা[illegible]নটি এখনকার গঙ্গাসাগর ক্ষেত্রের আরও দক্ষিণে উপস[illegible]ত।

বিবর্তিত জনগোষ্ঠীসমূহ :

রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীতে বিধৃত গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলের ম্লেচ্ছ-দস্যুরাক্ষস-অসুরদের নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করেছেন বিদেশি পর্যটক, রাজদূত, নাবিক, কবি ও ভূগোলবিদগণ গঙ্গারিডি জাতি হিসাবে। প্রাচীন বাংলাদেশের প্রত্নসাক্ষ্যে এখানকার মানুষের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে কোম অর্থাৎ tribe অর্থে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক দেশ-পরিচয় হতো এক একটা কোমের নাম অনুসারে। বহু জনপদ গড়ে উঠেছিল এই সব কোম-জনদের একত্র বসবাসের ফলে। বঙ্গ, পুন্ড্র রাঢ়, প্রভৃতি জনপদগুলিতে ছিল এক একটি কোমের প্রাধান্য। পুন্ড্র কোমদের প্রসঙ্গে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'পুন্ড্র বা পৌন্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য (সপ্তম শতক) এবং পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি বা পৌন্ড্রভুক্তি। এই ভুক্তিটি এক সময় হিমালয় শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া (দামোদরপুর লিপি, পঞ্চম শতক) সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল (দ্বাদশ শতকে বিশ্বরূপ সেনের : সাহিত্য-পরিষদ লিপি দ্রষ্টব্য)' এই পুন্ড্রজনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ আছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। এখানে পুন্ড্রদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে এরা আর্যভূমির প্রাচ্য প্রত্যন্তদেশের দস্যু-কোমদের অন্যতম। এদের আরও পরিচয়, এরা 'সংকীর্ণযোনি' এবং 'অপবিত্র'। বঙ্গ ও কলিঙ্গ জনদের এরা প্রতিবেশী। এই পুন্ড্ররাই বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পোদ বা পৌন্ড্র নামে পরিচিত।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা অধিকার এবং সেই সঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের পূর্ববঙ্গে পলায়নের পর থেকে বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাঁচমিশালি সমাজদেহে মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম শাসিত হিন্দু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অবর্ণ হিন্দুরা দলে দলে ধর্মান্তরিত হতে থাকে। সব সময় গায়ের জোরে যে ধর্মত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে, একথা ঠিক নয়। বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শোষণ ও শাসন সামাজিক নিপীড়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকায়ত অবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় তখন ছিল কোণঠাসা। নিম্নবর্গের মানুষ কঠোর পরিশ্রম করেও নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। এর ফলে শোষিত ও দলিত মানুষের কোন মোহ ছিল না শাসকদের প্রতি। এই সুযোগে খিলজির পক্ষে বাংলা বিজয় করে মুসলমান শাসন কায়েম করা সম্ভব হয়েছিল খুব সহজে। বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকায়ত সমাজ দাঁড়িয়ে আছে এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে। শত শত বছরের বহু সামাজিক ভাঙাগড়া ও রাজনৈতিক পালাবদলের মাঝে মূলত চারটি জীবন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে বৃহত্তর সমাজ দেহে।

১. প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধনীয় একালের পৌন্ড্র নামে পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ও মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত্য, জেলিয়া কৈবর্ত, কাওরা, বাগদি, নমঃশূদ্র, দলুই, রাজবংশী, কর্মকার, কুম্ভকার, ধোবা, তন্তুবায়, হাড়ি, তিলি, পাটনি, সদগোপ, যাদব বা গোয়ালা, চর্মকার (মুচি), নাপিত, ডোম, যোগী, শুঁড়ি, সচ্চাষী, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, পতিত ব্রাহ্মণ, জোলা প্রভৃতি এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য

সুন্দরবনের মিশ্র জনগোষ্ঠীতে আছেন সবধর্মের সকলবর্ণের মানুষ। *ছবি : লেখক*

মুসলমান সমাজ। এই সঙ্গে আছেন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ।

২. সুন্দরবন হাসিলের সূত্রে প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো, সবিস্তা, ভূমিজ, মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষ।

৩. হুগলি ভাগীরথীর পশ্চিম পারের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ মেদিনীপুর জেলার কৃষিজীবী, ভূস্বামী ও শ্রমজীবী মানুষ। পশ্চিম সুন্দরবন অঞ্চলের গঙ্গা সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা থানা এলাকায় এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে মাহিষ্য, জেলিয়া কৈবর্ত, করণ, তন্তুবায়, খণ্ডায়িত, পৌন্ড্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে অল্পসংখ্যক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জনগোষ্ঠী।

৪. চতুর্থ জনগোষ্ঠী সমূহের আগমন ঘটেছে স্বাধীনতা লাভের আগে এবং পরে পূর্ববঙ্গের যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা থেকে। এঁদের মধ্যে নমঃশূদ্র, পৌন্ড্র, রাজবংশী, যোগী, মালো, কপালী, জোলা প্রভৃতি অবর্ণ হিন্দু ও মুসলমানগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের আগমনে জনবহুল হয়ে উঠেছে গোসাবা, বাসন্তী, ভাঙড়, ক্যানিং, কুলতলী, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ এবং কলকাতা সন্নিহিত কয়েকটি থানা এলাকা। প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মাঝে এই সব জীবন প্রবাহ মিলেমিশে দিনে দিনে গড়ে তুলছে মিশ্র সমাজ ও জনসংস্কৃতি।

লোকধর্মে সমন্বয়সাধন :

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসমাজ মূলত গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষিভিত্তিক। জল-জঙ্গল ও আবাদি খেত-খামারের অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় বলেই এখানকার সমাজে দীর্ঘদিন ধরে স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো এক সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। কৃষি এবং জল ও জঙ্গলের উপর নির্ভরশীলতার ফলে লোকসমাজের মধ্যে ঐক্য ছিল সুদৃঢ়। ফলশ্রুতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারাটা ছিল একসময় পর্যন্ত নিটোল। কৃষিক্ষেত্রে এবং জল ও জঙ্গলের জীবনঘাতী জীবিকা অর্জনের সংগ্রামে একে অপরের নিত্যসঙ্গী ও সহমর্মী বলেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই একাত্মতা অনুভব করে। লোকায়ত অবর্ণ হিন্দু সমাজে লৌকিক দেবদেবী ও বিবিগাজী পীরপীরানীদের পূজা হাজোতের ঘটা আজও ধর্মনিরপেক্ষ লোক সমাজের গৌরবজনক পরিচয় বহন করে চলেছে। গ্রামীণ সমাজের উপাসিত বিচিত্র দেবদেবী ও পীরপীরানীর পূজা-অনুষ্ঠানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই অধ্যাপক সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তিনি লিখেছেন, 'একদা সমগ্র পূর্ব ভারতে গ্রামের যে ধর্মানুষ্ঠানরীতি ছিল তাহা পরে শুধু বাঙ্গালা দেশে, আরও পরে শুধু পশ্চিম বাঙ্গালাতেই রহিয়া গিয়াছে। উত্তর প্রদেশে ও বিহারে ঘন ঘন রাষ্ট্র-বিপর্যয়ে পুরানা গ্রামরীতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ আর্যাবর্তের সদররাস্তা হইতে অনেক দূরে ছিল এবং আগম-নিগমের সহজসুবিধা না থাকায় বাঙ্গালার গ্রাম যতদূর সম্ভব নির্বিবাদে পুরনো পন্থায় দিন কাটাইতেছিল।' ডঃ সেনের বক্তব্যের সূত্রে বলা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকধর্ম আবহমানকালের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলতে সক্ষম আছে বর্ষব্যাপী পূজা-হাজোত উপলক্ষে নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠান ও মেলা-পার্বণের মধ্যে দিয়ে।

এখানকার লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা ব্যাপকভাবে না হওয়ায় ইতিমধ্যে বহু ক্ষতি হয়ে গেছে। আশার কথা বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত এবং তাঁর প্রতিবেশী ও সুযোগ্য শিষ্য প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু সুন্দরবন সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহু অজানা

ও লুপ্তপ্রায় ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি উদ্ধার করে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। প্রাথমিক কাজ তিনি শুরু করেন তাঁর জন্মভূমি সুন্দরবন অঞ্চলে। তারপর সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তাঁর অনুসন্ধান প্রসারিত হয়। সূচনায় এ কাজে তাঁকে কিছুটা বাধা পেতে হয়েছিল। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে তিনি লিখেছেন, 'তখন পল্লী বা শহর থেকে দূরে কিছু উন্নত অঞ্চলেরও বহু লোক এ বিষয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করতেন না। বিশেষত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা লৌকিক দেবতাদের প্রতি খুব কমই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন বলে মনে হত। তাঁদের দু'একজন সময় বিশেষে লৌকিক দেবতাদের কোনও কোনটিকে পূজা দিতেন, কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল, যেহেতু অশাস্ত্রীয় এবং নিম্নবর্ণের দ্বারা অধিক পূজ্য অতএব ইহারা চাষা-ভূষাদের দেবতা। সে কারণে লৌকিক দেবতাদের বিষয় ঔৎসুক্য বা অনুসন্ধান করা শিক্ষিত বর্ণ হিন্দুর পক্ষে হাস্যকরব্যাপার। প্রজ্ঞাবান গোপেনবাবুর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কৃষিজীবী, জল ও জঙ্গলজীবী ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের আশা ও ভরসাস্থল লৌকিক দেবদেবী ও বিবিগাজী-পীরপীরানীদের স্বরূপ বিচার বিশ্লেষণ করা। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক ধর্ম চর্চায় অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু তথাপি এখনও আরও গভীরভাবে এখানকার লৌকিক জীবনচর্যার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা উদ্ধারের অবকাশ আছে। এই বিষয়ে কয়েকটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচনার চেষ্টা করছি।

১. লৌকিক দেবদেবী ও বিবিগাজী-পীরপীরানীদের উপাসনার ক্ষেত্রে কোনও কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের উৎসাহ ও আন্তরিকতা বেশি।

২. লৌকিক পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার কতখানি দায়বদ্ধতা পালিত হচ্ছে।

৩. কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে পূজা-অর্চনার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখনও কতখানি বজায় আছে।

৪. বৌদ্ধতন্ত্রের শক্তিদেবী পৌরাণিক ধ্যানধারণায় মিশে কতখানি লোকসমাজে পূজ্য।

৫. কৃষিপ্রধান দক্ষি[illegible] [illegible] [illegible]গনার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামদেবতার আসন কখন থে[illegible] [illegible] [illegible]লেন ব্রজের রাখালগণের সখা গ্রাম দেবতা রাখাল ঠা[illegible]

লৌকিক দেবদেবীদের [illegible] [illegible] পীরপীরানীদের পূজা-হাজোতে অবর্ণ হিন্দু সমাজে[illegible] [illegible] [illegible]ময় বেশি চোখে পড়ে। ইসলাম ধর্মপ্রচারকগণের ম[illegible] [illegible] ক্ষমতার অধিকারী ও অধিকারিণীগণ এক সময় সা[illegible] [illegible] [illegible]খে দেবত্বে উন্নীত হন। মা বনবিবি, বড়খাঁ গাজী, [illegible] [illegible] মায়েরা হিন্দুদের থানে ও মন্দিরে লৌকিক ও পৌ[illegible] [illegible]র সঙ্গে সমান মর্যাদায় পূজিত হন। এঁদের পূজা-হা[illegible] [illegible] বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতো।

১. এঁদের পূজার [illegible] [illegible]র প্রধানত প্রাচীনতম অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক [illegible] [illegible] দেশের কঠোর জীবন সংগ্রামী মানুষ এক এক [illegible] [illegible] বোধে এক একজন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মানব অ[illegible] [illegible]পন্ন হয়েছিল। সেই সব মানব চরিত্র কালক্রমে লো[illegible] [illegible] তাঁদের অবস্থান ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে উপাসনালয়। পরবর্তীকালের বহিরাগতগণ এই আঞ্চলিক লোকধর্মের সামিল হয়েছেন।

২. জেলার লোকসমাজের পোদ বা পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, কাওরা, বাগদি, হাড়ি, মুচি, রাজবংশী, নাপিত, করণ, কর্মকার, কুম্ভকার, ডোম, তন্তুবায়, জেলিয়া কৈবর্ত প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ও এঁদের পূজা-হাজোতে অংশগ্রহণ করেন। যুগ বদলের সঙ্গে অভিজাত ও বর্ণহিন্দু নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের মানুষ এখন অংশগ্রহণ করছেন।

৩. লৌকিক দেবতার থানে, দরগায় অথবা মন্দিরে সবস্থানে নিত্য পূজার ব্যবস্থা নেই। বছরের নির্দিষ্ট দিনে খুব জাঁকজমক সহকারে জাঁতাল পূজা করা হয়। অনেকে মনে করেন জাঁতাল শব্দটি এসেছে জাতিবাচক 'জার্তিল' শব্দ থেকে। একে 'জাতের পূজাও' বলা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে জাঁকজমক সহকারে পূজার পরিভাষাই হল—জাঁতাল পূজা। দক্ষিণরায় সহ আরও কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর পূজায় আদিম যুগীয় আচার-অনুষ্ঠান চোখে পড়ে।

৪. বেশিরভাগ দেবদেবীর উপযুক্ত মন্দির নেই। মাটির দেওয়াল আর তালপাতার অথবা খড় বা টালির চালা ঘরে শত শত বছর ধরে পূজা-অর্চনা চলে আসছে। বহুস্থানে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, কোথাও কোথাও গাছতলায় দেবদেবী ও বিবিগাজীদের মূর্তি বা ছলন বসিয়ে উপাসনা করা হয়। বৃষ্টি পড়লেই রঙ-মাটি ধুয়ে খড় কাঠামো বেরিয়ে পড়ে।

৫. দেবদেবী পূজায় এখনও অনেক স্থানে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কোন প্রয়োজন হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পতিত ব্রাহ্মণগণ পূজা হাজোতে পৌরোহিত্য করেন। দিনবদলের সঙ্গে দু'এক স্থানে অভিজাত ব্রাহ্মণ লৌকিক দেবদেবী পূজায় অংশগ্রহণ করছেন।

৬. লোকধর্মের অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে চমৎকৃত করে। স্থান সমীক্ষায় দেখেছি কৃষিজীবী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারের কুলদেবীর আসন অলংকৃত করে আছেন বাদাবনের অধিষ্ঠাত্রী মা বনবিবি। এক একজন মুসলমান খাদেম পরিবার পুরুষানুক্রমে এইসব স্থানে পূজা-হাজোতে পৌরোহিত্য করে আসছেন। সেজন্য খাদেমদের দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়ে রেখেছেন হিন্দু গৃহস্থরা।

৭. লৌকিক দেবদেবীদের নামকরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আশ্চর্যজনক। পুরুষ ও স্ত্রীদেবতার সংখ্যাও অগণন। অঞ্চল বিশেষে গ্রামদেবতার এক এক রূপ। দেবদেবী ও বিবিগাজীদের ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র নামে উপসিত হন। রোগনিবারক, বাঘ ভীতিনাশক, কুমির দেবতা, সর্পদেবী, কৃষিদেবতা, গৃহপালিত পশুরক্ষাকারী গাজীসাহেব, সন্তানরক্ষাকারী দেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন নাম-মাহাত্ম্য নিয়ে লোকজীবনে জড়িয়ে আছেন এঁরা।

লৌকিক দেবদেবী :
ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়

সভ্যতার আদি স্তর থেকে ব্যক্তিপূজা চলে আসছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব, মাধুর্য যুগে যুগে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। সমকালজয়ী এক একজন মানুষ বিরল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ধীরে ধীরে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন। স্থান পেয়েছেন

কাব্য-সাহিত্য-লোককথা, লোকগাথায়। বর্তমানে আলোচ্য দক্ষিণ রায়ও ছিলেন এমন একজন মানুষ। ইনি ছিলেন মধ্যযুগের একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, যাঁর লোকাতীত ব্যক্তিত্ব ঢাকা পড়েছে অলীক দেবত্বের পোশাকে। নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী, জলজীবী, জঙ্গলজীবী ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের গ্রামীণ সমাজে বাঘের দেবতারূপে ইনি পূজিত হয়ে আসছেন। কলকাতা সংলগ্ন বোড়াল-বড়িষা থেকে উপকূলবর্তী বুড়োবুড়ির তট, দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গাসাগর দ্বীপ থেকে উত্তর-পূর্বে হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের বিশ্বাসের সাম্রাজ্য জুড়ে বসে আছেন লৌকিক গ্রাম দেবতা দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য প্রচার, ক্রমবিকাশ এবং লোকসমাজে তাঁর ব্যাপক প্রভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি।

১. প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষ বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে দক্ষিণ রায়ের স্মরণ নেয়। জঙ্গলমহলে মোম, মধু, কাঠ, বুনো হাঁসের ডিমসহ বনজ সম্পদ আহরণ এবং নদী-খাড়ি-ভারানি-দোয়ানিতে মাছ-চিংড়ি-কাঁকড়া ধরায় যুক্ত বাউলে, মউলে, কাঁকড়া মারা, মাছ মারা ধীবরসহ বিচিত্র পেশাধারীরা সারা বছর ধরে এঁকে পূজা-হাজোত দেন।

২. বাসস্থান জঙ্গলাকীর্ণ ও জঙ্গল সংলগ্ন স্থানে হওয়ায় বাঘের উপদ্রবে তখনও বহু মানুষের জীবনহানি ঘটে। অনেকেই মনে সাহস পেতে বাস্তুদেবতারূপে তাঁর প্রতীক বারা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গৃহসংলগ্ন বাগান ও খামারবাড়িতে।

৩. কৃষিখেতে, খামারে ও আগান-বাগানে ধান, পাট, শাক-সবজি উৎপাদন কাজে ব্যস্ত মানুষকে প্রধান লক্ষ্য বস্তু হিসাবে বেছে নেয় সুন্দরবনের সুচতুর বাঘ। বাঘ-ভয় থেকে বুকে বল লাভের একমাত্র উপায় ইনি।

৪. পূজা-স্থান যত্রতত্র। গাঁ-পল্লীর পথে-প্রান্তরে, জঙ্গল মহলের প্রবেশপথে, নদী-খাড়ির পাড়ে যে কোনও স্থানের গাছতলায় এঁর পূজা-হাজোত ও জানান দিয়ে জেলে-মউলে-বাউলেরা জলে ও জঙ্গলের মধ্যে জীবিকার সন্ধানে পাড়ি জমায়। কোনও কোনও গ্রাম-জনপদে পাকা ঘরে অথবা মাটির দেওয়াল দেওয়া থানে দক্ষিণ রায়ের বীর যোদ্ধা মূর্তি পূজা হয়ে আসছে শত শত বছর। এই সব স্থানের আঞ্চলিক ইতিহাস সন্ধান করে দেখা গেছে, মধ্যযুগে জঙ্গল মহলে প্রবেশকারী বিচিত্র পেশাধারীদের প্রাচীন উপাসনা ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এইসব থান গড়ে উঠেছে। বেশির ভাগ থানে দক্ষিণ রায় ও তাঁর মা নারায়ণীকে দেখা যায় বারামূর্তি প্রতীকে। ধপধপি গ্রামের দক্ষিণ রায় মন্দিরের খ্যাতি আছে সারা জেলা জুড়ে।

৫. নিত্যপূজার কোনও বাঁধা-ধরা বিধান নেই। পৌষ সংক্রান্তি ও তারপর দিন পয়লা মাঘ থেকে মাঘ সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সারা মাস জুড়ে দক্ষিণ রায়ের বারা মূর্তি অর্থাৎ লতাপাতা আঁকা মুণ্ডমূর্তি পূজা হয়। মাঘ মাসের যে কোনও দিন বেছে নিয়ে এক এক অঞ্চলে বার্ষিক জাঁতাল পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৬. কিছু কৃষিজীবী পরিবার কুলদেবতারূপে দক্ষিণ রায়ের নামে দেবোত্তর সম্পত্তি রাখতেন আগের দিনে। একটি উল্লেখযোগ্য দলিল দেখেছি মন্দিরবাজার থানার পূর্ব গোপালনগর গ্রামের পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ভুক্ত বর্ধিষ্ণু মণ্ডল পরিবারে। মণ্ডল বাড়ির শিক্ষিত ও
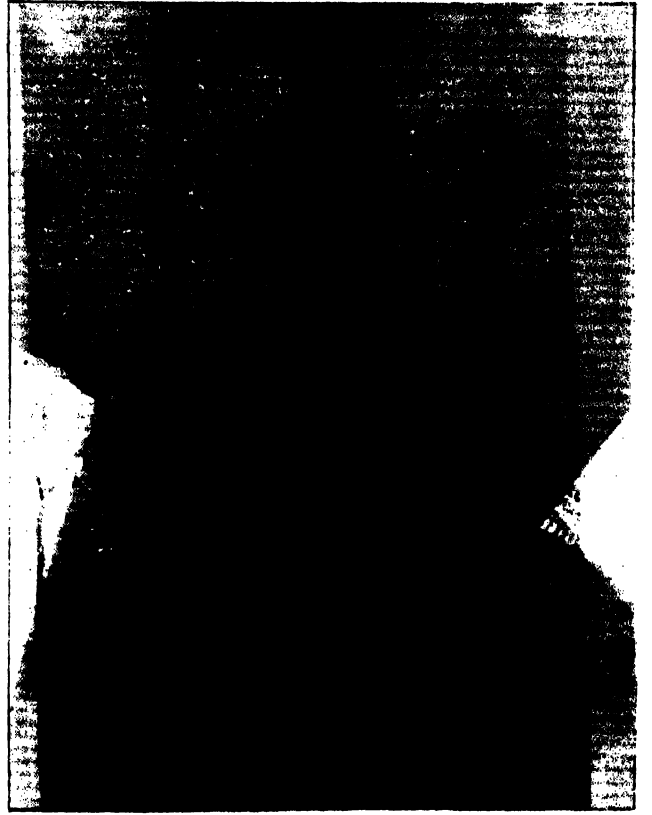
দক্ষিণ রায় ছবি : কাশীনাথ দাস

চাকরিজীবী মানুষ হরেকৃষ্ণ মণ্ডল তাঁদের পারিবারিক কাগজপত্র দেখিয়েছেন। ১৯৩২ সালের এই কাগজপত্রে উল্লেখ আছে, প্রাচীন হাতিয়াগড় পরগনার অধীন কুলপি থানার পূর্ব গোপালনগর ৯৩ নং খতিয়ানের ১৬৭ দাগের মোট ২৮ শতক মধ্যস্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী সম্পত্তি দেবোত্তর দেওয়া হল 'দক্ষিণ রায় ঠাকুর'-এর নামে। এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেবায়তগণ বার্ষিক পূজার ব্যয় নির্বাহ করেন। পূজার পুরোহিত কিন্তু একজন মুসলমান খাদেম।

৭. একান্তই অশাস্ত্রীয় লৌকিক দেবতা বলেই এঁর সম্বন্ধে গড়ে ওঠা বীরত্ব ব্যঞ্জক কাহিনী ও কিংবদন্তী আশ্রিত উপাসনা বহুল প্রচলিত। এঁর পূজার মন্ত্রে আরণ্যক পরিবেশে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার আকুতি ধ্বনিত হয়। ব্রাহ্মণ-পূজারীগণ কিছু কিছু গোঁজামিল মন্ত্রে এঁরা পূজাকার্য সারেন। গোপেনবাবু সংগৃহীত দক্ষিণ রায় পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রে ফুটে ওঠে জঙ্গল মহলের একজন বীর-যোদ্ধার রূপ :

চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়।
শার্দুল বাহন দক্ষিণ রায়॥
ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি হস্তে।
দক্ষিণ রায় নমোহস্তুতে॥

৮. দক্ষিণ রায়ের 'বারা ঠাকুর' নামে পরিচিতি খুব বেশি। মধ্যযুগে একশত বারা বা মুণ্ডমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। পঞ্চাশ জোড়া বারাকে বলা হয় শতবারা বা বারাশত। মা নারায়ণী ও দক্ষিণ রায়ের পৃথক বারাকে জোড়া বারা বলা হয়। শতবারা পূজার খ্যাতির স্মারক হিসাবে গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব অববাহিকার অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় দুটি জনপদ মধ্যযুগ থেকে বারাশত নামে চিহ্নিত হতে দেখা যাচ্ছে।
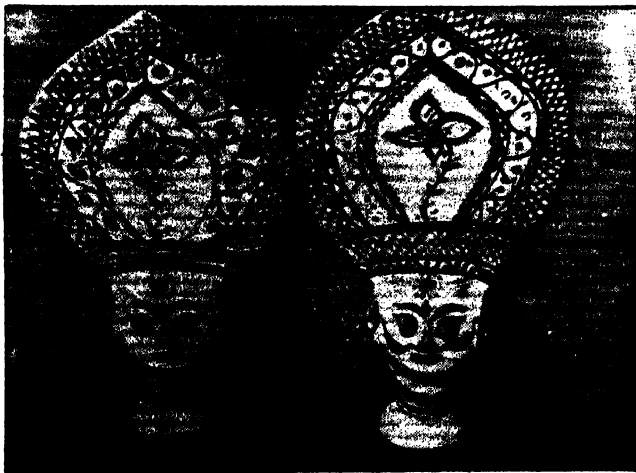
মুখ বারামূর্তি

এর একটি হল বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনার সদর। অপরটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানা প্রাচীন জনপদ দক্ষিণ বারাশত। দক্ষিণ অঞ্চলের বলেই 'বারাশত' জনপদের আগে 'দক্ষিণ' শব্দটি বসেছে। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবি কঙ্কন চণ্ডী' গ্রন্থে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা বর্ণনায় কলকাতার কালীঘাটের দক্ষিণের এই বারাশত জনপদের উল্লেখ আছে। পুরনো বইপত্রে এই উভয় জনপদের বানান ছিল বারাশত।

বারামূর্তি পূজা দক্ষিণ রায়ের প্রতীকী পূজা মাত্র। তাঁর উপর আরোপিত দেবত্বের মহিমা সরিয়ে লৌকিক ব্যক্তি হিসাবে তাঁর ঐতিহাসিক উপস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের বহু পণ্ডিত ও গবেষক আলোচনা করেছেন। দক্ষিণ রায়ের মতো এত আলোচিত এবং অনুসন্ধিৎসার কেন্দ্রস্থল হিসাবে চিহ্নিত অপর কোনও আঞ্চলিক ও লৌকিক দেবতা বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষে বিরল। দক্ষিণ রায় যে কীভাবে বারাপূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন, সে বিষয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই মানব মুণ্ডরূপী দেবতার পূজা চলে আসছে সারা পৃথিবী জুড়ে, সুপ্রাচীন কাল থেকে। মনীষী প্লেটো বলেছেন, 'The human head is the image of the world'. অর্থাৎ বিশ্বমূর্তির প্রতীক হল এই মানব মুণ্ডমূর্তি [illegible] থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে পোড়ামাটির একটি ক্ষুদ্র আকৃ[illegible]র্তি [illegible]খতে বারামূর্তির মতো। তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আরকোট [illegible]য় '[illegible]বর' (Kuttandavar), বিসলমারী (Bisalmari) মু[illegible] [illegible] ও তাঁর মা নারায়ণীর বারামূর্তির মতো পাশাপাশি [illegible] পূ[illegible] হয়।

কালিদাস দত্ত কিন্তু সরা[illegible] [illegible] বারাঠাকুর দক্ষিণ রায় নন, দক্ষিণ রায়ের প্রতীক মা[illegible] [illegible] হল, 'পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যপাঠে জানিতে পারা [illegible] মুসলমান রাজত্বকালে গাজীসাহেব, ওলাবিবি ও বন[illegible] প্রভৃ[illegible] [illegible]কিক দেবতাদের সহিত দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব ঘটে[illegible]

পুঁথিগত উপকরণ ও [illegible] [illegible]গোষ্ঠীগত বিবর্তন ধারা পর্যালোচনার দ্বারা এখন দ[illegible] রা[illegible] ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধানের চেষ্টা করছি। স[illegible] শত[illegible] শেষার্ধে রচিত (১৬৭৯-৮০) নিমতা গ্রামের কবি কৃষ[illegible] দাসে[illegible] [illegible]রায়মঙ্গল' কাব্যের কাহিনী ও বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণার সূত্রে গবেষকগণ যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন সেগুলি সাজালে কিছু উৎসের সন্ধান মেলে।

১. দক্ষিণ রায় আদি পাঠান যুগের একজন স্বধর্ম ও সমাজরক্ষক মহাপরাক্রমশালী আঞ্চলিক শাসক ছিলেন, যাঁর বাসস্থান ও রাজধানী ছিল ঐতিহাসিক খাড়ি গ্রাম। একসময় বহিরাগত ইসলাম প্রচারক যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধেছিল এবং দীর্ঘকালীন যুদ্ধের পর মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান লোকসমাজে অবর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক সহাবস্থান সেই ঘটনার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করছে।

২. গবেষক হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'দক্ষিণ রায়ের কাহিনী' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বঙ্গে পাঠান অধিকারের প্রথম যুগে যখন পীর-গাজীরা সশস্ত্র ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন সেইকালে দক্ষিণ রায়-সমাজ ধর্ম রক্ষার্থে নেতৃত্ব করেছিলেন, সে কারণে তিনি স্বীয় অঞ্চলে সকল ব্যক্তিরই ভক্তিভাজন হন। পরে দেবত্বে উন্নীত হন।'

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'চব্বিশ পরগনা—হাজার বর্ষ পূর্বে' বিষয়ক আলোচনায় মন্তব্য করেছেন, 'দক্ষিণ রায় একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন।' এই মন্তব্যটি নিয়েও ভাববার অবকাশ আছে। বুদ্ধ ও মহাবীর পূর্ব ভারতের মানুষ বলেই প্রাচীন বাংলার জনগোষ্ঠীসমূহের উপর বেদবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব খুব সহজেই পড়েছিল। নিম্নবঙ্গে বৈদিক প্রভাব বিস্তারের বহু আগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাশ্রয়ী ছিল এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। বহিরাগত ইসলাম প্রচারকদের আগমনে প্রথম পর্বে তাঁদের সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের সংঘাত বেধেছিল। এখন 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর সম্মুখ সমরের প্রারম্ভিক কথোপকথনের আলোচনায় আসছি। এই দুইজন ধর্মযোদ্ধার পরস্পরবিরোধী আস্ফালন ও গালিগালাজের মধ্য দিয়ে এঁদের মানবীয় চরিত্র খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ রায়ের আস্ফালনের সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠেন বড় খাঁ গাজী। রাগের ভাষায় গালিগালাজ, জাতজন্ম উঠে আসাই স্বাভাবিক :

> 'ভালো আগে করো তোম জতেক কারণে।
> ভেজতাহোঁ জমকু বজুরি চলোনে।।
> শুনিয়া হারামজাদ মহলিয়া কোদ।'

'শুনিয়া হারামজাদ মহলিয়া কোদ' এই পঙ্‌ক্তিভুক্ত 'কোদ' শব্দটি গোষ্ঠী বা জাতিবাচক 'পোদ' শব্দের খুবই কাছাকাছি। সম্ভবত পুঁথির লিপিকারদের অনবধানবশত 'কোদ' শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে 'পোদ' শব্দের পরিবর্তে। দক্ষিণ রায় রূপধারী এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিটি পোদ বা পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর আদি-মধ্যযুগের কোনও এক সময়ের প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এখনও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সহ সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষিজীবী ও জলজীবী ও সাধারণ শ্রমজীবী এবং বিচিত্র পেশাধারীদের মধ্যে পৌণ্ড্র জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে গরিষ্ঠ। প্রতি বছর জঙ্গলে কাঠ কাটতে এবং মধু-মোম সংগ্রহে এপ্রিল মাস থেকে জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত যারা যুক্ত থাকে, তাদের মধ্যে পোদদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। এরাই এখনও সুন্দরবনের অরণ্যদেব দক্ষিণ রায়ের অন্যতম উপাসক গোষ্ঠী।

বর্তমান কালে বারুইপুর পৌর শহরের মধ্যে দক্ষিণ রায়ের পুরনো পূজার স্থানের নামে একটি পাড়ার নামকরণ হয়েছে দক্ষিণ রায় পল্লী।

বনদেবী নারায়ণী

. স্ত্রী দেবতাগণের মধ্যে বনদেবী নারায়ণী কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এক উচ্চ আসন পেতে বসে আছেন। দক্ষিণ রায়, মা বনবিবি ও বড় খাঁ গাজীর সঙ্গে ইনিও বাঘের দেবতা বলে পরিচিত। তবে কিছুটা বাড়তি মাতৃত্বের অধিকারিণী। এক-দেড়শো থেকে দু-আড়াইশো বছর ধরে যে সব গ্রামে এক একটি কৃষিজীবী পরিবারের মানুষ বসবাস করছেন, সেসব গ্রামে আত্মীয়তা সূত্রে গিয়ে দেবদেবীর সন্ধান নিয়ে দেখেছি বাড়ির আশপাশের বনবাদাড় অথবা ঝোপঝাড় সংলগ্ন স্থানে বনদেবী নারায়ণীর থান বর্তমান। বেশির ভাগ থান হল মাটির দেওয়াল খড় অথবা টালির ছাউনি দেওয়া ঘর। তালপাতার ছাউনি দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট কুঁজিঘরের থান চোখে পড়েছে। এই জেলার আরণ্যক সভ্যতার অন্যতম সাক্ষী হয়ে মা নারায়নী মধ্যযুগ থেকে বিরাজ করছেন সব থেকে প্রাচীন খাড়িগ্রামের থানে। এঁর অদূরেই মনি নদীর তীরেই আছে বড় খাঁ গাজীর থান।

বনদেবী নারায়ণী কিন্তু পৌরাণিক দেবতা বিষ্ণুর স্ত্রী বা শক্তি নন। শাস্ত্রীয় দেবদেবীর সঙ্গে এঁর কোনও সম্পর্ক নেই। জনপ্রিয়তা ও মর্যাদায় এঁর স্থান দক্ষিণ রায়ের ঠিক পরেই। দক্ষিণ রায়ের মা নামে এর সমধিক পরিচয় আছে। পৌষ সংক্রান্তির পর থেকে সারা মাঘ মাস জুড়ে দক্ষিণ রায় ও নারায়ণী যুগ্ম বারা ব্যাঘ্র দেবতা রূপে পূজিত হন।

বারা প্রতীকপূজা ছাড়া নারায়ণীর মূর্তিপূজা হয় বহু গ্রামে। পূজারী ব্রাহ্মণদের হাতে পড়ে ব্যাঘ্রদেবীর অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। অনেক স্থানে চতুর্ভুজা শাস্ত্রীয় দেবী বানানো হয়েছে। অথচ ইনি ভাটীশ্বর দক্ষিণ রায়ের মা এবং খাড়ির গ্রামে অধিবাসিনী ছিলেন। মা-ব্যাটাতে ছিলেন স্বধর্মরক্ষক। এজন্য নারায়ণীকে যুদ্ধ ও পরে মৈত্রী স্থাপন করতে হয়েছে ইসলাম প্রচারিকা মা বনবিবির সঙ্গে। মুন্সী বয়নদ্দী রচিত 'বোনবিবির জহুরানামা' কেচ্ছাকাহিনীতে এঁদের জঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত আছে। নারায়ণীর পূজার ব্যাপকতার ফলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহু স্থান-নাম ও গ্রাম-নাম নারায়ণীতলা নামে প্রসিদ্ধ। এঁর জাঁতায় পূজা উপলক্ষে বহু গ্রামে বার্ষিক মিলনোৎসব পালিত হয়।

মৎস্যদেবতা মাকাল ঠাকুর

কথায় আছে, পৃথিবীর তিন ভাগ জল, আর এক ভাগ স্থল। চোখে দেখা সম্ভব বলেই স্থল ভাগের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি জগতের অনেক পরিচয় আমরা রাখি। কিন্তু জলভাগের বহু রহস্যময় জগৎ আমাদের কাছে অজানা থেকে গেছে। এই অনন্ত জলরাশির বুকে বিচরণকারী অসংখ্য প্রাণীকুলের মধ্যে মাছের সঙ্গে মানুষের আছে চিরদিনের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। শুধু মানুষ বা বলি কেন, পশু, পাখি, কীট ও পতঙ্গ সবাই মাছ খায়। সুন্দরবনের বাঘেরাও মাছ খায়। প্রবাদ আছে, 'মাছের নামে গাছও হাঁ করে।' আর বাঙালিদের মতো বাংলাদেশের ভূতেরাও নাকি মাছ খায়। মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মধ্যে বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রচনায় বাঙালির মৎস্যপ্রীতির অন্ত নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাঙালির মাছে-ভাতে থাকার যথাযথ বিবরণ লিখেছেন গুপ্ত কবি :

> ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল।
> ধান ভরা ভূমি তাই মাছ ভরা জল।।

'বাঙালি কাঙালি মরে মাছে আর ভাতে' এই আপ্তবাক্যের প্রতিবাদ হবার কথা নয়। বাংলাদেশের মৎস্যপ্রীতিকে একসময় আর্যাবর্তের লোকরা ভাল চোখে দেখতেন। কিন্তু বাংলার জল-হাওয়ার গুণে মাছের বাজারে এখন প্রাক্তন আর্যসন্তানগণের দাপট সব থেকে বেশি।

মাছ যখন আছে, মাছের দেবতা অবশ্যই থাকবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবতাদের প্রথম সারিতে আছেন মৎস্য দেবতা মাকাল ঠাকুর। মাকাল বা মাখাল মূলত জলাভূমি অঞ্চলের দেবতা। কাওরা, বাগদি, তিওর বা রাজবংশী এবং পোদ সমাজের কিছু মানুষকে মাকাল ঠাকুরের পূজা করতে দেখেছি। এঁর পূজার নির্দিষ্ট বিশেষ কোন

সুন্দরবনের খাঁড়িতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন মৎস্যজীবীরা
ছবি : সচ্চিদানন্দ মণ্ডল

স্থান থাকে না। দু'এক স্থানে পৃথক থান চোখে পড়ে। মাকাল ঠাকুরের মূর্তিপূজা চোখে পড়ে না। কাদা-মাটিতে গড়া একটি অথবা দুটি স্তূপ মাকাল ঠাকুরের প্রতীকরূপে পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের পাড়ে তৈরি করে পূজা করা হয়। কলাপাতায় পাকাকলা, বাতাসা ও আতপ চালের নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দেওয়া হয়। মৎস্যশিকারীদের মধ্যে যে কোনও একজন পুরোহিতের আসনে বসে পড়ে। এদের বিশ্বাস জলাশয় মানে রসাতল। বাবা মাকাল ইচ্ছা করলেই মাছদের রক্ষা করার জন্য জল কাদার গভীরে আশ্রয় দেন। কার সাধ্য তাদের নাগাল পায়। সেজন্য মাকালকে সন্তুষ্ট করতে পূজা-নৈবেদ্য নিবেদন করতে হয়। মাকাল ঠাকুরের নামে জেলার বহু গ্রামনাম ও স্থাননাম মাকালপুর ও মাকালতলা নামে পরিচিত। মৎস্যজীবী অনেক রাজবংশী পরিবারের 'মাকাল' পদবি আছে মাকাল ঠাকুরের নামে।

সন্তানরক্ষক পাঁচুঠাকুর

পাঁচুঠাকুর শিশুসন্তান রক্ষকদেবতা। শিশুসন্তান হারাবার ভয় বাবা ও মাকে চিরদিন কাতর করে রাখে। শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভাল না থাকায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কয়েক দশক আগে পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার ছিল ভয়ানক। গ্রামে গ্রামে দেখেছি, 'ছাবাল-পোঁতার দাঁড়' অর্থাৎ মৃত সন্তান পোঁতার উঁচু ঢিবি। লৌকিক দেবতা পাঁচুঠাকুর পূজার জনপ্রিয়তা এসেছে সন্তান হারাবার ভয় থেকে। গৃহস্থের বাসস্থান থেকে কিছু দূরে পুকুর অথবা খালের পাড়ে তালগাছ, বটগাছ তলায় উন্মুক্ত স্থানে পাঁচু ঠাকুরের উপাসনা ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত হয়। কোথাও গ্রামের বাইরে মাটির ছোট্ট ঘরে পাঁচুঠাকুর, স্ত্রী দেবতা পাঁচি ঠাকুরানী পূজিত হন। অনেক মা আছেন, যারা শারীরিক কারণে বার বার মৃত সন্তান প্রসব করেন তাঁরাই পাঁচু ঠাকুরের থানে এখনও 'হত্যে' দেন। সন্তান রক্ষা হলে পাঁচু ঠাকুরের থানে মাটির মূর্তি বা ছলন প্রতিষ্ঠা করে পূজা দেন।

পাঁচু ঠাকুরের মূর্তি দেখলে ছোট ছোট শিশুদের ভয়মিশ্রিত কৌতুক জাগে। পটুয়ারা চিরাচরিত প্রথায় মূর্তি নির্মাণ করেন। মূর্তি ভাবনায় উন্নত শিল্পকর্মের ছাপ না থাকলেও এই দেবতার আদিমতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাঁ[illegible] [illegible]কুরে[illegible] [illegible]প্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় জেলার ভোটার তালিকায় [illegible] [illegible] কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে জানি, [illegible] [illegible] [illegible]াচু ঠাকুরের নামের মালা গলায় পরে ধন্য হয়ে আ[illegible]

কুমির দেবতা কালু র[illegible]

দক্ষিণ রায়, নারায়ণী [illegible] [illegible] [illegible]া গাজী, আটেশ্বর প্রভৃতি পশু-প্রাণী ভীতিনাশক দে[illegible] ম[illegible] [illegible]কিক দেবতা কালু রায়। সুন্দরবন অঞ্চলের মূর্তিমা[illegible] [illegible] [illegible] হাত থেকে রক্ষা পাবার বিশ্বাসে জল ও জঙ্গলজীবী [illegible] [illegible] দেবতা কালু রায়ের পূজা করে। দক্ষিণ রায়ের মতো [illegible] [illegible] [illegible]বারে মানবীয়। পোশাক পৌরাণিক যুদ্ধ দেবতার ম[illegible] দুই [illegible] টাঙ্গি ও ঢাল, কোমরবন্ধে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ঝোল[illegible] পিঠে [illegible] ধনুক। আরণ্যক দেবতার প্রাচীন পূজা পদ্ধতি মেনে [illegible] [illegible] [illegible]ায় বনঝাউ ফুলের নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া হয়।

কালু রায়ের মূর্তি[illegible] [illegible] [illegible] বিরল হতে চলেছে। এঁকে কোথাও দক্ষিণ রায়ের স[illegible] দেব[illegible] [illegible]পে ভাবা হয়। এঁর জাঁতাল

পূজায় আয়োজন হয় মকর সংক্রান্তির গভীর রাতে। আগে পশুপাখি বলি দেওয়া হতো। পূজার নৈবেদ্য হিসাবে ধেনো মদ আবশ্যক।

বাদাবনের গ্রাম রক্ষক আটেশ্বর

বাদাবন অঞ্চলের আদিম আরণ্যক লোকদেবতা আটেশ্বর। বনজঙ্গল সমাকীর্ণ গ্রাম সমাজের ইনি দেবতাজ্ঞানে উপাসিত হন। খেত-খামারে আবাদকারী কৃষিজীবী, জল ও জঙ্গলজীবী পৌণ্ড্র, মাহিষ্য, কাওরা, বাগদি, দলুই, অধিকারী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি লোকসমাজের মানুষের কাছে দক্ষিণ রায়, নারায়ণী, বনবিবি, গাজী সাহেবের মতো আটেশ্বর সমান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা পান। আটেশ্বরের মূর্তি পূজার প্রচলন ব্যাপক। বেশির ভাগ থানে মূর্তিপূজা হয় নিয়মিত। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, গ্রামরক্ষক আটেশ্বর গ্রামের বাইরে তাঁর উঁচু অধিষ্ঠান ভূমিতে বসে জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামের মানুষ ও গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করেন।
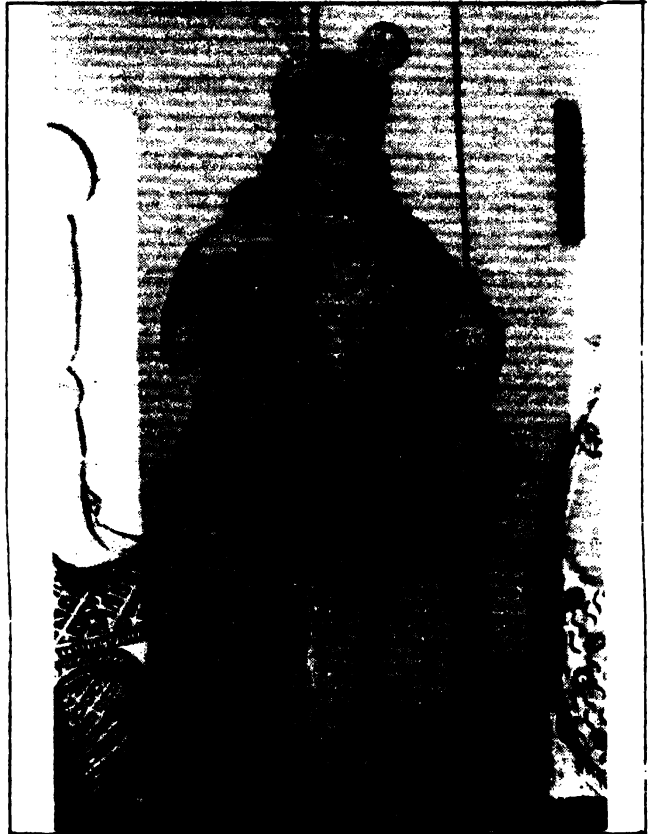
আটেশ্বর মূর্তি ছবি : কাশীনাথ দাস

আটেশ্বরের মূর্তি রীতিমতো বীর যোদ্ধার মতো। মাথায় সাধারণ পাগড়ি, বড় বড় বাবরি চুল, ছোট কাপড় মল্লযোদ্ধার মতো মালকোচা মেরে পরা, বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ, ডান হাতে ছাটা-মুগুর। সুন্দরবনের বাউলে ও মউলেরা যে ধরনের মুগুর নিয়ে জঙ্গলে যায় কাঠ-মোম-মধু সংগ্রহ করতে। শক্ত গর্জন অথবা গরান গাছের গোড়ার দিকের আস্ত-অংশ হাত চারেক কেটে নিয়ে এই ছাটা মুগুর বানানো হয়। গাছের গোড়ার শক্ত শিকড়-বাকড় কাটলেও খোঁচা খোঁচা অবস্থায় থেকে যায়। এই ছাটা-মুগুর দ্বারা কোনও জন্তুকে আঘাত করলে শক্ত শিকড়ের কাঁটাগুলো জন্তুর দেহ বিদ্ধ করে। বাঘের আক্রমণ প্রতিরোধে

জঙ্গলকারীরা এই ছাটা-মুগুর নিয়ে বনে ঢোকে। সম্ভবত মুগুরে দেবতা আটেশ্বরের অনুকরণে সাহসী জঙ্গলজীবী এই ছাটা-মুগুরের ব্যবহার করে। আটের এই বাঘ শিকারী মল্লবেশে এঁকে একজন মানুষ বলে চিনতে খুব সাহায্য করে। আরণ্যক সমাজের একসময়ের কোন অমিত বিক্রমশালী ব্যক্তি গ্রামের আটন অর্থাৎ গ্রামসীমানা রক্ষক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। এঁর সেবা-পূজায় এখনও পৌণ্ড্র সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বার্ষিক জাঁতাল পূজার রাতে মথুরাপুর থানার পাটিকেল্লবেড়িয়া গ্রামে সমীক্ষায় (১৯৭৫) গিয়ে দেখেছি, সব পূজা-অনুষ্ঠান শেষে জঙ্গলকাটি নারায়নী থানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে নিবেদিত হল আটেশ্বরের ভোগ-নৈবেদ্য। মাটির মালসায় পৃথকভাবে ভাত রান্নার পর একটা গোটা শোল মাছ আগুনে পুড়িয়ে ভাতের সঙ্গে কলাপাতায় ঢেলে সাজিয়ে রাখতে হয় নির্জন স্থানে। ভোগ নিবেদনের পর সঙ্গে সঙ্গে স্থানত্যাগ করতে হয়। পিছন ফিরে তাকাবার নিয়ম নেই। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস স্থান জনশূন্য হয়ে গেলে বাবা আটেশ্বর এসে ভোগ-নৈবেদ্য গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে সারা বছর মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্তুদের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। বাবা আটেশ্বরের গাঁজাপ্রীতি সুন্দরবনের লোকায়ত সমাজে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। লোকমুখে গ্রাম্যছড়া আজও শোনা যায় :

জয় বাবা আটেশ্বর।
হুঁকো ছেড়ে কলকে ধর॥

বাবাঠাকুর পঞ্চানন্দ

বহুজন-পূজ্য লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ। জেলায় ইনি বাবা পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত। ইনি বর্ণহিন্দু ও অবর্ণ হিন্দু সমাজে সমানভাবে সমাদৃত। সাধারণত মাটির ঘরে অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে এঁর অধিষ্ঠান। কোনও কোনও দালান মন্দিরে দেখা যায়। বিশাল চেহারা নিয়ে একাই একশো হয়ে বিরাজ করছেন। চেহারা দেখে ভয়েও ভক্তি আসে। চোখমুখের ভাব মহাদেবের মতো সৌম্য নয়, অতি উগ্র। পঞ্চানন্দের ধ্যানমন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের। পূজামন্ত্রেও বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব পড়েছে। ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ ঠাকুরের সঙ্গে পঞ্চানন্দের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধর্মসংঘাতের ফলে গঠনগত পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হয়। সাম্প্রদায়িক সংঘাত মোকাবিলার ক্ষেত্রে কল্পিত বীরপুরুষোচিত চেহারায় গড়ে তোলা হয়েছে এই মিশ্রিত দেবতাকে।

জ্বরনাশক জ্বরাসুর

জ্বররোগ নাশক রূপে পূজিত বিচিত্রদেবতা জ্বরাসুর। অসুররূপী এই জ্বরের দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য লোক সমাজ এঁর পূজা করেন দেহাবয়ব বিচিত্র ধরনের। গায়ের রঙ ঘন নীল। তিনটি মাথা, নয়টি চোখ, ছয়টি হাত ও তিনটি পা নিয়ে জ্বরাসুর অসংখ্য থানে শীতলা, মনসা, দক্ষিণ রায়, আটেশ্বর, পঞ্চানন্দ, বসন্ত রায়, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে পূজা পান। এঁর মূর্তি পূজার প্রচলন খুব বেশি। ধর্ম ঠাকুরের অনুচর হিসাবে এঁর কূর্ম প্রতীকে পূজা হয় বলে অনেকে মনে করেন। তবে শীতলার থানে বা মন্দিরে জ্বরাসুর নিত্য পূজা পান।

আধি-ব্যাধি নিয়ন্ত্রক বসন্ত রায়

বসন্ত রায় ব্যাধিনিয়ন্ত্রক দেবতা। দেহগত সৌন্দর্যের দৌলতে এঁকে লৌকিক দেবকুলে কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শীতলা মন্দিরে বা থানে সর্বত্রই এই সুবেশী দেবতার পূজা হয়। শীতলা দেবীর বিশ্বস্ত অনুচর ও পুত্ররূপে আরাধিত হন। পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। কৃষ্ণরাম দাসের শীতলা মঙ্গল কাব্যের বন্দনা অংশে বসন্ত রায়ের উল্লেখ আছে। কামলা, গলগণ্ড, কোরণ্ড, সন্নিপাত, বাত, উদরি, ফোঁড়া, গোদ, কুষ্ঠ: পীলে, ঘাম, বসন্ত, মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগের নিয়ন্ত্রক দেবতারূপে এঁকে পূজা করা হয়। গৃহপালিত পশু-পাখিকে বাঁচাতে এঁকে স্মরণ নিতে হয়। পৌণ্ড্র সমাজে শীতলা দেবীর সঙ্গে বসন্ত রায়ের পূজা খুব বেশি প্রচলিত। পূজায় ব্রাহ্মণ—পুরোহিতের প্রয়োজন একেবারে গৌণ। শীতলার বার্ষিক পূজায় পুত্ররূপ বসন্ত রায় সমানভাবে পূজিত হন।

শীতলা দেবী

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শীতলা পূজা হয়। শীতলা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক পালা বা কাহিনী নিয়ে বহু কবি শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। বসন্ত রোগের দারুণ গাত্রদাহ এঁর কৃপায় নিমেষে শীতল হয়ে যায় বলে ভক্তজনের বিশ্বাস। অনেক স্থানে শিলাখণ্ডে দেবীর পূজা হয়। বর্তমানে সর্বত্রই মূর্তিতে আরাধিতা হন। শীতলার বাহন গাধা ও অস্ত্র হল ঝাঁটা। এঁকে বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী পর্ণশবরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ভেবেছেন অনেকে। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত পর্ণশবরী দেবীর মূর্তির সঙ্গে গাধা ও বসন্ত রোগগ্রস্ত মানুষের উপস্থিতি শীতলা দেবীর সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শীতলা দেবীর প্রাধান্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। দিনে দিনে সর্বব্যাধি নিরাময়কারী দেবী বলে বিশ্বাসী ও ভক্ত নরনারীর হৃদয়সাম্রাজ্য জুড়ে বসেছেন। অতি অনাড়ম্বর স্থানে ও মন্দিরে নিত্য আরাধিতা হন সারা বছর। নিত্যপূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। নিত্য পূজায় পূজারীর আসনে বসেন কুলবধূগণ। পূজা দেওয়া হয় দুপুরে ও সন্ধ্যায়। ভিজানো আতপ চাল, মিষ্টি মিঠাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ ফলমূলের নৈবেদ্য সাজিয়ে দুপুরে নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় দেওয়া হয় শীতল—ভিজানো ছোলার সঙ্গে গুড়ের বাতাসা রেকাবে সাজিয়ে। বার্ষিক পূজা উপলক্ষে বহু থান, মন্দির ও দেবালয়ে মেলা বসে। মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক শীতলা পালা বা শীতলার জাগরণ গানের আয়োজন করা হয়। 'গায়েন' উপাধিধারী বহু গায়ক আছেন যাঁরা পুরুষানুক্রমে শীতলার জাগরণ গান পরিবেশন করছেন। মন্দিরবাজার থানার আখড়াবেড়িয়া গ্রামের মঙ্গলা হালদারের শীতলা মন্দিরে মক্রিমপুর গ্রাম নিবাসী পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকশিল্পী বসন্ত কুমার গায়েনের শীতলার জাগরণ গান শোনার সুযোগ মিলেছিল। তাঁর দলে ছিলেন হারমোনিয়াম মাস্টার, খোলী ও কয়েকজন দোয়ার। মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, জয়নগর, কুলপি, মগরাহাট, ডায়মন্ডহারবার প্রভৃতি থানার অধীন বিশ-পঁচিশটি গ্রামের কৃষিজীবী গৃহস্থ বাড়ি ও বারোয়ারি থানে বসন্তবাবু প্রতিবছর শীতলার জাগরণ পরিবেশন করেন।

সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা পূজার বহুল প্রচলন

সর্পদেবী মনসা

সর্পদেবী মনসা একজন অপৌরাণিক দেবতা। প্রাচীন ভারতীয়গণ সর্পদেবীর রূপকল্পনা করে নাগদেবীর পূজা ও নাগপূজা করত। কিন্তু মনসা নামে সর্পদেবীর পূজার উল্লেখ পাওয়া গেছে অর্বাচীন কালের পুরাণে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে এঁকে পদ্মাবতী নামে অভিহিত করা হয়েছে। পদ্মাবতীর পরিচয় ইনি শিবকন্যা। ষোড়শ শতকের কবি বৃন্দাবন [illegible] ক[illegible] লিখেছেন, চৈতন্যের জন্মকালে জনগণ বিষহরি পূজা[illegible] ছি[illegible] মনসা তখন বিষহরি অর্থাৎ সাপের বিষ হরণকা[illegible] [illegible]ত্রতা হতেন।

দক্ষিণ চব্বিশ [illegible] পূজা হয় অতি সাধারণ থান ও দেবালয়ে। অনেকে [illegible] [illegible]দেবীরূপে মনসার প্রতীক ঘট অথবা মূর্তি প্রতিষ্ঠা [illegible] পূজা করে আসছেন। সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারে [illegible] মনসার ভাসান, পদ্মপুরাণ ও মনসামঙ্গল কাব্য [illegible] থাকে। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে বার্ষিক পূজা করা হ[illegible] [illegible]পূজাকে চলতি কথায় বলা হয় 'রান্নাপূজা'। এই সম[illegible] [illegible]রের লোকের প্রবেশ নিষেধ। সূচিতার সঙ্গে রান্না[illegible] [illegible]তে হয়। নতুন মাটির হাঁড়িতে অষ্টনাগপূজার আত[illegible]র [illegible] রান্না হয়। এই হাঁড়িকে বলে 'ভোগের হাঁড়ি'। রান্[illegible] [illegible] বাজিয়ে নতুন উনোনে শুকনো খড়ের নুড়ো জ্বেলে [illegible] [illegible] একে ভাত, ডাল, বিভিন্ন ধরনের ভাজা, কুমড়ো-চিংড়ি[illegible] [illegible] ঝোল, চালতার চাটনি, পায়েস, পিঠে, পাকাকলার বড়াভাজা প্রভৃতি পদ তৈরি করে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয় যত্ন করে।

পরদিন অরন্ধন পূজা। সকালে ভোগ-রান্নার উনোন পরিষ্কার করে মনসা গাছের ডাল এনে বসিয়ে রাখতে হবে। ভোগের হাঁড়ির গলায় পরিয়ে দিতে হবে খাল-পুকুর থেকে তুলে আনা শাপলার মালা। এরপর শাপলার পাতায় নিবেদিত হবে অষ্টনাগের উদ্দেশে ভোগ-নৈবেদ্য। ভোগের হাঁড়ি থেকে আতপচালের পান্তার সঙ্গে রান্না করা সব আমিষ ও নিরামিষের পদ আটটা শাপলা পাতায় সাজিয়ে অষ্টনাগকে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। করজোড়ে প্রার্থনা জানাতে হয় মা মনসার কাছে। ফলমূল ও মিষ্টি-মিঠাইয়ের নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। মনসা পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, গৃহস্থ মহিলারা পৌরোহিত্য করেন এই পূজায়। পূজার পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অতিথি-অভ্যাগত, প্রতিবেশী ও গরিব দুঃখীদের কলাপাতা পেতে পেটপুরে অরন্ধন পূজার পান্তাসহ বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু ব্যঞ্জন খাইয়ে তৃপ্তি পান গৃহস্থ ভক্তগণ। এই ভোজের জন্য বাড়তি ভাত ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয় ভোগ রান্নার সঙ্গে। রান্না-পূজার পান্তা-ডাল চচ্চড়ি-ইলিশ ভাজার প্রতি আকর্ষণ নেই এমন ভূমিসন্তান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বিরল। মনসা পূজার ব্যাপকতায় বহু গ্রাম নাম ও স্থান নামের সৃষ্টি হয়েছে জেলায়। মনসাতলা, মনসাবাড়ি, মনসাডাঙা, মনসার বেড়, মনসা দাঁড়ি প্রভৃতি নামে বহু আবাদি খেত-খামার, গ্রাম ও মৌজার সন্ধান মেলে জেলায়। গঙ্গাসাগর দ্বীপের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল মনসাদ্বীপ নামে সুপরিচিত।

কৃষিদেবতা বেনাকি

কৃষি বর্ষচক্রের মধ্যে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে কৃষিজীবী গার্হস্থ্য পরিবার পূজা করেন কৃষিদেবতা বেনাকিকে। নামটি মেয়েলি বলে মনে হলেও ইনি আসলে পুরুষ দেবতা। পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বিশেষ ভূমিকা আছে। লোক বিশ্বাসে ইনি হলেন শস্যদেবী লক্ষ্মীর সহচর-দেবতা। আকৃতি সরীসৃপের মতো। মূর্তিটি চিৎ হয়ে শোয়ানো অবস্থায় থাকে। দেহাবয়ব চারটি পা ও একটা লম্বা লেজ নিয়ে গঠিত। মূর্তির বাম ও ডান দিকে থাকে কাদার দুটি গোলাকার পিণ্ড। এই পিণ্ডদুটির উপর থাকে অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েক ইঞ্চি লম্বা পিণ্ড। লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস আছে প্রাচীন শস্যের দেবী দুর্গার কনিষ্ঠ পুত্র গণেশের কাটা মুণ্ড নাকি অদৃশ্য হয়ে এক সরীসৃপের কাঁধে চেপে বসে বেনাকি ঠাকুরের সৃষ্টি হয়েছিল। পৌরাণিক ও লৌকিক বিশ্বাস একাকার হয়ে এই দেবতা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আসলে আদিম ভূমি দেবতার রূপান্তর ঘটেছে বলে মনে হয়। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিনে বেনাকি ঠাকুরের পূজাকে বলা হয় 'হালকাটা' পূজা। 'হালকাটা' শব্দটি সম্ভবত ভূমিজ।

সংক্রান্তির দুপুরের আগে যে কোনও এক সময় আমন ধান খেতের এক প্রান্ত পরিষ্কার করে পূজার আয়োজন করেন গৃহকর্তা। সঙ্গে থাকে বাড়ির ও পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। ধানী জমি থেকে কাদামাটি তুলে আলের পাশে তৈরি করা হয় অদ্ভুত আকৃতির এই দেবতার মূর্তি। ফুল, দূর্বা, মিষ্টি-মিঠাই-এর নৈবেদ্য সাজিয়ে দীপ ও ধূপ জ্বেলে পূজার সূচনা হয়। শাঁখ, ঘণ্টা ও কাঁসরের মিলিত ধ্বনিতে সহসা মুখরিত হয়ে ওঠে আমন ধানের খেত। পূজার শেষ লগ্নে কয়েকটি ধান গাছের আগার দিকে পুরোহিত মশাই বাম হাত দিয়ে ধরবেন। তখনই ঝুলে পড়া ধানের শিষগুলি একত্র করে মুঠো মেরে ধরবেন গৃহকর্তা। এবার পূজারী ডান হাতে কাস্তে নিয়ে ওই ধান শিষগুলি কাটতে কাটতে বলবেন, 'কার খেতে বছর পড়ে।' চাষীকর্তা নিজের নাম ধরে বলবেন,'অমুকের খেতে বছর পড়ে।' চাষীকর্তা তখন ধানের কাটা শিষগুলি সযত্নে সঙ্গে নেবেন ধানের গোলায় তুলে রাখার জন্য। আগামী বছরে পর্যাপ্ত ফসল পাবার প্রার্থনা জানিয়ে বেনাকি ঠাকুরের হালকাটা পূজা ও উৎসবের সমাপ্তি হয়।

ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেবতা ধর্মরাজ

লোকসমাজে ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুরের প্রভাব ব্যাপক। পোদ, বাগদি, মাহিষ্য, হাড়ি, মুচি, ডোম, কাওরা সম্প্রদায়ের মানুষ সারাবছর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মরাজের পূজা-অর্চনা করেন। বেশির ভাগ স্থানে ইনি নিজের থানে বা মন্দিরে পূজা পান। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী পল্লীতে এঁর থানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মূর্তি আকারে বিশাল। স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা মূর্তি গড়েন। মূর্তি ভাবনায় ধ্যানী বুদ্ধের ছাপ স্পষ্ট। সঙ্গে কিছুটা যুক্ত থাকে যোদ্ধাবেশধারী পুরুষ দেবতার অবয়ব। বহু থানে কূর্মাকৃতি শিলাখণ্ডে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হয়। একে বলা হয় 'ধর্মশিলা'।

ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজঠাকুর নিয়ে বহু আলোচনা বাংলাদেশে হয়ে গেছে। লৌকিক দেবতাকুলে তাঁর অবস্থান বিষয়ে গবেষকগণ নানা ধরনের মতামত জানিয়েছেন। ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন যে, এঁর উপাসনায় মিশে আছে বিভিন্ন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ ও বিধিবিধান। আদিতে ইনি অন্ত্যজদেবতা। পরবর্তী কালে পূজা উপাচারে ও মূর্তি ভাবনায় পড়েছে শাস্ত্রীয় দেবদেবীর প্রক্ষিপ্ত প্রভাব। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত, ধর্মঠাকুর অনার্য সেবিত দেবতা বলেই অনুন্নত-অবর্ণ হিন্দু সমাজে ইনি অপেক্ষাকৃত বেশি সমাদৃত হন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসমাজে ধর্মঠাকুরের ব্যাপক প্রভাব সুনীতিকুমারের বক্তব্যের যাথার্থ নিরূপণ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। সারা বছর ধর্মঠাকুরের থানের জানালা ও দরজায় খড়ের কুটোতে মাটির ঢেলা বেঁধে মানত জানিয়ে রাখে সরল ও বিশ্বাসী মানুষ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্যের আশায়।

বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে ধর্মরাজের বার্ষিক জাঁতালপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা বসে। ধর্মের গাজন উৎসব পালিত হয়। গৃহস্থ মহিলাগণ মাটির সরাতে পাকা খেজুর, তালশাঁস, লিচু, জাম, জামরুল প্রভৃতি নানাবিধ ফলমূলের সঙ্গে জিবেগজা, সন্দেশ, বাতাসা, নকুলদানা, পাটালি প্রভৃতি মিষ্টান্নের নৈবেদ্য সাজিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যান ধর্মঠাকুরের সামনে নিবেদন করতে। অনেকে ওল, মানকচু, শামুকে চুন, শ্বেত চামর দিয়ে নৈবেদ্য সাজান। কোঁড়া, পাঁচড়া, আব, শিশু ও কিশোরদের গায়ের দুর্গন্ধ প্রভৃতি রোগ থেকে নিরাময়ের আশায় ওল ও মানকচু নিবেদনের বিধি মানা হয়। অবর্ণ হিন্দু সমাজের হাড়ি ও ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ এই পূজায় পৌরোহিত্য করতেন আগের দিনে। এখন স্থান দখল করেছেন পতিত ব্রাহ্মণকুল। বুদ্ধপূজার দিন ধর্মঠাকুরের পূজা-অনুষ্ঠান প্রচ্ছন্ন বুদ্ধপূজা কিনা, সে বিষয়ে অনেকে ভেবেছেন।

গ্রামদেবতা রাখালঠাকুর

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। কৃষিকাজে গো-সম্পদের ব্যবহার আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। শুধু কৃষিকাজে নয়, স্থলপথ পরিবহনের কাজে এই গৃহপালিত পশুর অবদান চিরদিন স্বীকৃত। আবার গোদুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত বিভিন্ন ধরনের সুষম খাদ্য ভারতীয়দের প্রিয়তম খাদ্য হিসাবে খুবই আদরণীয়। ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের মাঝে এই গৃহপালিত জন্তুটি সাধারণ মানুষের কাছে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যে আমরা পড়ি, ভারতীয় মুনি-

চাঁদপুর গ্রামের রাখাল ঠাকুর — ছবি : কৃষ্ণকালী মণ্ডল
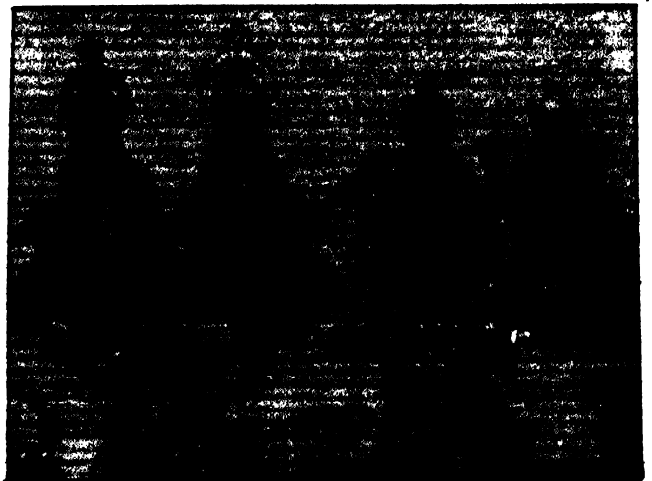
ঋষিগণ আরাধ্য দেবতাদের কাছে যে সব পার্থিব ধন প্রার্থনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম সম্পদ ছিল গোধন। মহাভারত পাঠে জানা যায়, হস্তিনাপুরে যুবরাজ দুর্যোধন একবার বিরাট রাজার গোধন হরণের জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ প্রমুখ মহাবীরগণকে নিয়োগ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের কৃষ্ণকথার অন্ত নেই। তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন গোধনে ধনী গোপ সমাজে। বৃন্দাবনের গোঠে গোঠে গোধন চরিয়ে গোসম্পদের মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি। গোধন পালন ও রক্ষার জন্য তিনি ব্রজের রাখাল বেশে অমানুষী লীলা বৈভব দেখিয়েছিলেন শ্রীদাস, সুদাম, দাদা বলরামসহ গোপ-বালকদের সঙ্গে নিয়ে। সখা কৃষ্ণ ভগবান ছিলেন রাখাল বালকদের নয়নমণি, রাখালরাজা, গোপালকদের রাখালঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ রাখালরাজার এই নিত্যলীলা মাহাত্ম্যকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে কত কাব্য, কবিতা, কথকতা। শ্রীনাম ভাগবতে উল্লেখ আছে—'হে কৃষ্ণ। তুমি পঞ্চমবর্ষে বৃহদ্বন গোকুল থেকে পশুচারণযোগ্য নতুন বন বৃন্দাবনে এসেছিলে। তুমি রাখালগণসহ সানন্দে বনভোজনে নিবিষ্ট হয়েছিলে।' শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সেজে যে লীলা-মাধুর্য দেখিয়েছিলেন, তা আস্বাদন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আজও নিত্য কৃষ্ণকীর্তন করেন—'ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল, চিত্তহারী বংশীধারী।' অথবা 'দামোদর বৃন্দাবন গোবৎস রাখাল।'

বৃন্দাবনের গোষ্ঠ লীলার পুনরাবৃত্তি হয় ষোড়শ শতকে। জৈন-বৌদ্ধ প্রভাবিত বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার আসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর থেকে। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে চব্বিশ বছর পূর্ণ হবার মুখে, নীলাচল যাত্রাপথে মহাপ্রভুর আগমন ঘটে বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন বাদরতীর্থ ছত্রভোগ মহাতীর্থে। সেসময় ছত্রভোগের সীমান্ত অধীক্ষক ছিলেন রামচন্দ্র খাঁ নস্কর। তিনি ছিলেন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের বিশ্বস্ত আঞ্চলিক সীমান্তরক্ষক ও শাসক। বৃন্দাবন দাস কবিরাজ রচিত 'শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, রামচন্দ্র খাঁ নস্কর মহাপ্রভুকে সপার্ষদ নৌকাযোগে ছত্রভোগ থেকে উৎকলের শ্রীমান্ত অঞ্চল বর্তমান কালের [illegible] পৌঁছে দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত [illegible] খাঁ নস্কর মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপালাভ করেন। এরই [illegible] বঙ্গের সে সময়ের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বৈষ্ণব ধর্মে [illegible]। সেই পুণ্য প্রভাব আজও অটুট। দক্ষিণ চব্বিশ [illegible] সমীক্ষায় দেখা যায়, লোকসমাজের বৃহত্তর জ[illegible] সম্প্রদায়ের সঙ্গে মাহিষ্য, করণ, সদগোপ, ধোবা, রাজব[illegible] প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব প্রভাব অপরিসীম।

জেলার মথুরাপু[illegible]বার, মন্দিরবাজার, কুলপি, ক্যানিং প্রভৃতি থানার [illegible] কুরের পূজো চলে আসছে মধ্যযুগ থেকে। ব্রজের [illegible] চব্বিশ পরগনার লোকধর্মে একাত্ম হয়ে গিয়ে বিভি[illegible]বতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। গ্রাম সংলগ্ন গোচারণ ভূ[illegible]রের বহু থানের সন্ধান মেলে। গৃহস্থের আঙিনায় এঁর [illegible] নেই। গোচারণ ভূমিতে এঁর অবস্থান। বেশির ভাগ [illegible] অথবা টালির ছাউনি দেওয়া চালাঘরে রাখাল ঠাকু[illegible] কোথাও কোথাও এক তলা দালান মন্দিরে রাখাল ঠাকুর নিত্য পূজিত হন। মন্দিরের গর্ভগৃহে কক্ষে, বলরাম ও শ্রীদাম সুদাম সহ গোপবালকদের সঙ্গে দুগ্ধবতী গাভী, বাছুর, ষাঁড় ও বলদমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সর্বত্র। মন্দিরবাজার থানার জগদীশপুর গ্রামের বৈষ্ণব সাধক ও লেখক ডা. ভূষণচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের উৎসাহে অঞ্চল সমীক্ষায় বেরিয়ে ডায়মন্ডহারবার, কানপুর, জগদীশপুর, পূর্ব চাঁদপুর, মথুরাপুর থানার রাজপুর, পুরন্দরপুর, রায়দিঘি থানার শোভানগর, ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা প্রভৃতি গ্রামে রাখাল ঠাকুরের থানের সন্ধান পেয়েছি। জয়নগর থানার একটা প্রাচীন জনপদ এখনও 'গোচারণ' নামে খ্যাত। রাখাল ঠাকুরের থান আজও রাখাল বালকদের গোচারণভূমির মূল কেন্দ্রবিন্দু ভক্তি ভালবাসার স্থল। মিলনমেলার স্থান।

জঙ্গলজননী বিশালাক্ষী

কৃষিজীবী, জলজীবী ও জঙ্গলজীবী লোকসমাজে ও জঙ্গলজননী বিশালাক্ষীর প্রভাব অসীম। কলকাতার দক্ষিণে জঙ্গলমহল যত ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে; বিশালাক্ষী পূজার ক্ষেত্র ততই বিস্তৃত হয়ে চলেছে। কৃষক, ধীবর, মউলে ও বাউলে প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের নয়নের মণি ইনি। সুন্দরবন অঞ্চলের নবগঠিত ছোট-বড়-মাঝারি দ্বীপগুলিতে মেদিনীপুর জেলা ও প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে

শাহজাদাপুর গ্রামে বনবিবি ছবি : জয়ন্ত হালদার

আগত মানুষের নয়াবসত পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশালাক্ষী পূজা-উপাসনা ও বার্ষিক জাঁতাল পূজার প্রসার বেড়েছে। প্রাচীন অধিবাসীদের বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন পরবর্তীকালের আগতগণ।

বিশালাক্ষী শাস্ত্রীয় কোনও দেবী নন। তান্ত্রিক দেবী। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থে এই তান্ত্রিকদেবীর পরিচয় আছে। ইনি বহুক্ষেত্রে 'বাসলী', 'বাঁশুলী', প্রভৃতি নামেও খ্যাত। গবেষকগণ এঁকে বিচিত্ররূপিণী দেবী রূপে বর্ণনা করেন। বজ্রযান বা সহজানযানীদের উপাস্য এই বৌদ্ধদেবী, গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে যুক্ত হন। এর পূজায় মদ, মাংস, পোড়া মাছ প্রভৃতি নৈবেদ্যের উপাচার দেখে এঁকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কোনও দেবী হিসাবে ভাবার কোনও অবকাশ নেই। জেলার প্রায় সর্বত্র অতি সাধারণ মাটির অথবা ইটের দেওয়াল দেওয়া থানে এঁর নিত্য পূজা হয়। আবাদি সুন্দরবন অঞ্চলে মাটির দেওয়াল ঘেরা খড়ের চালাঘরে মূর্তিপূজা হয় বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জে ও দ্বীপভূমিতে। সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যে বণিকের বাণিজ্যযাত্রা বর্ণনায় কলকাতার দক্ষিণে বারুইপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উল্লেখ আছে :

সাধুঘাটা পাছে করি   সূর্য্যপুর বাহে তরী
চাপাইল বারুইপুর আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি   বিশালক্ষ্মী দেবী পূজি
বাহে তরী সাধু গুণরাশি।।

সম্ভবত লিপিকারদের ভুলবশত 'বিশালাক্ষী' শব্দের পরিবর্তে এখানে 'বিশালক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। বারুইপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন কাছারি বাজারে এই বিশালাক্ষী ক্ষেত্রটি এখন সুপ্রসিদ্ধ। ফলতা থানার পদ্মপুর গ্রামের প্রাচীন ক্ষেত্রে বিশালাক্ষী দেবীর নব-রত্নমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক দশক আগে। জয়নগর থানার বহড়ু-দক্ষিণ-বারাসত সংলগ্ন উত্তরপাড়া গ্রামের বিশালাক্ষী ক্ষেত্রটিও প্রাচীন। সুন্দরবন অঞ্চলে একটি বিশাল আটচালা বিশালাক্ষী মন্দির আছে কাকদ্বীপ থানার শিবকালীনগর গ্রামের কামারবাড়িতে। গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের কাছে একসময় সদাব্রতী ও দানশীল প্রবাদপুরুষরূপে খ্যাত ঈশানচন্দ্র কামার মহাশয় হুগলি-ভাগীরথীর পূর্ব তীরে তাঁর বাসভবনের সামনে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কাঁটাবেনিয়া গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর খ্যাতি আছে দক্ষিণ অঞ্চলে। পূজারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু প্রধান উপাসকগোষ্ঠী হল মৎস্যশিকারীরা। কাকদ্বীপের বিশালাক্ষী ক্ষেত্রটিও সুপ্রসিদ্ধ।

বেশির ভাগ থানে দেবীর মাটির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতলের মূর্তি ও দারুমূর্তিতেও পূজিতা হন। শিলাখণ্ড অর্থাৎ যন্ত্রমূর্তিতে পূজা হয়। মূর্তি ভাবনায় রূপভেদ দেখা যায়। কোথাও ইনি দ্বিভুজা, আবার কোথাও চতুর্ভুজা। নিত্য পূজা ছাড়া, সারা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে সারা জেলায় বিশালাক্ষী পূজার ধুম পড়ে যায়। পূজা উপলক্ষে গ্রামে-গঞ্জে-দ্বীপভূমিতে মেলা বসে। সম্প্রদায়গত ভাবে দেখলে বিশালাক্ষী আরাধনায় পৌণ্ড্র, কাওরা, বাগদি, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, জেলিয়া কৈবর্ত, গোয়ালা, নাপিত, ধোপা, মুচি, হাড়ি, কামার, দলুই প্রভৃতি সমাজের মানুষের প্রাধান্য চোখে পড়ে। দেবীর বার্ষিক জাঁতাল পূজা গ্রাম-জনপদে শুধু নয়, জঙ্গলমহলে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত। কুলতলী থানার চিতুড়ির বাঘের জঙ্গলে একবার (১৯৮৮) সারারাতব্যাপী বিশালাক্ষী দেবীর বার্ষিক জাঁতাল পূজার মেলায় কাটাবার সুযোগ পেয়েছি।

বিবিগাজী-পীরপীরানী : বাদাবনের অধিষ্ঠাত্রী বনবিবি

আবাদি খেতখামার, জল ও জঙ্গল সমাকীর্ণ বাদাবনের দেশের গ্রাম সমাজের অধিষ্ঠাত্রী মা বনবিবি। লোকায়ত হিন্দু জনগোষ্ঠী সমূহের কাছে ইনি সর্বজনপ্রিয় মাতৃমূর্তি। পৌত্তলিক হিন্দুরা মায়ের আসনে বসিয়ে শত শত বছর ধরে এঁর পূজা করে চলেছেন থানে, মন্দিরে, দেবালয়ে। চাষী-গৃহস্থের পরিবারে অনেক স্থানে বসে আছেন কুলদেবীর আসনে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভক্তজনের চিত্তজয়কারী এমন লৌকিক দেবতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অদ্বিতীয়। এই গ্রহণযোগ্যতাই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের স্মারক।
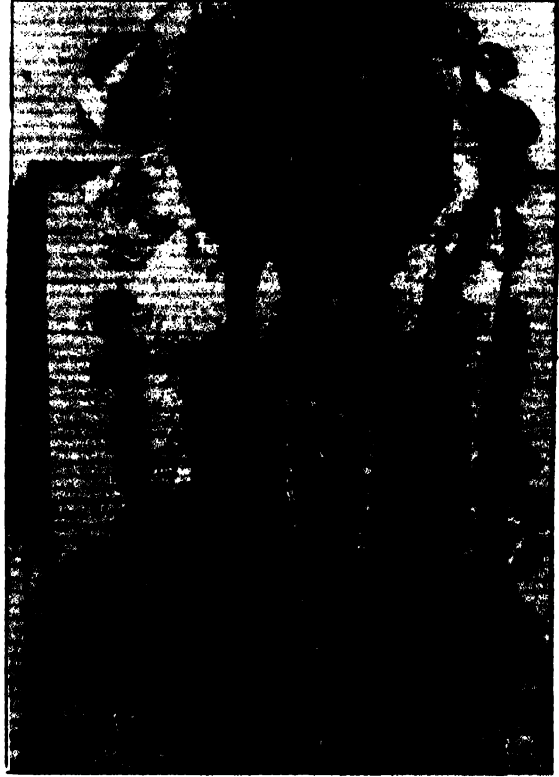
বহড়ু উত্তরপাড়ার বিশালাক্ষী   *ছবি : কাশীনাথ দাস*

বনবিবি শুধু একজন অভিজাত মুসলমানী নন, মুসলমান সমাজে ... পরিচয় হল ইনি একজন বিলাসিনী। এই বিলাস হল এঁর আজন্মের সাধন ঐশ্বর্যের। বনবিবি যে একজন উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্না মহীয়সী মাতৃমূর্তি এ বিশ্বাস কিন্তু মুসলমান সমাজের থেকে লোকায়ত হিন্দু সমাজের মানুষের বেশি। এঁর মাহাত্ম্যের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে আছে কৃষিজীবী, সাধারণ খেতমজুর, বাউলে, মউলে, শিকারী, নিকারী, বুনো পাটনী প্রভৃতি বিচিত্র জীবিকাধারীরা। এরা নিত্য স্মরণে রাখেন মা বনবিবিকে। সবাই বিপদে-আপদে স্মরণ নেয় লোক-কবির রচিত ও ব্যাপক প্রচলিত মা বনবিবির সেই অভয়বাণী :

আঠার ভাটির মাঝে আমি সবার মা।
মা বলি ডাকিলে তাঁর বিপদ থাকে না।
বিপদে পড়ি যেবা মা বলি ডাকিবে।
কভু তারে হিংসা না করিবে।

বনবিবি একজন ব্যাঘ্রদেবী। দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর মতো ইনি দেবতারূপে সর্বজন শ্রদ্ধেয়া। মধ্যযুগের আঞ্চলিক ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনায় জানা যায়, আদি পাঠান যুগের একজন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না মুসলমান সাধিকা ও ইসলাম প্রচারক ইনি। পারিবারিক আভিজাত্যে নিজের সমাজে প্রথমে ছিলেন বহুজন পূজ্য এবং পরবর্তীকালে অবর্ণ হিন্দু সমাজের উপাস্যা হন। নিম্নবঙ্গের অধিবাসীদের ব্যাঘ্রভীতির মুশকিল আসানে এঁর সাধন ঐশ্বর্য একসময় অলৌকিকতায় রূপান্তরিত হয়। বনাঞ্চল ও বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রাম-জনপদে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বাঘের অধিদেবতারূপে কল্পিত হয়ে রূপান্তরিত হন অভয়দাত্রী মাতৃমূর্তিতে। আদিতে ছিলেন একজন বহিরাগত ইসলাম-প্রচারক, পরিবর্তিত আচারে হয়ে ওঠেন অভয়দাত্রী মা বনবিবি। মাহাত্ম্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় ব্যক্তিজীবন। কল্যাণময়ী জননীর কোনও জাত নেই বলেই হয়ে ওঠেন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যবর্তী একজন সমন্বয়ী মাতৃমূর্তি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার যোগসূত্র।

বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচার মূলক কয়েকটি মুদ্রিত মুসলমানী কেচ্ছা-কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মুন্সী বয়নদ্দীন, মুন্সী মোহাম্মদ খাতের ও মোহাম্মদ মুন্সী সাহেব এই কাব্যগুলির রচয়িতা। এই কেচ্ছাকাব্যগুলির মধ্যে মুন্সী বয়নদ্দীন রচিত 'বোনবিবির জহুরানামা' কাব্যখানি সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে আহাজদ্দীন আহমদ কর্তৃক কলকাতার বটতলায় ৩৩৭/২ আপার চিৎপুর রোড থেকে প্রকাশিত হয়। 'বোনবিবির জহুরানামা' পাঠে জানা যায়, ইনি এব্রাহিম ফকিরের কন্যা, মায়ের নাম গুলালবিবি। এঁর ভাইয়ের নাম শা-জাঙ্গলী। এঁদের নামকরণের মধ্যে আছে আরণ্যক পরিবেশের ব্যঞ্জনা। ভাইয়ের নামের শেষাংশে জুড়ে আছে জঙ্গল এবং নিজের নামের প্রথমাংশে বন। অরণ্য অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে এসে এঁরা অরণ্যদেবতার আবরণে আবৃত হয়ে পিতৃদত্ত নামকরণ হারিয়েছেন। নিম্নবঙ্গের ভাটির দেশে ইসলাম প্রচারের সূচনা সহজ ছিল। ভাটীশ্বর দক্ষিণ রায় ও তাঁর মা নারায়ণীর সঙ্গে এঁদের প্রথম বিরোধ বাধে। প্রথমে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং সন্ধি স্থাপিত হয়। আঠারো ভাটির দেশে সাড়ম্বরে পূজা-হাজোত শুরু হয় দক্ষিণ রায়, নারায়ণীর [illegible] মা [illegible]বিবির।

দক্ষিণ চব্বিশ প[illegible] বনবিবির উপাসনা হয় থান অথবা মন্দিরে। গ্রাম-গ[illegible], [illegible]পল্লীর পথে প্রান্তরে সর্বত্র এই পূজা হয় মূর্তি ও মা[illegible] সংক্রান্তির পর থেকে সারা মাঘ মাস জুড়ে দক্ষিণ [illegible] মানুষ মেতে ওঠেন বিবির বার্ষিক জাঁতাল পূজায় [illegible] উপলক্ষে মেলা বসে বিভিন্ন অঞ্চলে। জ্যৈষ্ঠ মাস [illegible] উ[illegible]। বিবির আকৃতি অন্যান্য লৌকিক দেবীদের ম[illegible] [illegible]র্ণ মানবী মূর্তি। নারায়ণী, বিশালাক্ষীর মতো প্রহ[illegible]বতী, কল্যাণী ও ভক্তবৎসলা মাতৃমূর্তিতে সর্বত্র পূ[illegible] কো[illegible]ঘের পিঠে, আবার কোথাও মুরগির পিঠে আরূঢ়া [illegible]কটি বালকমূর্তি। ভক্তজনের বিশ্বাস মূর্তিটি তাঁর শর[illegible] বা[illegible]র। তাঁর পূজা-হাজোতে চিনির বাতাসা, পাটালি, কদম[illegible], দুধ, শিরনি ও ফলমূলের নৈবেদ্য নিবেদন কর[illegible] ও তাঁর আশ্রিত বাঘকুলের ভোগের জন্য ভক্তজন [illegible] মধ্যে [illegible] মোরগ ও মুরগি সুন্দরবনের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে। এইজন্য সুন্দরবনের জঙ্গলে ঝাঁকে ঝাঁকে বনমোরগের দল ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

বনবিবির বার্ষিক পূজা-হাজোত অর্থাৎ জাঁতাল পূজার জন্য জেলার বিভিন্ন এলাকার খ্যাতি আছে। মগরাহাট থানার আলিদিয়া ও কুলদিয়া গ্রামের বনবিবির খ্যাতি অনেক দিনের। জয়নগর থানার রামরুদ্রপুরের হরিণখালির মাঠের বনবিবির মেলা খুব জাঁকজমকপূর্ণ। একসময়ের বিস্তীর্ণ বনভূমির বাঘ-হরিণের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বনবিবির স্থান। এরই অদূরেই আছে আবাদি সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ গ্রাম হলদিয়া। পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ভুক্ত মণ্ডলবাড়ির কৌলিক দেবী মা বনবিবির জাঁতাল পূজা উপলক্ষে পয়লা মাঘ গ্রাম জুড়ে সারারাত ব্যাপী উৎসব পালিত হয়। বনবিবির মন্দিরের গর্ভগৃহে মাটির স্তূপপ্রতীকে পূজা নিবেদন করা হয়। আগের দিনে একজন খাদেম ছিলেন এই বার্ষিক পূজার পুরোহিত।

লোক সংস্কৃতির একটা বিশাল জায়গা জুড়ে আছেন বনবিবি। বার্ষিক উৎসবে সর্বত্রই বনবিবির পালাগান পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে। আধুনিক যুগের বহু কবির কবিতা ও ছড়ায় বনবিবির মাহাত্ম্য কথা প্রচারিত হয়। পরিশেষে কবি ওয়াজেদ আলির 'বনবিবির বন' কবিতার শেষাংশ উদ্ধৃত করছি :

> প্রতিবছর বোশেখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে,
> দলবেঁধে সব নৌকো নিয়ে আসে বনের ধারে।
> বনবিবির নামে তারা সন্না দিয়ে যায়,
> মোরগ কিংবা মুরগী দিয়ে মানত মেটায়।
> বনবিবির জঙ্গলেতে এসব প্রথা আছে,
> সোঁদরবনের গেঁও মানুষ এসব নিয়ে বাঁচে।
> গঙ্গারিডির রাজ্যেতে তাই বনবিবির বন,
> ভয়াল-সবুজ হলেও তা মুগ্ধ করে মন।

বড় খাঁ গাজী

ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে বড় খাঁ গাজী নামটি বহুল প্রচলিত এবং বহু আলোচিত। বড় খাঁ গাজী নামে পরিচিত এই ইসলাম প্রচারক যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সে বিষয়ে গবেষকগণ একমত। কিন্তু এঁর ব্যক্তি পরিচয় অজ্ঞাত থেকে গেছে বনবিবি, দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর মতো। অথচ পুঁথিগত উপকরণে বনবিবি, দক্ষিণ রায়, শা-জঙ্গলী, বড় খাঁ গাজী, ভাঙড়পীর, নারায়ণী সমসাময়িক কালের মানুষ। বহিরাগত ইসলাম প্রচারক বনবিবি, শা-জঙ্গলী ও বড় খাঁ গাজীর সঙ্গে নিম্নবঙ্গের স্বধর্মরক্ষক দক্ষিণ রায় এবং তাঁর মা নারায়ণীর সংঘর্ষ এবং পরে মৈত্রী স্থাপনের পরিচয় আমরা পেয়েছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে গাজী শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বিজয়ী। বিধর্মীর সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে যিনি বিজয়ী, তিনিই গাজী নামে সম্মানিত হতেন। সে জয় সব সময় সশস্ত্র সংগ্রামের নাও হতে পারে, নিজের চরিত্র মাধুর্যে বিধর্মীর হৃদয় জয় করাও হতে পারে। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড় খাঁ গাজীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ এবং পরে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে মৈত্রী স্থাপনের চিত্র আমরা পেয়েছি।

বড় খাঁ গাজীর উপাসকদের মধ্যে ধর্মীয় কোনও ভেদাভেদ নেই। ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের কাছে সমানভাবে বরণীয়। পল্লীর পথে-প্রান্তরে এঁর বীরপুরুষোচিত মাটির মূর্তি সর্বত্র পূজা করা হয়।

মাথায় মুসলমানী টুপি অথবা পাগড়ি পরা, মুখে লম্বা দাড়ি, গোঁফ জোড়া আকর্ণ বিস্তৃত, চোখ বড় বড়, হাতে শাণিত তরবারি অথবা আসাবাড়ি। পুরোপুরি ধর্মযোদ্ধার বেশ। সাধারণ মাটির আস্তানায় বা থানে এঁর মূর্তি পূজা হয়। অনেক স্থানে মুসলমান ফকির বা খাদেমগণ হাজোতদানের অধিকারী। ভক্তজন বহু থানে নিজেরা হাজোত দেন। চিনির বড় বড় ফুল-বাতাসা, বীরখন্ডি, এলাচদানা, পাটালি, কদমা, দুধ, ক্ষীর, শিরনি নৈবেদ্য দেওয়া হয়। খাড়ি গ্রামের বড় খাঁ গাজীর আস্তানার খ্যাতি আছে।

ঘুটিয়ারী শরীফের পীরমোবারক গাজী

মধ্যযুগের ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী অন্যতম। মেদনমল্ল পরগনার হাড়দহ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আস্তানা এখন উত্তরবঙ্গের ভক্তজনের ভক্তি ও ভালবাসার স্থল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সপরিবারে সারাবছর পীরবাবার মাজারে জমায়েত হন। এঁর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে রচিত হয়েছে পালাকাহিনী। অনেক নামের মালা পরানো রয়েছে এঁর গলায়। অনেক নামের মধ্যে মোবারক শা গাজী, পীর মোবারক, গাজীপীর, গাজীসাহেব, গাজীবাবা, বড় খাঁ গাজী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই পুণ্যক্ষেত্রকে সাধারণ মানুষ বলে থাকে বাবার অঞ্চল, পীরের ঠাঁই, গাজীবাবার মাজার। পুথিগত উপকরণে এঁর পিতৃদত্ত নামের পরিচয় মিলেছে—মোবারক শা। বাবার নাম সেকেন্দার শা, মতান্তরে চন্দন শা বাদেশা। জন্ম বেলে-আদমপুর। জন্মস্থানরূপে বৈরাটনগরের উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি আছে, বাল্যকাল থেকে ইনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। পরিণত বয়সে সাধনা-ঐশ্বর্যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। এক সময় তিনি হাড়দহের মোকাম ছেড়ে পিয়ালী ও বিদ্যাধরী নদীর অববাহিকা অঞ্চলের বাঁশড়া গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন। 'বাঁশড়ার গাজীর গান', 'মুসলমানী গাথা', 'মদনপালা' প্রভৃতি মাহাত্ম্যকথা প্রচারমূলক রচনা থেকে গাজীবাবার জীবনের বহু কথা ও কাহিনীর সন্ধান মিলেছে।

তখন মোগল আমল, ঢাকার নবাব তখন শায়েস্তা খাঁ। ছত্রপতি শিবাজীর প্রবল আক্রমণে মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব প্রায় পর্যুদস্ত। এই ঘোর দুর্দিনে জলপথে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণে নিম্নবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হতে চলেছে। গাজীর গাথায় উল্লেখ আছে, সে সময় তিনি গায়েবী অর্থাৎ আকাশবাণী শুনতে পান:

গায়েবী আওয়াজ গাজী পাইল শুনিতে,
শুন গাজী কই তুমে যাও হেথা হৈতে।

মানুষের কল্যাণ সাধনে গাজীসাহেব চলে এলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পাইকহাটি অঞ্চলে। সেখান থেকে হাড়দহ এলাকায়। অল্প দিনের মধ্যে জঙ্গলজীবী কাঠুরিয়ারা তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠে। এখানে কিছুদিন কাটিয়ে চলে আসেন বাঁশড়ার জঙ্গল মহলে। তাঁর আগমনে বাঁশড়া গ্রাম তীর্থ মাহাত্ম্য লাভ করে। নামকরণ হয় ঘুটিয়ারী শরীফ। একসময় রাজপুরের রাজা মদন রায় ঘোর বিপদে পড়ে গাজী বাবার স্মরণাপন্ন হন এবং বিপদ থেকে রক্ষা পান। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজা তাঁর বাঁশড়া অঞ্চলের ১৬৫৬ বিঘা জমি পীরের সেবার জন্য লাখরাজ দেন এবং একটি পাকা মসজিদ নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এই মানবসেবী মহৎ জীবনের অবসান ঘটলে তাঁর সমাধির উপর গড়ে তোলা হয় সুরম্য মাজার-সৌধ। এখন প্রতি বছর ৭ আষাঢ় থেকে ১৭ শ্রাবণ পর্যন্ত এই পবিত্র মাজারে বার্ষিক হাজোত উৎসব পালিত হয় ও মেলা বসে। মদন রায়ের বারুইপুরের উত্তরাধিকারীগণ পারিবারিক কৌলিক প্রথা অনুসারে পীরের মাজারে সর্বপ্রথম শিরনি নিবেদন করেন।

ঘুটিয়ারী শরীফের মেলাকে বলা হয় 'রাত পরব'। সারা রাতের মেলা। ধূপ, বাতি, আতরের সঙ্গে নৈবেদ্য সাজিয়ে ভক্তগণ মাজারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পীরালি, ফকিরি, আমীরি সব রকমের

ঘুটিয়ারি শরিফ মাজারের পুকুরে দর্শনার্থীরা জলের মধ্যে হাত রেখে মনস্কামনা জানান ছবি : হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল

গান পরিবেশিত হয়। গানে ব্যবহৃত হয় কাওয়ালী ও গাজনের সুর। গানে গানে রাত কাবার হয়। ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়:

জাগোরে জাগোরে সুন্দরবনের বাদশা
গাজীপীর মোবারক শা।
বৎসর বৎসর তোমার চন্দন মেলা,
জাগিয়াছে আজি ১৭ই শ্রাবণ বেলা।

১৭ শ্রাবণ গাজী সাহেবের মৃত্যুদিবস পালিত হয়। ঘুটিয়ারী শরীফ হয়ে ওঠে সর্বধর্মের মিলনতীর্থ। মেলা উপলক্ষে পূর্বরেলের দক্ষিণ শাখায় শিয়ালদহ-ক্যানিং রেলপথে বিশেষ ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। স্বদেশী ও বিদেশি বহু ভক্ত, জ্ঞানী, গুণী, ভদ্র, সজ্জন, গবেষক মানুষ উপস্থিত হন গাজীর মাজারে। অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক সাহেব প্রতি বৃহস্পতিবার একসময় আসতেন গাজীসাহেবের মাজারে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে।

ভাঙ্গড় পীর

ভাঙ্গড় পীর মধ্যযুগের বরিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক। তাঁর মাহাত্ম্য কথা প্রচারিত হয়েছে সারা নিম্নবঙ্গ জুড়ে। মুন্সী মোহাম্মদ খাতের সাহেব, মোহাম্মদ মুন্সী ও মুন্সী বয়নদ্দীন রচিত 'বোনবিবির জহুরানামা' কেচ্ছা-কাব্যে আমরা পীর ভাঙ্গড় শার পরিচয় পাই। আল্লা রসুলের আজ্ঞায় বনবিবি ও শা জাঙ্গলী ভাটির দেশে এসে প্রথমেই ভাঙ্গড় পীরের আস্তানায় গিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে মুনশী মোহাম্মদ খাতের বর্ণনা করেছেন:

কহেন ভাঙ্গড় শাহা শুন দিয়া মন।
এই তো ভাটির দেশ আইলে এখন।।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নিম্নবঙ্গের এমন একজন পীরের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কোনও পালা বা কেচ্ছাকাহিনী আমাদের হাতে আসেনি। অথচ তাঁর আগমনে ধন্য হয়েছে নিম্নবঙ্গ। তাঁর আস্তানা এখন ভাঙ্গড় জনপদ নামে খ্যাত। তাঁর পবিত্র মাজার ভক্ত মানুষের মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। 'ভাঙ্গড়' শব্দটি চলিত কথায় 'ভাঙড়' নামে পরিচিত। তাঁর মাজারের পাশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাঙড় বাজার। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ভাঙড়।

ভাঙড় বাজারের অদূরে এই মাজারের পাশেই আছে একটি নাম না জানা প্রাচীন [illegible] লোকে বলে আজান গাছ। বৃক্ষ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছে[illegible] হাজার বছরেরও বেশি। জনশ্রুতি আছে, পীরে[illegible]রবের দিন গভীর রাতে ছোট ছোট হলদে রঙের [illegible] বেলায় ঝরে যায়। সারা বছর পীরের মাজারে ভক্ত [illegible] ভিড় লেগেই আছে। ১৬ চৈত্র পীরবাবার উরসের দি[illegible]লা বসে। এদিন শিখভীদেরও প্রবেশাধিকার আছে মা[illegible]কিরি, কাওয়ালী গানে মুখরিত হয়ে থাকে মাজার প্রা[illegible]

গ্রামজননী বিবিমা

বিবিমা। এই [illegible] জড়িয়ে ভক্তি, ভালবাসা ও নির্ভরতা। জাতি, ধর্ম [illegible] কোনও রূপভেদ এখানে নেই লোকধর্মে বিবিমা খুব [illegible] অনাড়ম্বরভাবে স্থান পেয়েছেন। বিবিমা নামটি আবেগ[illegible]বোধক। কিন্তু বিবিমা একক ব্যক্তিত্ব নন। দক্ষিণ [illegible] প্রায় সর্বত্রই কোথাও সাত বিবিমা, কোথাও নয় [illegible]ধিক প্রসিদ্ধ। আগের দিনে হিন্দুদের থানে অথবা মন্দিরে খাদেম অর্থাৎ মুসলমান পুরোহিতগণ পূজা-হাজোতের অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে এই প্রথার বিলোপ হতে বসেছে। পূজা-হাজোত প্রক্রিয়ায় মৌলবাদীদের অশুভ ছায়া পড়েছে। মৌলবাদী চাপে পড়ে খাদেমগণ কিছুটা নিরুৎসাহ হচ্ছেন বিবিমাদের মূর্তিপূজায়। উপাসকগণ নিজেরাই বিবিমায়েদের হাজোতে পৌরোহিত্য করছেন। পতিত ব্রাহ্মণও এগিয়ে এসে পূজারীর আসনে বসেছেন। পূজা হাজোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সমান অধিকার।

বিবিমাগণের মধ্যে ওলাবিবিমা সর্বজ্যেষ্ঠা। সাত বিবিদের মধ্যে তিনি অধিক সমাদৃত। অন্য ছয়জন তাঁর প্রিয়তমা ভগ্নী। ওলাউঠা বা বিসূচিকা রোগের অধিষ্ঠাত্রী বিবি হিসেবে তিনি সর্বজনপরিচিত। অন্য ছয়জন বোনদের নাম হল—ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটুনেবিবি ও আসানবিবি। মতান্তরে আর একজন আছেন, তাঁর নাম মড়িবিবি। এঁদের মধ্যে ঝোলাবিবি হাম ও বসন্ত, মড়িবিবি সন্নিপাত জ্বর, বিকার প্রভৃতি রোগের অধিষ্ঠাত্রী বলে মানুষের বিশ্বাস। মাটির স্তূপের প্রতীকে এবং মাটির প্রতিমা মূর্তিতে সর্বত্র এঁরা পূজিত হন। বালি-সিমেন্টে জমিয়েও এঁদের স্তূপ বানানো হয় কোথাও কোথাও। তবে ছোট-বড়-মাঝারি মাটির মূর্তিতে পূজা-হাজোত দেওয়া হয় প্রায় সর্বত্র।

নিত্য পূজা ছাড়া মঙ্গলবার ও শনিবার 'বারের দিন' বিশেষ হাজোত ব্যবস্থা থাকে। বার্ষিক পূজা-হাজোতের দিন উৎসব পালিত হয় এবং এই উপলক্ষে মেলা বসে অজস্র গ্রামে। বিবিমার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক গানের আসর বসে। এক এক জন গায়েন ও বায়েন পরিবারের সন্ধান পেয়েছি যাঁরা পুরুষানুক্রমে বিবিমায়ের পালাগান পরিবেশন করে জেলায় বিপুল খ্যাতি লাভ করেছেন। মন্দিরবাজার থানার মকিমপুর নিবাসী বসন্তকুমার গায়েন এবং বল্লভপুর গ্রামের লক্ষ্মণচন্দ্র গায়েন এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দুজনেই পোদ বা পৌণ্ড্র সম্প্রদায়ের মানুষ। পালাগান শুরুর আগে কতকগুলি মাঙ্গলিক আচরণ সমাধা করতে হয়। মূল গায়েন আসরের কাছে মাটির ঘট স্থাপন করে আসাবাড়ি মাটিতে গেঁথে দেন। তারপর কালমা অর্থাৎ বুলি পাঠ করেন:

ওয়াম কালমা তৈয়ব
দিয়াম কালমা সাহদ্যোৎ
সিয়াম কালমা তমশিব
হক এলাহি ইল্লাহ্য মাহম্মদ রসুলুল্লাহ।

পালাগানের সূচনায় বন্দনা গান গাওয়া হয় বিবিমায়ের উদ্দেশে :

বন্দিলাম নূর নবী মা ওলাবিবি
তোমরা বিবি আলমের সার।
তোমাদের জহুরা যতো
তাহা বা বলিব কতো
বিধিমতে করিলে অপার।

পালাগানের এই সব আসরে গ্রামের সব মানুষ সমবেত হয় সপরিবারে। আত্মীয়-স্বজন, পরিজনদের সমাগমে গৃহাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ বারাসতের শতর্বা গাজী

আধুনিক যুগের একজন ইসলাম প্রচারক শতর্বা গাজীর প্রসিদ্ধ মাজার আছে মজে যাওয়া আদিগঙ্গা তীরের প্রাচীন জনপদ দক্ষিণ

বিভিন্ন সময়ের বাঘমূর্তি মুণ্ড, কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালার সৌজন্যে
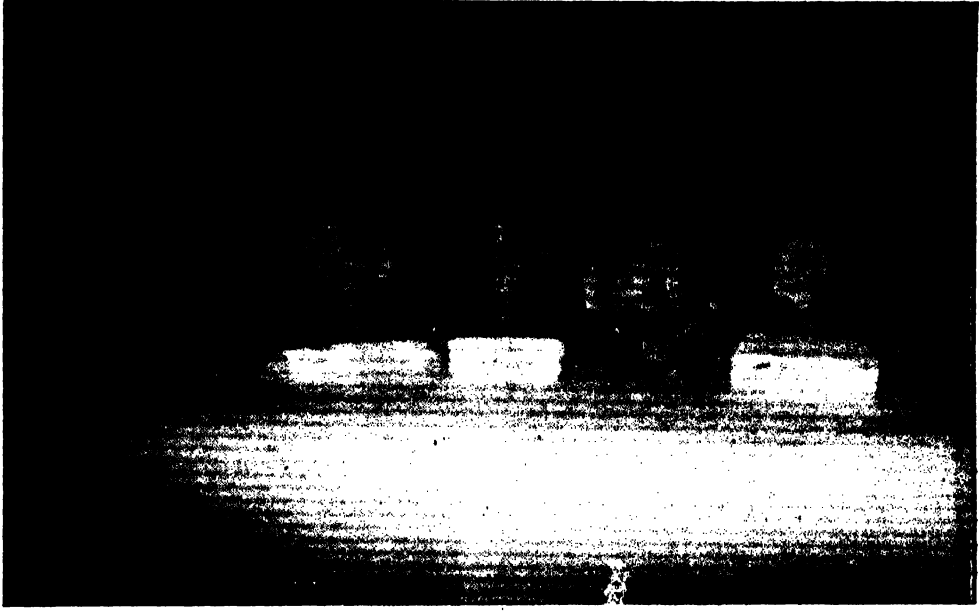
বারাশতে। দক্ষিণ রায় ও নারায়ণীর এক শত মুণ্ড মূর্তি পূজার খ্যাতির ফলে মধ্যযুগ থেকে স্থানটি বারাশত নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণ অঞ্চলের বলেই বারাশত শব্দের আগে দক্ষিণ কথাটি বসেছে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দক্ষিণ বারাশতের লোকধর্ম পর্যালোচনায় অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে পীর শতর্ষা গাজী মাহাত্ম্য কথা। দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের অদূরেই মজে যাওয়া গঙ্গাতীরে কালিকাপুর গ্রামের দাসপাড়ার মাহিষ্য পল্লীতে গাজী সাহেবের এই মাজারে প্রতিনিয়ত ভক্ত সমাগম হয়। এঁর জীবনকাহিনীর খুব বেশি পরিচয় পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, গাজীবাবা ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচারে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের পর জীবন সায়াহ্নে দক্ষিণ বারাসত জনপদে এসে লোকালয় থেকে কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে সাধন আসন পাতেন। দিনে দিনে তাঁর লোকোত্তর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল। স্থানীয় বসুবাড়ির জনৈক ব্যক্তি গাজীবাবার সেবার ভার অর্পণ করেন তাঁর জমিদারির অধীনস্থ একঘর মোল্লা প্রজার উপর। বসু মহাশয় গঙ্গাতীরের কিছু জমিও দান করেন গাজীবাবার সেবার জন্য। গাজীবাবা ঠিক কতদিন আগে এখানে এসেছিলেন তা জানা যায়নি। শোনা যায়, প্রায় দুশো বছর আগে তিনি এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পবিত্র মাজারের উপর একসময় সৌধ গড়ে তোলা হয়েছিল। মাজার ঘিরে ইটের বনেদ দেখা গিয়েছে।

সমতল থেকে পাঁচফুট উঁচু মাটির বেদির উপর সাড়ে তিনফুট গম্বুজাকৃতি মাটির ঢিপিটিই গাজীর মাজার। সমগ্র মাজার ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে একটা বিশাল ছাতার মতো ঢেকে আছে অজানা একটা বুনোলতা। সপ্তাহের মধ্যে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার মাজারে হাজোত দেন ভক্তিমতী মহিলাগণ। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির হাত থেকে বাঁচার আশায় অনেকেই খড়ের কুটোতে মাটির ঢেলা বেঁধে মানত করে যায়। রোগ মুক্তির পর মানসিক পূজা-হাজোত দিয়ে যান সপরিবারে। অনেকেই দুধ ও ডাবের জল ঢালেন মাজারের বেদির উপর। দুধের ধারা নেমে আসে মাটির বিশাল বেদি বেয়ে। মাঘটিকারি গ্রামের একঘর মুসলমান পরিবার এই মাজারের খাদেম।

রায়নগরের রক্তা খাঁ

দক্ষিণ বারাসত রেল স্টেশনের সংলগ্ন গ্রাম রায়নগর। গ্রামের নস্করদের পারিবারিক দেবালয়টি বহুদিনের। এখানে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে বিবিমা ও রক্তা খাঁ গাজীর পূজা-হাজোত চলে আসছে বহুদিন। রক্ত-আমাশয় রোগ নিরাময়ের জন্য অনেকে মানত করেন এবং আরোগ্য লাভের পর গাজীর থানে হাজোত দেন। এই গ্রামের নবতিপর ব্যক্তি কালুরুদ্দি মোল্লা মনে করেন, এই আমাশা রোগ নিরাময়কারী সুফী সাধকের প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে গেছে অন্যান্য পীর-দরবেশগণের মতো। রক্তা খাঁ নামের আড়ালে ঢাকা পড়েছে কোনও মহাত্মার আসল পরিচয়। নিত্য পূজা হয় এই থানে। বার্ষিক জাঁতাল পূজায় উৎসব পালিত হয়। দক্ষিণ বারাসতের কয়েক মাইল দক্ষিণে জয়নগর জনপদের একটি পল্লীর নাম রক্তা খাঁ পাড়া। সোনারপুরের কামাল গাজীর থানের কাছে রক্তান খাঁর আস্তানা আছে।

তাজপুরের বামন গাজী

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অধীন তাজপুর গ্রামের বামন গাজীর খ্যাতি এখন আর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কলকাতা সহ আশপাশের কয়েকটি জেলা থেকে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার বহু ভক্তজন রোগ নিরাময়ের আশায় ভিড় করেন বামন গাজীর থানে। সাধারণ গোয়াল ঘরে গাজী সাহেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গাজী সাহেবের মূর্তি একজন সুশ্রী মুসলমান বীর যোদ্ধার মতো। মুসলমানী চোগাচাপকান-পিরান-পাজামা পরা যোদ্ধার বেশ। মাথায় টুপি অথবা পাগড়ি, মুখে দাড়ি, পায়ে বুট জুতো পরা ঘোড়ায় চড়া মূর্তি, যা সচরাচর খুব চোখে পড়ে। শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে গিয়ে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে নেমে সাইকেল ভ্যান চাপলেই দয়ারামপুরের মধ্য দিয়ে বামনগাজীর থানে যাওয়া যায়।

মন্দিরবাজার থানার অধীন এই ভাজপুর গ্রাম আগে ছিল জঙ্গল মহলের মধ্যে। গ্রামের মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার জটিল কর্ণমূল রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে নিরুপায় অবস্থায় পাশের দয়ারামপুর গ্রামের তাঁর একজন মুসলমান কবিরাজ বন্ধুর শরণাপন্ন হন। এই কবিরাজ বন্ধু ছিলেন একজন হেকিমি চিকিৎসক। ইনি ছিলেন কোনও এক গাজীসাহেবের দরগার হেকিম। তিনি গাজী সাহেবের দোয়া প্রার্থনা করে সরষের তেল-পড়া দিলেন তাঁর কবিরাজ বন্ধু মতিলাল বাবুকে। সুস্থ হয়ে ওঠেন মতিলাল বাবু। সেই থেকে তিনি তিনি গাজী সাহেবের অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। মৃত্যুর আগে হেকিম বন্ধু গাজী সাহেবের 'নাম মন্ত্র' দিয়ে যান বন্ধু মতিলালবাবুকে। তারপর মতিলালবাবু নিজগৃহে প্রতিষ্ঠা করেন গাজী সাহেবের মূর্তি। শুরু হয় পূজা হাজোত। গাজী সাহেবের নামে সরষের পড়া দিয়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতে থাকেন তিনি। পুরুষানুক্রমে সেই প্রথা চলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গাজীসাহেব এবং তাঁর সেবক সেই ভক্ত-কবিরাজের নাম পরিচয় এখনও মেলেনি।

নালুয়া গ্রামের তাতাল গাজী

মণিনদীর অববাহিকার পুরনো গ্রাম নালুয়া। নালুয়া গাঙের নামেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে নালুয়া গ্রাম। নালুয়া গ্রামের তাতাল গাজীর খ্যাতি ছড়িয়ে আছে সুন্দরবন অঞ্চলে। অন্যান্য ইসলাম প্রচারকদের মতো তাতাল গাজীর প্রকৃত পরিচয় অজানা থেকে গেছে। অনুমান করা যায়, ইনি পীর গোরাচাঁদের সঙ্গী বাইশ আউলিয়াদের মধ্যে একজন। ইসলাম প্রচারে ইনি একসময় নালুয়াগাঙের তীরে তাঁর আস্তানা পাতেন। এঁর সাধনঐশ্বর্যে সাধারণ মানুষ অভিভূত হয়ে তাঁর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন। তাতালগাজী বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। কোনও অনুসন্ধানের প্রমাণ মেলেনি। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত একটা ছড়া ছোটবেলায় শুনতাম দাদামহাশয় রেণুপদ মণ্ডল মহাশয়ের মুখে :
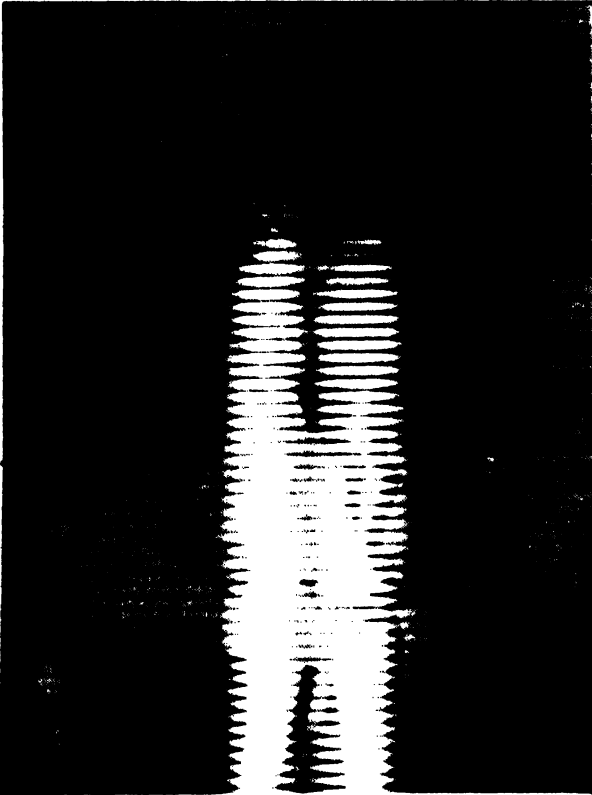
সত্যনারায়ণ বলে, আমি শিন্নি নাহি খাব,
তাতালগাজী বলে, আমি মুখে গুঁজে দেব।

পূর্বরেলের শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে মথুরাপুর রোড স্টেশনে নেমে আটেশ্বরতলা যাবার কোনও সাইকেল ভ্যানে চাপলেই পীর তলায় পৌঁছন যায়। নালুয়া গ্রামের এই আস্তানায় প্রতিষ্ঠিত গাজীর থান সম্ভবত তাঁর মাজারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বারে বারে স্থানটির পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি ১৪০২ বঙ্গাব্দে পাশের পাটুনিঘাটা গ্রামের ডা. অর্জুন মণ্ডল মহাশয় তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের সহায়তায় ইটের দেওয়াল ও করগেটের ছাউনি দিয়ে গাজী বাবার মাজারটি পুনরায় নির্মাণ করেন। গোসম্পদ রক্ষার জন্য কৃষিজীবী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সারা বছর গাজীর থানে পড়ে আছে। আগের দিনে গরু হারিয়ে গেলে সবাই গাজীর থানে জানান দিয়ে সুফল পেতেন বলে সুভাষ প্রামাণিকের কাছে শুনেছি।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের কাছে গোধন রক্ষা একটা বড় সমস্যা চিরদিনের। কেঁট বা আঁটুলি হল গরুর রক্তশোষণকারী এক ধরনের চর্মকীট। এর হাত থেকে গরু-বাছুরকে রক্ষা করতে কৃষি-গৃহস্থেরা তাতাল গাজীর কাছে মানত করে। গরু সুস্থ হয়ে উঠলে বাতাসা, সন্দেশ, ফল-মূল-মিষ্টি মিঠাইয়ের সঙ্গে এক গোছা নতুন ঝাঁটা নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করে। প্রতিবছর পয়লা মাঘ বার্ষিক তাতাল পূজা-হাজোত হয় সাড়ম্বরে। আগে খাড়ি গ্রামের এক ঘর মুসলমান খাদেম পূজা-হাজোতের অধিকারী ছিলেন। এখন ভক্ত ও ব্রতীগণ নিজেরাই পূজা-হাজোত নিবেদন করেন। পাটুনিঘাটা ও নালুয়া গ্রামের ভক্তজন এখন গভীর নিষ্ঠাসহকারে বাবা তাতাল গাজীর সেবা করে চলেছেন।

নালুয়া গ্রামের তাতাল গাজী *ছবি : কৃষ্ণকালী মণ্ডল*

গৃহপালিত পশুরক্ষক মানিক পীর

মানিকপীর গোরক্ষক দেবতারূপে চাষী হিন্দুগৃহস্থ পরিবারে পূজ্য। এঁর ব্যক্তিপরিচয় অন্যান্য পীর-গাজী-বিবিদের মতো রহস্যাবৃত। ভক্তজনের বিশ্বাস, ইনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও হেকিমী চিকিৎসক ও সাধক। গৃহপালিত পশুপক্ষীর রোগ নিরাময়কারী ছিলেন বলে একসময় শ্রদ্ধাভক্তির প্রাবল্যে লৌকিক দেবতায় উন্নীত হয়েছেন। সেবা পূজার ব্যাপকতায় মানিকপীর লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে একই থানে বা দেবালয়ে পূজা পান। মধ্যযুগের পল্লীকবিগণ বহু পালাগান রচনা করেছেন এঁকে নিয়ে। মানিকপীরের সেবক ফকিরদের গানে জানা যায়, স্বয়ং খোদাতালা কলিযুগে দুনিয়াতে তাঁর প্রেরিত দূতরূপে মানিকপীরকে অবতার হিসাবে পাঠান।

পয়লা বৈশাখ প্রতি চাষী গৃহস্থ পরিবারে মানিক পীরের বিশেষ পূজা উৎসব পালিত হয়। গরু-বাছুরদের গায়ে কাঁচা হলুদ ও শিঙ-এ সরষের তেল মাখিয়ে পুকুরে স্নান করানো হয়। ইতিমধ্যে গোয়াল ঘরের গোবর-চোনা পরিষ্কার করে মানিকপীরের ক্ষীর নিবেদনের আয়োজন করা হয়। আমরা বাল্যকালে দেখেছি মুসলমান ফকিরেরা গৃহস্থের গোয়াল ঘরে সমাদৃত হয়ে মানিক পীরের মাহাত্ম্যমূলক গোইলে

বড়খাঁ গাজী

ছবি : জয়ন্ত হালদার

কঙ্কণদিঘির বাজারে পঞ্চানন্দ

গান অর্থাৎ মানিকপীরের পাঁচালি পরিবেশন করতেন। গোয়াল ঘরে তিউড়ি তৈরি করে নতুন মালসায় আতপচালের সঙ্গে দুধ, চিনি ও কিশমিস দিয়ে মানিকপীরের ভোগ নিবেদনের ক্ষীর ভাত রান্না করা হত। এরপর ক্ষীরের মালসা পীরের উদ্দেশে গোয়ালঘরে নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে ফকির সাহেব চামর দুলিয়ে গোইলে গান শুরু করতেন। এই প্রথা এখনও চলছে।

মথুরাপুরের বরখান গাজী

প্রাচীন হাতিয়াগড় পরগনার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মথুরাপুর। মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যেও কেচ্ছাকাহিনীতে 'হাত্যেগড়' অর্থাৎ হাতিয়াগড় পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মথুরাপুরের বরখান গাজীর জীবনকাহিনী প্রায় সবটাই অজ্ঞাত। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে আবাদি মাঠের মাঝে নির্জন স্থানে গাজী সাহেবের আস্তানা ঘিরে আছে কাঁটাগাছের ঝোপঝাড়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় ভক্তজন গাজী সাহেবের দরগাহে পূজা-হাজোত দেন। অনেক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানকামনায় গাজীর দরগাহে মানত করেন। গৃহস্থেরা গরু-বাছুর, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তুর জন্য মানত করেন। গাজী সাহেবের পুকুরের জল এনে খাইয়ে দেন। এতে অনেকেরই উপকার হয়। গ্রামের করমান মোল্লা গাজী সাহেবের দরগাহের খাদেম-সেবায়েত। এঁরা পুরুষানুক্রমে গাজীর দরগাহের সেবাকাজে নিযুক্ত আছেন।

মথুরাপুর গ্রামের দুকিলোমিটার পশ্চিমে নয়াবাদ ও তাজপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থলে আরও একটি বরখান গাজীর দরগাহ আছে। পাশাপাশি এই দুটি স্থানের মধ্যে ঠিক কোনটি গাজী সাহেবের মাজার, তা এখনও অজানা থেকে গেছে। তবে ক্ষেত্র হিসাবে মথুরাপুরের দরগাহটি অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্গম স্থানে অবস্থিত। এখানেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয়েছিল বলে মনে হয়। নয়াবাদের থানটি তাঁর খানক বা আস্তানা হতে পারে।

পাশাপাশি একই নামের এই দুটি ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি লোকমুখে গাজীসাহেব 'বরখান' ও 'বরপন' নামে পরিচিত। উচ্চারণের মধ্যে অস্পষ্টতা আছে বুঝে প্রশ্ন করেছি জনে জনে। অনেকেই দুবার দুরকম উচ্চারণ করেছেন। আসলে ইনি একজন ক্ষমতাশালী ইসলাম প্রচারক ও পরিব্রাজক। মধ্যযুগে ধর্মবিজেতাদের ব্যাপক অর্থে 'বড় খাঁ' নামে চিহ্নিত করা হতো। বড় খাঁ কোনও একজন ব্যক্তির নাম নয়। 'বড় খাঁ' শব্দটি লোকমুখে 'বরখান' ও 'বরপন' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

মাদারপাড়ার সুফী নূরমহাম্মদ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় লোকপূজ্য বিবি গাজী-পীরপীরানীদের মাহাত্ম্যপূর্ণ জীবনকাহিনী পর্যালোচনায় দেখা গেছে এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন বহিরাগত ইসলাম প্রচারক। নিজেদের সাধন ঐশ্বর্যে ও মানবকল্যাণের মহত্ত্বে সবাই লোকসমাজে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকায়ত মানুষের সেবা-পূজা-হাজোতের অধিকারী হয়েছেন। আলোচ্য সুফী নূরমহাম্মদ কিন্তু এঁদের সবার থেকে আলাদা। ইনি এ যুগের একজন মহাত্মা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভূমিসন্তান। ব্যক্তিগত জীবনে এই সুফী সাধক কোনদিন নিজেকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে জাহির করেননি। নিজের জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে এক উজ্জ্বল জীবনধারা গঠন করে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা অর্জন করেছেন। মহান আল্লাহর এবাদতে ব্রতী এঁর আচরণ সমাজজীবনকে প্রকৃত সত্যের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। সুন্দরবনসহ দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, কোচবিহার, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার ও প্রতিবেশী বিহার-ওড়িশা রাজ্যের মানুষও এই আবেদ ব্যক্তির সান্নিধ্য ও সেবায় উপকৃত হয়ে জীবনধন্য করেছেন।

মথুরাপুর থানার অন্তর্গত ৯ নং শঙ্করপুর অঞ্চলের মাদারপাড়া গ্রামে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে মরহুম আলহাজ্ব সুফী নূরমহাম্মদ (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের কাছে ইনি শ্রদ্ধেয় 'ফকির সাহেব' নামে

সমধিক পরিচিত ছিলেন। ফকির সাহেবের শিক্ষা জীবন নিতান্তই স্বল্প হলেও পিতা সুফী খেরাজমোল্লা ও মাতা মবিরোন বিবির জীবনাদর্শ তাঁকে মহৎ হতে সাহায্য করেছে। মাত্র পনের বছর বয়সে ইসলামের নির্দেশসমূহ অনুযায়ী জীবনযাত্রা শুরু করেন। বাড়িতে বসে তিনি সেখ সাদীর রচিত 'গুলিস্তা', ও 'বোস্তা' দুই গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করেন। তারপর শুরু হয় পরিব্রাজকের জীবন। স্থানীয় পীরগাজীদের খানকা-দরগাহে যাতায়াত করতে থাকেন। একসময় দিল্লি-আজমীরের পথে পাড়ি জমান। বহু আলী-আলমের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপাসনার নতুন প্রেরণালাভ করেন। দীর্ঘ বারো বছর পর তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছিল মেহেরনেগা বিবির সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ বছর।

ফকির সাহেবের জীবন ছিল অতি অনাড়ম্বর। সাদা থান কাপড়ের লুঙ্গি ও থান কাপড়ের জামা পরিহিত অবস্থায় খানকার হুজরা গৃহে খোদার অনুধ্যানে সবসময় নিমগ্ন থাকতেন। সৎ, সজ্জন ও শুদ্ধাচারী মহামানবের সব লক্ষণ তাঁর জীবনচর্যায় প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। ১৩৬৪ এবং ১৩৬৯ দুবার হজযাত্রা করেন। তাঁর দীর্ঘ জীবন পরিক্রমার মাঝে মানুষের সেবায় কেটে গেছে বেশিরভাগ সময়। নিজের সাধনঐশ্বর্য মানুষের সেবায় দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ রোগব্যাধি থেকে মুক্তির আশা নিয়ে ভিড় করত তাঁর হুজরা গৃহের সম্মুখে। খানকার মেঝে ভরপুর হয়ে উঠত পানির বোতল ও তেলের শিশিতে। রোগ নিরাময়ের জন্য তিনি তেলপড়া ও জলপড়া দিতেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর দরবারের জল পড়ায় আরোগ্য লাভ করেছেন। অনেকে মন্দ উপসর্গ থেকে রক্ষা পেয়েছে তাঁর দরবারে এসে খোদার রহমতে। ব্যক্তিগতভাবে আমার শ্বশুর মহাশয়ের কাছে ফকির সাহেবের কেরামতির বহু বৃত্তান্ত শুনেছি। ১৩৯৭ সালের ২৯ আষাঢ় লক্ষ লক্ষ মানুষকে শোকসাগরে ভাসিয়ে করুণাময় আল্লাহর শান্তির আশ্রয় লাভ করেন তিনি। চিরদিনের অভ্যাসমতো শেষরাতে তাহাজ্জোদের নামাজ আদায় করার পর ফজরের নামাজ সম্পন্ন করেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হতে থাকে। প্রিয়তম পুত্র সুফী গোলাম রহমান ও পোতা মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব বুকে ও পিঠে হাত দিয়ে ধরে থাকেন নামাজের জানুপাতা অবস্থায়। এরই মধ্যে তাঁর অমর আত্মার বিদায় ঘটল। অবসান হল এক মহাজীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।

অন্ত-কথন :

লোকসমাজে লৌকিক দেবদেবী-বিবিগাজী-পীরপীরানীদের প্রভাব অনুভবে ধরা যায়। লিখে শেষ করার নয়। লোকধর্মের পরতে পরতে সাজানো আছে এঁদের মাহাত্ম্য কথা। আলোচনার অসম্পূর্ণতার কথা মেনে নিয়ে জানাই সাধারণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গেও জড়িয়ে আছেন লৌকিক দেবতাকুল। শুধু মাত্র ধর্মাচরণ ও আনন্দবিনোদন নয়, বহু মানুষের পেটের খিদে মেটায় এঁরা। জেলার মৃৎশিল্পীরা মূর্তি গড়ে, পটশিল্পীরা পট এঁকে, গায়েনগণ পালা-পাঁচালি পরিবেশন করে জীবনের ব্যবহারিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছেন পুরুষানুক্রমে। বিভিন্ন স্তরের লোকশিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের সুখ ও দুঃখের বারোমাস্যা জানার অবকাশ পেয়েছি। তথাপি গভীর বেদনার সঙ্গে জানাই, এইসব লোকশিল্পীরা এখন আর সুখে নেই। জীবনের চাহিদার টানে তাঁরা অনেকেই আজ শহরমুখী হচ্ছেন। লোকসংস্কৃতি চর্চার এই বিপর্যয় কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় সে বিষয়ে ভাবা বড়ই প্রয়োজন। একটা অদ্ভুত উপেক্ষা লক্ষ্য করা যায় গ্রাম-সমাজ থেকে উঠে আসা শিক্ষিত ও চাকরিজীবী এক শ্রেণীর লোকসমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে। লোকসংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত ও পালিত হয়েও মূল্যবোধের জায়গাটাও এঁরা ভুলে যেতে চান। তৃতীয় বিশ্বের ভোগবাদ এঁদের দ্রুত গিলে ফেলেছে। এঁদের দলে শুধু সাধারণ চাকরিজীবীরা নন, শিক্ষক, অধ্যাপক, সমাজসেবী ও তথাকথিত সংস্কৃতিপ্রেমীদের দেখা মেলে। আশার কথা, বিভিন্ন গ্রাম সমীক্ষায় অতি সম্প্রতি দেখছি একেবারে আধুনিক প্রজন্মের মানুষেরা কেন জানিনা, লৌকিক দেবদেবী-বিবিগাজী-পীরপীরানীদের বার্ষিক পূজা-হাজোত উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে আত্মনিয়োগ করছেন। গ্রামীণ সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা রাখছেন মেলা প্রাঙ্গণে। এইসব সাহসী ও আন্তরিক লোকসংস্কৃতি চর্চাকে সাধুবাদ জানাই।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

১. নীহাররঞ্জন [illegible] ইতিহাস, আদিপর্ব।

২. কালিদাস দত্ত [illegible] পরগনার অতীত, প্রথম খণ্ড।

৩. কৃষ্ণরাম দাস [illegible] নারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় [illegible]

৪. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ [illegible] লৌকিক দেবতা।

৫. সুকুমার সেন [illegible] সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

৬. ড. গিরীন্দ্রনাথ [illegible] পীর সাহিত্যের কথা।

৭. শ্রীবৃন্দাবন [illegible] শ্রী চৈতন্যভাগবত।

৮. নরোত্তম হা[illegible] আলোচনা ও পর্যালোচনা।

৯. বিমলেন্দু হালদার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ।

১০. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, রাঢ়ের গ্রামদেবতা।

১১. কৃষ্ণকালী মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়।

১২. ধূর্জটি নস্কর সম্পাদিত, চতুর্থ দুনিয়া, আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি সংখ্যা, মার্চ, ১৯৯৯, কলকাতা।

১৩. ডঃ অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

লেখক পরিচিতি—লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব গবেষক। কয়েকখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

স্বপন মুখার্জি

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুতুলনাচ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গিয়ে আগেই বলে রাখি যে, আমি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে কাজ করার সুবাদে এই বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ এবং পণ্ডিত মানুষজনের আলোচনা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি সেই অভিজ্ঞতার কথাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি।

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের মতে পুতুলনাচের উৎপত্তি মিশর দেশে। গ্রিসেও প্রাচীনকালে পুতুলনাচ ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়াতে পুতুলনাচ, শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এবং ইন্দোনেশিয়াতে রামায়ণের 'ছায়া পুতুলনাচ' আছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে বলেই এই পুতুলনাচকে ঐতিহ্যবাহী বলে।

ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ রাজ্যেই পুতুলনাচের প্রচলন ছিল। তবে বিভিন্ন কারণে এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বেশির ভাগ গ্রামেই তা বিলুপ্ত হয়েছে। আমি প্রত্যক্ষভাবে ৭টি রাজ্যের পুতুলনাচের কথা বলতে পারি। এই ৭টি রাজ্যের শিল্পীরা ২৫-১-৯৭ থেকে ৩০-১-৯৭ পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবারে অনুষ্ঠিত পুতুলনাচের কর্মশালা এবং উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছে।

কেরলের কথাই প্রথম বলছি। কেরলে বর্তমানে 'ছায়া-পুতুলনাচই' বেশি। কিছু তারের পুতুলের দলও আছে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ডাং ও অন্যগুলো শেষ হয়ে গেছে। এখানকার পুতুলনাচের ঘরানা ২০০ বছরের পুরনো। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বর্তমান অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে।

প্রায় ১৫০ বছর আগে খাগড়াকোনা গ্রামে পুতুলনাচের প্রচলন শুরু হয়। এই ব্যাপারে ওই গ্রামে তিনজনের অবদান ছিল। এঁরা হলেন—কৈলাস হালদার, হরিপদ হালদার এবং বাগাম্বর হালদার। এঁরা সম্পর্কে খুড়তুতো-জ্যাঠাতুতো ভাই। যুবক বয়সে এঁরা তিনজনে একসঙ্গে তাঁদের পাশের গ্রামের মেলায় পুতুলনাচ দেখে মুগ্ধ হন। কৈলাসবাবু মিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি অবশ্য দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে শিমুল গাছের কাঠ দিয়ে প্রথম পুতুল তৈরি করেন। এবং বিভিন্ন গাছের পাতার রস দিয়ে রং করেন। পরে চৈতন্যপুরে পুতুল দলের লোকেদের কাছে যজ্ঞডুমুর গাছের কথা শুনে ওই গাছের কাঠ দিয়ে পুতুল তৈরি করতে থাকেন।

ত্রিপুরার পুতুলনাচ বিগত ১৫০ বছর ধরে চলে আসছে। এখানে 'তার' ও 'বেনী' এই দুই ধরনের পুতুল দেখা যায়। ত্রিপুরাতে বিভিন্ন মেলায় পুতুলনাচ হোত। ১৯৭১ সালের পর মেলা অনেক কমে যাওয়ায় পুতুলনাচের সংখ্যাও কমে গেছে।

ওড়িশার পুতুলনাচ ২০০ বছরের পুরনো হলেও বর্তমানে পুতুলনাচের পরম্পরা খুব খারাপ। মাত্র একটি বড় পুতুলের দল আছে। মেলায় অনুষ্ঠান হয়। কভারি নামক গাছের কাঠ দিয়ে এখানে পুতুল তৈরি হয়, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অন্য দল শেষ হয়ে গেছে।

কর্নাটকে বর্তমানে লেদার পাপেটের মোট ১৪৫টি এবং তারের পুতুলের ৩২টি দল আছে। অন্যান্য রকমের পুতুলনাচের দল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আগে এই সব দল বিভিন্ন মেলা এবং হাটে টিকিট বিক্রি করে অনুষ্ঠান করতো। তখন কর্নাটকে গ্লোব পাপেটেরও পরম্পরা ছিল। তখন এরা দুহাতে ৫টি করে ১০ আঙুলে ১০টি পুতুল নিয়ে খেলা দেখাতো। এখানকার বর্তমান তারের পুতুলের বৈশিষ্ট্য হল শিল্পীদের মাথা থেকে ৩টি তার পুতুলের মাথার সঙ্গে এবং পুতুলের ২টি হাত শিল্পীর দুটি হাতে তার দিয়ে বাঁধা থাকে। অর্থাৎ শিল্পীর মাথা ও হাত নড়াচড়ার মধ্য দিয়েই পুতুল অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানের সময় শিল্পীরা হাঁটু ও পা ব্যবহার করেন।

মহারাষ্ট্রে পিঙ্গুলী গ্রামে প্রায় সব ধরনের পুতুলনাচই হয়। এখানকার পুতুল খুবই ছোট ছোট। ওই গ্রামের ১৫০টি ঠাকুর পরিবার এই সব অনুষ্ঠান করান। ১৯৭৮ সালে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ওই গ্রামে পুতুলের প্রদর্শনী করেন। বর্তমানে দলের সংখ্যা কমে গেছে। ডাং পুতুল নেই। তার ও গ্লোব পুতুলের কিছু দল আছে। এখানে

নন্-ট্রাডিশনাল পুতুলনাচের দল বেশি। এখানে আমন্ত্রণমূলক অনুষ্ঠান হয়।

তামিলনাড়ুতে নয় দশক থেকে ছায়া পুতুলনাচের প্রচলন ছিল। ছায়াপুতুল তামিলনাড়ুর দক্ষিণ দিকে এবং তারের পুতুল পূর্ব ও পশ্চিমদিকে আছে। এরা একটি স্থানে কমপক্ষে ১৫ দিন অনুষ্ঠান করত। দলের শিল্পীরা মাসিক কমপক্ষে ১০০০ টাকা করে বেতন পান এবং অনুষ্ঠানের সময় রাহা খরচ পেয়ে থাকেন। এখানে দু-একটি দল আছে যারা বছরে ২০০টির মতো অনুষ্ঠান করে। এরা আমন্ত্রামূলক অনুষ্ঠান করে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য জমকালো আলো বা চলচিত্র সংগীত ব্যবহার করে না। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। তবে বর্তমানে দলের সংখ্যা খুবই কম। বড় পাপেট ৩টি, বেনীপুতুল ৫-৬টি এবং তারের পুতুলনাচের দল ৬-৭টি। সজনে কাঠ দিয়ে পুতুল তৈরি করে। গঠন-প্রণালী খুবই সুন্দর।

এবার আসছি পশ্চিমবঙ্গের কথায়। এখানে প্রচলিত তিন ধরনের পুতুলনাচ দেখা যায়—ডাং, বেনী ও তারের পুতুল, দঃ ২৪ পরগনায় ডাং বা লাঠি পুতুল, নদীয়া জেলায় তারের এবং মেদিনীপুর জেলায় বেনীপুতুল। সুরেশ দত্ত (C.P.T) একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন নদীমাতৃক দেশ বলে অতীতে এখানে জলপুতুলও ছিল বলে মনে হয়। তাঁর মতে বেনীপুতুলই আমাদের দেশের প্রাচীনতম পুতুল। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা উচিত বলে আমারও মনে হয়। সেটি হল ১৯৯৭ সালে ডায়মন্ডহারবারে অনুষ্ঠিত পুতুলনাচের উৎসব এবং কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য যে সব রাজ্য থেকে পুতুলনাচের দল এসেছিল তারা কেউই এই রাজ্যের মতো সরকারি সাহায্য বা উৎসাহ অন্য কোনও রাজ্যে পাননি বলে উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বিপরীত। কারণ, এখানে বর্তমানে সরকারি সাহায্য এবং উৎসাহে অনেক মৃত দলও আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র পুতুলনাচ দলগুলির ক্ষেত্রেই নয়, লোকসংস্কৃতির সমস্ত ধারাতেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে একটা জোয়ার এসেছে বলা যায়। ডাংপুতুল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিজস্ব সৃষ্টি, কিন্তু অনেক আগে থেকেই কিছু তারের পুতুলের দলও এই জেলায় ছিল। মাঝখানে কিছু সময় তাদের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলেও আবার কুলতলি, মণিরতট অঞ্চলের তারের পুতুলের দলগুলিও নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু করেছে। আরো আশার কথা চৈতন্যপুর, মায়া-হাউড়ি, দস্তিপুর ইত্যাদি অঞ্চলের বেশ কিছু শিক্ষিত যুবক ডাং পুতুলনাচ [illegible] নতুন উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা [illegible] ডাং [illegible]নাচের প্রচলন শুরু হয় ২০০ বছরেও আগে। এই [illegible] নাচ দঃ ২৪-পরগনা জেলার নিজস্ব সৃষ্টি। প্রাচীন[illegible] মানুষের চিত্ত বিনোদনের প্রধান অঙ্গ ছিল পুতুলনা[illegible] (প্রাচীনকালে) গ্রামের জমিদারেরা এই সব পুতুল[illegible] পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ডঃ সনৎকুমার মিত্রের কথায় [illegible] পুতলনাচ যেমন অমিত শক্তিধর, তেমনি এর নির্মা[illegible]শলও যেকোনও শিল্প-রসিকের কৌতূহল আকর্ষণ [illegible] এই রকম মানুষ-সমান কাঠের তৈরি পুতুল নাচি[illegible] অভিনয় পৃথিবীর অন্য কোথাও হয় না। হালকা অ[illegible]ন্তে, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর) যে কাঠ হাতের কাছে পাও[illegible] পুতুল তৈরি হয়। মূল পুতুলগুলি দুই থেকে আড়াই [illegible]লের মাথা ও হাত দুটি মূল পুতুলের দেহের সঙ্গে অ[illegible]না থাকে। মাথাটি কাঠের একটি গজালের সঙ্গে এমন[illegible] যাতে সেটি গর্দানের ভেতরের একটি গর্তের মধ্য দিয়ে ঢুকে পিঠের দিকের ফাঁকা অংশে বেরিয়ে আসতে পারে। হাত দুটি কাঁধের কাছে জোড়া অংশে বাঁধা। দড়ি নিচের দিকে ঝুলে থাকে যাতে সেটি ধরে টানলে হাত ওঠানামা করতে পারে। আর কাঠের গজালটি ধরে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরালে মাথাটিও নড়তে থাকে। যিনি পুতুল নাচান তিনি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোট একটা ২ ইঞ্চি মাপের বাঁশের চোঙ (Socket) কোমরে বেঁধে নেন। এই চোঙের মধ্যে ডাং বা লাঠি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, যার অপর দিকটি পুতুলের পেটের নিচে, তৈরি করে রাখা একটি গর্তের মধ্যে আটকানো থাকে। এইবার বাঁশের লাঠির মাথায় আটকানো পুতুলটিকে নাচিয়েরা ওপরদিকে তুলে ধরে নাচিয়ে থাকেন। একটু স্থূল শিল্পকলায় পুতুলগুলি তৈরি হলেও টানাটানা চোখ, টিকালো নাক এবং পৌরাণিক চরিত্রানুযায়ী রঙ ব্যবহার করা মুখমণ্ডলটি বেশ সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পুতুলগুলির পোশাক যাত্রাদলের মতো।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডাং পুতুল — ছবি : লেখক

সেই সময় কেবলমাত্র পৌরাণিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক পালাই পুতুলনাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতো। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটছে। শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলি একে অপরকে টেক্কা দেবার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। গণমাধ্যমের অনুষ্ঠানকে সাময়িক আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অশালীন ও অশ্লীল অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। বর্তমানে সর্বত্র একটা মিশ্র সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। এই সমস্ত নানা কারণে আগে পুতুলনাচের যে ব্যাপকতা ছিল মাঝে কিছু সময় তা কমে গিয়েছিল। সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে গ্রামীণ এই লোকসংস্কৃতির ধারাটি
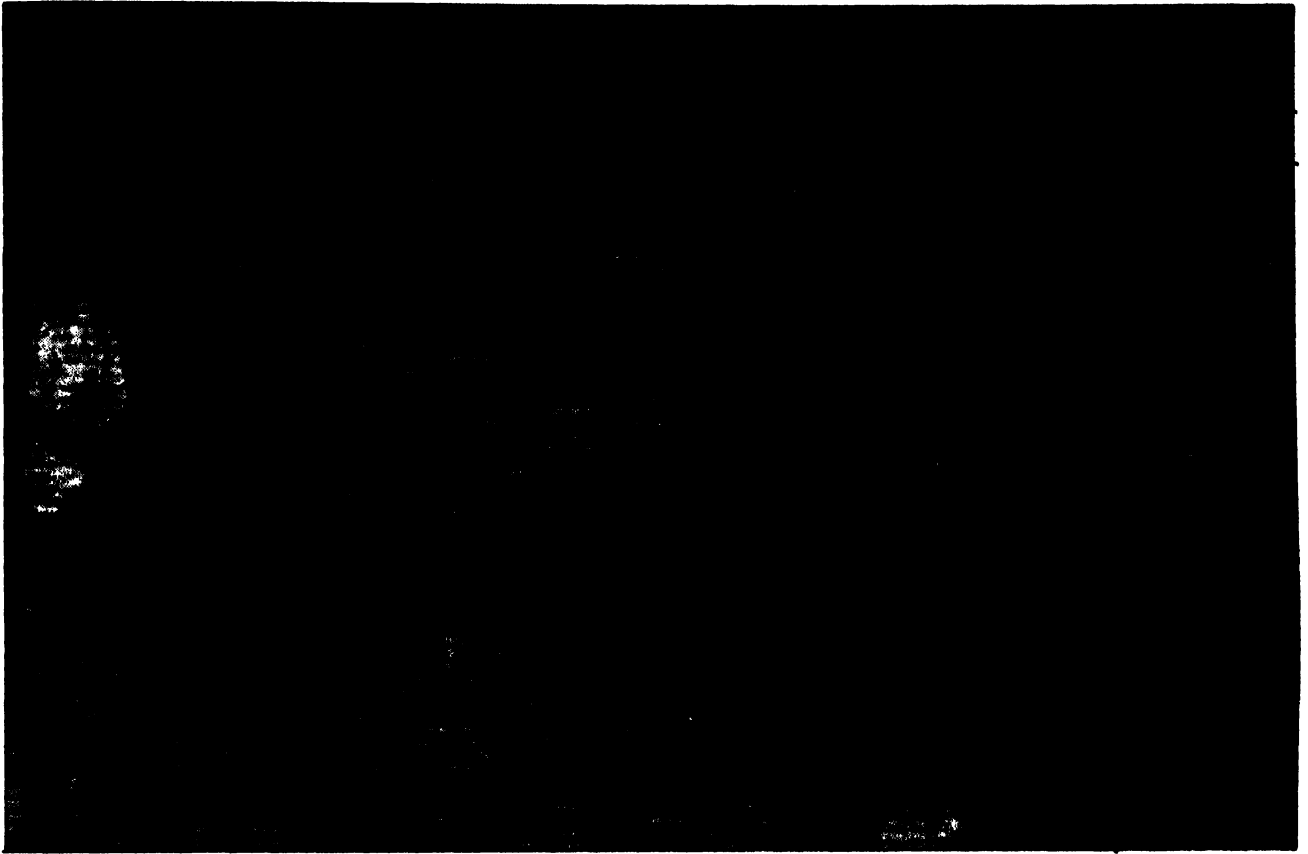
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুতুল নাচ — *ছবি : অমৃতলাল পাড়ুই*

দঃ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার খাগড়াকোনা দক্তিপুরে মায়া হাউড়ি, চৈতন্যপুর, রসপুঞ্জি কুলতলি এবং আরো কিছু কিছু অঞ্চলে টিকে আছে। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকে লোকসংস্কৃতির উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। লোকসংস্কৃতি উন্নয়নে তৈরি হয়েছে লোকসংস্কৃতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতির প্রতিটি ধারার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মশালা, লোকসংস্কৃতি উৎসব এবং লোকসংস্কৃতির প্রসার অনুষ্ঠান। গ্রামেগঞ্জে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এমন কি শহর অঞ্চলেও পুতুলনাচ ইত্যাদি লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রামীণ শিল্পীরা শিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পুতুলনাচ বিশেষজ্ঞ হীরেন ভট্টাচার্য একটা অনুষ্ঠানে বলেছেন, শীতের সময় ওনার কাছে যা আমন্ত্রণ আসে তার ৫০ শতাংশ উনি করতে পারেন না সময়ের অভাবে ও শারীরিক কারণে। মালিনী ভট্টাচার্য প্রায়ই বলে থাকেন "আমরা মাটি তৈরি করে দিচ্ছি, গাছ লাগানোর দায়িত্ব আপনাদের।" অর্থাৎ শুধুমাত্র সরকারের উপর নির্ভর করলে চলবে না, সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে।

একটা বিষয় পুতুলনাচের সব শিল্পীদের ভাবা উচিত হীরেন ভট্টাচার্য বা সুরেশ দত্ত যদি সারা বছর অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পান, তাহলে অন্য দলগুলিই বা পাবে না কেন? তাহলে ওনারা যেভাবে করেন সেইভাবে অন্য দলগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। একটা কথা এই ব্যাপারে উল্লেখ করছি—নদীয়া জেলার ডাং পুতুলনাচের কর্মশালায় সত্যনারায়ণ অপেরা পুতুল নাচ দলের নিরাপদ মণ্ডল অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারিখটা আমার মনে নেই। নিরাপদর বয়স তখন বছর ২০ হবে। পরবর্তীকালে সরকারি উদ্যোগে নিরাপদ আরো ট্রেনিং নিয়েছে এবং সুরেশবাবুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে নিরাপদ একজন দক্ষ শিল্পী এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে সরকারি বৃত্তি পাচ্ছেন। তিনি তাঁর দল নিয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্রই অনুষ্ঠান করেছেন। খাগড়াকোনার জগদীশ হালদারও তাঁর ডাং পুতুলনাচ ভারতের রাষ্ট্রপতিকে দেখিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন। শ্রীহালদার লোকসংস্কৃতি পর্ষদের (তখন পর্ষদ ছিল) উদ্যোগে রাশিয়াতে অনুষ্ঠান করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। আর একজনের কথাও এখানে উল্লেখ করতে হবে। যদিও তিনি ডাং পুতুলের শিল্পী নন এবং মেদিনীপুরের লোক। রামপদ ঘড়ুই ছোট ছোট বেনীপুতুল নিয়ে এই জেলার গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন। সম্ভবত ১৯৮৮ সালে দঃ ২৪ পরগনা জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসব ডায়মন্ডহারবার গার্লস হাই স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় তিনি আমাদের কাছে এসে অনুষ্ঠান করার কথা বলেন। কিন্তু যেহেতু উনি দঃ ২৪ পরগনার শিল্পী নন, তাই অনুষ্ঠান করানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওনাকে শিল্পীর মর্যাদায় অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে অনুষ্ঠানশেষে মিলন উৎসবে ওনাকে গান গাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। উনি গেয়েছিলেন আমার আজও মনে আছে "আকাশে মেঘ জমেছে মাঠেতে হাল নেমেছে।" অপূর্ব অনুষ্ঠান! ওটাই রামপদবাবুর প্রথম সরকারি অনুষ্ঠান (অলিখিতভাবে)। পরবর্তীকালে উনি ভারতবর্ষের বাইরে বহু স্থানে

ওই পুতুল নিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন। এই অনুষ্ঠান করার সূত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজও করছেন।

কাজেই আমার মনে হয় পুতুলনাচের প্রযোজনা এবং প্রয়োগ যদি যথাযথ হয় তাহলে মানুষ নিশ্চয় গ্রহণ করবেন। মনে রাখতে হবে পুতুলের সীমাবদ্ধতার কথা। পুতুলনাচের নাটক রচনা করার সময় এই সীমাবদ্ধতার কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাহলেই মানুষ বিশ্বাস করবে। এর পরে ভাবতে হবে দৃশ্যপটের কথা। প্রাচীনকালে প্রায় সব নাটকেই রাজপ্রাসাদ, বন-জঙ্গল, শ্মশান-দৃশ্য এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পট থাকত। প্রাচীনকালে এই সমস্ত দৃশ্যপট তৈরি করতো দক্ষ চিত্র শিল্পীরা। বর্তমানে এই শিল্পিসংখ্যা কমে গেছে। তাছাড়া ভারি ভারি পুতুলের সঙ্গে এই সমস্ত দৃশ্যপট বর্তমানে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়ার খুবই অসুবিধা। আরো একটা বিষয় হল নাটকের প্রয়োজনে দৃশ্যের পরিবর্তন দরকার হতে পারে। দৃশ্যপট না থাকলে নাটক দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে না। কাজেই দৃশ্যপট প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এর পরে অভিনয় এবং সংলাপ। অভিনয়ের ব্যাপারে হীরেনবাবু বলেছিলেন "আমার অহঙ্কার ভেঙে গেছে, মোহভঙ্গ হয়েছে। অনুভব করছি এদের কাছে অনেক কিছু শিখতে হবে।" তবে সংলাপ বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ সংলাপ সঠিকভাবে বলতে না পারলে একই সংলাপের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

এর পর দৃষ্টি দিতে হবে নাটকের সঙ্গীত ও সুর-সংযোগের দিকে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা ও পছন্দের পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন ধরুন বাচ্চা ছেলেদের আগে যে ধরনের খেলনা দেওয়া হোত বর্তমানে কিন্তু সেইসব খেলনা চলে না। শ্রীমতি রত্না ভট্টাচার্য এই বিষয়ে বলেছেন সংগীত, নাটকের হাত ধরে এগিয়ে যাবে। সুর, সংলাপ ও ঘটনার সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটবে। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো সঙ্গীত, কখনো বাজনা (মিউজিক) নাটকের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। আবার শুধু সঙ্গীত হলেও চলবে না। নাটকের ধাঁচ অনুযায়ী সঙ্গীত সৃষ্টি করতে হবে। পুতুলের নড়াচড়ার বিষয়ে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের বক্তব্য—গ্রামের পুতুলনাচ দলের পুতুলগুলির শুধুমাত্র হাত, মাথা ও কব্জি নড়ে কাজেই ওই পুতুলগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই পুতুলগুলির ট্র্যাডিশন বজায় রেখে সামান্য পরিবর্তন করতে হবে [illegible] ভট্টাচার্য বা রত্না ভট্টাচার্য করেছেন)। তাহলে এই পুতু[illegible] ধরনের ভঙ্গি নাটকের মধ্যে দেখাতে পারবে। দর্শ[illegible] এবং সবচেয়ে বড়ো কথা এই পরিবর্তন খুব শক্ত [illegible] নয়। রত্না দেবীর মতে নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গী[illegible]কভাবে করতে পারলে একঘেয়েমি কেটে যাবে। [illegible] পুতুলের বর্তমান যা রূপ আছে ভেবেচিন্তে [illegible]রেনবাবু, রত্না দেবী, সুরেশবাবুদের কাছে পরাম[illegible]) [illegible] কিছু পরিবর্তন করতে পারলে নাচের সময় আরো [illegible]রিবর্তন করা যাবে এবং সেক্ষেত্রে সুরের প্রয়োজনে[illegible] ও আনা সম্ভব হবে। পৃথিবীর সব পুতুলের সী[illegible]টকে সংলাপ অনুযায়ী গান ও সুর তৈরি করতে হ[illegible] হবে আগে পুতুল পরে গান অর্থাৎ পুতুলের জন্যই [illegible]ত হবে। নাচের বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে মানুষ স[illegible]চতে পারলেও পুতুলের নাচের ও নাচার ভঙ্গিও সী[illegible]লের সীমাবদ্ধতার কথা
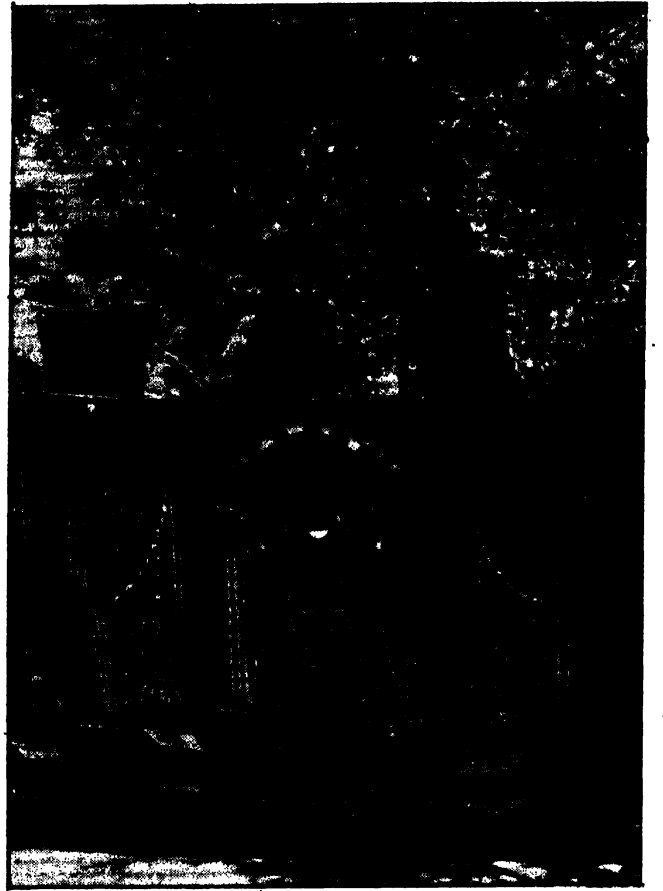
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুতুল নাচ — ছবি : লেখক

মনে রেখে সঙ্গীত, সুর এবং সংলাপ তৈরি করতে হবে। সুরের সঙ্গে নাচের সামঞ্জস্য না থাকলে দর্শকরা সঙ্গীত শুনবে, নাচ দেখবে না। পুতুলের নড়াচড়া দেখে মানুষের মনের বিস্ময়কে সুর ও সঙ্গীতের মাধ্যমে ধরে রেখে আরো বাড়াতে হবে। অভিনয়, সঙ্গীত, দৃশ্য ও নাচের সার্থক মিলন ঘটলে নাটক দর্শকদের মনে রেখাপাত করবেই।

পুতুলের গতি (মুভমেন্ট) সম্বন্ধে হীরেন ভট্টাচার্য একবার বলেছিলেন—মানুষ বিভিন্নভাবে কথা বলে, হাত পা নেড়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, পুতুল তা পারে না। পুতুলের প্রাণ হচ্ছে পুতুলের নড়াচড়া। "যে পুতুল নড়ে না তার আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী"—কথাটা বলেছিলেন স্বর্গীয় রঘুনাথ গোস্বামী খুব খারাপ দেখতে পুতুলও যদি ঠিকমতো নড়াচড়া করে, খুব সুন্দর দেখতে স্থির পুতুলকেও মৃত মনে হয়। কাজেই পুতুল আগে নাচবে, কারণ, পুতুলনাচে পুতুলই নায়ক। পুতুলের মুভমেন্ট চারটি স্থান থেকে হয় (১) হাত, (২) মাথা, (৩) চোখ এবং (৪) শরীর। কোন অঙ্গ কীভাবে নড়াচড়া করবে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সঠিকভাবে প্রকাশের জন্য পুতুলের মুভমেন্ট দরকার। সুর এবং মুভমেন্ট পাশাপাশি বিরাজের ফলে সংলাপও শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত হয়। যেমন 'যা' কথাটি একটি ভিখারিকে চলে যেতে বলা হতে পারে। আবার কোনও স্ত্রীলোকের কাছে প্রেম নিবেদনের সময় ভঙ্গির সাহায্যে অন্যরকমও হতে পারে। কাজেই ভঙ্গি অভিনয়ের একটা বিরাট অঙ্গ। ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়টা ঠিকভাবে করতে হবে। সংলাপ পড়ার ক্ষেত্রে গ্যাপ দিয়ে

এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে একমাত্র খেয়াই ভরসা

বলতে হবে। যিনি সংলাপ বলবেন এবং যিনি পড়বেন তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক হতে হবে। অর্থাৎ ভালো করে মহড়া দিতে হবে। পুতুলনাচে রংলা গানের (অশ্লীল গান) ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে অপসংস্কৃতি ও নগ্নতা ক্ষণস্থায়ী। জীবনের আনন্দের জন্য মদ খেতে খেতে জীবন একদিন শেষ হবেই। কিন্তু সংস্কৃতির কোনও শেষ নেই। শিক্ষার কোনও শেষ নেই। রংলা গানের সঙ্গে নাটকের কোনও সংযোগ না থাকলে অবশ্যই তা বাদ দিতে হবে। ঠিক সেই রকম নাটকের প্রয়োজন ছাড়া বাড়তি সংলাপ বা অসংগতিপূর্ণ সঙ্গীত নাটকের মাধুর্য নষ্ট করে, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার মনে রাখতে হবে আমাদের পুতুল এমন অনেক কিছু করতে পারে যা মানুষ পারে না (একচড়ে মাথা ঘুরিয়ে দিতে পুতুল পারে মানুষ পারে, না)। কাজেই পুতুল কী কী পারে, সেগুলো জেনে ব্যবহার করতে হবে।

তাই সর্বপ্রথম পুতুলকে জানতে হবে, চিনতে হবে, পুতুলকে সামনে রেখে নাটক রচনা করতে হবে। রাশিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত সারগাই ওরবাতজব পৃথিবীর এক বিখ্যাত নাট্যকারের লেখা নাটক দু-লাইন পড়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ নাটকটি মানুষের জন্য লেখা, পুতুলের নয়। এবারে আসি দক্ষিণ ২৪-পরগনা পুতুলনাচের ইতিকথায়। যতদূত জানি অবিভক্ত ২৪-পরগনা জেলায় ডাং পুতুলনাচের প্রচলন হয় প্রায় ১৫০ বছর আগে। বর্তমানে এই জেলারই রাঙ্গাবেড়িয়া, চৈতন্যপুরে (মন্দিরবাজার থানা) এবং কালীকৃষ্ণ হালদারের ১নং টকি পুতুলনাচ পার্টি কালীকৃষ্ণ অপেরা মনে হয় এই জেলার প্রথম ডাং পুতুলনাচের দল। তিন পুরুষ ধরে এই দলটি বহু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এখনো টিকে আছে। কালীকৃষ্ণবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর দুই ভাই অমৃতলাল হালদার, সতীশ হালদার ওই দল চালিয়েছেন। তবে সতীশবাবু মূলত পুতুল তৈরি করতেন। তিনি তাঁর ১০০ বছরে যথেষ্ট কর্মঠ ছিলেন বলে শোনা যায়। পুতুলে রং করার সময় তিনি বিভিন্ন গাছের পাতার রস ব্যবহার করতেন। সতীশবাবুর মৃত্যুর পর অমৃতবাবুর ছেলে ভূষণবাবু দল পরিচালনার কাজে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসেন। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে সাধারণ মানুষ। তিনি প্রায় ৮০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর আমলে দলের খুব উন্নতি না হলেও অবনতি হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেরা এই কাজ আর করবে না। তাই দলের পুতুল সহ বেশ কিছু জিনিসপত্র ওই অঞ্চলের পুতুলনাচে উৎসাহী যুবকদের দিয়ে গেছেন। তবে আশার কথা ভূষণবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মদনবাবু বিশ্বজিৎ (মদনবাবুরপুত্র)-কে দিয়ে দলের হাল ধরেছেন এবং ভূষণবাবুর ইচ্ছাপূরণ করেছেন, এটা বলা যেতে পারে। ভূষণবাবু সরকারিভাবে সম্মানিত হয়েছেন। সামান্য আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। কিন্তু সরকারি অনুষ্ঠান করার সুযোগ পাননি যা মদনবাবু বিশ্বজিৎ করেছে এবং দলকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রসঙ্গত উত্তমকুমার অভিনীত সুপরিচিত "ভ্রান্তিবিলাস" ছায়াছবিতে চৈতন্যপুরের এই কালীকৃষ্ণ অপেরার "অহল্যা উপাখ্যান" মঞ্চস্থ হয়। তথ্যটি জানিয়েছিলেন ভূষণবাবু। মোট ৩টি পুতুল—অহল্যা, ইন্দ্র ও গৌতম এই কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভূষণবাবুর মুখেই শুনেছিলাম এই জেলার পুতুলনাচের ধারাবাহিক বিবর্তনের দিকটি। একসময় ঢোল, কাঁসি, বাজনা সহযোগে পুতুলনাচ হত। পুতুলনাচের আদিপর্বে পুরোপুরি কাঠের পুতুল তৈরি হত না। মাটির মুণ্ডর ওপর ন্যাকড়া, কাপড় জড়িয়ে মাথার আকার এনে কাঠের হাত-পা লাগানো হত।

পুতুল নাচের কাঠের পুতুল ও কলাকুশলী; স্থান—বহড়ু গ্রাম
ছবি : জয়ন্ত হালদার

তবে কাঠের সম্পূর্ণ পুতুল তৈরি হয় আরো পরে, ভূষণবাবুর বাবা অমৃতলাল ও কাকা সতীশ হালদারের আমলে। ভূষণবাবু নিজে পুতুল তৈরির কাজ না করলেও, পুতুলের পোশাক তৈরি, জরি বা অলংকরণের কাজ করতেন। চৈতন্যপুরের পাশেই পুকুরিয়া অঞ্চলে শ্রীশ্রী কালীমাতা পুতুল পার্টি, দুর্গা অপেরা পুতুলনাচ পার্টিগুলিও খুবই প্রাচীন। জয়নগর থানা এলাকায় মায়া হাউড়ির শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ অপেরা পুতুলনাচ পার্টি পুরাতন। ওই দলের চালক হারামণি মণ্ডলের ছেলে নিরাপদ মণ্ডল পুতুল নাচিয়ে বেশ নাম করেছেন। নিরাপদর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

এবার দঃ ২৪-পরগনা জেলার সাধুর হাট, খাগড়াকোনার (ডায়মন্ডহারবার) ডাং পুতুলনাচের কথা কিছু বলব। প্রায় ১৫০ বছর আগে খাগড়াকোনা গ্রামে পুতুলনাচের প্রচলন শুরু হয়। এই ব্যাপারে ওই গ্রামে তিনজনের অবদান ছিল। এঁরা হলেন—কৈলাস হালদার, হরিপদ হালদার এবং বাগাম্বর হালদার। এঁরা সম্পর্কে খুড়তুতো-জ্যাঠাতুতো ভাই। যুবক বয়সে এঁরা তিনজনে একসঙ্গে তাঁদের পাশের গ্রামের মেলায় পুতুলনাচ দেখে মুগ্ধ হন। কৈলাসবাবু মিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনি অবশ্য দু... নিয়ে শিমুল গাছের কাঠ দিয়ে প্রথম পুতুল তৈরি ... এবং ... গাছের পাতার রস দিয়ে রং করেন। পরে চৈতন্য... লোকেদের কাছে যজ্ঞডুমুর গাছের কথা শুনে ওই গা... পুতুল তৈরি করতে থাকেন। তিনজন মিলে ৫।৭ ব... পরে গোলযোগের সৃষ্টি হওয়ার বাগাম্বর হালদা... অঞ্চলে প্রথম দল তৈরি করেন। দলের নাম দে... পুতুল নাচ পার্টি। তাঁর ছেলে সুচিত্র হালদার ...। এঁরা বাজার বেড়িয়ার কর্মকারদের (প্রফুল্ল কর্ম... থেকে অনেক সময় তৈরি পুতুল নিয়েও আসতে... আর একটি পুরনো দল হল জ্ঞানদা চক্রবর্তীর তৈরি ... পুতুলনাচ পার্টি। জ্ঞানদাবাবুর ছেলে সতীশ চক্রবর্তীও ...। বর্তমানে তিনি মৃত্যুশয্যায়। ওনার ছেলে মাধব চক্র... অপেরা পুতুলনাচ পার্টি নামে নূতন দল গঠন করে... ওই গ্রামের যদুনাথ হালদার সাধারণ শিল্পী হিসাবে ... কাজ করতেন। শ্রীহালদারের পুতুল নাচিয়ে হিসাবে ... জ্ঞানদাবাবুর সঙ্গে গোলযোগ হওয়ায় যদুনাথ হালদারের সাহায্যে ১৯০৭ সালে পুকুরিয়া গ্রামের রজনীকান্ত হালদারের সহযোগিতায় 'যদুনাথ হালদার পুতুলনাচ অপেরা' নামে নতুন দল গঠন করেন এবং সুনামের সঙ্গে পরিচালনা করতে থাকেন। যদুনাথবাবুর দুই ছেলে, মন্মথ হালদার ও জগদীশ হালদার ও ওই কাজে বাবাকে সাহায্য করেন। পরবর্তিকালে মন্মথবাবু ও জগদীশবাবু পুকুরিয়া গ্রামের রজনীবাবু ও চৈতন্যপুরের সতীশবাবুর কাছ থেকে পুতুল তৈরি করার শিক্ষা গ্রহণ করেন। যদুনাথবাবুর মৃত্যুর পর জগদীশবাবু 'যদুনাথ হালদার পুতুলনাচ সংস্থা' নাম দিয়ে দল দিয়ে পরিচালনা করতে থাকেন। পুতুলনাচ দল চালাতে গিয়ে অনেকেই নিঃসম্বল হয়ে গিয়েছেন বলে শোনা যায়। কিন্তু জগদীশবাবু পুতুলনাচের দল চালিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে তো বটেই, সামাজিক দিক দিয়েও সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কাছ থেকে শ্রীহালদার প্রচুর সহযোগীতা পেয়েছেন। তাঁর প্রথম সরকারি অনুষ্ঠান (4—6 April, 1980) প্রেসিডেন্সি বিভাগের লোকসংস্কৃতি উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে প্রথম অনুষ্ঠান ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও ওনার অনুষ্ঠান দেখেছেন। শ্রীহালদার দূরদর্শন কেন্দ্রেও অনুষ্ঠান করেছেন। ১৯৮৭ সালে ভারতের তৎকালীন মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান করেছেন। ওই বছরেই রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত ভারত উৎসবে অংশ নিয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। তিনি আন্দামান সহ ভারতবর্ষের বহুস্থানে অনুষ্ঠান করে বাংলার এই পুরানো লোকসংস্কৃতির ধারাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কাজেই নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। জগদীশ হালদার, নিরাপদ মণ্ডল, প্রফুল্ল কর্মকার, রামপদ ঘড়ুই সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন বেশ কিছু শিক্ষিত যুবকও এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। (দলের নাম এইসঙ্গে দেওয়া হল)। দলগুলির মধ্যে আবার প্রাণের স্পন্দন এসেছে। বামফ্রন্ট সরকারের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতির জোয়ার এসেছে। এই বিষয়ে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন মাননীয় সুধী প্রধান। শিল্পীরা তাঁকে জ্যান্ত ভগবান আখ্যা দিয়েছেন। বছর দুই তিনি চলে গেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা শেষ করছি।

লোক-আঙ্গিকের নাম

পুতুলনাচ

	দলের নাম	মহকুমার নাম	ঠিকানা
১)	জ্ঞানদা অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রযত্নে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী গ্রাম: খাগড়াকোনা পো: সাধুর হাট, ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগনা
২)	যদুনাথ পুতুলনাচ অপেরা	ডায়মন্ডহারবার	প্রযত্নে জগদীশচন্দ্র হালদার গ্রাম: খাগড়াকোনা পো: সাধুরহাট, ডায়মন্ডহারবার দঃ ২৪ পরগনা
৩)	মহালক্ষ্মী অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রযত্নে মাখনলাল বিশ্বাস, পো: দুর্গাপুর, দঃ ২৪ পরগনা
৪)	রাজারামপুর (বেনিয়াবাটি) পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: সচ্চিদানন্দ নস্কর, পো: রাজারামপুর, দঃ ২৪ পরগনা
৫)	শ্রীশ্রীদুর্গা অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: শঙ্করী মুখার্জী, পো: বাজারবেড়িয়া মন্দিরবাজার, দঃ ২৪ পরগনা
৬)	মহামায়া অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: শম্ভুনাথ মণ্ডল, গ্রাম: পূর্ব দুর্গাপুর, পো: দোস্তপুর, দঃ ২৪ পরগনা
৭)	দঃ ২৪ পরগনা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: পরিমল চক্রবর্তী গ্রাম: মর্যাদা, পো: হোটর, দঃ ২৪ পরগনা
৮)	শ্রী ভীষ্মদেব হালদার দেস্তানা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	শ্রীফলতলা, পো: রায়দিঘি দঃ ২৪ পরগনা
৯)	অনুপ নাট্য তারের পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: হরেন্দ্রনাথ হালদার, গ্রাম: হালদারহাট, পো: ঘোষের পেনি, থানা: মথুরাপুর, দঃ ২৪ পরগনা
১০)	নিউ ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: নারায়নচন্দ্র নস্কর, আতাসুরা, পো: মাইতির হাট দঃ ২৪ পরগনা
১১)	নিউ জ্ঞানদা অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: মাধব চক্রবর্তী, খাগড়াকোনা, পো: সাধুরহাট, ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগনা,
১২)	বাগামুর অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: সুচিত্রকুমার হালদার, গ্রাম: খাগড়াকোনা, পো: সাধুরহাট, ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগনা,
১৩)	পূর্ব দুর্গাপুর নিউ ভারতী অপেরা থিয়োরিটিক্যাল পুতুলনাচ পার্টি	ডায়মন্ডহারবার	প্রো: রুচিরাম মণ্ডল, পো: দোস্তিপুর, দঃ ২৪ পরগনা,

লোক-আঙ্গিকের নাম

পুতুলনাচ

১৪)	অন্নদা গঙ্গা তারের পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: অজয়কুমার চক্রবর্তী গ্রাম + পো: মনিরতট
১৫)	শ্রীশ্রীমহাকালী অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: গৌতম গায়েন পো: সাউথ বিষ্ণুপুর গ্রাম: পুকুরিয়া, মন্দিরবাজার দঃ ২৪ পরগনা
১৬)	১নং টকি পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: বিশ্বজিৎ হালদার, পো: চৈতন্যপুর, জেলা: দঃ ২৪ পরগনা
১৭)	শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ অপেরা পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: নিরাপদ মণ্ডল, মায়াহাউড়ি, পো: মায়াহাউড়ি, (জীবন মণ্ডলের হাট), জয়নগর থানা, দঃ ২৪ পরগনা,
১৮)	নিউ নারায়ণী টকি পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, গ্রাম + পো: চুপড়িঝাড়া, ভায়া : কাশীনগর, দঃ ২৪ পরগনা,
১৯)	কামারের চক দেবেন্দ্রসরলা পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: গোবিন্দচন্দ্র নস্কর, গ্রাম + পো: কামারের চক ৩৬ নং হাট, কুলতলি
২০)	সুবলচন্দ্র ও সম্প্রদায় পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: সুবলচন্দ্র হালদার, পো: চৈতন্যপুর, (জয়নগর) দঃ ২৪ পরগনা
২১)	ধীরেন্দ্র নাট্য তারের পুতুলনাচ পার্টি	বারুইপুর	প্রো: কৃষ্ণপদ সরদার, গ্রাম + পো: ৬নং জালাবেড়িয়া, ভায়া: নীমপীঠ, থানা— কুলতলী। ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)
২২)	সরস্বতী নাট্যসমা[illegible] পার্টি	আলিপুর সদর	প্রো: সুদর্শন পুরকাইত, পো: রসপুঞ্জি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
২৩)	ধর্মরাজ থিয়োরি[illegible] পার্টি		প্রো: লালবিহারী সরকার, খানজটাপুর, (কড়াইবেরিয়া) দঃ ২৪ পরগনা
২৪)	শ্রীশ্রীকালীমাতা [illegible]	ডায়মণ্ডহারবার	প্রো: প্রফুল্ল কর্মকার গ্রাম + পো— বাজারবেড়িয়া থানা— মন্দিরবাজার

লেখক পরিচিতি : ক্ষেত্র তথ্য সহায়ক (Field Information Asstt)
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
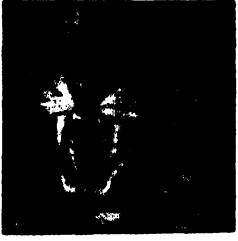
অমৃতলাল পাড়ুই

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার লোকশিল্পীদের জীবন ও শিল্পচর্চা

লোক সংস্কৃতি চর্চা একটি সংগ্রাম। তা অলসের জন্যে নয়, ভীরুর জন্য নয়। গরিবের কান্নার চীৎকারে সহানুভূতি জাগতে পারে, তাদের ঘাম ঝরানো ফসলে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটতে পারে। তাদের রোগজীবানু মেশানো রক্তে জীবন সংগ্রামের চেতনা জাগতে পারে। কিন্তু সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে গেলে প্রয়োজন সম্পদের হাতিয়ার। এর অর্থসম্পদ থাকে ধনীর ভাণ্ডারে। আর মানবসম্পদ থাকে সৃষ্টিশীলদের মধ্যে। ধনীর ভাণ্ডারের অর্থসম্পদ যখন সৃষ্টিশীল মানবজমিতে ছড়িয়ে পড়ে তখনই হয় কান্না-ঘাম-রক্তের সার্থক রূপায়ণ—লোকায়ত সংস্কৃতির জীবনদর্পণ, বেদনায় জারিত হয়েও হর্ষবর্ধন। রাজা-জমিদারের সহায়তাপুষ্ট লোকশিল্পীগণ বর্তমানে বারোয়ারী মেলাকমিটি ও বেআইনি জুয়াখেলোয়াড়দের মদতে কোনওরকমে টিকে রয়েছে। আবার নিজেদের বাঁচবার তাগিদে লোকবহির্ভূত সংস্কৃতি নকল করে বেশির ভাগ শিল্পীই ঐতিহ্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতির নামে মিশ্রসংস্কৃতি চালিয়ে যেতে বেশ মেতে উঠেছেন। অনেকে ঐতিহ্য ধরে রাখতে লোকজীবনের গাথা রচনা করে চলেছেন মূলত গীতিপ্রবণতা ও নাটকীয়তায় সমগুরুত্ব দিয়ে এবং সংগ্রামী মর্যাদায় বাস্তবজীবনের রূপচ্ছবি স্বচ্ছন্দে বুঝিয়ে দেবার সাহসিকতা নিয়ে। দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার এমন সার্বিক লোকশিল্পীর জীবনকথা আলোচনা করব যাঁদের সৃষ্টি ছড়িয়ে চলেছে পুতুলনাচ, গাজন, তরজা-কবিগান-পালা-পাঁচালি, বুড়ুমি, মানুষপুতুল, মাঝিমাল্লার গান, শ্রমিকের গান, ঢুলী শিল্পী প্রমুখ প্রদর্শনশিল্পের মধ্যে।

পাঁচালি পালাগান দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার বহু পুরনো ঐতিহ্য। কিন্তু এটি এখনও কটি অঞ্চল কেন্দ্র করে নিয়মিত চর্চা হয়। গুরু শিষ্য পরম্পরায় পুরনো পালাগুলো নতুনভাবে লেখা হয় ও সময় অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত করা হয়। মনসা-শীতলা-লক্ষ্মী-জরা-পঞ্চানন-বিবিমা পালাগুলো সাধারণত মূল গায়েন ও দোয়ারকি পদ্ধতিতে পূজা অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। এছাড়া দক্ষিণ রায়, সত্যপীর মানিকপীর, বড়পীর, মোবারক গাজী, বনবিবি, ওলাবিবি, মুরতকাঙাল, গ্রহরাজ প্রভৃতি পালাও চালু আছে।

পুতুলনাচ সম্প্রদায়ের শিল্পীরা সব এখন ঠিকা কাজ করেন। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামে দল-মালিককেই প্রকৃত শিল্পী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বেশির ভাগই বংশপরম্পরায়, যাদের কোনও পূর্বপুরুষ নিতান্তই সখেরবশে এই আনন্দজনক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার ১২৮০-৮২ সাল নাগাদ মন্দির বাজার থানার বাঙ্গাবেড়িয়া গ্রামের জনৈক উদ্ধব ব্যাপারী খেয়ালবশত খড়ের পুতুল তৈরি করে মজার মজার ঘটনা দেখাতেন বহুলোকের সামনে। কথা ছিল না, শুধু নাচ আর প্রবেশ ও প্রস্থান। যাত্রার কথা মাথায় রেখে ওই গ্রামের গোবিন্দ আজলাদার এই পুতুলনাচে ঢোল-সানাই বাজনা আর মুখে মুখে পুরাণের কিছু গল্প বলা আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে যজ্ঞডুম্বুর বা তেপলতে গাছের হালকা কাঠ দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের পুতুলের মাথা-ধড় আর তার সংগে নীচে লাঠি লাগিয়ে কোমরে কেঁড়ে বেঁধে নাচানোর ব্যবস্থা হ'ল। অবশ্যই নানারূপ প্রয়োজন মতো পোশাক পরানো হতে লাগল। এরপর মোটামুটি বাংলা ১৩৫০ সালের পর থেকে যাত্রার পালা নিয়ে কয়েকজন অভিনেতা অভিনয় করেন আর পুতুল ধরিয়েরা নাচাতে থাকেন। চৈতন্যপুরে তৈরি হ'ল রামবৈদ্যের দল; কালীকৃষ্ণ হালদার-রজনী গায়েন-উষাচরণ হালদার-শ্রীচরণ হালদারের সরিকানার দল, দয়ালহরি হালদারের দল, কিশোরী কর্মকারের দল, সতীশ গায়েনের দল, মতি গায়েনের দল, সাধন গায়েনের দল, কংসারী হালদারের দল, মোহন নস্করের দল, ভারত কর্মকারের দল। গত দুবছর আগে চৈতন্যপুর গ্রামে কালীকৃষ্ণ হালদারের দলের তৎকালীন মালিক ৮২ বছর বয়স্ক ভূষণচন্দ্র হালদার নিজ বাড়ির উঠানে ধান ঝাড়তে ঝাড়তে এ তথ্য দিচ্ছিলেন। তাঁকে দেখা যায় একাধারে বংশীবাদক, অভিনেতা, পোশাকতৈরি ও অঙ্গসজ্জাকর এবং দল পরিচালকরূপে। সতীশ হালদার ছিলেন অতিদক্ষ পুতুল নির্মাণ শিল্পী। পাশের গ্রাম বাঙ্গাবেড়িয়ায় এখনও একই বয়সের শৈলেন্দ্রনাথ পুরকাইত অন্ধ হয়ে তখনকার রচিত গান মাঝে মাঝে গেয়ে চলেছেন তাঁর ভাঙা কুঁড়ে ঘরে বসে। সুবলচন্দ্র হালদার

এখন একটি দল ভালোভাবে চালিয়ে রেখেছেন আধুনিক বিষয়ভিত্তিক পদ্ধতিতে। বাজারবেড়িয়ার প্রফুল্ল কর্মকার বিখ্যাত পুতুল নির্মাণ শিল্পী ও দলের মালিক। বাজারবেড়িয়ার অনুকরণ করে দল বাড়তে থাকে বাংলা ১২৯১-৯২ সালে ডায়মন্ডহারবার থানার আশুরালী মৌজার খাড়াকোনা গ্রামে। জ্ঞানদা চক্রবর্তী, যদুনাথ হালদার, বাগম্বর হালদার দল তৈরি করেন। কৈলাস মিস্ত্রী ও হরিপদ হালদার পুতুল তৈরি করেন। সুলতান সেখ দৃশ্যপট এঁকে মঞ্চের পিছনদিকে লাগিয়ে দিতেন। এভাবে গঙ্গাধর মণ্ডল, নিশিকান্ত হালদার আলাদা দল গড়েন। পরবর্তীকালে এসব দলের মালিক হলেন মহাদেব চক্রবর্তী, সতীশ চক্রবর্তী, জগদীশ হালদার, সুচিত্র হালদার। মন্মথ হালদার দক্ষ পুতুল নির্মাণ ও পটশিল্পী ছিলেন। বিখ্যাত পুতুল নাচিয়ে ছিলেন শ্রীচরণ হালদার, কিরণ রায় ও চূড়ামণি হালদার। গায়ক মাষ্টারের খ্যাতি ছিল কান্ত পুরকাইত। বিষ্টু মিদ্দে, পালান সরদার, জিতেন্দ্রনাথ হালদার এবং এখন জীবিত ক্ষুদিরাম মণ্ডল। উস্থি থানার দেয়ারাক গ্রামে খেপোকুমার হালদার ও রঙ্গলাল হালদার দল গড়েন যা চালু ছিল বাংলা ১৩৬৪ সাল পর্যন্ত। এমনিভাবে ফলতা থানার বেনিয়াবাটিতে ৭০ বছর বয়সের মালিক শিল্পী শচীন্দ্রনাথ নস্কর যথেষ্ট বায়না না পেয়ে নিজ বাড়ির দাওয়ায় ব'সে হারমোনিয়াম বাজিয়ে পুতুল নাচের গান গেয়ে চলেছেন। এ থানায় শম্ভুনাথ মণ্ডল বাড়ির ছেলেদের নিয়ে দল গড়ে বায়নার যোগাযোগ রেখে চলেছেন। জয়নগর থানার হারমণি মণ্ডল দল চালাচ্ছেন ৪৫ বছর ধরে। তাঁর ছেলে নিরাপদ মণ্ডল নতুন ধরনের পুতুল নির্মাণশিল্পী। মগরাহাট থানার আতাসুরা গ্রামে নারায়ণচন্দ্র নস্কর, গোকর্নির দ্বিজপদ নস্কর ও হোটরে পরিমল চক্রবর্তী বহুবছর দল গঠন করে চালিয়ে যাচ্ছেন। বিষ্ণুপুর থানার রসপুঞ্জিতে সুদর্শন পুরকাইত এবং জয়নগর থানার অজয় চক্রবর্তী এখনও দল চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলা ১৩৪০ সাল থেকে তৎকালীন জয়নগর থানার কুলতলী অঞ্চলে ক্ষীরোদচন্দ্র মণ্ডল, দেবেন্দ্রনাথ নস্কর প্লাসটিকের ও খড়ের পুতুল দিয়ে পরে শোলার তৈরি দেহ ও কাঠের তৈরি মাথা দিয়ে তারের পুতুল করে দল গ... বর্তমানে জামতলায় গোবিন্দ নস্কর তাঁর ভাঙা ঘরে নিত্য নতু... করে সাজিয়ে রাখেন আর নতুন পালায় লাগিয়ে দেন ... এমনিভাবে কৃষ্ণপদ সরদার পুতুলনাট্য লিখে বাড়ির ... নিয়ে দল চালিয়ে যাচ্ছেন। সাংকিজাহানে পাঁচুমাষ্টা... -মধুসূদনপুরের দুর্গাচরণ মণ্ডলের দল, মথুরাপুর ... জয়দেব নাইয়ার দল তৈরি হয়। ক্যানিং থানার পূ... শ্বর হালদার, ফলতা থানায় পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী, ... তারের পুতুলনাচ দল তৈরি করে চালাচ্ছেন। মথুরা... দেব হালদার ছাড়া এ জেলায় বেণীপুতুল নাচের চর্চা ... নাচ শিল্পীদের মহড়া দেবার সুযোগ বড় কম। পাল... সাজসরঞ্জাম ও পোশাকের দিকে গুরুত্ব দিতে পার... অভাবে। তাই পালা প্রদর্শনের মান উন্নত হচ্ছে না ...

হরপার্বতীর মা... চৈত্রমাসের শুরু থেকে যে গাজনগানের উৎসব ... পালাকারে পরিবর্তিত হতে শুরু হয়েছিল বছর পঞ্চাশেক আগে থেকে ডায়মন্ডহারবার-কুলপী-কাকদ্বীপ থানা অঞ্চলে। স্থানীয় ঘটনা নিয়ে ২০।২৫ মিনিটের মতো ছোট ছোট হাস্যরসের ও ব্যঙ্গের পালা মুখে মুখে ঠিক করে নিয়ে মাঝে মাঝে গান জুড়ে দিয়ে মহড়া মারফৎ তৈরি করে চৈত্রমাসে দলবল নিয়ে শিল্পীরা বের হয়ে পড়েন মাসখানেকের জন্যে। কারোর উঠানে, শিবের থানে, স্কুল মাঠে, খেলার মাঠে একটা জায়গা দেখে ঢোল কাঁসি বাজনা আরম্ভ হল, শিবদুর্গা আর সামাজিক বেশে সঙ্গীরা গোলাকার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নাচতে লাগল—লোকজন ছুটে এসে জড়ো হয়ে ঘিরে দাঁড়াল, আরম্ভ হল শিবদুর্গার বন্দনা। হিসাব করে মাঝখানে আসরমঞ্চের মতো জায়গা ধরে পালা আরম্ভ হল। ম্যানেজার ওদিকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল-পয়সা তুলে নিয়ে এলেন। আবার দল চলল অন্য পাড়ায়। মথুরাপুর-জয়নগর-কুলতলী অঞ্চলে পালাগানের মতো ছোট ছোট ছক তৈরি হল, ওইরূপ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে 'গাজন গীতিনাট্য' বলে চালু হল। অবশ্যই আরম্ভের সময় শিববন্দনা হবে, এখন আবার কৃষ্ণবন্দনা চালু হয়েছে। প্রথমোক্ত অঞ্চলগুলোতে বর্তমানে যাত্রার আঙ্গিকে বাদ্য-আলো-মঞ্চ ব্যবহার করে পেশাদারী দল চালনায় ঝোঁক দেখা যায়। দ্বিতীয়োক্ত অঞ্চলগুলোতে এখনও লোকসংস্কৃতি আঙ্গিকে দলগুলো যথাসময়ে গাজনগান ও প্রয়োজনে ধর্মস্থানে বা মানস অনুষ্ঠানে শীতলা-মনসা-লক্ষ্মী-পঞ্চাননের পালাগান করে থাকেন। পালাগাজন বর্তমানে বিশ্বকর্মাপূজা থেকে আরম্ভ করে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত চলছে গাঁয়ের বিভিন্ন মেলা পার্বণে ও লোকসংস্কৃতি উৎসবে। তবে অবৈধ জুয়ার আসরের মদতে এই সংস্কৃতির শিল্পী এখনও বেঁচে আছে। চৈত্রসংক্রান্তির শেষ তিনদিন শিবের থানে পাশাপাশি গ্রামের গাজনদলের গাওনার বিনিময় হয়, সেখানে চাল-পয়সা সংগ্রহ বা কোনও চুক্তি থাকে না। গাজনে দেবদেবীকে নিজ সমাজের যে চরিত্রভাবনার প্রয়াস ছিল, সে স্রোতের বাইরে চলে আসার ইচ্ছার মূল গাজন ঐতিহ্যকে আর ধ'রে রাখতে চাইছেন না শিল্পীগণ। তবে গীতিনাট্যের কাঠামো রেখে বিষয়বস্তু এসে যাচ্ছে চাষীর সমাজে স্থান, দৈনিক মজুরি, গৃহের শান্তি, পরিবারকল্যাণ, পাট্টা, বর্গা, পরিবেশ উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃত্রিম সংরক্ষণ, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়। এ যেন চোখের ছানি অপারেশন করে সমাজের বিকৃতি-

নরসিংহ বধ পালা ছবি : লেখক

শীতলার পালাগান, মাতরালী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা — *ছবি : অমৃতলাল পাড়ুই*

তরঙ্গের মধ্য দিয়ে চিনিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিকল্প সংস্কৃতিকে তার হৃদয়গ্রাহী লোক নাট্যের। বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট বড় দলের প্রতিনিধি শিল্পীদের চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করলে বলতে হয় কতকগুলো নাম যাঁরা এখনও চলেছেন পালাগাজনের স্রোতগতিতে। জয়নগর থানা অঞ্চলে নীলমণি নস্কর, অনুকূল সরদার, সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জগদীশ সরদার, ক্ষুদিরাম নাইয়া, কাশীনাথ বর, কানাইলাল হালদার, সাধনচন্দ্র হালদার, শ্যামাপদ সরদার, পাঁচুগোপাল মণ্ডল; কুলতলী থানা অঞ্চলে মহাদেব দাস, কালিপদ হালদার, গোবিন্দ মণ্ডল, নারায়ণচন্দ্র হালদার, বুদ্ধিশ্বর বৈরাগী, মুচিরাম মণ্ডল, প্রভাত কুমার নাইয়া, রামদেব হালদার, গোপাল নস্কর, সুবলচন্দ্র পাটারী, উদয়চন্দ্র সরদার, দুলালচন্দ্র বায়েন, লক্ষ্মীকান্ত বায়েন, চন্দ্রকান্ত সরদার, মৃত্যুরাম মণ্ডল, যতন সরদার, লখীন্দর মণ্ডল, গোপাল নস্কর; মন্দির বাজার থানা অঞ্চলে বাবুলাল গায়েন, অমূল্য হালদার, সুবল হালদার, জয়দেব হালদার; মথুরাপুর থানার কুমুদবান্ধব হালদার; উস্থি থানার আনন্দ হালদার, ডায়মন্ডহারবারের তুলসী দলুই, মোহন সরদার, উৎপল সামন্ত, তপন কুমার মণ্ডল; কুলপী থানা অঞ্চলে সতীশ কর্মকার, সাধন হালদার, নজরুল সেখ, নিখিল হালদার, সুধাংশু প্রধান, পূর্ণ-হালদার, মেজবাহুর লস্কর, মুরারীমোহন মণ্ডল, ক্ষুদিরাম দলুই, দিলীপ বাজখাঁ, পরিতোষ হালদার; কাকদ্বীপ থানা অঞ্চলে হারাণচন্দ্র হালদার, অমলকুমার ঘোষ, পরিতোষ দাশ, গোপাল মাজী, জহর হালদার, সুকুমার মিস্ত্রী, দীপক পাইক প্রমুখ প্রত্যেকে আলাদা দলের পরিচালক শিল্পী। এছাড়া আরও প্রায় শতাধিক ছোটখাটো দল আছে যাঁরা নিয়মিত চর্চা করেন না, কিন্তু চৈত্রমাসে গান করেন, আবার বন্ধ হয়েও যায়। বর্তমানে গাজনে পালা রচয়িতা খুব কম। যার ফলে বেশির ভাগ দলকে পালা কিনে নিতে হয় আগে থেকে অথবা পুরনো পালা একটু হেরফের করে তৈরি করেন।

কবিগানের প্রভাব গ্রামসমাজের মধ্যে হ্রাস পেলেও তরজা এখনও বেশ জাঁকিয়ে চলেছে প্রকৃত শিল্পীদের চর্চায়। এখনও আসর ধরেন মন্দির বাজার থানার সুজানগর গ্রামের ৭৪ বছর বয়সের বসন্ত নস্কর, মগরাহাট থানার শালিকা গ্রামের একই বয়সী হরিপদ মিস্ত্রী আর জীবিত আছেন জয়নগর অঞ্চলের ৭৮ বছরের গোপাল নস্কর যাঁরা কবিগান ছেড়ে তরজাগান রচনা করে চলেছেন। এই দক্ষিণ ২৪-পরগনায় প্রথম দাঁড়াকবি ছিলেন উস্থি থানার গড়খালি গ্রামের গোরাচাঁদ নস্কর যিনি ১১৩ বছর পরমায়ু নিয়ে বাংলা ১৩৫৭ সালে মারা গেছেন। শেষ বয়স পর্যন্ত আসরে দাঁড়িয়ে তিনি গান গেয়েছেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ও অন্যতম শিষ্য প্রবোধচন্দ্র নস্কর দাঁড়াকবি হয়ে ৯৮ বছর বয়সে মারা যান বাংলা ১৩৮৫ সালে। গোরাচাঁদবাবুর অন্যান্য শিষ্য ছিলেন মন্দির বাজার থানার সিদ্ধেশ্বরপুর গ্রামের দুভাই ধ্রুব হালদার ও মহিম হালদার, জয়নগর থানার মরিশ্বরপুর গ্রামের মাখন নস্কর, ক্যানিং থানার বেতবেড়িয়া গ্রামের সুরেন নস্কর। এঁদের

গড় পরমায়ু ৮০ বছর। প্রবোধবাবুর শিষ্য হলেন মগরাহাট থানার মাঝেরহাট-কৃষ্ণপুর গ্রামের দণ্ডধর মণ্ডল (১৪০২ সালে ৮৬ বছরে মৃত্যু), সালিকা গ্রামের হরিপদ মিস্ত্রী ও ভূধর মিস্ত্রী, জয়নগর থানার বকুলতলা গ্রামের নিরাপদ নস্কর (৬৬ বছর) ও বহড়ু গ্রামের গোপাল নস্কর, মন্দির বাজার থানার সৃজানগরের বসন্ত নস্কর এবং উস্থি থানার নৈনানপুর গ্রামের সুশীলচন্দ্র নস্কর। এঁরা সকলে কবিগান ও টপ্পা রচনা করেছেন ও চর্চা করেছেন। বর্তমানে আরও যাঁরা তরজা গেয়ে ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন নতুন সামাজিক বিষয়বস্তুর কাহিনী যোগ করে তাঁরা হলেন ডায়মণ্ডহারবার থানার বিজলীচন্দ্র মাজী, সামসুদ্দিন মোল্লা, ফলতা থানার গোলাম রসুল, মগরাহাট থানার মেঘনাদ মণ্ডল, কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল, শম্ভুনাথ মোদক, জয়নগর থানার নিরাপদ নস্কর, ভূপতিচন্দ্র সরদার, জলধর মণ্ডল, শশধর নস্কর, দুলালচন্দ্র মণ্ডল, স্বপনকুমার মণ্ডল, শ্রীমন্ত বৈরাগী, শেখরকুমার মণ্ডল, রায়দিঘী থানার গোপাল হালদার, গৌর হালদার, অনুকূলচন্দ্র হালদার, কুলতলী থানার বাঁটুল হালদার, মথুরাপুর থানার কেশব মিদ্দে, বিষ্ণুপুর থানার অনিরুদ্ধ নস্কর, বারুইপুর থানার প্রকাশচন্দ্র বারিক, অতুলচন্দ্র নস্কর (ইং ১৯৯৭ সালে মৃত্যু), পালানচন্দ্র সরদার, গোসাবা থানার হারাণচন্দ্র যোদ্দার কাকদ্বীপের ধনপতি হালদার প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন দলের পরিচালক। এছাড়া এঁদের সঙ্গী শিষ্য বহু শিল্পী আছেন।

পাঁচালি পালাগান দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার বহু পুরনো ঐতিহ্য। কিন্তু এটি এখনও কটি অঞ্চল কেন্দ্র করে নিয়মিত চর্চা হয়। গুরু শিষ্য পরম্পরায় পুরনো পালাগুলো নতুনভাবে লেখা হয় ও সময় অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত করা হয়। মনসা-শীতলা-লক্ষ্মী-জরা-পঞ্চানন-বিবিমা পালাগুলো সাধারণত মূল গায়েন ও দোয়ারকি পদ্ধতিতে পূজা অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। এছাড়া দক্ষিণ রায়, সত্যপীর মানিকপীর; বড়পীর, মোবারক গাজী, বনবিবি, ওলাবিবি, মুরতকাঙাল, প্রহরাজ প্রভৃতি পালাও চালু আছে। বর্তমানে নানা অনুষ্ঠানে লোকনাট্যরূপে বিভিন্ন চরিত্রে সাজ-সজ্জা করে গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমেই রূপদান বেশি করা হয়। বারুইপুর থানার অষ্ট মণ্ডল, সুদিন মণ্ডল, গোষ্ঠ মণ্ডল, ভরতচন্দ্র মণ্ডল, নিশিকান্ত কয়াল, বিমলকৃষ্ণ সাফুই, পান্নালাল ঘোষ, সনাতন মণ্ডল, জীতেন মণ্ডল, অশো[illegible]মার পাত্র, ডায়মণ্ডহারবার থানার সতীশ হালদার ও [illegible] (পালাকার), প্রদীপ অধিকারী, শংকর মণ্ডল, [illegible]ন্তকুমার মণ্ডল, কালীপদ কাঞ্জিলাল, কাকদ্বীপের [illegible] চন্দ্রকান্ত বৈরাগী, সাগর থানার মিলন কুমার পাল, [illegible] রেনুপদ হালদার, মগরাহাট থানার বলরাম মণ্ডল, [illegible] কুলতলী থানার শরৎচন্দ্র সরদার, গোপাল হালদার, [illegible], ধনপতি নস্কর, গোপাল মণ্ডল, রাধেশ্যাম হালদার, [illegible]নার্দন প্রামাণিক, সোনারপুর থানার লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল, [illegible] থানার বসন্তকুমার গায়েন, লক্ষ্মীকান্ত গায়েন, গোসা[illegible]রাজ অধিকারী প্রমুখ শিল্পী বিভিন্ন দল পরিচালক [illegible] এই [illegible]গানের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন।

কথকঠাকুরের [illegible] সহযোগে পুরাণ-ভারতের কাহিনী বলা আর এখন [illegible]বন অঞ্চলে নাটকীয় ভঙ্গীতে একা শুধু গল্প বলে যা[illegible]য়েছে। ২৫।৩০ বছর আগে থেকে চালু এই সংস্কৃতি 'বুড়মি' নামে পরিচিত। কুলতলী থানায় হরেন্দ্রনাথ নস্কর, কাঞ্চন গায়েন, প্রাণকৃষ্ণ সরদার, সন্তোষ গায়েন, গৌরাঙ্গ সরদার, রায়দিঘী থানা অঞ্চলে গোপাল দাস ও ক্যানিং থানা অঞ্চলে কানাইলাল মৃধা এই আঙ্গিক ধরে রেখে কথকঠাকুরের বহিরঙ্গরূপ দেখিয়ে একক আসর জাঁকিয়ে চলেছেন।

মাঝিমাল্লার গান প্রায় লোপ পেতে বসেছে। ক্যানিং থানার সুনীলচন্দ্র নস্কর, কুলতলী থানার গিরিজাবালা মণ্ডল এখনও কিছু কিছু অনুষ্ঠান করে এ গানের স্মৃতি বজায় রেখে চলেছেন। মাঝিমাল্লার মুখে মুখে কিছু পুরনো গান গোসাবা থানা অঞ্চলে একটু আধটু শোনা যায়। আজ মাঝিমাল্লাদের জীবনচিত্র বদল হতে থাকায় নৌকার কাজ সেরে বাড়িতে পৌছে সমাজে বাঁচার বহু রঙিন স্বপ্নের গান গেয়ে থাকেন যা ওখানে লোককর্মসংগীত হিসাবে বেঁচে আছে।

এরকমভাবে জেলায় কিছু লোকশিল্পী পল্লীগীতি, বাউলগীতি গেয়ে চলেছেন, কিন্তু তা' পুরনো ক্যাসেট বন্দী গান, নতুন লোকগান সৃষ্টি হচ্ছে না। সোনারপুর থানার জগদীশ্বর সরকার, অমল চক্রবর্তী, গোপালদাস বাউল, কাকদ্বীপের নিশিকান্ত বর্মণ, চিত্তরঞ্জন বারিক, মথুরাপুরের শ্যামসুন্দর হালদার, কুলতলীর যদুনাথ দত্ত, বারুইপুরের আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আলি আকবর, কুলপী থানার কালীপদ শিকারী, গোসাবার আশিস চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীগণ কোন রকমে পল্লীগানের স্মৃতি রেখে চলেছেন।

মানুষ পুতুল এক নতুন লোকসংস্কৃতির রূপ নিয়েছে নামখানা থানা অঞ্চলে 'মৌসুমী পয়লা ঘেরী' গ্রামে গৌরহরি মণ্ডল ও তাঁর ২০।২২ জন সংগীর মাধ্যমে। মানুষেরাই পুতুলের মতো অঙ্গসজ্জা করে বিভিন্ন নাটক পরিবেশন করেন পুতুলের নড়াচড়ার মতো অঙ্গভঙ্গী করে এবং কথা ও গানের মধ্য দিয়ে।

নিমাই সন্ন্যাস ও কৃষ্ণযাত্রা দক্ষিণ ২৪-পরগনার এক প্রাচীন লোকনাট্য ছিল, এখন থেকে ৩৫।৪০ বছর আগে তার শেষ রেশটুকু মিলিয়ে গেছে। এই সাংস্কৃতিক শিল্পীরা যথা অভিনেতৃ, গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী এখন গীতিনাট্যরূপী গাজনপালা, মঙ্গলগীতি, দেলগান, বনবিবি ও বিভিন্ন পাঁচালি পালা-গানের সংগে যুক্ত হয়ে আছেন। এঁদের অনেকে চিৎপুরী পেশাদারী যাত্রা আঙ্গিকের নকলকারী অ্যামেচারের নির্দেশনামা অনাচারে যুক্ত হয়ে স্বকীয় শিল্পসৌকর্য বিসর্জন দিয়ে চলেছেন।

আর এক ধরনের শিল্পী যাঁরা জেলার কৃষিঅঞ্চল, বনাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের বহু গ্রামে বসবাস করে একসময় নিজস্ব বাজনরীতিতে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন, সেই ঢুলীরা বংশ পরম্পরায় নিজ নিজ বসত অঞ্চলে থেকেই পূজাপার্বণ-বিবাহ-অন্নপ্রাশনে কচিৎ মাইক্রোফোন যন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ঢোলের নিজস্ব বোল হারিয়ে চলতি সিনেমা সংগীতের ঢেউয়ের দোলায় নেচে চলেছেন। শুধু তরজাগানের শিল্পীর সংগী হয়েই ঢুলীরা স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন।

মাত্র তিন দশকের মতো হল বাটানগর-বজবজ শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশা নিয়ে নিজেরাই গেয়ে চলেন তাঁদের কর্মসংগীত যা এখন 'শিল্পশ্রমিকের গান' হিসাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায়।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক এবং সংগ্রাহক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র-পত্রিকা সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

পলাশ হালদার ও তুহিনময় ছাটুই

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলা

বর্ণিত শীর্ষক প্রবন্ধটির রচনা একটি শ্রমসাধ্য কাজ। পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য প্রবন্ধটিকে দুটি পর্বে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের শিরোনাম—"দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার লৌকিক দেব-দেবীর ইতিবৃত্ত" এবং দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম "দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলার ইতিবৃত্ত।"

এ কথা সবার জানা—বণিকের মানদণ্ড এই ভারতের মাটিতে দেখা দিয়েছিল রাজদণ্ডরূপে। সেই রাজদণ্ড প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চব্বিশ-পরগনার মাটিতে। ইংরেজ আর মিরজাফরের মধ্যে গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালের ৩রা জুন (পলাশীর যুদ্ধের আগে)। যুদ্ধের পর সরকারিভাবে ইংরেজ ও নবাবের মধ্যে সন্ধি হয় ১৭৫৭ সালের ১৫ই জুন। সেই সন্ধির ৯ নং ধারা মোতাবেক কলকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত ভূ-অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানির জমিদারীভুক্ত হয়েছিল। ওই বছরের ২০শে ডিসেম্বর নবাবী পরওয়ানায় ২৪টি পরগনার কথা উল্লেখ করা হয়।

দরবস্ত পরগনা (পূর্ণ পরগনা)

মাগুরা / খাসপুর / মেদনমল্ল / ইখ্‌তিয়ারপুর / বারিদহাটি / খাড়িজুড়ি / দক্ষিণসাগর / মুড়োগাছা/ পেঁচাকুলি / মেলাংমহল (নিমকমহল) / হাতিয়াগড়/ময়দা।

কিসমৎ পরগনা (আংশিক পরগনা)

গড় / কলকাতা / পাইকান (পৈখান)/ মানপুর/ আমিরাবাদ/ আজিমাবাদ / শাহপুর / শাহনগর / আমিরপুর / আকবরপুর / বালিয়া / হাসুন্দি।

কৃষিজীবী, অরণ্যজীবী, জলজীবী মানুষ দক্ষিণ রায়, বনবিবি, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, কালী, শিব, চণ্ডী, পঞ্চানন, বারা, আটেশ্বর, ধর্মরাজ, শনি, লক্ষ্মী, বেনাকী, মাকাল, ঘেঁটু, কালুরায়, পীরবাবা, গাজীবাবা প্রভৃতিকে এক-একটি শক্তির আধার দেবতা হিসাবে কল্পনা করেছে এবং সেই কল্পনার দেবতাদের বাস্তবের মাটিতে নানা প্রতীকে মূর্ত করে তুলে প্রচলন করেছে ধ্যান, জপ, পূজা, আচার, উৎসব ও মেলার।

নবাবের পরোওয়ানার সমর্থনে যে ফার্দ সাওয়াল (Gazette) প্রকাশ হয় সেখানে আরও ৩টি অতিরিক্ত পরগনার কথা উল্লেখ আছে যথা : হাবেলি শহর (হালিশহর)/বালিয়াজুড়ি/২টি আবওয়াব ফৌজদারী মহল। (বালিয়া ও বাসুন্দিকে একটি পরগনা হিসাবে উল্লেখ আছে)

চব্বিশ পরগনা জেলা ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে বহুবার বয়ে গেছে বহুরকম প্রাকৃতিক রুদ্র রোষ। অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষ্য বহন করে এ ভূ-খণ্ড। অখণ্ড চব্বিশ পরগনা প্রশাসনিক কারণে ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। জেলার উত্তর অংশ—উত্তর চব্বিশ- পরগনা এবং দক্ষিণ অংশ—দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা নামে স্বতন্ত্র দুটি জেলার মর্যাদা পেয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে জেলার দক্ষিণ অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেব-দেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রাম জনপদ-গুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে লৌকিক দেব-দেবীর এবং সেই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে যে পূজা-পার্বণ-উৎসব ও মেলার হদিস পাওয়া গেছে তা সারণিবদ্ধ করা যেতে পারে।

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
● বিষ্ণুপুর থানা		
ঝিকুড় বেড়ে	—	ভূতনাথ
জয়রামপুর	—	শিব
বাখরাহাট	—	শীতলা
জয়চণ্ডীপুর	—	সিদ্ধেশ্বরী কালী ধর্মরাজ, পীর খোদা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
কাঞ্চনবেড়িয়া	—	জগন্নাথ দেব
নাদা (নন্দা) ভাঙ্গা	—	রাধাকৃষ্ণ, শিব

বারামূর্তি
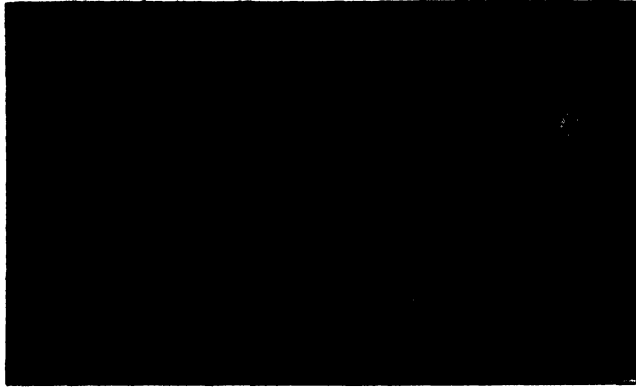
স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
মৎস্যখালি	—	রাধাকৃষ্ণ, শিব
ভাদু রামকৃষ্ণপুর	—	রাধাকৃষ্ণ

(এ ছাড়া প্রত্যেক গ্রামে আছে মনসা, শীতলা, বিবিমা, ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, বড় খাঁ গাজীর থান)

● সোনারপুর থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
সেনদীঘি	—	ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী, পঞ্চানন
সরলদীঘি	—	বাবাঠাকুর
রাজপুর এবং হরিনাভি	—	ওলা বিবি, ময়দানবেশ্বরী, ভবানীশ্বর, শিব, পঞ্চানন্দ, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী, গাজীবাবা, ধর্মরাজ, রাধাকৃষ্ণ
সোনারপুর বাজার	—	সোনাপীরের থান
গোড়খাড়া	—	শিব, শীতলা, রাধাকৃষ্ণ, শনি, ষষ্ঠী।
কামরাবাদ	—	শ্রীধর জীউ, শিব, শীতলা, ষষ্ঠী, পঞ্চানন,
নওয়াপাড়া	—	গোরক্ষনাথ
বৈদ্যপাড়া	—	রাধাকৃষ্ণ
খুঁড়িগাছি	—	শীতলা
বনহুগলি	—	শিব
রায়পুর		চণ্ডী, মনসা, পঞ্চানন্দ, শীতলা, বিবি মা, গাজীবাবা
সাজুর, নভাসন	—	ঐ
মালঞ্চ	—	অন্নপূর্ণা, শিব
মাহিনগর	—	শিব
সুভাষগ্রাম	—	হাড়ি ঝি চণ্ডী

● বেহালা থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
নস্করপুর	—	পঞ্চানন, বিশালাক্ষী
বেহালা বাজার	—	সিদ্ধেশ্বরী কালী, জগন্নাথ দেব
ডায়মন্ডহারবার রোড	—	পঞ্চানন
হরিসভা	—	ধর্মঠাকুর
চণ্ডীতলা	—	মঙ্গলচণ্ডী দেবী
চণ্ডির মাঠ	—	ঐ

● মহেশতলা থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
বড় ঠাকুরতলা (বাগপোতা)	—	রাধাকৃষ্ণ, চণ্ডী, সরস্বতী. শিব, শীতলা, দক্ষিণরায়, বারাঠাকুর, মনসা, ধর্মঠাকুর, হরিঠাকুর, ঘেঁটু, মানিকপীর, বুড়ো শিব।
গোপালপুর (দক্ষিণদারতলা)	—	বারা ঠাকুর
কেয়াতলা	—	মনসা
সাপা রায়পুর	—	ধর্মরাজ
জটা শিবরামপুর	—	পঞ্চানন্দ
বেগোর খাল	—	জলার পঞ্চানন
কুম্ভকারপাড়া	—	মানিকপীর, ঘেঁটু, হরিঠাকুর

● বজবজ থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
বাটানগর, নুঙ্গী	—	বুড়ো শিব, শীতলা

● যাদবপুর থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
যাদবপুর	—	মানিকপীর, মনসা, শীতলা
ঢাকুরিয়া	—	পঞ্চানন, মনসা, শীতলা, ধর্ম ঠাকুর।

● বারুইপুর থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
বাগানীপাড়া	—	ওলা বিবি
ফাঁসি ডাঙ্গা	—	সতীমার থান, দেওয়ান গাজী
বারুইপুর	—	রাধাকৃষ্ণ, পঞ্চানন, শীতলা, বিশালাক্ষী, ওলাবিবি, গাজীসাহেব, বাবাঠাকুর।
মদারাট	—	শিব, কালী, পঞ্চানন
ধপধপি	—	দক্ষিণরায়, পঞ্চানন, শীতলা, বিবিমা, বারা
হোটর (ধনবেড়িয়া)	—	বিবিমা, মনসা
কল্যাণপুর (ইন্দ্রপালা)	—	রাধাকৃষ্ণ, বাবাঠাকুর, মনসা
চকমানিক (আমতলা)	—	ধর্মরাজ

● বজবজ থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
আচিপুর	—	বুদ্ধদেব

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
চিত্রগঞ্জ	—	খুকী কালী, গৌরাঙ্গ দেব, মনসা, শীতলা, পীরবাবা।
মায়াপুকুর	—	কালী
বিড়লাপুর বাজার	—	শিব
বাওয়ালী	—	শিব, গৌরাঙ্গ, রাধামদন-মোহন, রাধাবল্লভ, গোপীনাথ, শ্যামসুন্দর, রাধাকান্ত, চণ্ডী, সত্যপীর
বুইতা	—	কালী, ওলাবিবি, বাবাঠাকুর, মনসা
চাউলখোলা	—	ষড় শিব, দুর্গা, ধর্মরাজ, পঞ্চানন, দক্ষিণরায়, মনসা, শীতলা।

● **ভাঙর থানা**

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
শাঁকশহর	—	বামনপীর
মরিচগ্রাম	—	পীর ইসমাইল শাহ
ভাঙর	—	পীর গোরাচাঁদ
বামুনিয়া	—	পঞ্চানন্দ
সানপুকুরিয়া	—	রাধাকৃষ্ণ, পঞ্চানন, কালী, মনসা

● **জয়নগর থানা**

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
জয়নগর	—	জয়চণ্ডী
মিত্রগঞ্জ	—	দ্বাদশ শিব
রাধাবল্লভতলা	—	রাধাবল্লভ জিউ
তেলিপাড়া	—	জগন্নাথদেব
জয়নগর-মজিলপুর	—	শিব, মনসা, ধন্বন্তরী কালী,
(মতিলাল পাড়া, রক্তাখাঁ পাড়া, মজিলপুর, দুর্গাপুর, পণ্ডিতপাড়া, কয়ালপাড়া)	—	রাধাকৃষ্ণ, রক্তাখাঁ, পঞ্চানন বিবি, বাবা ঠাকুর, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, দক্ষিণরায়, জ্বরাসুর, বনবিবি
ঢোষা (ধোষা)		শিব, পঞ্চানন, শীতলা, মনসা, বনবিবি, বসন্তরায়
বহড়ু (কানাইয়ের মোড়) বহড়ু বাজার, বহড়ু দক্ষিণপাড়া বহড়ু বাঁড়ুজ্যেপাড়া		পঞ্চশিব, ধর্মরাজ, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন, জ্বরাসুর, দক্ষিণরায় নিত্যগোপাল, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, কালী।
ময়দা গ্রাম	—	ধর্মঠাকুর, মনসা, পঞ্চানন, শীতলা, গঙ্গা, ভৈরবী কালী, বনবিবি, দক্ষিণা কালী, সন্ত শিব, জগন্নাথ, শ্যামসুন্দর
বড়তলা	—	শিব
নয়পুকুরিয়া	—	রাধাগোবিন্দ

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
সরিষাদহ	—	মানিকপীর
রায়নগর	—	রাধাকৃষ্ণ
অর্জুনতলা	—	গঙ্গাদেবী

● **দক্ষিণ বারাসত**

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
বেলেডাঙ্গা দক্ষিণ বারাসত বাজার দক্ষিণ বারাসত দাসপাড়া জোড়াপোল (বহড়ু)	—	আদ্যমহেশ (শিব), বিনোদিনী কালী, ধর্মরাজ, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, দক্ষিণ রায়, শতর্ষা গাজী
তুলসীঘাটা	—	পাঁচু ঠাকুর।

● **কুলতলী থানা**

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
নলগোড়া	—	শিব, কালী, নারায়ণী, পঞ্চানন্দ, আটেশ্বর, মনসা, শীতলা
সোনাটিক্রি	—	গীর্জা, শিব, গঙ্গা

● **বাসন্তী থানা** — শীতলা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
মহেশপুর হাটখোলা	—	বনবিবি
আম ঝাড়া	—	পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায়, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা

● **ক্যানিং থানা**

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
ক্যানিং বাজার	—	ব্রহ্ম দেবতা
বাঘিনী গ্রাম	—	বিশালাক্ষী, কালী, শীতলা, চৈতন্য, পঞ্চানন্দ, মনসা

সুন্দরবনে পূজিত দেবদেবী

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
তালদি গ্রাম	—	কালী, পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা, বনবিবি, বাবাঠাকুর
ডেভিস আবাদ	—	কালী, শীতলা, পঞ্চানন, শিব, বাবাঠাকুর
ঘুটিয়ারী শরীফ	—	বড় খাঁ গাজী

● মগরাহাট থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
উত্তর কলস, উত্তর কুসুমপুর, ইয়ারপুর শালিকা	—	শাহপীর মাজার, শিব, কালী, মনসা, শীতলা, দক্ষিণরায়; ধর্মরাজ, পঞ্চানন্দ

মনসা
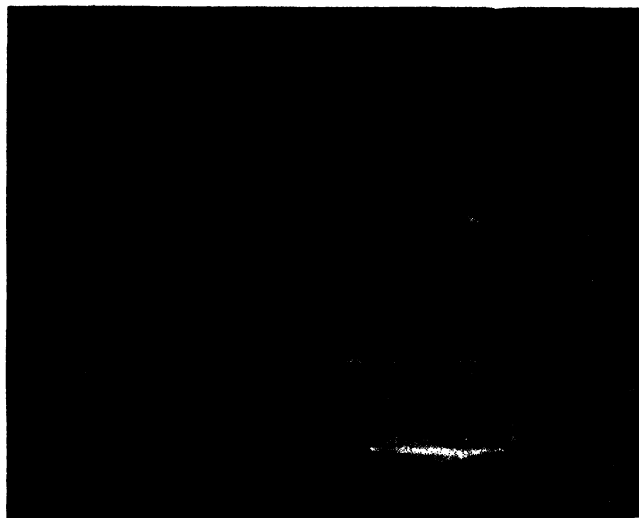
স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
ধনিরামচক	—	বিবিমা, দক্ষিণেশ্বর, বাবাঠাকুর
নাজরা	—	কালী, মনসা, শীতলা, [illegible]নন্দ, বাবাঠাকুর, [illegible], গাজীবাবা
রঙ্গীলাবাদ		[illegible]লা, বাবাঠাকুর, মনসা, [illegible]ণেশ্বর।

● মন্দিরবাজার থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
মন্দিরবাজার		[illegible] কেশবেশ্বর
ঘাটেশ্বর		[illegible]ব, শীতলা, মনসা, [illegible]ক্ষিণেশ্বর, বিবিমা
জগদিশপুর (হাউড়িহা[illegible]		[illegible]ব, শীতলা, মনসা, [illegible]ড়খাঁ, পঞ্চানন্দ
সিদ্ধেশ্বরপুর	—	[illegible]সিদ্ধেশ্বরী, শিব, শীতলা, [illegible]ক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, [illegible]াচপীর, সাতবিবি, পঞ্চানন

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
বিদ্যাধরপুর	—	গোপীনাথ
পূর্বগোপালনগর	—	শিব, শীতলা, মনসা, পঞ্চানন, ধর্মরাজ, বাবাঠাকুর, শিব, পঞ্চানন, ধর্মঠাকুর
বিষ্ণুপুর	—	বিবিমা, মনসা, শীতলা, গঙ্গা
মহেশপুর	—	রাধাকৃষ্ণ

● ফলতা থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
হোগলা, পদ্মপুর, দোস্তিপুর	—	গঙ্গাদেবী
মামুদপুর	—	ধর্মরাজ
রসুলপুর	—	রাধাকৃষ্ণ
জগন্নাথপুর	—	গঙ্গাদেবী, পঞ্চানন্দ
দলুইপুর	—	রাধাকৃষ্ণ
বেলসিংহ	—	রাধাকৃষ্ণ
সহরা	—	শিব, শীতলা, মনসা, পঞ্চানন, বিবি, ধর্মরাজ,
রুখিয়া	—	বাবাঠাকুর, দক্ষিণরায়
কোদালিয়া, ফতেপুর হাসিমনগর	—	পঞ্চানন, রাধাগোবিন্দ, শিব, শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, ধর্মরাজ, দক্ষিণরায়
ফলতা, বাগদা	—	বেনাকী

● ডায়মন্ডহারবার থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
কামারপোল, মশাট হরিণডাঙ্গা, লালবাটী দক্ষিণ সিমলা, কুলটিকারী পারুলিয়া	—	শিব, শীতলা, মনসা, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন, বিশালাক্ষী, চণ্ডী, রক্ষাকালী
দীঘেশ্বর, পালা বীরপালা, শঙ্কর পারুলিয়া সেহালামপুর	—	বেনাকী দেবী
বাসুলডাঙ্গা	—	শিব

● কুলপী থানা

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
দেরিয়া	—	জগন্নাথদেব ও অন্যান্য লোকদেবতা
শ্যামবসুর চক	—	শিব ও অন্যান্য লোক-দেব-দেবী
উদয়রামপুর	—	ঐ
দুর্গানগর	—	ঐ
রাজারামপুর, বাহাদুরপুর রামরামপুর, মুকুন্দপুর, জামবেড়িয়া, রামকিশোরপুর কানপুর, নারায়ণপুর বড়বেড়িয়া, হাড়া, কুলপী, বকচর, মশামারী, রামকৃষ্ণপুর ভগবানপুর	—	শিব, শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, ধর্মরাজ, বাবাঠাকুর, বিবিমা, দক্ষিণরায়

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
করঞ্জলী কাঁটাবেনিয়া	—	পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, বাবাঠাকুর, শীতলা, পঞ্চানন্দ, ওলাইচণ্ডী, বিবিমা, গাজীবাবা, বিশালাক্ষী
● মথুরাপুর থানা		
মাধবপুর	—	ত্রিপুরা দেবী (চক্রতীর্থ), শিব
বাপুলীবাজার	—	শিব
কাশীনগর	—	পঞ্চানন্দ, বিষ্ণু মহেশ্বর, মনসা, শীতলা, জ্বরাসুর
মাইবিবিহাট	—	বিবি মা
ছত্রভোগ	—	ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী
খাড়ি	—	বড়খাঁ গাজী, নারায়ণী, হরিদেব, রাধাবল্লভ
কৃষ্ণচন্দ্রপুর	—	অন্ধমুনি
উত্তর গোবিন্দপুর	—	রাধাকৃষ্ণ, দক্ষিণরায়, বুড়ো শিব, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন, গাজী, সাতবিবি, মনসা, শীতলা, মহাদেব, রাধাগোবিন্দ
গিলারছাট	—	ঐ
খাড়ি ফৌজদার	—	মঙ্গলা দেবী
● পাথরপ্রতিমা থানা		
কামদেবপুর	—	শিব, শীতলা, মনসা, রাধাকৃষ্ণ, বিশালাক্ষী
দিগম্বরপুর	—	নারায়ণী, রক্ষাকালী, রাধাকৃষ্ণ
শ্রীধরনগর গ্রাম	—	গঙ্গা, বিশালাক্ষী, চন্দনমাতা, রাধাকৃষ্ণ, কালী
● কাকদ্বীপ থানা		
মন্মথপুর	—	আটেশ্বর, শিব, নয় শীতলা, পাঁচ মনসা
সীতারামপুর	—	পঞ্চানন, বিশালাক্ষী, হরিদেবতা
মাধবনগর	—	শ্রীকৃষ্ণ, গাজী সাহেব, পঞ্চানন্দ, মনসা, শীতলা
মনিপুর	—	গঙ্গা দেবী, পঞ্চানন্দ, শিব, বিবিমা, গাজী, দক্ষিণরায়
মৃণালনগর	—	বিশালাক্ষী, চণ্ডী, শীতলা, পঞ্চানন্দ, মনসা
জটার দেউল	—	শিব
নামখানা (ফ্রেজারগঞ্জ)	—	গঙ্গা, বিশালাক্ষী

স্থান নাম		লৌকিক দেব-দেবী
● সাগর থানা		
সাগরদ্বীপ	—	গঙ্গাদেবী, কপিলমুনি
শিলপাড়া	—	শিব, শীতলা, মনসা
মৃত্যুঞ্জয়নগর	—	শিব, রাধাকৃষ্ণ, মনসা, রামসীতা
সুমতিনগর	—	ঐ
মনসাদ্বীপ	—	দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ, শিব, শীতলা, মনসা
বেগুয়াখালী	—	শিব, বিশালাক্ষী, কালী, শীতলা, ধর্মরাজ, মনসা
চেমাগুড়ি	—	চন্দনেশ্বর, মহাদেব ঠাকুরজীউ, শীতলা, মনসা, দক্ষিণরায়, বিবিমা, বাবাঠাকুর
কোম্পানীচর (ঘাসপাড়া)	—	শিব
ধবলাট শিবপুর	—	শীতলা, রাধাকৃষ্ণ
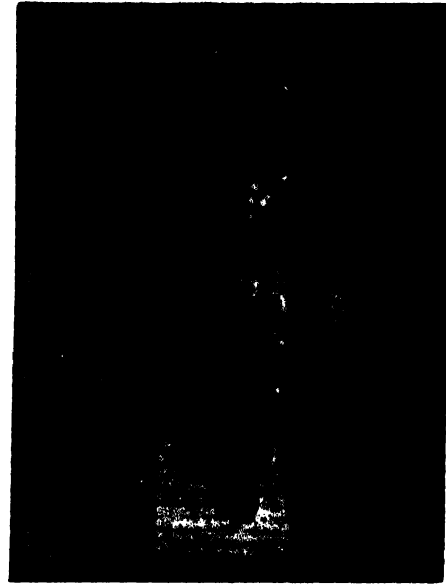
আটেশ্বর মূর্তি

বর্ণিত সারণিতে দেখা যাচ্ছে শিব, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, দক্ষিণরায়, বারা, ঘেঁটু/ঘন্টাকর্ণ, হাড়ি ঝি, মঙ্গল চণ্ডী, জয়চণ্ডী, কালুরায়, সিনি দেব, বনবিবি, বৃক্ষদেব, ধর্মরাজ, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, অসংখ্য পীর, গাজী, বেনাকী, মাকাল, ইতু লক্ষ্মী, বাউনী লক্ষ্মী, ঢেঁকি লক্ষ্মী, জলসী, পাঁচু ঠাকুর, টুসুলক্ষ্মী প্রভৃতি দেব-দেবীর অবস্থান সমগ্র জেলাজুড়ে। এখন প্রশ্ন হল—এতসব দেব-দেবীর প্রচলনের পেছনে উৎস ভাবনাটা কি?

পশুপালন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন কৃষি প্রচলন করল এবং আদিতে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ জীবন গড়ে তুলেছিল তারও পূর্বে আদিম সমাজে নৈসর্গিক বিপর্যয় ভীতি-বিহ্বল মানুষকে খাদ্য অন্বেষণের জন্য অস্থির করে তুলেছিল। সে কারণে প্রকৃতির প্রতি টান, প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের ভয়, খাদ্য সংগ্রহে বাধা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানলের দহন ভয়, প্রলয় প্রবল প্লাবন ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণাবর্ত, খাদ্য সঞ্চয় সংগ্রহের ব্যাপারে ভাবিত করেছিল। বিস্মৃত অতীত থেকে আজও মানুষের মধ্যে সঞ্চয় ও সংগ্রহের সেই আদিম নেশা, অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই মানুষের অন্তহীন প্রয়াস, প্রচেষ্টা। সঞ্চয় ও সংগ্রহের প্রবলতম প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রাচীন সভ্যতা। ইতিহাস আমাদের জানিয়েছে—সঞ্চয় ও সংগ্রহের তাগিদ আদিম মানুষকে গোষ্ঠীবদ্ধ করেছে। গোষ্ঠীজীবনের পথ বেয়ে ক্রম পর্যায়ে মানব সমাজ, সভ্যতা, জীবন, জীবিকা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম, বিশ্বাস, দেব-দেবী কল্পনা, পূজা-পার্বণ, উৎসব, মেলা সব কিছুর উৎপত্তি হয়েছে।

সারণিটি লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে সেখানে অসংখ্য দেবী ও দেব অর্থাৎ নারী দেবতা ও পুরুষ দেবতার নাম। কেন?

দেবী অর্থাৎ নারী দেবতা প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি অথর্ববেদের পৃথিবী সুক্তটি। সুক্তটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—'মা' হচ্ছে পৃথিবী। বিশ্বম্ভরা বসুন্ধরা এই পৃথিবী সুবর্ণবক্ষা, যাহা কিছু চলমান তার নিবেশিনী, যে ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে, ইন্দ্র যার ঋষভ সেই ভূমিমানুষ যাতে পায় কেননা এই ভূমি মানুষকে দুগ্ধ দান করবে যেমন মা তার সন্তানকে দুগ্ধ দান করে থাকেন, যেহেতু মানুষ পৃথিবীর সন্তান, মা-ই পৃথিবী, মা-ই মঙ্গলময়ী, কল্যাণময়ী, জগততারিণী, জগত পালিকা, বিপদতারিণী, মা-ই মানুষকে সু প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং দ্যুলোকের সঙ্গে মানুষকে শ্রী ও সম্পদ দান করতে পারেন।

পুরুষ দেবতা প্রসঙ্গে বলা যায়—ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। এক ব্রহ্ম থেকে সকল দেবতার সৃষ্টি প্রকাশ। সেই আদি ব্রহ্ম হলেন শিব যিনি সকল দেবতার অগ্রগণ্য। তিনিই জগত পিতা, জগতপালক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—সঞ্চয় ও সংগ্রহের কামনা সুখের নিমিত্ত। সন্তান-সন্ততির সুখ, সমৃদ্ধির জন্য মানুষের আকুলতা, ব্যাকুলতা, সুখ-সমৃদ্ধির চাওয়া। প্রতিধ্বনিত হয় দেবতা পূজার মাধ্যমে এবং চাওয়াটাই যাতে 'পাওয়া' হয়ে মানুষের [illegible] আসে তারই আকুলতা।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে একটু অন্য রকম ভাবা যেতে পারে। যে মূল শক্তি বিশ্ব চালিত করছে সেই আদি শক্তিকে মানুষ তার বোধ, প্রজ্ঞায় জানতে চায়। বুঝতে চায়, অনুভবে পেতে চায়, উপলব্ধিতে ধরতে চায়। সেই আদি শক্তির সঙ্গে নিজেকে মেলাবার একটা ইচ্ছা পোষণ করে নিজেরই অজান্তে। অর্থাৎ দুটি ক্ষেত্রেই চাওয়া এবং পাওয়ার জন্যই দেব এবং দেবীর ভাবনা। মানুষের সেই চাওয়া-পাওয়ার সূত্রেই আদি দেব-আদি দেবী এক থেকে বহুতে পরিণত হয়েছে মানুষের ভাবনা ও কল্পনায়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সমাজ জীবন মূলত গ্রামীণ। কৃষি-ভিত্তিক জীবন সমাজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঐতিহ্য। এ ভূখণ্ডের সমুদ্র, নদী, অরণ্য পরিবেষ্টিত অঞ্চলের কৃষিজীবী, অরণ্যজীবী, জলজীবী, মানুষ প্রতিনিয়ত মারি-মড়ক, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা প্রলয়, শ্বাপদ-সঙ্কুল প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করতে। প্রকৃতিক সম্পদই একমাত্র জীবন ধারণের রসদ। প্রকৃতিকে জয় করে প্রকৃতির দান গ্রহণ করার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চাই হাতিয়ার। সেই হাতিয়ার মানুষের মানসিক বল যা কিনা দেব নির্ভর। দেবতার ধ্যান, জ্ঞান, পূজার মাধ্যমে সেই মানসিক বল, শক্তি অর্জন করার জন্য মানুষ তার কল্পনার মানসে এঁকেছে এক-একটি শক্তির প্রতীক। উক্ত শক্তির প্রতীকগুলিই মানুষের সমাজ জীবনে প্রতিভাত হয়েছে পৃথক পৃথক লোক দেব-দেবী হিসাবে।

কৃষিজীবী, অরণ্যজীবী, জলজীবী মানুষ দক্ষিণ রায়, বনবিবি, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, কালী, শিব, চণ্ডী, পঞ্চানন, বারা, আটেশ্বর, ধর্মরাজ, শনি, লক্ষ্মী, রেনাকী, মাকাল, ঘেঁটু, কালুরায়, পীর বাবা, গাজীবাবা প্রভৃতিকে এক-একটি শক্তির আধার দেবতা হিসাবে কল্পনা করেছে এবং সেই কল্পনার দেবতাদের বাস্তবের মাটিতে নানা প্রতীকে মূর্ত করে তুলে প্রচলন করেছে ধ্যান, জপ, পূজা, আচার, উৎসব ও মেলার।

সবশেষে বলব, বাংলার কৃষিকেন্দ্রিক, অরণ্যময়, সমুদ্র-নদী পরিবেষ্টিত সমাজ জীবন যতদিন থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবে বাংলার লৌকিক দেব-দেবী। যতই উদারনীতির হাত ধরে বিশ্বায়নের পালাবদলের খেলা চলুক না কেন জল, মাটি, আগুন, অরণ্য, পাহাড় ছিল, আছে, থাকবে এবং এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত লৌকিক দেব-দেবীরাও থাকবে।

দ্বিতীয় পর্ব

লৌকিক পূজা-পার্বণ উৎসব ও মেলার ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশে বারো মাসে [illegible], এই পার্বণকে ঘিরেই মেলা বা উৎসব। দেবদেবী-পু[illegible] লৌকিক দেবদেবী নানান সামাজিক সংস্কারকে ঘিরেই [illegible] মিলন উৎসব।

কৃষিভিত্তিক দক্ষিণ চ[illegible] শস্য গবাদিপশু হাতে তৈরি দৈনন্দিন নানা ব্যবহার্[illegible] নদেনের সঙ্গমস্থল হল মেলা। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা[illegible] প্রাচীন। আদিগঙ্গার দুই তীরবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন সম[illegible] তার বিস্তার ঘটেছিল। গঙ্গারিডি জাতি, গঙ্গাসাগর [illegible] একসময়কার সমৃদ্ধ বন্দর। এককালে বাঙালি [illegible] করত এই পথ ধরে। সমুদ্রকূলবর্তী নদীবেষ্টিত এ অঞ্চল ইতিহাসের নানা প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবর্ণের মানুষের মিলনক্ষেত্রও বটে।

এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন মেলা হল 'গঙ্গাসাগর'। এর পরেই ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ শিবের মেলা বা চক্রতীর্থের মেলা। বাদবাকি অন্য মেলাগুলির জন্ম মুসলমান রাজত্ব এবং তার পরবর্তী সময়ে।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মেলাগুলিকে বিভিন্ন লোকাচারের ভিত্তিতে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন:—

১। সূর্যোৎসব— (ক) গাজন, (খ) চড়ক সংক্রান্তি, (গ) নীল-দেল, (ঘ) নববর্ষ।
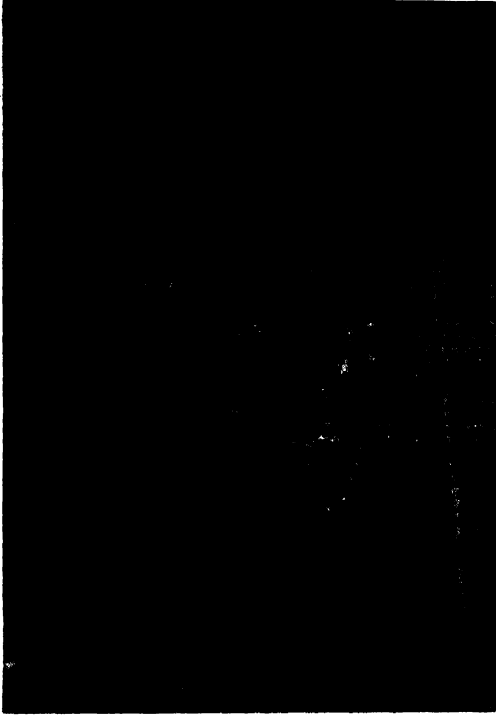
বনবিবি

২। ধরিত্রী পূজা—(ক) চণ্ডী পূজা, (খ) অম্বুবাচী, (গ) লৌকিক চণ্ডী পূজা ইত্যাদি।

৩। কৃষি উৎসব—(ক) নবান্ন, (খ) মাঙন, (গ) পৌষসংক্রান্তি।

৪। শস্য দেবতার উৎসব—(ক) কোজাগরি লক্ষ্মী, (খ) ভাঁজো, (গ) ক্ষেত্রঠাকুর, (ঘ) কাউয়াপীর, (ঙ) বেনাকি।

৫। বৃক্ষ দেবতা পূজা—(ক) বড় কাছারি, (খ) ছোটকাছারি, (গ) বটপাকুড়ের বিয়ে।

৬। গঙ্গাসহ নদনদী পূজা ও স্নান—(ক) গঙ্গা পূজা, (খ) নন্দাস্নান, (গ) বারুনিস্নান, (ঘ) বদরপীর।

৭। বিভিন্ন পশু-পাখি ও তার দেবতা—(ক) সাপ ও তার দেবতা (মনসা), (খ) বাঘ ও তার দেবতা (দক্ষিণ রায়, বনবিবি) (গ) কুমির (কালু খাঁ)।

৮। বিভিন্ন রোগশোক ও তার দেবতা—(ক) শীতলা (বসন্ত), (খ) ঘেঁটু দেবতা (খোস পাচড়া) (গ) ওলাবিবি (কলেরা) মড়িবিবি।

৯। হিন্দু গুরু-কেন্দ্রিক উৎসব—(ক) বৈষ্ণব-বাউল।

১০। মুসলমান গুরু-কেন্দ্রিক মেলা—(ক) পীর-গাজী-বিবি।

১১। মিলিত দেবদেবীর পূজা—(ক) সত্যপীর, (খ) মানিকপীর, (গ) বামনগাজী।

১২। আদিবাসী সংস্কৃতি ও মেলা—(ক) ভাদু-টুসু।

১৩। লৌকিক দেবদেবী পূজা—(ক) ধর্মপূজা—পাঁচুঠাকুর, রাখালঠাকুর।

১৪। হিন্দু পূজা ও উৎসব—(ক) দুর্গা, (খ) কালি, (গ) লক্ষ্মী, (ঘ) রাস, (ঙ) দোল, (চ) রথযাত্রা।

১৫। মুসলমানদের পরব—(ক) মহরম, (খ) ঈদ।

১৬। আধুনিক মেলা বা বাণিজ্যিক মেলা—(ক) বইমেলা, (খ) গ্রামীণ মেলা, (গ) শিল্পমেলা, (ঘ) কৃষিমেলা, (ঙ) নাট্যমেলা।

সূর্যোৎসব

দক্ষিণ ২৪-পরগনার সর্বত্র শিবের থান ও মন্দির দেখা যায়। 'ধান ভানতে শিবের গীত' কথাটা এ অঞ্চলের প্রবাদ। অনার্য শিব তাই কৃষিজীবী ব্রাত্য মানুষের দেবতা।

হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সীলমোহরে এ দেবতার দেখা পাই। আবার প্রাচীন মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নে ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছে শিবের কীর্তি কাহিনী। পুরাণ বর্ণিত ম্লেচ্ছ দেশের নিষাদ-শবর-কিরাত পুলিন্দ বা পুন্ড্র প্রভৃতি আদিম জনগোষ্ঠীর প্রাণের দেবতা তাই শিব। এই ধর্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছে নানা লোকাচার ও উৎসব যা বৃষ্টি ও শস্য উৎপাদনের প্রতীক।

চৈত্রের শেষে সংক্রান্তি। সে দিন সূর্য দ্বাদশ রাশির পথ ধরে ভ্রমণ শেষ করে। পরের দিন আবার সে পথেই নতুন করে যাত্রা শুরু করে। নতুন রাশিতে প্রবেশ করে। সূর্যের এই চক্রাকারে চক্রপথে আবর্তন করার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণ ২৪-পরগনার চড়ক-গাজন-নীল-দেল-নববর্ষ উৎসবগুলি।

লোককথা হল বা প্রচলিত বিশ্বাস যে এই দিনটিতে শিবের সঙ্গে নীল বা নীলচণ্ডিকার বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের বরযাত্রী হল চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ-সাত দিন আগে থেকে গৃহী থেকে রূপান্তরিত সন্ন্যাসী হওয়া মানুষজন।

এ সময় এ অঞ্চলের মানুষজন গেরুয়া ধারণ করে। একবেলা আহার করে। হাতে ত্রিশূল বা দণ্ড নেয়। সারাদিন জল পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ। আর এই সময়েই শুরু হয় গাজন গান, শিব মহিমা পালাগান। গাজনে শিবমহিমা ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ, সমসাময়িক নানা ঘটনা হাস্যরস-সহ পরিবেশন হয়। গ্রামের মধ্যে যেখানে মন্দির নেই, সেখানে অস্থায়ীভাবে শিবকে প্রতিষ্ঠা করে তৈরি করা হয় গাজনতলা।

চৈত্রের শেষ তিনদিনের প্রথম দিন হল বাবার মাথায় জল ঢালা। উঁচু বাঁশের মাচা থেকে ঝাঁপ দেওয়া।

দ্বিতীয় দিনে হয় নীলপূজা বা নীলের বাতি দেওয়া। আর তৃতীয় দিনে বা সংক্রান্তিতে আগুন ঝাঁপ, চড়ক বা বাঁশের মাথায় দড়ি বেঁধে ঘুরপাক খাওয়া। বানফোঁড়া বড়শি ফোঁড়া ইত্যাদি। আর সংক্রান্তির পরের দিন নববর্ষ। এই দিন নানা আচার-অনুষ্ঠানের শেষে বিকালে রাধাকৃষ্ণের পূজা ও গোষ্ঠ মেলা।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মেলাগুলিকে নিয়ে আমরা একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করেছি সেখানে এই জেলার মোটামুটি সব মেলার কথা উল্লেখ থাকছে। এখানে শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মেলাগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হল।

সূর্যোৎসব কেন্দ্রিক চৈত্র মেলাগুলির মধ্যে রয়েছে ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ শিবের মেলা হাউড়িহাটের মেলা, মন্দিরের বাজারের মেলা জয়রামপুরের মেলা, পাইকানের বুড়ো শিবের মেলা, জটার দেউলের মেলা ইত্যাদি বিখ্যাত।

ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ শিবের মেলা

আগেই বলেছি দক্ষিণ ২৪-পরগনার প্রাচীন মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম এই মেলা। মধ্যযুগে বাঙালি বণিকরা আদিগঙ্গার এই মোহনায় পূজা দিয়ে বাণিজ্য যাত্রায় যেত। গুপ্ত-পাল যুগেও এ অঞ্চল দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রমাণ মেলে।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মধ্যযুগের কাব্য ও সাহিত্যে নানা পৌরাণিক গ্রন্থে এ অঞ্চলের উল্লেখ আছে।

ভগীরথ এ পথেই গঙ্গাকে নিয়ে আসেন। চক্রতীর্থ নামে বিখ্যাত তীর্থ আজও বর্তমান। চৈতন্যদেব সপার্ষদ এখানে থেকে পাড়ি দিয়ে নীলাচল (পুরী) গমন করেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ মন্দিরের জন্য জমি দেন বরদাকান্ত রায়চৌধুরিকে। একসময় আদিগঙ্গা প্রবাহিত হত এ মন্দিরের কাছ থেকে। মন্দিরের কাছের পুকুরটি শিবগঙ্গা নামে খ্যাত। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে শুরু হয় 'নন্দাস্থান' বা 'জাত'। প্রতিপদ-ষষ্ঠী-একাদশী এই তিন তিথিকে একত্রে নন্দা বলা হয়ে থাকে। এই সময় শিবপুকুরে নিঃসন্তান মেয়েরা পুত্রের আশায় ডাব ভাসায়। শিবরাত্রি ও চড়কে মেলা বসে। বৈশাখের ১০ তারিখে মন্দিরের সামনে বসে গোষ্ঠের মেলা। রামায়ণে বর্ণিত অন্ধমুনির মেলা বসে চক্রতীর্থে। এখানে অন্ধমুনির আশ্রম ছিল কোনও এককালে। তিনি নাকি অন্ধ মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন বলে শোনা যায়।

কথিত আছে মাতৃহত্যার পাপে পরশুরাম হাতের কুঠার নামাতে পারছিলেন না। পুষ্করে স্নান করে নামে হাতের কুঠার, আর চক্রতীর্থে স্নান করে জুড়ান মনের জ্বালা। পৌষ-সংক্রান্তি সেই উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এ মেলা অন্ধমুনির মেলা নামে খ্যাত। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে মথুরাপুর স্টেশনে নেমে বাসে বা অটোয় এখানে যাওয়া যায়।

মন্দিরের বাজারের মেলা

ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় মন্দির বাজার একটি থানা। এখানকার শিব কেশবেশ্বর নামে খ্যাত। এটি পত্তন করেন জমিদার কেশব রায়চৌধুরি। এর বয়স প্রায় আড়াইশ বছর। অপুত্রক জমিদার পুত্রের আশায় এ মন্দির নির্মাণ করেন।

চৈত্র মাসে গাজন উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হন। চড়ক-গাজন গোষ্ঠ এই উপলক্ষে সাত-আট দিন মেলা হয়।

এ মেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঝাঁপের আগে দুটি শঙ্খচিলকে মন্দিরের মাথায় এসে বসে থাকতে দেখা যায়। মেলা উপলক্ষে মাটির পুতুল হাঁড়ি-খুরি-সরা-মাদুর-তালপাখা-চাটাই ও কাঠের নানা জিনিসপত্র বিক্রি হয়। ডায়মন্ডহারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন থেকে বাসে এখানে যাওয়া যায়।

বোলসিদ্ধির মেলা

ডায়মন্ডহারবার থানার একটি গ্রাম এটি। শিয়ালদহ ডায়মন্ডহারবার রেলপথে গুরুদাস নগর স্টেশন থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে এই গ্রা...

বাকসিদ্ধ এক সন্ন্যা... ...ন। তিনি এখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। স্যার ... ...ধ্যায়ের বাড়ি এই গ্রামে।

আঠাশে চৈত্র এখা... ...এই মেলার বৈশিষ্ট্য হল 'বাণফোড়া' উৎসব। শতা... ...য় ঠোঁটে বগলে বাণ ফুঁড়ে পাশের গ্রামে মঙ্গলচণ্ডী... ...িতে যায়।

জয়রামপুরের মেলা

বিষ্ণুপুর থানার প্র... ...আমতলা থেকে চড়িয়াল-বজবজ বাস রাস্তার গা... ...জয়রাম হালদার প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে চৈত্র সংক্রা... ...ল মেলা বসে। দূর-দূরান্ত এমনকি পাশের জেলা হা... ...বসিরহাট থেকে লোকজন আসে। মেলা শুরু হয় ...

এই মেলার বয়স ... মেলা উপলক্ষে পুতুলনাচ, কবিগান, তরজা, গাজন, ... বসে।

ধর্মঠাকুর

এছাড়া উল্লেখযোগ্য চৈত্র মেলার মধ্যে আছে বিড়লাপুরের পাইকানের বুড়োশিবের মেলা, হাউড়ি হাট (মন্দিরের বাজার থানা) মেলা। দক্ষিণ বারাসতের (দঃ বারাশত স্টেশনের কাছে) আদ্যমহেশের মেলা, দক্ষিণ রায়ের একশত মুন্ড পূজা থেকে এ নামের উৎপত্তি। এটি বহু প্রাচীন মেলা। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এ অঞ্চলের উল্লেখ আছে। মগরাহাট থানার গাড়দা বা গাড়েশ্বর মেলা। সোনারপুর থানার তাড়দার মেলা উল্লেখযোগ্য। এ মেলায় ভূতের 'ভাত বাড়া' অনুষ্ঠানে পোড়া শোলমাছ, মদ, গাঁজা ইত্যাদি পূজা উপকরণ দেওয়া হয়। বজবজ থানার রসুলপুরের চৈত্র মেলাটিও বহু প্রাচীন। এখানে প্রচুর লোকজন আসে। এর বয়স ২০০ বছর। দক্ষিণ ২৪-পরগনার সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির 'জটার দেউলে'ও শিবের মেলা বসে। এটি কুলতলী থানার মধ্যে পড়ে। মথুরাপুর স্টেশন থেকে বাসে রাইদিঘিতে নেমে হেঁটে বা নৌকায় করে এখানে যাওয়া যায়।

কলকাতার গা ঘেঁসা সোনারপুর, কসবা, গড়ফা রামলাল বাজারেও এককালে বিরাট বিরাট মেলা বসত। বর্তমানে সেগুলো মৃতপ্রায়। নগরায়ণ বিশ্বায়নের থাবায় হারিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় মানুষজন এবং তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি। তবু গ্রামের গরীব খেটে-খাওয়া মানুষরা এখনও মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। তাই দক্ষিণ ২৪-পরগনার সর্ববৃহৎ উৎসব হল এই চৈত্র উৎসব বা শিবের গাজন। এ অঞ্চলের প্রতিটি অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে চৈত্র মাসে মেলা বসে জাতপাতের বেড়া ভেঙে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এতে যোগ দেয়।

ধরিত্রীপূজা

হিন্দু দেবী এবং তার তান্ত্রিক প্রভাবে ধরণীকে দেবীরূপে কল্পনা করে নানা পূজা পদ্ধতি চালু আছে। কেউ কেউ বলেন এর সঙ্গে বৌদ্ধ

দেবদেবীর মিলমিশ হয়ে সৃষ্টি করেছে নানা লৌকিক দেব-দেবী। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে চণ্ডী পূজা ও নানা লৌকিক চণ্ডী দেবী। যেমন ঢেলা চণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, জয়চণ্ডী, বিপদতারিণী চণ্ডী। অম্বুবাচী ইত্যাদি। বাংলা মঙ্গল কাব্যে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী মধ্যে এই দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এই দেবীর কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নানা মেলা-পার্বণ।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিখ্যাত চণ্ডীমেলাগুলির অন্যতম হল বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরিদের চণ্ডীর মাঠে চণ্ডীর মেলা। এটি প্রায় দু'শ বছরের পুরানো। বিষ্ণুপুর থানার জয়চণ্ডীপুরে দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মূর্তি আছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এতে যোগ দেয়। এছাড়া পৌষ মাসেও এখানে মেলা হয়।

সোনারপুর সুভাষগ্রাম স্টেশনের মাঝখানে হাড়িঝি চণ্ডী বর্তমান। এ অঞ্চলকে বলা হয় হাড়িঝিচণ্ডীর মাঠ। পৌষমাসের শুক্লপক্ষে এখানে মেলা বসে।

জয়নগর রেল স্টেশনের কাছে চণ্ডীতলায় আছে 'জয়চণ্ডী'র মন্দির। এই দেবী নাম থেকেই 'জয়নগর' নামের উৎপত্তি। 'গুণানন্দ মতিলাল' এর প্রতিষ্ঠাতা। দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমা থেকে প্রতিপদ পর্যন্ত পনেরো দিন মেলা চলে। দেবীর বেশ পরিবর্তন হয়। কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার লোক আসে। এ মেলাকে অনেকে বেশের মেলা বলে। বেহালার চণ্ডীতলায় চণ্ডী পূজা ও মেলা বহু প্রাচীন। সোনারপুর থানার রাজপুরে আষাঢ় মাসে রথের পরের সপ্তাহে শনি বা মঙ্গলবার হয় বিপদতারিণী চণ্ডী। কুলপী থানার কাঁটাবেনিয়া গ্রামে বিশালাক্ষী মেলাও খুব বিখ্যাত।

কৃষি উৎসব

বর্ষার পর ধান ওঠাকে কেন্দ্র করে নানা উৎসব ও মেলা হয়। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় বিখ্যাত পরবগুলি হল নবান্ন, পৌষসংক্রান্তি, মাগুন ইত্যাদি। এ উৎসবের সবচেয়ে বড় মেলা হল গঙ্গাসাগরের মেলা। এই দিন এ অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন নদী ও পুকুরে স্নান ও তর্পণ করে। পূজা উপলক্ষে নদীর ধারে মেলা হয়।

গঙ্গাসাগর মেলা

এ পরগনার সবচেয়ে প্রাচীন মেলা। দক্ষিণের শেষ ভূখণ্ডে সাগরের তীরে সাগর দ্বীপ। এখানেই গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল।

মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সারা ভারতের নানা বর্ণ ও ধর্মের মানুষ এখানে জমায়েত হয়। স্নান করে। সঞ্চয় করে পুণ্য। দশ থেকে বারো লক্ষ মানুষ আসে প্রতিবছর। ডায়মন্ডহারবার স্টেশন থেকে চৌষট্টি কিলোমিটার দূর। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে ডায়মন্ডহারবার বা লক্ষ্মীকান্তপুর বর্তমানে নতুন রেল স্টেশন 'নিশ্চিন্তপুর' নেমেও বাসে করে হার্ডউড পয়েন্ট (কাকদ্বীপ)। ওখানে থেকে লঞ্চে করে নদী পেরিয়ে কচুবেড়ে। সেখান থেকে বাসে বা হাঁটা পথে মেলায় যাওয়া যায়। তিন চাকার ভ্যানও চলে।

নৌকা-স্টীমার দ্বারা বহুমানুষ নদীপথ ধরে মেলায় আসে। আগে নদীপথেই সবাইকে এ মেলায় আসতে হত। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এ পথের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে।

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে এ তীর্থের নানা বিবরণ পাই। যুধিষ্ঠির ও তীর্থে স্নান করেছিলেন মহাভারতে উল্লেখ আছে।

নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ অঞ্চল একসময় বনময় হয়ে যায়। সুন্দরবন এসে গ্রাস করে। বাঘ-সাপ-জলদস্যুদের ঘাঁটি হয়। ইংরেজ আমলে সাগরদ্বীপে নতুন করে জনবসতির পত্তন হয়। কামান দেগে বাঘ তাড়িয়ে মেলা বসানো হত। নৌকা করে আসার সময় বহু মানুষ সামুদ্রিক ঝড়-তুফানে প্রাণ হারাত। আর এই দুর্গমতার জন্যেই—'সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার'।

মহামুনি কপিলের আশ্রম ছিল সাগরদ্বীপে। আজো তার মূর্তি পূজিত হয় এখানে। ইনি ছিলেন সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা। কোনও এক সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বোধহয় সিন্ধু গঙ্গার সমভূমি মরুময় হয়ে যায়। গঙ্গা হারিয়ে ফেলে সমুদ্রের পথ। এ সময়ে সগররাজ আয়োজন করেন অশ্বমেধ যজ্ঞের। একে কেন্দ্র করে কপিলের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। সগরের ষাট হাজার পুত্র বা সৈন্যসামন্ত ধ্বংস করে দেন। সগরের উত্তরপুরুষ ভগীরথ মহামুনি কপিলের সাহায্যে গঙ্গাকে একটি ধারায় প্রবাহিত করেন। শুধু ষাট হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ বেঁচে

মকর সংক্রান্তিতে কপিল মন্দিরে দর্শনার্থী ও সাগর স্নান

মানিক পীর
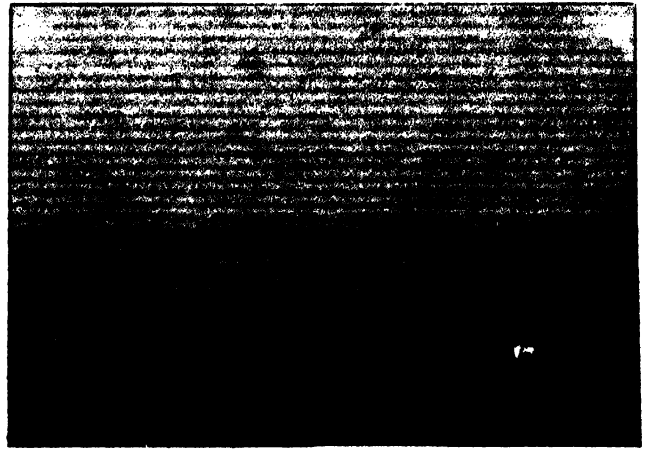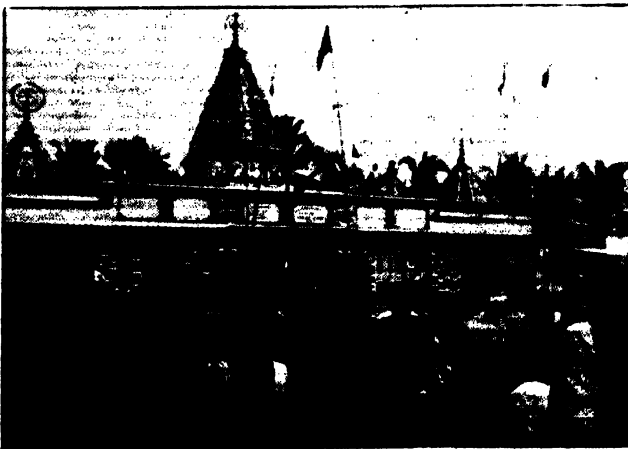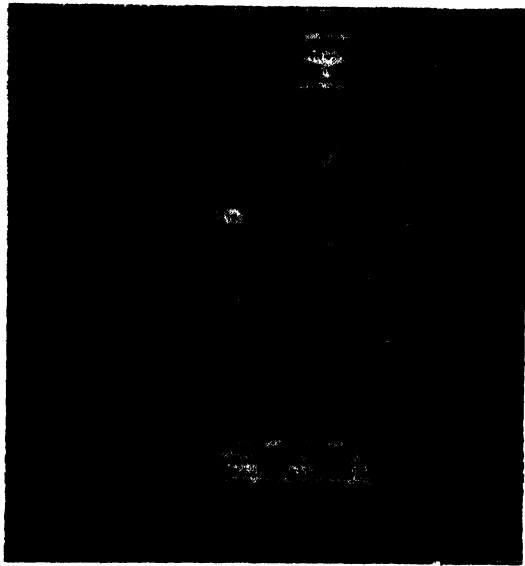
যায়। কারণ শুদ্ধ জল পেয়ে এ অঞ্চল আবার সুজলা-সুফলা হয়ে ওঠে এবং আমরা এখনও বেঁচে আছি এই গঙ্গার দয়ায়।

ভগীরথ ও কপিলের এ যুগলবন্দী কীর্তিকে আজও সম্মান জানায় ভারতবর্ষের অগণিত মানুষজন। সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে স্নান করে। পূজা দেয়। স্মরণ করে পুণ্যাত্মাদের।

শ্বেতদ্বীপের রাজা মাধব এখানে একটি বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেছিলেন বলে কথিত আছে। এছাড়া টলেমির বিবরণে গঙ্গাবন্দরকে কেন্দ্র করে গঙ্গারিডি জাতির উল্লেখ পাই। সে সব হারিয়ে গেছে, সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়েছে সব। বর্তমানে কপিলমুনির আশ্রমটি'ও নতুন করে তৈরি। গঙ্গাসাগরে বর্তমানে যে মন্দিরটি আছে সেখানে শিলায় খোদিত তিনটি মূর্তি বর্তমান। গঙ্গা-কপিল এবং সগরের। বর্তমানে এটির মালিকানা অযোধ্যার হনুমানগড়ি মঠের রামানন্দ পন্থী সাধুদের।

এখন এ মেলার দায়িত্বভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে অস্থায়ী আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন এঁরাই। সরকারি থানা-পুলিশ-হসপিটাল-ডাকঘর সবই [illegible] হয়। বালির উপর হোগলা দিয়ে ঘর ভাড়া পাওয়া [illegible] পানীয় জল বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। সাগরদ্বী[illegible] আশ্রম স্থায়ীভাবে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। ভারতসেবা[illegible] অতিথি নিবাসটি'তে সারাবছর যাত্রী যাতায়াত করছে[illegible] সরকারেরও অতিথি নিবাস বর্তমান। এছাড়া সৎস[illegible] স্থায়ীভাবে আশ্রম গড়ে তুলেছেন। এ অঞ্চলের [illegible] বড় উপার্জনের পথ হল এই মেলা। ডাব-নারকে[illegible] তো আছেই। এছাড়া বেতের লাঠি ও বেতের নানা [illegible] তালের লাঠি, কাঠের নানা আসবাব-পত্র বিক্রি ক[illegible]

নৌকা ভাড়া দি[illegible] পার করে। অনেকে গরু নিয়ে আসে। 'বৈতরণী পার' [illegible] ধরিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করায়। এছাড়া শাঁখা-সিঁদুর-চুড়ি [illegible] অনেকে পয়সা উপার্জন করে। হোটেল চা পানের দো[illegible] লাভ হয়। অনেকের কাছে সারাবছরের রোজগা[illegible] মেলা। তাই তারা পথ চেয়ে থাকে কবে আসবে [illegible]

বৃক্ষপূজা

দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষকে দেবতা হিসেবে পূজার চল বর্তমান। কোথাও কোথাও বট-পাকুড়ের বিয়ে দিয়ে পূজা হয়। আগেকার দিনে বট-অশ্বত্থের সঙ্গে অনূঢ়া মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। কমলকুমার মজুমদারের 'সতী' গল্পে এ কাহিনী আছে।

আবদুল জব্বারের ছোট গল্পে দেখা যায় এমন একটি বৃক্ষের কথা। সেখানে মানুষ যা প্রার্থনা করে তাই মেলে। সাধারণের ধারণা বৃক্ষের বাস করা অপদেবতাই মানুষের প্রার্থনা পূরণ করে।

গাছের ডালে ঢিল বাঁধে। মানত করে। দণ্ডী কাটে। এই দেবতার কোনও পৌরাণিক পূজাবিধি নেই। নেই কোনও জাতি-ধর্ম-বর্ণ। সকল ধর্মের বর্ণের মানুষ সহজেই আসে পূজা দিতে প্রার্থনা জানাতে।

বাখরারহাটের বড় কাছারির মেলা

বিষ্ণুপুর থানার 'ঝিকুড়বেড়' গ্রামে এমনিই একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এই কাছারি। সন্তানহীন নারী-পুরুষ এখানে ঢিল বাঁধে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে।

উদয়রামপুরের ছোট কাছারির মেলা

'কেদার'নাথের এক সাধু প্রোথিত বটবৃক্ষের এ রকম দৈবী-ক্ষমতা বর্তমান। এটি ডায়মন্ডহারবার থানার অন্তর্গত। বৈশাখ মাসে মেলা বসে।

গঙ্গাসহ নদনদী পূজা ও স্নান

ডায়মন্ডহারবার থানার কুলটিকুরি গ্রামে চৈত্রমাসে বসে বারুণি স্নান। এটি বেশ বড় মেলা। তিন দিন ধরে মেলা চলে। পৌষ সংক্রান্তিতে মথুরাপুর থানার 'চক্রতীর্থে' মেলা বসে। মেলা বসে জয়নগর থানার 'বহড়ুতে' এতেও প্রচুর লোকসমাগম হয়। ফলতা থানার জগন্নাথপুর গ্রামের গঙ্গাপূজা ও স্নান উৎসবের মেলাটি একশ বছরের পুরানো।

মানুষের বিশ্বাস এ সমস্ত সংক্রান্তিতে পুণ্যাত্মাদের আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীতে। স্নানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ঐশি সম্পর্ক ঘটে। নানা রোগ ও শোকের যন্ত্রণা দূর হয়। মানুষ নবজন্ম পায়।

বিভিন্ন পশু-পক্ষী ও তার দেবতা

গ্রামের পশুরক্ষক দেবতা হল আটেশ্বর। এর বর্ণ নীল, মাথায় পাগড়ি। মাথার চুল ঝাঁকড়া। মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুরের কাছে বাবা আটেশ্বরের থান। এটি আটেশ্বরতলা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে মাঘ-ফাল্গুন মাসে মেলা বসে। এছাড়া মৎস্যজীবীদের দেবতা হল 'মাকালঠাকুর'। এই দেবতার পূজা ও মেলা বসে নদী বা পুকুরের ধারে। গোসাবা থানার বালি বিজয় নগর গ্রামে প্রতিবছর শ্রীপঞ্চমীতে মাছধরার প্রতিযোগিতা ও উৎসব পালিত হয় এ পূজা উপলক্ষে। মগরাহাট থানার 'বামনগাজী' গ্রামে মাঘ মাসে বসে মনিকপীরের মেলা। এই পীর হ'লেন গোবদ্যি বা গোরুর দেবতা।

পৌষ-সংক্রান্তি ও পয়লা মাঘে বারুইপুরের ধপ্‌ধপি স্টেশনের কাছে ধপ্‌ধপি গ্রামে বাঘের দেবতা 'দক্ষিণ রায়ের' পূজা উপলক্ষে 'জাঁতাল'এর মেলা বসে। দক্ষিণ ২৪-পরগনার অন্যতম লোকদেবতা হল এই দেবতা। এর কাটা মুন্ডু বারা দেবতা হিসেবে বাস্তুপূজায় লাগে। এখানেও বিভিন্ন রোগের ওষুধ দেওয়া হয়। রক্তন গাজী বা রক্তের দেবতা—এই গাজীর পূজা বা হাজ্য উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪-পরগনার উস্থি থানার গোলাবাড়ি গ্রামে ১লা মাঘ মেলা বসে। সোনারপুরে এই গাজীর থান বর্তমান এখানেও মাঘ মাসে মেলা বসে।

এছাড়া কুমিরের দেবতা হলেন কালু খাঁ। তবে এই দেবতা-পূজা উপলক্ষে কোনও মেলা বা উৎসব তেমন চোখে পড়ে না।

সাপ ও মনসা

জল ও জঙ্গলে ঘেরা দক্ষিণ ২৪-পরগনায় সাপের উৎপাত খুব বেশি। বর্ষার সময় প্রতিবছর বেশ কিছু মানুষ সাপের কামড়ে মারা যায়। হসপিটাল থাকলেও দূরত্ব এবং অবহেলায় যথাযথ চিকিৎসা হয় না। অগত্যা স্মরণ নিতে হয় সাপের দেবী মা 'মনসা'র।

মনসামঙ্গল কাব্যে এ দেবীর নানা মহিমা আমরা পাই। সাপের মতনই হিংস্র কুটিল নির্দয় এ দেবী। তাই মানুষ এ দেবীকে ভয় পায়।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার প্রায় সর্বত্র এ দেবীর থান পাওয়া যায়। কোথাও মূর্তি আছে, কোথাও তাও নেই। কাঁটাওয়ালা ফণীমনসার ঝোপকেই মনসার থান বানিয়ে সেখানে পূজো উৎসব পালন হয়। এ পূজার অন্যতম উপাচার হাঁস বা হাঁসা বলি দেওয়া।

মহেশতলা থানার কেয়াতলা গ্রামে মনসা পূজা উপলক্ষে মনসাদাঁড়ির মেলা বসে। মেলা বসে পাথরপ্রতিমার কামদেবপুর গ্রামে।

তবে দক্ষিণ ২৪-পরগনার একদম দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে এ দেবীর পূজা একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। মনসার জাত উপলক্ষে আদিবাসীগণ মনসার ডাল বেদিতে বসিয়ে গান গায়। এ ধরনের গানকে ঝাঁপান গান বলে। মনসার সবচেয়ে বড় মেলা বসে কচুখালির হরিশপুর গ্রামে। এটি গোসাবা থানার অন্তর্গত। এ উপলক্ষে নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা হয়। ভারতবর্ষে কেরালাতেও এ ধরনের বাইচ উৎসব হয়।

গঙ্গা পূজা
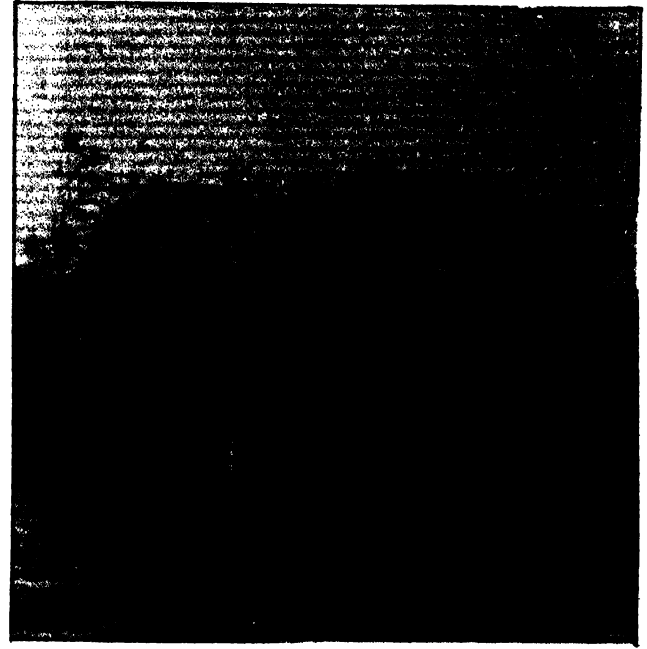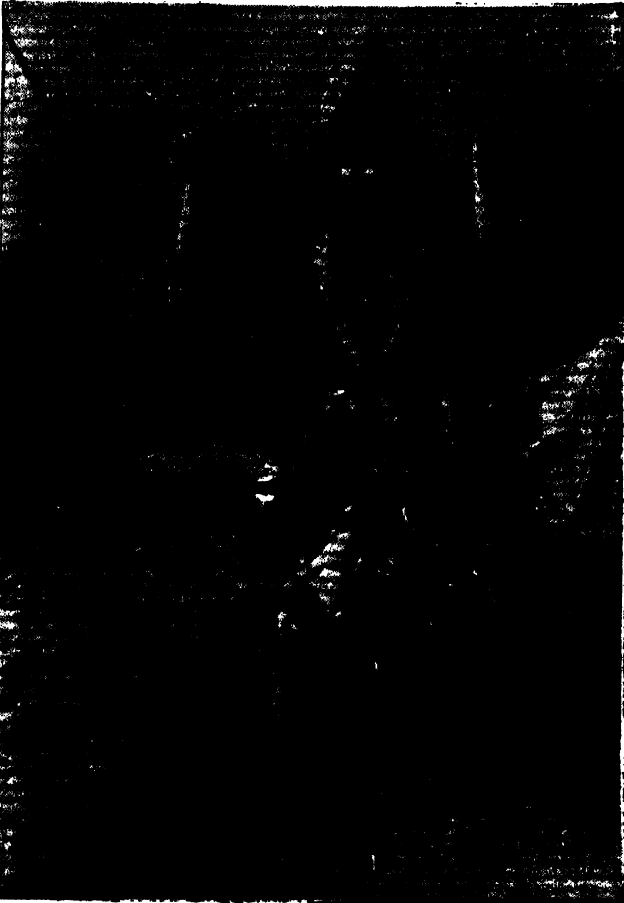
বনের অভ্যন্তরে বনবিবি পূজা

দুর্গাবাবাজির মনসামেলা বসে রাধানগরে। মৃত-অর্ধমৃত সাপে কাটা রুগিকে নাকি এ দিন এ অঞ্চলের ওঝারা জীবন দান করে। এ পূজার প্রসাদ হল কচুর শাক এবং পান্তাভাত।

বিভিন্ন রোগশোক ও তার দেবতা

দক্ষিণ ২৪-পরগনায় বিভিন্ন রোগ ও তার নিরাময়কল্পে হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন দেবদেবী। যেমন বসন্তের সেকালে কোনও ওষুধ ছিল না হাজার হাজার মানুষ মারা যেত এ রোগে। রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য সৃষ্টি হয় নতুন দেবতা 'শীতলা'।

বাসন্তী থানার ভারতগড়ে ফাল্গুন মাসে সাত দিন ধরে বিরাট শীতলা মেলা হয়। প্রচুর লোকজন আসে। ভাদ্রমাসে কুলপী থানার অশ্বত্থতলা গ্রামে শীতলা মেলা বিখ্যাত। ক্যানিং থানার তালদি গ্রামেও এই মেলা হয়। বজবজের কীর্তনখোলায় এর পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সরস্বতী পূজার পর দিন শীতল-ষষ্ঠী নামক ব্রতও পালিত হয়। এই পূজার প্রসাদ হল পান্তাভাত। শিব এবং চণ্ডীর পর শীতলা হল দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম দেবী।

হিন্দু গুরুকেন্দ্রিক পূজা ও উৎসব

প্রখ্যাত হিন্দু গুরু বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সাধু-সন্ন্যাসীদের স্মরণ করে নানা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আদিগঙ্গার পথ ধরে শ্রীচৈতন্যদেব একসময় নীলাচলে যাত্রা করেছিলেন। যাত্রাপথে তিনি যে সমস্ত অঞ্চলে পদার্পণ করেছিলেন সে সব অঞ্চলে আজও তাঁর স্মরণে মেলা বসে। যেমন গড়িয়ার কাছে বৈষ্ণবঘাটা কীর্তনখোলা ছত্রভোগ ইত্যাদি। মথুরাপুর থানার 'কৃষ্ণচন্দ্রপুরে' পৌষমাসে চারপাঁচ দিন ধরে 'নামসংকীর্তনের' মেলা বসে। ছত্রভোগেও এই রকম মেলা বসে। কাকদ্বীপের সীতারামপুরে ফাল্গুন মাসে 'মহোৎসব' এর মেলা বসে।

মাইবিবি *ছবি : জয়ন্ত হালদার*

ফাল্গুন চৈত্র মাসে দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিভিন্ন গ্রামে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন ও পদাবলী কীর্তনের মেলা বসে। এগুলিকে মহোৎসব বা মোচ্ছব বলে। 'লক্ষ্মীপালা' কুলপী থানায় অবস্থিত একটি গ্রামে বৈষ্ণবদের সমাধিকে ঘিরে 'হরির মেলা' বহু প্রাচীন। এ উপলক্ষে 'হরির লুট' (বাতাসা ছড়ানো) নামকীর্তনের আসর বসে।

মুসলমান গুরুকেন্দ্রিক মেলা

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র এই দক্ষিণ ২৪-পরগনা মুসলমানরাও যেমন এই সব গুরুকে দেবতা হিসেবে মান্য করে। হিন্দুরাও তেমনই মানে।

এইসব গুরুদের মধ্যে প্রখ্যাত পীর মোবারক আলিগাজী বা বড় খাঁ গাজী, পীর ভাঙর সুলতান বা ভাঙড়পীর, পীর গোরাচাঁদ, একদিল শাহ ইত্যাদি।

বড়খান গাজীখাঁ

ঘুটিয়ারি শরিফ [illegible] ২[illegible]নার ক্যানিং থানার মধ্যে অবস্থিত। এখানেই আছে [illegible] মসজিদ ঘুটিয়ারি শরিফ স্টেশনের উত্তর গায়ে [illegible] হিন্দু ও মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। প্রবাদ ইনিও [illegible] দেবতা।

বারুইপুরের জমিদা[illegible] এই গাজীর জন্যে দরগাহ নির্মাণ ও জমি দান করে[illegible] এই [illegible] সঙ্গে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ের নানা সংঘাত শেষে [illegible]তায় মীমাংসা হয়। বনবিবি জহুরানামা পালায় এ ক[illegible]য়।

সাতই আষাঢ় থেকে [illegible] তিরোধান উৎসব ও মেলা বসে। সতেরোই শ্রাবণ [illegible] বসে। মেলা উপলক্ষে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ শিরণি [illegible]না পূরণের আশায় হাজার হাজার মানুষ জমায়েত [illegible] অম্বুবাচীর দিন খরার হাত থেকে এ অঞ্চলকে রক্ষা [illegible]চ্ছায় দেহত্যাগ করেন। এ উপলক্ষেও মেলা বসে।

মগরাহাট থানায় নাজরা গ্রামে ১লা মাঘ গাজী সাহেবের মেলা বসে।

বড়খাঁ গাজীর পরই বিখ্যাত গাজী হলেন ভাঙড়ের পীর-সুলতান সাহেব। শাঁক শহরের বামনপীর ও বামুনিয়ার পীর গোরাচাঁদ। প্রতিবছর ১৬ই চৈত্র পীরভাঙড়ের মেলা বসে। এছাড়া এঁর তিরোধান উপলক্ষে 'উরস মোবারক' মেলা বসে। শিয়ালদহ থেকে বাসে সোনারপুর এবং সোনারপুর থেকে বাস বা অটোতে এখানে যাওয়া যায়।

ভাঙড়ের মরীচা গ্রামে পীর ইসমাইলের সমাধিতে বিশে ফাল্গুন মেলা বসে। এই মেলাটি 'কালাচাঁদের' মেলা নামে খ্যাত।

এছাড়া বাসুনিয়া গ্রামে পীর গোরাচাঁদের মেলা বসে ১২ই ফাল্গুন। এ মেলায় রান্না করা মাংস, ভাত প্রসাদ হিসেবে উৎসর্গ করা হয়।

মল্লিকপুরের (স্টেশন) কাছে পীর হাবিব আবদুল্লা আল আতাশের দরগা। এখানে একটি গভীর জলাশয় ও কুয়ো বর্তমান। প্রবাদ খরায় শুকিয়ে যাওয়া অঞ্চলকে বাঁচাতে তিনি এই কুয়োটি স্থাপন করেছিলেন। এই কুয়োর জল খেলে পেটের যাবতীয় রোগ সারে। দূরদূরান্ত থেকে যাত্রী আসে; 'ফতেহা দোয়াজদাম' উপলক্ষে। পৌষমাসে মেলা বসে। সব সম্প্রদায়ের মানুষ এ মেলায় যোগ দেয়।

বিবিপূজা

এই দেবী মূলত প্রকৃতির দেবী বা অরণ্যরক্ষক দেবী। বাঘের পিঠে আসীন। জঙ্গলের মানুষ মাছ কাঠ মধু আনতে যাবার সময়

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মেলা

এই দেবীর স্মরণ নেয়। পাঁচ পীর আর সাত বিবির মধ্যে 'বনবিবি' সর্বাধিক পূজিত। ক্যানিং থানার কালিতলা গ্রামে মাঘ মাসে এঁর পূজা উপলক্ষে মেলা বসে।

কুলতলী থানার মইপিঠ গ্রামের কাছে সুন্দরবনের ভিতরে ঠাকুরান নদীর চড়ায় চৈত্রমাসে বনবিবির বিশাল মেলা বসে। মাঝে মাঝে এ মেলায় বাঘের উৎপাত ঘটে। এ মেলা দাউদের মেলা নামে খ্যাত। জ্যান্ত মুরগি মানত করে-জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া এ অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এছাড়া মাইবিবির হাট কাশীনগরে এর মূর্তি ও মন্দির আছে। অগ্রহায়ণ মাসে মেলা বসে।

মগরাহাট থানার আলিদায় বিবিমার মেলাও বিখ্যাত।

মিলিত দেবদেবীর পূজা ও মেলা

হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর মিলনে সৃষ্ট নতুন দেবতাকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নানা উৎসব ও মেলা। মানিকপীর, বামনগাজী, সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর এঁরাই হলেন এ অঞ্চলের প্রখ্যাত দেবদেবী। এছাড়া বদরপীর-কাউয়াপীর এঁরাও সর্বত্র পূজিত।

মানিকপীর—ইনি হলেন গোরুর দেবতা বা গোবদ্যি বাবা 'মুসকিল আসান কর দয়াল মানিক পীর' এককালে এ গানটি দক্ষিণ-বঙ্গের ঘরে ঘরে শোনা যেত। বর্তমানে আধুনিক ভেটেনারি ডাক্তার এ এলোপ্যাথিক ওষুধের প্রভাবে এঁদের গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। যাদবপুরে এককালে এঁর পূজা ও মেলা বসত। বর্তমানে মগরাহাট থানার ধনিরামপুর গ্রামে মাঘমাসে এর থানে মেলা বসে।

বামনগাজী

কুলপি থানার দয়ারামপুর গ্রামে এই পীরের অবস্থান। দুই ধর্মের মানুষ এখানে আসে মোরগ-বাতাসা মানত করে। মন্ত্রপূত তেল ও জল ঘটে ভরে বাড়ি নিয়ে যায়। যে কোনও রোগে এই তেল ও জল অব্যর্থ ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করে। বিভিন্ন মাসে এখানে মেলা ও পরব অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন থেকে বাস বা ভ্যানে দয়রামপুরের মোড়। সেখান থেকে হেঁটে বা ভ্যানে এখানে যাওয়া যায়। মেলা ও মানত উপলক্ষে সাধারণ মানুষ এর মূর্তি বা 'ছলন' দেয়। এই পূজা উপলক্ষে এ অঞ্চলে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। এছাড়া মগরাহাট থানায় আলিদা গ্রামে এইরূপ প্রতিযোগিতা হয়। এছাড়া দক্ষিণ ২৪-পরগনার সোনারপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার এলাকায় মেলা উপলক্ষে ঘোড়দৌড় উৎসব লক্ষ্য করা যায়।

আদিবাসীমেলা

সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করার সময় বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর থেকে সাঁওতাল-মুন্ডা-ওরাঁও প্রভৃতি উপজাতির আদিবাসী মানুষদেরকে শ্রমিক হিসেবে আনা হয়েছিল। জঙ্গল হাসিলের পর এরা অনেকেই এই আদিম অরণ্যের মায়া এড়াতে পারেনি। অনেকে জমিজমা নিয়ে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

এই সমস্ত বাসিন্দারা স্থানীয় মানুষদের আচার-আচরণ ভাষা গ্রহণ করলেও পরবের সংস্কৃতিকে ভোলেনি। তাই পৌষসংক্রান্তি শ্রীপঞ্চমীতে এরা মেতে ওঠে ভাদু-টুসু পরব নিয়ে। হাড়িয়া খাওয়া আর মোরগের লড়াই নিয়ে।

গোসাবা থানার আমতলীতে সংক্রান্তির দিনে বসে 'টুসুর মেলা' মোরগের লড়াই। এ অঞ্চলের এটি সবচেয়ে বড় মোরগ লড়াইয়ের মেলা। কচুখালিতে সরস্বতী পূজার পরের দিন শুরু হয় 'পচাই উৎসব' মোরগের লড়াই। বেলতলীতে শ্রীপঞ্চমীর দিন হাড়িয়া বা পচাই খাওয়ার প্রতিযোগিতা ও মোরগ লড়াই। গোসাবা বাজারে পৌষ সংক্রান্তিতে বসে টুসু গানের আসর ও প্রতিযোগিতা এতে শুধুমাত্র মহিলারা যোগ দেয়।

রাধানগর গ্রাম গোসাবা থানায় বামনির দিন টুসু পূজা হাড়িয়া প্রতিযোগিতা। কালিতলায় টুসু পূজোও বিখ্যাত। রাঙাবেলিয়াতে টুসু গান করে স্থানীয় মানুষজন। এটি আদিবাসী মেলার অনুকরণে সৃষ্ট মেলা। চোরাবিদ্যা মিলন বাজারে বসে টুসু গান ও টুসু মেলা। এখানেও মোরগের লড়াই হয়। চাতরাখালিতেও এ মেলা হয়। দ্বীপময় সুন্দরবনে আরও নানা জায়গায় অনুরূপ মেলা বসে।

লৌকিক দেবদেবীর পূজা

দক্ষিণ ২৪-পরগনার অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী বর্তমান। হিন্দু দেবদেবী লোকাচারের সঙ্গে বৌদ্ধ-জৈন দেবদেবীর মিলনে এদের সৃষ্টি। এই সব দেব-দেবীর মধ্যে 'ধর্মঠাকুর' 'রাখালঠাকুর', 'পাঁচুঠাকুর' বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দেবতার কোনও বিগ্রহ নেই। কালো পাথরের টুকরোকে বিগ্রহ হিসেবে পূজা করা হয়। রাজপুরে-রাজপুর বাজারের মধ্যে ধর্মঠাকুরের একটি থান বর্তমান। পূজারী ডোমসম্প্রদায়ের লোক। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা ও মেলা হয়। বহু দূর-দূরান্ত থেকে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ এখানে এসে মানত করে।

ধর্মঠাকুরের থান দক্ষিণ ২৪-পরগনায় সর্বত্র বিদ্যমান। কলকাতায় ধর্মতলা বলে একটি জায়গাও আছে। এছাড়া আরও বহুজায়গায় 'ধর্মতলা' নামে রাস্তা ও গ্রাম বর্তমান। বাংলা সাহিত্যে 'ধর্মসঙ্গল' কাব্যে এই দেবতার মহিমা প্রচার করা হয়েছে।

বারুইপুর থানার 'নিহাটা' গ্রামে এর থান বর্তমান। এখানেও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমাতে মেলা বসে। এখানেও পূজারি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ।

বিষ্ণুপুর থানার চকমানিকপুর গ্রামে 'ধর্মঠাকুর' খুবই বিখ্যাত। এই থানটির প্রতিষ্ঠাতা কড়ুই পণ্ডিত। নবাব আলিবর্দি খাঁ এ মন্দিরের জমি দান করেন। এখানে বৈশাখী পূর্ণিমা জন্মাষ্টমী এবং মহাষ্টমীতে মেলা বসে।

হিন্দু পূজা উৎসব

দুর্গা, শিব, কালি, লক্ষ্মী, রাস, দোল, রথযাত্রা ইত্যাদি নানা পূজা ও উৎসব বর্তমান। এর মধ্যে দোল-রথ ও রাস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে।

দুর্গা ও কালি পূজা উপলক্ষে মেলা বসে তবে দুর্গার চেয়েও কালিপূজার প্রচলন অধিক।

রথযাত্রা

রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন মেলা হল বারুইপুরের মেলা। মেলা চলে প্রায় একমাস ধরে। এখানে নানারকম ফল-ফুলের কলমের চারা মেলা উপলক্ষে বিক্রি হয়। দেশ-বিদেশে এই চারার চালান যায়।

বিষ্ণুপুর থানার কাঙ্গনবেড়িয়ার রথও খুব বিখ্যাত। রথের মেলা জয়নগরেও খুব বড় আকারে বসে। এছাড়া ছোটবড় আরো রথের মেলা দক্ষিণ ২৪-পরগনার সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয়।

রাস

রাধাকৃষ্ণের মিলন উৎসবকে ঘিরেই শুরু হয় রাস। বারুইপুরের রাসমাঠে কার্তিকমাসে রাসের খুব বড় আকারের মেলা বসে।

মুসলমান পরব

ঈদ ও মহরম এই পরবকে কেন্দ্র করে মেলা ও উৎসব হয়। দক্ষিণ ২৪-পরগনার মুসলিম প্রধান এলাকাগুলিতে এধরনের উৎসব ও মেলা হয়। মগরাহাট থানার উত্তর কুসুমপুর গ্রামে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মহরমের মেলা বসে। প্রচুর লোকসমাগম হয়। মেলা চলে দু'দিন। মল্লিকপুরে বসে ফতেহাদোয়াজদামের মেলা।

অন্যান্য মেলা ও উৎসব

পুজাও আচার বাদ দিয়ে দক্ষিণ ২৪-পরগনায় আরও কিছু মেলা ও উৎসব পালিত হয়। যেমন কুলপী থানার ভগবানপুর ও নিশ্চিন্তপুরে 'মানুষ ঠাকুরের' মেলা। গ্রামের সাধারণ মানুষ শিব, দুর্গা, কালি ইত্যাদি নানা দেবতার রূপ পরিগ্রহ করে নানা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাড়িয়ে থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় মাটির মূর্তি।

গোসাবা থানার আমতলীতে বসে 'জুয়া' বা 'ফড়ের' মেলা। এরকম মেলা বসে কুলপীতে পুরানো হাটের মধ্যে। এ মেলা উপলক্ষে রাতভোর যাত্রা হয়। হাজার হাজার মানুষ সর্বস্বান্ত হয় একরাত্তিরের মেলায়।

গোসাবার থানার 'রূপমারিতে' বসে বাজির মেলা। বিশ্বকর্মা পুজার দিন এ অঞ্চলের বহু জায়গায় বসে ঘুড়ির মেলা। এছাড়া গোসবার আমতলিতে বসে কুরুক্ষেত্র মেলা। মেলা চলে এক মাস ধরে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি হয় নানা মৃৎপ্রতিমা। কুমিরমারি গ্রামে হয় লাঠিখেলার মেলা। আগে সোনারপুরে ঘসিয়াড়াতেও সংক্রান্তিতে এ রকম লাঠিখেলা হত। বজবজ থানার অচিপুরে চীন দেশের মানুষ 'টং আচু'র কবরকে ঘিরে একটি মেলা বসে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কুলপীতে পর্তুগীজদের সমাধি আছে এবং এদের বংশধররা বর্তমানে সাহা পদবী ধারী হয়ে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে মিশে গেছে। যদিও ভাগীরথীর ওপারে মেদিনীপুরে এখনও একটি পর্তুগীজদের গ্রাম আছে। এখানেও মেলা হয়। পঁচিশে ডিসেম্বরে নানা জায়গায় চলে চড়ুইভাতি। ডায়মন্ডহারবারে পুরানো কেল্লায় এটি প্রায় মেলার রূপই পায়। বড়দিন উপলক্ষে মথুরাপুর থানায় 'খাঁড়াপাড়া' গ্রামে খ্রিষ্টান চার্চকে ঘিরে মেলা বসে। এখানেও ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষজন খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী।

বাণিজ্যিক মেলা বা আধুনিক মেলা

এ অঞ্চল যেহেতু কলকাতার খুব কাছে তাই শহরের প্রভাব এসব অঞ্চলে খুব বেশি। যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ খুব বেশি। এছাড়া নগরায়ণ ও বিশ্বায়নের ধাক্কায় গ্রামের চেহারা রাতারাতি বদলে যাচ্ছে। পাল্টাচ্ছে মানুষের জীবন ও জীবিকা। হারিয়ে যাচ্ছে লোকসংস্কৃতি গাজন, পুতুলনাচ, বনবিবির পালা। এই ধ্বংসের মধ্যেও ফিনিক্স পাখির মতো নবজন্ম হচ্ছে নতুন নতুন মেলা। যেমন—সোনারপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবারে নানা সময়ে বসছে 'বইমেলা'। দীর্ঘদশবছরে ধরে সোনারপুরের বইমেলাটি প্রতিবছরই হয়ে চলেছে। এটি পরিচালনা করে সোনারপুর ক্লাব সমন্বয় কমিটি ও স্থানীয় মানুষজন।

ক্যানিং থানায় হচ্ছে সুন্দরবন গ্রামীণ মেলা। তালদিতেও হচ্ছে গ্রামীণ মেলা। এসব মেলায় স্থানীয় কৃষিজাত ফসলের প্রদর্শনী চলছে। শ্রেষ্ঠ ফসল উৎপাদনকারী চাষীকে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার। চাষীরা পাচ্ছেন উৎসাহ।

এছাড়া কবিগান, তরজা, যাত্রা, বনবিবির পালা গানের নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে এ মেলায়। লোকসংস্কৃতির চর্চা ও প্রদর্শনীর পীঠস্থান হয়ে উঠছে এ সব মেলাগুলি। সোনারপুর লোকশিক্ষা পরিষদ—নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে বেশ কিছু বছর ধরে এরকমই গ্রামীন মেলার আয়োজন করে চলেছে। সোনারপুর, জয়নগর, বারুইপুরে মাঝেমধ্যে বসছে নাটকের মেলা। চম্পাহাটি, তালদিতে বসছে যাত্রা মেলা। স্থানীয় দল ও মানুষের সহায়তায় এগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

পরিশেষে একটা কথা বলা যায় দক্ষিণ ২৪-পরগনার মেলা সম্পর্কে এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা অসম্ভব তাই উল্লেখযোগ্য মেলাগুলির কথা বলা হল। বাকিগুলি থানাভিত্তিক গ্রাম ও মাসের নামসহ দেওয়া গেল। নিম্নোক্ত তালিকায়—

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উৎসবের তালিকা

থানা	মৌজা	বাংলা/ইংরেজি	উপলক্ষ	দিন	উপস্থিতির হার ও অন্যান্য
বজবজ	বুইটা	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	—
	পুজালী	আষাঢ়	রথযাত্রা	১ দিন	চারশো থেকে পাঁচশো জন
	বাওয়ালী	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	২৫ হাজার জন
	চাউলখোলা	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	২-৩ হাজার জন
	বজবজ	বৈশাখ	গোষ্ঠ উৎসব	—	—
	বজবজ	আষাঢ়	রথযাত্রা	—	—
	রাজপুর	পৌষ	কালী এবং গঙ্গাপুজা	—	—
	বিড়লাপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	—	—
	অচিপুর	বুদ্ধপূর্ণিমা	বুদ্ধোৎসব	১ দিন	—

থানা	মৌজা	মাস বাংলা/ইংরেজি	উপলক্ষ	দিন	উপস্থিতির হার ও অন্যান্য
বারুইপুর	মল্লিকপুর	পৌষ	ফতেহ্দোয়াজদাম	১ দিন	—
	মাদারহাট	চৈত্র	শিবগাজন	১ দিন	—
	বারুইপুর	বৈশাখ	গৌরনিতাই পূজা	১৫ দিন	—
	বারুইপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৭ দিন	১০ হাজার জন
	বারুইপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	১ মাস	২৫ হাজার জন
	বারুইপুর	চৈত্র	চড়ক	২ দিন	—
	ইন্দ্রপালা	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	৩ দিন	—
	ধপধপি	মাঘ	জাতাল (দক্ষিণ রায়)	২ দিন	বার্ষিক পূজা ও মেলা
	রাগানিপাড়া		ওলাবিবি		
বাসন্তী	আমঝাড়া	বৈশাখ	নববর্ষ	১ দিন	(চড়াবিদ্যা মিলন বাজার ও টুসু পরব উপলক্ষে)
	আমঝাড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১ দিন	মোরগ লড়াই, আদিবাসী মেলা,
	ভরতগড়	ফাল্গুন	শীতলা পূজা	৭ দিন	চাতরাখালির মেলা
বেহালা	বড়িশা	অগ্রহায়ণ	চণ্ডীপূজা	৭ দিন	২ হাজার
	চণ্ডীতলা	অগ্রহায়ণ	মঙ্গলচণ্ডী	১ দিন	
ভাঙ্গড়	পিতপুকুরিয়া	মাঘ	পীরমেলা	৩ দিন	
	বামুনিয়া	ফাল্গুন	গোরাচাঁদের মেলা	১ দিন	
	সানপুকুরিয়া	মাঘ	মহোৎসব মেলা	২ দিন	
	শাঁকহর	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	৭ দিন	
	মরিচা	ফাল্গুন	কালাচাঁদের মেলা	৩ দিন	
	মরিচা (পীরস্থান)	বৈশাখ	ভাঙর পীরের মেলা	১ দিন	
	ভাঙড়	চৈত্র	ভাঙড় পীরের উৎসব	১ দিন	১০ হাজার
	শাঁকশহর	পৌষ	ভাঙড় পীরের উৎসব	১০-১২ দিন	১০—১৫ হাজার
বিষ্ণুপুর	ঝিকুড়বেড়ে	চৈত্র	নীলপূজা ও ভূতনাথ	১ দিন	২—৩ হাজার
	জয়রামপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১ দিন	১ হাজার
	জয়রামপুর	চৈত্র	গাজন	৩ দিন	২০ হাজার
	ভাড়ুরামকৃষ্ণপুর	চৈত্র	রাধাকৃষ্ণ	১ দিন	—
	কাঞ্চনবেড়িয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	১০-১২ হাজার
নাদাভাঙা	নাদাভাঙা	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	৫-৬ দিন	৫০০-৬০০
	বাখরহাট	মাঘ-ফাল্গুন	শীতলা	৫-৬ দিন	৫০০-৬০০
	কীর্তনখোলা	চৈত্র	বারুনী স্নান	১ দিন	১০-১২ হাজার
	কীর্তনখোলা	চৈত্র	শীতলা পূজা	১ দিন	—
	জয়চণ্ডীপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	১ দিন	—
	জয়চণ্ডীপুর	পৌষ	হাজাৎ মেলা	১ দিন	—
	মৎস্যখালি	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	—
	বহড়ু রামকৃষ্ণপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৪ দিন	
	রামনাথপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৪ দিন	
ক্যানিং	কালিকাতলা	মাঘ	বনবিবির পূজা	৪ দিন	
	মঠেরদিঘি	চৈত্র	বাসন্তী পূজা ও চড়ক	৮ দিন	১০০০ হাজার
	ক্যানিং	ফাল্গুন-চৈত্র	ব্রহ্মাপূজা	৭-১২ দিন	১০-১২ হাজার

থানা	মৌজা	মাস বাংলা/ইংরেজি	উপলক্ষ	দিন	উপস্থিতির হার ও অন্যান্য
	তাঁলদি	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	৩ দিন	ক্যানিং ২নং ব্লকে ভবেনের হাটে
	তালদি	জ্যৈষ্ঠ	শীতলা	২ দিন	আদিবাসী মেলা, টুসু পরব।
	ডেভিস-আবাদ	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১ দিন	
	রায়বাঘিনী	চৈত্র	চড়ক	৩ দিন	
	ঘুটিয়ারি শরিফ	আষাঢ়	পীর মোবারক	৩ দিন	২০- ২২ হাজার
ডায়মন্ডহারবার	কুলটিকুরি	চৈত্র	বারুনি স্নান	৩ দিন	২০ হাজার
	পারুলিয়া	চৈত্র	পঞ্চানন্দ	৮-১০ দিন	৪-১০ হাজার
	হরিণডাঙা	বৈশাখ	রক্ষাকালী	৪-৫ দিন	২-৩ হাজার
	মশাট	চান্দ্রমাস	মহরম	১ দিন	৫ হাজার
জয়নগর	খাকসাড়া	বৈশাখ	চড়ক	১ দিন	
	জয়নগর	বৈশাখ	ধন্বন্তরি কালীপূজা	১৫ দিন	২০-২৫ হাজার
	জয়নগর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	১ দিন	
	জয়নগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	১ দিন	
	জয়নগর	জ্যৈষ্ঠ	জয়চণ্ডীপূজা	১৫ দিন	—
	জয়নগর	ফাল্গুন	পঞ্চম দোল	১ দিন	১০-১২ হাজার
	জয়নগর	ফাল্গুন	রাসমেলা	৭ দিন	
	কালীনগর	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	১ দিন	
	ময়দা	ফাল্গুন	শ্রীপঞ্চমী	১ দিন	
	গোবিন্দপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা		
	বহড়ু	মকর সংক্রান্তি	স্নানমেলা	১ দিন	
কাকদ্বীপ	সীতারামপুর	ফাল্গুন	মহোৎসব	৩-৪ দিন	৩—৪ হাজার
	মাধবনগর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	৭ দিন	৩—৪ হাজার
	উঃ দুর্গাপুর	ফাল্গুন	গোরাচাঁদ মেলা	৭ দিন	৫—৬ হাজার
	মণিরামপুর	পৌষ	গঙ্গা পূজা	৭ দিন	৪০০-৯০০ জন
	গঙ্গাসাগর	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি স্নান	৭ দিন	১০-১২ লক্ষ
কুলপি	দেড়িয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	১ দিন	
	শ্যাম বসুর চক	জৈষ্ঠ্য	ধর্মপূজা	১ দিন	৪-৫ হাজার
	ঐ	আষাঢ়	রথযাত্রা	১ দিন	—
	ঐ	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	৪-৫ হাজার
	উদয়[illegible]পুর	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	
	দুর্গান[illegible]	চৈত্র	চড়ক	২-৩ দিন	
	দুর্গান[illegible]	আষাঢ়	রথযাত্রা	১ দিন	
কুলতলি	নল[illegible]	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	২ দিন	
	সোনা[illegible]	পৌষ	গঙ্গাপূজা	১ দিন	
	সোনা[illegible]	চৈত্র	গাজন	১ দিন	
	সোনা[illegible]	চৈত্র	গোষ্ঠপূজা	৪-১০ দিন	১০-১২ হাজার
মগরাহাট	ইয়ার[illegible]	আষাঢ়	রথ	২ দিন	
	সের[illegible]	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	
	চকপ[illegible]	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩ দিন	
	বেরা[illegible]	মাঘ	সরস্বতী পূজা	৩ দিন	
	করি[illegible]	কার্তিক	কালীপূজা	১ দিন	

থানা	মৌজা	মাস বাংলা/ইংরেজি	উপলক্ষ	দিন	উপস্থিতির হার ও অন্যান্য
	মনিরামপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৪ দিন	
	বানিবেড়িয়া	বৈশাখ	গঙ্গাস্নান	২ দিন	
	সালিখা	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	২-৩ হাজার
	সালিখা	চৈত্র	বিবিমার মেলা	১ দিন	
	রাজবল্লভপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৩ দিন	
	মহেশ্বরা	বৈশাখ	ধর্মপুজা	২ দিন	
	ঢনঢনিয়া	বৈশাখ	ধর্মপুজা	৩ দিন	
	শিবপুর	আশ্বিন	দুর্গাপুজা	৩ দিন	
	সাপমারা	বৈশাখ	চড়ক	১ দিন	
	সাপমারা	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৩ দিন	
	রঙ্গিলাবাদ	চৈত্র	চড়ক, শীতলা	৩ দিন	
	বামনগাজি	মাঘ	মানিকপীর	৪ দিন	
	নাজড়া	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	
	কানপুর	চৈত্র	চড়ক		
	উত্তর কুসুম	শ্রাবণ-ভাদ্র	মহরম	২ দিন	৭ হাজার
	উত্তর কলস	চৈত্র	পীর	৩ দিন	
	আজমখালি	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১ দিন	
	সংগ্রামপুর	বৈশাখ	গাজন-গোষ্ঠ	১ দিন	
	রামনা	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	
	রামনা	মাঘ	সরস্বতী পুজা	১ দিন	
	সরাচি	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	
	একতারা	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	
	মাইতির হাট	কার্তিক	কালীপুজা	১ দিন	
	বনসুন্দরী	বৈশাখ	গঙ্গাস্নান	২ দিন	
	বেণীপুর	আশ্বিন	দুর্গাপুজা	৩ দিন	
	কাটাপুকুরিয়া	বৈশাখ	ধর্মপুজা	১ দিন	
	আবাদ ঈশ্বরীপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ	২ দিন	
	ইয়ারপুর	বৈশাখ	চড়ক	১ দিন	
	মোহনপুরহাট	বৈশাখ	চড়ক-গোষ্ঠ	৪ দিন	
	মাজদা	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	
	বারহানপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	
	আলিদা	বৈশাখ	বিবিমার মেলা	৪ দিন	১০০০ হাজার
	আলিদা	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৩ দিন	
	তোনারহাট	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	
	ধনিরামচক	বৈশাখ	বিবিমা-দক্ষিণেশ্বর	৩ দিন	
মহেশতলা	মহেশতলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	
	চকমিরা	চৈত্র	চড়ক	—	
	গানপুর	চৈত্র	চড়ক	২ দিন	
	বাঘপোতা	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৩ দিন	২০০০
	বাঘপোতা	জ্যৈষ্ঠ	চণ্ডীপুজা	৩ দিন	২০০০
	বাঘপোতা	মাঘ	সরস্বতী পুজা		
	বানেশজোড় হাট	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	
	পাড়বাংলো	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	
	ডাকঘর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	
	মায়ানগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	

থানা	মৌজা	মাস বাংলা/ইংরেজি	উপলক্ষ	দিন	উপস্থিতির হার ও অন্যান্য
	নুঙ্গি	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	
	নুঙ্গি	চৈত্র	চড়ক		
	শিবরামপুর	চৈত্র	চড়ক	—	
	গোপালপুর	পৌষ সংক্রান্তি	বারা	জাঁকের পূজা	
	কুম্ভকারপাড়া	—	মানিকপীর, ঘেঁটু	১ বেলা	
	চাতলা	চৈত্র	চড়ক	২ দিন	
	বিশালাক্ষীতলা	চৈত্র	চড়ক	২ দিন	—
	গোপালপুর	চৈত্র	চড়ক	২ দিন'	—
মন্দিরের বাজার	সিদ্ধেশ্বরপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠ		
	গোপালনগর (পূর্ব)	বৈশাখ	ধর্মপূজা	৩ দিন	
	বিষ্ণুপুর	পৌষ	পৌষপার্বণ	৩ দিন	
	জগদীশপুর	আষাঢ়	রথ	৭ দিন	১০-১২ হাজার
	মন্দিরের বাজার	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি		
			গাজন-গোষ্ঠ	৬ দিন	১০-১২ হাজার
	বিষ্ণুপুর (দঃ)	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	১ দিন	৩ হাজার
	গোলের হাট	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৪ দিন	
	বিজয়গঞ্জ	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	৪ দিন	
মথুরাপুর	গোবিন্দপুর (উঃ)	বৈশাখ	গোষ্ঠ	১ দিন	
	নাড়ুয়া	মাঘ	শ্রীপঞ্চমী	৬ দিন	
	কৃষ্ণচন্দ্রপুর	পৌষ	নাম সংকীর্তন মেলা	৩-৪ দিন	
	ছত্রভোগ	চৈত্র	স্নানযাত্রা (নন্দা)	—	
	ছত্রভোগ	চৈত্র	চড়ক		
	বড়াসী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি		
	বড়াসী	চৈত্র	হিন্দুমেলা	১৫ দিন	৫ হাজার
	বড়াসী	চৈত্র	স্নানযাত্রা	৩ দিন	
	খাঁড়ি	চৈত্র	সর্বমঙ্গলা পূজা	৬-৭ দিন	৫ হাজার
	গিলারছাট	বৈশাখ	নববর্ষ মেলা	৪ দিন	
	গোবিন্দপুর (দঃ)	ফাল্গুন	শিবরাত্রি		
	লক্ষ্মীজনার্দনপুর	পৌষ	বিশালাক্ষী মেলা	৭ দিন	
	কুমারপু[illegible]	কার্তিক	জগন্নাথদেব মেলা	৪ দিন	
	রায়পু[illegible]	বৈশাখ	গঙ্গাস্নান মেলা	—	
	বিষ্ণুপু[illegible]	পৌষ সংক্রান্তি	গঙ্গাস্নান	৩ দিন	১০-১২ হাজার
নামখানা	অমরা[illegible]	পৌষ	মকর সংক্রান্তি	৩ দিন	৬ থেকে ৭ হাজার
পাথরপ্রতিমা	দিগম্বর[illegible]	ফাল্গুন	নারায়ণী পূজা	৩ দিন	—
	কামদে[illegible]	বৈশাখ	চণ্ডীপূজা	৩-৪ দিন	৪০০-৭০০
	শ্রীধর[illegible]	ফাল্গুন	বিশালাক্ষী পূজা	১ দিন	
	ইন্দ্রপু[illegible]	মাঘ	বিশালাক্ষী পূজা	৩ দিন	২০০০
সাগর	সিলপা[illegible]	চৈত্র	চড়ক	৭ দিন	২০ হাজার
	মৃত্যুঞ্জ[illegible]	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৪ দিন	—
	সুমতি[illegible]	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫ দিন	২ হাজার

থানা	মৌজা	মাস বাংলা/ইংরেজি	উপলক্ষ	দিন	উপস্থিতির হার ও অন্যান্য
	লালপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৬ দিন	৬ হাজার
	লালপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	১ দিন	৬ হাজার
	লালপুর	চৈত্র	শিবপূজা	১ দিন	৫-৬ হাজার
	ঈশ্বরীপুর	পৌষ	গঙ্গাপূজা	২ দিন	৩০০-৫০০ জন
সাগর	দাসপাড়া	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১ দিন	—
সোনারপুর	গোড়খাড়া	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	৬-৭ হাজার
	হরিনাভি	চৈত্র	রাসযাত্রা	৩ দিন	—
	কামরাবাদ	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১ দিন	৩-৪ হাজার
	রাজপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	৭ দিন	—
	রাজপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১ দিন	
	রাজপুর	চৈত্র	শিবগাজন	১ দিন	
	রাজপুর	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	৬-৭ হাজার
	বনহুগলি	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	
	রায়পুর	চৈত্র	চণ্ডীপূজা	৬ দিন	২-৩ হাজার
	রায়পুর	শ্রাবণ	স্বাধীনতা দিবস	২ দিন	—
	শানগুর	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	১ দিন	—
	নবসান	বৈশাখ	গোষ্ঠমেলা	১ দিন	—
	সেনদিঘী		ত্রিপুরাসুন্দরী, পঞ্চানন	৩ দিন	
	সরলদিঘি		ঐ		
	নওয়াপাড়া	ভাদ্র	শীতলা, গোরক্ষনাথ	১ দিন	—
ফলতা	মাসুদপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজ পূজা	৪ দিন	৫০০-১০০০
	পদ্মপুকুর	মাঘ	গঙ্গাপূজা	৭ দিন	১০০০-২০০০
	সহরা	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	৩ দিন	২০০০
	জগন্নাথপুর	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা (১০০ বছরের)	১ দিন	—
	বেলসিনা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১ দিন	৭০০
	রসুলপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	৩ দিন	২০০০
	ডালুইপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	৭ দিন	২০০০
	রুখিয়া	কার্তিক	মহরম	—	—
	দোলকুঠারি	বৈশাখ	ধর্মযাত্রা	১ দিন	৫০০০
	বাসুদেবপুর	পৌষ	বিশালাক্ষ্মী পূজা	৪ দিন	১০০০
	দোস্তিপুর	মাঘ	গঙ্গাপূজা	৪-৫ দিন	১০০০
	কোদালিয়া	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	৬ দিন	১০০০
	ফতেপুর	বৈশাখ	গোষ্ঠযাত্রা	৬ দিন	৪০০০
	ফতেপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২ দিন	৭০০০
	হাসিমনগর	বৈশাখ	শিবগাজন	৩ দিন	৫০০০
	মালা	বৈশাখ	গোষ্ঠ	৩ দিন	৫০০০
	সমীরনাথ গোপালপুর	চান্দ্রমাস	মহরম	১ দিন	১০০০০
	দৌলতপুর	পৌষ	বিশালাক্ষ্মীপূজা	৪ দিন	১০০০
যাদবপুর	যাদবপুর		মানিকপীর	১ দিন	—
কসবা	কসবা, রথতলা	চৈত্র	চড়ক	১ দিন	

তথ্যসূত্র

১। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়—কৃষ্ণকলি মণ্ডল।
২। West Bengal District Gazeteers, March 1994.
৩। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস—কমল চৌধুরি।
৪। পরায়ত্ত পরগনা—মনোরঞ্জন রায়।
৫। গঙ্গারিডি—নরোত্তম হালদার।
৬। আদি গঙ্গার তীরে—প্রসিত রায়চৌধুরি।
৭। দক্ষিণ ২৪-পরগনার শৈব্যতীর্থ—ধূর্জটি নস্কর।
৮। সমারূঢ় ব্যতিক্রম—পলাশ হালদার (সম্পাদক, সুন্দরবন সংখ্যা)।
৯। লোকসূত্র—তুহিনময় ছাটুই (সম্পাদক)
১০। দেবদেবী ও তাদের বাহন—স্বামী নির্মলানন্দ।
১১। পীর-গাজী-বিবি (দঃ ২৪ পরগনা জেলা)—তুহিনময় ছাটুই।
১২। দিলীপ মণ্ডল—গোসাবা থানা।
১৩। সুব্রত মণ্ডল—ঝড়খালি গ্রাম।
১৪। বিশ্বনাথ পুরকাইত—বাসন্তী।
১৫। গণশক্তি, আনন্দবাজার, আজকাল ও সমসাময়িক নানা পত্রপত্রিকা।
১৬। সাগর চট্টোপাধ্যায়, বারুইপুর।

লেখক পরিচিতি

পলাশ হালদার—'সমারূঢ় ব্যতিক্রম' পত্রিকার সম্পাদক। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী।

তুহিনময় ছাটুই—লোক সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'লোকসূত্র'-র সম্পাদক। রাজ্য সরকারের কর্মী।

সুন্দরবনের অভয়ারণ্য

লালমোহন ভট্টাচার্য

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস করে স্বাধীনতা আসতে পারে না। দেশকে স্বাধীন করতে হলে চাই অস্ত্র, চাই অর্থ, চাই দুর্জয় সাহস এবং দুর্দমনীয় দৈহিক ও মানসিক শক্তি। তাই গ্রামে গ্রামে গড়ে তুলতে হবে বলিষ্ঠ সংগঠন। যে সংগঠনে গ্রামের যুবকরা যুক্ত হবে। তারা শরীরচর্চা করবে—ব্যায়াম করবে। বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস জানবে, বুঝবে, চর্চা করবে। গড়ে তুলবে নিজেদের মানসিক ও দৈহিক বল। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে গোটা বাংলার বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নামের গুপ্ত সমিতি ও সংগঠন। আমাদের এই দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলাতেও এই ধরনের সংগঠন বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছিল। এই সংগঠনগুলির নেতৃত্বে ছিলেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায়), হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ।

সেই সময় 'স্বদেশী ডাকাত' বলে একটা কথা প্রচলিত ছিল। যাঁরা এ কাজ করতেন তাঁদের দেশের সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। কেননা স্বদেশী ডাকাতদের কাজ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। স্বদেশি ডাকাতরা সাধারণ মানুষের অর্থ বা ধনসম্পদ লুঠ করতেন না। তাঁরা সরকারি অর্থই লুণ্ঠন করতেন।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় দুটি স্বদেশী ডাকাতি হয়। প্রথমটি হয় ডায়মন্ডহারবার লাইনের ন্যাতড়া রেল স্টেশনে এবং দ্বিতীয় ডাকাতিটি হয় ১৯০৭ সালে চাংড়িপোতা (সুভাষগ্রাম) রেল স্টেশনে। দুটি ঘটনাই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে ঘটেছিল। তবে এই দুই ডাকাতিতে খুব বেশি টাকা সংগ্রহ করতে পারেননি নরেন্দ্রনাথের দলবল। তাই এর কিছুদিন পরে দুঃসাহসী নরেনের নেতৃত্বে গার্ডেনরিচ মিউনিসিপ্যালিটিতে আবার স্বদেশি ডাকাতি হয়। গার্ডেনরিচ থেকে ১৮,০০০ টাকা নিয়ে বিপ্লবীরা মোটরযোগে বারুইপুরে চলে আসেন। এই সব স্বদেশি ডাকাতিতে সেই সময় জয়নগরের কুন্তল চক্রবর্তী, তিনকড়ি দাস, চাংড়িপোতার অলক চক্রবর্তী, মাখন চক্রবর্তী, শৈলেশ্বর বসু প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের অনেকেরই পরিচিতি আজ নেই। কিন্তু সেই যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে এঁরা ছিলেন দুশ্চিন্তার কারণ।

> **ঠিক হল, আমেরিকার সানফ্রানসিস্কো বন্দর থেকে তিনটি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ ২ লক্ষ টাকা নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় এসে ভিড়বে। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা নিয়ে আসতে হবে। পরিকল্পনামত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী ও অশ্বিনী গাঙ্গুলী নৌকাযোগে চলে গেলেন রায়মঙ্গল নদীর মোহনায়। সেখানে গহন অরণ্যে গাছের ওপর সাত দিন সাত রাত কাটল তাঁদের। পেটে ক্ষিদে নেই—চোখে ঘুমও নেই। ৩০ হাজার রাইফেল, ৬০ হাজার কার্তুজ ও ২ লক্ষ টাকা জাহাজে আসবে আর তা নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই দেশের মাটিতে চালানো হবে এই প্রবল আশা মনে নিয়ে তাঁরা সাত দিন সাত রাত কাটালেন সুন্দরবনের গহন অরণ্যে।**

এইভাবে এখানে-সেখানে ডাকাতি করে যা অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে তাতে তেমন কাজ হচ্ছে না দেখে দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর' দলের কর্মীরা একটি বড় পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সেই সময়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পয়লা নম্বর শত্রু ছিল জার্মানরা। যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা তাই ঠিক করল যে কোনভাবেই হোক জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বিস্তর জল্পনা-কল্পনা শেষে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকেদায়িত্ব দেওয়া হল জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার। নরেন্দ্রনাথ তখন টি মার্টিন, বি চাটারটন প্রভৃতি ছদ্মনাম নিয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে জার্মান গভর্নমেন্টের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ হল। ঠিক হল, আমেরিকার সানফ্রানসিস্কো বন্দর থেকে তিনটি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ ২ লক্ষ টাকা নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় এসে ভিড়বে। সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা নিয়ে আসতে
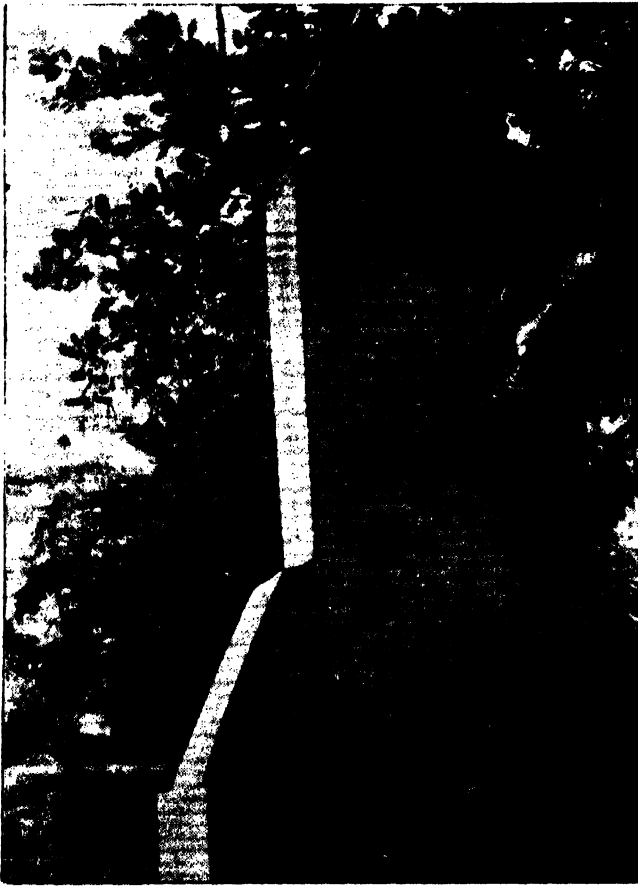
ডায়মন্ডহারবার মহকুমার 'নীলা'য় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম শহীদ আশুতোষ দলুইয়ের স্মৃতিস্তম্ভ

হবে। পরিকল্পনামত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী ও অশ্বিনী গাঙ্গুলী নৌকাযোগে চলে গেলেন রায়মঙ্গল নদীর মোহনায়। সেখানে গহন অরণ্যে গাছের ওপর সাত দিন সাত রাত কাটল তাঁদের। পেটে ক্ষিদে নেই—চোখে ঘুমও নেই। ৩০ হাজার রাইফেল, ৬০ হাজার কার্তুজ ও ২ লক্ষ টাকা জাহাজে আসবে আর তা নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই দেশের মাটিতে চালানো হবে এই প্রবল আশা মনে নিয়ে তাঁরা [illegible] দিন সাত রাত কাটালেন সুন্দরবনের গহন অরণ্যে। [illegible] আশা মনেই থেকে গেল। জাহাজ আর এল না। পরি[illegible]নি হয়ে যাওয়ায় যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে [illegible] সরকার ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা শুরু কর[illegible] ক্রবর্তী গ্রেপ্তার হলেন। নরেন্দ্রনাথ এম এন রায় [illegible] দেশ ঘুরে আমেরিকায় পালিয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় যুগান্ত[illegible] সাময়িকভাবে কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কি[illegible] সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবার সাংগঠনিক [illegible]কল। ১৯১৪ সালে প্রায় ৪০০ জন ভারতীয় যাত্রী [illegible] এক[illegible]পানি জাহাজ সমুদ্রপথে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে [illegible]হাজের অধিকাংশ যাত্রীই ছিলেন শিখ সম্প্রদায়ের। বা[illegible]য়ের পরিচালনায় তাঁরা দেশ ছেড়ে জীবিকার অন্বেষ[illegible] রাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছিলেন। জাপানি জাহাজটা তাঁরা ভাড়া [illegible]কিন্তু সেই সময় কানাডা ও আমেরিকা দুটি দেশেই বর্ণবৈষম্যবাদ প্রবল ছিল এবং তাতে ব্রিটিশদের প্ররোচনাও ছিল। ইংরেজদের প্ররোচনায় কানাডা বা মার্কিন সরকার ওই জাহাজের যাত্রীদের নামতে না দেওয়ায় তাঁরা আবার ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর যখন কোমাগাতামারু জাহাজ দক্ষিণ ২৪-পরগনার বজবজে পৌঁছোয় তখন ব্রিটিশ সরকার জাহাজের সমস্ত যাত্রীদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত এই অজুহাতে বন্দী করতে চেষ্টা করে। ফলে দু পক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ শাসকসহ ২০ জন নিহত হন। কিন্তু বাবা গুরদিৎ সিং সহ বেশ কিছু যাত্রী পালাতক হন এবং বাকিদের ব্রিটিশরা বন্দী করে পাঞ্জাবের জেলে পাঠায়। সেই সময় পালাতক শিখ যাত্রীদের আশ্রয় দেওয়া ও তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ায় সাহায্য করার ভার পড়ে দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলের ওপর। সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা ওই সব যাত্রীদের আত্মগোপন করে থাকা ও ছদ্মবেশে পাঞ্জাবে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও হরিকুমার চক্রবর্তীর পৃষ্ঠপোষকতার স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার রাজপুর, বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, বোড়াল, গড়িয়া, বড়িষা, ডায়মন্ডহারবার, সরিষা, জয়নগর-মজিলপুর, মাহিনগর, বেহালা প্রভৃতি গ্রামে বিপ্লবীদের ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। এই বিপ্লবী দলের দুটি বিভাগ ছিল। একটি প্রকাশ্য বিভাগ এবং অপরটি গোপন বিভাগ। ব্যায়াম সমিতি, লাইব্রেরি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল প্রকাশ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ্য বিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের ব্যাপক জন সাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার বিকাশ ঘটানো ও তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। আর বাছাই করা বিপ্লবীদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল গোপন বিভাগ। গোপন বিভাগে দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিতরাই কেবলমাত্র স্থান পেতেন। তাঁদের রাইফেল ও রিভলভার চালানোর শিক্ষা দেওয়া হত এবং তাঁরাই বিভিন্ন অ্যাকশনে অংশগ্রহণ করতেন।

১৯৪২-এর আন্দোলন চলাকালে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিপ্লবীরা। সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় দীনেশ মজুমদার ও খুলনার বিপ্লবী অনুজা সেন মালঞ্চ গ্রামের কাওরাপাড়ায় বোমা ছোঁড়ার মহড়া নেন এবং চার্লস টেগার্টকে আক্রমণ করতে গিয়ে অনুজা সেন নিজেই আহত হয়ে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

সেই সময় জয়নগর-মজিলপুরে বিপ্লবীদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটির নেতৃত্বে ছিলেন বহড়ু গঙ্গাঘাটার সুনীল চ্যাটার্জি। জয়নগর-মজিলপুরের ব্যায়াম সমিতির মাধ্যমে বহু যুবক তখন দলের গোপন বিভাগে যুক্ত হয়েছিল। ১৯৩০ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই ব্যায়াম সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় এসেছিলেন।

১৯৩১-এর ৭ জুলাই বিচারপতি আর আর গার্লিক রাইটার্সের ঐতিহাসিক অলিন্দযুদ্ধের অন্যতম সৈনিক দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির আদেশ দেন। গার্লিককে বিচার করার ভার পড়ে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার বিপ্লবীদের ওপর। সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায় ও

অমূল্য দাশগুপ্ত সবদিক বিবেচনা করে জয়নগর-মজিলপুরের কানাইলাল ভট্টাচার্যর ওপর গার্লিক নিধনের দায়িত্ব দেন। ১৯৩১-এর ২৭ জুলাই কানাইলাল আলিপুর জজকোর্টের মধ্যে ঢুকে গার্লিককে গুলি করে হত্যা করেন এবং নিজে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন।

এর পরই দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিপ্লবীদের ওপর দায়িত্ব পড়ে স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করার। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জীর পরিকল্পনা অনুযায়ী দলের গোপন বিভাগের সৈনিক মণি লাহিড়ী ও অনিল ভাদুড়ী ১৯৩২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর ওয়াটসন সাহেবকে হত্যা করে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

এইভাবে একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ পুলিশবাহিনী দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার বিপ্লবীদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে হানা দিয়ে দলের অনেককেই গ্রেপ্তার করে। তার ফলে দলের সাংগঠনিক কাজকর্ম বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। দলের গোপন বিভাগের অনেক ভালো ভালো কর্মী হয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বন্দী হন অথবা অ্যাকশন করতে গিয়ে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। তবে ধারাবাহিকভাবে দলের প্রকাশ্য বিভাগের কাজকর্ম চলতে থাকায় জেলার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। তার ফলে ১৯৪২-এর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলার সময় সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে এই জেলারও বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকী দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সত্যাগ্রহ অন্দোলন সংগঠিত হয়। সেই সময় সুদূর সাগরদ্বীপেও ভারত ছাড়ো আন্দোলন এমন তীব্র রূপ নিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার সাগরদ্বীপে বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ সৈনিক রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

এই সব আন্দোলনে যাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের কর্মকাণ্ডে সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম চলে গিয়েছিল, যাঁরা দেশকে স্বাধীন করার কঠিনকঠোর ব্রত নিয়ে নিদারুণ নির্যাতন ভোগ করেছিলেন অথবা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হল।

হরিকুমার চক্রবর্তী

(১৮৮২-১৯৬৩)

হরিকুমার চক্রবর্তী ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর (এম এন রায়) নেতৃত্বেই স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার সূচনা হয় এই দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায়। সোনারপুর থানার অন্তর্গত চাংড়িপোতা (সুভাষ-গ্রাম) গ্রামে হরিকুমারের জন্ম। তিনি প্রথমে 'অনুশীলন' সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বিপ্লবী বাঘাযতীনের 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত হন। বাঘাযতীনের নির্দেশেই হরিকুমার দলবল নিয়ে সুন্দরবনের গহন অরণ্যে ম্যাভেরিক জাহাজে জার্মান থেকে পাঠানো অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অভিযান করতে গিয়ে ধরা পড়েন। এ জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘকাল তাঁকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হরিকুমার কংগ্রেসে যোগ দেন। সেই সময় তিনি গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর পর তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে যোগ দেন ও ইনডিপেণ্ডেন্স লিগের বাংলাদেশ শাখার সম্পাদক হন। স্বরাজ

নীল চাষীরা নীল পেটাচ্ছেন

পার্টির কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘকাল কারাবাসের জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে ভলান্টিয়ার সাবকমিটির সম্পাদক হন। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে নেতাজির 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাবের পরিবর্তে জওহরলাল নেহরুর 'স্বায়ত্তশাসনে'র প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় হরিকুমার কংগ্রেস ছেড়ে আবার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারায় যুক্ত হন। তিনি দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে আবার কারারুদ্ধ করে। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হরিকুমারের সঙ্গে তাঁর বাল্যবন্ধু নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যর আবার যোগাযোগ ঘটে। নরেন্দ্রনাথ তথা এম এন রায় তখন র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজমের চর্চা করতে থাকেন। ১৯৬৩ সালে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে হরিকুমারের জীবনাবসান হয়।

এম এন রায়

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে ভারতের আকাশে এসেছিল একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সেই জ্যোতিষ্কটি হল এম এন রায়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নরেন্দ্রনাথের জন্ম দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার আরবেলিয়া গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই তিনি অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। প্রবল চারিত্রিক দৃঢ়তা, সংগ্রামমুখী মানসিকতা ও অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য তিনি বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন। ১০-১২টি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সময় দশম শ্রেণীর ছাত্র নরেন্দ্রনাথ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। মূলত তাঁরই নেতৃত্বে সেই সময় হরিনাভির অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল। এ জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেছিল। তারপর থেকে নরেন্দ্রনাথ আর স্কুলে পড়েননি। কিন্তু স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে না গিয়েও তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন। বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিপ্লবী কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন

তিনি। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ২০ মাস জেলে থাকার পর ছাড়া পেয়ে বাঘাযতীনের ডানহাত হিসাবে তিনি যুগান্তর দলে কাজ করতে থাকেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নরেন্দ্রনাথ আর সি মার্টিন নাম নিয়ে জার্মান চলে যান। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের তদানীন্তন পয়লা নম্বর শত্রু জার্মানদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা সংগ্রহ করে এদেশে পাঠানো। যুগান্তর দলের পরিকল্পনামত তিনি জার্মান থেকে ম্যাভেরিক জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। যুগান্তর দলের বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে ইংরেজ শাসকরা গ্রেপ্তার করে ও ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। তখন নরেন্দ্রনাথ জার্মান থেকে এম এন রায় নাম নিয়ে নানা দেশ ঘুরে আমেরিকায় পালিয়ে যান। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে এম এন রায়কে ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় আমেরিকাতে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি মেক্সিকোতে পালিয়ে যান। মেক্সিকোতে তিনি গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং তিনিই প্রথম মেক্সিকোতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে মহান লেনিনের আমন্ত্রনে তিনি মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি দেশে ফিরে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে তিনি র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করেন ও সুচিন্তিত রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করে বহু বই লেখেন। তাঁর লেখা বইগুলি হল : র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম, ইন্ডিয়া ইন্ ট্রানজিশন, বিয়ন্ড কমিউনিজম ইত্যাদি। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে এই সুমহান ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান হয়।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৮৯-১৯৩৭)

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার বেহালার সরশুনা গ্রামে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর [illegible] নিবাস [illegible]সোনারপুর থানার মাহিনগর গ্রামে। পিতা মন্মথনাথ [illegible]পাধ্যায় [illegible] নরেন্দ্রনাথ দত্তর (স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী ছিলে[illegible] [illegible]কেই সাতকড়ির একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল পরাধীন [illegible] [illegible]করার। ছাত্রজীবনে তিনি হরিকুমার চক্রবর্তী ও নরে[illegible] [illegible] (এম এন রায়) সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত [illegible] [illegible]সভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তিনি [illegible] [illegible]লা সংস্কৃত স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। তখন বাধ্য [illegible] [illegible]তার মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হতে হয়। সেখানে স্কু[illegible] [illegible] পর কলকাতার ডানহাম হোমিওপ্যাথি কলেজে তিনি [illegible] [illegible]ওপ্যাথি ডাক্তার হওয়ার পর সাতকড়িবাবু বারুইপু[illegible] [illegible] [illegible]সারি খোলেন। ডাক্তারির পাশাপাশি সমানতালে চল[illegible] [illegible]ক [illegible] [illegible]র্মকাণ্ড। 'যুগান্তর' দলের অন্যতম সংগঠক হিসাবে [illegible] [illegible] [illegible]তে থাকেন। বারুইপুরের ডিসপেন্সারিটি ক্রমে বিপ্লবী [illegible] [illegible]কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিপ্লবী বাঘাযতীন, যদুগোপাল মু[illegible] [illegible] [illegible] রায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, সুনীল চ্যাটার্জী প্রমুখের আ[illegible] [illegible] [illegible]থাকে ওই ডিসপেন্সারিতে।

বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়: জন্ম ১৭ অক্টোবর ১৮৮৯, মৃত্যু ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

স্বাভাবিকভাবেই ডিসপেন্সারিটি বৃটিশ পুলিশের সন্দেহের দৃষ্টিতে পড়ে।

১৯১৪ সালে বজবজ পোতাশ্রয়ে কোমাগাতামারু জাহাজের যাত্রীরা ইংরেজ পুলিশের গুলিবর্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের আশ্রয় দেন ও নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য বাঘাযতীনের পরিকল্পনামত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জার্মান থেকে ম্যাভেরিক জাহাজে যে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তা সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর মোহনা থেকে সংগ্রহ করে আনার দায়িত্ব যাঁরা নেন সাতকড়ি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা জানাজানি হয়ে যায়। 'যুগান্তর' দলের অনেকেই ধরা পড়ে যান। বিপ্লবী বাঘাযতীন শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। তখন ছত্রভঙ্গ 'যুগান্তর' দলের সংগঠনের হাল ধরেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে বহু যুবক সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তরুণ বিপ্লবী যুবকদের অত্যন্ত প্রিয় সাতুদা।

'যুগান্তর' দলের কাজকর্ম চালানোর জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাধন সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সাধন সংঘ যুগান্তর দলের শাখা সংগঠন হিসাবে কাজ করতে থাকে। সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অপরিসীম। বহু যুবক তাঁর সান্নিধ্যে এসে বিপ্লবী জীবনকেই সেদিন মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সেই সময় বিপ্লবী যুবকদের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল। ওয়াটসন হত্যাকাণ্ড মামলার বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী, ডালহৌসি বোমা মামলার অমূল্য দাশগুপ্ত ও অমিয় মণ্ডল, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট যুদ্ধের বিপ্লবী যোদ্ধা জলদানন্দ মুখার্জী, গার্লিক নিধনযজ্ঞের কিশোর বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য প্রমুখ তাঁর

নেতৃত্বে জীবন উৎসর্গ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। জীবনেব প্রায় অর্ধেকটা সময় তাঁর বিভিন্ন জেলে কাটে। শেষে দেউলীর বন্দীশিবিরে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয়।

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন শত শত মহাপ্রাণ মানুষ। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে নিজের নাম সুকৌশলে গোপন রেখে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার নজির বিরল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বিরল নজির সৃষ্টি করেছিলেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য। কানাইলালের জন্ম দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুর গ্রামে। ছোটবেলায় আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, বাঘাযতীনের বুড়িবালামের যুদ্ধ, মাস্টারদা সূর্য সেনের জালালাবাদ যুদ্ধের কাহিনী তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রমে তিনি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। নীরবে, নিভৃতে কঠিনকঠোর সংগ্রামের ব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কানাইলালকে যুগান্তর দলের নেতারা রিভলভার চালানোর শিক্ষা দিতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যেই কানাইলাল রিভলভার চালানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেন।

শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য

সেই সময় রাইটার্স বিল্ডিংসের ঐতিহাসিক অলিন্দযুদ্ধে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক সিম্পসন সাহেবকে হত্যা করে বীরের মৃত্যু বরণ করেন বাংলার দুই দামাল ছেলে বিনয় বসু ও বাদল গুপ্ত। ধরা পড়েন দীনেশ গুপ্ত। দীনেশ গুপ্তর বিচার হয়। বিচারে ফাঁসির আদেশ দেন ইংরেজ বিচারপতি আর আর গার্লিক। এই খবরে সারা বাংলার বিপ্লবীরা গর্জে ওঠেন। বিপ্লবীরা ঠিক করেন গার্লিক সাহেবের বিচার তাঁরাই করবেন। দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিপ্লবী সংগঠন 'সাধন সংঘ'-র ওপর গার্লিকের বিচারের দায়িত্ব পড়ে। 'সাধন সংঘ'র নেতা সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডানহাত সুনীল চ্যাটার্জীর ওপর দায়িত্ব দেন এ ব্যাপারে পরিকল্পনা নেওয়ার।

সুনীল চ্যাটার্জীর পরিকল্পনা ও নির্দেশমত কানাইলাল একদম অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলের বেশে ১৯৩১-এর ২৭ জুলাই অর্থাৎ দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির আদেশ দেওয়ার ২০ দিন পর আলিপুরের জজকোর্টের এজলাসে ঢুকে গুলি করে গার্লিক সাহেবকে হত্যা করে নিজে পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিটিশ পুলিশরা তখন অপরিচিত মৃত যুবকের পরিচয় জানার আশায় পকেট খুঁজে একটা ছোট কাগজের টুকরো পায় এবং দেখে তাতে লেখা 'ধ্বংস হও—দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির দণ্ড লও—বিমল দাশগুপ্ত।'

সেই সময় পেডি হত্যাকারী মেদিনীপুরের বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ফেরার ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যাতে কানাইলালের মৃতদেহ দেখে পুলিশের ধারণা হয় এটাই বিমল দাশগুপ্ত এবং পুলিশ যাতে আর বিমল দাশগুপ্তকে না খোঁজে এমন পরিকল্পনা নিয়েই কানাইলাল পকেটে ওই চিরকুট রেখেছিলেন। তাই কানাইলালের মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত পুলিশ জানতে পারেনি কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ি। এমনই ছিল দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিপ্লবী সংগঠন 'সাধন সংঘ' তথা যুগান্তর দলের কর্মীদের বিপ্লবী মানসিকতা।

ভূতনাথ ভট্টাচার্য

(১৯০৬—১৯৯২)

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার মজিলপুর গ্রামে ভূতনাথ ভট্টাচার্যর জন্ম। স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসকামী ধারার একজন প্রধান সৈনিক ছিলেন তিনি। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজির আহ্বানে যখন সারা ভারতবর্ষে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন চলেছিল ভূতনাথবাবু তখন সেই আন্দোলনে এই জেলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ারের এই অঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর আহ্বানে সেই সময় এই অঞ্চলের বহু যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াটসন হত্যা মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ছ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেলে থাকাকালীন তিনি মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হন। ভূতনাথবাবু দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন।

মন্মথ ঘোষ

(১৯১১—১৯৯৩)

জয়নগর-মজিলপুরের মন্মথ ঘোষ বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামই হল দেশের স্বাধীনতা আনার একমাত্র পথ। সশস্ত্র সংগ্রামের ব্রতে কঠিনকঠোর মন্মথবাবু ছিলেন অগ্নিযুগের সশস্ত্র অ্যাকশনে ব্যবহারের জন্য যে সব অস্ত্রশস্ত্র বিপ্লবীরা সংগ্রহ করতেন সেই সব অস্ত্রর প্রধান রক্ষক। ব্রিটিশ পুলিশবাহিনী এটা জানা সত্ত্বেও কোনও দিনই অস্ত্রশস্ত্রসহ তাঁকে ধরতে পারেননি বা তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অস্ত্র পাননি।

মন্মথনাথ ঘোষ

মন্মথবাবু ছিলেন বিপ্লবী সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনকড়ি দাস, সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবীদের সহকর্মী। ওয়াটসন হত্যা মামলায় তিনকড়িবাবু গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘকাল কারাবাস করেন।

কুন্তল চক্রবর্তী

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মজিলপুর গ্রামে কুন্তল চক্রবর্তীর জন্ম। পিতার নাম কেদারনাথ চক্রবর্তী। কুন্তল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বৃত্তি পেয়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। চাংড়িপোতা রেল স্টেশনে স্বদেশি ডাকাতির যাবতীয় টাকাপয়সা নিয়ে জয়নগর-মজিলপুরে পালিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে ওই টাকা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে লেগেছিল। কুন্তল চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির শাখা সংগঠন মহামায়া ক্লাবের সক্রিয় সভ্য ছিলেন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী চারু ঘোষ ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়। এঁদের সহযোগিতায় তিনি 'সত্যাশ্রয়' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। কুন্তলবাবু দৌলতপুরে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন।

তি[illegible]কড়ি [illegible]াস

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষি[illegible] মজিলপুর গ্রামে তিনকড়ি দাসের জন্ম। খুবই দরিদ্র [illegible] হওয়ায় তিনি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। [illegible] অনটন থাকায় বাধ্য হয়ে কলকাতায় ইংরেজ সাহে[illegible]র করতেন। কিন্তু ইংরেজ সাহেবের কাছে কাজ কর[illegible] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের গু[illegible]ঠন [illegible]ন্নতি সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনকড়িবাবু ব্যা[illegible]ঠি চালানোয় দক্ষ ছিলেন। বাংলার রণপা দৌড়ে তাঁর [illegible] না। তিনকড়ি দাসের সঙ্গে বিপ্লবী বাঘাযতীন, এম এ[illegible] আলাপ হওয়ার পর তিনি পরিপূর্ণভাবে বিপ্লবী সং[illegible]ড়েন। ন্যাড়া রেল স্টেশন ডাকাতিতে তিনি ডায়মন্ড[illegible]পায়ে এসে ডাকাতি করে এত দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌ[illegible]শ সাম্রাজ্যবাদীদের পুলিশ বিশ্বাসই করতে পারেন[illegible] ওই ডাকাতিতে ছিলেন। পরবর্তীকালে হাওড়ার গ[illegible] অন্তরীণ হতে বাধ্য হন। বহুবার পুলিশ ধরবার চেষ্টা করেও তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হয়। পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ায় তিনি ছিলেন ওস্তাদ। অসীম সাহসিকতা ও দৈহিক শক্তির জন্য বিপ্লবী দলের তিনি একজন গুরুত্ব-পূর্ণ সভ্য হয়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বেই জয়নগর-মজিলপুরে 'আত্মোন্নতি সমিতি'-র কাজকর্ম চলত। তিনকড়িবাবু শেষজীবনে আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন নেননি।

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

(১৮৯৬—১৯৮৫)

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর জন্ম ডায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত শ্যাম বসুর চক গ্রামে। অর্থনীতিতে এম এ ও পরবর্তীকালে এল এল বি পাশ করে তিনি ওকালতি পেশায় যুক্ত হন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজির আহ্বানে চারুবাবু স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে দশ বছর কারারুদ্ধ করে রাখেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চারুবাবু পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী হন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস ত্যাগ করে তিনি কৃষক মজদুর-প্রজা পার্টিতে যোগদান করেন। এই পার্টির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি জয়লাভ করেন। এর পরে তিনি আচার্য বিনোবাজির ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং বিধানসভার সদস্যপদ সহ সমস্ত রকম দলীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করে ভূদানযজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 'সর্বোদয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এই সর্বত্যাগী অহিংস আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধার জীবনাবসান হয়।

রজনীকান্ত ভট্টাচার্য

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ২৪-পরগনার জয়নগর-মজিলপুরে রজনীকান্ত ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। রজনীকান্ত অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতার সিটি কলেজে পড়ার সময় তিনি বাঘাযতীনের সংস্পর্শে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৭ সালের ন্যাতড়া রেল স্টেশন ডাকাতিতে তিনি, জয়নগর তিলিপাড়ার চুনীলাল নন্দী ও মজিলপুরের কুন্তল চক্রবর্তী ছিলেন। ন্যাতড়া রেল ডাকাতিতে পুলিশ রজনীকান্তকে সন্দেহ করলেও প্রমাণ অভাবে গ্রেপ্তার করতে পারেন নি। ১৯০৯ সালে হাওড়ার গ্যাং কেসে তিনি গ্রেপ্তার হন। দেড় বছর কারাবাসের পর পর মামলায় প্রমান অভাবে মুক্তি পান। জেলে থাকাকালীন রজনীবাবু আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হন এবং পরবর্তীকালে শ্রীরামদাস বাবাজীর নিকট দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন। তাঁর অগণিত ভক্ত ও শিষ্যগণ বর্তমানে তাঁরই জন্মস্থানে একটি আশ্রম স্থাপন করেছেন।

সুনীল চ্যাটার্জী

(১৯১১—১৯৮৮)

সুনীল চ্যাটার্জীর জন্ম দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার বহড়ুর গঙ্গাঘাটায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুনীল

চ্যাটার্জী ছাত্রজীবনেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি 'যুগান্তর' দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। 'যুগান্তর' দলের বিশিষ্ট সংগঠক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণহস্ত ছিলেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়। বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য তাঁরই পরিকল্পনামত ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুলাই আলিপুর জজকোর্টে ঢুকে কুখ্যাত বিচারক গার্লিককে গুলি করে হত্যা করে নিজে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন।

১৯৩২-এ ওয়াটসন হত্যা মামলায় প্রধান অভিযুক্ত সুনীল চ্যাটার্জী ধরা পড়েন ও বিচারের প্রহসনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে সুনীল চ্যাটার্জীর মৃত্যু হয়।

প্রভাস রায়

দক্ষিণ ২৪-পরগনার বড়ুল গ্রামে প্রভাস রায়ের জন্ম। ওই গ্রামে তখন চট্টগ্রাম বিপ্লবী যুব গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা অনুরূপচন্দ্র সেন শিক্ষকতা করতেন। প্রধানত তাঁর শিক্ষাতেই প্রভাসবাবু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। সেই সময় দরিদ্র কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার কিশোর প্রভাস রায়ের হৃদয় বিদীর্ণ করে। ক্রমে তিনি কলকাতার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন ও বিপ্লবী সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে প্রভাসবাবু নিজ গ্রামে কৃষকদের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসেন। ওই সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কেসে তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। তখন তিনি আত্মগোপন করেই যাবতীয় রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৩২ সালে প্রভাসবাবুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিনা বিচারে আটক করে রাখে। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তিনি ১৯৩৮-এ ফজলুল হকের ভূমিরাজস্ব কমিশনের কাছে অখণ্ড ২৪-পরগনার নির্বাচিত কৃষকদের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। ওই স্মারকলিপিতে এই জেলার কৃষকদের সমস্যাবলীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল।

বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী প্রভাস রায় ১৯৪২-এর ভয়াবহ বন্যা ও ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষকদের মধ্যে সেবামূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি ছিলেন এই জেলার কৃষকদের হৃদয়ের মানুষ। সুন্দরবনের মেছোভেড়ি দখলের আন্দোলন, অতিরিক্ত সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন, ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে এই অঞ্চলে জোরদার হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৮-এ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হলে প্রভাসবাবু আত্মগোপন করে সাংগঠনিক কাজকর্ম করতে থাকেন। ১৯৪৯-এ ক্যানিংয়ে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ১২৯ জন কৃষক কর্মীসহ তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯৫০ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে প্রভাসবাবু ১৯৫১ সালের জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হন। প্রভাসবাবু সি পি আই এম দলের দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। দলমত-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য

(১৯১২—১৯৯০)

দক্ষিণ ২৪-পরগনার মাহিনগর গ্রামে সন্তোষকুমার ভট্টাচার্যর জন্ম। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে সন্তোষবাবু এই জেলার বিপ্লবী সংগঠনের প্রধান সংগঠন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এসে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। তিনি 'যুগান্তর' দলের অন্যতম শাখা 'সাধন সংঘ'-র বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র সংগ্রামে এই জেলার অন্যতম সংগঠন 'সাধন সংঘ'-র নেতৃত্বে যে সব অ্যাকশন সংঘটিত হয়েছিল সন্তোষকুমার ভট্টাচার্যর তাতে সাহসদীপ্ত, প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট, কুখ্যাত বিচারপতি আর আর গার্লিক, স্টেটসম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসনকে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে কারাবাস করতে হয়। বিপ্লবী দলে সন্তোষবাবুর ছদ্মনাম ছিল শান্তি ওরফে মিএণ। এই নামেই তিনি সহকর্মীদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভালো দেশাত্মবোধক সংগীত গাইতে পারতেন।

সন্তোষবাবুর লেখা প্রবন্ধ 'দক্ষিণ ২৪-পরগনার সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা' শৈলেশ দে সম্পাদিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল 'অগ্নিযুগ'-এ সংযোজিত হয়েছে। তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথা তিনি 'রক্তে রাঙা দিনগুলি' নামে একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে যে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন তা তাঁর ওই লেখা পড়লেই বোঝা যায়। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট সন্তোষবাবুর জীবনাবসান হয়।

শচীন ব্যানার্জী

(১৯১৫—১৯৮৫)

জয়নগরের শচীন ব্যানার্জী ছাত্রাবস্থাতেই অগ্নিযুগের বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ
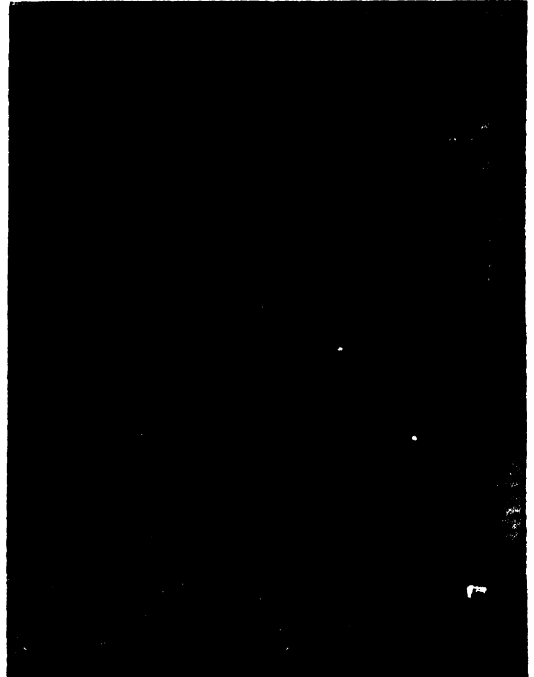
সরকারের হাতে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়। ব্রিটিশবিরোধী যুবমানস গঠনকল্পে তিনি জয়নগরে শান্তি সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এই সময় তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল ও পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দীর্ঘকাল কারাবাস করেন। জেলে থাকাকালীন অগ্নিযুগের আর এক বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির শিবদাস ঘোষ সহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে শচীনবাবু ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। জেলের মধ্যেই তাঁরা একটি সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পরিকল্পনামাফিক কাজকর্ম চলতে থাকে। ওই সময় শচীনবাবু জয়নগরে ফিরে এসে নানা জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ক্রমেই তিনি ছোটবড় সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। শচীনবাবুর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি নীরবে নিভৃতে কাজ করতেন নিরলসভাবে। ১৯৪৮ সালে শচীনবাবুই জয়নগরের বাসন্তী নাট্য মন্দিরে একটি রাজনৈতিক কনভেনশনের আয়োজন করেন। ওই কনভেনশন থেকেই এস ইউ সি আই দল প্রতিষ্ঠিত হয়। শচীনবাবু দীর্ঘ ২৩ বছর জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। শচীনবাবুর নেতৃত্বে দক্ষিণ ২৪-পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন, জমিদারি প্রথা বিলোপ আন্দোলন, বর্গাস্বত্ব আন্দোলন ও খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তিনি এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য ছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

(১৯০৯—১৯৪৭)

জয়নগরের শচীন্দ্রনাথ মিত্র ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন আন্দোলনে যোগদান করার জন্য কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯২৯ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৩১ সালে নিখিল ভারত যুব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ও তদানীন্তন ইউথ লিগের বঙ্গীয় শাখার প্রধান হন। সেই সময় তিনি ইন্ডিয়া টো-মরো পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তিনি ফিল্ডম্যান পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। ১৯৩৯-এ গান্ধীজির চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শচীনবাবু ৪২-এর ঐতিহাসিক আগস্ট আন্দোলনে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আবার গ্রেপ্তার হন। তিনি কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ, কর্মী সংঘ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময় তিনি পূর্ববাংলায় যান। দাঙ্গার বিরুদ্ধে শান্তি মিছিল করার সময় ছুরিকাহত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
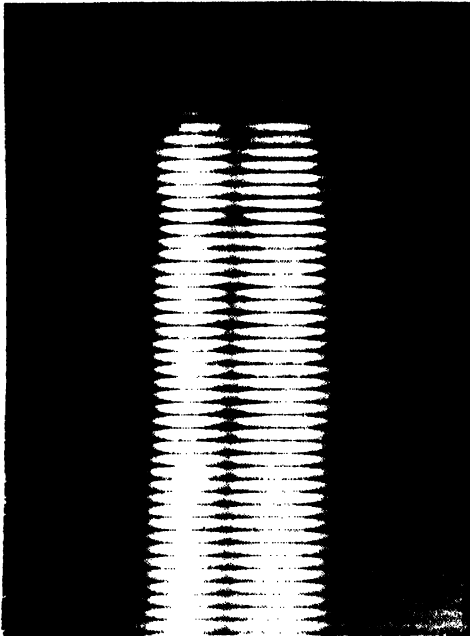
শচীন্দ্রনাথ মিত্র

এমন আরও অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কমবেশি কারাবাস ও কারার অন্তরালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। তাঁদের সকলের জীবনী ও কর্মকাণ্ড সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তবে তাঁদের যতজনের নাম আজও পর্যন্ত জানা গেছে তা দেওয়া হল : যতীন্দ্রনাথ রায়, দীনেশ মজুমদার, বঙ্কিম বৈদ্য, জগদানন্দ মুখার্জী, পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, সুরেশ দাস, অমর ঘোষ, অমূল্য দাশগুপ্ত, তুলসী মণ্ডল, সুকুমার সেন, ললিত ঘোষাল, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, কানাই ব্যানার্জী, দেবেন মিশ্র, ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য, নৃপেন চক্রবর্তী, হরিচরণ ভট্টাচার্য, পান্নালাল চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ ঘোষ, জানকী চ্যাটার্জী, সন্তোষ ব্রহ্মচারী, অমিয় মণ্ডল, ক্ষিতিপ্রসাদ দাস, অনিল ভাদুড়ী, মানস বক্সী, মণি লাহিড়ী, প্রমোদ বসু, রামহরি চ্যাটার্জী, সৌরেন দত্ত, জীতেন ঘোষ, কালী ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, নারান ব্যানার্জী, প্রবোধ ভট্টাচার্য।

সুভাষচন্দ্র বসু

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উড়িষ্যার কটক শহরে জন্ম হলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণ ২৪-পরগনার চাংড়িপোতা গ্রামে।

সুভাষচন্দ্র বসু

1 Woodburn Park
Calcutta
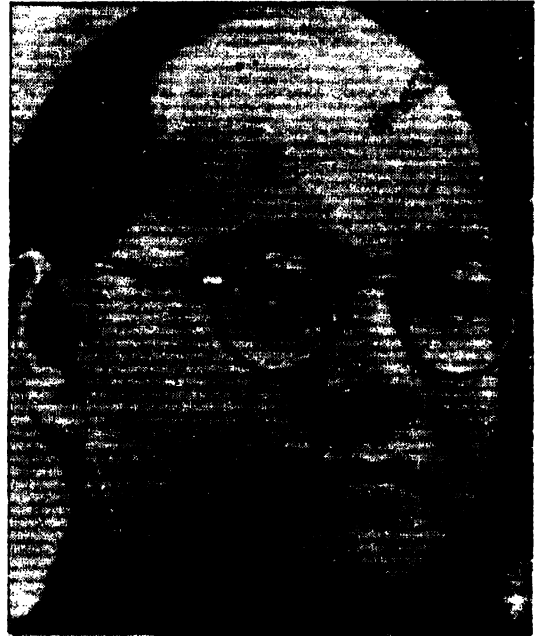
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার অন্যতম সৈনিক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাই চাংড়িপোতা গ্রামটি বর্তমানে সুভাষগ্রাম নামেই পরিচিত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের সেরা ছাত্র হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৯-এ তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি এ পাশ করেন। ১৯২০-তে ইংলন্ডে আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। পরিণত বয়সে সুভাষবাবু দেশের আপামর জনসাধারণের প্রিয়পাত্র তথা প্রিয় নেতায় রূপান্তরিত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বভারতীয় স্তরে তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল। এই জেলার বিপ্লবীরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এই জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সব গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সুভাষবাবুর যোগাযোগ ছিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজির অবদান লিখতে বসলে একটি মোটা বই লেখা হয়ে যায়। তা ছাড়া দেশের সব মানুষই মোটামুটিভাবে তা জানেন কিন্তু পৈতৃক ভিটার সূত্রে তিনি যে এই জেলারই সন্তান তা সম্ভবত অনেকেই জানেন না।
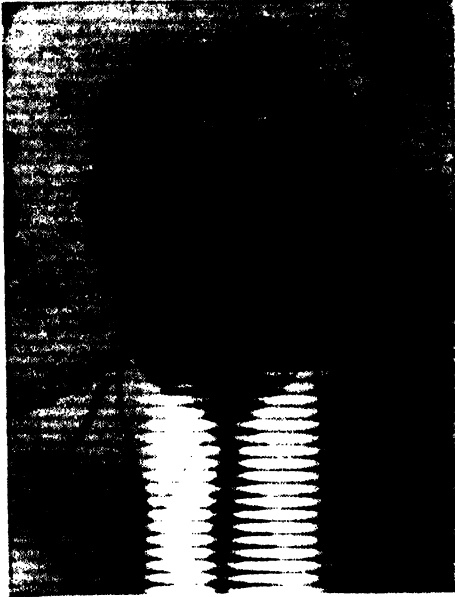
ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের সভাপতি
অনুকূল চন্দ্র নস্কর

অনুকূলচন্দ্র দাসনস্কর

তেঁতুলবেড়িয়ার অ[illegible] নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি [illegible]শগ্রহণ না করলেও পেছন থেকে বিপ্লবীদের প্রচুর [illegible]ন। গড়িয়ায় ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট গঠিত হলে তিনি [illegible]ন। অনুকূলচন্দ্র এম. এ পাশ করে আইন নিয়ে পড়া[illegible] আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওকালতি শুরু করলেও [illegible] পরিচিত ছিলেন সমাজসেবক রূপে।
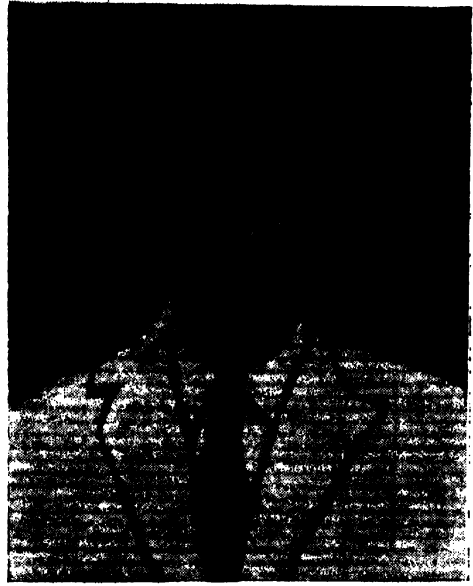
টেগার্ট হত্যায় দণ্ডিত সশস্ত্র বিপ্লবী অমিয়ভূষণ মণ্ডল

অমিয়ভূষণ মণ্ডল

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গড়িয়ায় জন্ম। পিতা যোগীন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন রানাভূতিয়ার জমিদার। শৈশবেই অমিয়ভূষণ পিতাকে হারান। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি সন্ত্রাসবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পড়ার সময় বিপ্লবী জগদানন্দের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে কলেজে পড়াকালীন বিনয় বাদল ও দীনেশের সঙ্গেও পরিচিত হন। লোকনাথ বল ও অমিয়ভূষণ একসঙ্গে লাঠিখেলা ছোরাখেলা ও বক্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। টেগার্ট হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর সাত বছরের কারাদণ্ড হয়। কারাগারেই তিনি আইন নিয়ে পড়াশুনো শুরু করেন এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ও স্নেহভাজন হন।

তথ্যসূত্র

১। রক্তে রাঙা দিনগুলি—সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য।
২। দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার জীবনী সংকলন—নবনির্মা। সম্পাদক প্রভাত ভট্টাচার্য;
৩। দক্ষিণ ২৪-পরগনার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন স্মারক সংখ্যা।
৪। চব্বিশ পরগনার শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ও প্রভাস রায়।
৫। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের লোকজন।

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক*

এক নজরে চব্বিশ পরগনার স্বাধীনতা সংগ্রাম

মাতলা, বেহালা, সরশুনার দুর্গ ও পর্তুগীজ গড় কুলপী, তাড়দহে যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের প্রতিরোধ মোগল বাহিনী চূর্ণ করে দিল। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সূর্যকান্ত গুহ, মদন মল্ল, ইব্রাহিম খাঁ ও রডার মতো সেনাপতি পরাজিত হল। ২৪-পরগনার মাতলায় শেষ যুদ্ধ বাংলার স্বাধীনতার প্রয়াসকে স্তব্ধ করে। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু ১৬১০ সালে।

❑ ২৪-পরগনা জমিদারির এক পরগনা কলকাতায় গড় তৈরি করতে গিয়ে পর্যুদস্ত হয়ে ক্লাইভ ডাচ কলোনি ফলতার দুর্গে আশ্রয় নিলেন। বিজয়ী সিরাজদ্দৌলা বজবজ দুর্গের অধ্যক্ষ মানিকচাঁদের হাতে কলকাতার ভার দিয়ে ফিরলেন।

❑ পলাশী যুদ্ধের পূর্বে মীরজাফর-ক্লাইভ চুক্তি যুদ্ধশেষে মীরজাফর হবেন নবাব আর কোম্পানির কর্মচারী ক্লাইভ হবেন ২৪-পরগনার জমিদার। এই জমিদারির জন্যই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইমপিচমেন্ট ও অবশেষে ক্লাইভের আত্মহত্যা।

❑ ১৭৭২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে শক্তি সংহত করতেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলল বারাসাত, ব্যারাকপুর আর দমদমে এবং কাশীপুর ইছাপুরে বন্দুক কারখানা তৈরি করা হল।

❑ কলকাতায় তৈরি হল ব্যবসা কেন্দ্র, কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, ক্রয়বিক্রয় কুঠি। অনেক পরে নতুন বন্দর গড়ে উঠলো ক্যানিং ও ডায়মণ্ডহারবারে।

❑ ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সিপাহি বিক্ষোভের পর লর্ড আমহার্স্ট বারুইপুরে ২৪-পরগনা জেলার জেলা-সদর করলেন। চার বছর পর বেণ্টিক আমলে তা স্থানান্তরিত হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বারুইপুর নিমকি (Salt) বিভাগের জেলা সদরে কালেক্টর হন দ্বারকানাথ ঠাকুর।

❑ ১৮৩১-এ বারাসাতের নারকেলবেড়িয়ায় তিতুমীর বাহিনীর সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারের লড়াই। কামানের গোলায় ভেঙে পড়ল তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, কিন্তু লড়াই চলতেই থাকে নানান কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

❑ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ করলেন শ্রীশ বিদ্যারত্ন। বাড়ি তাঁর গোবরডাঙায়।

❑ ১৮৫৭-র বারুইপুরের রাজকুমার রায়চৌধুরীও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে গণ দরখাস্তে স্বাক্ষর দেন। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে তার স্বীকৃতি আছে।

❑ ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল ব্যারাকপুর ব্যারাকের বিদ্রোহী সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডের প্রকাশ্য ফাঁসির প্রতিক্রিয়া ঠেকাতে গোরা সৈন্য জমায়েত হল বাংলার দুর্গে দুর্গে। তাই সিপাহি বিদ্রোহ বাংলায় সফল হয়নি। ৬৪ বছরের চিরস্থায়ী জমিদারদের সমর্থন ছিল ইংরেজদের কোম্পানির দিকে।

❑ ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে শাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বারুইপুর হল মহকুমা। থানা জয়নগর, মাতলা আর প্রতাপনগর নিয়ে। তার ১১ বছর পর হল একটি পৌরসভা। দুবছর ধরে চলা বারুইপুর স্কুল হল হাই ইংলিশ স্কুল।

❑ নীলকরদের 'গাদন' দেখাতে 'সাপে কাটা পথিক' বনগাঁর দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন 'নীলদর্পণ নাম নাটকম্'। চাষীদের প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ মধ্যবিত্ত জীবনের সমর্থন পেয়ে সফল হল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বারুইপুরের টমাস কুক কোম্পানির নীল খ্যাতি ছিল। কল্যাণদিঘি রায়দিঘির নীল আসত বারুইপুরের নীলকরদের কাছে।

❑ নীলদর্পণ ইংরেজি অনুবাদ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ঠাকুরপুকুরের গির্জার ফাদার লঙ তা সার্ভিস স্টাম্পে 'আয়নায় মুখ দেখার জন্য' পাঠালেন বিলেত। কিন্তু নীলকরদের মামলায় তাঁর জরিমানা হল।

❑ বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৬৪-৬৯)। দুর্গেশনন্দিনী (নারীর অধিকার,) কপালকুণ্ডলা, (গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব) ও মৃণালিনী (স্বদেশ চিন্তা) উপন্যাসের মাধ্যমে।

❑ চাঙড়িপোতার (সুভাষগ্রাম) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' জমিতে চাষীর অধিকার আর মজুরদের আট ঘন্টা কাজের দাবি সমর্থন করলো (১৮৬২)। বাংলা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদে সোমপ্রকাশ বন্ধ হল।

❑ কাশীপুর, বরানগরে শুরু স্বদেশি ধর্মনিরপেক্ষ 'চৈত্রমেলা'। পরবর্তী নাম হিন্দুমেলা (১৮৬৭)। মেলায় স্বদেশি সঙ্গীত, বিজ্ঞান-প্রদর্শনী, রাজনীতিক সম্মেলন ছিল বৈশিষ্ট্য।

❑ বারুইপুরেও (১৮৭১-৭৪) ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী, সংগ্রামী, অসুর ও পরবশ্যতার সঙ্গে যুদ্ধরত উৎপাদনমুখী 'উন্নতি দেবী'কে (যাঁর হাতের অস্ত্র—কৃষি, শিল্প, উদ্যানতত্ত্ব, বাণিজ্য, সাহিত্য, ব্যায়াম, সামাজিক জীর্ণতার সংস্কার, স্বাবলম্বন, প্রতিযোগিতা ও ঐক্য) সামনে রেখে সঙ্গীত সহযোগে রাজনৈতিক সমাবেশ হল। ভাষণ দিলেন ছোট জাগুলিয়ার নাট্যকার মনোমোহন বসু ১০,০০০ মানুষের সমাবেশে। বরানগরের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমজীবী সমিতি, শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, সেই সঙ্গে বার করলেন ভারতে শ্রমজীবী পত্রিকা। ভারতে শ্রমজীবী প্রথম সংখ্যায় (১৮৭৪ খ্রিঃ মে) মজিলপুরের শিবনাথ শাস্ত্রী কবিতা লিখলেন—"ওঠো জাগো শ্রমজীবী ভাই, উপস্থিত যুগান্তর, চলাচল নারী নর, ঘুমাবার বেলা আর নাই।" শাস্ত্রীমশাই ১৮৭৭-এ গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কথাও লিখেছিলেন।

❑ ইণ্ডিয়ান-'অ্যাসোসিয়েশন' 'লিগ' আর 'কনফারেন্স' নেতা ইয়ং বেঙ্গল শিরোমণি বারুইপুরের রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার পত্রিকা, অস্ত্র আর নাটকের তিন আইন নিয়ে লড়লেন। ইংরেজ অস্ট্রেলিয়ান হিউম 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করলেন।

❑ ইন্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কনফারেন্সকে ফেডারেটিভ করতে ব্যারাকপুরের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানুয়ারি, ১৮৮৫তে গড়েন স্থানীয় সংঘ 'জয়নগর' অ্যাসোসিয়েশন।'

❑ ১৮৮৫-র ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ের পুনায় প্রথম কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হলেন খিদিরপুরের উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

❑ 'সর্দারি' প্রথার বিরুদ্ধে বজবজের চটকলের ৯০০০ মজুরের ঘেরাও, রক্তাক্ত প্রতিরোধ অভিযান চলে। টিটাগড়ের মজুরদের লড়াইয়ে গুলি চলল। গার্ডেনরিচেও চলল শ্রমিক আন্দোলন।

❑ শিকাগোর বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে সর্বধর্মসমন্বয় নীতির বিজয় ঘোষণা করে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ১৯ ফেব্রুয়ারি বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) বজবজে জাহাজ থেকে নামলেন।

❑ মলঙ্গী (লবণ মজুরে) মজুরদের অভিযানে চম্পাহাটি সল্ট এজেন্ট ব্রিটিশ পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নির্যাতন আর মোকদ্দমায় সৌপর্দ হয়েছিলেন ১৮৯৮-এ।

❑ ১৮৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মভূমি পত্রিকা কার্ল মার্কস, বাকুনিন ও সাম্যবাদ বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপায়। পত্রিকা সম্পাদক বারুইপুরের শাসন গ্রামের ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

❑ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মার্চ নৈহাটির ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী 'অনুশীলন' দল গড়লেন। বিপ্লবীদের পাঠ্যসূচিতে রইলো ভুবনচন্দ্রের 'সিপাহি বিদ্রোহ বা মিউটিনি'।

❑ বারাসাতের কৃষ্ণমোহন মিত্র সঞ্জীবনী পত্রিকা নিয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

❑ জাতীয় গৌরববোধ গড়ে তুলতে বোড়ালের ঋষি রাজনারায়ণ 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বদেশ চিন্তার সূত্রপাত হল।

❑ কাঁচড়াপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে (১৮৩৯-) বীরদর্পে ঘোষণা করলেন—'দীন দুঃখীদিগের দুঃখ বর্ণনা করিতে আমাদের কাঠের লেখনী করুণা রসে আর্দ্র, ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও কাহারো নিকট স্বাধীনতা বা অভিপ্রায় বিক্রয় করিব না।'

❑ আলিপুর বোমার মামলায় প্রাপ্ত বন্দেমাতরম গোষ্ঠীর ১৯০৭ সালের ঘোষণা—ইংরেজ বিরোধী হিন্দু মুসলিম ঐক্য, জমিদার উচ্ছেদ, পঞ্চায়েত ও চৌকিদারি শাসন।

❑ বারুইপুরে সামন্তশক্তি [illegible] —স্বেচ্ছাসেবী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ১৯০৮-এর ১২ [illegible] অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী জনস[illegible] [illegible]শীয় বিদ্যালয় হল মদারাট পপুলার আকাডেমি।

❑ প্রতিরোধের দায়িত্ব [illegible] ও যুগান্তর দলের জন-সংগঠন 'আত্মোন্নতি [illegible]বী সভা' ও 'সাধন সংঘ' গড়ে উঠল। বারুইপু[illegible] মাহিনগরের সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়, নরেন ভট্টা[illegible] [illegible]বর্তীরা ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম রাজ[illegible] করলেন চাংড়িপোতা রেলস্টেশনে।

❑ বজবজ শ্রমিকদের [illegible] অশ্বিনী ব্যানার্জি Mills Hands Union গড়লেন [illegible]লের মধ্যে সংগঠিত শ্রমিক সংগঠন ছড়িয়ে পড়ল ব[illegible]পুরে।

❑ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বা[illegible]র [illegible] শিক্ষক হারানচন্দ্র রক্ষিত (মজিলপুর) 'ভিক্টোরীয় [illegible]' লেখার জন্য।

❑ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা সফল করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রের আশায় মেভারিক জাহাজের জন্য হ্যালিডে দ্বীপে অপেক্ষা করে ব্যর্থ হলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বজবজে বাবা গুরুদিত সিং কামাগাটামারু জাহাজের ৪০০ শিখ নিয়ে মিছিল করে। ব্রিটিশ পুলিশের গুলি চালনায় ২০ জন মৃত। গ্রামবাসীগণ শিখদের সেবা করলেন অকুতোভয়ে।

❑ অস্ত্র সন্ধানে বার হয়ে চাংড়িপোতার নরেন ভট্টাচার্য এম এন রায়, ছদ্মনামে সোভিয়েতে ১৯২০-র ১৭ অক্টোবর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গড়লেন। আন্তর্জাতিকের এক সহ-সভাপতি রূপে মানবেন্দ্রনাথ রায় গয়া অন্যান্য কংগ্রেস অধিবেশনে পরামর্শ দিয়েছেন পত্র মারফৎ।

❑ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে চটকল ধর্মঘটে সারা জেলা কেঁপে উঠল। এ জেলার বহু শ্রমিক সংঘ এ আই টি ইউ সি-তে যোগ দেয়। কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহারে ক্ষোভ হয়। মতিলাল ও চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধী-নীতিতে বিরক্ত হয়ে গড়লেন স্বরাজ্য দল। রাজ্য সম্পাদক হলেন কোদালিয়ার হরিকুমার চক্রবর্তী।

❑ ১৯২৫-এ গঠিত বঙ্গীয় শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল তিন বছর পর ভাটপাড়া সম্মেলনে নাম নিল বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল। দলের মুখপত্র লাঙল পত্রিকা দল 'গণবাণী'। সাম্যবাদী চিন্তা ছড়াল কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মে, কংগ্রেসের মধ্যেই।

❑ জার্মানি থেকে ফেরা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লেনিনের নির্দেশে ভারতে ফিরে এলেন কৃষক শ্রমিকদের লড়াই চালাতে। বর্ধমান ও ২৪-পরগনায় তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

❑ ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে এই জেলার কমিউনিস্ট ও যুব বিপ্লবীরা পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে বিশেষ ভূমিকা নিলেন। সুভাষচন্দ্রকে ভরসা নিয়ে প্রস্তাব তোলালেন। সেদিন সুধী প্রধান ও হেমন্ত বসু, তাঁর সহকারী হন।

❑ ১৯৩০-এ ডালহৌসিতে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টায় বসিরহাটের দীনেশ মজুমদার ফাঁসিতে গেলেন। তার আগে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে উন্মুক্ত গুলির লড়াইয়ে তাঁর সঙ্গী ছিলেন জগদ্দলের জগদানন্দ মুখার্জিরা।

❑ আইন অমান্যে লবণ সত্যাগ্রহে ভারতের প্রথম শহিদ ডায়মন্ডহারবারের তরুণ খেতমজুর আশুতোষ দলুই। মেয়র সুভাষচন্দ্র তাঁকে 'দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী মহান সন্তান' বলে ঘোষণা করলেন চিঠিতে। রাজারহাটে লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক, সাগরের গঙ্গাধর দাস নিহত হলেন। নটনায়ক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লবণ কর্মীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কালিকাপুরে। লবণ আইন অমান্যে বারুইপুরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শাসনের অধ্যাপক রাসবিহারী চ্যাটার্জী, ডাঃ তুলসী পাল, সতীশ দে।

❑ ১৯৩১-এর ২৭শে জুলাই মজিলপুরের কানাই ভট্টাচার্য আলিপুরের বিচারপতি গার্লিককে হত্যা করে আত্মঘাতী হলেন।

❑ ১৯৩৭-এ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মুজফ্‌ফর আহমেদ, নজরুল ইসলাম, বঙ্কিম মুখার্জির প্রেরণায় বুড়ুলের প্রভাস রায়, ফলতার যতীশ রায়, ব্যারাকপুরের রাসবিহারী ঘোষ, স্বরূপনগরের আবদুল রেজ্জাক খাঁ, নলিনীপ্রভা ঘোষ, ভূতনাথ ভট্টাচার্য কৃষক সভা গড়ে তুললেন। প্রথম সম্পাদক মজিলপুরের ভূতনাথ ভট্টাচার্য। ১৯২৮-এ রাজারহাটে কৃষক সম্মেলন প্রথম হয়েছিল এর আগে।

❑ শ্রমিক আন্দোলনে এলেন ধপধপির বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ঘোষ, (যিনি বিয়ে করেন কুমিল্লা জেলার বিপ্লবী ছাত্রী সুনীতি চৌধুরীকে) খিদিরপুরের বিশ্বনাথ দুবে, নৈহাটির গোপেন চক্রবর্তী। তিনের দশকের শেষ দিকে ব্যাপক চটকল ধর্মঘটে শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথ।

❑ ১৯৩২-এর ২৯ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ গোসাবার হ্যামিলটন স্টেটে এলেন কৃষিবিদ জামাতাকে নিয়ে। আধুনিক কৃষি ও সমবায় ব্যবস্থা গড়া তাঁদের লক্ষ্য।

❑ গান্ধীবাদী সতীশ দাশগুপ্ত সোদপুরে গড়লেন অভয় আশ্রম। গান্ধীজী বলতেন, দ্বিতীয় সবরমতি।

❑ ১৯৩৯-এ র‍্যাডিক্যাল পার্টি, পরে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের আহ্বান দেয়। বারুইপুর, বেলঘরিয়া গ্রামে তা পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯৪১-এ জাপানি বোমা পড়ল খিদিরপুরে। কলকাতা জনশূন্য হল।

❑ ১৯৪৩,৫০-এর মহামারী মন্বন্তর। মানুষ মরল লাখে লাখে। ২৪-পরগনার ব্যাপক মানুষ ভিক্ষার আশায় গ্রাম ছাড়ে। 'মাগো ফ্যান দেবে'-আওয়াজে বাতাস ধ্বনিত হল। কমিউনিস্টরা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে কৃষক শ্রমিক বস্তিতে রিলিফ-কিচেন করে।

❑ ১৯৪৫-এ দাঙ্গা ছড়াল কিছু শ্রমিক অঞ্চলে। মানুষের জীবন রক্ষায় জনরক্ষা সমিতি কাজ করে। সংগঠিত প্রতিরোধ হয়েছিল, তাই দাঙ্গা ছড়াতে পারেনি। এ জেলার গ্রামান্তরে শান্তি ছিল পূর্ণ মাত্রায়।

❑ ১৯৪৬-এ বোম্বাই নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে বেহালায়ও নৌ-বিদ্রোহ। নৌ, পদাতিক ও বিমান বাহিনীর সঙ্গে ৮টি রাজ্যের পুলিশ ও বিদ্রোহ করে। কেন্দ্রীয় ডাক-তার-কর্মীরাও সঙ্গে।

❑ তেভাগের দাবি সন্দেশখালি কাকদ্বীপে শুরু হোল। ধানের ফসলের চাষীরা দুভাগ, মালিকের একভাগ দাবি। নিহত কৃষক নারী। অত্যাচারী জমিদার ও ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে সাধারণের লড়াই চলেছে দীর্ঘ দিন ধরে।

❑ ছোট জাগুলিয়ার মনোমোহন বসু বারুইপুর চৈত্র মেলায় রাজনৈতিক সম্মেলন গড়ে তুললেন।

❑ চট্টগ্রাম যুব আন্দোলনের নেতা অনুরূপ সেন বুড়ুল স্কুলের শিক্ষকতা নিয়ে এলেন। স্বদেশি কর্মী রূপে গড়ে তুললেন প্রভাত রায়, মুরারিশরণ চক্রবর্তী ও হেমন্ত ঘোষালদের।

❑ ২৪-পরগনায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ২৮৭৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, ৩৫৮ জনের সাজা হয় এবং ১১৪টি হরতাল পালিত হয়। ২২২টি শোভাযাত্রায় ৬৮বার লাঠি চালনায় ১৭৩ জন আহত, ৪৪ বার গুলি চালনায় ১৩১ জন নিহত হন এবং টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয় ১১ বার। চারু ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে ডায়মণ্ডহারবার ও বসিরহাটে কোর্ট অচল হয়ে যায়।

❑ ২৪-পরগনা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট গোপাল বসু ও সম্পাদক প্রভাস রায় বাধ্য হলেন কংগ্রেস মঞ্চ ত্যাগ করে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে।

❑ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষ বসু ও দাদা শরৎ বসু দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগিতায় কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন সুভাষ বসু।

সৌজন্যে ঃ হেমেন মজুমদার
সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, বারুইপুর
(স্থাপিত ১৯৭৯)

ভারতবর্ষের প্রথম কল্পিত দেশমাতৃকা মূর্তি উন্নতি দেবী। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে বারুইপুরে অনুষ্ঠিত চৈত্রমেলায় গ্রামীণ রাজনৈতিক মেলা' উপলক্ষে মনোমোহন বসু বর্ণিত উন্নতি দেবী। 'চৈত্রমেলা' পরবর্তীকালে 'হিন্দুমেলা'য় পরিবর্তিত হয়।

হেমেন মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত

সঞ্জয় ঘোষ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

(সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংকলন)

মুখবন্ধ :

অন্তহীন মানুষের এই পথ-চলা। কে জানে কত সহস্র লক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল এই পথ-চলা। কত লক্ষ কোটি মানুষ সামিল হয়েছিল এই পথ-চলায় সবার কথা ইতিহাস মনে রাখেনি। তবুও এদের মধ্যেই যুগে যুগে দেশে দেশে কিছু অনন্যসাধারণ মানুষের দেখা মিলেছে যাঁরা তাঁদের আত্মত্যাগ, উন্নত মানবিক গুণ বৃহত্তর সামাজিক চেতনা, অসাধারণ নিষ্ঠার সাহায্যে মানুষের এই পথ-চলাকে অর্থাৎ জীবনযাত্রাকে করে তুলেছেন সহজ ও সুন্দর। প্রাত্যহিক জীবনের এক-ঘেয়েমিজনিত ক্লান্তি থেকে মুক্ত করে পথ-চলাকে আনন্দময় করে তুলেছেন। আবার গভীর অন্ধকারে পথ-হারা মানুষকে পথের সঠিক নিশানাটি চিনিয়ে দিতে প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য ও মনীষার উজ্জ্বল আলোকশিখাটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন কেউ কেউ। এমনই অনেক স্মরণীয় মানুষ জন্মসূত্রে, কর্মসূত্রে বা অন্য [illegible]ও [illegible] জড়িত ছিলেন আমাদের এই [illegible] পরগনার সঙ্গেও।

ক্রমেই এটা স্পষ্ট [illegible] প্রাগৈতিহাসিক কালেও এই [illegible] বসতি ছিল তবে সে যুগের স[illegible] অস্পষ্ট। ঐতিহাসিক যুগে[illegible] মধ্যযুগের কীর্তিমান মানুষে[illegible]জলভ্য নয়। ক্রমান্বয়ে আলো ও অন্ধকারের যুগ দে[illegible] বারে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর আরও একবার [illegible] হল [illegible]র যুগের। সেই স্থবির জড় সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তার [illegible]লোড়নের সৃষ্টি হল তা-ই অন্ধকারে আলো ফুটিয়ে [illegible] আধুনিক যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নব[illegible]দের কথা দিয়ে তাই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলন শু[illegible]ছে।

প্রাগৈতিহাসিক কালেও এই জেলায় মানুষের বসতি ছিল তবে সে যুগের সব কিছুই এখনও অস্পষ্ট। ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কীর্তিমান মানুষের কথাও খুব সহজলভ্য নয়। ক্রমান্বয়ে আলো ও অন্ধকারের যুগ দেখা দিয়েছে বারে বারে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর আরও একবার শুরু হল অন্ধকার যুগের। সেই স্থবির জড় সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তার প্রবেশে যে আলোড়নের সৃষ্টি হল তা-ই অন্ধকারে আলো ফুটিয়ে তুলল, শুরু হল আধুনিক যুগ।

আজ আবার যখন চারিদিক থেকে আদর্শহীনতা, দিশাহীনতা, ও হতাশার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, অতীতের সেই আলোর দিশারীদের কথা, খ্যাতকীর্তিদের কথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে আরও বেশি করে। যাতে বর্তমান প্রজন্ম সঠিক পথের দিশাটি খুঁজে পায়।

ডিরোজিও-শিষ্য রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) :

ভারতে উনিশ শতকের নবজাগরণের সূচনাকারীদের অন্যতম কৃষ্ণমোহনের পৈত্রিক নিবাস বারুইপুর থানার উত্তরভাগের কাছে নবগ্রামে হলেও জন্ম কলকাতায়। পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র কৃষ্ণমোহন ছিলেন হেনরি লুই ডিরোজিওর শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্যতম। হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধ সমালোচনা শুরু করে খ্রিষ্টান হলেও হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশপ্স কলেজের অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য, ও সিভিলিয়ানদের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিলেতের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। গ্রিক, হিব্রু, সংস্কৃত, তামিল প্রভৃতি দশটি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নতি ও স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার ছিল তাঁর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সে যুগের তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তেরো খণ্ডে মূল্যবান গ্রন্থ বিদ্যাকল্পদ্রুম রচনা করেছিলেন তিনি। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ করা, ইংরেজি ভাষায় নাটক লেখা, ইনকোয়ারার সহ বহু পত্রিকা পরিচালনা করা প্রভৃতি বহুবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি।

ডাঃ বামনদেব ভট্টাচার্য :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন গ্রামে কোনও ডাক্তার প্রায় ছিলই না সেই সময় ডাক্তারি পাস করে জন্মস্থান মজিলপুর গ্রামে আজীবন চিকিৎসা করেন অত্যন্ত গরিব দরদী, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, টনিক শান্তিরস সালসার আবিষ্কারক এই সুচিকিৎসক দারুন জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

আনন্দমোহন বিদ্যাবাগীশ (১২২৪-১২৮৭ বঙ্গাব্দ) :

কোদালিয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত বেদান্তসার, পঞ্চদর্শীর অনুবাদ প্রভৃতি লেখক এবং রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের পিতা ইনি।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) :

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও এই জেলার একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী দ্বারকানাথের জন্ম চাংড়িপোতা (বর্তমান সুভাষ গ্রাম) গ্রামে। তাঁর পিতা প্রখ্যাত পণ্ডিত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামতনু লাহিড়ী ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের শিক্ষক ছিলেন এবং ১৮৩১ সালে প্রকাশিত প্রভাকর পত্রিকা সম্পাদনায় ঈশ্বর গুপ্তকে সহায়তা করেন।

দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি পান। কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা পড়ানোর পর প্রথমে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও পরে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারীরূপেও কাজ করেছেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল পরিদর্শনে বেরোলে তিনি অস্থায়ী অধ্যক্ষের কাজও করতেন তাঁর জায়গায়। এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই প্রেরণায় ১৮৫৮ সালে 'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেই দ্বারকানাথ জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি করলেন এবং বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। তিনিই প্রথম দেখালেন একটি পত্রিকা কীভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন প্রেরণা জোগাতে পারে ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশ সরকার ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করলে দ্বারকানাথ এই অসম্মানজনক আইনের কাছে নতি স্বীকার না করে এক বছরের বেশি সময় 'সোমপ্রকাশ'-এর প্রকাশ বন্ধ রাখেন। এ ছাড়া 'সোমপ্রকাশ' আগেকার সাহেবি বাংলা, মৈথিলি বাংলা, সংস্কৃত বাংলা প্রভৃতি ভেঙে-চুরে আধুনিক বিশুদ্ধ বাংলাভাষা চালু করে বাংলাভাষার বিকাশেও বড় ধরনের অবদান রাখে। দ্বারকানাথ 'কল্পদ্রুম' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন (১৮৭৮) এবং রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস, সাংখ্য, দর্শন প্রভৃতি কয়েকটি বইয়ের লেখক ছিলেন তিনি। ১৮৬২তে চাংড়িপোতা (বর্তমান সুভাষ গ্রাম) রেলস্টেশন, হরিনাভি ইংরাজি সংস্কৃত বিদ্যালয় (১৮৬৬), সোনারপুর ডাকঘর ও রাজপুর পৌরসভা (১৮৭৬) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা দ্বারকানাথের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়। এইসব সমাজসেবামূলক কাজ এই অঞ্চলের মানুষের কাছে দ্বারকানাথকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

বামনদেব ভট্টাচার্য

হারানচন্দ্র রক্ষিত

বাংলার নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) :

উনিশ শতকের বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের পথিকৃতের জন্ম সুভাষগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে 'হরিনাভি' গ্রামে। তিনিই সে যুগের সাড়া জাগানো অত্যন্ত শক্তিশালী নাটক 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' -র লেখক। ১৯৫৪ সালে লিখিত এই নাটকের অভিনয়ই (১৮৫৬/৫৭) সম্ভবত প্রথম মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয়। সমসাময়িক সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার এই নাটক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথাবিরোধী বহু নাটক ও প্রহসন রচিত হয় সে-সময়। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুবাদ করা 'রত্নাবলী' নাটকের অভূতপূর্ব সুন্দর অভিনয় দেখেই কবি মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নামে নাটকটি লিখতে উদ্বুদ্ধ হন ১৮৫৮ সালে। রামনারায়ণ আর একটি সামাজিক নাটক 'নবনাটক' ছাড়াও পৌরাণিক নাটক ও প্রহসন লিখেছিলেন। 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামেই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

গিরিশ বিদ্যারত্ন (১৮২২-১৯০৩) :

সোনারপুর রেলস্টেশনের নিকটবর্তী রাজপুর গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামধন বাচস্পতি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্নেহের পাত্র গিরিশ বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে ওই কলেজেই অধ্যাপক হন। তৎকালীন সামাজিক অন্যায়ের বিরোধিতা করে 'বিধবা বিষম দায়' নামে নাটক লেখার জন্য তাঁকে সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'পুওর ফান্ড' এর সাহায্য পেয়ে অনেক দরিদ্র পরিবারের উপকার হয়েছিল। গিরিশ বিদ্যারত্ন রচিত 'কাদম্বরীর টীকা' প্রখ্যাত পণ্ডিত কার্ডওয়েল সাহেব অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াতেন। তিনি শব্দসার অভিধান, কাদম্বরী ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাসাগর বলতে যেমন ঈশ্বরচন্দ্রকেই বোঝায় তেমনই বিদ্যারত্ন বলতে গিরিশ বিদ্যারত্নকেই বোঝাত সেকালে।

সমাজসংস্কারক রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) :

উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারের কাজটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন যাঁরা রাজনারায়ণ বসু তাঁদের অন্যতম। তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকার সুবাদে তাঁর সান্নিধ্যে থাকায় বোড়ালের

বসু বংশে প্রথম ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহপাঠী রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন।

১৮৪৩-এ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সান্নিধ্যে আসেন। মেদিনীপুরে সরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন ১৮৫১ সালে। এই সময়েই সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার, নৈশ বিদ্যালয়, নারীবিদ্যালয়, ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয় ও সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি দেশবাসীর মনে জাতীয়বোধ ও স্বনির্ভরতাবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মেদিনীপুর শিক্ষকতাকালেই ১ম ও ২য় বিধবা বিবাহ দানের পর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ একটু থমকে দাঁড়িয়েছে মনে হচ্ছিল যখন; ঠিক তখনই, রাজনারায়ণ নিজের গ্রাম বোড়ালে সমস্ত বিরুদ্ধতা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রাহ্য করে ৩য় ও ৪র্থ বিধবা বিবাহ দেন নিজের ভাই ও জ্যাঠতুতো ভাইয়ের। বহু অত্যাচার সহ্য করেও অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করার যে মনোভাব তাঁর ছিল তা-ই হয়তো অনুপ্রাণিত করে থাকবে তাঁর বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত নাতি অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষ এবং ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদানকারী ভাইপো সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক, বেশ কিছু ইংরেজি গ্রন্থ-রচয়িতা রাজানারায়ণের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস, সম্বন্ধে বাংলা বইয়ের সংখ্যা প্রায় কুড়ি।

হরানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮২৭-১৯১২) :

পণ্ডিত রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের পৌত্র ও রামকুমার ভট্টাচার্যের পুত্র স্বাধীনচেতা নির্ভীক ব্রাহ্মণ হরানন্দ বিদ্যাসাগরের জন্ম হয় মজিলপুরে। ইনি সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথের ভগ্নীপতি ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা। মাত্র দশ বছর বয়সে বিবাহ ও তারপর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানে থেকে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সরকার কর্তৃক তৎকালীন সম্মানজনক জজপণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য। ১৮৫৯ সালে মজিলপুর প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তিনি সবার আগে নিজের মেয়েকে সেখানে ভর্তি করান। [illegible] সালে জয়নগরে গঠিত টাউন কমিটির সভাপতি [illegible] গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইনিই প্রথম সরকারি চাকুরি [illegible] পাশাপাশি ইংরাজিও শেখেন।

শিক্ষাব্রতী উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮[illegible]-১৯০৭) :

[illegible] অদম্য উৎসাহীর জন্ম মজিলপুরে। ১৮৫৯-এ প্র[illegible] ২য় স্থান অধিকার করেন এবং মজিলপুর দক্ষিণ চবি[illegible] ও সম্ভবত বাংলাদেশের তৃতীয় বালিকা বিদ্যালয় প্র[illegible] বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে জমিদারের প্রবল অ[illegible] হয়। এরপর কলকাতায় ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (বর্তমান [illegible] কলেজ) ও হিন্দুস্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৮৬৩ [illegible] বাং[illegible] নারীদের শিক্ষিত ও সচেতন করার উদ্দেশ্যে ও তাঁদের [illegible] ধরার জন্য 'বামাবোধিনী' মাসিক মহিলা পত্রিকা প্রকাশ করেন ও আমৃত্যু (১৯০৭) ৪৪ বছর ধরে সম্পাদনা করেন। এরপর তিনি রাজপুর স্কুলের, হরিনাভি স্কুলের, কোন্নগর স্কুলের ও কলকাতার সিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন ক্রমান্বয়ে। সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পর আজীবন তার অধ্যক্ষ ছিলেন। কলকাতার মূক ও বধির বিদ্যালয়ের (ভারতের সর্বপ্রথম?) তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই শিলাইদহে কবি মধুসূদন দত্তের সমাধিতে 'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব............' খোদিত ফলকটি স্থাপিত হয়।

সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১১) :

হরিদাসের গুপ্তকথা, লন্ডন রহস্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক রূপে খ্যাতিপ্রাপ্ত ও বসুমতী, বিদূষক, জন্মভূমি, প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনাকারী এই সাহিত্যিক আজীবন দারিদ্রের মধ্যে থেকেও সাহিত্য চর্চা থেকে নিবৃত্ত হননি। এঁর জন্ম হয় [শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের বারুইপুরের দক্ষিণে পরবর্তী স্টেশন শাসন-এ]।

সাহিত্যিক ও অধ্যাত্মচিন্তক কালীনাথ দত্ত (১৮৪৩-?) :

উনিশ শতকে তত্ত্ববোধিনী, সমদর্শী প্রভৃতি পত্রিকায় 'পঞ্চ প্রদীপ' ছদ্মনামের লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম কালীনাথ দত্তের জন্ম হয় মজিলপুরে। ভারত সংস্কার নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। লর্ড লিটনের ডাকে ১৮৭৭ সালে দিল্লিতে সর্বভারতীয় সাহিত্যিক সমাবেশে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন। মজিলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৮৮তে স্থানীয় পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। বারুইপুরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেট হলে ইনি তাঁর পেশকারি করতেন। এঁর ব্রহ্ম সাধনা, নিগূঢ় আত্মদর্শন প্রভৃতি বই অধ্যাত্মচিন্তা, দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

গার্লিক নিধনের নায়ক কানাইলাল-এর দীক্ষাগুরু বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জী

ডাঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য
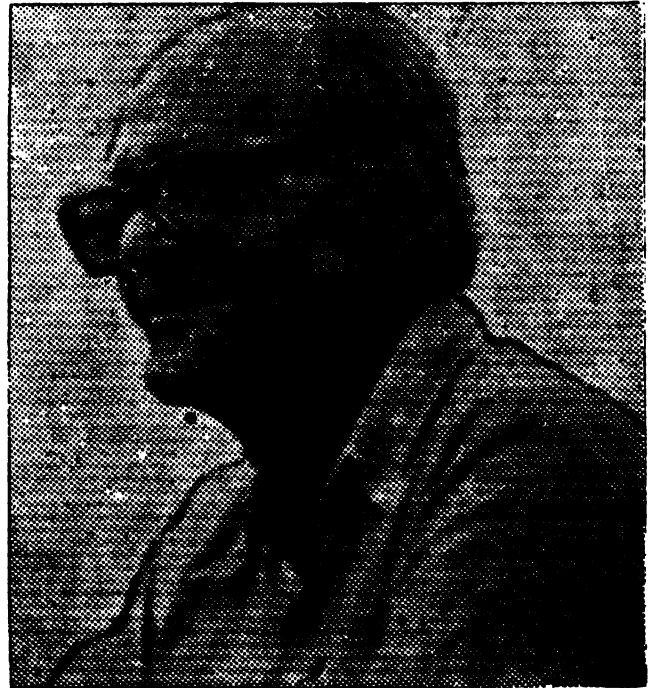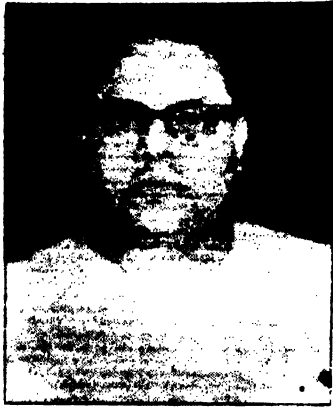
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

হরিদাস দত্ত

হরিদাস দত্ত (১৮৩২-১৯১৩) :

নিজগ্রামে যে কোনও গঠনমূলক কাজে সর্বদা অগ্রণী ছিলেন মজিলপুরের জমিদার বংশের সন্তান হরিদাস দত্ত। ১৮৪৭ সালে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মজিলপুরে স্থাপিত প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার 'বিদ্যাবিলাসিনী'-র সঙ্গে গঠিত 'বিদ্যাবিলাসিনী সভা' নামে কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন তিনি। (১৮৬০-৬১খ্রিঃ?) ১২৬৭ বঙ্গাব্দে তাঁর চেষ্টাতেই 'মজিলপুর পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে উপরোক্ত সভা ও গ্রন্থাগার থেকেই মজিলপুর হিতৈষিণী সভা' নামে অন্য যে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয় হরিদাস দত্ত তার এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় ১৮৭৬ সালে জয়নগর ইনস্টিটিউশন ও ১৯০৫ সালে মজিলপুরে জে এম ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ও হাইকোর্টের বিচারক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮) :

লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের বহড়ু গ্রামে জন্ম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গুরুদাসের। প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেন (১৮৫৯)। ডক্টর-অব-ল উপাধি পান ও ১৮৮৮-১৯০৪ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন। ইনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির উল্লেখযোগ্য হল কর্ম ও জ্ঞান, A few thoughts on Education ইত্যাদি।

সমাজ সংস্কারক দেশপ্রেমিক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) :

উনবিংশ শতকের শেষদিকে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে সামাজিক সংস্কারের রামমোহনের শুরু করা ধারাটি অব্যাহত রাখা ও দেশপ্রেমে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন যাঁরা ইনি তাঁদের অন্যতম। জন্ম চাংড়িপোতায় মামার বাড়িতে হলেও পৈত্রিক বাড়ি মজিলপুর। মামা সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ। পিতা পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগর। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম এফ এ. পরীক্ষায় চতুর্থ হন। ১৮৬৯ সালে বি এ পাশ করেন। এই সময় কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতীক পৈতে ত্যাগ করে স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান। ১৮৭২-এ এম এ পাস করে শাস্ত্রী উপাধি পান। এই সময়ে সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনা ও হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। ১৮৭৪-এ কলকাতার ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তখনই ভারতের প্রথম শ্রমিক পত্রিকার ('ভারত শ্রমজীবী') প্রথম সংখ্যায় তাঁর 'শ্রমজীবী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ৭৬-সালে হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত হন। এই সময়ের মধ্যবিত্তদের রাজনীতি সচেতন করার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন. যার লক্ষ ছিল দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, বৃটিশ সরকারের দাসত্ববৃত্তি না করা, প্রতিমা পুজো বন্ধ করা, জাতিভেদ না-মানা, নারী পুরুষের সমান অধিকার অর্জন করা প্রভৃতি। '৭৬ সালেই শিবনাথ শাস্ত্রী বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ পরবর্তী কালে দেশনেতা যুবকদের উপরোক্ত মর্মে 'অগ্নিমন্ত্রে' দীক্ষা দেন। '৭৯ সালে সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত ইংরেজি ও বাংলা বইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, আত্মচরিত ও History of the Brahmo Samaj (২ খণ্ড)।

হরিশ কবিরত্ন (১৮৪৮-১৯৩৮) :

গিরিশ বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ জন্মগ্রহণ করেন রাজপুরে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও কবি হিসাবে সুনাম ছিল। এঁর ছাত্র প্রখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরী। তাঁর আত্মকথায় হরিশ কবিরত্নের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

ডাঃ শ্রীশ বিদ্যানিধি (১৮৫০-১৯০৬) :

গিরিশ বিদ্যারত্নের কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম রাজপুরে। মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাস করে জয়পুর (রাজস্থানে)

রাজ্যে রাজ-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এঁর চেষ্টাতেই ১৮৬৯ সালে রাজপুর মধ্য-বঙ্গ (বর্তমান বিদ্যানিধি) বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৫০-১৯২২) :

দানশীল এই ব্যক্তির জন্ম জয়নগরে। জয়নগর পৌরসভা ভবন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও শ্মশানটি (বর্তমান তাঁর নামেই যোগী মিত্র শ্মশান ঘাট) তাঁর দেওয়া জমিতেই স্থাপিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল স্থানীয় পৌরসভার চেয়ারম্যান ও জয়নগর সার্কেলের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

সঙ্গীতরত্ন অঘোরনাথ চক্রবর্তী (১৮৫২-১৯১৫) :

রাজপুর গ্রামে জন্ম। গোয়ালিয়র ঘরানার ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ আলি বক্সের প্রধান শিষ্য হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। কাশী থেকে সঙ্গীরত্ন উপাধি পাওয়া এই সঙ্গীত সাধকের খ্যাতি ছিল প্রখ্যাত যদু ভট্টের পরেই।

গণেন্দ্রনাথ মিত্র (?—?) :

জন্ম রাজপুরে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান দখন করেন। সে সময়ে মেডিক্যাল পরীক্ষায় তাঁর মতন কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেননি। স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁরই ভ্রাতা।

নবীনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৪-?) :

১৯১২ সালে ভারতে প্রথম সমবায় বা কো-অপারেটিভ আইন চালু হলে, ১৯১৩ সালে নবীনকৃষ্ণ জন্মস্থান মজিলপুর গ্রামীণ মহাজনী ঋণের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে, জয়নগর মজিলপুর পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন ও এর প্রথম সভাপতি হন।

নবীনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রায়সাহেব হারান রক্ষিত (১৮৫৪-?) :

আবাল্য সাহিত্য অনুরাগী। দীর্ঘদিন বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩ সালে ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ারের সমগ্র রচনা ৪ খণ্ডে বাংলায় অনুবাদ করে ভারতের ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'রায় সাহেব' উপাধি পান ও রাণী ভিক্টোরিয়ার তলোয়ার পুরস্কার পান। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭) :

জন্ম ডায়মন্ডহারবার লাইনের নেতড়া গ্রামে। স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার পাশাপাশি নিয়মিত সাহিত্যচর্চাও চালিয়ে গেছেন এই কৃতি লেখক। এঁর বিশালায়তন মাইকেলের জীবনী প্রভৃতি গবেষণামূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। আরও কয়েকটি জীবনী গ্রন্থ রচনার সঙ্গে নিয়মিত কাব্যচর্চাও করতেন। যোগীন্দ্রনাথের কাব্যশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে 'কবিভূষণ' উপাধি দেন।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৬) :

উনিশ শতকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে ভরা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়, জাত যায়-এই ধরনের উদ্ভট ধারণা বদ্ধমূল ছিল মানুষের মনে। সেই সময়ে শুধু লেখাপড়া শেখাই নয় নবজাগরণের প্রভাবে প্রভাবিত গিরীন্দ্রমোহিনী উন্নত মানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করে মহিলা সমাজের সামনে এক অনুসরণযোগ্য নজির স্থাপন করলেন। এই কীর্তি এই জেলা তথা বাংলার মহিলাদের কাছে বিশেষত, তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

মজিলপুরের উচ্চশিক্ষিত পিতা হারানচন্দ্র মিত্রের কন্যা গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয় কলকাতায়। পিতার কাছেই কাব্যচর্চায় প্রেরণা পান। মাত্র ১০ বছর বয়সে কলকাতায় বিয়ে হয়। কাব্যচর্চায় স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের সহযোগিতা পেতেন। ১৮৮৪-তে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর রচিত 'অশ্রুকণা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর এই গ্রন্থেই "ফুটফুটে জোছনায় ধবধবে আঙিনায় একখানি মাদুর পাতিয়া"—এই জনপ্রিয় কবিতাটি আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—কাব্যগ্রন্থ : 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' (১৮৭২), 'ভারতকুসুম' (১৮৮২); নাটক : 'সন্ন্যাসিনী ও মীরাবাঈ' (১৮৯২), 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭); কৌতুক রচনা-'বুড়োর অ্যালবাম' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন ও 'জাহ্নবী' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনাও করেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) :

ডায়মন্ডহারবার ট্রেন লাইনের কাছে নেতড়া গ্রামে পৈত্রিক ভিটা হলেও জন্ম মামার বাড়ি জয়নগরে। বাবা নন্দলাল সরকার, মা থাকমণি সরকার। ১৮৭৭ সালে স্থাপিত ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই ডাক্তার ছিলেন একজন। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেও ছাত্রজীবনে বহু স্বর্ণপদক পান এবং এম বি ও এম ডি ডিগ্রিও অর্জন করেন। স্বাধীনতার আগে জাতীয় শিল্প প্রসারে অর্থ ব্যয় করেন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কলকাতার

ক্যাম্বেল হাসপাতালের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ডাঃ নীলরতন সরকার হাসপাতাল' হওয়ায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) :

বাংলা সাহিত্যের এককালের এই নামী লেখকের জন্ম বেহালায়। পিতা গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'কলিকাতার একাল ও সেকাল' নামে ইতিহাস লিখে বিখ্যাত হন। বর্তমানের প্রসিদ্ধ লেখক ভবানী মুখোপাধ্যয়ের জেঠ্যতাত হরিসাধনবাবু গল্প-উপন্যাসও লিখতেন।

মৃদঙ্গবিশারদ কেদার কাত্যায়ন (১৮৬৪-১৯১৫) :

কাশীতে তদানীন্তন ভারতশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গী মদন মিশ্রজীর সামনে কেদারবাবুর মৃদঙ্গ বাদনে মুগ্ধ হয়ে উপস্থিত পণ্ডিতগণ তাঁকে মৃদঙ্গ বিশারদ উপাধি দেন। স্বভাবকবি হাস্যরসপূর্ণ কবিতার রচয়িতা মৃদঙ্গ বিশারদের জন্ম মজিলপুর। 'সীমের মাহাত্ম্য' 'ভোটমঙ্গল' ও গিরীশচন্দ্রের প্রশংসাধন্য 'সুধন্য বধ' নাটক প্রভৃতি তাঁর রচনা।

শিশুসাহিত্যের যাদুকর যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) :

বাবা নন্দলাল সরকার ও মা থাকমণি সরকারের তৃতীয় ছেলে যোগীন্দ্রনাথের জন্ম মামারবাড়ি জয়নগরে হলেও পৈত্রিক ভিটা নেতড়া গ্রামে। অত্যন্ত দারিদ্রতার জন্য কলকাতা সিটি কলেজে এম এ পড়া শেষ করতে না পেরে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে চাকরি ছেড়ে গড়ে তোলেন পুস্তক প্রকাশন সংস্থা 'সিটি বুক সোসাইটি'। শিশুদের বর্ণপরিচয় নতুন ভাবে লেখেন তিনি—'অ—অজগর আসছে তেড়ে', 'আ—আমটি খাব পেড়ে', 'ক—কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি', 'খ—খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি' বা 'হারাধনের দশটি ছেলে....'। —এইভাবেই লিখে চললেন শিশুদের জন্য অবিস্মরণীয় সব ছড়া ও বই। হাসি ও খেলা (১৮৯১), হাসিখুশি-১ম ভাগ (১৮৯৭), খুকুমণির ছড়া প্রভৃতি তার মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি মাত্র। এ ছাড়াও তাঁর 'বনে জঙ্গলে', জানোয়ারে জানোয়ারণ্য' প্রভৃতি রচনাগুলিও অসাধারণ। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় তাঁর 'মুকুল' পত্রিকায় শিশুদের জন্য লিখে যাঁরা জনপ্রিয় হন তিনি তাঁদেরই একজন। শিশুসাহিত্যের যাদুকর আখ্যাটি তাঁর চূড়ান্ত জনপ্রিয়তারই পরিচয় বহন করেছে।

শিক্ষানুরাগী শরৎচন্দ্র দত্ত (১৮৭০-১৯৪৭) :

প্রথমে হট্টগঞ্জ হাইস্কুলে ও পরে জে এম ট্রেনিং স্কুলে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করার পর অবসর নেন। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের প্রেরণায় জয়নগর ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন আমৃত্যু। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টার ফলেই জন্ম নেয় 'জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস'। এই শিক্ষানুরাগীর জন্ম হয়েছিল জয়নগর উত্তরপাড়ায়।

কৃতী গবেষক ও চিকিৎসক ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭২-১৯৩৫) :

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান স্থানীয় চিকিৎসক যোগীন্দ্রনাথের পুত্র

রামনারায়ণ তর্করত্ন
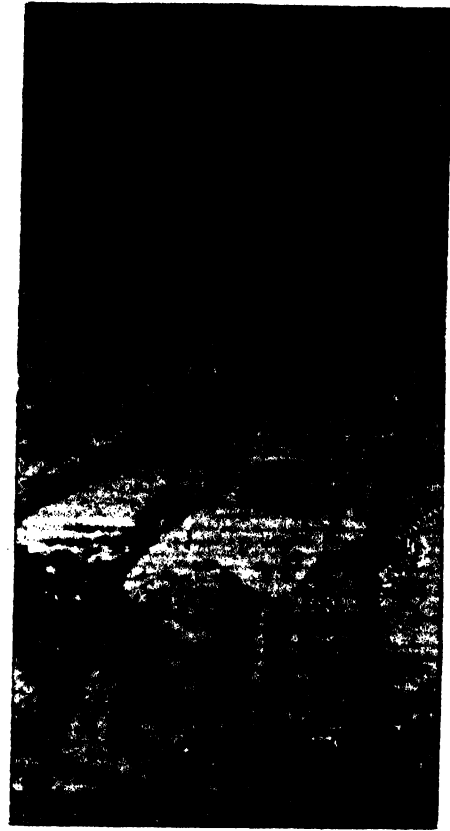
গিরীন্দ্রনাথ। জন্ম ও প্রাথমিক পাঠ মজিলপুরে। বি এ পাস করেন কৃতিত্বে সঙ্গে ও বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য শরৎচন্দ্র ঘোষাল পদক পান। মেডিকেল কলেজে কৃতী ছাত্র হিসেবে অনেক বৃত্তি পান। ১৯০০ সালে এম বি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান ও শল্যচিকিৎসায় Mc Leod স্বর্ণপদক পান। ১৯০৮-এ এম ডি পাস করাকালীন রচিত তাঁর গবেষণাগ্রন্থটি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকরূপে মনোনীত করে। ১৯০৯, ১১, ১৩ সালে তিনটি মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনবার Grifith পুরস্কার পান। তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ Central Research Institute-এর বিশেষ প্রশংসা পায়।

আজীবন জ্ঞানানুরাগী গিরীন্দ্রনাথের ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়েও কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯০৯-১৪)। Indian Aso. for. Cult. of Sc.-এর আজীবন সভ্য ও উদ্ভিদশাস্ত্রের অধ্যাপক। Asiatic Society'-র ফেলো। Cal. Med. School ও College of Physicians and surgeons (এখন R. G. Kar Med. Col) -এর অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science ও Medicine দুই বিভাগের পরীক্ষকও ছিলেন। সংস্কৃত ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্য 'ভিষগাচার্য' ও আয়ুর্বেদ শিরোমণি পুরস্কার পান। নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন ও Journal Ayurveda -র প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

কৃতী চিকিৎসক ও উদ্যোগী ডাঃ কার্তিক বসু (১৮৭৩-১৯৫৫) :

চাংড়িপোতার এই কৃতী সন্তান এম বি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পান। তিনিই ভারতে প্রথম জল শোধনের কারখানা (Distillation Plant) স্থাপন করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুরোধে বেঙ্গল কেমিক্যালে কাজ করেছিলেন। তাঁর 'বোসেক ল্যাবরেটরি' ভারত বিখ্যাত। তিনি স্বাস্থ্য সমাচার, Health and Happiness প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে সাড়া জাগানো 'রমলা' উপন্যাসের লেখক মনীন্দ্রলাল বসু তাঁরই ভাইপো।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৩-১৯৬১) :

প্রখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের বড়ভাই প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বংশে জন্ম হয় হরিনাভির এই সুসন্তানের। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহের পাত্র ও রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের এক উৎসাহী কর্মী ছিলেন। সহজ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়ে লিখে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি আবিষ্কারের কাহিনী, কবি স্মরণে, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষ জীবনে 'বসুধারা' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

নেতাজির অগ্রজ ও সহকর্মী শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৮-১৯৫০) :

নেতাজী সুভাষের মধ্যম ভ্রাতা পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার। সে-যুগের বাংলা তথা ভারতের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। জাতীয় কংগ্রেসের বাংলা প্রদেশের সর্বোচ্চ নেতাদের অন্যতম। নেতাজির অগ্রজ সমস্ত কাজেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে। এঁর সাহায্যেই সুভাষের ভারত ত্যাগ সম্ভব হয়েছিল। শরৎচন্দ্র The Nation কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে বহু বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। এঁদের পৈত্রিক ভিটা ছিল কোদালিয়া গ্রামে।

সঙ্গীতরত্ন, সঙ্গীত নায়ক পণ্ডিত মুরারীমোহন মিশ্র (১৮৮৮-১৯৬৮) :

জন্ম মজিলপুরে। সঙ্গী... ...হরিনাথ মিশ্রের কাছে। স্কুল জীবনে ভারত বিখ্যা... ...নের কাছে পাখোয়াজ বাজানো ও পরে কলকাতা... ...জনের কাছে তালিম নেন। গোয়ালিয়র সম্মেলনে ... পান। মহামণ্ডলী তাঁকে 'সঙ্গীতরত্ন' ও সঙ্গীত নায়... ...ভূষিত করেন।

শিক্ষাব্রতী হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৮) :

মজিলপুরের তৎকা... ...শিক্ষক নীলমনি চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ... পাস করে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহ... ...অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। তাঁর চিন্তাতেই ওই কলে... ...ভাগ খোলা হয়। তিনি যোগেশচন্দ্র কলেজেরও অ... ...ছিলেন। তিনিই প্রথম
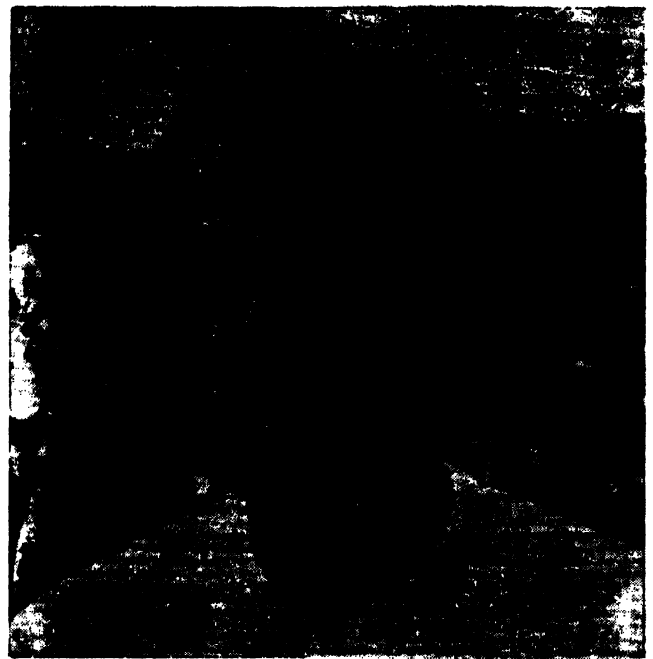
হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

মাতৃভাষায় অর্থনীতির বই লিখে ছাত্রছাত্রীদের দারুন উপকার করেন তৃতীয় ভাই এর সঙ্গে মিলে কলকাতায় তিনি একটি প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমরা বাঙালি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি একদিনের ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, আবার অন্যদিকে গ্রামের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও ছিলেন দীর্ঘদিন।

আইনজ্ঞ হীরালাল চক্রবর্তী (১৮৯০-?) :

জন্ম মজিলপুর। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে লেখাপড়া শিখেও তিনটি বিষয়ে এম এ ও পরে আইন পাস করে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে থাকেন। জগত্তারিণি স্মৃতি পদক ও প্যারিচাঁদ স্মৃতি পদক পেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর লেখা বহু আইনের বইয়ের মধ্যে 'হিন্দু আইন' বইটি উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলায় তিনি অন্যতম জুরি ছিলেন।

সুফি সাধক মওলানা আল্লামা ইব্রাহিম (১৮৮৫-১৯৩৭) :

সেকালের বিখ্যাত সাহিত্য সাধক গ্রন্থকার ও ধার্মিক পুরুষ ইব্রাহিম সাহেবের জন্ম জয়নগর উত্তর দুর্গাপুর গ্রামে ১ আষাঢ় ১২৯২, বঙ্গাব্দে। অল্প বয়সেই মাতৃভাষা বাংলা-সহ আরবী, ফার্সি, উর্দু ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। ১৯০৯ সালে ফাইনাল মাদ্রাসা পরীক্ষার রের্কড নম্বর ও ১৯১১ সালে টাইটেল পরীক্ষায় সব বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পান। উচ্চ শিক্ষার্থে মিশর ও পারস্যে যান। কর্মজীবনে আরবি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের বিশিষ্ট কাজীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী আইন বা শরিয়ত বিষয়ে সরকারি কাজে সহায়ক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তকগুলি হল— নাকেওল মোমেনীন, হাজী সহচর, ইজ্জালে ছওয়াব, রোজা

বিধি, সমাজ দর্পণ প্রভৃতি। হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীকামী বহু মাদ্রাসা ও মোক্তারের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহিম সাহেব শেষ জীবনে 'পীর' মর্যাদায় ভূষিত হন।

সঙ্গী-রত্ন অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৫-?) :

সঙ্গীতাচার্য কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের পুত্র অমরেন্দ্রনাথ হরিনাভির আর এক সুসন্তান। ইনি অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও বিশ্বনাথ রাও-এর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বারাণসী ভারত ধর্মমহাসভামণ্ডলের সঙ্গীতরত্ন উপাধি পান। শত রজনী অভিনীত 'ব্রহ্মতেজ' গীতি নাটকে তাঁর দেওয়া ধ্রুপদী সুর নাটকটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল।

কৃষকনেতা হরিধন চক্রবর্তী (১৯২৪-১৯৮৭) :

সোনারপুরে জন্ম। মেধাবী ছাত্র হরিসাধন প্রথমে বলশেভিক পার্টিতে পরে ১৯৪৩-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৩৫০-এর মন্বন্তরে তাঁর চেষ্টায় লঙ্গরখানা খোলা ও চালের চোরাচালান বন্ধে জোর আন্দোলন হয়। ১৯৪৬ থেকে সোনারপুর, ভাঙড়, ক্যানিং, জয়নগর, কাকদ্বীপ থানা এলাকায় বিশেষত ডোঙাজোড়া, মনির তট, চন্দনপিড়ি ও বাগবেড়িয়ার তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেতা ছিলেন। বিভিন্ন নামে আত্মগোপন করে কৃষক আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। কবিতা প্রবন্ধ লেখক সংস্কৃতিপ্রেমী উচ্চশিক্ষিত হরিসাধন ওরফে জীবনদা পরে সি পি আই-এর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সম্পাদক ও রাজ্য সম্পাদক হন।

সুবোধ ব্যানার্জি
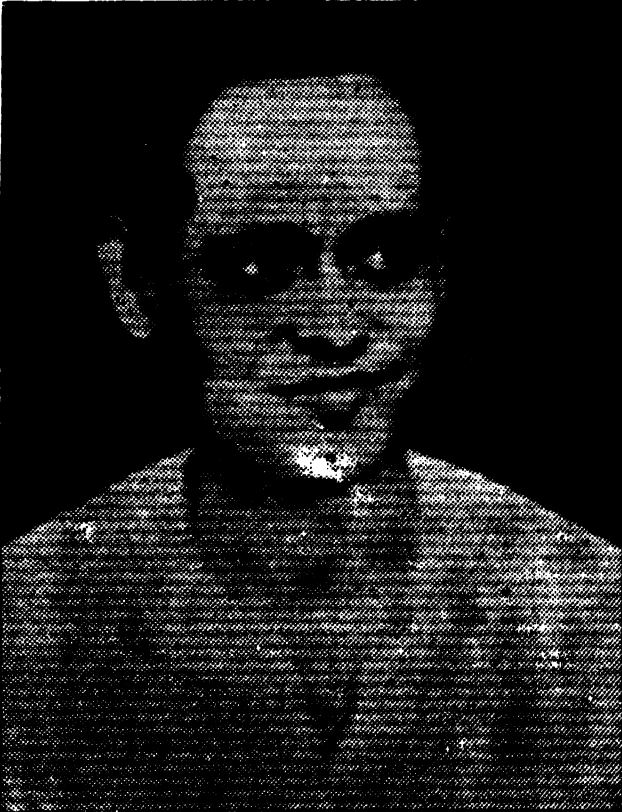
প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক অমল হোম (১৮৯৩-১৯৭৫) :

জন্ম মজিলপুরে। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে আকৃষ্ট হন। প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ-এ শিক্ষানবিশ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলি পত্রিকায়, দি পাঞ্জাবী পত্রিকায়, দি ট্রিবিউন পত্রিকায় কাজ করেন। মতিলাল নেহরুর দৈনিক দি ইন্ডিপেন্ডেন্টে বিপিনচন্দ্র পালের সহকারীরূপে কাজ করেন। ১৯২৪-এ তিনি ও সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর পরিকল্পিত একটি মিউনিসিপ্যাল পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনিই ১৯৩১-এ কলকাতায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব পালন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন রায় এন্ড হিজ ওয়ার্কস প্রভৃতি। তিনি রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন।

স্বনামধন্য অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৪৩) :

এই বিখ্যাত অভিনেতার জন্ম দক্ষিণ গড়িয়া গ্রামে। আর্ট স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে অভিনয়কেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন ও কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে নির্বাক চলচ্চিত্রের বর্ণনা লেখার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯২১ থেকে ৩২ সালের মধ্যে মোট ২২টি নির্বাক চলচ্চিত্রে ও পরে ১৬টি সবাক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' চলচ্চিত্রে ওসমানের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করে। তিনি একজন শক্তিশালী নাট্যাভিনেতাও ছিলেন। অন্তত ৪৬টি নাটকে অভিনয় করেন। ১৯২৩-এ স্টার থিয়েটারে বিকর্ণের ভূমিকায় ('কর্ণার্জুন' নাটকে) বিশেষ কৃতিত্ব দেখান, ১৯২৫-এ 'চিরকুমার সভা' নাটকে তাঁর অভিনয় রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। তাঁর অভিনীত কর্ণার্জুন, খনা, শকুন্তলা নাটকগুলির রেকর্ড আজও জনপ্রিয়। সুদর্শন এই চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনেতার মাত্র ৫০ বছর বয়সে মৃত্যু হয়।

আদর্শ শিক্ষক অটলবিহারী মণ্ডল (১৮৯৫-?) :

লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের মাধবপুর রেলস্টেশন থেকে দক্ষিণে সুদূর পল্লীগ্রাম যাদবপুরে মামার বাড়িতে জন্ম হয়। পৈত্রিক বাসভূমি উত্তর কাশীনগরে। স্নাতক হবার পর শিক্ষকতাকেই জীবনে ব্রত করেন। দীর্ঘকাল জয়নগর ইনস্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষকতা করে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করেন। আদর্শবান, উদার, ছাত্রদরদী এই শিক্ষক অবসর গ্রহণের পরও দীর্ঘকাল বিনা বেতনে জয়নগর বালিকা বিদ্যালয়ে ও পরে বহড়ু বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে এক মহান ও বিরল আদর্শ স্থাপন করেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্ত (১৮৯৫-১৯৬৮) :

মজিলপুরে জন্ম। পিতৃবিয়োগের পর জমিদারপুত্র হিসেবে জমিদারি দেখাশোনার কাজে সুন্দরবনে গিয়ে 'জটার দেউল' নামে বিশাল মন্দির দেখে পুরা ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় প্রেরণা পান। সারা সুন্দরবনে গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে প্রচুর প্রত্নদ্রব্য সংগ্রহ করে
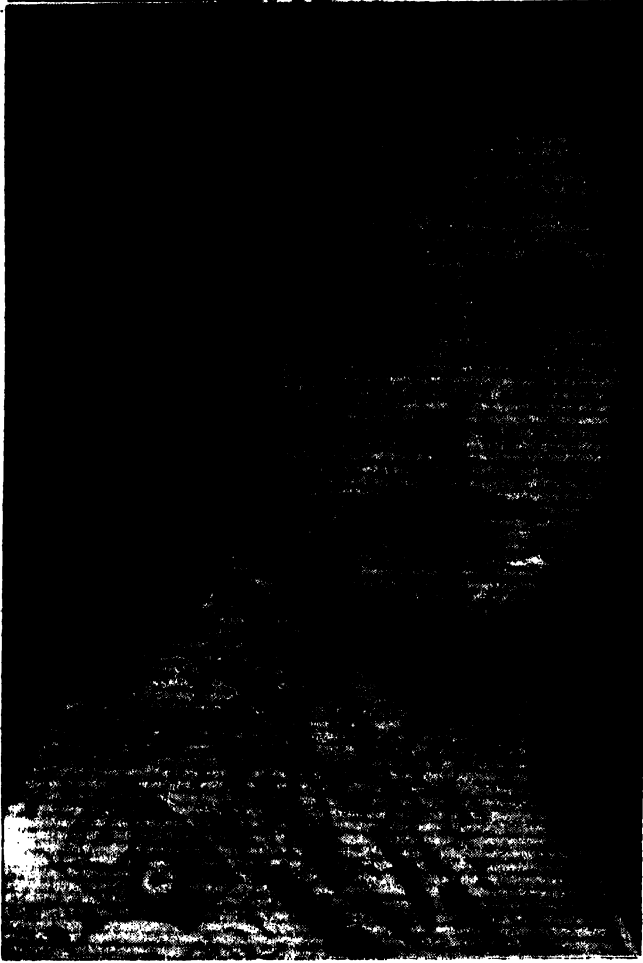
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজগৃহে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। পরে তাঁর প্রেরণায় সমগ্র চব্বিশ পরগনায় আরও ১৬টি স্থানীয় সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। তিনিই প্রথম ২৪-পরগনার অন্তর্গত পশ্চিম সুন্দরবনে প্রাচীন সভ্যতার প্রামাণ্য অস্তিত্বের কথা বলেন। তিনি বর্তমানে লুপ্ত গঙ্গার আদি ধারাটিও আবিষ্কার করেন। তাঁকে [illegible]বঙ্গের [illegible]তিহাস চর্চার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তাঁর সংগৃহীত ও [illegible] ইত্যাদি প্রত্নদ্রব্যগুলি কলকাতার শ্রেষ্ঠ মিউজিয়ামগুলিকে [illegible] শোভাবর্ধন করেছে। তিনি প্রত্নতত্ত্ব, স্থানীয় ইতিহাস [illegible] লোকশিল্প, দর্শন ও মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি বিষয়ে [illegible] মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়াও তিনি দুটি [illegible] সম্পাদনাও করেন।

অহিংস আন্দোলনে [illegible] [illegible]চন্দ্র ভাণ্ডারী (১৮৯৬-১৯৮৫) :

ডায়মন্ডহারবার [illegible] শ্যামবসুর চকে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থনীতিতে [illegible] এল বি পাস করে জনপ্রিয় আইনজীবী হিসেবে [illegible]৩০-এ গান্ধীজির ডাকে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে [illegible] দশবছর কারাবরণ করেন। স্বাধীনতার পর বাংলা[illegible]মন্ত্রী হন। পরে কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেও বিনোবা ভাবের আহ্বানে বিধানসভার পদ-সহ সমস্তরকম দলীয় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ভূদান যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ত্যাগী অহিংস যোদ্ধা 'সর্বোদয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

স্বভাবকবি কালাচাঁদ ভট্টাচার্য (১৩০৫-১৩৯২ বঙ্গাব্দ) :

স্বভাবকবি কালাচাঁদ ও অগ্রজ শশধর ভট্টাচার্য এই দুই ভাই পাঁচালি গানকে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। কালাচাঁদবাবু দীর্ঘকাল আকাশবাণীতেও পাঁচালি গান এবং সহস্রাধিক যাত্রাপালায় বিবেকের গান গেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বহু বাউল কীর্তন কবিগান প্রভৃতির কথা লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-?) :

সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয় ওড়িশার কটক শহরে। সুভাষের পিতৃভিটা এই জেলারই কোদালিয়া গ্রামে যা এখন সুভাষগ্রাম নাম পরিচিত। তাঁর পিতা জানকীনাথ বসু ওকালতি করতে কটকে যান। সুভাষের প্রাথমিক পড়াশোনা কটকে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে অনার্স সহ বি এ পাস করেন। বিলেতে আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ হয়েও দেশের কাজ করার জন্য এই লোভনীয় চাকুরি হেলায় ত্যাগ করেন।

রাজনৈতিক জীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্নেহভাজন সহকর্মীরূপে স্বরাজ্য পার্টিতে কাজ করেন, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন দুবার ১৯৩৮ ও ১৯৩৯-এ। দেশত্যাগ করেন ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্য নিয়ে। প্রথম জার্মানি ও পরে জাপানে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করেন। আক্রমণ হেনে ভারতের কিছু অংশ সাময়িক মুক্ত করে দেশের মাটিতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদাতা নেতাজি সুভাষ ছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর শেষ জীবনের ঘটনাবলী আজও আশ্চর্য্যজনকভাবে রহস্যে আবৃত।

শচীন্দ্রনাথ মিত্র (ডেপুটি শচী) (১৮৯৯-১৯৮৭) :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ (অংক) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন জয়নগরের এই সুসন্তান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি হয়ে গ্রামের বহু মানুষকে উপকার করেন। বহু সমিতির উচ্চপদে ছিলেন। তিনি নিজগৃহে যে দলিল সংগ্রহশালা করেছিলেন গ্রামের মানুষ সেটির উপযুক্ত সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারেননি।

সমাজসেবী পুলিনবিহারী কর (১৮৯৮-?) :

মথুরাপুর থানার মির্জাপুর গ্রামে জন্ম হয়। ওকালতি পেশা হলেও সমাজসেবা ছিল তাঁর নেশা। তিনি ডায়মন্ডহারবার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। নিজগ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা ছাড়াও মথুরাপুর হাইস্কুল স্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। ১৯৩৪ সালে নয় বছরের বিধবা জ্ঞাতি ভাইঝির আবার বিয়ে দিয়ে সেকালে প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী ডাঃ ধ্রুবচাঁদ হালদার (১৮৯৮-১৯৬৮) :

সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষালাভের ক্ষেত্রে দক্ষিণ বারাসত 'ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দক্ষিণ বারাসতের শ্রীকৃষ্ণনগর চৌরিবাসি গ্রামে জন্ম হয় নবীনচন্দ্রের পুত্র ধ্রুবচাঁদের। ডাক্তারি পাস করে কলকাতায় চিকিৎসক হিসেবে বাস করতেন। এই জেলার কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। দক্ষিণ বারাসত কলেজ গড়ার ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ও কিছু জমি দান করেন। প্রধান আর্থিক অবদানটি ছিল তাঁরই। তাই ১৯৬৫ সালে স্থাপিত এই কলেজের নাম 'ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ' রাখা হয় তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে।

সমাজসেবী আলহাজ্জ মকবুল আলি (?—?) :

মকবুল আলি সাহেবের ডায়মন্ডহারবার লাইনের কাছে নেতড়া গ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্ম ও শৈশবে মাতৃবিয়োগ হলেও কঠোর সংগ্রাম করে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারশিপ পান। কলেজে পড়ার সময় জেলা জজের আদালতে সেরেস্তাদারের চাকরি পান। ১৯৬৮ সালে অবসর নেন। গ্রামের স্কুল, রাস্তাঘাট, মসজিদ উন্নয়ন, নলকূপ বসানো প্রভৃতি যে কোন সমাজসেবামূলক কাজে তিনি সর্বদাই ছিলেন অগ্রণীর ভূমিকায়। জাতি-ধর্ম, নির্বিশেষে সকলের আপনজন, সংকীর্ণতামুক্ত, আদর্শ মুসলিম মকবুল সাহেবকে স্থানীয় রেনেসাঁ পত্রিকা গুণিজন সংবর্ধনায় সম্মানিত করেছিলেন।
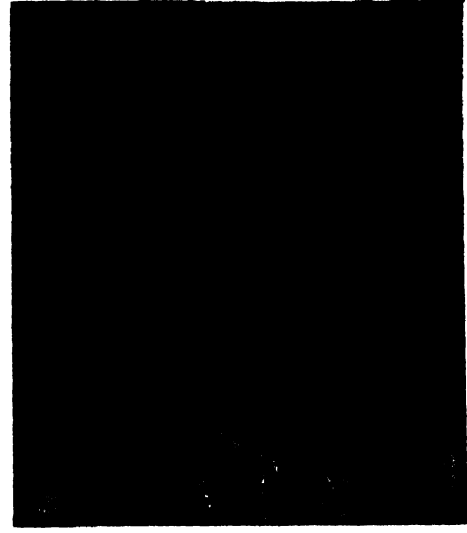
অমল হোম

ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন পঞ্চানন চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৪৯) :

জন্ম মজিলপুরে। যাদবপুরের বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯৩৩ সালে ব্যাডমিন্টনে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হন। বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব জনক সুযোগ পেলেও ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান পঞ্চাননবাবুর অভিভাবকরা তাঁকে বিলেত যেতে দেন নি। তিনি দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়ও ছিলেন।

মৃদঙ্গ-বিশেষজ্ঞ প্রতাপ-নারায়ণ মিত্র (১৯০২-?) :

জয়নগরে জন্ম। পিতা অন্নদাপ্রসাদ মিত্রর কাছেই পাখোয়াজ বাদন শিক্ষা শুরু, পরে বিখ্যাত বাদকগণের কাছে তালিম নিয়ে কেবল সিং ঘরানায় দক্ষ প্রতাপনারায়ণ ১৯৩১-এ এলাহাবাদ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় স্থান পান। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ছাড়াও চলচ্চিত্র ও বেতারেও কৃতিত্ব দেখান।

ব্যায়ামবিদ শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৯০২-১৯৮৪) :

জয়নগর থানার মজিলপুরের দক্ষিণে ফুটিগোদা গ্রামের শৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী সিটি কলেজে পড়ার সময় কলকাতার প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ রাজেন গুহঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। দেহচর্চার মধ্য দিয়ে পরে দেহপ্রদর্শনী, বুকে রোলার (৪৮০০ পাউন্ড) নেওয়া, লোহার শেকল ছেঁড়া, স্টার্ট দেওয়া মোটর গাড়িকে নড়তে না দেওয়া, বুকের ওপর দিয়ে হাতি পারাপারের মতো শ্বাসরুদ্ধকর খেলায় পারদর্শিতা দেখিয়ে খুবই জনপ্রিয় হন। ১৯৩০ সালে মজিলপুর ব্যায়াম সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁর পারদর্শিতা দেখে প্রধান অতিথি জননায়ক নেতাজি সুভাষ তাঁকে 'বাংলার গৌরব' আখ্যা দেন।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বলাইচাঁদ কুণ্ডু (১৯০৫-১৯৮৯) :

জয়নগর তিলিপাড়ায় জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশের রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনার পর ইংলন্ডের লিড্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি বিশেষ করে জুট টেকনোলজি বিষয়ে করা তাঁর গবেষণায় কল বিশ্বের

বিজ্ঞানী মহলে সমাদৃত হয়। অবিভক্ত ভারতে নবগঠিত জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। দেশ ভাগের পর ঢাকা ছেড়ে ভারতের ব্যারাকপুরে ওই একই নাম বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হন। তাঁর লেখা 'জুট ইন ইন্ডিয়া' বইটি আজও গবেষকদের কাছে মূল্যবান। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর ও কলকাতার বোস ইনস্টিটিউটের জয়েন্ট ডিরেক্টরও হন। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কুণ্ডু ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সাইন্স আকাডেমি ও লন্ডনের লিনিনিয়েন সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদ অলংকৃত করেন।

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

প্রখ্যাত অনুবাদক ও সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৬৩) :

জয়নগর-মজিলপুরের দক্ষিণে ফুটিগোদা গ্রামে পৈত্রিক ভিটা কল্লোল যুগের লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের। শিশু ও কিশোরদের জন্য বিশেষ করে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির দক্ষ অনুবাদ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। জীবনী রচনাকার ও শিশু সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি সুপরিচিতি। চিত্রনাট্যকার রূপেও খ্যাতি পান। তিনি ধূমকেতু, গল্পভারতী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনাও করেন।

কৃষিবিজ্ঞানী শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪-১৯৯৫) :

কৃষিক্ষেত্রে নানান ধরনের বিচিত্র আবিষ্কারের জন্য কল্যানি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক D. Sc. পাওয়া এই কৃষিবিজ্ঞানীর জন্ম গড়িয়ার কাছে বোড়াল গ্রামে। তাঁর অন্যতম প্রধান আবিষ্কার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা কর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত বিলিতি বিট ও দেশি পালং শাকের মধ্যে বর্ণ সংকর ঘটিয়ে তৈরি অতিশয় সংকর পালং শাক যা Banerjee's Giant নামেই বিশেষ পরিচিত। তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারর মধ্যে আছে টমেটো ও আঙুরের মিলন ঘটিয়ে তৈরি বিচিত্র স্বাদের আঙুর। কৃষিক্ষেত্রে অল্প ব্যয়ে বেশি ফলনের জন্য আবিষ্কৃত একটি গোলাসার যা ভিন্ন জাতের গোলাপের মধ্যে বর্ণসংকর ঘটিয়ে ২৪ রকমের বিভিন্ন রকমের রঙ ও সুগন্ধযুক্ত গোলাপ ফুল সৃষ্টি করেন।
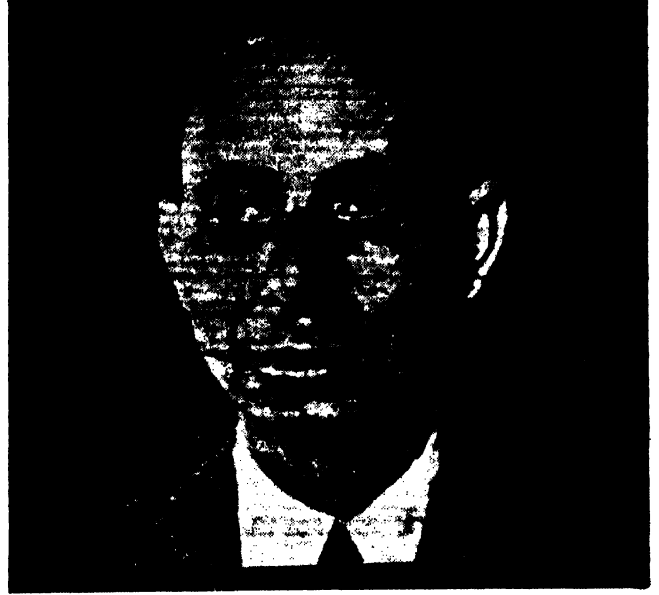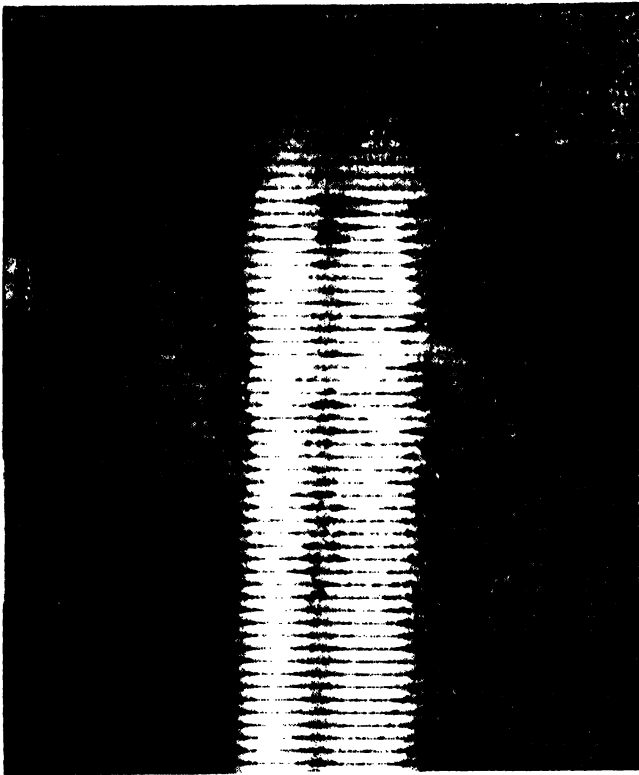
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

রাশিবিজ্ঞানী শুভেন্দুশেখর বসু (১৯০৬-১৯৩৮) :

রাশিবিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়ার মতো মৌলিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত শুভেন্দুশেখর বসু সোনারপুরের সুসন্তান। বিখ্যাত রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবিশের ছাত্র ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ পুর্ণেন্দু বসু তাঁরই ভ্রাতা।

বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪-১৯৯৫) :

জন্ম বহড়ু গ্রামে। চার বছরে পিতৃহারা। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর বাগবাজারে মামার বাড়িতে চলে আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন ১৯৫৫ পর্যন্ত। ১৯৭০-১৯৯৪) আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনিয়মিত জীবনযাত্রার মধ্যে এটিই দীর্ঘ একটানা কর্মজীবন। অন্তিমপর্বে বিশ্বভারতীর অতিথি অধ্যাপকের মর্যাদা পেয়েছিলেন। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮৩ সালে তিনি আকাডেমি পুরস্কার পান। তাঁর ৪১ খানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্য

কাব্যগ্রন্থগুলি হল—'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই', ধর্মে আছো জিরাও আছো, প্রভৃতি। 'অবনী বাড়ী আছো' তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তিনটি কবিতা পত্রিকার সম্পাদনাও করতেন তিনি গীতার অনুবাদ, ব্রেকের জীবনী, এবং আত্মজীবনী তাঁর আরব্ধ কাজের মধ্যে ছিল।

লোকসংস্কৃতি গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু (১৯০৭-১৯৯৪) :

মজিলপুরের ভূস্বামী বসু পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯৬৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলার লৌকিক দেবতা'র জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পান। প্রবাসী, অমৃতবাজার, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। শেষ জীবনে কথকতা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তমলুকে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়।

জ্ঞানপীঠ প্রাপক আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) :

সাহিত্যে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান জ্ঞানপীঠ (১৯৭৭) প্রাপক আশাপূর্ণা দেবীর পৈত্রিক আদি নিবাস হুগলী জেলায়। জীবনের শেষের দিকে গড়িয়ায় ফ্ল্যাট কিনে বাস করতেন। স্কুল কলেজে পড়ার সুযোগ না পেয়েও ৭০ বছরের দীর্ঘ লেখক জীবনে তিনশ'র বেশী বই লিখেছেন। তের বছর বয়সে শিশুসাথী পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। আঠাশ বছরের পর বড়দের জন্য লেখা শুরু করেন। সারা জীবনে ১৭৬টি উপন্যাস, ৩০টি ছোট গল্প সংকলন, ৪৭টি ছোটদের বই ও ২৫টি অন্যান্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। তাঁর ৬৩টি বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। ১৯৫৪তে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) লীলা পুরস্কার ১৯৬২তে (কলঃ বিশ্বঃ) ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ১৯৬৬তে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের জন্য। ১৯৭৬ সালে ভারত সরকারের পদ্মশ্রী সহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন এই অসামান্য লেখিকা বিশ্বভারতীর সম্মানজনক দেশিকোত্তম যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
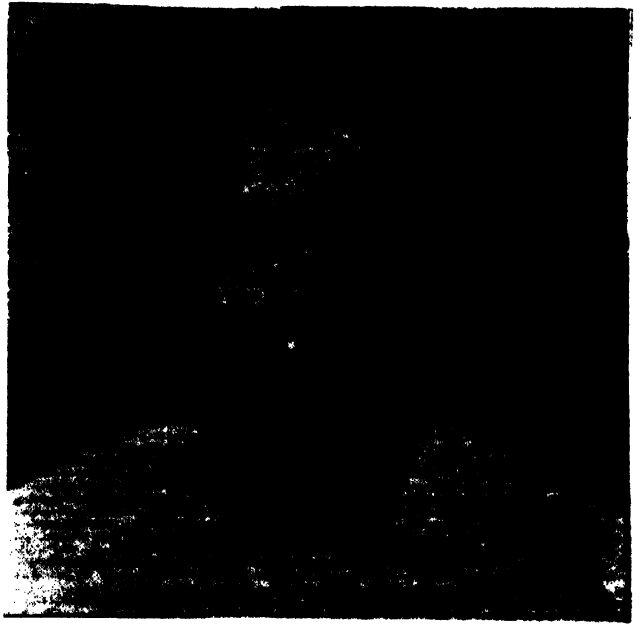
হরিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

হরিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৯২) :

প্রথম দিকে বিপ্লবীদের সাহায্যকারী পরে গান্ধীজির মতে বিশ্বাসী কংগ্রেসে কর্মী। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রাথমিক স্কুলবোর্ডের সদস্যও ছিলেন। অঞ্চলে দাতব্য চিকিৎসালয় ও কুটির শিল্প গড়ে তোলেন।

সমাজসেবী পরেশনাথ বিশ্বাস (১৯০৭-১৯৮৪) :

লক্ষ্মীকান্তপুর রেলস্টেশনের কিছু দূরে ঘাটেশ্বর গ্রামে জন্ম। পিতা শশিভূষণ ও পিতৃব্যগণের বহু সমাজ সেবামূলক কাজ ও দানের মধ্যে পাথরপ্রতিমা থানার কাশিরাবাদে একটি এবং দক্ষিণ দুর্গাপুরে একটি ও মথুরাপুর থানার ইমামুদ্দিপুরে একটি—মোট তিনটি স্কুল প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। এঁদের উত্তরসূরি পরেশনাথ ঘাটেশ্বরে নিজের জমি অর্থ ও গৃহ দান করে একটি বালিকা বিদ্যালয়—আজকের ঘাটেশ্বর বালিকা বিদ্যালয়—প্রতিষ্ঠা ও স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে 'ঘাটেশ্বর পরেশনাথ বিশ্বাস মেমোরিয়াল কে. জি.' স্থাপিত হয়েছে।

সঙ্গীতজ্ঞ ধীরেন ভট্টাচার্য (১৯১০-১৯৭৭) :

সাউথ বিষ্ণুপুর গ্রামের জন্ম। দুলর্ভ ভট্টাচার্য সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ নিয়ে উপস্থিত পণ্ডিতগণের প্রশংসা অর্জন করেন।

বেহালাবাদক প্রতাপচন্দ্র ব্রহ্মচারী (১৯১২-১৯৮৬) :

মজিলপুরে জন্ম। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মিশ্রের কাছে বেনারসী ঘরানা আয়ত্ত করেন। ১৯৬৩ সালে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

যোগীন্দ্রনাথ মিত্র

ডঃ গোপীকামোহন ভট্টাচার্য (১৯৩০-১৯৮৩) :

মজিলপুরে কাত্যায়ন পরিবারে জন্ম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম এ পরীক্ষায় প্রথম হন ও পরে পি এইচ ডি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে যাদবপুর ও পরে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের বিভাগীয় প্রধানের পদ অলংকৃত করেন। আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে তিনি প্রায়ই ভিয়েনা থেকে ডাক পেতেন। দেশ পত্রিকায় তাঁর 'ভিয়েনার চিঠি' নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় তুলে ধরত। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর দুর্লভ গ্রন্থ ত্রিভাষিক অভিধান সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি।

আবৃত্তিকার প্রদ্যোতকুমার দত্ত (১৯১৬-১৯৭৯) :

মজিলপুরে জন্ম। ১৯৫৩ সালে বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি নাটকেও সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন কলকাতায় থাকাকালীন সানডে ক্লাবে।

ভারতীয় সঙ্গীত জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯) :

কালিদাস মুখোপাধ্যায় ও কিরণবালা দেবীর পুত্র হেমন্তর জন্ম মামার বাড়ি বেনারসে হলেও শৈশব কেটেছে এই জেলার বহড়ু গ্রামে পৈত্রিক ভিটায়। ১৯২৮ সালে তাঁদের পরিবার কলকাতায় ভবানীপুরে এলে তিনি মিত্র ইনস্টিটিউশনের ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই পঙ্কজ মল্লিক, জগন্ময় মিত্র প্রমুখের গান রেকর্ডে শুনতেন ও নিজের গলায় সুর তুলে নিয়ে চমৎকার গাইতে পারতেন। সহপাঠী ও পরে বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই জোর করে তাঁকে রেডিওতে অডিশন দেওয়ান, হেমন্ত তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। মায়ের উৎসাহ ও সমর্থনে সুভাষের লেখা গান দিয়েই হেমন্তর সঙ্গীতজীবন শুরু হয়। ওই সময়কার সাহিত্য সাধনার ফল দেশ পত্রিকায় 'একটি দিন' গল্প প্রকাশ। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে যাদবপুর কলেজে ভর্তি হয়েও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করতে পারেননি। অভাবের সংসারে কিছু রোজগারের আশায় শর্টহ্যান্ড টাইপ শিক্ষা একদিকে, অন্যদিকে গানের টিউশনি শুরু করেন। ১৯৪০ সালে নিমাই সন্ন্যাস ছবিতেই প্রথম চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করেন। এরপর গণনাট্য সঙ্ঘের সাথে যুক্ত হয়ে 'গাঁয়ের বধূ', 'রানার' প্রভৃতি গানের রেকর্ড করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। 'প্রিয় বান্ধবী' ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্লেব্যাকের সুযোগ পেয়ে ছায়াছবির গায়ক রূপে স্থায়ী আসন পান। ক্রমে সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশেও খ্যাতি পাওয়া অসাধারণ কণ্ঠস্বরের অধিকারী হেমন্ত কিন্তু বরাবরই বিনয়ী ও সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন।
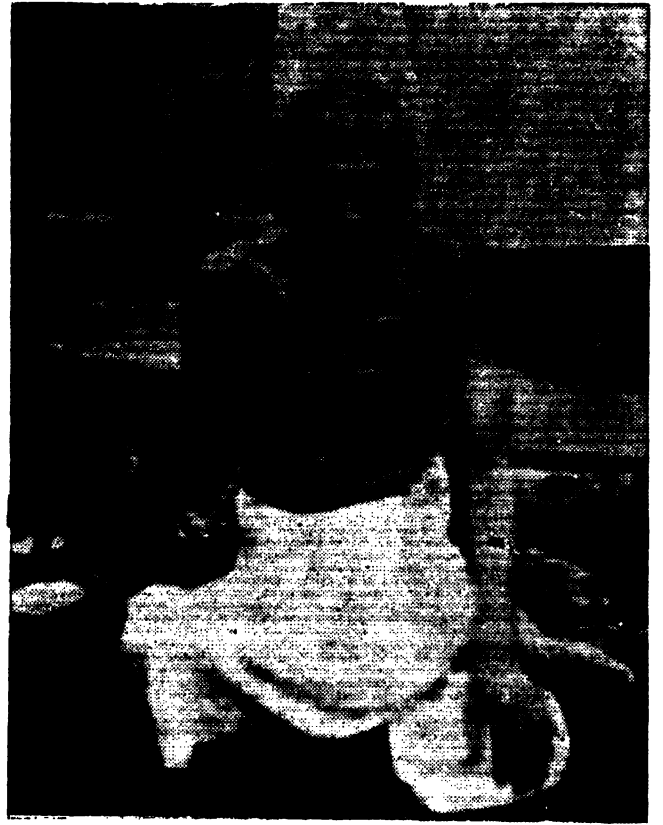
লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে তিনিই প্রথম বাংলা গান (রবীন্দ্রসঙ্গীত) গাইয়েছিলেন। ছায়াছবির গানের জগতে হৈমন্তী শুক্লা, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়ে মতো শিল্পীদের সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৫৫তে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার, ৫৮-তে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, রবীন্দ্র-ভারতীয় ডি লিট, ৮৭তে জাতীয় পুরস্কার, ৮৮তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট এবং ৮৯-এ বাংলাদেশ থেকে 'মাইকেল মধুসূদন' পুরস্কার লাভ করেন। 'আনন্দধারা' নামক আত্মজীবনীতে তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে।

জ্যোতি বসু ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
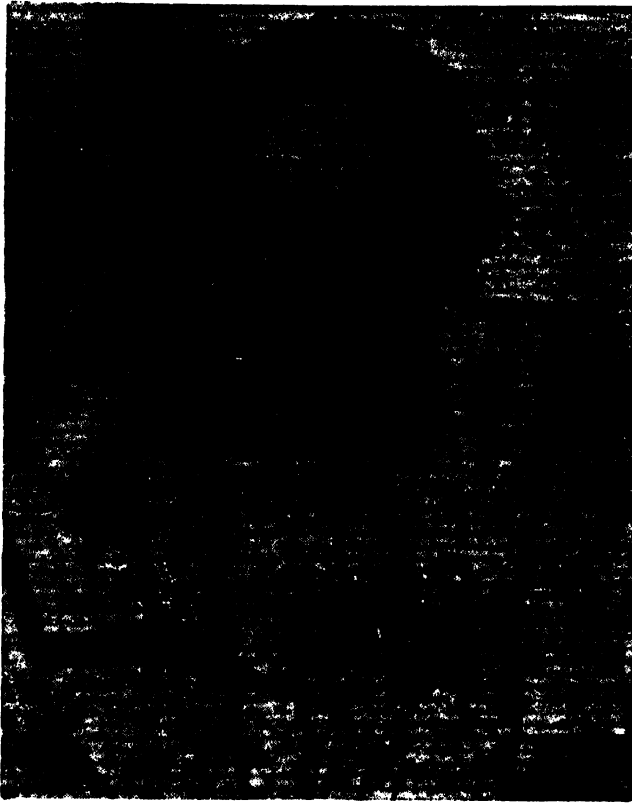
বিমলকৃষ্ণ মতিলাল

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক বিমলকৃষ্ণ মতিলাল (১৯৩৫-১৯৯১) :

জয়নগরে মতিলালপাড়ায় জন্ম। পিতা হরেকৃষ্ণ, মাতা পরিমল। গণিতে কৃতী হয়েও তিনি দর্শন চর্চার লক্ষ্যে মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স-সহ বি এ পরীক্ষা দেন ও প্রথম স্থান পেয়ে জুবিলি স্কলার হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ও সংস্কৃত কলেজ থেকে 'তর্কতীর্থ' পাস করেন এই মেধাবী ছাত্র। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট করে কানাডার টরেন্টো ও আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া, শিকাগো ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৬ সালে মাত্র ৪০ বছর বয়সে অক্সফোর্ডের অল্‌সোলস্ কলেজে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে তিনি স্পলডিং অধ্যাপক পদে বসার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন। বিলেতে প্রাচ্য ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের উচ্চতম পদ এটি। তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল—'লজিক ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড রিয়্যালিটি' এবং 'পার্সেপশন : অ্যান এসে অন ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান থিয়োরিজ অফ নলেজ'। বাংলা ভাষায় তাঁর একটিই পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশিত হয়েছে—'নীতি যুক্তি ও ধর্ম—কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ'। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর 'জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি' ত্রৈমাসিকের সম্পাদনা করেন। বিলেতের শ্রেষ্ঠ দর্শনের পত্রিকা 'MIND' -এ তাঁর ও অধ্যাপক প্রণব সেনের যুগ্ম রচনা ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রাচ্যদর্শন ও নব্যন্যায়ের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের পতন হল খ্যাতির মধ্যগগনে থাকাকালীন মাত্র ৫৫ বছর বয়সে।

শেষ কথা : 'কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা (ভ্রাম্যমাণ)'-এর পরিচালক মজিলপুরের শ্রীপ্রভাত ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাহায্য ছাড়া এই জীবনী সংকলনটি রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। প্রচুর তথ্য সরবরাহ করে, প্রেরণা দিয়ে, দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা দেখতে দিয়ে—তাঁর সংগ্রহ থেকে সম্ভাব্য প্রায় সকল প্রকারে তাঁর সাহায্য পেয়েছি। তাই শুধুমাত্র ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে ছোট করব না। কৃতজ্ঞতা জানাই। শান্তি সংঘ (জয়নগর) পরিচালিত 'দক্ষিণী পুরাকীর্তি ও বরেণ্য স্মৃতি কক্ষের পরিচালক শ্রীরাধাবল্লভ বন্দোপাধ্যায়কে ও মজিলপুরে শ্রীমিন্টু রায় ও শ্রীজয়ন্ত হালদারকে।

যে-সমস্ত বই, পত্রিকা ইত্যাদি থেকে এই জীবনী সংকলনের তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে :

তথ্য সংগ্রহ :

১। নব নিম্নবঙ্গ (বিশেষ সংখ্যা) রত্নমালা। ১ জানুয়ারি ১৯৯৩। (দঃ চঃ পরগনা জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী সংকলন)

২। দক্ষিণ ২৪ পরগনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৮১ স্মারক পত্রিকা। 'মনীষী তীর্থ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা'—নিবন্ধ।

৩। প্রবন্ধ সংকলন—কালিদাস দত্ত (মজিলপুর, ১৯৯১) কালিদাস দত্ত স্মৃতি সংগ্রহশালা (ভ্রাম্যমাণ) কর্তৃক প্রকাশিত

৪। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সংকলন (১ম খণ্ড)
সংকলক : কালিদাস দত্ত ও বিপ্লবী সন্তোষ ভট্টাচার্য
প্রকাশক : নব নিম্নবঙ্গ। জয়নগর-মজিলপুর। ১৯৮৯।

৫। আজকাল (ক) ১৪/জুলাই ৯৫ ও (খ) ২৪/মার্চ/৯৫

৬। শান্তি সংঘ পরিচালিত দক্ষিণী পুরাকীর্তি ও বরেণ্য স্মৃতি কক্ষের (ক) উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ও (খ) অ্যালবাম।

৭। দেশ (ক) ৬/জুলাই/৯১ ও (খ) ৯/এপ্রিল/৯৪ (গ) ২/১/৬৫

৮। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—বিভূতি চৌধুরী

৯। ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ (বারাসত, দঃ) রজত জয়ন্তী উৎসব, স্মারক পত্রিকা।

১০। পশ্চিমবঙ্গ—নববর্ষ সংখ্যা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

১১। স্মৃতির সন্ধানে ভারত-পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি (৩১/১/৯৬)

১২। দি জয়নগর, মজিলপুর পিপল্‌স কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড বিশেষ সভার উদ্যোগ স্মরণিকা। (১২/১/৯৬)।

লেখক পরিচিতি : লোকসংস্কৃতি গবেষক

গণেশ ঘোষ

প্রাক্‌স্বাধীনতা-পর্বে বজবজ এবং বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর

বজবজের প্রাচীনত্ব বলে কিছু নেই, তবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিক অবস্থান বজবজকে দ্রুত শিল্পনগরীর মর্যাদা এনে দিয়েছে। সমুদ্র থেকে নদীপথে কলকাতা আসার প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল বজবজ। তাই পর্তুগিজ, মগ জলদস্যুদের হাত থেকে গ্রামবাংলাকে বাঁচাতে রাজা প্রতাপাদিত্য নদীর ধারে নির্মাণ করেছিলেন বজবজ দুর্গ, যেটি পরবর্তীকালে নবাবের দখলে যায়। বিদেশি শত্রুরা যাতে সমুদ্রপথে এসে কলকাতায় না ঢুকতে পারে তার জন্য বজবজ দুর্গটি আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল।

ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা ইংরেজদের কলকাতা থেকে বিতাড়িত করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন এবং কলকাতার নাম পরিবর্তন করে নাম দেন 'আলিনগর''। কলকাতার ইংরেজরা প্রাণভয়ে নৌ[illegible] পা[illegible] যায় এবং ফলতায় ডাচদের [illegible] দুর্গে আশ্রয় নেয়।

লর্ড ক্লাইভ ও [illegible] টসন ৫ খানি যুদ্ধজাহা[illegible] কাতা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ [illegible] ঝড়ে ২টি জাহাজ নিমজ্জি[illegible] ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে তি[illegible] সেন। সেখানে এসে পরি[illegible] স্থিত ইংরেজদের নিয়ে [illegible] মজর ক্লিওপার্টিককে নিয়ে [illegible] মুখে পুনরায় যাত্রা করেন। [illegible] থেকে ১০ কিমি দক্ষিণে ল[illegible] সৈন্য, কামান, বন্দুক, গোলা নিয়ে বনজঙ্গল ভেদ ক[illegible] দিকে এগোতে থাকেন, অপর দিকে নদীপথে অ্যাড[illegible] কাপ্টেন কুট ৩টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে (কেন্ট, টাইগার, সলস্‌বেরি) বজবজ কেল্লার মুখোমুখি পৌঁছান। নবাব সিরাজউদৌল্লার দেওয়ান রাজা মানিকচাঁদ হাতির পিঠে চড়ে ১৫০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে বজবজ অভিমুখে এসে লর্ড ক্লাইভের সৈন্যদলের মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের প্রহসন করে মানিকচাঁদ সসৈন্যে পলায়ন করে এবং বজবজ দুর্গে অবস্থিত সৈন্যগণও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন জাহাজ থেকে বজবজ দুর্গের ওপর কয়েকটা কামানের গোলা নিক্ষেপ করলে তার প্রত্যুত্তর দেবার মতো সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকলেও তা ঠিকমতো প্রয়োগ করল না নবাববাহিনী বজবজ দুর্গ থেকে। বিনা আয়াসে ২৯ ডিসেম্বর, ১৭৫৬ বজবজ দুর্গের দখল নিল ইংরেজরা। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ধাপ এখানে গাঁথা হলো। সিরাজের পতন দ্রুত শুরু হলো। কলকাতা পথের মেটিয়াবুরুজ দুর্গ ও শালকিয়ার ঠানা দুর্গ বিনাযুদ্ধে ইংরেজরা দখল করল। ২ জানুয়ারি ১৭৫৭ কলকাতা পুনরুদ্ধার করল তারা। ঐতিহাসিকরা আক্ষেপ করে বলেছেন, সেদিন বজবজ যুদ্ধে একটু দৃঢ়তার সঙ্গে নবাব সৈন্য যুদ্ধ করে ইংরেজদের আর একবার তাড়িয়ে দিতে পারলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো[1]। ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকায় সেদিন ইংরেজরা দখল করল বজবজ দুর্গ। বণিকের মানদণ্ড এখান থেকেই রাজদণ্ডরূপে প্রোথিত হলো। বজবজ দুর্গ জয় ইংরেজদের মনোবল অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। বজবজ দুর্গ আজ নেই, তবে দুর্গের পরিখার কিছু চিহ্ন আজও লক্ষ্য করা যায়।

অগ্নিযুগের সুভাষচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছিল এই বজবজ। দেশে সাইমন কমিশন নিয়ে ভারতব্যাপী ছাত্র আন্দোলন চলছে। শ্রমিকরাও দাবিদাওয়া নিয়ে শুরু করে আন্দোলন। সারা ভারতব্যাপী বিভিন্ন শিল্পে একসঙ্গে ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘটে যোগ দেয় জামশেদপুর টিনপ্লেট কোম্পানি ও পাটকলগুলির শ্রমিকরা। এই টিনপ্লেট কোম্পানি প্রকৃত মালিক বার্মা অয়েল কোম্পানি। এই টিনপ্লেট কোম্পানির সমর্থনে বজবজে বার্মা অয়েল কোম্পানিও অন্যান্য তেল কোম্পানিতে ধর্মঘট শুরু হয়, যেটি পরিচালনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সুভাষবাবু বজবজের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি, জনসভা করতেন এবং অন্যান্য স্থানে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বজবজের শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করতেন এবং তাঁদের পাশে দাড়িয়ে তাঁদের মনোবলকে চাঙ্গা করতেন। এই ধর্মঘট প্রায় আড়াই মাস চলে।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রিঃ এক ধর্মসভার আয়োজন
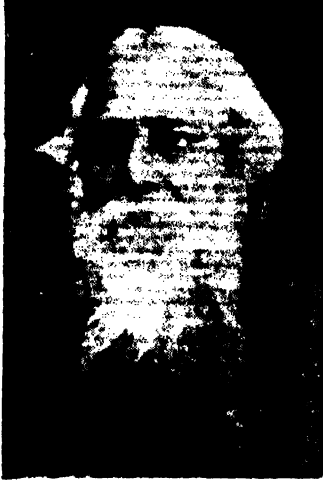
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
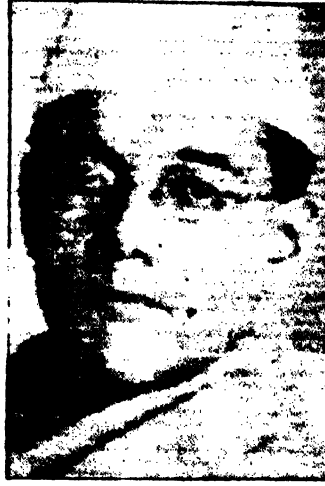
সুভাষচন্দ্র বসু

স্বামী বিবেকানন্দ

করা হয়। যার সূচনা ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর ও সমাপ্তি ২৭ সেপ্টেম্বর। কয়েকটি ভাষণে বিবেকানন্দ ভারতাত্মার মর্মকথা শুনিয়ে এই মহাসভাকে জয় করেছিলেন। রাতারাতি স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে যান এক জগদ্বিখ্যাত পুরুষ। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বেদান্তের বাণী প্রচার করে ১৮৯৭ খ্রিঃ গোড়ার দিকে ফিরলেন ভারতবর্ষে। বিশ্বজয়ী স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তন ভারতবাসীর জীবনে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। দক্ষিণ ভারতে প্রথম পদার্পণ করে পরাধীন ভারতবাসীকে প্রাণশক্তিতে পুনর্জীবিত করে, সারা দক্ষিণ ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে তিনি মুখ ফেরালেন তাঁর বাল্য-শৈশবের লীলাভূমি কলকাতার দিকে। পথক্লান্ত স্বামীজি বিশ্রামের আশায় ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭ মোম্বাসা জাহাজে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। মোহনা পেরিয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার প্রাক্কালে জাহাজ নোঙর করল বজবজে। সারা রাত জাহাজে অবস্থান করে পরদিন প্রভাতে সূর্যকে প্রণাম করে অবতরণ করলেন বজবজে, স্পর্শ করলেন মাতৃভূমির মাটি, বিজয়দর্পে বজবজ থেকে রওনা হলেন ট্রেনযোগে কলকাতা অভিমুখে। ২০০০ ভক্ত তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বজবজে অবতরণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বামীজি মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসতে পারতেন অথবা জাহাজ মোম্বাসায় সোজা কলকাতা পৌঁছে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নামতে পারতেন। বজবজে অবতরণের কোনও সংবাদ ছিল না। কিছু বিশিষ্ট মানুষজন খিদিরপুর ডকেই উপস্থিত ছিলেন। সোজা কলকাতায় না নেমে তাঁকে বজবজে নামতে হলো কোন প্রয়োজনে! তাঁর জাহাজ বজবজে নোঙর করে সেই স্থানে, যেখানে কলকাতা পুনরুদ্ধারে এসে ইংরেজদের তিনটি যুদ্ধজাহাজ নোঙর করেছিল। বজবজ দুর্গ আক্রমণ করে এবং জয়লাভ করে বজবজে ইংরেজরা প্রথম সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সোপান গড়ে। স্বামীজি পরদিন জাহাজ থেকে নেমে বীরদর্পে যেন সেই সাম্রাজ্যবাদের ভিত নাড়া দিয়ে কলকাতায় এসে জাতিকে ডাক দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন—আগামী ৫০ বছরের' মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে, সাধারণত যেভাবে দেশ স্বাধীন হয় সেভাবে নয়, Not with blood sheed ....(উদ্বোধন ৬২ বর্ষ, পৃষ্ঠা ৫৪৮)[৫] তিনি আরো বলেন—আগামী ৫০ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হোক। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই কয়বছর ভুলে থাকলে কোন ক্ষতি নাই"। (উদ্ধৃতাংশ 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতা)।

১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বজবজঘাটে ভিড়ল এক জাপানি জাহাজ S.S. KOMAGATAMARU, তাতে আবদ্ধ ছিল ৩৭২ জন শিখ যাত্রী।

ভাগ্যান্বেষণে তারা ব্রিটিশের আর এক কলোনি কামাগাটামারু জাহাজে কানাডায় যাচ্ছিলেন, কিন্তু কানাডা সরকার তাঁদের এই আগমন প্রচলিত ইমিগ্রেশন আইনের খেলাপি ঘোষণা করে তাদের কানাডায় নামতে দিল না। খাদ্যপানীয় কোনরকম তুলতে দেওয়া হলো না, এমন কি কানাডায় বসবাসকারী আত্মীয়দের আনা খাদ্যদ্রব্য তুলতে দিল না। জাহাজটি তীর থেকে হঠাবার জন্য "শী-লায়ন" (Sea-lion) যুদ্ধজাহাজ এসে হোসপাইপের গরম জল যাত্রীদের ওপর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। পরে আরো একটি যুদ্ধজাহাজ "রেনবো"কে আনা হলো তাদের বন্দর থেকে তাড়াতে। অবশেষে সামান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়ে কলকাতা অভিমুখে পাঠিয়ে দিল+ হংকং থেকে যাত্রা করে দীর্ঘ ছ মাস তাদের জাহাজের অবস্থান করে, মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। অনাহার, অনিদ্রা, অপমানিত হয়ে কামাগাটামারু জাহাজ ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বজবজে এসে ভিড়ল। ব্রিটিশ সরকার তাদের গদর পার্টির কর্মী সন্দেহ করেছিল। তাই জাহাজ ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিরাট সৈন্যসামন্ত নিয়ে জাহাজে উঠে তখনই যাত্রীদের জাহাজ থেকে নেমে জাহাজঘাটা সংলগ্ন বজবজ রেল স্টেশনে রাখা বিশেষ পাঞ্জাব মেল চড়ার নির্দেশ দেন। "ইনগ্রেস টু ইন্ডিয়া" আইনের বলে তাঁদের ট্রেনে উঠতে বাধ্য করা হয় এবং যাঁরা ট্রেনে উঠতে অস্বীকার করেন, তাঁদের স্টেশন চত্বরে গুলি করে মারা হয়। খুব কাছ থেকে ১৭৭ রাউন্ড গুলি এলোপাথাড়ি চালিয়ে ও বেয়নেটের আঘাতে যাত্রীদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। দু-ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৫০ জন শিখ যাত্রীকে গুলি করে হত্যা করে এবং শতাধিক মানুষ আহত ও ২১১ জনকে বন্দী করে কারান্তরালে পাঠিয়ে দেয়। ১৯১৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর। এই ঘটনার নিন্দা করে স্যার সুরেন ব্যানার্জি দৃঢ়কণ্ঠে এর তদন্তের দাবি জানান এবং বলেন, যাত্রীদের কলকাতা প্রবেশ বাধা না দিলে এই হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ছিল না।[৬]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নিষ্ঠুরতা ও তাঁদের কানাডায় প্রবেশ করতে না দেওয়া কানাডা সরকারের এই অসম আচরণের প্রতিবাদে ১৯১৬ সালে তাঁর কানাডা সফর বাতিল করেন*। কামাগাটামারুর ঘটনা ভারতের বুকে প্রথম সংঘবদ্ধ সংঘর্ষ, যেখানে মুক্তিকামী মানুষ ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে আত্মাহুতি দিয়েছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার একে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।*

দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই সংগ্রামে দলপ্রতি বাবা গুরুদিৎ সিংয়ের প্রদর্শিত শহিদের রক্তে রঞ্জিত স্থানে কৃপাণ আকৃতি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি তদানীন্তন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাবা গুরুদিৎ সিং ও তাঁর কয়েকজন সহচরকে সঙ্গে নিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করতে এসে বলেছিলেন—"ভারতের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি, সেইসব শহিদের আত্মাহুতিতে স্বাধীনতার সোপান গড়ে উঠেছে।" বজবজের মাটিতে সেদিন বীর শিখ অভিযাত্রীদের বুকের রক্তে ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায়ের সন্ধান দিয়েছিল। কামাগাটামারুর ঘটনা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বজবজের নাম চিরস্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর ঘটনা অমৃতসরকে যেমন রাজনৈতিক পীঠস্থানে পরিণত করেছে, কামাগাটামারুর ঘটনা সে রকম বজবজকে শহিদতীর্থে পরিণত করেছে।

অগ্নিযুগের সুভাষচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছিল এই বজবজ। দেশে সাইমন কমিশন নিয়ে ভারতব্যাপী ছাত্র আন্দোলন চলছে। শ্রমিকরাও দাবিদাওয়া নিয়ে শুরু করে আন্দোলন। সারা ভারতব্যাপী বিভিন্ন শিল্পে একসঙ্গে ধর্মঘট শুরু হয়। এই ধর্মঘটে যোগ দেয় জামশেদপুর টিনপ্লেট কোম্পানি ও পাটকলগুলির শ্রমিকরা। এই টিনপ্লেট কোম্পানি প্রকৃত মালিক বার্মা অয়েল কোম্পানি। এই টিনপ্লেট কোম্পানির সমর্থনে বজবজে বার্মা অয়েল কোম্পানিও অন্যান্য তেল কোম্পানিতে ধর্মঘট শুরু হয়, যেটি পরিচালনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সুভাষবাবু বজবজের বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি, জনসভা করতেন এবং অন্যান্য স্থানে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বজবজের শ্রমিকদের কথা উল্লেখ করতেন এবং তাঁদের পাশে দাড়িয়ে তাঁদের মনোবলকে চাঙ্গা করতেন। এই ধর্মঘট প্রায় [illegible] মাস [illegible]। তিনি বজবজে প্রথম পেট্রোলিয়াম ওয়ার্কার্স ইউনি[illegible] জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন, যার সভাপ[illegible]ভাষবাবু শেষ বজবজে আসেন ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯[illegible] আহ্বান করেন "দেশের ডাক শুনুন ও সময় সুযোগের [illegible] জয় আমাদের অনিবার্য, স্বাধীন আমরা হবো আর [illegible]।" ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারতকে মুক্ত কর[illegible] সম্প্রদায় ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করতে [illegible]মের ডাক দেন। ওই জনসভায় তাঁকে বজবজ [illegible]রের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়*-

"দেশগৌরব শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়ের করকমলে—
তুমি যে সুরের আগুন জ্বলি[illegible] প্রাণে যে আগুন ছড়িয়ে গেল, সবখানে, সবখানে, [illegible]।"

হে দেশ গৌরব/বঙ্গজননীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তুমি, তোমাকে আজ আমাদের দরিদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা ধন্য।

হে নির্ভীক সেনাপতি/ পররাজ্য লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের আজ সমগ্র বিশ্বে ত্রাসের সঞ্চার করেছে, এই সংকট মুহূর্তে আপসপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজপ্রতিনিধির দরবারে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। আর এই দুর্দিনে তোমার অভয়বাণী সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সুপরিচালিত অভিযান সমগ্র ভারতে তোমার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে।

হে বাংলা মায়ের দুলাল/ তুমি একদিন যেমন সমগ্র ভারতে বাঙালির সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছো, তেমনি বিশ্বের দরবারে ভারতের আসন প্রতিষ্ঠা করেছো। ভারতের যুবসমাজ আজ তোমার নেতৃত্বেই আস্থাবান এবং তোমারই আদর্শে তোমারই অনুপ্রেরণায় পূর্ণ স্বাধীনতার আপসহীন সংগ্রামে অগ্রবর্তী হয়ে চলেছে।

হে ত্যাগী সন্ন্যাসী/তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন এই শিশু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা দেশসেবার কার্যে তোমারই নগণ্য অনুচর হওয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে পারি।

প্রণতঃ বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির সদস্যবৃন্দ।

সুভাষচন্দ্র সব সময়েই মনে করতেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে শ্রমিক আন্দোলন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, উভয় আন্দোলন যখন

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত - ১৯১১

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে নেতাজীকে প্রদত্ত মানপত্র
২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪০

"দেশ গৌরব শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহোদয়ের করকমলে :—
তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে"।

হে দেশগৌরব,
বঙ্গজননীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান তুমি তোমাকে আজ আমাদের দরিদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা ধন্য।

হে নির্ভীক সেনাপতি,
পররাজ্য লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহের বিকট মুখব্যাদন আজ সমগ্র বিশ্বে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। এই সংকট মুহূর্তে আপোষ পন্থী নেতৃবৃন্দ রাজ্য প্রতিনিধির দরবারে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন লাভের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল, আর এই দুর্দিনে তোমার অভয়বাণী সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সুপরিচালিত অভিযান সমগ্র ভারতে তোমার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে।

হে বাংলা মায়ের দুলাল,
তুমি একদিন যেমন সমগ্র ভারতে বাঙালীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ তেমনিই বিশ্বের দরবারে ভারতের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। ভারতের যুবসমাজ আজ তোমার নেতৃত্বেই আস্থাবান এবং তোমারই আদর্শে, তোমারই অনুপ্রেরণায় পূর্ণ স্বাধীনতার আপোষহীন সংগ্রামে অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছে।

হে ত্যাগী সন্ন্যাসী,
তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর যেন এই শিশু প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া আমরা দেশ সেবার কার্যে তোমারই নগন্য অনুচর হওয়ার সামর্থ অর্জন করিতে পারি।

প্রণতঃ
বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্যবৃন্দ

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরীর নিমন্ত্রণে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর
মাসে একটিতে আমি গিয়েছিলাম। আমার আত্মচরিতে রামজী
সাধুর উল্লেখ আছে। রামজী সাধু - আমার গোঁসাইবাবা আমার
জন্মকাল থেকে কৈশোর এমন কি যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত
একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছেন। শুনেছি - আমি যখন মাতৃগর্ভে
তখন তিনি আমার কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ করেছেন জপ করেছেন।
বাল্যকালে আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। আমার ধাত্রীদেবতা
উপন্যাসে তিনিই গোঁসাইবাবা। এই গোঁসাইবাবা বা রামজী
সাধুর একটি আস্তানা ছিল বজবজে। মধ্যে মধ্যে বজবজেও এসে
তিনি থাকতেন। তাঁর এক ভক্ত ছিল বজবজে - তাঁর নাম অধর
অধর রায়। গঙ্গার ধারে একটি বটগাছের তলায় তিনি একটি কালীমূর্তি
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কালীর নাম দিয়েছিলেন তিনি খুকীমা।

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির ভিজিটারস-বইয়ে তারাশঙ্করের লিপি

যুক্ত হয়েছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখনই নতুন পন্থা খুঁজছে তাকে বানচাল করতে। আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তখন নতুন মাত্রা পেয়েছে।

১৮৮৬ সালে বজবজে তৈল বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়, বজবজ দুর্গের পরিত্যক্ত স্থানে। বজবজ বন্দরেরই শেষ সীমানায় প্রতিষ্ঠিত আছে কালীবাড়ি, বজবজ পোর্ট কমিশনে চাকরি সূত্রে আসেন বীরভূমের জনৈক দয়াল ঘোষ। তিনি শক্তির উপাসক ও তান্ত্রিক, তাঁরই গুরুদেব স্বামী পূর্ণানন্দ মায়ের বর্তমান মূর্তিটি বীরভূম থেকে সংগ্রহ করে এখানে আনেন। মূর্তিটি কীভাবে সংগৃহীত হলো বা প্রতিষ্ঠিত হলো সে এক রহস্যে ঢাকা ইতিহাস। কিছু জনশ্রুতি, কিছু কিংবদন্তী থেকে জানা যায় বর্ধমানের মহারাজা তেজেশ্চন্দ্র, সাধক কমলাকান্তের আধ্যাত্মিকতায় ও ধর্মবৈভবে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন। কমলাকান্তের ইচ্ছায় মহারাজ এক নিকষ কালো কষ্টিপাথরের এক মূর্তি নির্মাণ করেছেন। এই মূর্তিটি একখণ্ড কষ্টিপাথর কেটে নির্মিত, কোথাও কোনও জোড় নেই, মুণ্ডমালাটিও একই প্রস্তরখণ্ড থেকে খোদিত। এই বিগ্রহের পদতলে শিব নেই. সাধক কমলাকান্ত নিজে ভূমিতে শয়ন করে মাতৃমূর্তি বক্ষে ধারণ করতেন। মূর্তিটির দীপ্ত চক্ষুদ্বয়, উন্নত নাসা, লোলজিহ্বা, দৃঢ় চিবুক, দীপ্ত ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। চতুর্ভুজা, ওপরে বাম হাতে অভয়মুদ্রা। নিচের হাতে আশীর্বাদ বা বরদান। এই মূর্তি গড়ার ব্যয়ভার যে কোনও সাধারণ ব্যক্তির সাধ্যের নয়। এবং এমন একটি অপরূপ মূর্তির কারিগর পাওয়াও সেকালে ছিল মুশকিল। তাই মহারাজা তেজেশ্চন্দ্রের আনুকূল্যেই যে এই মূর্তিটি তৈরি হয়েছিল সেই যুক্তি গ্রহণযোগ্য। সাধক কমলাকান্তের দেহাবসানের পর তাঁর কোনও শিষ্য বা বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে এই মূর্তির বজবজে আগমন ঘটে। মূর্তিটি উচ্চতায় একহাত পরিমাণ। তাই আদর করে একে বলে 'খুকীমা।' বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই মূর্তিটি সাধক কমলাকান্তের শ্যামামা।

খুকীমার পুরোহিত হয়ে একসময় আসেন অযোধ্যা নিবাসী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামজি। তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাত্রীদেবতা গ্রন্থে গোঁসাইবাবা। ধাত্রীদেবতা উপন্যাসটিতে তারাশঙ্করের আত্মজীবনের অনেক উপাদান আছে। এই রামজি সাধুর টানে তিনি বারবার বজবজে এসেছেন এবং ১৯৬১ সালে বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য এসে রেখে গেছেন এক অনবদ্য ঐতিহাসিক দলিল। যাতে রামজি সাধু ও বজবজ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

তিনি রামজি সাধু বা গোঁসাইবাবার টানে ১৯১৬-১৭ সালে বজবজে আসেন। রামজি সাধু তারাশঙ্করের জীবনে গোঁসাইবাবা ও অক্ষয় জ্ঞানের অধিকারি। রামজি সাধু গোঁসাইবাবার পার্থিব দেহের সমাধি তিনি নিজে হাতে রচনা করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বহস্তে লিখিত বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির ভিজিটার্সের বইতে লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক দলিলটি এখানে মুদ্রিত হলো[৯]—

"বজবজ পাবলিক লাইব্রেরির নিমন্ত্রণে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে একটি অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। আমার আত্মচরিতে রামজী সাধুর উল্লেখ আছে। রামজী সাধু—আমার গোঁসাইবাবা—আমার জন্মকাল থেকেই কৈশোর এমন কি যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছেন। শুনেছি—আমি যখন মাতৃগর্ভে তখন তিনি আমার কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ করেছেন, জপ করেছেন।

বাল্যকালে আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। আমার 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে তিনিই গোঁসাইবাবা। এই গোঁসাইবাবা বা রামজী সাধুর একটি আস্তানা ছিল বজবজে। মধ্যে মধ্যে বজবজেও এসে তিনি থাকতেন, তাঁর এক ভক্ত ছিল বজবজে। তাঁর নাম বলতেন অধর রায় (অধর দাস হবে)। গঙ্গার ধারে একটি বটগাছের তলায় তিনি একটি কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কালীর নাম দিয়েছিলেন 'খুকীমা।' ১৯১৬-১৭ সালে আমি কলকাতায় পড়তে এসে বজবজে এসেছিলাম। 'খুকীমা' তখন বটগাছতলায় একটি বেদীর ওপর ছিলেন। সুদীর্ঘকাল পর কলকাতায় এসে তখন বাস করছি। তখন একদিন বজবজ গিয়েছিলাম অতীত স্মৃতির আকর্ষণে। গোঁসাইবাবা এখনও আমার মনের মধ্যে আছেন—মুছে যাননি, জীবনে যাঁরা অক্ষয় স্থানের অধিকারী তিনি তাঁদের অন্যতম। বজবজের প্রতি একটি

আকর্ষণও সেই সূত্রে। সেই কথা অবগত হয়েই বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ সেদিন আমাকে আহ্বান করেছিলেন। আমি সানন্দে গিয়েছিলাম। সেদিনের অনুষ্ঠানের ছবিও আমার মনে রয়েছে। অনুষ্ঠানটি মনোরম অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং বজবজ গ্রন্থাগার দেখেও খুশী হয়েছিলাম। বজবজ আজ ১৯১৬-১৭ সালের বজবজ নেই, আজ বজবজ একটি সমৃদ্ধ স্থান, পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার, আশপাশের চটকল, পাটকলের চিমনি মাথা তুলেছে। লোকজন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। 'খুকীমা' আজ বটতলার অধিকারিণী নন। তিনি পাকা মন্দির ও নাটমন্দিরের অধিকারিণী। আজও পর্যন্ত যান্ত্রিক সভ্যতার জড়বাদের মধ্যে আধ্যাত্মবাদের মতো প্রাণকেন্দ্র জাগ্রত রয়েছেন। ভারত সভ্যতার বিবর্তনের রূপটিকে অবিকৃত রেখেছেন। সেদিন আমি খুকীমাকে প্রণাম করে পেট্রোল ট্যাঙ্কের এলাকার পাশ দিয়ে এসে উঠেছিলাম বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে। আজ বজবজের মতো জনবহুল বর্ধিষ্ণু স্থানে এই গ্রন্থাগার খুব প্রয়োজনের জিনিষ, তার অনেক সমৃদ্ধির প্রয়োজন স্বাধীন দেশে। বজবজের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে লাইব্রেরীরও শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবীরূপে হবে বলেই আমি মনে করি,—আশা করি বজবজে আজ শ্রমবিনিময়ে অর্থের অভাব নেই কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাণময় কোষে গঠিত মানুষের মনের তৃষ্ণার জল লাগাবার গুরুত্ব বিপুল......... (২৯/৭/৬৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন মেয়ে শ্রীমতী র‍্যাচেল ফ্যাল মাকডার্মচে শাক্ত কবি কমলাকান্তের পূজিত মূর্তির সন্ধানে বর্ধমানের গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর সেই গবেষণামূলক অনুসন্ধানের তাগিদে ছুটে এসেছেন বজবজে এই মূর্তিটিকে পরীক্ষা করার জন্য এবং মূর্তিটি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।[১০]
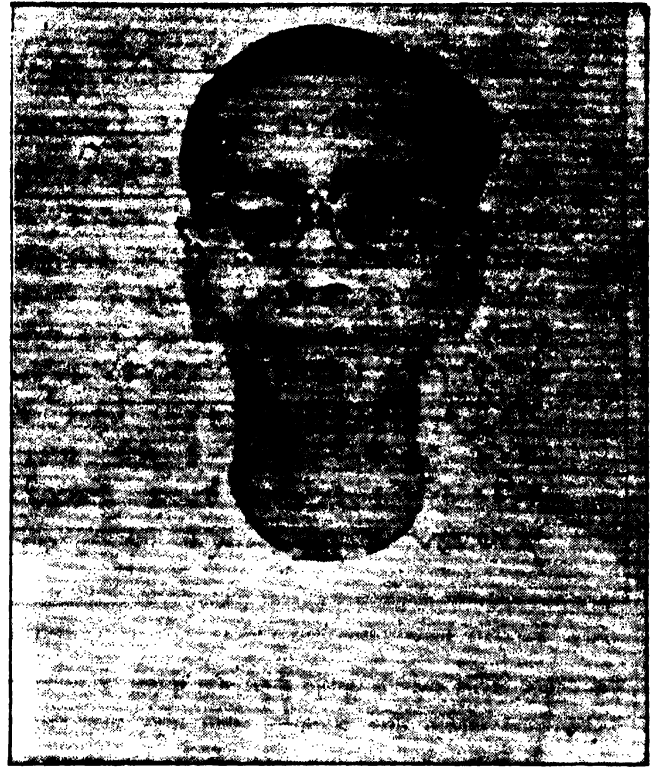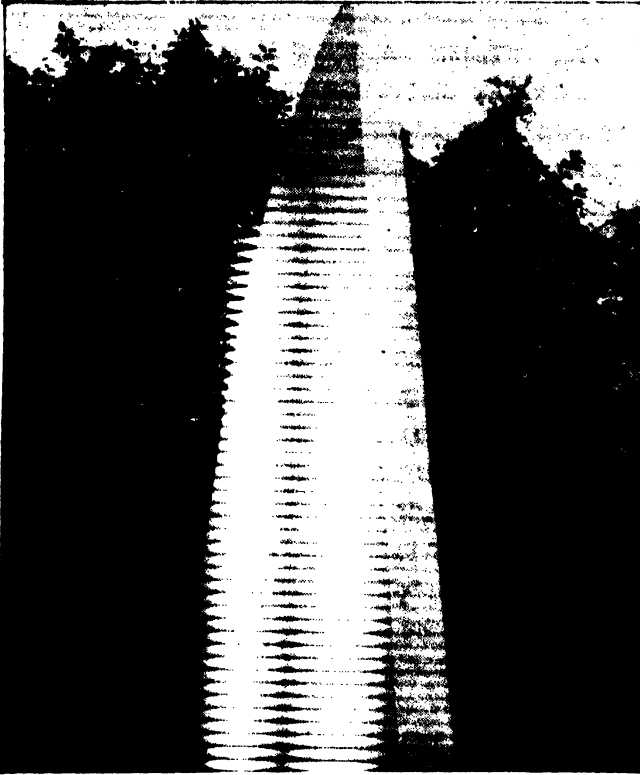
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পুণ্যসলিলা ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী বজবজ বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। বিশ্ববন্দিত ও বিশ্ববিজয়ী মহান মনীষীত্রয় স্বামী বিবেকানন্দ, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্য পদধূলিরঞ্জিত বজবজ।

রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ছিলেন বজবজ নিশ্চিন্তপুর নিবাসী কিশোরীমোহন সাঁতরা। তিনি বজবজ কালীপুর স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। মেধাবী ছাত্র কিশোরীবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত রবীন্দ্র অনুরাগী কিছু দিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মুদ্রণ সচিব। তাঁরই দায়িত্বে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনে কিশোরীবাবুর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমার সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের কাঠামো গড়ে তুলেছো তার সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। বিপুল বিচিত্র এর ব্যবস্থা।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কিশোরীবাবুর প্রতি অসীম নির্ভরশীল, বিশ্বভারতীর ছুটির সময় কিশোরীবাবুর দেশের বাড়িতে বজবজে মাঝে মাঝে আসতেন প্রশান্ত মহলনাবীশ, নন্দলাল বসু প্রমুখেরা। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। ১৯২১-এর জুন মাসে চেকোস্লোভাকিয়া সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে যান। চেক প্রজাতন্ত্র ঘোষণার উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চেকোস্লোভাকিয়ায় উপস্থিতিতে চেক জাতি উল্লসিত এবং এই নবজাগরণের দিনে চেকোস্লোভাকিয়ায় তাঁর শুভ পদার্পণ ও প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে সমগ্র চেক জাতি উদ্বুদ্ধ হয়। পুনর্বার ১৯২৬ সালে চেকোস্লোভোকিয়ায় যান। চেকোস্লোভাকিয়া সরকারের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালে কলকাতার কাছে বাটানগর কারখানা স্থাপিত হলে তদানীন্তন চেক প্রেসিডেন্ট বেনেস রবীন্দ্রনাথকে

কোমাগাটামারুর শহীদ স্তম্ভ

তাঁদের নতুন কারখানা পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় ১৯৩৯ সালে কলকাতা রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় সুভাষ বসুকে নিয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠায় আছেন গান্ধীসুভাষ ও কংগ্রেস জটিল সমস্যায়। গান্ধীসুভাষ আলোচনা ব্যর্থ হলে সুভাষ কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ তারই মধ্যে সুভাষকে নিয়ে ১৯ আগস্ট, ১৯৩৯ মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো। সেই জটিল মানসিকতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ চেক সরকারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। অসুস্থ শরীরে কবি ১৯৩৯ সালের ১০ নভেম্বর বাটানগর কারখানা পরিদর্শনে এলেন। সেই সময় বাটানগর বজবজ থানার অন্তর্ভুক্ত মীরপুর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ হুইল চেয়ারে কারখানা পরিদর্শন করেন। প্রায় দু-ঘণ্টা কারখানার কাজকর্ম দেখেন তিনি। এদের স্বতন্ত্রতাকে স্বীকার করে, পরিদর্শকের খাতায় লিপিবদ্ধ করে যান।[১১]—

"I have just spent a most **interesting hour in Batanagar where I had the previlage of visiting different** departments of that factory, not only **as an object lesson** in efficient organigation but in **benificent methods** regulating the community life of **the settelment.** Batanagar ought the evoke our **warm admiration.**

I was glad to find people from different parts of India working together and getting skilful training in the managment of machinary which our country needs.

I thank the founder of this great Industrials and offer my deep appreciation of the friendly welcome that was given to me during my visit."

Sd/-Rabindranath Tagure.

তথ্যসূত্র

১। সত্যচরণ শর্মা—ক্লাইভ চরিত্র। (পৃঃ ৪৮)
২। উদ্বোধন ৬২ বর্ষ ৫৪৮ পৃষ্ঠা
৩। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম।
৪। "The Bengalee" -6th oct 1914 .
৫। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৯৪ পৃঃ ১০৫৬
৬। ডঃ রমেশ মজুমদার— 'History of freedom movment in India.
৭। আনন্দবাজার পত্রিকা ২রা জানুঃ ১৯৫২
৮। বজবজ পাবলিক লাইব্রেরি হইতে সংগৃহীত।
৯। পাবলিক লাইব্রেরি হইতে সংগৃহীত
১০। মনোরমা শারদীয়া ১৩৯৮ পত্রিকা
১১। বাটা রিক্রিয়েশন ক্লাব হইতে সংগৃহীত

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

R. W. Frazer—British India.
Cartier—Governor of Bengal 1769—1772.
S. C. Hill—Bengal in 1756—1757 (Vol—112)
Caraccioli—Life of lord Clive.
ORM—History of the Millitery tranjaction of British Nation in Indostan.
Carry—Good old days of Hon'ble John Co.
Ramesh Majumdar—History of the Freedom Movement in India.
Hugh Johnston—The Voyage of Komagatamaru.
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত—চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ।
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম।
নকুড়চন্দ্র মিত্র—বজবজের ইতিহাস ও কোমাগাটামারু।
নেতাজী শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ -বজবজ পুরসভা।
মডার্ন রিভিউ—সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯১৪।
Sedition Committee Report 1918 Justis Rowlat.

লেখক পরিচিতি ঃ বিশিষ্ট আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক, An Episode of India's struggle for freedom : Komagatamaru 1914. গ্রন্থের লেখক

শিবদাস ভট্টাচার্য

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত ও বর্তমান

মির জাফর বাংলার মসনদে বসে কৃতজ্ঞতার পুরস্কার হিসাবে সপ্তগ্রামের অধীন ২৪টা পরগনা ক্লাইভকে জমিদারি দেন। সেই থেকেই ২৪ পরগনা জেলার সৃষ্টি। দেশভা[illegible] হবার পর বর্তমান বনগাঁ, গাইঘাটা ও বাগদা থানা তৎকালীন যশোর জেলা থেকে ২৪ পরগনার সঙ্গে যুক্ত হয়।

১ মার্চ, ১৯৮৬ চব্বিশ-পরগনা জেলা ভাগ হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার সৃষ্টি। সমতটের এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার ইতিহাস একটাই। এই এলাকা সমতট ও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেলার পাদদেশে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে হুগলি নদী। পূর্বে বাংলাদেশের সুন্দরবন। উত্তরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ও কলকাতা। জেলার দক্ষিণাংশ ছুঁয়ে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত পিয়ালী, বিদ্যা, মাতলা, ইছামতি প্রভৃতি নদীর খাড়িবেষ্টিত সুন্দরবনের দ্বীপময় গভীর অরণ্য।

বর্তমান হুগলি নদী যাকে আমরা গঙ্গা বলি, তার মূল জলধারা চারশো [illegible] পূর্বে আলিপুর, কালীঘাট, গড়িয়া [illegible] রাজপুর, শাসন, বারুইপুর [illegible] মজিলপুর, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর [illegible] কাশীনগর হয়ে সাগরে মিশেছিল [illegible] তীরে প্রাচীন জনপদ ও [illegible] উঠেছিল—তার নিদর্শন এখ[illegible] [illegible]নারায়ণপুর, জিপ্লট, আটঘরা, চক্রতীর্থ, বোড়াল [illegible] শুঙ্গ-কুষাণ-পাল-সেন যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া [illegible]. পোড়ামাটির জিনিস, মুদ্রা ও লিপি সংগৃহীত হয়েছে।

সুন্দরবনে একসময় জ[illegible] জলোচ্ছ্বাসে, ঝড়ে, প্রকৃতির ধ্বংস লীলায় এবং [illegible]র আক্রমণে এলাকা জনমানবহীন হয়েছে। সুন্দরব[illegible] মাটির তলায় অনেক পুরাতত্ত্বের ঐতিহাসিক নিদর্শন [illegible] দিঘির জটার দেউল, জিপ্লটে গুপ্ত যুগের মুদ্রা ও অনেক মূর্তি ঐতিহাসিক নিদর্শন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৯টি পঞ্চায়েত সমিতি, ৩১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা ৭টি, গ্রামীণ জনসংখ্যা ৫৭ লক্ষ। কলকাতা অংশসমেত জেলার জনসংখ্যা ৬৭ লক্ষ। জেলার কৃষিজীবীর সংখ্যা ৪৪ লক্ষ, খেতমজুর ৩ লক্ষ। এছাড়া আছে মৎস্যজীবী কামার, কুমোর, তাঁতি গ্রামীণ কারিগর ইত্যাদি। এই সমস্ত মেহনতি মানুষের উন্নয়নই জেলার উন্নয়ন।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ছিল আর্যোত্তর ভূমি, এখানে ছিল আদিম অধিবাসী। আর্যসভ্যতা আদিম সভ্যতাকে গ্রাস করেছে। পরবর্তীকালে প্রবেশ করেছে বৌদ্ধধর্ম। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বলে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হয়েছে। মুসলিম ধর্ম এসেছে, এসেছে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ, মিশে সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি। ২৪ পরগনা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস ও এখানকার মানুষ এর থেকে পৃথক নয়।

বহু প্রাচীন মন্দির ছড়িয়ে আছে জয়নগর, মজিলপুর, বোড়াল, রাজপুর, শাসন, বারুইপুর বিষ্ণুপুর প্রভৃতি এলাকায়। ঘুটিয়ারি শরিফের পীর মোবারক গাজির মাজার আর ধপধপির দক্ষিণ রায়ের মন্দির হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে শিরনি বা পূজা দেয়। সাগরদ্বীপের কপিলমুনির মন্দির অবস্থান পরিবর্তন করলেও বহু প্রাচীন। সুন্দরবনে যেমন আছে বনবিবি, তেমনি জেলায় ছড়িয়ে আছে ওলাবিবি, ওলাইচণ্ডী। কোথাও নাথ সম্প্রদায়ের গোরক্ষনাথের মন্দির। আদিগঙ্গা শুকিয়েছে। শুকিয়েছে পিয়ালি ও বিদ্যাধরী নদী। পিয়ালি-বিদ্যাধরীর সংযোগস্থান বর্তমান ক্যানিং থানার ধোঁয়াঘাটা গ্রাম। লোকে বলে ধূম্রঘাটা থেকে ধোঁয়াঘাটা—এখানে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের লড়াই হয়েছিল। বিদ্যাধরী নদীর তীরে সোনারপুর থানার প্রতাপনগর প্রতাপাদিত্যের নামের সঙ্গে জড়িত।

দু'শ বছর পূর্বে পুরাতন গঙ্গা নীচের দিকে শুকিয়ে গেলেও বিদ্যাধরী তখন জীবিত। টালিসাহেব সোনারপুর থানার সামুখপোতা থেকে খাল কেটে গড়িয়ায় আদিগঙ্গার সঙ্গে যোগ করে দেন, ওই খালের নাম টালিস নালা। টালিসাহেবের নামে টালিগঞ্জ। ২৪ পরগনার দক্ষিণাংশ জুড়ে দ্বীপময় বদ্বীপ এলাকা সুন্দরবনের জঙ্গল ছিল। ইংরেজ সুন্দরবনের এক বিরাট অংশের জঙ্গল কতকগুলি প্লট বা লটে ভাগ

করে এক-একজন ইজারাদারকে জঙ্গল কেটে উঠিত করার জন্য বন্দোবস্ত দেয়। সুন্দরবন এলাকা এখনও ৫নং প্লট, ১০নং প্লট, জি প্লট, কে প্লট হিসাবে পরিচিত। ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় এখন জন বসতি ১৯টি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার মধ্যে ১৩টি দক্ষিণ ২৪ পরগনার। সংরক্ষিত বনাঞ্চল ৪২৬৪ বর্গ কিমি শ্বাপদসঙ্কুল ম্যানগ্রোভ অঞ্চল। এর মধ্যে ৪৮টি দ্বীপ যার মধ্যে মানুষ বাস করে না, বাঘ, বানর, হরিণ, শুয়োর, সাপ প্রভৃতি জীবের বাস। জনবসতি এলাকা ১৯টি ব্লকের ৫৪টি দ্বীপে নদীবাঁধ দিয়ে জমি রক্ষা করতে হয়। ঝড়ে জোয়ারে দুর্বল নদীবাঁধ ভেঙে প্রায়শ এলাকায় নোনাজল ঢুকে চাষবাস নষ্ট করে। সুন্দরবনের নদীবাঁধের দৈর্ঘ্য ৪৩৫০ কিমিঃ। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সুন্দরবনের ভূমিব্যবস্থা ২৪ পরগনার অন্য এলাকা থেকে পৃথক। এখানে লাটদারদের রাজত্ব। তাদের জোত ছিল বিরাট। এখানে ইংরেজ জমিদারও ছিল। জমিদার ও জোতদারদের বাস কিন্তু বেশির ভাগ ছিল বাইরে। বিভিন্ন এলাকায় কাছারি থেকে নায়েব-দারোগারাই রাজত্ব চালাত। ২৪ পরগনার বেশির ভাগ স্থানেই জমিদারদের বাইরে বাস ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে নদীয়া, ২৪ পরগনায় নীলকরদের অত্যাচার ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর, মগরাহাট, বিষ্ণুপুর নীলকরদের ঘাটি ছিল। সুন্দরবনে নীলকরদের মত মালঙ্গীদের দিয়ে জোর করে ইংরেজরা নুন চাষ করাতো। গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিংয়ে নদীর ধারে এখনও খুঁজলে লম্বা লম্বা পোড়া চুল্লি দেখা যাবে, দেখা যাবে ওর চারপাশে পোড়ামাটির পাত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে, ভাগচাষীর তেভাগার দাবিতে, মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে, সর্বোপরি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য কৃষকসমাজ লড়াই করে এসেছে। এই লড়াইয়ে অংশীদার ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষক। ১৯৪৬-এ যখন দেশ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কলুষিত, তখন হিন্দু-মুসলমান কৃষক ঐক্যবদ্ধভাবে তেভাগার দাবিতে লড়াই করেছে। বিভেদের বিরুদ্ধে সম্প্রীতি বজায় রেখেছে, পুলিশ ও জোতদারের গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে আহত হয়েছে, জেলে গেছে, প্রাণ দিয়েছে। শাসকশ্রেণী দাবি স্বীকার করেনি। কিন্তু কৃষক তার অধিকার অর্জন করেছে লড়াই করেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের শহিদ অহল্যা বাতাসী নীলকণ্ঠের কথা মানুষ ভুলবে না।

দেশ স্বাধীন হলে, কৃষকের অন্দোলনের ফলে ভূমিসংস্কার আইন ও জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাস হয়েছে বটে, কিন্তু জোতদার-জমিদাররা বেনামী করে জমি লুকিয়ে রাখে। জমি জমিদাররাই ভোগ করতে থাকে। প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে সোনারপুরের কৃষক, জমিদার-জোতদারদের বেনামী উদ্বৃত্ত জমি দখল করে চাষীর মধ্যে বিলি করে দেয়। পরে সেই আন্দোলন থেমে থাকেনি, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়েছে। কৃষক যতই গরিব হোক, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে শত্রুকে চিনেছে। শত্রুর অর্থাৎ জোতদার-জমিদারের শোষণের মূল উপাদান জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীনের মধ্যে বণ্টন করেছে। জোতদার-জমিদারের সামাজিক আধিপত্য খর্ব করেছে। গণতন্ত্র যাদের কেড়ে নিয়েছিল, তা পুনরায় অর্জন করেছে। তারাই বামফ্রন্টকে প্রতিষ্ঠা করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের মানুষকে নির্বাচিত করেছে। গ্রামোন্নয়ন এখন পঞ্চায়েতের হাতে। উন্নয়নের অর্থ শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নয়ন নয়, ব্যক্তিগতভাবে কত বেশি মানুষের আর্থিক আয়

UNDIVIDED 24- PARGANAS District
(24 Parganas South & 24 Parganas North)
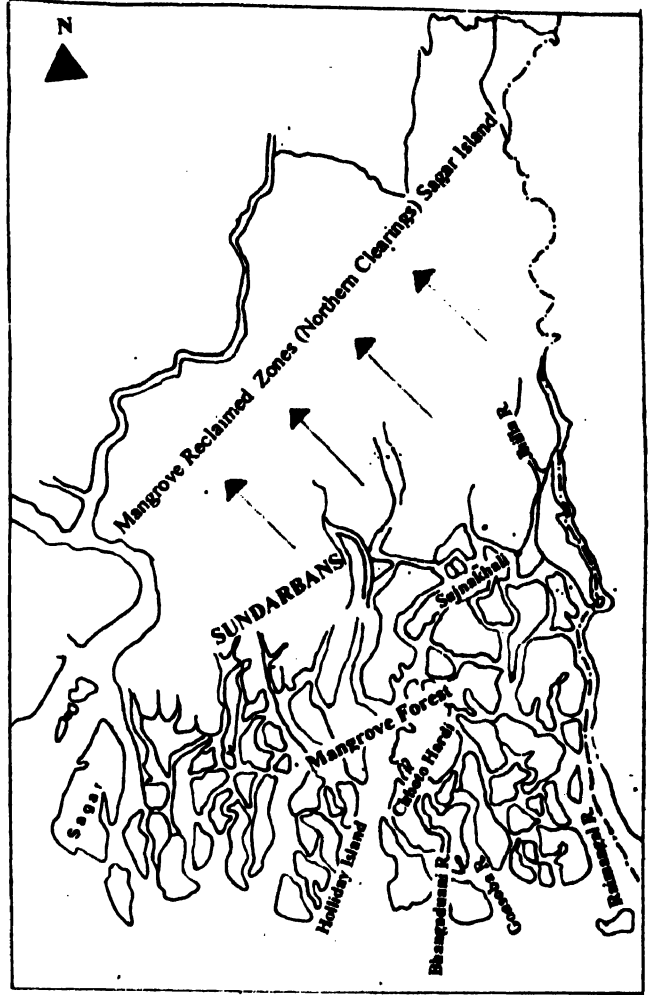
বাড়ছে, কত মানুষ সাক্ষর হচ্ছে, মানুষ বেশি বেশি খাদ্য পাচ্ছে কিনা, বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিশু ও মাতার প্রতি বেশি বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, এসব তো আছেই।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ১,৬০,৪০৭ একর জমি ভেস্ট হয়েছে, তার ভেতর চাষযোগ্য জমি ৯২,২৬৩ একর, তার মধ্যে ৬৬,৮৪৭ একর জমি ১,৪৫,৫৫৬ জন ভূমিহীনের মধ্যে বিলি হয়েছে। ২,১২,৫০৭ জন ভাগচাষীর নাম রেকর্ড হয়েছে। ১২,৭৫২জন বাস্তুহীন বাস্তুজমি পেয়েছে।

১৯৯১ সালের জনগণনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোকসংখ্যা গ্রামীণ এলাকা কলকাতা বাদ দিয়ে ছিল ৫৭ লক্ষ, এর মধ্যে পুরুষ ২৯ $\frac{1}{2}$ লক্ষ মহিলা ২৭ $\frac{1}{2}$ লক্ষ। তার মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ৪৫%, পুরুষ ৫৬%, মহিলা ৩৩%। ১৯৯১ থেকে সাক্ষরতা আন্দোলনের ফলে বর্তমান সাক্ষরতার হার মোট ৬১%, পুরুষ ৬৭%, মহিলা ৫৫%।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৯টি পঞ্চায়েত সমিতি, ৩১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা ৭টি, গ্রামীণ জনসংখ্যা ৫৭ লক্ষ। কলকাতা

অংশসমেত জেলার জনসংখ্যা ৬৭ লক্ষ। জেলার কৃষিজীবীর সংখ্যা ৪৪ লক্ষ, খেতমজুর ৩ লক্ষ। এছাড়া আছে মৎস্যজীবী কামার, কুমোর, তাঁতি গ্রামীণ কারিগর ইত্যাদি। এই সমস্ত মেহনতি মানুষের উন্নয়নই জেলার উন্নয়ন।

সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় এই জেলার সুন্দরবনের চাষবাস প্রায়শ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুন্দরবনের ১৩টি পঞ্চায়েত সমিতি লবণাক্ত নদী পরিবেষ্টিত। কলকাতায় ময়লাবেষ্টিত ভাঙড়। মাটির তলায় অনেক গভীরে মিষ্টি জল, উপরের স্তরে নোনা আবার কোথাও আর্সেনিক। চাষ ও পানীয় জলের পক্ষে গুরুতর সমস্যা। খাল-বিল, ফিশারি, বিভিন্ন ধরনের মাটি এ জেলার বৈচিত্র্য।

অপ্রতুল জলনিকাশি ব্যবস্থা, সেচব্যবস্থাহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সুন্দরবনের লবণাক্ততা একাধিক ফসল চাষে প্রধান অন্তরায়। এই কারণেই এই জেলা প্রধানত একফসলি।

চাষ বাড়াতে চাই জল ও জলের সদ্ব্যবহার। ভাঙড়ের দুটো ব্লকে অগভীরে নলকূপের সাহায্যে চাষ হচ্ছে। সোনারপুর, বারুইপুর আরও দু-একটি ব্লকে কয়েকটা গভীর নলকূপের সাহায্যে কিছু জমি চাষ হচ্ছে, ভাঙড়ে ময়লা খাল থেকে পাম্প করে সেচের বন্দোবস্ত আছে। সোনারপুর ও ভাঙড়ে যেমন ময়লা জলের ফিশারি আছে, তেমনি ওই জলে চাষ হয়। ১৯৭৮-এর বন্যার পর ১৯৭৯ থেকে গঙ্গার পূর্বতীরের সবগুলো নিকাশি খাল দিয়ে উল্টো পথে জোয়ারের জল ঢুকিয়ে ৯টি ব্লকে এবং তারপর সোনারপুর ও বারুইপুরের একাংশে চাষ হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪পরগনায় সেচ সেবিত এলাকা বর্তমানে ৩০%

জেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	৩,৯২,৭৯৫	হেক্টর
আউস ধান চাষ	৩,১৭১	„
আমন ধান চাষ		
(স্থানীয় বীজ + অধিক উৎপাদনশীল)	৩,৬০,৫৪৮	„
ডাল	১৭,০০০	„
সরিষা	৩৯৫৬	„
পাট	১১২৯	„
আলু	৪৪৫৭	„
লঙ্কা	১৯৮১৩	„

সেচ ব্যবস্থাহীন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লব[illegible] একাধিক [illegible]ষের অন্তরায়
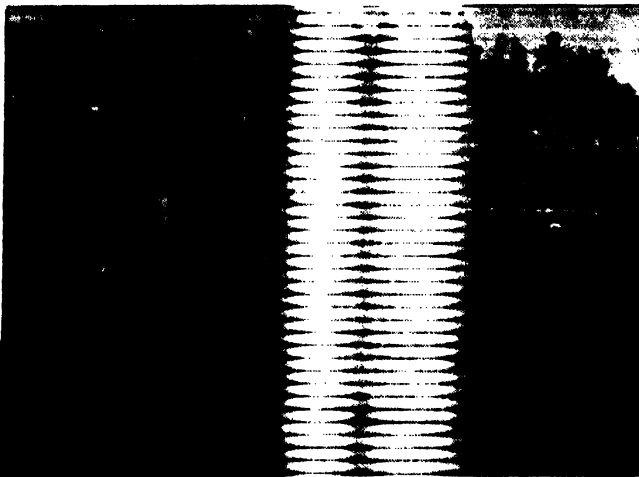
লবণাক্ত নদীর বাঁধ ভেঙে প্রায়শ কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়

ধান, গম, সরিষা, আলু, লঙ্কা সব্জি চাষের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন বহু বেড়েছে। এর ফলে উৎপাদকদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ৩ লক্ষ বিঘা জমি ১ লক্ষ চাষীর মধ্যে বণ্টিত হয়েছে, এর বাইরেও বহু জমি চাষীরা দখল করে আছে। এই সব জমিতে আগে একটা ফসল হত এবং তা জোতদার-জমিদারদের গোলায় উঠতো। এখন যে চাষী চাষ করছে সেই তার ফসল তুলছে, একবারের স্থানে দুবার ফসল করছে। তাই গ্রামের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই জেলার সব্জি, মাছ, চাল, লঙ্কা কলকাতায় যাচ্ছে, জেলার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। গ্রামের মেয়েরা এখন জুতো পরে, মেয়েরা সাইকেল চেপে স্কুলে যায়। গঞ্জে গঞ্জে রাস্তার ধারে কত দোকান উঠেছে, সেই দোকানে মানুষ কাপড়, জামা, জুতো, খাবার কিনছে। অটোরিকশা, ট্রেকার, রিকশা, ভ্যান হয়েছে। ইটের রাস্তা, পাকা রাস্তা, ঝামার রাস্তায় এই সব গাড়ি চলছে। রাস্তা ও যোগাযোগ হওয়ায় সুন্দরবনে ৪ ঘণ্টার রাস্তা ১$\frac{1}{2}$ ঘণ্টায় যাওয়া যাচ্ছে। ভটভটি চলছে। এসবের মাধ্যমে বেকারের কাজের জোগান হচ্ছে।

স্বাধীনতার পূর্বে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শিল্প ছিল উল্লেখ করার মতো—বজবজে পাটকল, বিড়লাদের পাটকল ও কাপড়কল মহেশতলায় বাটার জুতোর কারখানা ছিল, উষা সেলাই কল ও ফ্যান ছিল। স্বাধীনতার পর অনেক কারখানা হয়েছে ডায়মন্ডহারবার রোডের

মাটি কেটে জমি সমতল করে কৃষির উপযোগী করছেন খেতমজুরেরা
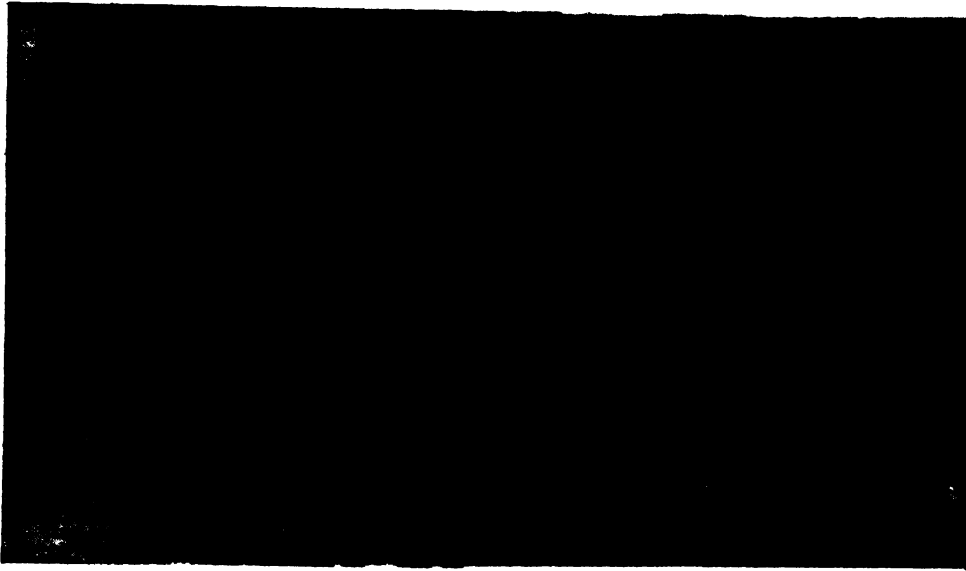
দুপারে ফলতায়, মহেশতলা, বিষ্ণুপুর ১, বিষ্ণুপুর ২, বারুইপুর ও সোনারপুরে। আবার অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস বহুদিনের। এই জেলা কৃষক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। স্বাধীনতা, সমাজসংস্কার ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এই জেলার অনেক মনীষীর নাম আমাদের স্মরণ করতে হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পিতৃভূমি কোদালিয়া গ্রামে। ওই গ্রামেই বাস করতেন এম এন রায়, যিনি বিদেশে প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়েছিলেন। ওই গ্রামে তাঁরই সহকর্মী হরিকুমার চক্রবর্তীর বাস, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সলিল চৌধুরী এই গ্রামেই থাকতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জন্ম বোড়ালে। সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়িপোতা থেকে পত্রিকা প্রকাশ করতেন— তাঁর লেখাটা ছিল সিপাহি বিদ্রোহীদের পক্ষে, নীলকরদের বিরুদ্ধে। ইংরেজ সরকার সোমপ্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিল। জয়নগরমজিলপুরের কানাইলাল ভট্টাচার্য আলিপুরের সেশন জজ গার্লিককে হত্যা করায় ফাঁসির মঞ্চে শহিদ হয়েছিলেন। জয়নগরের সুনীল চাটার্জি ও সোনারপুর দক্ষিণ জগদ্দলের জগদানন্দ মুখার্জি আন্দামান জেলে বন্দী ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর কর্মভূমি ছিল হরিনাভি। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গিকে নাটকে রূপদান করেছিলেন হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামনারায়ণ তর্করত্ন। জয়নগরের ভূতনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম যুগের কৃষক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। এই জেলার বহড়ুতে বাড়ি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়ি নেতড়ায়, মামাবাড়ি জয়নগর, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বারুইপুরের নবগ্রামে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি বড়িয়া, ডায়মন্ডহারবার। তাঁর নামেই ডায়মন্ডহারবারের আগেই স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি হল্ট স্টেশন। কৃষিবিজ্ঞানী ডাঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি বোড়ালে। বহু স্মরণে আসে সব নাম লিখতে গেলে তালিকা বিরাট হয়ে যাবে।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ অন্দোলনের সময় ইংরেজের সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা এমন কি শিক্ষায় অসহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদই সৃষ্টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, স্বাধীনতার পর তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বেই যাদবপুর টিবি হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৫-এ সৃষ্টি হয়েছে সেন্ট্রাল গ্লাস ও সেরামিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্। বর্তমানে আশপাশে আরও অনেকগুলি গবেষণাগার হয়েছে।

স্বাধীনতার সময়ের মানুষ ও এলাকার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে লাগাতার গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কোনও কলেজ ছিল না। এখন কত কলেজ, কত স্কুল। স্কুলের সংখ্যা বাড়লেও সবাই ভর্তি হতে পারছেন না। তবুও শিক্ষিতের হার বাড়ছে। গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নতি হলেও, খেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রামে-শহরে বেকার বাড়ছে। ক্ষুদ্রশিল্প দিয়েও তাদের কাজে জোগান সবাইকে দেওয়া যাচ্ছে না। নতুন নতুন শিল্প যেমন গড়ে উঠছে—কিন্তু অনুপাতে বেকারের নিয়োগ কম হচ্ছে—কেননা, বর্তমান শিল্প শ্রমনিবিড় নয়, পুঁজিনির্ভর। আগে ছিল দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতির শোষণ তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ। এখন বিশ্বায়নের কল্যাণে বহুজাতিক কর্পোরেশনের শোষণ শুরু হয়েছে। আজকে কৃষিতে, শিল্পে, অর্থনীতি ও বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত আক্রমণ আসছে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে। এই আক্রমণ ভারতময় পশ্চিমবঙ্গেও, তার সঙ্গে আছে শাসকশ্রেণীর শোষণ। দক্ষিণ ২৪পরগনাও তার থেকে দূরে নয়। আজকে প্রগতিশীল মানুষের কর্তব্য মানুষকে এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করা, সংগঠিত করা। সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে নিয়ে সীমিত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এলাকার উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।

ইংরেজ আমলে যে শোষণ, শাসন ও অত্যাচার তা আজ ইতিহাস। ২৩ বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে যে শোষণ অত্যাচার ছিল, সেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ আজ বহুলাংশে খর্বিত। বর্তমান প্রজন্মের যুবক তা জানে না, বয়স্করা তা ভুলতে বসেছে। এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে।

লেখক পরিচিতি : ছাত্র আন্দোলন পরে ১৯৫৪ থেকে কৃষক আন্দোলনে জড়িত। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কৃষকসভার সভাপতি। ২৪পরগনা ও দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি। বর্তমানে খাদিবোর্ডের চেয়ারম্যান।

সাকিল আহমেদ

শিল্পায়নে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

রাজ্যে ভূমিসংস্কার ও কৃষিবিপ্লবের ধারাবাহিকতায় শিল্পায়নে দ্রুত এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। যদিও বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদাবন সুন্দরবন এই জেলাতেই অবস্থিত, তবুও শিল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং রাজ্যের রাজধানী কলকাতার নিকটতম প্রতিবেশী জেলা হিসাবে শিল্পপতিদের পছন্দ তালিকায় এবং শিল্প মানচিত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্থান করে নিয়েছে। বড় ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এই জেলা। রাজ্যে ভূমিসংস্কার ও শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছিল এই রাজ্যেও।

আজ থেকে ৫১ বছর আগে ভূমিহীন কৃষকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন 'তেভাগা আন্দোলন' সংগঠিত হয়েছিল এই জেলার কাকদ্বীপ-নামখানা এলাকা জুড়ে। ভূমিপুত্র কৃষকদের ফসল ফলানো এবং নিজগৃহে ফসল তুলে নিয়ে জীবনযাপনের তাগিদে সেদিন চন্দনপিঁড়ি, লয়ালগঞ্জ, বুধাখালি এলাকা জুড়ে [illegible] তেভাগা আন্দোলন। দুভাগ [illegible] একভাগ ফসল জমিদারের [illegible] সারা দেশে জাতীয়তাবাদী [illegible] প্রভাবিত করেছিল।

রাজ্যের শিল্পায়নের [illegible] ২৪ পরগনা জেলার বিশে[illegible] রাজ্য সরকারের শিল্প পরি[illegible] শিল্পায়নের স্বার্থে স্থাপন করেছে শিল্পবন্ধু।

শিল্পবন্ধু

যথার্থ শিল্পোন্নয়নের [illegible] রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গ[illegible] ব্যবস্থা নিয়েছে। ১৯৯০ সাল থেকে একটি আকর্ষক [illegible] কর্মসূচি চালু রয়েছে যার ফলে বিপুল সংখ্যক নয়া [illegible] স্থাপন সম্ভব হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সভাপতিত্বে গঠিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নিয়ে শিল্প সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে আছে শিল্প সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবদের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। যাঁরা শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগীদের বিনিয়োগ ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছেন। উৎসাহবর্ধক এই শিল্প বিনোয়গের বিষয়টি 'শিল্পবন্ধু' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

১৯৯১ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল রাজ্যে ১৪৯৩.০৭ কোটি টাকা। ১৯৯৬ সালে ৫ বছরের ব্যবধানে বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮৬১.২৭ কোটি টাকায়। তবে ১৯৯৫ সালে বিনিয়োগ হয়েছিল সর্বাধিক। শিল্প স্থাপিত হয়েছে ৩৯০টি। যার বিনিয়োগের পরিমাণ ১০২৭৬.৪৮ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে শুধু রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো নয়, রাজ্য সরকার ১৩টি রুগ্ন শিল্প অধিগ্রহণ করেছে।

শিল্প ও পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির জন্য প্রস্তাব পর্যায় থেকে বাস্তবায়ন ঘটাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। জেলাস্তরে জেলাশাসকদের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিগুলি জমি অধিগ্রহণ, রূপান্তর ও নামপত্তন (মিউটেশন), বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অন্যান্য স্থানীয় পরিকাঠামোগত সুবিধাদান সংক্রান্ত বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। একই সঙ্গে শিল্পবন্ধুর মাধ্যমে বিনিয়োগকারী সংস্থা ওয়াকিবহাল হবে এবং ছাড়পত্র পাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের। শিল্প মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ছাড়পত্র, নির্দেশনামা সবকিছুর সুবিধা পাবেন শিল্পবন্ধুর মাধ্যমে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার গঠন করেছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নয়ন নিগম।

ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়চক ব্যাভিসন ফোর্টে রাজ্য সরকারের শিল্প উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে শিল্পবন্ধুদের বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগসুবিধা দানের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে বিনিয়োগকারীদের নিয়ে এক সমাবেশের ডাক দেয়। তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিরা যোগ দেন। যোগ দেন অনাবাসী ভারতীয়রাও। রাজ্য সরকারের এটি ছিল একটি সফল উদ্যোগ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা, বজবজ, সোনারপুর বিষ্ণুপুর, ডায়মন্ডহারবার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল।

ফলতা রপ্তানি বাণিজ্যকেন্দ্র

অবস্থান : কলকাতার দক্ষিণ থেকে মাত্র ৫৫ কিলোমিটার দূর হুগলি নদীর ধারে গড়ে উঠেছে ফলতা রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্র। রাজ্য হাইওয়ের ডায়মন্ডহারবারের রোড ধরে সরিষা থেকে পশ্চিম দিকের এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ভিতরে কয়েক কিলোমিটার ঢুকে গেলে হুগলি নদী। হুগলি নদীর অববাহিকায় প্রায় ২৮০ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে ফলতা রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্র। সাধারণত বিদেশি কোম্পানি এবং ভারতীয় কোম্পানিগুলিই এখানে করেছে বিনিয়োগ।

বৈশিষ্ট্য : (এক) ফলতা রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্রের ইউনিটগুলি ১০০ শতাংশ রপ্তানিযোগ্য।

(দুই) ২৫ শতাংশ উৎপাদন বিক্রি হবে স্থানীয় এলাকায়।

(তিন) উৎপাদনসামগ্রীগুলি হবে দূষণমুক্ত।

সুযোগ-সুবিধা : (১) শিল্প পরিকাঠামো শেড, (২) জমির প্লটগুলি বিস্তৃত (৩) রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্র এলাকার পিচের রাস্তা (৪) ১৩২, কে ভি বিদ্যুতের সার্ভিস স্টেশন ফলতা বাণিজ্য জোনের মধ্যে (৫) ২৪ ঘণ্টা জল সরবরাহ (৬) একটি স্বয়ংক্রিয় কন্টেনার জেটি হুগলি নদীর অববাহিকায়। যার অপারেশন এলাকা প্রায় ২০ ও ৪০ ফুট। (৭) মাটির নিচে এখানে আছে আধুনিক নিকাশিব্যবস্থা। (৮) ওয়াটার হাউজিংয়ের সুযোগ (৯) আছে একটি ইলেকট্রিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (১০) সামাজিক পরিকাঠামো যথা হাউজিংয়ের সুযোগ, মেডিকেল সার্ভিস, বাজার, পোস্ট অফিস, থানা

ফলতার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পলিটেকনিক

সি আই আই মিট : কুলপি বন্দর নিয়ে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি

এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুযোগ। (১১) আছে একটি নিরাপত্তাযুক্ত কাস্টম উইং স্টেশন যাতে দ্রুত পণ্যসামগ্রী রপ্তানি ও আমদানি করা যায়।

রপ্তানিযোগ্য পণ্যসামগ্রী

(১) সোনা/রূপা/হীরা/কস্টিউম জুয়েলারি (২) খেলার সামগ্রী (৩) রেডিমেড পোশাক, সূক্ষ্ম তন্তু, (৩) সিগারেটের এসিটেড ফিল্টার রড, (৪) ল্যাটেক্স গ্লোভস (৫) প্যাকেজিং (৬) প্যাকেট চা।

উৎপাদন বা রপ্তানিযোগ্য উৎপাদনসামগ্রী

(১) হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসামগ্রী।

(২) পাটজাত দ্রব্য

(৩) চামড়াজাত দ্রব্য

(৪) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

(৫) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

বানতলা লেদার কমপ্লেক্স

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বানতলা লেদার কমপ্লেক্স স্থাপিত হয়েছে কলকাতায় পার্কসার্কাস কানেক্টর থেকে ই এম বাইপাসের ধারে। এটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার তিলজলা থানা এলাকায়। শহর কলকাতা থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বানতলা লেদার কমপ্লেক্স জুড়ে গড়ে উঠেছে বিশাল কর্মকাণ্ড। লেদার কমপ্লেক্সটি প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠেছিল কলকাতার তিলজলা, তোপসিয়া এবং ট্যাংরা এলাকায়। সংখ্যায় ছিল ৫৩৮। বানতালা লেদার কমপ্লেক্সের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে ৪৪৪ হেক্টর জমি। এটির দায়িত্বে আছেন এম এল ডালমিয়ার প্রোমোটর কোম্পানি। ডালমিয়ারা ইতিমধ্যে তৈরি করেছেন কলকাতা বিমানবন্দর, রবীন্দ্রসদন ইত্যাদি।

বানতলা লেদার কমপ্লেক্সের জন্য প্রজেক্টমূল্য ধার্য হয়েছে ২৮৫২ মিলিয়ন। (১) প্রোমোটরদের সঙ্গে সরকারের ৩০ বছরের বিল্ড অপারেট ট্রান্সফার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি রাজ্যের প্রথম চুক্তি। (২) ৫০ শতাংশ জমি ভেস্টেড জমি এবং প্রোমোটরদের হস্তান্তর করা হয়েছে। (৩) জমি এবং জমির পাশের উন্নয়নের কাজ চলছে। ১৯৯৭ সালের ১ জুন মুম্বাই থেকে টাইমস অফ ইন্ডিয়া একটি সমীক্ষা চালায় ভারতের ৫টি মেট্রোপলিটন শহরগুলির উপর। শহরগুলি হল—দিল্লি, মুম্বাই কলকাতা, চেন্নাই এবং ব্যাঙ্গালোর। টাইমস অব ইন্ডিয়ার ওই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে
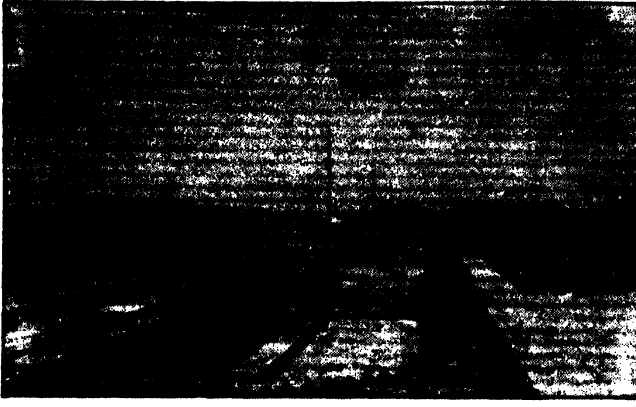
গঙ্গাসাগরে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র

এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। বিদ্যুৎ, জল, কাঁচামাল, পরিবহন, মেডিকেল ব্যবস্থার সুযোগ, শিক্ষা, স্বল্প মুল্যে শ্রমিক, বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান পরিবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। টাইমসের সমীক্ষায় শতকরা হিসাবে প্রাপ্ত নম্বর দিল্লি ৫৪.৬৬ শতাংশ, মুম্বাই ৬৮.৬৭ শতাংশ, কলকাতা ৯২.৫০ শতাংশ, চেন্নাই ৮৫.৩৩ শতাংশ এবং ব্যাঙ্গালোর ৮০.৬৭ শতাংশ। বড় ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে অন্য জেলার তুলনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা বেশ এগিয়ে। এক সময় ভারতের শিল্প মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রনী ছিল। মাসুল সমীকরণ নীতি, শিল্প অনুমোদন প্রথা, কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের অভাব, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের বিরূপ আচরণ ইত্যাদি কারণে রাজ্য পিছিয়ে পড়ে। রাজ্যে 'শিল্পবন্ধু' এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে 'ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ' ডাক দেওয়ায় চনমনে হয়ে উঠেছে শিল্পায়নের পরিবেশ। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিসংখ্যানচিত্র নিম্নরূপ।

সাল	অনুমোদিত শিল্প	বিনিয়োগের পরিমাণ
১৯৯১	১৪২	১৪৯৩.০৭ কোটি
১৯৯২	২৩১	৪৪৫২.৫৪ কোটি
১৯৯৩	১৭১	৫৯৬৬.৭৯ কোটি
১৯৯৪	[illegible]	২০২০.৮৩ কোটি
১৯৯৫	[illegible]	১০২৭৬.৪৮ কোটি
১৯৯৬	[illegible]	৬৮৬১.২৭ কোটি

১৯৯১ সালে বি[illegible]ণ ছিল রাজ্যে ১৪৯৩.০৭ কোটি টাকা। ১৯৯৬ [illegible] ব্যবধানে বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮৬১.২৭ [illegible] টা[illegible]বে ১৯৯৫ সালে বিনিয়োগ হয়েছিল সর্বাধিক। শি[illegible] ৩৯০টি। যার বিনিয়োগের পরিমাণ ১০২৭৬.৪৮ [illegible] টা[illegible]মধ্যে শুধু রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো নয়, রাজ্য স[illegible] শিল্প অধিগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৬টি জাতীয়কর[illegible] ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে অধিগৃহীত হয়েছে। রা[illegible] শিল্পকে রিলিফ আন্ডারটেকিং ঘোষণা করে মোট ২[illegible] জনের চাকরি রক্ষা করেছে।

শিল্পায়নের ক্ষে[illegible] সূচক হল এলাকার রাস্তাঘাট। কলকাতা-শিলিগুড়ি এ[illegible] কিমি ফোর লেনে খরচের পরিমাণ ৪০০০ কোটি টাকা। সোনারপুর-কামালগাজি-সিরাকোল রোড ২২ কিমি ফোর লেন। যার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৮ কোটি টাকা। কুলপি-চুঁচুড়া এক্সপ্রেসওয়ে ভায়া বারাসতের জন্য ৬৫ কিমি ফোর লেন রাস্তায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৮৮০ কোটি টাকা। কুলপি-চুঁচড়া এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হলে ফলতা ও ডায়মন্ডহারবার, বেহালা, ঠাকুরপুকুর এলাকার উন্নতি হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী শিল্প স্থাপনের স্বার্থে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করতে সচেষ্ট হচ্ছে। ডব্লিউ বি আই ডি সি এবং আই সি আই সি আই মিলিতভাবে কর্মসূচি বা প্রস্তাবগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কুলপি বন্দর

কুলপিতে একটি ক্ষুদ্র বন্দর নির্মাণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম এবং মুকুন্দ কেভেন্টার কনসোর্টিয়াম একটি বিস্তৃত প্রকল্প প্রতিবেদন রচনা করতে এক সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করেছে। মুকুন্দ শিল্পগোষ্ঠীর কুলপিতে একটি জাহাজ তৈরির কারখানা ও বন্দর স্থাপন করবে। নাম বেঙ্গল পোর্ট লিমিটেড। বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৬২৫ কোটি টাকা। যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি দক্ষিণ ২৪ পরগনা তথা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেগুলি হল—ন্যালকো কেমিক্যাল, আলকোয়া, ক্যালটেক্স, ট্রান্স আমেরিকান কোপাকা প্রাইম ওয়াটার হাউস। মাৎসুশিটা, লুমিটোনা, ডেলটা কর্পোরেশন ইউ এস এ. জি ই সি. ফিলিপস্ ইন্টারন্যাশনাল, মোটোরোলা, রোলস রয়েস, সিমেন্স ইত্যাদি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি, শিল্প উন্নয়ন নিগামের চেয়ারম্যান সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডি পি পাত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

রাজ্যে শিল্প বিকাশের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক্স শিল্প উন্নয়ন নিগম গঠিত হয়েছে। এই নিগম সফ্‌টওয়ার ও হার্ডওয়ার টেকনোলজি পার্ক গড়ে তুলছে। এই নিগমের সহায়তায় গ্লোবাল সিনার্জিস লিঃ ইনফরমেশন ও টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেছে। রিলায়েন্স, ফিলিপস্, সিমেন্স, এ সি সি ইত্যাদি কোম্পানি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

সৌরসেলের ব্যাটারি ব্যাঙ্ক
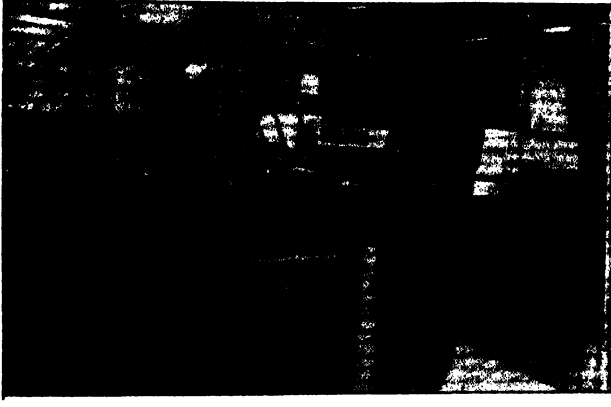
সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে স্ক্রিন প্রিন্টিং

ওয়েবেল সোলার

দক্ষিণ ২৪ পরগনার দ্বীপবহুল নদীবহুল এলাকার সব জায়গায় চিরাচরিত প্রথায় বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তাই অচিরাচরিত বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর ওয়েবেল সোলার ডিভিশন। জেলার দুটি জায়গায় অচিরাচরিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে ওয়েবেল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ওয়েবেল সোলার কাজ করছে সারা পৃথিবী জুড়ে। গুণগত মান আর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনি দেখতে পারবেন সারা পৃথিবী জুড়ে ওয়েবেল সোলারের কাজ-কারবার। ইউরোপীয় দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতে রপ্তানি করা হচ্ছে ওয়েবেলের তৈরি করা রুম হিটার, সোলার প্যানেল, সৌরকুকার, সৌরবিদ্যুৎ, সৌরলণ্ঠন, পাখা, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, পাম্প ইত্যাদি। এছাড়া সৌরবিদ্যুৎকে কাজে লাগাতে তৈরি হচ্ছে বাড়িতে বিদ্যুৎ এবং রাস্তার আলো ইত্যাদি। রেলওয়ে সিগন্যাল পাওয়ার এবং সেফটি লাইট তৈরিতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। তেল এবং গ্যাসের পাইপলাইনের ক্ষেত্রে ওয়েবেল সোলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন টেলিফোন, ডাক্তারির যন্ত্রপাতি, পরিবহন, পোর্টেবল সোলার লাইট, মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনে, সেফটি ইকুইপমেন্ট তৈরিতে ওয়েবেল সোলার ব্যবহার হচ্ছে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে ওয়েবেল সোলার একটি ২৬ কিলোওয়াট পাওয়ারের এস পি ভি পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করেছে গঙ্গাসাগরে। দ্বীপবহুল গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় সার্কিট হাউসের পাশে এবং জেলা পরিষদ বাংলোর পিছনে গড়ে উঠেছে এই অচিরাচরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ই এম বাইপাসের কাছে কলকাতা বিজ্ঞাননগরীতে ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার প্রজেক্ট ওয়েবেল গ্রহণ করেছে, যা বিজ্ঞাননগরীকে আলো দিচ্ছে। ওয়েবেল সুন্দরবনের নামখানা, গোসাবা, জি প্লট, জেমসপুর, ছোট মোল্লাখালি, পাথরপ্রতিমার কামালপুর এলাকায় ৩০০টি হোমলাইট দিয়েছে। ১৫০টি সোলার লণ্ঠন তৈরি করে দিয়েছে জেলা জুড়ে। ওয়েবেল ছাড়া অগ্নি পাওয়ার, টাটা, বি পি সোলার, গীতাঞ্জলি সোলার, এক্সাইড পাওয়ার প্ল্যান্টও রাজ্য জুড়ে সৌরবিদ্যুৎ প্রসার ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। রাজ্যের শিল্পায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইলেকট্রনিক্স শিল্প কলেবরে গড়ে উঠছে। সাগরের চেমাগুড়ি, নরেন্দ্রপুর এবং উত্তর রাধানগরে বিদ্যুৎ দিতে সচেষ্ট হচ্ছে ওয়েবেল সোলার। ১০০ শতাংশ রপ্তানিযোগ্য ইলেকট্রনিক্স শিল্প গড়ে ওঠায় রপ্তানি হচ্ছে ইতালি, কেনিয়া, জার্মানি, আমেরিকাতেও।

শিল্প পরিকাঠামো, বিনিয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিল্পাঞ্চলে গড়ে উঠেছে ৩ তারা ও ৫ তারা হোটেল ও রিসর্ট। বিনিয়োগকারীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের পাশাপাশি রাজ্য পর্যটন নিগম এগিয়ে এসেছে। ফলতা রপ্তানিযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র এলাকায় তাই গড়ে উঠেছে তিনতারা হোটেল রাজহংস। হুগলি নদীর ধারে মনোরম পরিবেশে ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে শিলান্যাস করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। উপস্থিত ছিলেন শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি প্রমুখ। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে তিনতারা হোটেলের যাত্রা শুরু হয়। ৩০টি রুমবিশিষ্ট এই হোটেলের মধ্যে আছে হেল্‌থ ক্লাব, ইন্ডোর গেমসের সুযোগ-সুবিধা, সুইমিং পুল, কনফারেন্স হল, বার ও রেস্তরাঁ। হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সমর সরকার জানান, ফলতায় শিল্প স্থাপনের সুবিধা থাকায় উত্তরোত্তর চাহিদা বাড়ছে হোটেল রাজহংসের। এছাড়া 'ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ' শিরোনামে একটি শিল্পপতিদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯৯৯ সালে ডায়মন্ডহারবারের রায়চকে র‍্যাডিসন ফোর্টে। ৫ তারাবিশিষ্ট এই ফোর্টে আছে কনফারেন্স রুম, বার ও রেস্তরাঁ, সুইমিং পুল, গলফ ক্লাব, কর্টেজ ইন্ডোর গেমসের সুযোগ। হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার গণপতি গ্রিন ফিল্ডস প্রজেক্টটি আকর্ষণ করেছে অনাবাসী ভারতীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ সংস্থাকে।

এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নতুন গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন সম্পর্কে জানার কৌতূহল দিনে দিনে বাড়ছে শিল্প বিনিয়োগকারীদের।

এক নজরে ফলতা রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্র

(১) অধিগৃহীত জমির পরিমাণ : ২৮০ একর
(২) অধিগৃহীত জমির উন্নয়ন হয়েছে : ১১৫ একর
(৩) প্লট উন্নয়নের সংখ্যা : ৫৭ (৪৮ একর জুড়ে)
ইতিমধ্যে উন্নয়ন হয়েছে : ৫৪ (৪৬ একর এলাকা জুড়ে)
(৪) কারখানায় নকশা কনস্ট্রাকশন হয়েছে : ১৫,৫৭০ বর্গকিমি
(৫) অন্যান্য শিল্প পরিকাঠামো শিল্পশেড গঠিত হয়েছে : ৫,০০০ বর্গমিটার
(৬) ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার একটি শাখা চালু হয়েছে।

সেনবো কারখানার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সোমনাথ চ্যাটার্জি এবং শিল্পমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি
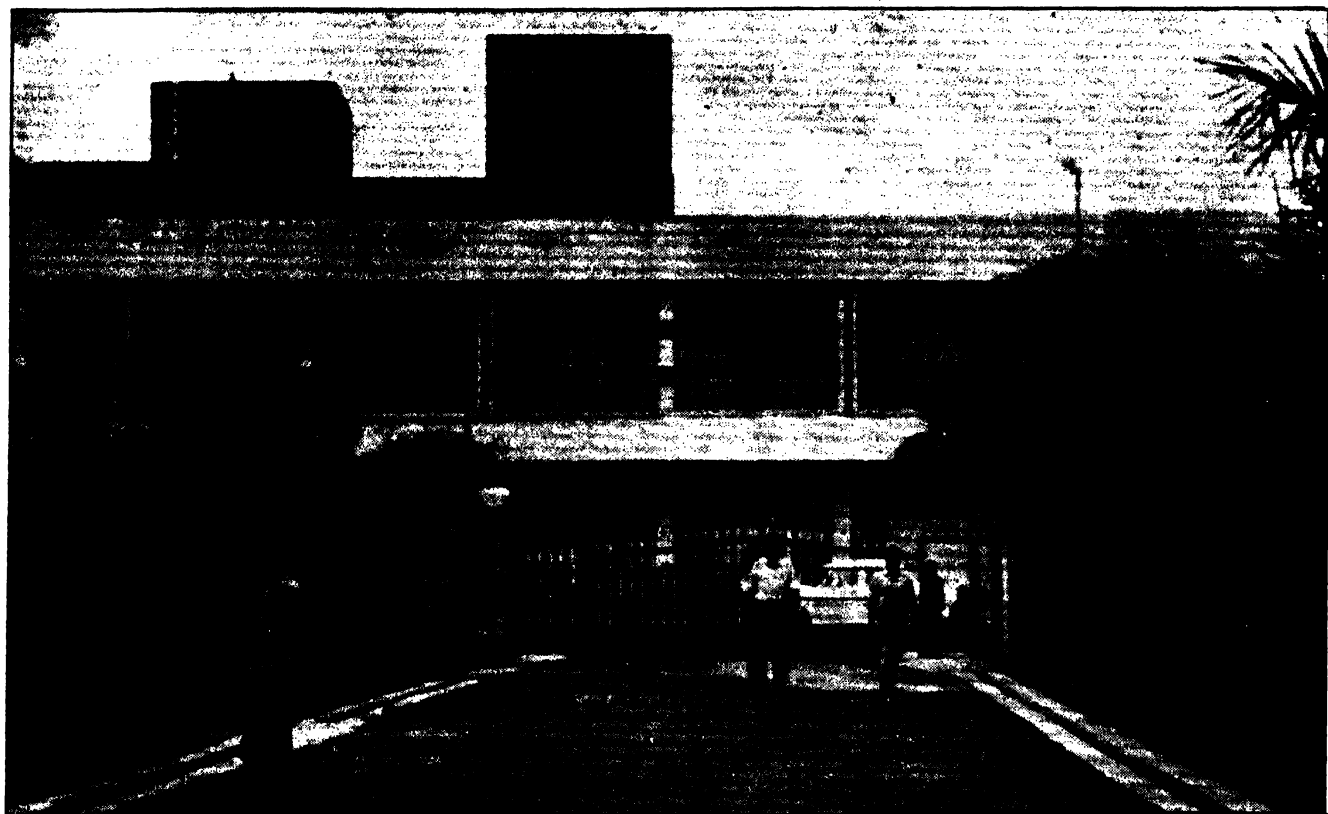
ফলতা রপ্তানি বাণিজ্য কেন্দ্রের কারখানা প্যাসিফিক কটস স্পিন ছবি : লেখক

বাৎসরিক পরিসংখ্যান

বছর	অনুমোদন পেয়েছে	উন্নয়ন কমিশনার	সর্বমোট
১৯৮৪-৮৫	৮	—	৮
১৯৮৫-৮৬	১০	—	১০
১৯৮৬-৮৭	৯	—	৯
১৯৮৭-৮৮	১২	—	১২
১৯৮৮-৮৯	২২	—	২২
১৯৮৯-৯০	৪	—	৪
১৯৯০-৯১	৭	—	৭
১৯৯১-৯২	৬	৫	১১
১৯৯২-৯৩	৪	২৪	২৮
১৯৯৩-৯৪	১	১২	১৩
১৯৯৪-৯৫	৮	১৫	২৩
১৯৯৫-৯৬	২	৮	১০
১৯৯৬-৯৭	৭	১৪	২১
১৯৯৭-৯৮	৬	১৯	২৫
১৯৯৮-৯৯	—	২৩	২৩
১৯৯৯-২০০০	(৭/৯৯)	১১	১১
সর্বমোট	১০৬	১৩১	২৩৭

বাৎসরিক কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ পরিমাণ (লক্ষ পরিমাণ)

সাল	কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব সঞ্চয়
১৯৮৪-৮৫	৩৬৩.৪১	১৪.২০	—
১৯৮৫-৮৬	২০৭.১২	১১.১৪	—
১৯৮৬-৮৭	৫৫১.৫৯	১০.২৩	১.৫৫
১৯৮৭-৮৮	২৬৭.৮৩	১৭.৪৭	৬.১৯
১৯৮৮-৮৯	১৮৩.০০	২০.৬৩	৯.১৩
১৯৮৯-৯০	৯৭.৩৯	২৬.৪২	১৭.৮৮
১৯৯০-৯১	৫০.০০	২৪.৭৯	৩০.০৩
১৯৯১-৯২	২৭.৪৩	৩১.৮৭	১৮.০০
১৯৯২-৯৩	১৭.০০	৩৮.৪৪	১৬.২৩
১৯৯৩-৯৪	২০০.০০	৫১.২৮	১৯.১৯
১৯৯৪-৯৫	২৭৫.৩৮	৬৯.০০	৩১.৯০
১৯৯৫-৯৬	২৩৮.২৬	৮১.০০	৩৮.৪৭
১৯৯৬-৯৭	৪৩.৪৬	৮৩.০০	৫০.১৪
১৯৯৭-৯৮	৫০.০০	৮৭.৭৭	৬৬.২৮
১৯৯৮-৯৯	১০০.০০	৯২.৭৪	৪৯.৫২
১৯৯৯-২০০০ (৭ জুলাই/৯৯)	১৫.০০	৩৫.৮৪	১৬.৩৯

কম্পিউটারের বিভিন্ন সোলার সেল

বাৎসরিক ইউনিটপ্রতি বিনিয়োগ বরাদ্দ (লক্ষ্য প্রতি)

সাল	বিনিয়োগ ইউনিট	অনাবাসী ভারতীয়	বিদেশি বিনিয়োগ
১৯৮৫-৮৬	১০	—	—
১৯৮৬-৮৭	—	—	—
১৯৮৭-৮৮	—	—	—
১৯৮৮-৮৯	১৫	—	—
১৯৮৯-৯০	৬৬	—	—
১৯৯০-৯১	২০০	৭	—
১৯৯১-৯২	৩০০	—	—
১৯৯২-৯৩	১৩২০	৭	—
১৯৯৩-৯৪	২০৮০	১২৫	—
১৯৯৪-৯৫	২৪০০	১৬৫	১৬০
১৯৯৫-৯৬	১৩৩০০	১৯৯	৫১৪
১৯৯৬-৯৭	১৫৮৫৮	৫০০.০৬	৫৪৯
১৯৯৭-৯৮	১৮৩৯৩	৫০০.০৬	১০৭৩.১০
১৯৯৮-৯৯	২২৭৩৫.৬৮	৫০০.০৬	১০৭৩.১০
১৯৯৯-২০০০	২৩২০৩.৯৯ (জুলাই '৯৯)	৫০০.০৬	১০৭৩.১০

এখন সৌরবিদ্যুৎ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অনেকগুলি গ্রাম আলোকিত করছে

৮.	বিড়লা জুট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	ফ্লোর ও ওয়াল কভারিং বস্ত্র	১.৪০
৯.	কলতা নিটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ	রেডিমেড পোশাক	৪.৬৩
১০.	ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ	সাইকেল টায়ার	৪.৬৩
১১.	শ্রী ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	সিগারেটের ফিল্টার রড	১.২২
১২.	মেসার্স এক্সপোজার জেমস্ অ্যান্ড জুয়েলারি প্রাঃ লিঃ	জুয়েলারি ডায়মন্ড কাটিং	১.২৫
১৩.	ভারত মার্জারিন লিঃ	মার্জারিন	৪.০০
১৪.	নিকো কর্পোরেশন লিঃ	ওয়্যাররোপ নেটস	৩.০০
১৫.	কন ফর্মস প্রাঃ লিঃ	প্রিন্টিং সামগ্রী	১.২৫
১৬.	একনিট নিটিং প্রাঃ লিঃ	কটন হ্যান্ড গ্লোবস	০.৩০
১৭.	গণপতি কমার্স লিঃ	প্যাকেট চা	০.৩৫
১৮.	টি প্যাকস স্পেসালিটি প্রাঃ লিঃ	প্যাকেট চা	০.৭৫

কল্যাণীতে প্রতিষ্ঠিত সিনথেটিক ফেব্রিক অ্যাইড প্ল্যান্ট

১৯৯৩

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মূল্য (প্রতি কোটি)
১৯.	বালা টেকনো সিনথেটিকস লিঃ	সরুচুল্লি ইলাস্টিক টেপ	১৫.০০
২০.	আর এম প্যাকেজিং প্রাঃ লিঃ	অ্যালুমিনিয়াম বেস্‌ড ল্যামিনেটস	১.৬৮
২১.	চেন অ্যান্ড স্প্রোকেট প্রাঃ লিঃ	স্টিল সামগ্রী	১.৩২
২২.	ডেকোরিয়া ফটোক্রেমস লিঃ	ব্রাশ ফটোগ্রামস	১.১০
২৩.	বিড়লা জুট এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	ফেরো ম্যাঙ্গানিজ	০.১৩

৩৪.	ইলেকট্রো মেটাল লিঃ	জিঙ্ক প্লেটেড স্টিল	২.৮৮
৩৫.	সেঞ্চুরি প্লাই বোর্ডস (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ	প্যানেল দরজা, জানালা	১.৬০
৩৬.	চেন অ্যান্ড স্প্রোকেট (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ	ওয়েলডেড চেয়ারস	০.৩২
৩৭.	আন্টারটিকা গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ	প্রিন্টেড প্যাকেজিং	১৮.০০

১৯৯৫

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (প্রতি কোটি)
৩৮.	ড্রুইড ফার্মা লিঃ	ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট	৮.০০
৩৯.	সেনবো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৪ ফ্লুইড	২১.০০
৪০.	ভারসেটাইল ওয়্যারস লিঃ	এনামেলড কপার ওয়ার	১৩.০০

১৯৯৬

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মূল্য (প্রতি কোটি)
৪১.	ডাগা নাইলোমেট প্রাঃ লিঃ	ডিসপোজেবল ট্রেজ	১.৬৪
৪২.	ওয়েবেল এস এল এনার্জি সিস্টেমস লিঃ	সোলার সেল	৮.৩১
৪৩.	জাপপ্রা আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিঃ	পাইপস	২.০০
৪৪.	ভারত মার্জারিন লিঃ	ভোজ্য তেল	৫.০০
৪৫.	একলাইন ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিমিটেড	ফার্মাসিউটিক্যাল প্রডাক্ট	২.১০
৪৬.	শ্রীলেদার ইন্ডাস্টিজ লিঃ	জুতো	৪.৬০

১৯৯৭

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প মূল্য প্রতি কোটি)
৪৭.	ভি. এক্স. এল লার্ডিস অ্যান্ড গিয়ার লিঃ	এনার্জি মিটারস	৩০.০০
৪৮.	এলকিউ পলিয়েস্টার্স লিঃ	পেট রেজিন	১২১.০০
৪৯.	ইডেন কসমেটিকস লিঃ	টুথ ব্রাশ	১০.০০
৫০.	জে জে স্পেকট্রাম সিল্ক লিঃ	সিল্ক ফেবরিক	৪০.০০
৫১.	ভারত মার্জারিন লিঃ	ভোজ্য তেল	৫.০০
৫২.	পেপসিকো ইন্ডিয়া হোল্ডিং লিঃ	সফট ড্রিংক্স	২১.০০
৫৩.	কেনয় প্লানটেশন প্রাঃ লিঃ	হার্ড গ্লোবস্	১.৪৫

শিল্পায়নের পাশাপাশি বেশ কিছু পুরনো কারখানা এখন বন্ধ। সেই সব রুগ্ন কারখানাগুলি পুনরায় চালু না হলে যেমন বাড়বে বেকারত্ব, তেমনি ধারণা জন্মাবে বিনিয়োগকারীদের যে পশ্চিমবঙ্গে কিছুই হয় না। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতায় যথেষ্ট সচেতন বলে জানা গেছে। শিক্ষা, শিল্প ও সাংস্কৃতিক মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাই নানা কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

লেখক পরিচিতি : *বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক*

দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী

সাক্ষরতা আন্দোলন : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

১৯৮৬ সালে চব্বিশ পরগনা জেলা দু-ভাগ করার ফলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জন্ম হয়। জেলার উত্তরে কলকাতা ও উত্তর চব্বিশ পরগনা, পুবে বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলি নদী। জেলার আয়তন ৮১৬৫.০৫ বর্গ কিলোমিটার। জেলায় পাঁচটি মহকুমা : আলিপুর, বারুইপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ। এছাড়া কলকাতা কর্পোরেশনের চারটি বোরো কমিটি এই জেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পড়ে। জেলাকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় : (ক) কলকাতা সংলগ্ন নাগরিক ও আধা-নাগরিক অঞ্চল, (খ) সুন্দরবন-বহির্ভূত গ্রামাঞ্চল, (গ) নদীনালাখাঁড়িতে আকীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চল, যার আয়তন পুরো জেলার প্রায় ৪৫ শতাংশ। ১৯৯১-এর আদমসুমারি অনুযায়ী জেলার লোকসংখ্যা ৬৭, ১৩৭, ১৭। পঞ্চায়েত ও পৌরসভার মধ্যে বাস ৫৭, [illegible] ২৬[illegible] জনের। বাকি মানুষের বাস [illegible] কর্পোরেশনের মধ্যে, যার ৪১টি [illegible] জেলারই অন্তর্ভুক্ত। কর্পোরেশনের সাক্ষরতা হয়েছে আলাদাভাবে, মূলত বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে।

১৯৯২-৯৩ সালে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানে দেশের ২২৩-টি জেলা সামিল হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অভিযান আরম্ভ হয় ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। জেলা সাক্ষরতা সমিতি গঠিত হয়। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে জেলার সমস্ত মানুষকে, গ্রাম-নগর-জনপদকে, এই অভিযানে যুক্ত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়। জেলাব্যাপী জাঠা, পদযাত্রা, মিছিল, সভা-সমিতি, নাট্যপ্রদর্শনী, সংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব গণ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ থেকে ১৯৯১ খুব কম সময় নয়। তবু এত নিরক্ষর মানুষ! মানুষকে সাক্ষর করতে এ-সময় যেটুকু চেষ্টা হয়েছে প্রায় সবই সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। কিছু কাজ নিশ্চয়ই তাঁরা করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

লোকশিক্ষা পরিষদ :

পরিষদের প্রতিষ্ঠা ১৯৫৬ সালে। বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির জন্যে এটি গড়া হয়। ওই সময় পরিষদের বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে সোনারপুর থানায় বর্তমান লেখকও কিছুটা যুক্ত ছিলেন।

বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজ এঁরা গোড়া থেকে করে আসছেন। বাজার-চলতি বই দিয়ে শুরু হলেও অচিরে

জে[illegible] মহকুমাগত বিন্যাস নিম্নরূপ (১৯৯১-এর জনগণনা অনুযায়ী) :

মহকুমা	জনসংখ্যা		
	মোট	পুঃ	স্ত্রী
আলিপুর	১০,৯৩,৩৬৪	৫,৭৬,৮৭৩	৫,১৬,৪৯১
ক্যানিং	৭,৭৫,২৮৫	৩,৯৭,৭৭২	৩,৭৭,৫১৩
বারুইপুর	১৫, ২২,০৯১	৭,৮৮,০২১	৭,৩৪,০৭০
ডায়মন্ডহারবার	১৫,৯৩,৩৩৪	৮,২৪,৩৭৬	৭,৬৮,৯৫৮
কাকদ্বীপ	৭,২৪১৮৬	৩,৭১,৭১২	৮,৫২,৪৭৪
	৫৭,০৮,২৬০	২৯,৫৮,৭৫৪	২৭,৪৯,৫০৬

পরিষদ বয়স্কদের উপযোগী পাঠ্যবই রচনা করেছে। পরে আরও উন্নত আকারে যে-বই বেরোয় তার নাম 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। এঁদের প্রথম যুগের সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলোয় খেলাধুলোর (Indoor games-এর) ব্যবস্থাও ছিল।

লোকশিক্ষা পরিষদ অব্যাহতভাবে কাজ করে আসছেন। ১৯৯২ সালে এই জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান আরম্ভ হবার সভায় লোকশিক্ষা পরিষদের কাজের হিসাব নিচের সারণিতে দেওয়া হল :

সোনারপুর পরিষদের পঞ্চাশটি গ্রামীণ শিক্ষাকেন্দ্রে সৃজনী শিক্ষার কাজ চলছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে নথিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০ জন, গড় উপস্থিতি ৩১। ১৯৯৭ সালে নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

বয়সের ভাগ	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
৬-১০	৭৬২	৮৫২	১৬১৪
১১-১৪	১৯৩	৩০৭	৫০০

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

নরেন্দ্রপুর * দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি * গুচ্ছ সমিতি ভিত্তিক সাক্ষরতা কর্মসূচির পরিসংখ্যান চিত্র, ১৯৯২-৯৩

ক্রমিক সংখ্যা	গুচ্ছ সমিতির নাম	জেলার নাম	ব্লকের সংখ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা	মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	ওয়ার্ডের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রিসোর্স পার্সনের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাস্টার ট্রেনারের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাকর্মীর সংখ্যা	শুরু করা কেন্দ্রের সংখ্যা	চালু কেন্দ্রে স্বেচ্ছাকর্মীর সংখ্যা	কর্মসূচিতে যুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা	মন্তব্য
১.	নরেন্দ্রপুর	দঃ ২৪ পরগনা	২	১	৯	৩	৩	১১	১৬৭	৯০	৯০	৪৯২	সোনারপুর
২	সংবর্তিকা	ঐ	৪	--	৮	—	৫	২০	১৬০	৬৬	৬৬	৬৮০	ও ভাঙড়
৩	বিবেকানন্দ সেবাপরিষদ	ঐ	১৪	—	২৯	—	১	১৯	১৫৩	১৫৩	১৫০	১৫৫২	ব্লকে কাজ
৪.	ইষ্টানন্দ	ঐ	২	--	৩	—	১	৫	৬২	২৮	২৮	২৮০	চলেছে।
৫.	সুন্দরবন অরুণোদয়	ঐ	৬	—	২২	—	১	২৫	১১৬৯	১১৬৯	১১৬৯	১১৬৯২	
৬.	সুন্দরবন সেবাঙ্গন	ঐ	৫	—	১০	—	১	১৩	২৭২	২২৪	২২৪	২৭৭০	মোট ৬টি
৭.	সেবা ভারতী	ঐ	৫	—	৬	—	১	১৯	৭৬	৩০	৩০	২৯২	ব্লকে কাজ
৮.	সেবায়তন	ঐ	১	—	৩	—	১	৫	২৫	২৫	২৫	২৩৫	চলছে।
৯.	নবচেতনা	ঐ	১	—	৩	—	১	৩	১০০	১০০	১০০	১০০০	
১০.	দীপাঙ্গন	ঐ	৩	—	৫	-	১	১৭	১৪৮	১৪৮	১৪৮	১৭১৮	
১১	গোসাবা রূপায়ণ	ঐ	১২	—	১৮	—	১	৪৮	৪২৪	৪১৫	৪১৫	৪১৪৫	
১২.	সবার পরশ	ঐ	৪	—	১৪	—	১	১৭	১৩০	১৩০	১০৬	১৪৩৫	
		মোট সংখ্যা	৫৯	১	১৩০	৩	১৮	২০২	২৮৮৬	২৫৭৮	২৫৫১	২৬২৯১	* দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ১৭টি ব্লকে লোকশিক্ষা পরিষদের সাক্ষরতার কাজ চলেছে।

সূত্র : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত।

সৃজনী শিক্ষা (Innovative Education)

লোকশিক্ষা পরিষদ বয়স্ক শিক্ষার পাশাপাশি এখন 'সৃজনীশিক্ষা' আরম্ভ করেছে। ভারত সরকারের অনুমোদন ক্রমে ১.৮.১৯৯৫ থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়। শুধু সোনারপুর থানায় ৬-১৪ বছরের শিশুদের নিয়ে এই কাজ চলছে। উদ্দেশ্য দুটি : (১) প্রথামুক্ত শিক্ষার এমন একটি মডেল সৃষ্টি করা যা সারা দেশে সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হতে পারবে, (২) প্রথাগত প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে কাজ করা, যার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া (drop out) শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমবে।

পেশা ও বৃত্তিগত শিক্ষা, সঞ্চয় প্রকল্প এবং খেলাধুলোও এই কর্মসূচির অঙ্গ। সৃজনী শিক্ষার কাজ এখনও অব্যাবহত আছে। বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লিগ (বি এস এস এল)।

এই খ্যাতনামা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৭৬ সাল থেকে বিভিন্ন সময় এই জেলায় সাক্ষরতার কাজ প্রতিষ্ঠানটি করেছে। ওই বছরে উত্তরভাগ (বারুইপুর), কাকদ্বীপ, কইখালি ও দেউলবাড়িতে এরা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে। ১৯৮০ সালের পর রাধানগরে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তিরিশটা শিক্ষাকেন্দ্র শুরু হয়, এই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা বা অর্থনৈতিক কর্মসূচিও যুক্ত ছিল। যেমন,

ঘরোয়া বাগান (কিচেন গার্ডেন), পোলট্রি ইত্যাদি। ১৯৯৩ সালে সত্যেন মৈত্রের প্রেরণায় এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'জনশিক্ষা প্রসঙ্গে'। এই জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনে এই তত্ত্বমূলক পত্রিকাটির দান স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও সংগঠকরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য সম্পদ কেন্দ্র (স্টেট রিসোর্স সেন্টার, এস আর সি) ছিল বি এস এস এল-এরই অন্তর্ভুক্ত। লিগ সারা রাজ্যের জন্যে স্তরবিন্যস্ত (গ্রেডেড) পাঠ্যবই রচনা করে, অর্থাৎ কোনও রাজ্যে এমনতর পাঠ্য-উপকরণ নেই। এ-রাজ্যের সমস্ত জেলাই এই সব বই ব্যবহার করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষা ও প্রবহমান শিক্ষা (Continuing Educations) বিভাগ আছে। সোনারপুর থানার কালিকাপুর অঞ্চলে এরা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে চালু করেছিলেন। অর্থকরী বা বৃত্তিশিক্ষাকে এরা বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। পরে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান শুরু হলে সাক্ষরতা বিধানের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের উপর বর্তায়। কিন্তু এলাকায় আজও এঁদের যোগাযোগ রয়ে গেছে।

হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজ :

১৯৭৪ সালে এঁরা সাক্ষরতার কাজ আরম্ভ করেন, বেঙ্গল স্যোশ্যাল সার্ভিস লিগের সহায়তায়। দ্বিতীয়বার শুরু করেন ১৯৮৬ থেকে। আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা বজায় আছে। ২৪টি পাড়ায় এরা সাক্ষরতার কেন্দ্র চালিয়েছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি পাড়ায় গড়ে ২৫ জন, সাক্ষরতার নির্ধারিত মান স্পর্শ করেছেন গড়ে ১৬-১৭জন।

সার্বিক সাক্ষরতার (TLC-এর) কাজ শুরু হবার পর পাড়ায় পাড়ায় পড়াশুনোর ঝোঁক বাড়ে, ফলে এঁদের কেন্দ্রগুলিতেও নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হয়। এঁদের কাজের বরাবরের বৈশিষ্ট্য : সাক্ষরতার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার সংযোগ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলিম মেয়ে-বউরা সংখ্যায় ভারী। এঁরা বৃত্তিশিক্ষাতেও বেশি আগ্রহী। নানারকম বৃত্তিশিক্ষার আয়োজন প্রতিষ্ঠানটি করেছে—খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তাঁতের কাজ, দর্জি কাজ, পাটের ব্যাগ সেলাই ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের তৈরি জিনিস বাজ[illegible] দায়িত্বও প্রতিষ্ঠানের। শুধু পাটের ব্যাগ সেলাই থেকে [illegible]র্থী [illegible]৬১৫.০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছেন। গড় রোজ[illegible] প্রা[illegible]০ টাকা।

পড়াশুনো ছাড়াও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে আলোচনাসভার নিয়মিত আয়োজন এঁরা করে থাকেন। এখন যে-সব সাক্ষরতা ও প্রবহমান শিক্ষার ক্লাস চলেছে তাতে ব্রাহ্মসমাজের মহিলাকর্মীরা ছাড়াও গ্রামের মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে পড়াচ্ছেন। এঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করেছে ব্রাহ্ম সমাজ।

সাগরদ্বীপ

আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বয়স্ক সাক্ষরতার কাজ করেছে। তাছাড়াও, একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি আরম্ভ হয়েছিল সাগরদ্বীপে, সরাসরি রাজ্যসরকারের উদ্যোগে এবং পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যবর্তিতায়। এই উদ্যোগ পরে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের মধ্যে এসে মিশে যায়।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (Total Literacy Compaign, TLC)

কিন্তু এই সমস্ত উদ্যোগই অল্পবিস্তর সীমিত : নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিয়ে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা। নিরক্ষরতা যখন সর্বব্যাপী, বিশেষত গ্রামজীবনে, তখন এই সব উদ্যোগ সাফল্য সত্ত্বেও নিরক্ষরতার বিরাট চালচিত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনতে পারেনি। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। তিনি লিখেছিলেন, দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূর করার কাজ রাষ্ট্রকেই করতে হবে, দু-দশটা নাইট স্কুলের কর্ম এ নয়। কারণ, শুধু লিখতে-পড়তে শেখা তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন তা সারা দেশে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। সোনার আংটি কড়ে আঙুলের মাপে হলেও চলে, কিন্তু পরনের কাপড় সেই মাপের হলে তা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাত ছোটো হয়—দেহটাকে এক আবরণে আবৃত করতে পারলেই তা কাজে দেয়। সামান্য লিখতে-পড়তে শেখা দু-চারজনের মধ্যে বদ্ধ হলে তা দামি জিনিস হয় না কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তা দেশের লজ্জা রক্ষা করতে পারে।

দেশের সেই লজ্জা-নিবারণের কর্মসূচি স্বাধীন ভারতে নেওয়া হল ১৯৭৮ সালে, কেন্দ্রের জনতা সরকার যখন 'জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি (National Adult Education Programme, সংক্ষেপে NAEP) গ্রহণ করল। পরবর্তী কালের সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি (TLC)-র ভিত্তি এটাই।

১৯৮৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসে তৈরি হল 'বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি'। ২৬জুন—১জুলাই, ১৯৮৮ যুবভারতী

১৯৯১[illegible] [illegible]নুসারে সাক্ষর জনসংখ্যার মহকুমাগত বিন্যাস নিচে দেওয়া হল :

মহকুমা	জনসংখ্যা		
	মোট	পুঃ	স্ত্রী
আলিপুর	৫,৭৯,৩৬৩	৩,৭৬,৭৮৫	২,০২,৫৭৮
ক্যানিং	২,৭৩,৩৪৪	১,৮৮,২৫৯	৮৫,০৮৫
বারুইপুর	৬,৭৪,১৮৬	৪,৩৩,৫২৬	২,৪০,৬৬০
ডায়মণ্ডহারবার	৬,৯৩,৮২৯	৪,৩৯,৬৩৬	২,৫৪,১৯৩
কাকদ্বীপ	৩,৩৪,৭৪৮	২,১৭,২০২	১,১৭,৫৪৬
	২৫,৫৫,৪৭০	১৬,৫৫,৪০৮	৯,০০,০৬২

ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবীদের এরা প্রশিক্ষণ দেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্বেচ্ছাসেবীরাও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এই জেলায় সার্বিক সাক্ষরতার কাজ সরকারি উদ্যোগে শুরু হয় আরও কয়েক বছর পরে। সমিতির সংগঠনও এখানে তখন দুর্বল ছিল। ফলে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীরা সকলে কাজ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র সেদিন পাননি।

১৯৮৮ সালের ৫মে 'জাতীয় সাক্ষরতা মিশন' (NLM) প্রতিষ্ঠার পর সাক্ষরতা আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়। ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রী কেরালার এর্নাকুলামকে ভারতের প্রথম পূর্ণসাক্ষর জেলা হিসেবে ঘোষণা করেন। ওই দিনেই শুরু হয় কেরালা রাজ্যকে পূর্ণ সাক্ষর করার অভিযান। এই বছরেই পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলাতে আরম্ভ হয় সার্বিক সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিরোধ অভিযান। অন্য কয়েকটি জেলাও এ-অভিযানে সামিল হয়।

১৯৯১ সালের ২৪ আগস্ট উপরাষ্ট্রপতি বর্ধমানকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষণা করেন। এই বছর সাক্ষরতায় অভূতপূর্ব গণউদ্যোগ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'ইউনেস্কো'র নোমা-পুরস্কার লাভ করে। সাক্ষরতা অভিযান এ-রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই (১৮ এপ্রিল ১৯৯১) কেরালা ভারতের প্রথম সাক্ষর রাজ্যের সম্মান অর্জন করে।

১৯৯২-৯৩ সালে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানে দেশের ২২৩-টি জেলা সামিল হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অভিযান আরম্ভ হয় ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। জেলা সাক্ষরতা সমিতি গঠিত হয়। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে জেলার সমস্ত মানুষকে, গ্রাম-নগর-জনপদকে, এই অভিযানে যুক্ত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়। জেলাব্যাপী জাঠা, পদযাত্রা, মিছিল, সভা-সমিতি, নাট্যপ্রদর্শনী, সংগীত প্রভৃতির মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব গণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। জেলাগতভাবে তৈরি হয় দুটি ভিডিও নাটক এবং গানের ক্যাসেট। গণনাট্য সংঘ এবং অপেশাদার বহু নাট্যগোষ্ঠী ও গ্রুপ থিয়েটার গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় পথনাটিকার মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রায় সব রাজনৈতিক দল, বিশেষত বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলি, অভিযানকে সফল করার কাজে নামে। তবে, এটাও ঠিক, সব গ্রাম-পঞ্চায়েত সমানভাবে কাজে নামেনি। কিছু গ্রামপঞ্চায়েত গোড়ার দিকে উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করলেও পরে পিছিয়ে যায়। দু-একটি পৌরসভা সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক-সংগঠনগুলিও প্রচারের কাজে সাড়া দিয়েছে। মূল্যায়নের সময় তাদের সহযোগিতা ছিল লক্ষণীয়। তবে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক ও সংগঠক হিসেব প্রাথমিক শিক্ষকদের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

সাগরদ্বীপে দু-দফায় স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষাকর্মী। সংগঠকদের জেলা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এঁরা হলেন জেলার সম্পদকর্মী (আর পি)। বছর দেড়েক পরে এই সম্পদকর্মীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পার্সন (ডি আর পি) তৈরি করা হয়। জেলাব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলনে প্রশিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে ডি আর পি-দের দান খুব মূল্যবান।

আন্দোলনের সূচনায় প্রধান কাজ ছিল প্রচার ও সমীক্ষণ। কয়েকবার সমীক্ষার পর ১০,০৬,৫৪৬ জন নিরক্ষর নরনারীকে লক্ষ্যদল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বয়স অনুযায়ী লক্ষ্যদলের দুটি ভাগ : প্রথম-৯ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়ে; দ্বিতীয়-১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী বয়স্ক মানুষ (প্রত্যেক দলের পাঠ্যবই স্বতন্ত্র)।

সমস্ত জেলায় প্রবল উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু হয়। পৌরসভার তুলনায় পঞ্চায়েত এলাকায় কাজের বিস্তৃতি ও গতি ছিল অত্যন্ত বেশি। কারণ, গ্রামাঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে ছিলেন নিরক্ষর নারীপুরুষ। এমন-কী গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতেও নিরক্ষর বউ দেখেছি। তবে এঁরা অনেকেই সকলের সঙ্গে সাক্ষরতা কেন্দ্রে এসে লেখাপড়া করতে চাননি। শেষ পর্যন্ত সকলের চেষ্টায় এঁদের একটা অংশ পড়াশুনো করেছেন।

কিন্তু এঁদের কথা থাক। গ্রামের গরিব মানুষের মধ্যেই নিরক্ষরের সংখ্যা ব্যাপক। মেয়েদের মধ্যে তো কথাই নেই। শুধু এই জেলায় নয়, সব জেলাতেই আমাদের অভিজ্ঞতা হল, মুসলিম নারীরা সাক্ষরতা কেন্দ্রে আসার ব্যাপারে হিন্দু মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রহী হয়েছেন।

সবাই যে গোড়া থেকেই সাক্ষরতার পাঠ নিতে এসেছেন তা নয়। তবে প্রচার আন্দোলনের ফলে পরিবেশ যত সাক্ষরতামুখী হয়েছে, একের পর এক কেন্দ্র খোলা যখন শুরু হয়েছে, তখন মানুষের মনের বাধাও কেটে গেছে।

বাধা যে কতকম আসে তার সবটা আমরা আন্দাজ করতে পারিনি। একটা উদাহরণ দিই। কোনও একটি পৌরসভার একটি আদিবাসী পল্লিতে মেয়েদের জন্যে সাক্ষরতাকেন্দ্র খোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কয়েকজন ভি টি। তাঁরা একদিন এসে বললেন, বউ-ঝিরা পড়তে রাজি হয়েছে, একটা ঘরও পুরোপুরি ফাঁকা পাওয়া গেছে, কিন্তু সেই ঘরে কেউ আসতে চাইছে না।

গেলাম সে-পাড়ায়। সেই ঘরেই মেয়েদের ডেকে এনে বসলাম। অনেক সাধ্য-সাধনায় এঁরা মুখ খুললেন। বললেন, এঘরে থাকত বুড়ো চমরু। মাস দুই হল মারা গেছে। আমরা এখানে পড়ব না।

কেন? এ-ঘর তো ফাঁকা পড়ে আছে।

ফাঁকা নয়। এ-ঘরেই সে বসে থাকে, সবসময়।

কোথায় বসে আছে সে?

ওই তো আপনার বাঁ পাশে।

আমি চেয়ে দেখলাম, আমরা বাঁ-দিকে হাত দেড়েক তফাতে একটা আধলা ইট। আমি ইটটা তুলে নিয়ে আবার রেখে দিলাম। বললাম, কোথায়, কেউ তো নেই?

আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি।

জীবনে এত অবাক কখনও হইনি। ওই আদিবাসী মেয়েরা কী করে তাঁদের কল্পনাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু হাল আমরা ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত ওখানেই কেন্দ্র শুরু হয়েছিল।

সাক্ষরতা মানে শুধু লেখাপড়া আর অঙ্কের প্রাথমিক পাঠ নয়। সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত সবাই জানেন, এই লেখাপড়ার সঙ্গে আরও দুটি অপরিহার্য জিনিস সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত : সচেতনতা আর সক্ষমতা। সাক্ষরতার বইগুলি শুধু বর্ণ-শব্দ-বাক্য শেখার বই নয়। শুধু

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিরক্ষর নারীরা সাক্ষরতা আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন

অক্ষর প্রাথমিক পাঠ দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়। পড়তে পড়তে নিরক্ষর শিক্ষার্থীরা যেমন সাক্ষর হয়ে উঠবেন, তেমনই তাঁরা নতুন চেতনার জগতেও পৌঁছাবেন—বইগুলো এমনভাবেই তৈরি। সাক্ষরতা-সচেতনতা-সক্ষমতা—এই তিনটি কথাকে সবসময় মনে রেখেছেন প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী—(ভি টি/এম টি)। তাই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাক্ষরতাকেন্দ্রেও বসেছে আলোচনার আসর। সে-আলোচনায় শুধু শিক্ষার্থীরাই আসতেন না, আসতেন নিরক্ষর-সাক্ষর নির্বিশেষে সব মানুষ। সূর্যগ্রহণের সময় য[illegible] আলোচনা করতে গেছি তখন দেখেছি, কী আগ্রহ নি[illegible] জড়ো হয়েছেন। ডাক্তার বাবুরা গেছেন স্বাস্থ্যবিধি [illegible] বলতে। নিরক্ষর-সাক্ষর উচ্চশিক্ষিত নির্বিশেষে সব[illegible] কথা শুনতে, বিশেষত মহিলারা, মায়েরা। সাক্ষর[illegible]সাফল্য বিচারের মাপকাঠি তাই কে কতটা লিখতে-[illegible] শুধু এ-টুকু নয়। সার্বিক সাক্ষরতার মূল্যায়ন হ[illegible] সরকারি পরিসংখ্যান আছে—কতজন কত নম্বর [illegible] শতকরা হার কত। কিন্তু সচেতনতা ও সাক্ষরতার [illegible]। যে-স্বাস্থ্যবিধির কথা আলোচিত হয়েছে পড়ার [illegible] নিজের ঘরকে তা বদলাতে পেরেছে কি না—সে-মূল[illegible] ব্যবস্থা ছিল না। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (এন এল [illegible] যে বিষয় ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, দেশের কো[illegible] তার বাইরে যাবার উপায় নেই। কিন্তু সাক্ষরতা [illegible] অভিজ্ঞতা থেকে জানেন—সাক্ষরতা আন্দোলন গ্রামের চিরাচরিত জীবনে কী সদর্থক পরিবর্তন এনেছে। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার একটি মুসলিম পাড়ার কথা। এখানে ছ-টি কেন্দ্র ছিল। পাঁচটিতে শিক্ষার্থীরা সবাই মুসলমান মহিলা, এখানকার স্বেচ্ছাসেবী কর্মী শুভ্রার (ও ছিল মাস্টার ট্রেনার বা এম টি) আহ্বানে কেন্দ্রগুলো দেখতে গেলাম।

রোজার মাসে মুসলমান নারীপুরুষের থুথু গেলাও নিষেধ। অনেকেই এই ধর্মীয় বিধান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে গিয়ে যেখানে সেখানে থুথু ফেলেন। শুভ্রা এবং অন্য ভিটিরা বোঝালেন, অভ্যাসটা কত খারাপ। ফলে সব শিক্ষার্থীর বাড়িতেই নির্দিষ্ট জায়গায় পাত্র বসে গেল। সবাই সেখানেই থুথু ফেলে। গ্রামে সেটা অভ্যাসে দাঁড়াল।

ফুলমালঞ্চ

পুনে স্টেট রিসোর্স সেন্টারের প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা আন্দোলনের পরিচয় নিতে এসেছিলেন। কয়েকটি জেলা তাঁরা দেখেন। এই জেলার ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতে তাঁরা ঘুরেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন, সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলো এক-একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তাঁদের জিজ্ঞেস করেছি—কেমন দেখলেন? তাঁরা বলেছিলেন, অনেক রাজ্যে তাঁরা ঘুরেছেন, কিন্তু সাক্ষরতার পিছনে গ্রামবাসীর এমন সাগ্রহ সমর্থনের পরিচয় অন্য কোথাও তাঁরা পাননি।

ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েত এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে অভিনন্দিত করে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের কাছে তাঁরা রিপোর্ট দিয়েছিলেন।

ফুলমালঞ্চের প্রধান ছিলেন সুদক্ষ সংগঠক। বিস্তারিত সমীক্ষার পর পঞ্চায়েত সাক্ষরতার কাজে নেমে অঞ্চলের সমস্ত সমিতিকে সাক্ষরতার কাজে তাঁরা যুক্ত করেন। ফুলমালঞ্চে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা অনেক। এখানকার আদিবাসী কল্যাণ সংঘ অনেকগুলি সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালনা করেছে। পঞ্চায়েত হুকুমদারি করে কোনও সমিতির কাজকে বিড়ম্বিত করেনি। এই মর্যাদাপূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ ছিল গ্রামবাসীর সমর্থন ও সাক্ষরতার সাফল্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণা।

এটাই অবশ্য সব নয়। প্রত্যেক সাক্ষরতা কেন্দ্রকে জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিল এই পঞ্চায়েত। একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল এই কর্মসূচি। শুধু পেশা বা বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দিয়েই তাঁরা কর্তব্য শেষ করেননি। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট বৃত্তিক্ষেত্রকে তাঁরা সমন্বিত করেছিলেন। যেমন, প্রশিক্ষণ—কার্পাস চাষ—তুলো থেকে পাঁজ—পাঁজ থেকে সুতো—সুতো থেকে কাপড় বা গামছা—বিক্রির ব্যবস্থা, এই সব পর্যায়ক্রমিক স্তর একটি পরিকল্পনার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল। সবটাতেই অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষার্থীরা। পঞ্চায়েত অফিসের দোতলায় পরের-পর সাজানো চরকায় শিক্ষার্থীদের সুতো কাটতে দেখেছি। দুপুরে বা বিকেলের দিকে বসত লেখাপড়ার ক্লাস।

শুধু লেখাপড়া নয়। প্রত্যেকটি সাক্ষরতা কেন্দ্র সংস্কৃতি কেন্দ্রও বটে। গানবাজনা তো হতই, দু-একটা কেন্দ্রে নাচও। পুরুষদের কেন্দ্রে নাটক। পুনের প্রতিনিধিরা গান শুনে তারিফ করেছেন। অনেক গান ও সুর শিক্ষার্থীদের স্বরচিত। শিক্ষার্থী মেয়েদের মুখে পরিচিত জনপ্রিয় গানের প্যারডি আমরা শুনেছি।

নাটকও বিশিষ্ট। মৌখিক নাটকের ঐতিহ্যকে এঁরা ধরে রেখেছেন। যে-কোনও পরিচিত বিষয় বা থিম আপনি বলুন, সঙ্গে সঙ্গে এঁরা অভিনয়ে নেমে যাবেন। যেহেতু মৌখিক, কোনও পাণ্ডুলিপি নেই, তাই পরপর দু-বার অভিনয় করলেও পাত্র পাত্রীদের সংলাপে ভিন্নতা ঘটে যায়। দরকারমতো অভিনয়ের সময়কে এঁরা কমিয়ে-বাড়িয়ে নেন। লিখিত সংস্কৃতির চাপে এই চিরাগত মৌখিক সংস্কৃতির বেঁচে থাকা কঠিন। তবু চেষ্টা করতে হবে। জেলায় এখন প্রবহমান শিক্ষাপর্ট (Continuous Education) শুরু হয়েছে। এই পর্বে সংস্কৃতিচর্চার বিস্তৃত অবকাশ আছে। মৌখিক শিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা ও উন্নত করার লক্ষ্য যদি কার্যকর হয়, তাহলে আমাদের সংস্কৃতি একটি দেশজ মুখশ্রী লাভ করবে।

ফুলমালঞ্চেই দেখতে পেয়েছি কালু আর সরস্বতীকে। গরিব ঘরের সুন্দরী মেয়ে সরস্বতী। তার সুনাম ছিল না। গ্রাম থেকে সে চলেও গিয়েছিল বহুদিনের জন্যে। এই সরস্বতী সাক্ষরতার কাজে প্রাণপাত করে নিজের দুর্নাম ঘুচিয়েছে, নিজেও লেখাপড়া শিখেছে।

কালু ছিল হাড়-কাঁপানো ডাকাত। পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা আর সাক্ষরতা আন্দোলনে তার জীবন বদলে দিয়েছে। যখনই দেখা হয়েছে তার সালাম পেয়েছি, সঙ্গে স্মিত হাসি। তার পঞ্চাশ-ছুঁই-ছুঁই শরীর ছিমছাম কালো ইস্পাত। সে বলেছে : বেঁচে গেছি দাদা। আগে লোকে সামনাসামনি অমায়িক হেসে গলে পড়ত, পিছনে গাল পাড়ত। এখন সকলের ভালোবাসা পাই, পঞ্চায়েতের সভায় যাই, ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করতে পাঁচ গ্রামের লোক ডাক পাঠায়।

কালু সন্ধের লণ্ঠনটি উসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। শিক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে তাগাদা দিত। তারপর সবার আগে সাক্ষরতাকেন্দ্রে এসে বসত। সাক্ষরতা আন্দোলন নিরক্ষর কালুকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। তাকে মানুষ করেছে।

কালু বা সরস্বতী দৃষ্টান্তমাত্র, পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা আন্দোলন গ্রামীণ জীবনে কী গভীর পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তার নির্দেশক।

বিজ্ঞান মঞ্চ :

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা শাখা সাক্ষরতার সঙ্গে বিজ্ঞানচেতনাকে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে জেলায় বিজ্ঞানকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যুবভারতীতে। প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানকর্মীরা যে যার নিজস্ব এলাকায় কাজ করেছেন। কোনও কোনও অঞ্চলে যেমন তৎকালীন রাজপুর এবং বর্তমান রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভার এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে এদের কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান সাড়া ফেলতে পেরেছিলে।

স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অনুষ্ঠান

অনেক জায়গায় স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষার্থীরা কখনও স্বতন্ত্র কখনও যৌথভাবে নানা অনুষ্ঠান করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী বা নবসাক্ষরদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। তাছাড়া আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা সাক্ষরতা সমিতির উদ্যোগে খেলাধুলো ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে এমন সাংস্কৃতিক কাজকর্ম আগে কখনও দেখা যায়নি।

এই সব অনুষ্ঠানে মহিলা শিক্ষার্থীদের যোগদান ছিল লক্ষ করার মতো ঘটনা। মহিলা সাক্ষরতাকেন্দ্র ছিল পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। স্বেচ্ছাসেবী (ভিটি)-দের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশি বললে ভুল হবে, অনেক অনেক বেশি।

সাক্ষরতার শহিদ : সাত্তার ও শওকত

সারা জেলায় শুভ্রা তো একজন নয়, অনেক। সাক্ষরতা আন্দোলন সাফল্যের জন্যে এই সব অনামা কর্মীদের কাছে অশেষভাবে ঋণী। বহুজন বহুভাবে স্বার্থত্যাগ করেছেন। সংস্কৃতে বন্ধুর আর-এক নাম অত্যাগসহন। অর্থাৎ যার ত্যাগ সহ্য করা যায় না। অন্য সমস্ত সংগ্রামে যেমন, সাক্ষরতার সংগ্রামেও তেমনই কত অসামান্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে। একদিন হয়তো সে-সব কাহিনী লেখা হবে। সবাই জানবে সাত্তার আর শওকতের নাম—এই জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলনের দুই শহিদ। জেলার শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ জুড়ে আছে সুন্দরবন। অসংখ্য নদীনালায় ভাসে অগুনতি জেলেনৌকা আর ভুটভুটি। ঘরবাড়ি ছেড়ে জেলেরা মাছ ধরতে বেরোয় অনেক দিনের জন্যে। সাক্ষরতার পাঠ এরা নেবে কী করে? বিশিষ্ট এবং সদ্যপ্রয়াত মহিলা নেত্রী প্রগতি ভট্টাচার্য পরিকল্পনা করলেন 'কাজের ফাঁকে লেখাপড়া'র। জেলেরা নৌকা ভাসাবে, তাদের সঙ্গেই থাকবে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক (ভি টি)।

সাক্ষরতায় বৃদ্ধাও পিছিয়ে নেই

তাঁরাও জেলে। একই নৌকার যাত্রী। নৌকোতে বসবে সাক্ষরতার ক্লাস। অথবা নদীনালার পাড়ে, বনাঞ্চলে।

সেদিন ২৯টা নৌকা ক্যানিং থেকে যাত্রা শুরু করল। এমনই দল বেঁধে ওরা যায়। ভিটিরাও চললেন ওদের সঙ্গে। তাম্বুলদা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান নুর মহম্মদ ছিলেন ওই বিশেষ সাক্ষরতা-যাত্রার অন্যতম সংগঠক। প্রণতি [illegible] কথা [illegible] বলেছি।

ভিটিদের মধ্যে ছি[illegible] মৌ[illegible] সাত্তার ও শওকত। ওঁরা জেলে, অন্যান্য বছরের [illegible] এ[illegible] গেছেন নৌকাদলের সঙ্গে। তবে এবারের কাজ শুধ [illegible] কাজের অবসরে লেখাপড়া করাতেও হবে।

একদিন জঙ্গলের [illegible] ক্লাস [illegible] পর সুন্দরবনের বাঘ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল সাত্তারকে [illegible] ও প্রাণ দিলেন একই ভাবে।

সাক্ষরতার এই শা[illegible] য[illegible] স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। সার্বিক সাক্ষর[illegible] চলছে দেখতে এসেছিলেন জাতীয় সাক্ষরতা মি[illegible]-এর) ডিরেক্টর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকগু[illegible] তিনি দেখেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন [illegible]-পরগনা জেলার শিক্ষার্থী, স্বেচ্ছাসেবী ও সাক্ষরতার [illegible] নি[illegible]প্রাণ মানুষের মধ্যে কিছু সময় ব্যয় করার সুযোগ আম[illegible] এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলেছি যাঁরা এই [illegible] ক[illegible]র গুরুত্ব বোঝেন, অসাধারণ তাঁদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলে অসামান্য উদ্যমের কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের মধ্যে কাজ আমাকে মুগ্ধ করেছে। ধীবররা যখন অনেক দিনের জন্যে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, তখন তাঁদের মধ্যে পঠন-পাঠনের দুঃসাহসী কাজের খবর সারা দেশের শোনা উচিত, জানা দরকার। দু-জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকের বাঘের হাতে প্রাণ দেবার দুঃখজনক কিন্তু বীরত্বপূর্ণ কাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রাণিত করবে। এই রকম নিঃস্বার্থ মানুষের আত্মত্যাগ ও মহৎ প্রয়াসের ফলেই এই আন্দোলন মহাকাব্যিক মাত্রা স্পর্শ করেছে। তাই দেশের সাক্ষরতা অভিযানকে আমরা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' আখ্যা দিয়েছি। (*প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত*)

১৯৯৪-এর ৮ সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবসে দিল্লির অনুষ্ঠান থেকে ওঁদের 'সাক্ষরতার শহিদ' ঘোষণা করা হয়। সরকার শহিদ পরিবারদের আর্থিক অনুদানও দিয়েছিল।

ওই দিনের অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল শহিদদের নিয়ে লেখা নাটক। নাট্যকার : শান্তিময় ভট্টাচার্য। পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। মঞ্চ : খালেদ চৌধুরী। আলো : তাপস সেন। সুর ও আবহ সঙ্গীত : সলিল চৌধুরী। তালকোটরা স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাবিব তনবির, সাফদার হাশমির ভাই সোহেল হাশমি,

দিল্লির বিখ্যাত নাট্যকার টি কে রানিয়া। পশ্চিমবঙ্গের এই নাটকটি সেদিন শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মান পেয়েছিল।

একই ঘটনা নিয়ে একই দিনে বিকেলে কলকাতার মেট্রো সিনেমার সামনে অভিনীত হয়েছিল জয়ন্ত ভট্টাচার্যের নাটক 'আমরা'। এখানে উপস্থিত ছিলেন বিমান বসু, বিনয় কোঙার প্রমুখ বিশিষ্ট জন। সম্পাদনা, গীতরচনা ও পরিচালনায় ছিলেন সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (সোনারপুর), কৃষ্টি সংসদ, ব্লু-স্কাই, ইঙ্গিত ও মিত্রায়ণের যৌথ প্রযোজনায় নাটকটি হয়েছিল। মিত্রায়ণের মহুয়া মুখোপাধ্যায় ছিলেন নৃত্য-পরিচালক। সারা জেলায় দুটি নাটকই বহুবার পরিবেশিত হয়েছে। দূরদর্শন 'আমরা' নাটকটি দেখানো উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখানো হয়নি।

বজবজ মহকুমার একটি বিশিষ্ট কর্মসূচি :

বজবজ মহকুমার সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের শেষদিকে অভিযানের সঙ্গে পাঠাগারগুলিকে যুক্ত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ওই সময় এই চেষ্টা খুব যে সফল হয়েছিল তা নয়। তবে চারটি পাঠাগার এই সময় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একটা জিনিস এ-প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা উচিত। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত জেলায় পুরোদমে সাক্ষরতার কাজ হয়েছে। যাঁরা নিয়মিত পড়াশুনো চালিয়েছেন তাঁদের অনেকে ছ-আট মাসের মধ্যেই সাক্ষরতার মান স্পর্শ করতে পেরেছেন। সমস্যা ছিল— অতঃপর তাঁরা কী করবেন? যদি বেশিদিন লেখাপড়ার চর্চা থেকে তাঁরা সরে থাকেন তাহলে আবার নিরক্ষরতার ঢাল বেয়ে তাঁরা নেমে যাবেন। জেলায় সাক্ষরোত্তর পর্ব শুরু হতে হতে অনেক সময় কেটে যাবে। মাঝের সময়টাও ওই সব নবসাক্ষর যাতে সাক্ষরতার মান ধরে রাখতে পারেন তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ওই চারটি লাইব্রেরি। তাছাড়া, আর-একটি উদ্দেশ্য ছিল—সাক্ষরতা আন্দোলনের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলা।

এই উদ্দেশ্যে তিন ধরনের কর্মীকে বজবজ-২ পঞ্চায়েত অফিসে ট্রেনিং দেওয়া হয়। একদল, যাঁরা লেখাপড়া শেখাবেন। আর-একদল, যারা খেলাধুলো করাবেন। তৃতীয় দল, যাঁরা গানবাজনা শেখানোর কাজ করবেন। প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন রাজ্য সম্পদ কেন্দ্র (এস আর সি)। তার আগে সত্যেন মৈত্রের উদ্যোগে এস আর পি দু-দফায় যুবভারতীতে রাজ্যের গ্রন্থাগারিকদের একটি অংশকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

এই প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীরা উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন। পাড়ায় পাড়ায় নবসাক্ষরদের মধ্যে তাঁরা লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে গেছেন, পড়া হলে ফেরত এনেছেন। বজবজ অঞ্চলে রাজ্য সম্পদ কেন্দ্রে শক্তি মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি পাঠাগারকে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক কাজ হয়েছিল। প্রবহমান শিক্ষাপর্বে এই অভিজ্ঞতা মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠতে পারবে।

সার্বিক সাক্ষরতার মূল্যায়ন :

১৯৯২-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাক্ষরতা কেন্দ্রে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ভাঙার পরিণামে এই জেলাতেও চাঞ্চল্য ও থমথমে ভাব দেখা দেয়, সাক্ষরতা অভিযান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্দোলনকে আবার টেনে তুলতে পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাস এসে যায়। এপ্রিল মাসে হয় দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৯২-এর সেপ্টেম্বরে।

এই জেলায় বহির্মূল্যায়ন হয় দুটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের বহির্মূল্যায়ন ১৯৯৩ সালের মে মাসে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে। এই মূল্যায়নে জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী ১,৯১,৭৫৩ জন শিক্ষার্থী নবসাক্ষর হিসেবে ঘোষিত হয়।

এই মূল্যায়নের পরেই আসে পঞ্চায়েত নির্বাচন। স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষার্থীদের অনেকেই নির্বাচনের কাজে নেমে পড়েন। সরকারি কর্মী ও অফিসাররাও নির্বাচনের সময় সাক্ষরতার দিকে নজর দেবার সুযোগ পান না। নির্বাচনের পর আন্দোলন প্রায় নতুন করে শুরু করতে হয়। এ হল সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন হয় ১৯৯৪-এর জুন মাসে। ডঃ পবিত্র সরকার মূল্যায়নকারী দলের নেতৃত্ব করেন। ৬,৩৯,০০০জন শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ দেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নের একত্রিত ফল নিম্নরূপ : লক্ষ্যদলের মধ্যে সাক্ষরতা কেন্দ্রে যাদের আনা যায়নি বা যারা মাঝপথে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে তার হিসেব :

বয়স	সংখ্যা
৯-১৪	২৮,৮০৩
১৫-৫০	১,৪৬,৬১৮
মোট	১,৭৫,৪২১

জাতীয় সাক্ষরতা মিশন নির্ধারিত মান যে-সব শিক্ষার্থী স্পর্শ করতে পারেনি, তার হিসেব:

বয়স	সংখ্যা
৯-১৪	১২,৫১৪
১৫-৫০	৬৪,৫১৪
মোট	৭৭,০৫৫

বয়স	লক্ষ্যদল	সাফল্য	শতকরা হার
৯-১৪	২,১৭,৪৪০	১,৭৬,১২৩	৮০.১০%
১৫-৫০	৭,৮৯,১০৬	৫,৭৭,৯৪৭	৭৩.২৪%

গ্রামীণ সাক্ষরতা আন্দোলনের দৃশ্য

সাক্ষরোত্তর অভিযান (Post-Literacy Campaign, PLC)

সাক্ষরতা—সাক্ষরোত্তর প্রবহমান শিক্ষার কর্মসূচি (Continuing Education Programme), এইভাবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে না গেলে সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যকে ধরে রাখা যায় না। আমাদের দেশে সাক্ষরতা অভিযান যথার্থভাবে শুরু হয়েছে বিশ শতকের শেষ দশকে। এ এমন এক পৃথিবী যেখানে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। এ এমন এক সময় যখন শুধু লিখতে-পড়তে শেখার মূল্য সামান্যই। আমরা জানি, তথাকথিত সাক্ষর কিন্তু কার্যত নিরক্ষর (functionally illiterate) মানুষের সংখ্যা আমেরিকার মতো দেশেও বিস্তর।

সুতরাং, কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের কর্তব্য ছিল—সারা দেশের জন্যে একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে কাজে এগোন। অর্থাৎ একটা পর্যায় শেষ হবার আগেই পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি ও কাজ শুরু করে দেওয়া। তা না হলে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদের অপচয় ঠেকানো যায় না। বহু মানুষের আত্মত্যাগ ও পরিশ্রম মর্যাদা পায় না। [illegible] সবই [illegible] কথা, নানা সর্বভারতীয় সভা-সেমিনারে এ-প্রসঙ্গ [illegible]।

তবু পর্ব থেকে পর্বা[illegible] ঘটেনি, ছেদ পড়ে গেছে। সারা দেশে সাক্ষরতা কর্ম[illegible]ক দুর্বলতা অভিযানের সুফলকে সীমিত করেছে। [illegible]ক্ষেত্রেও কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাতে যে অসুবি[illegible] সাক্ষরতা সমিতি প্রোজেক্ট রিপোর্টে (Project Re[illegible] [illegible]ntinuing Education Programme, 1997) তা [illegible] সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর অভিযানের মধ্যে সময়ের [illegible] অনেক শিক্ষার্থী আবার নিরক্ষরতার মধ্যে তলাতে [illegible]

সাক্ষরতা অভিযানের [illegible] চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয়েছিল ১৯৯৪-এর জুন মাসে। তার[illegible] কর্মসূচির প্রস্তুতিপর্ব শেষে ঠিকমতো ক্লাস শুরু হতে হ[illegible] ১৯৯[illegible] এসে যায়। মনে রাখতে হবে, সার্বিক সাক্ষরতা অ[illegible]র্বে বহির্মূল্যায়ন হয়েছিল ১৯৯৩ সালের মে মাসে। [illegible] যে [illegible]লক্ষ শিক্ষার্থী সাক্ষরতার মান স্পর্শ করেছিলেন তাদের সাক্ষরোত্তর পর্বের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে দেড় বছরের বেশি সময়। এ-ঘটনা ঘটতে পারত না যদি তখন থেকেই সাক্ষরোত্তর পর্ব শুরু করে দেওয়া যেত। তা যে গেল না, তার জন্যে জেলা সাক্ষরতা সমিতিকে দায়ী করলে হবে না। পর্ব থেকে পর্বান্তরের মধ্যে যে বিচ্ছেদ, তার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে প্রায় সমস্ত জেলাকেই।

সুতরাং, এই জেলায় সাক্ষরোত্তর পর্ব থেকে শুরু করতে হয় পিছন থেকে। প্রথম কয়েক মাস শুধু প্রাথমিক সাক্ষরতার ক্লাস চালাতে হয়।

সাক্ষরোত্তর পর্বে জেলার লক্ষ্যদলের সংখ্যা ১০,০৬,৫৪৬। তার মানে কিন্তু এ নয় যে সবাই নতুন পাঠ শুরু করবেন। প্রাথমিক সাক্ষরতার কাজ কোনও পর্বেই শেষ হয়ে যায় না, ওটা চলতে থাকে। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান চলার সময় অনেককে ক্লাসে আনা যায়নি, অনেকে আবার এসেও শেষ পর্যন্ত পড়াশুনো করেননি। অন্য একটা অংশে আছে নিরক্ষরতার পথে পিছিয়ে-আসা নবসাক্ষর। এ-রকম একটা অংশও থেকে যাবে, থেকে যায়।

এই জেলায় সাক্ষরোত্তর পর্বের দুটি অভ্যন্তরীন মূল্যায়ন হয়। একটি ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, অন্যটি ৪ এপ্রিল, ১৯৯৬। দুটি মূল্যায়নের ফল নিম্নরূপ।

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ (প্রথম মূল্যায়ন)

১. মূল্যায়নে বলেছেন :		২,৫৩,০৮৮
ক) ৯-১৪ বছরের শিক্ষার্থী :	২৫,৬৮৩	
খ) ১৫-৫০ বছরের শিক্ষার্থী :	২,২৭,৪০৫	
২. জাতীয় সাক্ষরতা মিশন-নির্ধারিত মান স্পর্শ করেছেন :		১,৯৮,৫১০
ক) ৯-১৪ বছর :	৮৩,১৬২	
খ) ১৫-৫০ বছর :	১,১৫,৩৮৪	
সাফল্যের হার :	৭৮%	

৪ এপ্রিল, ১৯৯৬ (দ্বিতীয় মূল্যায়ন)

১. মূল্যায়নে বসেছে :		৩,৬১,০১৮
ক) ৯-১৪ বছর :	৪৭,৩৬০	
খ) ১৫-৫০ বছর :	৩,১৩,৬৫৮	
২. জাতীয় সাক্ষরতা মিশন নির্ধারিত মান স্পর্শ করেছেন :		২,৮১,২৫৪
ক) ৯-১৪ বছর :	৩৪,৫৭২	
খ) ১৫-৫০ বছর :	২,৪৬, ৬৮২	
সাফল্যের হার :		৭১%

অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের সাফল্যের পর ডঃ পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে বহির্মূল্যায়ন করা হয় ১৪ এবং ১৫ জুন, ১৯৯৭। সাক্ষরোত্তর (পি এল) পর্ব চলার সময় প্রাথমিক সাক্ষরতা (Basic Literacy, BL)-র শিক্ষাকেন্দ্রেও থাকে। সুতরাং মূল্যায়নের সময় দু-রকম মূল্যায়নপত্র তৈরি করতে হয়। একটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে। অন্যটি সাক্ষরোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্যে। মূল্যায়নে শতকরা ৭০ভাগ নম্বর যাঁরা পান তাঁরা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন নির্ধারিত মান স্পর্শ করেছেন বলে গণ্য হন। বহির্মূল্যায়নের চিত্র নিম্নরূপ :

প্রবহমান শিক্ষাপর্বে প্রতি গ্রাম সংসদে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্র চালু হবে কোনও বিদ্যালয়ে, পঞ্চায়েতের ঘরে বা সাধারণ গৃহে। ৯ থেকে ১২টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে হবে একটি গুচ্ছ (Clusts), তাদের মধ্যে একটি হবে মুখ্য প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র (Nodal-CEC)। মোট সি ই সি ও নোডাল সি ই সির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮৫৩ এবং ৩৮২। মোট : ৪২৩৫। সি ই সির কাজ হবে নিম্নরূপ : (১) পাঠাগার (২) পাঠকক্ষ (৩) শিক্ষাকেন্দ্র (৪) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৫) তথ্যকেন্দ্র (৬) চর্চাকেন্দ্র (সভা ও আলোচনার স্থান (৭) বিকাশ কেন্দ্র (সরকারি বিভাগগুলি, পঞ্চায়েত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ কেন্দ্র) (৮) সংস্কৃতি কেন্দ্র (৯) ক্রীড়াকেন্দ্র।

প্রবহমান শিক্ষা (Continuing Education)

সাক্ষরোত্তর পর্বের পর প্রবহমান শিক্ষা পর্ব। এই জেলায় যখন সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি শুরু হয়, তখন জাতীয় সাক্ষরতা মিশন দু-বছরের জন্যে অনুমোদন দিত। এখন সাক্ষরোত্তর পর্ব এক বছরের এবং তা প্রবহমান শিক্ষাকর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান (টি এল সি) কালে শিক্ষার্থী যে সাক্ষরতা অর্জন করে তা ভঙ্গুর। সাক্ষরোত্তর পর্বের পর সে অল্প-বিস্তর স্বয়ম্ভর। এখন সে সাধারণ সহজ বইপত্র নিজে নিজে পড়ে বুঝতে পারবে, নানা পেশায় ও বৃত্তিতে নবার্জিত সাক্ষরতাকে কাজে লাগিয়ে উচ্চতর দক্ষতার অধিকারী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে। প্রবহমান শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্যে একটি আবশ্যিক পদক্ষেপ, যা শেষ পর্যন্ত শিক্ষারত সমাজ সৃষ্টি (learning society) করবে।

এই জেলায় প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা এন এল এম (জাতীয় সাক্ষরতা মিশন) অনুমোদন করেছে। সাক্ষরোত্তর পাঠ শেষ-করা শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়-ছুট ছাত্র-ছাত্রীরা এই কর্মসূচির মধ্যে বিশেষভাবে আসবে। জেলায় সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক স্তর থেকে বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রীর হার শতকরা ৪৫ ভাগ। লক্ষ্যদল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ :

(১) টি এল সি ও পি এল সির নবসাক্ষর	৯,৩২,০৬২
(২) টিএলসি ও পি. এল সি থেকে ছেড়ে যাওয়া	৭৪,৪৮৪
(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়-ছুট	৩,৫৭,৬৫১
(৪) প্রাথমিক-উত্তীর্ণ কিন্তু মাধ্যমিক ছুট	১,৩৫,০২৪
(৫) অধুনা অপ্রচলিত RFLP(Rural Functional Literacy Project)-র শিক্ষার্থী	১,৭০,০৮৪
(৬) অন্যান্য	১,১২,৮৬২
মোট	১৭,৮২,১৩১

জেলার প্রবহমান শিক্ষা কর্মসূচি এখনও প্রাথমিক স্তরে আছে। কাজ সবে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচন এসে যাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবকরা নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আশা করা যায়, নির্বাচনের পুরোদমে কাজ আরম্ভ হবে।

	মোট শিক্ষার্থী	৭০% বা তার বেশি· যাঁরা পেয়েছেন	৫০-৬৯% যাঁরা পেয়েছেন
বি এল	১,৯১,৩৯০	১,৭৭,৯৯২	১৮,০৬৭
পি এল	৩,৯৩,২৫৯	৩,৪০,১৬৯	৪৪,৮৭০
মোট	৫,৮৪,৬৪৯	৫,১৮,১৬১(৮৮.৬%)	৬২,৯৩৭ (১০.৭%)

(সূত্র : Project Report for Continuing Education Programme)

লেখক পরিচিতি : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ডি আর পি। 'জনশিক্ষা প্রসঙ্গে' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য। জনশিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধের লেখক। নবসাক্ষরদের জন্যে দুটি বইয়ের লেখক।

সজল রায়চৌধুরী ও সুবর্ণ দাস

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় নাট্য আন্দোলনের গতি প্রকৃতি

নাট্য আন্দোলন বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি থিয়েটারের আন্দোলন এবং দেশের অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনারও থিয়েটার ইউরোপীয় প্রভাব সঞ্জাত। অষ্টাদশ শতকের শেষে হেরেসিম লেবেডেফ যে বেঙ্গলী থিয়েটার কলকাতায় সুরু করেছিলেন তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল। চার-দেওয়ালে ঘেরা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সুব্যবস্থা যে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন লিপিবদ্ধ রয়েছে 'ভরত নাট্য শাস্ত্র', 'অভিনয় দর্পন' প্রভৃতি গ্রন্থে নানান নিবন্ধে। কিন্তু সেগুলির প্রভাব বঙ্গভূমিতে কতটা পড়েছিল তার বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। বাংলায়, প্রধানত কলকাতায় যে থিয়েটার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার যে অগ্রগতি ঘটে চলেছে তা অবশ্যই ইউরোপীও থিয়েটার কর্মজাত। সংস্কৃত নাটক ও নাট্যকর্ম অনুসরণে বাংলা নাটক লেখা হয়েছিল। নাট্যশালাগুলি সামন্ত প্রভু ও ইংরেজ পরিপোষিত ধণা[illegible] ব্যক্তিদের বাড়ীতে বা বাগান বাড়ীতেই [illegible] কিন্তু পৌরানিক খোলস ছেড়ে [illegible] সামাজিক ও স্বাদেশিক আ[illegible] হয়ে উঠল, তা আর নিছক [illegible] সীমাবদ্ধ রইল না' সম্পদ [illegible] সর্বসাধারণের। এরই ফলশ্রু[illegible] সা[illegible] রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৮৭২)।

রামমোহন রায়ের [illegible] নিবারণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাস[illegible] বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহে[illegible] [illegible]নে বঙ্গীয় সমাজ হয়ে উঠেছিল আথাল পাথাল। [illegible] [illegible]ন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতার আন্দোলনও [illegible] সামন্ত প্রভুরা বা ধনী ব্যক্তিরা থিয়েটারে চেয়েছিলে[illegible] [illegible]নন্দ বিধানেই সীমাবদ্ধ রাখতে। সামাজিকতা ও [illegible] [illegible]রোধা ছিলেন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা। অনস্বীকার্য যে [illegible] [illegible]দেশিক আন্দোলন যখন নাট্যকর্মে ভাষা পেতে থাকল, হয়ে উঠল শানিত তলোয়ারের মত। সুরু হল লড়াই। আন্দোলন ও আনন্দদান হল থিয়েটারের ধর্ম।

দক্ষিণাঞ্চলের প্রগতিবাদী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও প্রণীত হয়নি। কিন্তু সমাজসংস্কার, স্বাধীনতার ও শ্রমজীবী মানুষের শোষণমুক্তি সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবেই গড়ে উঠেছে নাট্য আন্দোলন। এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়েই তামাম ভারতবর্ষের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলায় এবং অবশ্যই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গড়ে উঠেছিল গণনাট্য আন্দোলন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন প্রখ্যাত গীতিকার সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক বহড়ু নিবাসী সলিল চৌধুরী।

বাংলা দেশের বাঙ্গালী কর্তৃক সামাজিক নাটক 'দি পারসিকিউটেড' প্রথম লিখেছিলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষায়। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় যে সমস্ত কুসংস্কার প্রচলিত ছিল এই নাটক তার প্রতিরোধে প্রতিবাদ। নাটকটির বঙ্গানুবাদ হয়েছিল 'গণনাট্য' পত্রিকায়। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের পিতৃনিবাস ছিল বারুইপুর থানার নবগ্রাম-এ।

থিয়েটার এবং থিয়েটার আন্দোলন কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হলেও তার পথিকৃৎ ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হরিনাভির রামনারায়ণ তর্করত্ন। আদি গঙ্গার তীরে কলকাতার সন্নিহিত জনপদে কিছু কিছু গ্রামে টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা প্রচলিত ছিল। সোনারপুর থানার রাজপুর হরিনাভি কোদালিয়া প্রভৃতি অঞ্চল সুখ্যাত ছিল সংস্কৃত শিক্ষার জন্যে। রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা ভাষায় নাটক লিখতেন। সে সব নাটক সংস্কৃত নাট্যকর্মেরই অনুসারী। তাঁর 'রত্নাবলী' নাটক অনুবাদ করতে গিয়েই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু যে কারণে বঙ্গীয় নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে রামনারায়ণ সবিশেষ প্রখ্যাত তা হোলো তাঁর দুটি সামাজিক নাটক রচনার জন্যে। লক্ষ্যনীয় যে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' ও 'নবনাটক' উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সৃষ্ট। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' লেখা হয়েছিল কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে রংপুরের কুন্ডী পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর অনুপ্রেরণায়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর গুণেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় রামনারায়ণ লিখেছিলেন বহু বিবাহ বিরোধী 'নবনাটক'। 'নবনাটক' সফল অভিনয়ের পর উল্লসিত রামনারায়ণ সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন যে 'পলাট' নেই,

নাটক—গোর্কির 'মা' (১৯৭৪) পরিচালনা—রেবা রায়চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, বারুইপুর পরিবেশিত

'পলাট' নেই অর্থাৎ প্লট নেই বলে যারা সমালোচনা করে তারা এসে দেখে যাক। নাটক দুটি পড়ে এবং অভিনয় দেখে পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকেরা নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক ও স্বাদেশিক নাটকের ধর্ম কদাচ ক্ষুন্ন হয়নি।

রামনারায়ণের প্রহসন গুলিও উল্লেখ্য। 'যেমন কর্ম তেমনি ফলের' বিষয় লাম্পট্যের লাঞ্ছনা। 'উভয় সঙ্কটে' বহু বিবাহের দোষ এবং 'চক্ষুদান'এ স্ত্রীর কৌশলে স্বামীর লাম্পট্য ব্যাধির চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নাটকগুলি অভিনীত হয় কলকাতায় রামজয় বসাক, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ও পাথুরিয়া ঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাট্যশালায়।

ঊনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক জাগরণের তিন পুরোধা বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু, কোদালিয়ার দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং তাঁর ভাগিনেয় জয়নগরের শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সোনারপুর অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রগতির আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে সংগঠিত হয়েছিল 'হিন্দুমেলা'। তার অনুসরণে বারুইপুরে সংগঠিত হল চৈত্রমেলা (১৮৭২)। পর পর এই মেলা চার বছর সংগঠিত হয়েছিল। লক্ষ্যনীয় এই যে, মেলাটির নামকরণ সাম্প্রদায়িক হয়নি। প্রথম বছর মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় বারুইপুর রাস ময়দানে।

এই উপলক্ষে দশহাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। সমাবেশে ভাষণ দিয়ে নাট্যকার মনোমোহন বসু বলেছিলেন—"এই মেলা রাধাকৃষ্ণের উৎসবের জন্য নয়, গঙ্গার উদ্দেশ্যেও নয়, পীরের মহিমা সূচকও নয়। এই মেলার উদ্দিষ্ট দেবী তন্ত্রোক্তা নন-পুরাণোক্তা নন। ইহার নাম "উন্নতি"। উন্নতি দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্যই—তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবার জন্যই এই মেলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভূজা। তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে—প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য। 'উদ্যম' নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র বিশেষত শেষোক্ত অস্ত্র দ্বারা দৈত্যপতি 'পরবশ্যতার' বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। দৈত্যরাজের সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ কম্পিত জর জর, পরাস্তপ্রায় তথাপি কি আশ্চর্য! হারিয়াও হারিতেছে না, মরিয়াও মরিতেছে না।" স্মরণীয় যে, তখনও 'বন্দে মাতরম-এর' দশভুজা কল্পিত হয়নি' যদিও ইতিপূর্বে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৬৫)। বারুইপুরে তখন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ১৮৭২ সালেই স্বাদেশিকতার স্মারক 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ হয়েছিল প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় জাতীয় নাট্যশালায়। শাসন নিবাসী ভুবন মোহন মুখোপাধ্যায়, বারুইপুরের নিমচাঁদ মিত্র কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। বারুইপুর থানার সাউথ গড়িয়া নিবাসী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াছবির এক শক্তিমান নায়ক।

শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন কোদালিয়া নিবাসী। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বিশেষত সোনারপুর ও বারুইপুর থানায় সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচারিত হয়েছে। সোনারপুর থানার মালঞ্চ মাহিনগর গ্রামের অধিবাসী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চলে সংগঠিত হয়েছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা। দক্ষিণ

চব্বিশ পরগনায় জাতীয়বাদী আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমিউনিষ্ট নেতা প্রভাস রায়। জয়নগরের কালিদাস দত্ত প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় পথ প্রদর্শক।

দক্ষিণাঞ্চলের প্রগতিবাদী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও প্রণীত হয়নি। কিন্তু সমাজসংস্কার, স্বাধীনতার ও শ্রমজীবী মানুষের শোষণমুক্তি সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবেই গড়ে উঠেছে নাট্য আন্দোলন।

এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়েই তামাম ভারতবর্ষের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলায় এবং অবশ্যই দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গড়ে উঠেছিল গণনাট্য আন্দোলন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন প্রখ্যাত গীতিকার সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক বহড়ু নিবাসী সলিল চৌধুরী। তিনি তখন থাকতেন মামার বাড়ী কোদালিয়ায়। ১৯৪১ সালের প্রথমদিকে বারুইপুরের সজল রায় চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তখন দুজনেই বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র। শ্রীরায় চৌধুরী কলেজ ছাত্র সংসদের সম্পাদক। সলিল চৌধুরী তখনই বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে সুদক্ষ। কিন্তু রায় চৌধুরী আন্দোলন করতেন কলকাতাতেই। সলিল চৌধুরী হরিনাভি অঞ্চলে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গণনাট্য আন্দোলন গড়তে সুরু করেন। গানের স্কোয়াড গড়ে তোলেন কোদালিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদিবাড়ীতে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম শাখা স্থাপিত হয় মালঞ্চ মাহিনগরে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সপক্ষে, মন্বন্তর মহামারীর প্রতিরোধে গণনাট্যসংঘের কর্মীরা নাট্য কর্মকে হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার তেভাগা আন্দোলন, কাকদ্বীপ ডোঙ্গাজোড়ার কৃষক অভ্যুত্থান, শ্রমিক শ্রেণীর সংগাম, এককথায় শোষন মুক্তির সংগ্রামের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল গণনাট্য আন্দোলন। এই কাজ করতে গিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রাম নগর দাপিয়ে বেড়িয়েছেন গণনাট্য শিল্পীরা। কারাবরণও করেছেন। গ্রাম নগরে বেশ কিছু অঞ্চলে সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সাধারণ রঙ্গালয়ে যে সব নাটক মঞ্চস্থ হত তারই অনুকরণ করতেন সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়গুলির শিল্পীবৃন্দ। গণনাট্য সংঘের নাটকগুলি ছিল জীবনমুখী, মৌলিক। তার পরিবেশন ছিল বৈজ্ঞানিক। অভিনয় ছিল বাস্তবানুগ। জীবন সংগ্রাম সঞ্জাত ছিল বলেই শোষিত মানুষ আকৃষ্ট হত বেশী। চার দেওয়ালের গন্ডী ভেঙে সভা সম্মেলনে এবং সাধারণ্যে নাটক পরিবেশনের ফলশ্রুতিতে থিয়েটার অনুরাগী বিরাট দর্শক সমাজ গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৩ থেকে অধুনা কাল পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাবে গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলন। চড়াই উৎরাই সত্ত্বেও গণনাট্য সংঘের অতীত ঐতিহ্য আজও অপরিম্লান।

যাদবপুর, বিষ্ণুপুর, বজবজ, মহেশতলা, সোনারপুর, বারুইপুর, মগরাহাট, ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, জয়নগর, মন্দিরবাজার, ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী প্রভৃতি অঞ্চলে দুশোরও বেশী গণনাট্য কর্মীবৃন্দ বহুবিধ নাট্য সৃজনে এবং গণ চৈতন্য উদ্বোধনে ব্যাপৃত।

তত্রাচ স্বীকার্য যে সর্বসাধারন্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় যাত্রাপালা। থিয়েটার ও ছায়াছবি যাত্রাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করলেও তার কাঠামো আজও অপরিবর্তিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে যাত্রাপালার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। তার ইতিহাস রচনার জন্যে গবেষকদের তৎপর হতে হবে। উল্লেখ্য যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দুই খ্যাতিমান যাত্রাপালাকার হলেন সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রসাদ ভট্টাচার্য।

সাংস্কৃতিক জাগরণ যুগের এবং গণজাগরণের প্রভাব সঞ্জাত গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলন। নানান বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে সেই আন্দোলন আজও বহমান। উদাহরণ স্বরূপ বাংলা থিয়েটারের ২০০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে ১৯শে নভেম্বর' ৯৫ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর সহযোগিতায় রাজপুরের শহীদ দাশুমতি ভবনে ১২০টি নাট্য সংস্থার
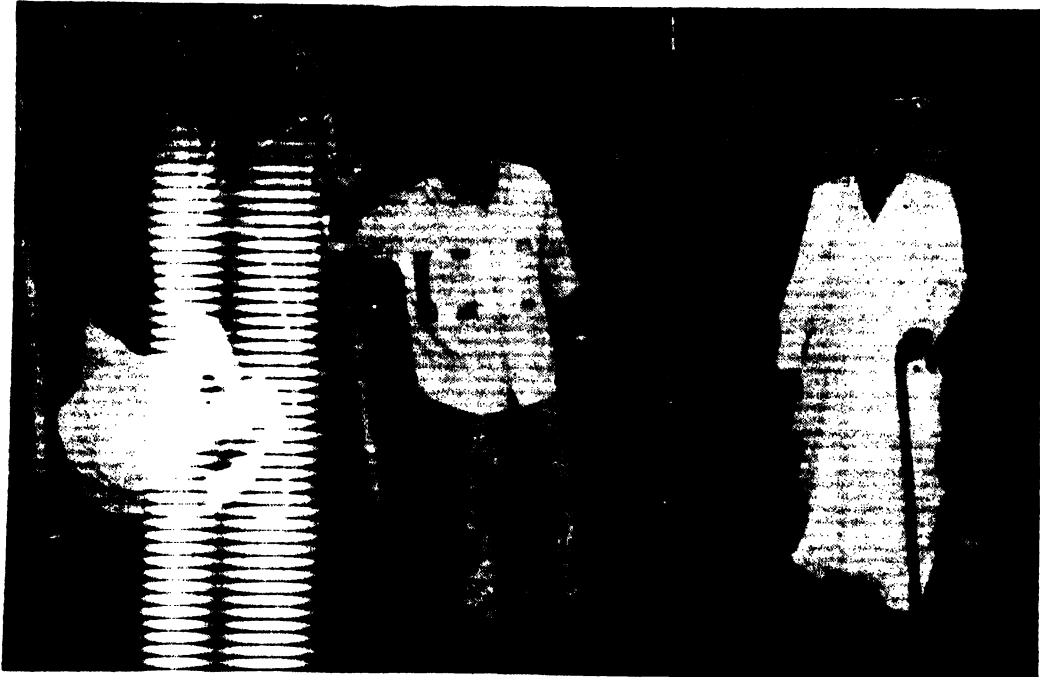
মনোজ মিত্রের না... ...' মিলন সংঘ (বারুইপুর) পরিবেশিত
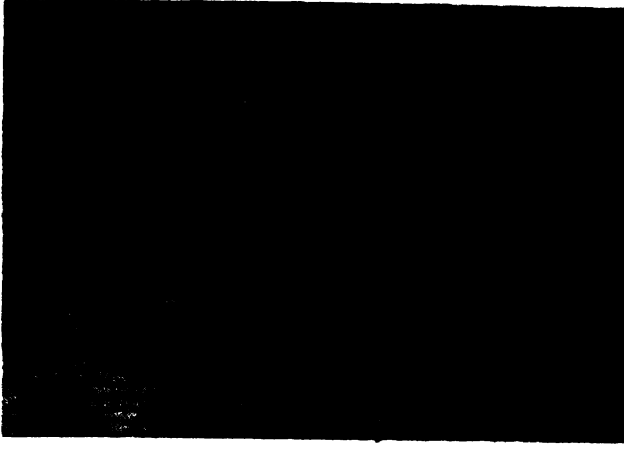
নাট্যকার ও সংগীত শিল্পী সলিল চৌধুরী

৪৬০ জন শিল্পী বন্ধুর উপস্থিতিতে সংগঠিত হল সেমিনার ও সম্মেলন। ২০০ বছর স্মরণে পথ নাট্য উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন ১৫০০ নাট্যশিল্পী। তাঁরা পরিভ্রমণ করেছিলেন ১৫০ কিলোমিটার। কিছুদিন পরে দাশুমতি ভবনেই গণ নাট্য-শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী ও কুমার রায় আলোচনা করেছিলেন। অর্থসাহায্য করেছিলেন নাট্য সংগঠনগুলি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শান্তি ভট্টাচার্য, প্রণতি ভট্টাচার্য, ভদ্রেশ্বর মন্ডল এম এল এ এবং অবশ্যই রাজপুর পৌরসভা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নাট্য আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে যে সব নাট্য সংগঠন কর্মরত সেগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল।

১। বঙ্গনাট্য সমাজ— (হরিনাভি)। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রতিষ্ঠিত।
২। মিলন সংঘ— (বারুইপুর)
৩। বন্ধুসংঘ— ঐ
৪। শিল্পীবৃন্দ— ঐ
৫। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ— ঐ
৬। থিয়েটার পয়েন্ট— ঐ
৭। সময় নাট্য গোষ্ঠী— ঐ
৮। লিটল ষ্টার ড্রামা ইউনিট— ঐ
৯। মদারাট তরুণ সংঘ— ঐ
১০। শরৎ স্মৃতি সংঘ— ঐ
১১। পিপল ন্যারিশ থিয়েটার— ঐ
১২। উন্মেষ— (কালিকাপুর)
১৩। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ— (চম্পাহাটী)
১৪। অচেনা— (সোনারপুর)
১৫। আমরা কজন— (হরিনাভী)
১৬। কল্পলোক— (সোনারপুর)
১৭। কৃষ্টিসংসদ— ঐ
১৮। আবির্ভাব— ঐ
১৯। ইঙ্গিত শিল্পী গোষ্ঠী— (কোদালিয়া)
২০। কথকতা— (সোনারপুর)
২১। অন্য চিন্তা— ঐ
২২। ব্লু-স্কাই— ঐ
২৩। রাজপুর আগামী— ঐ
২৪। সৃষ্টি— (রাজপুর)
২৫। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অয়নশাখা— (সোনারপুর)
২৬। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রাজপুর প্রস্তুতিশাখা— (সোনারপুর)
২৭। ভারতীয় গণনাট্য শাখা— (ঐ)
২৮। আবোল তাবোল— কয়তাবাদ
২৯। শান্তিসংঘ— (বোড়াল)
৩০। কৃষ্টি মন্দির— (গড়িয়া)
৩১। কল্যাণ পরিষদ— (ঐ)
৩২। নানামুখ— (বোড়াল)
৩৩। নবরূপা— (বাঘাযতীন)
৩৪। শিল্পী অঙ্গন— (কানুন গো পার্ক)
৩৫। ভাবা নাট্য সংসদ— (বাঘাযতীন)
৩৬। গণনাট্য সংঘ তরঙ্গ শাখা— (বাঘাযতীন)
৩৭। গণনাট্য সংঘ কল্লোল শাখা— (ঐ)
৩৮। লোক ও শিল্পী শাখা গণনাট্য সংঘ (কলকাতা)
৩৯। সমদের শাখা— গণনাট্য সংঘ— (হালতু)
৪০। সৌভ্রাতা— (হালতু)
৪১। সুরজম— (গড়ফা)
৪২। লিপিএক— (সন্তোষপুর)
৪৩। ছদ্মবেশী থিয়েটার ইউনিট— (হালতু)
৪৪। বাঁশদ্রোণী সব্যসাচী নাট্যসংস্থা— (বাঁশদ্রোণী)
৪৫। কিশলয় শাখা— (গণনাট্য সংঘ) (বাঁশদ্রোণী)
৪৬। অনির্বাণ আর্টস— (বাঁশদ্রোণী)
৪৭। বাঁশদ্রোণী কৃষ্টি পরিষদ— (ঐ)
৪৮। শতদল শাখা (গণনাট্য সংঘ)— (পূর্ব পুটিয়ারী)
৪৯। রক্তলতা— (বাঁশদ্রোণী)
৫০। দৌবারিক— (কানুন গো পার্ক)
৫১। অগ্নি নাট্যম— (বালিয়া)
৫২। অনামী নাট্যসংস্থা— (লেকগার্ডেন্স)
৫৩। মুকুর— (বারুইপুর)
৫৪। ভাঙা-গড়া গোষ্ঠী— (সাউথ গড়িয়া)
৫৫। দুর্গাদাস স্মৃতি সংঘ— (সাউথ গড়িয়া)
৫৬। আনবিক— (সাউথ গড়িয়া)
৫৭। আনন— (ঐ)

৫৮। বারুইপুর আর্ট থিয়েটার—

৫৯। খেয়ালী নাট্যগোষ্ঠী— (রামনগর)

৬০। প্রবাহ নাট্যগোষ্ঠী— (ঐ)

৬১। 'এপিক' থিয়েটার গোষ্ঠী— (দক্ষিণ রামনগর)

৬২। বেপাটরী— (কালিকাপুর)

৬৩। অগ্রণী সংঘ— (বারুইপুর)

৬৪। স্বস্তিকা সংঘ— (ক্যানিং শহর)

৬৫। গণনাট্য সংঘ (মাতলা শাখা) (ঐ)

৬৬। বন্ধুমহল— (ঐ)

৬৭। আরণ্যক শাখা গণনাট্য সংঘ— ছোট মোল্লাখালি

৬৮। দর্পণ— (সাউথ জলখুরা)

৬৯। অম্বেষক— (আকড়া)

৭০। নাট্যচেতনা— (কুমোর পাড়া)

৭১। মহেশতলা থিয়েটার একাডেমী— (কুমোরপাড়া)

৭২। অঙ্কুর— (বাটানগর)

৭৩। সারথী নাট্য গোষ্ঠী— (ব্যানার্জী পাড়া)

৭৪। মতিভ্রম নাট্য গোষ্ঠী— (মহেশতলা)

৭৫। পদধ্বনি— (সরকারপুল)

৭৬। বাটানগর গান্ধার— (সারেঙ্গাবাদ)

৭৭। পঞ্চপ্রদীপ নাট্য সংস্থা— (চট্টালিকাপুর)

৭৮। হায়দাৎপুর মুক্ত মৈত্রী— (বাটানগর)

৭৯। বজবজ সাইলেন্ট থিয়েটার— (বজবজ)

৮০। স্ফুলিঙ্গ— (ঐ)

৮১। অরিন্দম— (ঐ)

৮২। উত্তরণ শাখা— (সাতগাছিয়া) (গণনাট্য সংঘ)

৮৩। বাখরাহাট প্রস্তুতি শাখা (গণনাট্য সংঘ)— (বাখরাহাট)

৮৪। একতা সংঘ— (ঐ)

৮৫। কুরুবক নাট্য সংস্থা (ঐ)

৮৬। বড়িষা সংস্কৃতি প[illegible] (বড়িষা)

৮৭। কিশোর পাঠাগার [illegible] বি[illegible] (সাতগাছিয়া)

৮৮। থিয়েটার এজ— (বিষ্ণুপুর)

৮৯। সম্মিলনী নাট্য গো[illegible] (মহেশতলা)

৯০। থিয়েটার টেন্ট— ([illegible]৪ পরগনা)

৯১। দর্পণ— ([illegible] আই পি নগর)

৯২। এষণা— (জয়নগর)

৯৩। নাট্যজয়ী— (উত্তরপাড়া)

৯৪। সাঁঝের বলাকা— (ঘাটেশ্বর)

৯৫। চৈতন্যপুর সংকে[illegible] (চৈতন্যপুর)

৯৬। রূপায়ণ গোষ্ঠী— (বিষ্ণুপুর)

৯৭। খাকুড়দহ জনকল[illegible] (কৃষ্ণনগর)

৯৮। কৃষ্ণনগর উদয়ন [illegible]— (কৃষ্ণনগর)

৯৯। গণনাট্য সংঘ প্র[illegible] শাখা— (মাধবপুর)

'বাসন্তী নাট্যমন্দির' ১৩০০ বঙ্গাব্দে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাচীনতম নাট্যমঞ্চ: বর্তমানে পরিবর্তিত নাম 'রূপ ও অরূপ' ছবি : সাগর চট্টোপাধ্যায়

১০০। অম্বেষা— (মথুরাপুর)

১০১। গণনাট্য সংঘ, গোচরণ শাখা— (গোচরণ)

১০২। মিলন সংঘ— (জয়নগর)

১০৩। সব্যসাচী মুক্তি সংঘ— (গোচরণ)

১০৪। পল্লিসেবা সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা (অপরূপা নাট্য সংস্থা)— (সরবেড়িয়া)

১০৫। অভিনয় নাট্যসংস্থা— (মজিলপুর)

১০৬। শান্তিপুর জনতা সংঘ নাট্য সংস্থা— (গোচরণ)

১০৭। রূপ ও অরূপ— (জয়নগর)

১০৮। দধীচি— (মথুরাপুর)

১০৯। গাববেড়িয়া যাযাবর নাট্যসংস্থা— (গাববেড়িয়া)

১১০। তিয়াস— (ঘাটেশ্বর)

১১১। তরুণ নাট্যসংস্থা— (গোচরণ)

১১২। শতদল নাট্যসংস্থা— (ইনায়েতপুর)

১১৩। সিদ্ধেশ্বর মিলন সংঘ— (মন্দির বাজার)

১১৪। সুলতানপুর সেবা সংঘের শাখা নাট্য সংস্থা (কালপুরুষ)— (কৃষ্ণনগর)

১১৫। শিল্পী সংসদ— (লক্ষীকান্তপুর)

১১৬। গণনাট্য সংঘ জয়নগর শাখা— (জয়নগর)

১১৭। অঙ্কুর— (জয়নগর)

১১৮। রূপরঙ্গ নাট্য সংস্থা— (রায়দিঘী)

১১৯। গণনাট্য সংঘ (ধামুয়া শাখা)— (ধামুয়া)

বারুইপুর গণনাট্য সংঘের নাট্যাভিনয়

১২০। মগরাহাট প্রগতি শাখা (গণনাট্য সংঘ)— (মগরাহাট)
১২১। গণনাট্য সংঘ (ফোয়ারা শাখা)— (সরিষা)
১২২। গণনাট্য সংঘ (রবি রশ্মি প্রস্তুতি শাখা)
১২৩। দর্পণ— (ডায়মন্ডহারবার)
১২৪। সাত্ত্বিক নাট্য সংস্থা— (ডায়মন্ডহারবার)
১২৫। এল, আর, বি নাট্য সংস্থা— (ডায়মন্ডহারবার)
১২৬। ডায়মন্ড ক্লাব ও লাইব্রেরী নাট্যশাখা— (ডায়মন্ডহারবার)
১২৭। রূপায়ণ— (মগরাহাট)
১২৮। সরিষা থিয়েটার গ্রুপ— (সরিষা)
১২৯। সরিষা সঙ্গীত সমাজ (নাট্য বিভাগ)— (সরিষা)
১৩০। চলন্তিকা (কাঞ্চনতলা)— (বদরতলা)
১৩১। কোরাস থিয়েটার— (রায়দীঘি)
১৩২। প্রভাতসংঘ নাট্য গোষ্ঠী— (কাশীনগর)
১৩৩। গ্রুপ থিয়েটার কোরাম— (সুকান্ত সরনি)
১৩৪। গণনাট্য সংঘ (মুখর শাখা)—(দঃ ২৪ পরগনা)
১৩৫। গণনাট্য সংঘ (সৈকত শাখা)— (কাকদ্বীপ)
১৩৬। গণনাট্য সংঘ (সপ্তমুখী শাখা)—(বকখালি-কাকদ্বীপ)
১৩৭। গণনাট্য সংঘ (দক্ষিণী শাখা)—(কাকদ্বীপ)
১৩৮। গণনাট্য শাখা (গণবাণী প্রস্তুতি)— (কাকদ্বীপ)
১৩৯। শহীদ স্মৃতি নাট্য সংসদ— (কাকদ্বীপ)
১৪০। গণনাট্য সংঘ গণবানী প্রস্তুতি— (কাকদ্বীপ)
১৪১। যুবনাট্য সংঘ— (কাকদ্বীপ)
১৪২। মুকুল নাট্য সংসদ— (কাকদ্বীপ)
১৪৩। গণনাট্য সংঘ (শতাব্দী শাখা)— (নামখানা)
১৪৪। সমকাল নাট্য গোষ্ঠী— (ভাঙ্গড়)
১৪৫। গণনাট্য সংঘ গণবানী প্রস্তুতি—(ভাঙ্গর থানা)
১৪৬। প্রচেষ্টা— (মাধবপুর)
১৪৭। তৌর্যত্রিক (কলা মন্দির)— (সরিষা)
১৪৮। একটি নাটকের দল— (ক্যানিং)
১৪৯। অর্চক— (হালতু)
১৫০। গ্রুপ থিয়েটার— (জোকা)
১৫১। নির্মাণ— (গড়িয়া)
১৫২। আবার থিয়েটার— (রাজপুর)
১৫৩। সাংস্কৃতি পরিষদ— (মালঞ্চ মাহিনগর)
১৫৪। নেতাজী সংঘ— (সাগর)
১৫৫। উদয়ন ড্রামা একাডেমী— (বাঘাযতীন)
১৫৬। সংস্কৃতি চক্র— (গড়ফা)
১৫৭। মিতালী সংঘ ড্রামা ইউনিট— (গড়িয়া)
১৫৮। স্বস্তিকা সংঘ— (জোকা)
১৫৯। উত্তরসূরী— (লস্কর পুর)
১৬০। অঙ্কুর— (বারুইপুর)
১৬১। তির্যক— (ঐ)
১৬২। মিশারী— (বারুইপুর)
১৬৩। প্রতীক— (ঐ)
১৬৪। দি পিপল্ থিয়েটার— (ঐ)
১৬৫। মজলিশ— (ঐ)
১৬৬। চতুর্মুখ— (ঐ)
১৬৭। হলিডে ক্লাব— (ঐ)

১৬৮। অনামী গোষ্ঠী— (বজবজ)
১৬৯। কিশুলয় নাট্যগোষ্ঠী— (দক্ষিণ দুর্গাপুর)
১৭০। শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যম— (বারুইপুর)
১৭১। নবারুণ কালচারাল ইউনিট— (রাজপুর)
১৭২। শপথ— (সোনারপুর)
১৭৩। নাট্যবীথি— (পাশ্চাত্তপাড়া)
১৭৪। যুবনাট্য গোষ্ঠী— (সোনারপুর)
১৭৫। প্রতিবাদ— (ঐ)
১৭৬। কেতন— (ঐ)
১৭৭। কল্লক— (সুভাষগ্রাম)
১৭৮। নান্দনিক— (মালঞ্চ)
১৭৯। সংকেত— (ঐ)
১৮০। সরণি— (গড়ফা)
১৮১। সাংস্কৃতিক সম্মিলনী— (সন্তোষপুর)
১৮২। উন্মেষ— (কালিকাপুর)
১৮৩। থিয়েটার সার্কেল
১৮৪। সবুজ সংঘ— (বারুইপুর)
১৮৫। কর্মিবৃন্দ— (ঐ)
১৮৬। প্রভাত সমিতি— (লাঙ্গলবেড়িয়া)
১৮৭। সংস্কৃতি পরিষদ— (রথতলা)
১৮৮। ক্রান্তিক— (জয়নগর)
১৮৯। বন্ধু সংঘ— (ঐ)
১৯০। মিত্র সংঘ— (ঐ)
১৯১। শান্তি সংঘ— (ঐ)
১৯২। অভিনেত্রী সংঘ— (ঐ)
১৯৩। বাটানগর আর্ট থিয়েটার— (বাটানগর)
১৯৪। হাতিয়ার— (ঐ)
১৯৫। ত্রিতয় রথতলা— (নুঙ্গি)
১৯৬। গণনাট্য সংঘ
(অগ্নিবীণা প্রভৃতি শাখা)— (মুথরাপুর)
১৯৭। গণনাট্য সংঘ (রুদ্রবীণা শাখা)— (ন্যাতড়া)
১৯৮। আন্তরিক যুগান্তর (...২)
১৯৯। কামারপোল অ্যাথ... (কামারপোল)
২০০। কামারপোল (ইয়ং ...ইটে...)—
(সরিষা)
২০১। বীণাপানি সংঘ— (...সাহেব আবাদ)
২০২। গণেশ নগর লক্ষ্মী ...রণ ... (নামখানা)
২০৩। সরিষা ইয়ংস্টারস ... —(সরিষা)
২০৪। সাগর কপিল সমা... নাট... —(সাগর)
২০৫। সংযোজ— (আমতলা)
২০৬। প্রগতি নাট্যসংস্থা (কাশীনগর)
২০৭। মানখন্ড তরুণ সং... (...য়মন্ডহারবার)
২০৮। শিল্পী সম্মেলনী— (...ায়মন্ডহারবার)
২০৯। দিশারী— (ঐ)
২১০। বিশ্বরূপা নাট্য স... (...ায়মন্ডহারবার)
২১১। বান্ধব সম্মিলনী নাট্যগোষ্ঠী— (সরিষা)
২১২। ঐকতান— (ঐ)
২১৩। মিলন সংঘ— (ঐ)
২১৪। ইঙ্গিত— (ঐ)
২১৫। বলাকা থিয়েটার গ্রুপ— (ডায়মন্ডহারবার)
২১৬। প্রগ্রেসীভ ড্রামা ইউনিট— (সরিষা)
২১৭। ভ্রাম্যমাণ নাট্যসংস্থা— (ডায়মন্ডহারবার)
২১৮। কেয়ারী বানী মন্দির নাট্যসংস্থা—
(ডায়মন্ডহারবার)
২১৯। অবতার— (মন্দির বাজার)
২২০। ব্যতিক্রম নাট্যগোষ্ঠী— (বেহালা)
২২১। যাত্রী— (বাটানগর)
২২২। সমকাল— (জোকা)
২২৩। শুভময় সমিতি— (হরিশপুর)
২২৪। টি. জে. এস. নাট্য সংস্থা— (ডাঃ হারবার)
২২৫। মালঞ্চ নাট্য সংস্থা— (কৌতলা)
২২৬। পঞ্চম— (নেতড়া)
২২৭। সমবেত প্রয়াস— (বজবজ)
২২৮। পথিক নাট্যসংস্থা— (কুলপী)
২২৯। সুন্দরবন ইউথ অ্যাসোসিয়েশন— (কাকদ্বীপ)
২৩০। পথিক নাট্যগোষ্ঠী— (কুলপী)
২৩১। সুন্দরবন ইউথ অ্যাসোসিয়েশন— (কাকদ্বীপ)
২৩২। রামগোপাল নাট্যসমাজ— (কাকদ্বীপ)
২৩৩। নাট্যচক্র— (বারুইপুর)
২৩৪। কৃষ্টি— (গড়ফা)

কৃষ্টি সংসদ (সোনারপুর) পরিবেশিত 'দূরবীন'
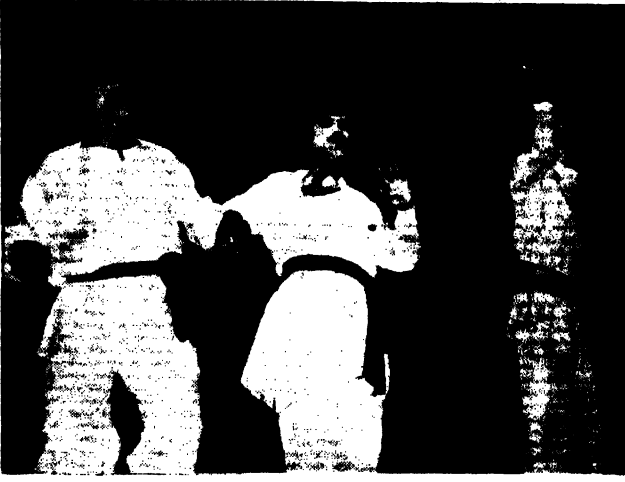
'অশনি নাট্যম'-এর সত্যরাজার দেশে

২৩৫। উত্তরসূরী— (বাটানগর)
২৩৬। সপ্তডিঙ্গা— (বারুইপুর)
২৩৭। গণচেতনা— (ঐ)

(এই তালিকাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা নাট্যোৎসব ও প্রদর্শনীর (১৯৯৯) স্যুভেনির থেকে গৃহীত।)

গ্রামীন মেলা ও উৎসবগুলিও জেলার নাট্য আন্দোলনে সঞ্চার করেছে বেগ ও আবেগ। যেমন,

পীরসাহেবের মেলা—(ভাঙর)। কৃষি ও গ্রামীন মেলা (সুন্দরবন)। রাসমেলা ও নেতাজী মেলা (বাসন্তী বাজার)। গ্রামীন সংস্কৃতি মেলা (আমতলা)। জয়রামপুর মেলা (বিষ্ণুপুর)। সাঁজুয়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েসনের বইমেলা, নেতাজী মেলা (হরিনাভি), বজবজের রায়পুরের স্বদেশী মেলা, শিশু মেলা ও প্রদর্শনী (বাওয়ালী দক্ষিণ), নজরুল মেলা (ডাঃ হারবার), গঙ্গা সাগর জাতীয় মেলা (সাগর), গঙ্গাপূজার মেলা (ফলতা), সুন্দরবন মেলা (ক্যানিং), সুন্দরবন যুবমেলা (তালদি), বিজ্ঞান মঞ্চ প্রদর্শনী ও মেলা (ক্যানিং), আলিদার বনবিবির মেলা (মগরাহাট), গ্রামীন মেলা (বারুইপুর), ধন্বন্তরীর মেলা (জয়নগর), গোসাবা থানার হরিশপুরের ভাদ্রমেলা (গোসাবা থানা), আনন্দমেলা (ঠাকুর পুকুর, মহেশতলা), কাশীনগরের গ্রামীন সাংস্কৃতি মেলা (মথুরাপুর)। এই সব পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাট্যকের অভিনয় স্থানীয় মানুষের মনে সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ঘটায়। কখনো কখনো সংগঠকরা নাট্য প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন।

কলকাতার অনুসরণে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও কয়েকটি নাট্য মঞ্চ বা নাচঘর স্থাপিত ছিল। যতটুকু জানি বারুইপুরে রাজবল্লভ মঞ্চ, জয়নগরের ক্ষেত্রমিত্রের মঞ্চ (যা এখন রূপ ও অরূপ মঞ্চ নামে খ্যাত) তারই নিদর্শন। প্রভৃত যে মাদারাটের মুখার্জী বাড়ীতে ও সাউথ গড়িয়ায় দুর্গাদাস ব্যানার্জীদের বাড়ীতে নাটমঞ্চ ছিল। বর্তমানে ডায়মন্ডহারবার ও বারুইপুরে আছে 'রবীন্দ্র ভবন'। রাজপুরে দাশুমতি ভবন ও ব্লু-স্কাই প্রতিষ্ঠিত উৎপল মঞ্চ। বজবজ লাইব্রেরীতে আছে একটি মঞ্চ। এছাড়া যাদবপুর সংস্কৃতি চক্রের মত কয়েকটি ছোট ছোট হল আছে যেখানে নাট্যকলা পরিবেশন করা যায়। বারুইপুরে নিউ ইন্ডিয়ান গ্রাউন্ডের পাশে সৈন্যদের পরিত্যক্ত একটি ছোট হলে নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ছোট প্রেক্ষাগৃহের নাম ছিল 'পঙ্কজ'

পঙ্কজ-এর উদ্বোধন উপলক্ষে একটি চিঠি সবিশেষ প্রাসঙ্গিক।

শুভেচ্ছা

'পঙ্কজ' ১১।১।৭৩
বারুইপুর

আগামী ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৩ বারুইপুর বড়কুঠি প্রাঙ্গণে 'পঙ্কজ' মঞ্চের উদ্বোধন হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটি শুভ সংবাদ। এবং সময়োপযোগী, কারণ বাংলা সাধারাণ নাট্য শালার শতবর্ষপূর্তি হয়েছে গত ৭ই ডিসেম্বর'৭২। আপনাদের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, এই কামনা করি।—

ইতি—
ভবদীয়—
শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী।

মদারাট স্কুল প্রাঙ্গণে ক্ষীরোদ প্রসাদ উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরী হয়েছে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। একথা স্বীকার করতেই হবে যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে নাট্য আন্দোলনের বিকাশে নানা বিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মনীষীদের নামে প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠা, দান অনুদান পুরস্কার প্রদান, নাট্য প্রতিযোগিতা ও নাট্যোৎসবের আয়োজন প্রভৃতি নানা বিধ কার্যক্রমের অন্তর্গত। সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগও নাট্য প্রতিযোগিতা ও উৎসব করে থাকেন।

উনবিংশ শতকে নাট্য আন্দোলনে যে জোয়ার এসেছিল, নাট্য নিয়ন্ত্রণের (১৮৭৬) ফলে স্তিমিত হয়েছিল। হয়ে পড়েছিল বাণিজ্য ভিত্তিক। বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের ফলে গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালের গ্রুপ থিয়েটার। গ্রুপ থিয়েটারও ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি অংশে সীমাবদ্ধ। আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করছে বাণিজ্যিক সংগঠনগুলি। পরিবেশিত হচ্ছে কল্পনা-বিলাস। গণমাধ্যম গুলিতে নৃসংশতা, যৌনতা, অপসংস্কৃতির নিরন্তর প্রচার চলেছে। এর বিরুদ্ধে কিছু কিছু সংগঠন সচেষ্ট থাকলেও সেই চেষ্টা সংগঠিত নয়, শক্তিশালী নয়। জাতীয় সম্প্রীতি ও সংহতি আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। নাট্যকর্মের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করতে হবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু তার ক্ষমতা সীমিত। নাট্য সংগঠনগুলির পরিকল্পিত এবং সংগঠিত আন্দোলনই সুস্থ গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গভীরে গতি সঞ্চার করতে পারে। বিশ্বায়ন ও বাজার সংস্কৃতির সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কলুষিত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানোই আজকের নাট্য আন্দোলনের ধর্ম হওয়া উচিত।

লেখক পরিচিতি : সজল রায়চৌধুরী—বিশিষ্ট নাট্যকার অভিনেতা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত।

সুবর্ণ দাস—ক্যালকাটা গার্লস বি. টি. কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধকার।

শমিত ঘোষ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ বিজ্ঞান আন্দোলন

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ সাল, দুপুর ২-৩০ মিনিট, স্থান—বাঘাযতীন স্টেশন রোড। আমরা ৪ জন অল্প বয়েসী ছাত্র রাস্তায় আমাদের পাড়ায় এবং যতদূর পর্যন্ত আমরা গেছি—মানুষ রাস্তায় নেই, বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। দুপুর রোদে তেষ্টার জল চাইলে দেবার কেউ নেই, ভাবছেন কি ব্যাপার? শীতের দুপুরে এই রকম চিত্র হবার নয়। না, সেই সময় কোনও যুদ্ধ লেগেছে বলে নিশ্চয়ই মনে পড়ছে না। সরকার বাহাদুর কার্ফু ডেকেছেন তাও না; তা হলে কি? একটু খোলসা করি। ওই দিন ছিল "সূর্যগ্রহণ"। হ্যাঁ ঠিক এই রকম অবস্থাই হয়েছিল। মানুষ ভয়ে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেননি। আমরা যারা কয়েকজন বিজ্ঞান ক্লাব করি, রাস্তায় বেরিয়েছি, চোখের সতর্কতা নিয়েই, ওই অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছি। মানুষকে দেখার জন্য বলেছি। বোঝাতে সেদিন পারিনি।

১৯৯৫ সাল—২৪ অক্টোব[illegible] [illegible]ন-ডায়মন্ডহারবার, সময় ১টা, সেই [illegible] আমরা ৪ জনের ৩ জন রা[illegible] [illegible] পরিবেশ, চিত্র অন্য। [illegible] ডায়মন্ডহারবার ঢুকেছে কিছুম[illegible] কাতারে-কাতারে মানুষ আসছেন [illegible] সময় অজস্র বাইক, গাড়ি, ম্যাটা[illegible] ডায়মন্ডহারবারে ঢুকছে মানুষ [illegible] হলাম প্রশাসনকে বলতে ডা[illegible] ঢোকার আগে গাড়িগুলোকে [illegible] লোকে লোকে ছয়লাপ। ব্যাপার [illegible] [illegible]লা "পূর্ণ সূর্যগ্রহণ" দেখতে মানুষ আসছেন। প্রাকৃতি[illegible] [illegible] হতে সমস্ত সংস্কার-কু-সংস্কারকে ঠেলে ফেলে। শুধু [illegible]ই ওই দিন কয়েক লক্ষ মানুষ এসেছিল।

এটাই হচ্ছে দুটি ঘটনার [illegible] [illegible]আমাদের জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনের [illegible] [illegible]য়েছে। মানুষ কিছুটা হলেও কু-সংস্কার মুক্ত হয়েছেন। এটা সম্ভব হল কেন? অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ হল ধারাবাহিক বিজ্ঞান আন্দোলন। জেলায় ১৯৮০ সালের আগে থেকেই ছিল বেশ কিছু বিজ্ঞান ক্লাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কি করত এরা? কোনও উৎসাহী শিক্ষক, অধ্যাপক বা ছাত্রর উৎসাহে গড়ে উঠত বিজ্ঞান ক্লাব। আমরা অনেক রকম ক্লাব জানি, সংস্কৃতি, খেলা, নাটক ইত্যাদির। বিজ্ঞান ক্লাব সেটা কি? কিইবা এদের কাজ? বিজ্ঞানের মতো জটিল বিষয় নিয়ে একটি ক্লাব? এদের নির্দিষ্ট কোনও কাজ ছিল না, মূলত বিজ্ঞানের মডেল তৈরি করা, বিজ্ঞান মেলায় যোগদান, মাঝে মাঝে আলোচনা সভা। কেউ কেউ এলাকার পরিবেশ, স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি নিচ্ছে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছে। অভাব প্রয়োজনীয় লোকবলের, অর্থের। নিজেদের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই, এর মধ্যে ভালো কাজ করছে এমন ২-১টি সংগঠনের নাম করা যায়। যেমন—গোবরডাঙায় রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, বাঘাযতীনে অনুসন্ধানী বিজ্ঞান সংস্থা, কাঁচড়াপাড়ায় বিজ্ঞান দরবার, মহেশতলায় মহেশতলা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ, যাদবপুরে যাদবপুর বিজ্ঞানচক্র, সোনারপুরে সোনারপুর বিজ্ঞান পরিষদ, অশোকনগরে প্রগ্রেসিভ সায়েন্স ক্লাব ইত্যাদি। চেষ্টা করল গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে। গোবরডাঙায় হল প্রথম বিজ্ঞান ক্লাবদের নিয়ে সম্মেলন। তৈরি হল 'EASTERN INDIA SCIENCE CLUB ASSOCIATION' কিছুদিন চলল, বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি হল। কিন্তু দানা বাঁধল না। ১৯৮৩ সাল গড়িয়া দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে ১১-১৪ মার্চ এস, এফ, আই-এর ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন, হলো বিজ্ঞান মেলা। প্রায় সমস্ত বিজ্ঞান ক্লাবের উপস্থিতিতে। পরবর্তীতে কল্যাণীতে ছাত্র-যুব উৎসব হল বিজ্ঞান মেলা। বিজ্ঞান ক্লাবগুলি

> **১৯৮৭ সাল। সর্বভারতীয় 'জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠা'। আমাদের জেলায় তিনটি স্থানে অনুষ্ঠান হল—যেমন গড়িয়া দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে, বারুইপুর মদারাট একাডেমি স্কুলে ও মহেশতলায় বাটা ক্লাবে। আয়োজনে বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান মঞ্চ। মানুষের অংশগ্রহণ অভূতপূর্ব। বিজ্ঞান আন্দোলন নতুন মাত্রা পেল।**

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিজ্ঞান আন্দোলন

নিজেদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার কথা বললেন। ১৯৮৬ সাল। সল্টলেক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হল রাজ্যের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান মেলা। লক্ষ লক্ষ মানুষ এলেন। মানুষের ঢলে ১ দিন মেলা বন্ধ করতে বাধ্য হলাম। তা না হলে বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাসে ওই দিন বহু মানুষের মৃত দেহের দ্বারা কলঙ্কিত হত। মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে এত আগ্রহ। এখানে আবার আলোচিত হল বিজ্ঞান ক্লাবের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা। পাশাপাশি অনেক সংগঠন, ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী চাইছিলেন রাজ্যে সংগঠিত বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে উঠুক।

১৯৮৬ সালের ২৯ নভেম্বর মৌলালী যুবকেন্দ্রে কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল বর্তমান ভারতের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞান সংগঠন—"পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ"। যার শুরুর ইতিহাসে আমাদের জেলার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৮৭ সাল। সর্বভারতীয় 'জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠা'। আমাদের জেলায় তিনটি স্থানে অনুষ্ঠান হল—যেমন গড়িয়া দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে, বারুইপুর মদারাট একাডেমি স্কুলে ও মহেশতলায় বাটা ক্লাবে। আয়োজনে বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান মঞ্চ। মানুষের অংশগ্রহণ অভূতপূর্ব। বিজ্ঞান আন্দোলন নতুন মাত্রা পেল।

আর পিছিয়ে পড়তে হয়নি। সামনে এগিয়ে যাওয়া। পরবর্তীতে "ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠা"—এই আন্দোলনের আর একটি পালক। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় জাঠার যাত্রা শুরু হল সাগর ব্লকের ঘোড়ামারা দ্বীপ থেকে। উদ্দেশ্য ঘোড়ামারা দ্বীপের ভাঙনের কথা, সেখানকার মানুষের সমস্যার কথা সারা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরা। এর মধ্যেই ঘোড়ামারা দ্বীপের ভাঙনের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক দিলীপ বসুর নেতৃত্বে বিজ্ঞান মঞ্চের দল গেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিজ্ঞান আন্দোলন মানুষের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাধানের পথ খুঁজছে। নতুন বিষয়, এভাবে বিজ্ঞান আন্দোলন আগে ভাবেনি। বিজ্ঞান মঞ্চের ছেলেরা কাজ সৃষ্টির নতুন দিক খুঁজে পেল। এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করার চেষ্টা হল। তার সমাধানের বৈজ্ঞানিক বিষয় ভাবা হল। এর সঙ্গে সঙ্গে চলল মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলা।

মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা। মানুষকে সমাজ সম্পর্কে, ঘটনার কার্য-কারণ বিশ্লেষণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কাজ। অন্ধ কু-সংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করার কাজ। জেলার মধ্যে ১০-১২টি দল তৈরি হল। গ্রামে, হাটে-বাজারে, বিদ্যালয়ে এরা কু-সংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান শুরু করল। বিভিন্ন কু-সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করল। সঙ্গে-সঙ্গে হাতে কলমে কিছু ঘটনা করেও দেখাল। যেমন—ন্যাবার মালা, জল পড়া, থালা পড়া, আগুনের উপর হাঁটা, শূন্যে ভাবা, আগুন খাওয়া, বাণ মারা ইত্যাদি। প্রতিটি অনুষ্ঠান মানুষ আগ্রহভরে দেখল, প্রশ্ন করল। মানুষ বিজ্ঞান

আন্দোলনকে গ্রহণ করতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও বাড়তে থাকল। বারুইপুরের কাছে গোবিন্দপুরে ডাব বাবা সবার রোগ ভালো করছেন ডাবের জল দিয়ে। মানুষ এলেন আমাদের কাছে, প্রবীর ঘোষ সহ আমরা গেলাম, কাতারে কাতারে মানুষ দেখলাম ডাবের জল নিচ্ছেন। সে দিন ফিরে এলাম স্থানীয় মানুষকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ প্রচার শুরু হল। মানুষ ভুল বুঝতে পারল। বন্ধ হল ডাব বাবার খেলা।

বিজ্ঞান আন্দোলনের সামনে এলো পরিবেশ রক্ষার কাজ, গাছ লাগানোর কাজ, নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য রক্ষার কাজ, সুন্দরবনের Forest Protection Group তৈরির কাজ। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মঞ্চ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়ে। পাশাপাশি চলল, বিজ্ঞান আন্দোলনের আঙিনায় সমস্ত স্তরের মানুষকে যুক্ত করার কাজ, জেলায় প্রথম বিদ্যালয়-স্তরে বিজ্ঞান ক্লাব গঠন হল গড়ফা ডি. এন মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে। এলাকায়-এলাকায় বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান মঞ্চের শাখা তৈরি হল। সুন্দরবনের সাতজেলিয়া সায়েন্স ক্লাব, গঙ্গাসাগরে বিজ্ঞান মঞ্চের শাখা থেকে শুরু করে ক্যানিং বারুইপুর (সাওদার্ন সায়েন্স ক্লাব), মহেশতলা, বাওয়ালী এদিকে যাদবপুর, সোনারপুরে বিজ্ঞান ক্লাব বা বিজ্ঞান মঞ্চের শাখা কাজ শুরু করল। বহু মানুষ যুক্ত হলেন বিজ্ঞান আন্দোলনে।

আরো অনেক বিষয় এলো বিজ্ঞান আন্দোলনের সামনে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হল বিজ্ঞান আন্দোলনের পক্ষ থেকে। 'স্বল্প ব্যয়ে মাটির বাড়ি'—প্রকল্প রূপায়িত হল মহেশতলা ও সোনারপুরে। কৃষকদের স্বার্থে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু করা হল। বিজ্ঞান মঞ্চের বিভিন্ন প্রকাশনা বিক্রি শুরু করা হল। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা, বিজ্ঞান মেলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের সাড়া, আগ্রহ অসীম। শারদ উৎসবে পত্র-পত্রিকার স্টল করল বিজ্ঞান মঞ্চ ও বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা। এর সঙ্গে যুক্ত হল বিভিন্ন দিবস পালন, জাতীয় বিজ্ঞান দিবস, পরিবেশ দিবস, হিরোসিমা দিবস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এইভাবেই ধীরে ধীরে বিজ্ঞান আন্দোলন আমাদের জেলায় এগিয়ে চলল। জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের উন্নতি রাজ্য সরকারকে আগ্রহী করে তুলল জেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি গড়ে তুলতে। রাজ্যের প্রথম যে ৫টি জেলায় এই কমিটি হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তার মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে আলিপুর জেলা পরিষদে এই কমিটি এবং জেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপদেষ্টার দপ্তর, এই দপ্তর জেলায় বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন বিদ্যালয়, ক্লাব সংগঠনকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দিচ্ছে। এই কমিটির উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে যেমন সুগন্ধী ঘাসের চাষ এই সম্পর্কে জেলার মানুষকে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কোথাও-কোথাও এই সুগন্ধী ঘাসের চাষ শুরু হয়েছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে এই ঘাসের চাষ শুরু করেছে। বারুইপুরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি খামারে ঘাসের চাষ ও ডিস্টিলেশন প্লান্ট বসেছে। ঔষধি গাছের চাষ নিয়েও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ডায়মন্ডহারবার, লস্করপুর ও বোড়ালে ঔষধি গাছের বাগান, পরীক্ষাগার, প্রচার স্থান ও বিক্রয় স্থান এর কাজ শুরু হয়েছে। এই ধরনের কাজ রাজ্যের মধ্যে প্রথম শুরু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। কৃষকদের জন্য শস্যদানা সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছে ডায়মন্ডহারবারের কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারদ্রোনি এলাকায় ও বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রামে। বারুইপুরে জেলার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মালীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফুল, ফল এবং কৃষি দ্রব্য ছিল এই প্রশিক্ষণের বিষয়। বাসন্তীর হাড়ভাঙা গ্রামে মেয়েদের একটি সমবায় কেন্দ্রের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা
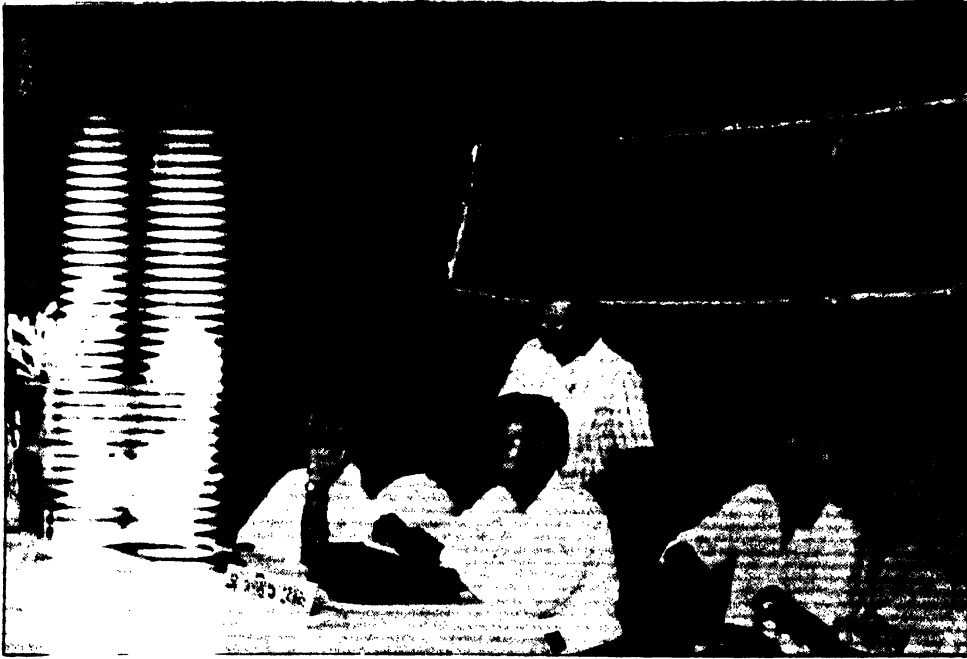
দক্ষিণ ... প... বিজ্ঞান আন্দোলন, আলোচনা সভা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিজ্ঞান আন্দোলন, জন সমাবেশ

হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সহযোগিতায়। বাসন্তীর ফুল মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়িয়া গ্রামে আদিবাসীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে S.S.F/H.R.F প্রকল্পের সাহায্যে। সাগর দ্বীপকে সৌর দ্বীপে পরিণত করার কাজ শুরু করেছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউএবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (W.B.R.E.D.A) এই কাজের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে সাগর দ্বীপের ৩০ হাজার পরিবারের সার্ভের কাজ করে বিজ্ঞান মঞ্চ ও সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল যৌথভাবে।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, জলবাহিত রোগ, ডায়ারিয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞান আন্দোলন যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে চলেছে। মানুষকে সুস্থ রাখার স্বার্থে, যত্র-তত্র মল মূত্র ত্যাগ না করা প্রয়োজন, এ বিষয়ে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প খরচে বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগার বসানোর কাজ চলছে জেলার বিভিন্ন ব্লকে ইউনিসেফ ও জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন এন, জি. ও, ও বিজ্ঞানমঞ্চ এই কাজে যুক্ত।

জল দূষণের ক্ষেত্রে আমাদের জেলার মূল সমস্যা আর্সেনিক দূষণ। এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান আন্দোলন তার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে।

কয়েকটি ব্লকে ও পৌরসভা অঞ্চলে সার্ভে হয়েছে, করছে সুইড, বিজ্ঞান মঞ্চ, অল ইন্ডিয়া ইনটিটিউট অব পাবলিক হেল্থ অ্যান্ড হাইজিন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রন সেন্ট্রাল স্টাডিজ, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে (গড়িয়া) জেলার কেন্দ্রীয় আর্সেনিক পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বারুইপুরে আর্সেনিক দূষণ যুক্ত দুটি গ্রাম-পঞ্চায়েত শেখরবালী ও বিন্দাখালীতে পুকুরের জলশোধন করে খাওয়ানোর ইউনিট বসানো হয়েছে।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে বিদ্যালয় স্তরে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান পরীক্ষা। এর মধ্যে বিজ্ঞানমঞ্চ পরিচালিত "বিজ্ঞান অভীক্ষা," সায়েন্স টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরীক্ষা, ভূগোল মঞ্চের পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। কৃষকদের সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি নিচ্ছে বিজ্ঞানমঞ্চ। ইতিমধ্যে কাকদ্বীপ, কুলতলী ও ক্যানিং-এর আমড়াবেড়িয়াতে কৃষকদের নিয়ে কর্মশালা হয়েছে।

জেলায় জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে- জেলা "জনস্বাস্থ্য চেতনা প্রসার সমিতি" গঠন হয়েছে অতিসম্প্রতি। যার কাজ হবে জেলার মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা, বর্তমান সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সদব্যবহার করা এবং রোগ প্রতিরোধ করা।

সাংস্কৃতিক মাধ্যমকে বিজ্ঞান আন্দোলনে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলার গণনাট্য সংঘ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল, নাট্য দল, তরজা দল, পুতুল নাচের কর্মীদের নিয়ে একটি জেলা ভিত্তিক "বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক সমন্বয় সমিতি" ও গঠন হয়েছে অতি সম্প্রতি। তারাও কাজ শুরু করেছে মানুষের মধ্যে কু-সংস্কার দূর করার লক্ষ্যে।

ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা সুন্দরবন অঞ্চলে ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থা ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। সাপ সম্পর্কে মানুষের সংস্কার দূর করার লক্ষ্যে। সর্প দংশনের ক্ষেত্রে ওঝার বদলে চিকিৎসা করানোর এবং সর্প দংশনের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এরা কাজ করছে। সামগ্রিকভাবে দেখা যায় বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্র দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে। মানুষ সচেতন হচ্ছেন, আর তার ফলশ্রুতি আমরা পেয়েছি পূর্ণ সূর্যগ্রহণে, অথবা উল্কা পতনের সময় সারা রাত মানুষের রাস্তায় অপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে।—এই কারণে গণেশের দুধ খাওয়া জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে দাগ কাটতে পারেনি। তাই বলে কি সমস্ত মানুষের পরিবর্তন হয়েছে। মোটেই না। বিজ্ঞান-সচেতনতা বাড়ছে একটু একটু করে—উপরোক্ত ৩টি বিষয় তার বড় প্রমাণ।

যে কাজ বিদ্যাসাগর শুরু করেছেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানী শুরু করেছেন—আমাদের জেলার মানুষ তাকে ধরে রেখে এগোতে চাইছেন।

"বিজ্ঞানের একটি বিন্দু ঘোচায় অজ্ঞতার সিন্ধু"—এই বীজ মন্ত্রকে মাথায় রেখেই বিজ্ঞান আন্দোলনে আমরা সবাই এগোতে চাই।

"প্রকৃতিতে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট সম্পদ আছে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের লোভ মেটানোর পক্ষে তা খুবই কম।"

—*মহাত্মা গান্ধী*

*"আমি সব সময়ে মনে করি যে, আমাদের দেশের বিজ্ঞানী লেখকদের শুধু বিজ্ঞান জানলে চলবে না, তাদের চেষ্টা করা চাই যারা বিজ্ঞান বোঝে না তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে। এবং সেইমত একটা ভাষা সৃষ্টি করা তাদের দায়িত্ব।"

—*সত্যেন্দ্রনাথ বসু*

লেখক পরিচিতি ঃ বিজ্ঞান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ঃ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা সম্পাদক

সুমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
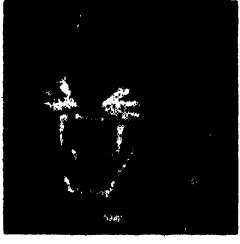
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্বাস্থ্যচিত্র

সময়টা ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি এক বর্ষা কাল। হঠাৎই জ্বরে পড়লেন ডায়মন্ডহারবার মহকুমার বড়িয়া গ্রামের রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন দশ গ্রামে একজনই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক। খবর পেয়ে দুর্গম কর্দমাক্ত পথে পালকি করে এসে পৌঁছলেন বটে কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে করলেন ম্যালেগনান্ট ম্যালেরিয়া। তবে যতই মনে হোক রক্ত পরীক্ষা না করে ত' আর সেদিনের এই রোগের জীবনদায়ী ওষুধ কুইনাইনের ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশান দেওয়া যায় না। কিন্তু রক্ত পরীক্ষা! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি ত' আকাশ কুসুম কল্পনা। সুতরাং রক্তের নমুনা নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায় আর স্টিম ইঞ্জিনে টানা ট্রেন ও অঝোর বর্ষায় পাঁচ মাইল কাদা ভেঙে রিপোর্ট এসে পৌঁছাবার পূর্বেই শেষ নিশ্বাস ফেললেন [illegible] রোগী। আপনারা বলবেন এ ঘটনা [illegible] আগের, কিন্তু ছবিটা একটু [illegible] হ'লেও প্রায় একই রকম ছিল [illegible] পর্যন্ত। আর আজ একি[illegible] দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পরি[illegible] অনেক, বামফ্রন্ট সরকারের [illegible] শাসনে এই অঞ্চলে এসে[illegible] জোয়ার। ডায়মন্ডহারবার [illegible] বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল ল্যাব[illegible] কলকাতার ক্লিনিকগুলির রি[illegible] সমমানের। আর ডায়মন্ডহার[illegible]পাতালের স্থান ত' জেলা হাসপাতাল বাঙ্গুরের ঠিক [illegible] শুধু মহকুমা বা জেলা হাসপাতাল নয় আজ ডায়মন্[illegible], ক্যানিং কী বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনার যে [illegible]মীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে যে [illegible] চিকিৎসার জন্য হাজির হতে পারেন।

> **জেলার আর একটি জ্বলন্ত সমস্যা আর্সেনিক দূষণ। নলকূপের পানীয় জল থেকে প্রধানত এই দূষণ ঘটে, পর্যবেক্ষণে দেখা যায় জেলায় গঙ্গার লুপ্ত নদী খাতটির আশপাশের জলস্তরেই আর্সেনিকের আধিক্য। জলে প্রতিলিটার .০৫ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেলে ঐ জলকে দূষিত জল হিসাবে গণ্য করা হয়। এ পর্যন্ত জেলায় ভাঙ্গড়-২, জয়নগর, মগরাহাট-২ বারুইপুর, সোনারপুর ইত্যাদি দশটি ব্লকের নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেলেও বারুইপুর ও সোনার পুর ব্লকেই দূষণের মাত্রা সব থেকে বেশি,**

আসলে এই কয় বছরে হুগলি মাতলা বা বিদ্যা নদীতে যেমন জল বয়ে গেছে অনেক ধীরে ধীরে হলেও উন্নয়নের কাজে এসেছে গতি, আজ এই নিরানব্বইয়ের শেষে জেলার স্বাস্থ্য মানচিত্রে মোট চৌষট্টিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এর মধ্যে তিনটিকে খুব শীঘ্রই ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যায়ে উন্নীত করা হচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণকে আলাদা করে স্বতন্ত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা তৈরীর পর জেলা পেয়েছে বারুইপুর, ক্যানিং ও কাকদ্বীপ এই তিনটি নতুন মহকুমা। কিছুদিনের মধ্যেই এই মহকুমাগুলির সদর শহরে উদ্‌বোধন করা হবে নতুন মহকুমা হাসপাতালের বাঙ্গুর জেলা হাসপাতালের পরেই এই মহকুমা হাসপাতালগুলির স্থান। এর পরের ধাপে রয়েছে বারুইপুর, সোনারপুর বা ক্যানিংয়ের মতো নয়টি গ্রামীণ হাসপাতাল। গ্রামীণ হাসপাতালের পরের পর্যায় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বর্তমানে সারা জেলায় ছড়িয়ে থাকা এই জাতীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা আঠারটি। এছাড়া আরো তিনটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছে। সকলের শেষে রয়েছে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। এছাড়াও যক্ষ্মা, কুষ্ঠ বা যৌন ব্যাধির মতো সংক্রামক রোগগুলির চিকিৎসার জন্য খোলা হয়েছে বেশ কয়েকটি বিশেষ ক্লিনিক। এমনকি সারা জেলায় ছড়িয়ে আছে ছাব্বিশটি হোমিওপ্যাথি ও দশটি সরকারি দন্তচিকিৎসা কেন্দ্র। এমনকি এখন রাজ্য স্বাস্থ্য ডাইরেক্টরের অধীনে একটি সরকার আর্য়ুবেদ চিকিৎসা ইউনিটও আছে এই জেলায়। এছাড়া রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অধীনে সরাসরি পরিচালিত বিদ্যাসাগর, বিজয়গড়, বাঘাযতীন ও গার্ডেনরীচের বদরতলা রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের অবস্থানও এই জেলায়। একথা মানতেই হবে জেলার প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যাগুলি কোনও মতেই যথেষ্ট নয়, তবু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিকে জেলার

বিভিন্ন অঞ্চলে এমনভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যাতে শহর থেকে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও সহজে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ নিতে পারে। সেই সঙ্গে প্রচেষ্টা চলছে জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো উন্নত ও গতিশীল করে তোলার।

আসত। আজ আর সেদিন নেই। এখন প্রতিটি জেলার স্বাস্থ্য প্রশাসনকেই প্রয়োজনীয়, নিত্য ব্যবহার্য্য বা জীবনদায়ী ওষুধ কেনার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেই মতো তৈরি করা হয়েছে একটি 'ওষুধ ক্রয় কমিটি'। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদাধিকার বলে এই

সারণি—১

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র : একনজরে

জেলা হাসপাতাল—		এম. আর. বাঙ্গুর হাসপাতাল টালিগঞ্জ, কলকাতা
মহকুমা হাসপাতাল—		ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতাল, ডায়মন্ডহারবার প্রস্তাবিত ৩টি নতুন মহকুমা হাসপাতাল বারুইপুর
গ্রামীণ হাসপাতাল—		ক্যানিং এবং কাকদ্বীপ ৯ টি
ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—	১৮	টি এছাড়াও ৩টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—	৬১	টি,
সি. এম. ডি. এ. ক্লিনিক—	৮	টি (বহির্বিভাগ)
টিউবারকুলেসিস ইউনিট—	৭	টি
কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট—	৭	টি, এছাড়াও ৫ টি সোসাইটি আছে
হোমিও ডিসপেনসারি—	২৬	টি
আয়ুর্বেদিক ইউনিট—	১	টি
পরিবার কল্যাণ ক্লিনিক—	৩	টি
যৌন রোগ চিকিৎসা কেন্দ্র—	২	টি
স্টেট জেনারেল হাসপাতাল—	৪	টি
	*	বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
	*	গার্ডেনরিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
	*	বিজয়গড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
	*	বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল
ব্লাড ব্যাঙ্ক—	২	টি (ডায়মন্ডহারবার ও বাঙ্গুর হাসপাতাল)
পুলিশ কেস হাসপাতাল—	১	টি
মর্গ—	২	টি, আলিপুর ও ডায়মন্ডহারবার
ডেন্টাল ক্লিনিক—	১০	টি
এক্স-রে-ক্লিনিক—	১০	টি
শয্যা সংখ্যা—	৪	টি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল— ৪০৬ টি
জেলা হাসপাতাল—	৬০০	টি
মহাকুমা হাসপাতাল—	১০৩৭	টি
মেডিসিন স্টোর্স—	২	টি

এই কিছুদিন আগেও একটা কথা প্রায়ই শোনা যেত, যে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে হয় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থাকে না, না হলে দরকারের সময় সেগুলি ঠিক মতো পাওয়া যায় না, এই নিয়ে একসময় তৈরি হয়েছে কত গল্প বা চলচ্চিত্র। আজকাল কিন্তু অভিযোগটা তেমন শোনা যায় না। "আসলে এই কয় বছরে চিত্রটা সম্পূর্ণ রূপে পালটে গিয়েছে"—জানালেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চিফ্ মেডিকেল অফিসার (হেলথ) ডাঃ এ. কে. দেবনাথ। আসলে এটি ওষুধ ক্রয় ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের সুফল, বললেন তিনি, আগে সারা রাজ্যের ওষুধ এক সঙ্গে একেবারে কেনা হত, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে সেগুলি সরবরাহ করা হত জেলায় জেলায় ফলে রাজধানী কলকাতা থেকে দুর্গম গ্রামাঞ্চলের ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেশ কয়েক পর্যায় পার হয়ে ওষুধ পৌছতে পৌছতে অনেক রোগীরই অবস্থা খারাপ হয়ে

কমিটির সভাপতি। সি. এম. ও এইচ ছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ জন। বর্তমানে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর বছরের প্রারম্ভে একটি তালিকা দিয়ে জানিয়ে দেয় কোন কোন রোগের কী কী ওষুধ কেনা যাবে। সেই অনুসারে প্রতি তিন মাস অন্তর ক্রয় কমিটির মিটিংয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও বাজার থেকে টেন্ডার ডেকে ওষুধগুলি কেনা হয়। তবে জেলার প্রধান অসুখ ডায়রিয়া আন্ত্রিক জাতীয় পেটের রোগ। আর দ্বিতীয় স্থানে আছে টাইফয়েড ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো কয়েক প্রকার জ্বর। তাই প্রতি পর্যায়ের কেনা ওষুধের সিংহভাগ জুড়ে থাকে এই অসুখগুলির ওষুধ প্রচুর পরিমাণে ওরাল রিহাইড্রেশান সলিউস্যান ও কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক। প্রাথমিক ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ অসুখবিসুখের কুড়িটি প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়মিত সরবরাহ করা হয়

এর মধ্যে কয়েকটি জীবনদায়ী ওষুধও থাকে। তবে এটি সত্যি যে যক্ষ্মা ক্যানসার ইত্যাদির মতো জটিল রোগের দামি ওষুধ মহকুমা হাসপাতালগুলির পক্ষে পরবর্তী পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওষুধ ছাড়াও সাম্প্রতিক একটি সরকারি আদেশে জেলা প্রশাসনকে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার ইত্যাদি কেনারও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এগুলি কলকাতার সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে সরবরাহ করা হয়, এই আদেশের ফলে এখন থেকে গ্লাভস্ সিরিঞ্জের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও জেলা স্তরে কেনাকাটা করা যাবে ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কাজকর্মে আরো সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমান আর্থিক বছর পর্যন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ওষুধ পত্র ক্রয় খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল দুই কোটি টাকা, কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সকল সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই রোগীদের ওষুধ দেওয়া হয় সম্পূর্ণ বিনা পয়সায়, তার ওপরে নতুন তিনটি মহকুমা হাসপাতাল হলেও খরচ বাড়বে অনেক। এছাড়া গার্ডেনরীচ ও বাঘাযতীন রাজ্য হাসপাতাল হলেও এদের মাঝে মাঝেই জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকেই ওষুধ সরবরাহ করতে হয়, সেই সব কারণেই আগামী আর্থিক বছরে এই খাতে আড়াই কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে।

ব্লক অনুসারে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবস্থান

আলিপুর মহকুমা

ব্লকের নাম	ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র	প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র
১. টি এম ব্লক	সরসুনা ব্লক প্রাইমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র	* * * * *
২. বজবজ—১	বেনজনহরি চারিয়াল	১. বিরাজলক্ষ্মী ২. জামালপুর
৩. বজবজ—২	এল. বি দত্ত গ্রামীণ হাসপাতাল	গজপোয়ালি বুরুল (সতীশ রায় স্মৃতি প্রাঃ হাঃ)
৪. বিষ্ণুপুর—১	চণ্ডীদৌলতাবাদ	জুলফিয়া আমগাছিয়া
৫. বিষ্ণুপুর—২	সমালি	মৌখালি আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল
	বারুইপুর মহকুমা	
১. সোনারপুর ব্লক	সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতাল	১. ফড়থাবাদ ২. কালিকাপুর ৩. লংগালবেরিয়া
২. বারুইপুর ব্লক	বারুইপুর গ্রামীণ হাসপাতাল	১. পাঁচগাছি ২. হরিহরপুর ৩. ইন্দ্রপলা
৩. ভাঙ্গড়—১	নলমুরি	১. ভাতিপোতা
৪. ভাঙ্গড়—২	জিরানগাছা	১. টোনা ২. ভাঙ্গড় (এজি)
৫. জয়নগর—১	পদ্মারহাট গ্রামীণ হাসপাতাল	১. ঢোসা ২. মোমরেজগড় ৩. নয়াপুকুরিয়া
৬. জয়নগর—২	নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতাল	১. মায়াহাউড়ি ২. নলগোড়া
৭. কুলতলি ব্লক (জয়নগর—৩)	১. জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতাল	১. কান্তমারিয়া ২. ভুবনেশ্বরী ৩. মইপীঠ ৪. কৈখালি
	ক্যানিং মহকুমা	
১. ক্যানিং—১	ক্যানিং গ্রামীণ হাসপাতাল	১. ঘুটিয়ারি শরিফ
২. ক্যানিং—২	...রে দীঘি	২. কুচিতলাহাট
৩. বাসন্তী ব্লক	...ন্তী	১. হেড়োভাঙ্গা ঝড়খালি ২. মহেশপুর ৩. কাঁটালবেড়িয়া
৪. গোসাবা ব্লক	...বা	১. ছোট মোল্লাখালি ২. দক্ষিণ রাধানগর
	ডায়মন্ডহারবার	
১. ডায়মন্ডহারবার—১	...গ্রাম	১. বারদ্রোণ ২. মশাট
২. ডায়মন্ডহারবার—	...ধা	১. গোনদিয়ারা ঘুনটপুর ২. পশ্চিম ভবানীপুর
৩. মথুরাপুর—১	...াপুর গ্রামীণ হাসপাতাল	১. ঘটকুলটোলা ২. যাদবপুর
৪. মথুরাপুর—২	...দীঘি গ্রামীণ হাসপাতাল	১. পুরন্দরপুর ২. গিলারচট ৩. বাড়িভাঙ্গাবাদ
৫. মগরাহাট—১	...শ্বরপুর	১. সিরাখোল (এ. জি.)
৬. মগরাহাট—২	...রাহাট	১. গোকর্ণী ২. মোহনপুর
৭. কুলপি ব্লক	...পি	১. বেলপুকুর ২. জামতলা হাট ৩. রামকিশোরপুর ৪. দক্ষিণ জগদীশপুর
৮. ফলতা ব্লক	...তা	১. ধলতিকুরি
৯. মন্দিরবাজার	...ার হাট	* * *

কাকদ্বীপ মহকুমা

১. কাকদ্বীপ	কাকদ্বীপ গ্রামীণ হাসপাতাল	১. হরেন্দ্রনগর ২. রামচন্দ্রনগর
২. সাগর	সাগর গ্রামীণ হাসপাতাল	১. মহেন্দ্রগঞ্জ ২. গঙ্গাসাগর ৩. মুড়িগঙ্গা
৩. নামখানা	দ্বারিকনগর	১. মহারাজগঞ্জ ২. ফ্রেজারগঞ্জ ৩. নারায়ণপুর মৌসুমী
৪. পাথরপ্রতিমা	মাধবনগর	১. ব্রজবল্লভপুর ২. গোদা মথুরাপুর ৩. ইন্দ্রপুর
মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক দক্ষিণ ২৪ পরগনা		১. গড়ফা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ২. হরিদেবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দিকে আর একটি অভিযোগের তীর আসে সাপের কামড়ের ওষুধ বা অ্যান্টি ভেনাম নিয়ে। আগে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর থেকে অ্যান্টি ভেনাম সরবরাহ করা হতো. সম্প্রতি জেলা মেডিকেল স্টোরকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিকে এ্যান্টি ভেনাম সরবরাহের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলায় অ্যান্টি ভেনাম সরবরাহের কোনও অভাব নেই। একথা সত্যি যে এই জেলায় বিশেষ করে সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে প্রতি বছর এক বিরাট সংখ্যক মানুষ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হয় আর মারাও যান অনেকে। এই মৃত্যু যে সবসময় সাপের বিষেই যে হয় তাই নয় অনেক সময়েই অবহেলা অহেতুক দেরী. ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা বা আতঙ্কে হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার জন্য ও রোগীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সাতানব্বইয়ের বন্যার পরেই অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তের আদেশক্রমে এক বছরেই এই জেলায় চার হাজার ভায়াল (এ্যান্টি ভেনাম ইঞ্জেকেশানের একক) অ্যান্টি ভেনাম কেনা হয়। তবে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন সাপে কামড়ালেই সেটি মারাত্মক হয় না। অনেক সময়েই বিষ হীন বা অল্প বিষাক্ত সাপ কামড়ায়। আবার বিষাক্ত সাপও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষ না ঢালতে পারলে কামড় প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে না।.এই তথ্যগুলি মানুষের জানা প্রয়োজন এর জন্য দরকার যথার্থ শিক্ষা ও প্রচার। এই প্রচারের ফলে মানুষ তাড়াতাড়ি সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবেন ও রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। অযথা আতঙ্কও দূর হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কেবলমাত্র মারাত্মক সাপে কাটা রোগীর ওপরেই সঠিক অ্যান্টি ভেনাম প্রয়োজনীয় মাত্রায় চার ছয় ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা হয়। এর সঙ্গে অন্য ওষুধও থাকে। এক একজন রোগী পিছু অনেক সময় আট দশ ভায়াল এভি এস লেগে যেতে পারে। এজন্যই অনেক সময় কোনও কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধের স্টক ফুরিয়ে যায় পরবর্তী সরবরাহ আসার মধ্যে হয়তো কোনও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তবে এই মধ্যবর্তী সময়টিকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

তবে অ্যান্টি ভেনাম নিয়ে না হলেও অবশ্যই সমস্যা আছে অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিন নিয়ে, এই ভ্যাকসিন এ রাজ্যে তৈরি হয় না আর স্থানীয় কেন রাজ্য স্তরেও এটি বাজার থেকে কেনার অনুমতি নেই। চাহিদার তুলনায় জোগানের পরিমাণ খুবই কম থাকায় প্রতিবছর এই জেলায় কুকুর বা শিয়ালে কামড়ানো রোগীদের মাত্র অর্ধেক সংখ্যক মানুষ সরকারি পরিষেবায় তত্ত্বাবধানে আসেন, বাকিদের কেউ দৌড়ান কলকাতা কেউ বা স্মরণ নেন বেসরকারি চিকিৎসকদের।

এরপরেই আসি কয়েকটি স্বাস্থ্য প্রকল্পের কথায় এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের কথা। বিশ্বের সেই সঙ্গে আমাদের দেশের জন সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তার জন্য পরিবার পরিকল্পনার অবশ্যই প্রয়োজন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। তবে সরকারি স্তরে 'একটি হলেই ভালো হয় দুটির বেশি কখনোই নয়' শ্লোগান যতই দেওয়া হোক না কেন এই বিষয়ে প্রধান বাধা কুসংস্কার ও অশিক্ষা। তাই জেলার শিক্ষিত পরিবার গুলিতে একটি বা দুটি সন্তান থাকলেও গ্রামে ও শহরের বস্তি অঞ্চলের দরিদ্র জনবসতিগুলিতে একটি পরিবারে চার পাঁচটি ত বটেই অনেক সময়েই দশ বারোটি শিশুও দেখা যায়। সেই দিক থেকে দেখলে পরিবার পরিকল্পনা এখানে ব্যাপকভাবে সফল হয়নি। তবে স্বাস্থ্য দফতর যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি। জেলার প্রতি পাঁচ হাজার মানুষ পিছু ও সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলের প্রতি তিন হাজার মানুষ পিছু রয়েছে একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলিতে থাকেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা আংশিক সময়ের স্বাস্থ্যকর্মী, এঁরা সরকারী কর্মচারি নন, ভাতার বিনিময়ে কাজ করেন। কিন্তু তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্য দফতরে এঁরাই স্তম্ভ স্বরূপ। পরিবার কল্যাণ প্রকল্প ছাড়াও, সাধারণ অসুখবিসুখের চিকিৎসা। পাল্স্ পোলিও প্রকল্প ইত্যাদি প্রতিষেধক দান প্রকল্পের কাজ ও জন্ম নিবন্ধীকরণ ইত্যাদি কাজও এঁরা করেন। সে যাই হোক জেলার পরিবার কল্যাণ প্রকল্পে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে একদিকে যেমন মহিলাদের ওরাল পিল, কনডোম ইত্যাদি সরবরাহ করা হয় বা কপারটি পরানো হয় তেমনই দুটি বা তিনটি সন্তানের পর স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে মহিলাদের লাইগেশান বা পুরুষদের ভেসেকটাম অপারেশান করানো হয়। আবার শুধু জন্ম নিয়ন্ত্রণই নয়, গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসাও এই প্রকল্পেরই মধ্যে পড়ে। এখনো পর্যন্ত জেলার পঞ্চাশ শতাংশ প্রসব দক্ষ বা অদক্ষ দাইদের সাহায্যে বাড়িতেই হয়, যদিও গর্ভবতী মহিলাদের একটি বিরাট অংশই চিকিৎসকের কাছে আসেন না, তবু যাঁরা আসেন তাঁদের প্রতিমাসে মাসে স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গুলিতে পরীক্ষা করা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান দেখা হয় ও প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র দিয়ে দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থায় জটিলতা দেখা দিলে সময় থাকতে হাসপাতালে ভর্তি হবার পরামর্শ দেওয়া হয় বা ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

সারণি—৩
জেলার পরিবারকল্যাণ প্রকল্প : কিছু তথ্য

বন্ধ্যাত্ব করণ—১৩,৭৯৮ (মার্চ ১৯৯৯ পর্যন্ত)
এপ্রিল '৯৯ থেকে আগষ্ট '৯৯ এ পর্যন্ত
বন্ধ্যাত্ব করণ— ৫, ৩৪৭ (জন)
আই. ইউ. ডি. (কপার টি) মার্চ '৯৯ পর্যন্ত —৫,৬১৬ জন
এপ্রিল '৯৯ থেকে আগষ্ট '৯৯ পর্যন্ত ১৯৯২ জন।
(মার্চ '৯৯ পর্যন্ত)
সি. সি. ইউ (কনডোম)—১৩,৭২১ জন ব্যবহার করে
গর্ভনিরোধক পিল ব্যবহার করেন—১৩,৪২৬ জন

স্বাস্থ্যকর্মী গ্রামের টিবি রোগীদের ওষুধ ও ব্যবহারপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন — *ছবি : হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল*

সারণি—৪
ইমিউনাইজেশন প্রকল্প (১৯৯৯-এর মার্চ পর্যন্ত) : কিছু তথ্য

* বি. সি. জি. দেওয়া হয়েছে—	১,২৭,৭৫৪	জনকে
* ডি. পি. টি.	১,১৪,৯১৭	জনকে
* হামের টিকা	৯৮,২৪৪	জনকে
* পোলিও	১,২০,২২৬	জনকে
* টি. টি. (পি. ডবলিউ)	৯৪,৬৬৮	
* ভিটামিন 'এ' প্রথম ডোজ	৯৪,৯৪৯	জনকে
দ্বিতীয় ডোজ	৬৪,২০২	জনকে
তৃতীয় ডোজ	৮৭,৮৪০	জনকে

জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরেই আসে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অপর অঙ্গ ইমিউনাইজেশান অর্থাৎ প্রতিষেধক বা টিকা-দান প্রকল্পের কথা। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে শিশুদের নিয়মিতভাবে বিসিজি, পোলিও এবং ট্রিপল অ্যান্টিজেন এর মতো প্রতিষেধক ত দিয়েই থাকে এছাড়াও বিশেষ করে পাল্‌স্ পোলিও প্রকল্পে জেলা আশাতীত সাফল্য পেয়েছে, গ্রামাঞ্চলে পাল্‌স্ পোলিওর সাফল্য একশ শতাংশেরও ওপরে তবে শহরাঞ্চলে এই প্রকল্পে সাফল্যের হার একশ ভাগ থেকে সামান্য কম।

গ্রামীণ ক্যান্সার কেন্দ্র পরিচালিত স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ক্যান্সার রোগ নির্ণয় কেন্দ্র

বারুইপুরে গ্রামীণ ক্যান্সার নির্ণয় কেন্দ্র

সারণি ৫ (ক)
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাল্‌স্‌ পোলিও টিকাকরণ

প্রোগ্রাম ১৯৯৮-৯৯
(গ্রামাঞ্চলে)
১/১০/১৯৯৭-এর গণনা অনুযায়ী
আনুমানিক জনসংখ্যা—৫৫,৮০,০০৯ জন
০—৫ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৭,১৫,৯৯০

পাল্‌স্‌ পোলিও টিকাকরণের তারিখ	[illegible]	প্রকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা	০—৫ বছর বাচ্চার সংখ্যা	মোট গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ০—৫ বছর বয়সী শিশু	৫ বছরের বেশি শিশু	শতকরা হিসাব
৬/১২ থেকে ৮/১২ ১৯৯৮	[illegible]	২৫৩৮	৬,৪৭,২৮১	৬,৫১,৯৭০	৯৩৯৯	১০০.৭%
১৭/১ ১৯/১ ১৯৯৯	[illegible]	২৫৩৮	৬,৪৭,২৮১	৬,৫৮,৭৮৯	৬০২৫	১০১.৮%

সারণি—৫ (খ)

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মফঃস্বল অঞ্চলে পালস্ পোলিও টিকাকরণ প্রোগ্রাম ১৯৯৮-৯৯

১/১০/৯৭-এর গণনা অনুযায়ী আনুমানিক জনসংখ্যা
= ৮,৫৮,৮৬২ জন (মফঃস্বল অঞ্চলে)

পালস্ পোলিও টিকাকরণের তারিখ	প্রস্তাবিত কেন্দ্রের সংখ্যা	প্রকৃত কেন্দ্রের সংখ্যা	০—৫ বছর বয়সী বাচ্চার সংখ্যা	মোট শিশুর সংখ্যা টিকাগ্রহণকারী		শতকরা হিসাব
				০—৫ বছর	৫ বছরের বেশি হলে	
৬/১২/৯৮	২৬৮	২৬৮	৬৮,৭০৯	৬৬,৭৪১	৫৯৪	৯৭%
১৭/১/৯৯ ১৯/১/৯৯	২৬৮	২৬৮	৬৮,৭০৯	৬৭,৮৭৭	৭৮৭	৯৮.৮%

আবার ইন্টিগ্রেটেড্ চাইল্ড হেলথ্ ডেভেলপ্মেন্ট স্কিম বা আই সি ডি এস্-এর মতো কয়েকটি প্রকল্পে শিশুর হুপিং কাশির উপর জোর দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে আই সি ডি এস এ মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে কাজ হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্যারামেডিকেল কর্মীর সংখ্যা

ফার্মাসিস্ট	৪৭
টেকনিসিয়ান (ল্যাবরেটরি)	১২
টেকনিসিয়ান (এক্স রে)	৫
অপথ্যালমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট	২০

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পাব্লিক হেলথ কর্মীর সংখ্যা

বি. এস. আই	১৩
এস. আই	১৯
ডি. এস. আই	১
হেলথ সুপারভাইজার (পুরুষ)	৫২
হেলথ সুপারভাইজার (মহিলা)	১১৫
হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট (পুরুষ)	৪৬৩
হেলথ অ্যাসিস্টেন্ট (মহিলা)	৯৫৯
নার্সিং কর্মী	৪৫২

বারুইপুরে গ্রামীণ ক্যান্সার নির্ণয় কেন্দ্রের অভ্যন্তর দৃশ্য
ছবি : দেবাশিস ভদ্র

নার্সিং কর্মী

বি. পি. এইচ এন	১৮
পি. এইচ এন.	২৩
গ্রে: - ১ (২)	৭
জি. এন. এম.	৩১৬
এ. এন. এম.	৮৮
	৪৫২

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা

এত গেল যে সমস্ত প্রকল্প চলছে তার কথা এছাড়া বর্তমান আর্থিক বছরে এমন দুটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যা একদিকে যেমন বৈপ্লবিক, অন্যদিকে এর ফলও হবে সুদূরপ্রসারী। এটির প্রথমটি হল 'অ্যাডালোসেন কেয়ার' প্রকল্প। এতদিন পর্যন্ত জন্মের পর থেকে শৈশবস্থা পর্যন্ত ইমিউনাইজেশানের কারণে চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে থাকত, তারপরে আবার একজন সুস্থ মানুষকে স্বাস্থ্য বিভাগ সহায়তা দিত, যখন সেই শিক্ষা পূর্ণ বয়স্ক যুবক হয়ে বিবাহ করতেন। এখন 'অ্যাডোলোসেনস্ কেয়ার প্রকল্পে' কিশোর কিশোরী বা এজারটিনদের নিয়ে কাজ হবে। এই প্রকল্পে স্বাস্থ্যকর্মীরা একদিকে গ্রামের এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ধূমপান মদ্যপানের মতো নেশা বা জুয়া খেলার কুফল সম্পর্কে বোঝাবেন, অন্যদিকে অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় যৌন শিক্ষা দেবেন এর ফলে একদিকে যেমন গ্রামের দরিদ্র যুব সমাজের চরিত্র গঠন হবে অন্য দিকে বিভিন্ন ধরনের যৌন রোগ ও যৌন বিকৃতি কমে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্লক স্তরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বর্তমান অবস্থা

দ্বিতীয় প্রকল্পটির নাম কমিউনিটি পার্টিসিপেটিং অ্যাকশান প্ল্যান এই প্রকল্পে গ্রামের সাধারণ প্রতিরোধ মূলক স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব ওপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে গ্রামের মানুষের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ গ্রামের মানুষই পঞ্চায়েতে বা একত্রে বসে স্থির করবেন কোথায় নলকূপ বসানো হবে, মহামারী হলে কীভাবে প্রতিরোধ করা হবে বা কীভাবে পরিবার কল্যাণ প্রকল্পগুলিকে গ্রামে চালান হবে জাতীয় জন স্বাস্থ্যমূলক সিদ্ধান্ত, বর্তমানে প্রকল্প দুটির বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ চলছে, খুব শীঘ্রই এগুলি জেলায় চালু হয়ে যাবে।
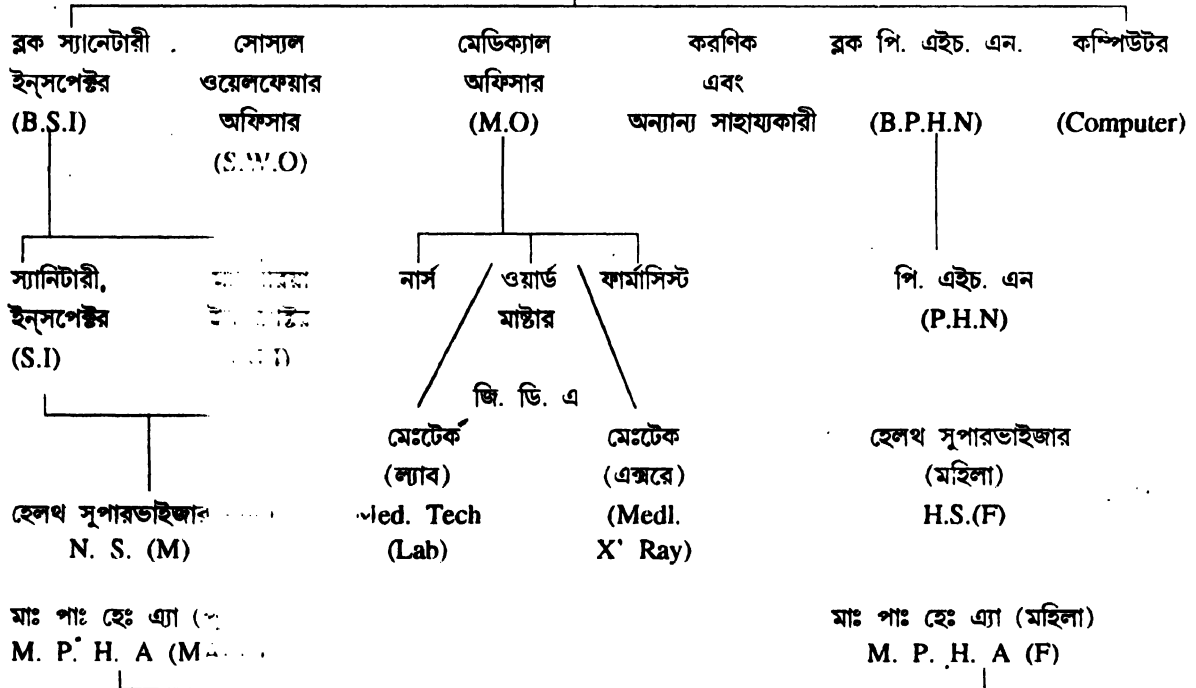
সি এম ও (এইচ) দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা

জি. ডি. এম. ও

১। আলিপুর সাব ডিভিসন : ২৩ (ব্লক—৫)
২। বারুইপুর সাব ডিভিসন : ৪০ (ব্লক—৭)
৩। ক্যানিং সাব ডিভিসন : ১৮ (ব্লক—৪)
৪। ডায়মন্ডহারবার সাব ডিভিসন : ৩৪ (ব্লক—৯)
৫। কাকদ্বীপ সাব ডিভিসন : ১৮ (ব্লক—৪)

সর্বমোট জি ডি এম ও (অ্যালোপ্যাথি) ১৪৩ অন্যান্য এম. ও ২০

কন্ট্রাক্ট এম. ও (ঐ) ১৫
হোমিওপ্যাথি এম. ও ২৬
আয়ুর্বেদিক এম. ও ১
সি. এইচ. এস. ও ১৭

বিগত কয়েক বছরের স্বাস্থ্য চিত্রে একথা স্পষ্ট যে এই জলে জঙ্গলে ঘেরা জেলার প্রধান অসুখ হল ডায়েরিয়া, জেলা স্বাস্থ্য বাজেটের এক তৃতীয়াংশ (প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা) খরচ হয় প্রতি বছর ডায়েরিয়ার পেছনে. এই ডায়েরিয়া প্রতিরোধে' কমিউনিটি পার্টিসিপেটিং অ্যাকশান প্ল্যান' একটি বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবে। এই প্রকল্পে জন স্বাস্থ্য নিয়ে গ্রামের মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বসবেন, দেখবেন সেই এলাকায় কোন কোন অসুখ বেশি হয়, চেষ্টা করবেন তার কারণ অনুসন্ধানের। ডায়রিয়া বা আন্ত্রিক বেশি হলে তাঁরা সকলে মিলে জল ফুটিয়ে পান করা বা গ্রামের জলাশয় গুলিকে দূষণ মুক্ত রাখার চেষ্টা করবেন। ডায়েরিয়া হলে রোগীকে চায়ের লিকার, ডালের জল, ভাতের মাড় ইত্যাদি সাধারণ ও: আর. এস দিয়ে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা চালাবেন, এর ফলে একদিকে যেমন ডায়েরিয়ার হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবেন অন্যদিকে সরকারের জেলায় শুধু ছাব্বিশ লক্ষ টাকার স্যালাইনের বোতল কেনার খরচ কমে আসবে। কমে আসবে অন্যান্য পেটের রোগের ওষুধ কেনার খরচও।

সারণি—৬
জেলায় ডায়রিয়া চিত্র

কোন বছরে	আক্রান্ত হয়েছে	মারা গেছে
১৯৯৭	১,৬৫,০৮০ জন	১৩০ জন
১৯৯৮	১,১৫,৫২৬ জন	৭৫ জন
১৯৯৯ (জুলাই পর্যন্ত)	৬২,৮৪৮	১৪ জন

ডায়েরিয়া প্রতিরোধের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিতে গেলে জল ফুটিয়ে খাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষদের যেখানে সেখানে মল মূত্র ত্যাগ করার অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে কমিউনিটি ল্যাট্রিন তৈরির জন্য জেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই সিমেন্টের স্ল্যাব ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দিচ্ছেন শুধু সরকারি দফতর নয় স্থানীয় মানুষ ও জন প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে, তবেই সুফল আসবে। প্রসঙ্গত পরিসংখ্যানে দেখা যায় এর ফলে ডায়েরিয়া আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গতবছরের তুলনায় অনেক কম। এই সংখ্যা আরো কমে আসবে যদি মানুষ একটু সচেতন হন বা গ্রামের দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে আরো একটু সচেতন করা যায়।

সারণি—৭
জেলার ম্যালেরিয়া চিত্র—১৯৯৮-৯৯

রক্ত পরীক্ষা হয়েছে	জীবাণু পাওয়া গেছে	ম্যালিগন্যান্ট
১৯৯৮ এর জানুয়ারি—ডিসেম্বরে ১,০৬,৪২১ জন	৮৩৮ জন	৪৯ জন
১৯৯৯ এর জানুয়ারি—জুলাই ৪৩,৬৯৯ জন	২১১ জন	৩ জন

পরিসংখ্যানেই প্রকাশ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কম। আসলে শহরাঞ্চলের থেকে গ্রামাঞ্চলেই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কম হয়। গত বছর থেকে ম্যালেরিয়ায় একজনও এ জেলায় মারা যায়নি। ম্যালেরিয়ার ওষুধ বা রক্তের স্লাইড্ সরবরাহে জেলায় কোনও ঘাটতি নেই। তা সত্ত্বেও রোগ প্রতিরোধ জেলার ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকাগুলিতে ডিডিটি স্প্রে শুরু হয়ে গেছে।

সারণি—৮
জেলার কালাজ্বর চিত্র

১৯৯৪ সালে	১৩২ জন আক্রান্ত হয়ে মারা যায়	২ জন
১৯৯৮ সালে	৯২ জন " " "	২ জন
১৯৯৯ (জুলাই পর্যন্ত)	২৮ জন " " কেউ মারা যায়নি	

ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়ার পরই আসে কালাজ্বরের কথা বর্তমানে এই রোগটিকে এই অঞ্চলে বেশ ভালো ভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। এ বছরে শুধু ক্যানিং-২, গোসাবা এবং বাসন্তী ব্লকেই কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে।

সারণি—৯
যক্ষা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ঃ কিছু তথ্য

এক্স রে	সর্ব মোট	নতুন	পজিটিভ	শতকরা
করা হয়েছে	১৪,০০৭	৯,২৬৫	৪,১০২	৪৪.২৮%
কফ পরীক্ষা	২১,১৮২	১৭,১৬৯	১৭৪৯	১০.১৯%

এ পর্যন্ত সর্ব মোট রোগীর সংখ্যা

স্পুটাম পজিটিভ	২২৬০ জন
এক্স রে	৬,২৫২ জন
এক্সট্রা পালমোনারি	৮৭৫ জন

কফ পরীক্ষার পর [illegible] চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন মোট ৮৭৫ জন, এক্স রে পজিটিভ ও এক্সট্রা পালমোনারির রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ২২২৮ জন

সাধারণ অসুখ [illegible] রাজরোগ যক্ষ্মা টিউবার কুলেসিস-এর কথায়। এ[illegible] রোগ এই অসুখকে আজ জয় করেছে মানুষ কিন্তু [illegible]র কাছে আজ এই রোগের দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসা ব[illegible] ও [illegible] বাহিরে। তাই বিনা মূল্যে সরকারি কেন্দ্রের চিকিৎ[illegible] দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনায় সরকারি টি. বি ইউনি[illegible] বর্তমানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাজ্যের বি[illegible] সোসাইটির মতো টিউবার কুলেসিস সোসাইটি খো[illegible] পর্যায়ে পাঁচটির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে সাতটি জেলায় [illegible] খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দ[illegible] চ[illegible] পরগনা একটি। সোসাইটির রেজিস্ট্রিশানও হয়ে গি[illegible] দা[illegible] লে জেলা শাসক হলেন এই সোসাইটির সভাপতি ও সি. এম. ও. (এইচ) সহ সভাপতি। সোসাইটির অধীনে জেলায় আরো চোদ্দটি টিউবার কুলেসিস ইউনিটও তেষট্টিটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় কেন্দ্র খোলা হবে, WHO থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়ায় এই প্রকল্পে আলাদা করে কর্মী নিয়োগ করা হবে এবং মাইক্রোসেলাপ, এক্স রে মেশিন ও ওষুধপত্রের পর্যাপ্ত জোগান পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রাথমিক রোগ নির্ণয় কেন্দ্রগুলিতে 'স্পুটাম টেস্টে' রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসা আরম্ভ করে দেওয়া হবে ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোগীকে টিউবার কুলেসিস ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে বর্তমানে শিশুদেরব্যাপক ভাবে বি সি জি টিকা দেবার ফলে ভবিষ্যতে এই অসুখ খুবই কমে আসবে বলে মনে হয়।

জেলায় আর একটি জ্বলন্ত সমস্যা আর্সেনিক দূষণ। নলকূপের পানীয় জল থেকে প্রধানত এই দূষণ ঘটে, পর্যবেক্ষণে দেখা যায় জেলায় গঙ্গার লুপ্ত নদী খাতটির আশপাশের জলস্তরেই আর্সেনিকের আধিক্য। জলে প্রতিলিটার .০৫ মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেলে ঐ জলকে দূষিত জল হিসাবে গণ্য করা হয়। এ পর্যন্ত জেলায় ভাঙড়-২, জয়নগর, মগরাহাট-২ বারুইপুর, সোনারপুর ইত্যাদি দশটি ব্লকের নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেলেও বারুইপুর ও সোনার পুর ব্লকেই দূষণের মাত্রা সব থেকে বেশি, এতদিন অগভীর নলকূপের জলে পাওয়া গেলেও আজকাল এক হাজার ফিট গভীর নলকূপের জলেও এই বিষ পাওয়া যাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধে এই দশটি ব্লকের প্রায় তিনশ জন স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মধ্যে আর্সেনিক দূষণের লক্ষণ নির্ণয় করবেন ও নলকূপের জল পরীক্ষার জন্য পাঠাবেন, আর্সেনিকের রোগী পাওয়া গেলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন ও প্রয়োজন হলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাবেন, নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেলে তাঁরা অবশ্যই ওই নলকূপ সিল করে দেবেন। তবে আর্সেনিক প্রতিরোধে সরকার গঙ্গার জল পরিশোধিত করে পানীয় জল সরবরাহের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। আড়াই শ কোটি টাকার এই প্রোজেক্টটি কাজ শুরু করলে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দূষণ থেকে আবার আমরা ফিরে আসি রোগের কথায়। কুষ্ঠ রোগের প্রকোপ এই জেলায় অনেক কম, প্রতি দশ হাজার জনে দুই থেকে আড়াই জন তবু এই সংখ্যাটিকেও নির্মূল করতে জেলা স্বাস্থ্য দফতর ব্যাপক প্রচারে নেমেছে। জেলায় মূল সরকারি সাতটি ও লেপ্রসি সোসাইটির পাঁচটি মোট বারোটি কুষ্ঠ রোগ নিরাময় কেন্দ্র আছে। এছাড়াও গত বছর জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন ও জনসাধারণ ইউনিসেফের অর্থে এক ব্যাপক কুষ্ঠ রোগ দূরীকরণ প্রচারাভিযানে নেমেছিল। এই অভিযানে প্রায় সতের জন মানুষের রোগ নির্ণয় করা হয়। এই বছরও জানুয়ারি মাসে আবার এই অভিযান হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখন কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা খুবই উন্নত। এক বছর ছয় মাস এমনকি কখনো কখনো মাত্র এক দাগ ওষুধ খাইয়েও রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। এই রোগের ওষুধ পত্রেরও কোনও অভাব নেই এখানে।

সারণি—১০
স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যেসব যন্ত্রপাতি আছে

* নাক-কান-গলা পরীক্ষানিরীক্ষার যন্ত্রপাতি
* চোখের শল্যবতীয় চিকিৎসার যন্ত্র
* ভিউইং বক্স
* ওয়েইং স্কেল
* অর্থোপেডিক ইনস্ট্রুমেন্ট
* এক্স রে অ্যাকসেসরিস্
* গায়নোকোলজিক্যাল ও অন্যান্য সার্জিকাল কিট্স্
* অটোক্লেভ মেশিন
* হাইড্রোলিক অপারেশন টেবিল
* আলট্রা সাউন্ড-স্ক্যানার
* ডায়াগনিস্টিক অডিওমিটার

এছাড়া প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধপত্রও (যেমন ডায়রিয়ার ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক ম্যালেরিয়ার ওষুধ, ইত্যাদি) বিনামূল্যে রোগীদের দেওয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীর কাল ব্যাধি এইড্‌সও থাবা বসিয়েছে এই জেলায়, বর্তমানে আমাদের রাজ্যে এই রোগের ভাইরাসের কেরিয়ারের সংখ্যা প্রায় চোদ্দশ আর এইড্‌স্ রোগী আছেন প্রায় আড়াইশ জন, এঁদের কয়েকজন এই জেলাতেও আছেন, জেলার স্বাস্থ্য কর্মীদের এ বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যৌন কর্মী ও যৌন রোগীদের মধ্যে চলছে ব্যাপক প্রচারাভিযান ও রক্ত পরীক্ষা, সরাসরি রোগ প্রতিরোধ ঠেকাতে যৌন কর্মীদের কনডোম ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

অসুখের কথা ছেড়ে আবার ফিরে আসি জন স্বাস্থ্যে, গত বছর ইউনিসেফের সহযোগিতায় জেলার বিভিন্ন ব্লকে সার্বিক পুষ্টির ওপরে সমীক্ষা হয়, এর পাশাপাশি চলছে আই সি ডি এস্ প্রকল্প। বর্তমানে প্রায় আঠারোটি ব্লকে এই প্রকল্প চলছে আরো পাঁচটি ব্লকে এই প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গেছে ফলে আগামী বছরে প্রায় চব্বিশটি ব্লক এই প্রকল্পের অধীনে আসবে। এছাড়া ও একই সঙ্গে চলছে 'এম সি ডি এস' বা মাদার অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম ও 'কমিউনিটি হেলথ্ ডেভেলপমেন্ট-২ প্রকল্প। প্রথমটিতে মা ও সদ্যজাত শিশুদের স্বাস্থ্য ও প্রতিষেধক প্রদান এবং মাতৃ দুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকল্পটিতে গ্রামীণ হাসপাতাল স্তর পর্যন্ত ও সুন্দরবনের পাঁচটি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বাড়ি তৈরি সেই সঙ্গে দামি ও জটিল রোগের ওষুধ যা উন্নত যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে উন্নত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

তবে ওষুধপত্র ও সদিচ্ছার অভাব না থাকলেও এই জেলার স্বাস্থ্য বিভাগে খুবই অভাব যানবাহনের। জেলার সব কয়টি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স নেই। অনেক গুলিতে আবার গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গাড়ি পিছু সরকারি বরাদ্দ সেই দশ বছর আগে থেকে বাৎসরিক বারো হাজার টাকা, তেলের দাম মিটিয়ে এই টাকায় সব সময়ে গাড়ির মেরামতি বা যন্ত্রাংশ কেনার দাম কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না, সেই কারণে অনেক সময়েই হাসপাতাল গুলিকে অন্য সংস্থা থেকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিতে হয়, ঠিক এর কমই খারাপ অবস্থা সুন্দরবন অঞ্চলে, এখানে সব সরকারি বিভাগের লঞ্চ বা যন্ত্রচালিত নৌকা থাকলেও স্বাস্থ্য দফতরের নেই, ফলে যোগাযোগের বড়ই অসুবিধা এই জন্য আগামী বছরে সপ্তাহে দশ হাজার টাকা ভাড়ায় অন্তত একটি বোট রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

সারণী—১১
জেলার সরকারি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ঃ কিছু তথ্য

জানুয়ারি '৯৮ থেকে ডিসেম্বর '৯৮

পুরনো রোগীর সংখ্যা	১৬,৭,৯৯	জন
নতুন রোগী	৪,৪৭১	জন
মোট রোগী	২১,২৭০	জন

এড্‌স্ নিয়ে প্রশিক্ষণ চললেও ক্যানসার নিয়ে জেলার সরকারি হাসপাতালগুলিতে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই, জেলার স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে কোনও ক্যানসার রোগী চিহ্নিত হলে তাঁকে সাধারণত চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল বা ঠাকুর পুকুর ক্যানসার সেন্টারে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্লোগান 'দু হাজার সালে সকলের জন্য স্বাস্থ্য', সকলের জন্য পানীয় জল', এ বিষয়ে সারা দেশের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাও চেষ্টা করে যাচ্ছে। চেষ্টা করে যাচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু হার কমাতে, রোধ করতে শিশু মৃত্যু, কিন্তু শুধু সরকারি স্বাস্থ্য দফতরের প্রচেষ্টাই নয়, সাবসেন্টারগুলির উন্নতি, জন প্রতি নিধিদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান আর সকলের উপরে সাধারণ মানুষের শিক্ষা, সচেতনতা [illegible] ভাল[illegible]াই একমাত্র এ বিষয়ে লক্ষমাত্রায় পৌঁছতে সাহায্য [illegible]

[illegible]
ড [illegible] [illegible]াথ
সি এম [illegible] চব্বিশ
পরগনা শ্রী সরল সা[illegible] [illegible]াস্থ্য দফতরের কর্মীবৃন্দ

দক্ষিণ ২৪ পরগন[illegible] [illegible] চিকিৎসা কেন্দ্র

জেলার কোনও সর[illegible] [illegible] ক্যান্সারের রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার কোনওরক[illegible] [illegible] এ রোগ সন্দেহ হলে রোগীকে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার [illegible] পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটি ছাড়াও বেসরকারি কিছু চি[illegible] [illegible]সার রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎ[illegible] [illegible]।

** চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার*
৩৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলি ৭০০০২৬
দূরভাষ ৪৭৬৫১০১/৫১০২

** ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার হোম*
মহাত্মা গান্ধী রোড, ঠাকুরপুকুর
কলকাতা—৭০০০৬৩
দূরভাষ ৪৬৭-৪৪৩৩/৮০০১/৮০০৩

** বারুইপুর ক্যান্সার ডিটেকশন সেন্টার*
নর্মান বেথুন সরণি বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

এখানে নামমাত্র খরচে বায়প্সি ও ক্যান্সার সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়।

** পিয়ারলেস হসপিটাল অ্যান্ড বি. কে. রায় রিসার্চ সেন্টার*
৩৬ পঞ্চসায়র, গড়িয়া
কলকাতা—৮৪
দূরভাষ ৪৬২-০৯৫৫/২৩৯৪/২৪৬২

ক্যান্সার সংক্রান্ত কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের কেমোথেরাপিও করা হয়, দৈনিক বেডভাড়া ৩০০ টাকা, অন্যান্য খরচ আলাদা।

লেখক পরিচিতি ঃ বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখালেখি বর্তমান ও আজকাল পত্রিকায়, বিজ্ঞান সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ (ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত)

বর্তমানে আকাশবাণী ও কয়েকটি পত্রপত্রিকায় স্পেস, চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত লেখক।

লেখিকা পরিচিতি ঃ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাংবাদিকতা আকাশবাণী ও আজকাল পত্রিকায়। ১৯৯০ থেকে দূরদর্শনের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানেও সংযোজক।

সুবর্ণ দাস

গ্রন্থাগার আন্দোলনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার এক বিশেষ অবদান আছে। ভাগীরথীর তটভূমিতে নদীজঙ্গল অধ্যুষিত, ১৭৫৭ সালে ২০ ডিসেম্বর বাংলার নবাব মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪টি পরগনার জমিদারিস্বত্ব উপহার দেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ২৪টি পরগনা সরাসরি ইংরেজের কর্তৃত্বে চলে যায়। ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বিভক্ত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সমগ্রের অংশ হিসাবে নবসৃষ্ট দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার বহু-গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সাক্ষী। ১৯৯১ সালে লোকগণনা অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪-পরগনার লোকসংখ্যা ৫৭,০৮,২৬০ জন। এর মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৫২,৬৭,২৭১ জন। দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রসার সাধনে গ্রন্থাগার সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা পরিষদ এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ১টি জেলা গ্রন্থাগার, ১০টি শহর গ্রন্থাগার এবং ১৩৬টি গ্রামীণ পাঠাগার। অবিভক্ত জেলার গ্রন্থাগার (১৯৭৭ পর্যন্ত) জেলা সমতুল্য ৩টি, কেন্দ্রীয় ২টি, শহর/মহকুমা ৬টি, প্রাইমারি/গ্রামীণ ৮২টি, মোট গ্রন্থাগার ৯৩টি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি সু-প্রাচীন গ্রন্থাগার হল রাজপুর সাধারণ পাঠাগার। এই জেলার শহর ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার মিলে পাঁচটি গ্রন্থাগার শতবর্ষ অতিক্রান্ত করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—জয়নগরের বান্ধব লাইব্রেরি রাজপুর সাধারণ পাঠাগার, মুদিয়ালি লাইব্রেরি প্রভৃতি। ৫০টিরও বেশি গ্রন্থাগার অর্ধ-শতবর্ষ অতিক্রম করেছে।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বারুইপুরের মদারাট বান্ধব পাঠাগার, হরিনাভি প্রগতি সংঘ, কোদালিয়ার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরি, জয়নগর-মজিলপুরের শিবনাথ-শাস্ত্রী পাঠাগার, বারুইপুর পাবলিক লাইব্রেরি, বড়িষা পাঠাগার, বারুইপুর থানার মালঞ্চ মাহিনগরে 'পুরন্দর স্মৃতি মন্দির লাইব্রেরি' প্রভৃতি।

শতবর্ষ ও অর্ধ-শতবর্ষ অতিক্রান্ত গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল : এই সমস্ত গ্রন্থাগারে স্বদেশি পত্র-পত্রিকা বেশি করে রাখা হত। তবে এই সময় অধিকাংশ গ্রন্থাগার ছিল সংঘভিত্তিক। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটি ছিল এই সব গ্রন্থাগার। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বিপ্লবীরা বই, পত্র-পত্রিকার মধ্যে পিস্তল লুকিয়ে আনত। তাই ব্রিটিশ শাসনে গ্রন্থাগারগুলির প্রতি ইংরেজ সরকার তীক্ষ্ণ নজর রাখত এবং প্রয়োজনে গ্রন্থাগারে তল্লাশি চালাত। যে সমস্ত বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী দক্ষিণ ২৪-পরগনা গ্রন্থাগার আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : দেশব্রতী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়, বিপ্লবী দেবেন মিশ্র, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাস রায়, চারণ কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায়। ফলে বেশ কিছু গ্রন্থাগার সরকারি অনুমোদন লাভ করে যেমন ছোটমোল্লাখালি পাবলিক লাইব্রেরি, বাসন্তী থানার সোনাখালি তরুণতীর্থ লাইব্রেরী, বাসন্তীর নেতাজী পাঠাগার, কুলতলি থানার চেমাগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার, ভাঙনখালির সুকান্ত পাঠচক্র, গোসাবা আরামপুরের বিদ্যাসাগর রুরাল লাইব্রেরি। পাথর প্রতিমার দক্ষিণ সুন্দরবন সংহতি সংসদ পাবলিক লাইব্রেরি, ঠাকুরানবেড়িয়া প্রভাতসংঘ পাঠাগার, নামখানার বাগদাহড়া পশ্চিমবাড়ি কিশালাক্ষ্মী ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি প্রভৃতি।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে পত্র-পত্রিকার ভূমিকা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশ শাসনে দক্ষিণ ২৪-পরগনার সংঘভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলি একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চার ভাণ্ডার ছিল অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশ বিরোধী আলোচনাচক্রের গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে জনমত সংগঠিত করেছিল 'সোমপ্রকাশ', 'বঙ্গবাণী', 'মানসী', 'মর্মবাণী', প্রবাসী, নবজীবন, শান্তি, বান্ধব, বঙ্গহিতার্থিনী, বিদ্যাবিলাসিনী, বামাবোধিনী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময় এই সব পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাগারে রাখা এবং প্রকাশ করা বেআইনি ঘোষণা করেছিল। এমন কি ব্রিটিশ সরকার অনেক সময় গ্রন্থাগারে ব্রিটিশ বিরোধী কাজকর্মের জন্য পুলিশি তল্লাশি চালাত।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসার পর দক্ষিণ ২৪-পরগনার গ্রন্থাগার আন্দোলনে জোয়ার আসে। ৪০টিরও বেশি গ্রন্থাগারকে সরকারি অনুমোদন প্রদান করে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কবি-সাহিত্যিক সমাজসেবী-রাজনীতিবিদদের গ্রন্থাগার কমিটিগুলিতে স্থান দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল করতে সমর্থ হয়েছেন। যে সব ব্যক্তিবর্গ বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন এবং কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি শিবদাস ভট্টাচার্য, বারুইপুরের প্রাক্তন বিধায়ক হেমেন মজুমদার, জয়নগরের ডঃ বিমল দত্ত, দক্ষিণ ২৪-পরগনার প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক-মনোরঞ্জন পুরকাইত, রাজপুরের রতনমণি ভট্টাচার্য, কাকদ্বীপের ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানা ও নরোত্তম হালদার, বারুইপুর মদারাটের বীরেন মিশ্র, রামনগরের পণ্ডিত অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী জয়নগরের সুধীর ব্যানার্জি প্রমুখ। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন চালু হওয়ার পর ১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট সরকার পৃথক গ্রন্থাগার দপ্তর প্রবর্তন করেন। জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনায় নতুন গতি সঞ্চার হয়। জেলার গ্রন্থাগার আধিকারিক (District Library Officer) এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বা 'Local Library Authority' জেলার গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জনশিক্ষার প্রসারে তাকে কার্যকর করতে গ্রন্থাগারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা শাখা এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নিয়মিত বার্ষিক সম্মেলন ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়ে নানা সমস্যার আলোচনা গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার মাধ্যম ও তথ্যকেন্দ্র (Information Centre) হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। সাক্ষরতা ও সাক্ষরোত্তর কর্মসূচি রূপায়ণে জেলার গ্রন্থাগার কর্মিগণ সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯৯৬ সাল থেকে সাক্ষরোত্তর পর্যায়ে নবসাক্ষরদের গ্রন্থাগারমুখী করা ও তাদের সদস্য করার জন্য কর্মীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির মধ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ এবং চালু গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া প্রয়োজন। 'প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার'—এটাই আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্লোগান হওয়া উচিত।

যুক্তফ্রন্টের আমলে সুন্দরবন অঞ্চলে হংসধ্বজ ধাড়া ও ভোলানাথ ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি দক্ষিণ

একথা অনস্বীকার্য যে, দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আদিগঙ্গা তীরবর্তী বোড়াল, রাজপুর, কোদালিয়া, বারুইপুর, দক্ষিণ বারাসত, ময়দা, বহড়ু জয়নগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জনপদকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ আন্দোলনের উষাকাল থেকে এই জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়।

১৯৫৩ সালে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পরিষদের (মহকুমা গ্রন্থাগার সংঘ বর্তমানে অবলুপ্ত) সভ্য হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত [illegible] গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করতে ১৯৯৪ সাল থেকে [illegible] ২৪-[illegible]না-জেলা বইমেলা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে [illegible] তীয় সূত্রের "Every reader his book" এবং "Ev[illegible] reader" সার্থক মিলন ঘটে বইমেলায়। গ্রন্থাগারকর্মী [illegible] ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক, প্র[illegible] বইমেলা প্রাঙ্গণে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরি[illegible]। প্রদর্শনী, আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে [illegible] বইমেলা প্রাঙ্গণ। বইমেলা গ্রন্থাগারগুলিকে বই [illegible] করে। শুধু জেলা বইমেলা নয়, জেলার স্বেচ্ছাসেবী সং[illegible] উদ্যোগে আয়োজিত 'আঞ্চলিক বইমেলা' গ্রন্থাগার আ[illegible] হয়েছেন। যেমন বারুইপুরের বুক লাভার্স অ্যাসো[illegible], [illegible]রের শান্তি সংঘ। সোনারপুর সম্মিলনী, সাঁজুয়া ইয়[illegible], জুলপিয়া ক্লাব প্রভৃতি কর্তৃক আয়োজিত বইমেলা, [illegible] ২৪ [illegible] জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের বার্তাবহ হিসাবে বই[illegible] পালিয়েছে।

২৪-পরগনার গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত হয়। বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছায়। ফলে বেশ কিছু গ্রন্থাগার সরকারি অনুমোদন লাভ করে যেমন ছোটমোল্লাখালি পাবলিক লাইব্রেরি, বাসন্তী থানার সোনাখালি তরুণতীর্থ লাইব্রেরী, বাসন্তীর নেতাজী পাঠাগার, কুলতলি থানার চেমাগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার, ভাঙনখালির সুকান্ত পাঠচক্র, গোসাবা আরামপুরের বিদ্যাসাগর রুরাল লাইব্রেরি। পাথর প্রতিমার দক্ষিণ সুন্দরবন সংহতি সংসদ পাবলিক লাইব্রেরি, ঠাকুরানবেড়িয়া প্রভাতসংঘ পাঠাগার, নামখানার বাগদাংড়া পশ্চিমঘড়ি বিশালাক্ষ্মী ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি প্রভৃতি। আমতলার বিদ্যানগরে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগারকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে বৃত্তিশিক্ষার ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাব গড়ে তুলতে বামফ্রন্ট সরকার ভীষণভাবে উদ্যোগী হয়েছেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করার জন্য কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থাগারের ইতিহাস অনুশীলন করা দরকার। ৫০ বছর ৭৫ বছর ও ১০০ বছর অতিক্রান্ত এমন তিনটি গ্রন্থাগারের ইতিহাস নিম্নে আলোচিত হল :

বিদ্যানগরে প্রতিষ্ঠিত জেলা গ্রন্থাগার — *ছবি : সুবর্ণ দাস*

শান্তি সংঘ পাঠাগার (১৯৩৬) :

১৯৩৬ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী গুপ্ত বিপ্লবী দল 'যুগান্তরের' সক্রিয় কর্মী শচীন ব্যানার্জি কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার, নদিয়ার চারণকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ সংঘে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁরা নানা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতেন। হাতে লেখা 'শান্তি' পত্রিকা প্রকাশিত হত যাতে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধও থাকত। বিপ্লবী সুবোধ ব্যানার্জি এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯৪০ সালে এই সংঘের উদ্যোগে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয় এবং সংঘের তরুণ সংগঠক পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে তাঁর নামে পাঠাগারের নাম 'পরিতোষ পাবলিক লাইব্রেরি' রাখা হয়। ১৯৪২ সালে শচীন ব্যানার্জি কানাই ব্যানাজি প্রমুখ 'ভারতরক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার হন। এই সময় ব্রিটিশ প্রতিনিধি স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে ভারতে আসেন কিন্তু দৌত্য ব্যর্থ হলে 'শান্তি' পত্রিকার ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতা ও জনগণের কর্তব্য নামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সংঘের উপর পুলিশের নজর পড়ে এবং পুলিশ সংঘ কার্যালয় ও পাঠাগারে খানাতল্লাশি চালায়। বইপত্র নষ্ট করে এবং 'শান্তি' পত্রিকার কপি ও কয়েকটি পুস্তক বাজেয়াপ্ত করে। এইভাবে কিছুদিন নানা খাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শান্তি সংঘ পাঠাগার সামাজিক ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে চলেছে।

মদারাট বান্ধব পাঠাগার (১৯১৩) :

১৯১০ সালে বারুইপুরের মদারাটের নিকটবর্তী প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাহিনগরে ১৯১০ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি সাধারণ পাঠাগার। মদারাটের তৎকালীন যুবকগণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে তোলেন 'মদারাট বান্ধব পুস্তকালয়', যাঁদের প্রচেষ্টায় সে সময় পাঠাগারটি গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিপ্লবী সুবোধ মুখোপাধ্যায়, অবনীভূষণ নাগ, রমেন্দ্রনাথ মান্নিক, নারায়ণচন্দ্র মিশ্র, প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। স্থানীয় অধিবাসী যোগেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয়ের একখানি ঘরে ১৯১৩ সালের ৯ মে বাংলা ১৩২০ সনের শুভ অক্ষয় তৃতীয়াতে প্রতিষ্ঠিত হল পাঠাগার। পাঠাগারের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মাত্র ২৯৬ খানি পুস্তক নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও মাত্র ৪ বছরের প্রচেষ্টায় পুস্তক সংখ্যা ২১০০তে পৌঁছায়। বাইরে থেকে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র দানবীর বিজয়চন্দ্র সিংহ, বারুইপুর পদ্মপুকুর নিবাসী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গ্রামের মধ্যে ছিলেন পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গসহ ভূপেন্দ্রনাথ মন্ডল, হরিপদ দাস প্রমুখ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ মিশ্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৩৯ সালের ১৮ জুন বারুইপুরের প্রথম মুন্সেফ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মিশ্র পরিবারের দান করা জমিতে নব উদ্যমে নবনির্মিত ভবনের কাজ শুরু হয়—ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই যুগে। পাঠাগারের দুটি শাখা খোলা হয়, একটি মদারাটের নিকটবর্তী আটঘড়ায়, অপরটি বারুইপুর স্টেশনে দেবেন্দ্র মিশ্রর সুলভ ফার্মেসিতে। ১৯৫৩ সালে গ্রামের বালকদের দুটি পাঠাগার তরুণ সংঘ পাঠাগার ও কিশোর পাঠাগারকে সংযুক্ত করে বান্ধব পাঠাগারেই 'বালকবিভাগ' খোলা হয়। ১৯৬০ সালে কিছু যুবক পাঠাগারের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হলে পাঠাগারের কর্মে জোয়ার আসে। ১৯৬১ সালে পাঠাগারটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে।

জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য গ্রন্থাগারের নিজস্ব পত্রিকা 'বান্ধব' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

রাজপুর সাধারণ পাঠাগার (১৮৭৭) :

১৮৭৭ সালের মার্চ মাসে (ফাল্গুন, ১২৮৩) বিদ্যোৎসাহিনী সভায় পাঠাগারের সূচনা হয়। ছ' মাস পরে রাজপুর দক্ষিণ পাড়ার জমিদার গোবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের বহির্বাটিতে এই পাঠাগার স্থানান্তরিত হয় এবং এর নাম হয় 'বান্ধব পাঠাগার'। রাজপুর বান্ধব নাট্য সমাজের খ্যাতি তখন বহু বিস্তৃত। আর সেই কারণে বান্ধব পাঠাগার নামকরণ করা হয়। পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ৭ বছর পর লর্ড রিপনের নামানুসারে পাঠাগারের নতুন নামকরণ হয় রাজপুর রিপন লাইব্রেরি, দক্ষিণ পাড়ার নিত্যনাথ মিত্র, মহাশয় বড়লাটের সেক্রেটারি এইচ ডবলিউ প্রিমরোজকে পত্র লিখে বড়লাটের অনুমতি আনান। যে সমস্ত সমাজসেবী পাঠাগারের পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পণ্ডিতপ্রবর হরিশ কবিরত্ন, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীশচন্দ্র রায়, নবগোপাল চক্রবর্তী, নিত্যনাথ মিশ্র তারাপ্রসন্ন মিত্র, বসন্তকুমার সরকার, বিধুভূষণ চক্রবর্তী এবং অঘোরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। ১৮৮৪ সালে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪১৯। সে সময় সকাল ৭টা থেকে ৯টা এবং বিকাল ৩টে থেকে ৫টা পর্যন্ত পাঠাগারটি সাধারণের জন্য খোলা থাকত। মাসিক চাঁদা ছিল দুআনা (বর্তমানে ১২ পয়সা) এবং বার্ষিক চাঁদার হার ছিল ১ টাকা। বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ১৩২ টাকা ৩ আনা এবং খরচ হয় ১৩১ টাকা ১৪ আনা ১০ গণ্ডা। ইংরাজি শিক্ষার জন্য ১৯০৫ সালে পাঠাগারে পৃথক ইংরাজি বিভাগ খোলা হয়। ক্রমশ পাঠাগারের ইংরাজি পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯০৮-৯ সালে পাঠাগারটি সরকারি তালিকাভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। ১৯১৮-১৯ সালে পাঠাগারের বাৎসরিক আয় ছিল ৭৮৬ টাকা ৮ আনা এবং খরচ ৬৬৬ টাকা ১০ আনা ১৫ গণ্ডা। ওই সময় পাঠাগারের বাংলা পুস্তক সংখ্যা ছিল ৩১২৫ এবং ইংরাজি পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৮৮৯। হরিপ্রসাদ রায়, সারদাপ্রসাদ নস্কর, ডঃ প্রভাত মিত্র, ব্রজেন্দ্র মিত্র, প্যারিমোহন রায়, শরৎচন্দ্র দত্ত, জানকীনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছিল পাঠাগার গৃহ। ১৯৪৮ সালে রিপন লাইব্রেরির পরিবর্তে পাঠাগারের নতুন নামকরণ হয় রাজপুর সাধারণ পাঠাগার। ১৯২৪ সালে [illegible]বক [illegible] দত্তের অনুপ্রেরণায় স্থানীয় যুবকরা 'ছাত্র সংঘ পাঠা[illegible] [illegible] পাঠাগার স্থাপন করেন। পরে সেটি রাজনৈতিক [illegible] [illegible]মতে পরিণত হয়। ১৯৪৯ সালে সেটির অবলুপ্তি [illegible] [illegible] [illegible]রের সমস্ত পুস্তক সাধারণ পাঠাগারে প্রদত্ত হয়। [illegible] [illegible] রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও কবিশেখর কালিদাস রা[illegible] [illegible] [illegible]রের গভীর যোগাযোগ ছিল।

যাঁদের পাদস্পর্শে [illegible] [illegible] হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন রাজা জ্যোৎস্নাকুমার [illegible] [illegible] [illegible]রপতি আশুতোষ চৌধুরী, বিচারপতি বিজনকুমার [illegible] [illegible] বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী, নাট্যাচার্য অমৃতল[illegible], [illegible]ক গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথ নাথ ঘোষ, গৌরীশংক[illegible] [illegible] [illegible]দিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ [illegible] [illegible]ক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯৮১ সালে বা[illegible] [illegible] [illegible] পাঠাগারকে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত করেছেন।

সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে সংগঠিত সংঘ বা ক্লাব গ্রন্থাগার দক্ষিণ ২৪-পরগনার গ্রন্থাগার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। যেমন— বাসন্তী থানার মহেশপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব অ্যান্ড কল্পনা পাঠাগার, ক্যানিং বন্ধুমহল, বারুইপুর সোনালী সংঘ পাঠাগার, বারুইপুরের কমলা ক্লাব পাঠাগার, তালদি বহুরূপী সংঘ, বারুইপুরের মদারাটের শরৎ স্মৃতি সদন, সাঁজুয়া ইয়ং অ্যাসোশিয়েসন, সাগরদ্বীপের নেতাজী ক্লাব, সোনারপুর ট্রেস্ট বুক লাইব্রেরি, প্রভৃতি।

উনবিংশ শতকে নবজাগরণের ভাবধারায় প্রাণিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত মানুষের একাংশের উদ্যোগে বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। আজকের গ্রন্থাগার শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিত মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য নয়, তা সর্বসাধারণের জন্য। ১৯৯৪ সালের গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন দ্বারা গ্রন্থাগার পরিষেবাকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করতে বিশেষভাবে নবসাক্ষর ও শিশুদের জন্য সংগঠিত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বলা হয়েছে "Organise Library Services for Non-literates and Children" এবং এই লক্ষ্য নিশ্চিত করতে প্রতি গ্রন্থাগারে মোট সরকারি অনুদানের শতকরা ১০ ভাগ শিশুদের ও অন্য ১০ ভাগ নব সাক্ষরদের পুস্তক ক্রয়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শুধুমাত্র পাঠকই গ্রন্থাগার তৈরি করে তা নয়, গ্রন্থাগারও পাঠক তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথ তার 'Function of a Library' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন "That the readers make the Library is not the whole truth। The Library likewise makes the readers". প্রকৃতপক্ষে সচেতন পাঠকই ভাল গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে পারে। আর গ্রন্থাগার আন্দোলন এ বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

জনশিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। সাক্ষরোত্তর ও প্রবহমান শিক্ষার মূল কথা হল "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গ্রন্থাগারের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন," "লাইব্রেরি অংশে মুখ্যত জমা করে রাখে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে। কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা।" জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠকরা গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলতে আন্তরিক সচেষ্ট হলে জেলার গ্রন্থাগার সার্থকতরা পথে অগ্রসর হতে পারবে।

এই হল দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রধান গ্রন্থাগারিক রামকৃষ্ণ সাহা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রবীর রায়চৌধুরী অধ্যাপক কৃতপদ মজুমদার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অরুণ রায় জয়নগর নিবাসী ভূতনাথ মুখার্জি, রাজপুর সাধারণ পাঠগারের সম্পাদক রতনমনি ভট্টাচার্য মদারাট বান্ধব পাঠগারের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ মিত্র দক্ষিণ ২৪-পরগনা কবি ও ছড়াকার মনোরঞ্জন পুরকাইত সমাজসেবী দিলীপ সরকার (সম্পাদক, বারুইপুর শহর গ্রন্থাগার) অধ্যাপক বিজয়পদ মুখার্জি ও অধ্যাপক মঙ্গলপ্রসাদ সিনহা।

লেখক পরিচিতি ঃ গ্রন্থাগার, ক্যালকাটা গার্লস বি. টি. কলেজ।

অমল কবিরাজ

খেলাধুলায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

১৯৪২-৪৩ সাল। অবিভক্ত ২৪-পরগনা জেলা ক্রীড়া সংঘ সোদপুরে (উত্তর ২৪-পরগনায়) স্থাপিত হয়েছিল। তদানীন্তন ক্রীড়া পরিচালকরা জেলার বিভিন্ন মহকুমায় মহকুমা ক্রীড়া সংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছিলেন। আমাদের এখানে অধিবেশন বসল ফুটিগোদা মিলন সমিতির কার্যালয়ে। কিন্তু যে ক্রীড়া সংঘ গড়া হল, সেদিন তা স্থায়ী হয়নি একটি বছরও। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে সর্বজন পরিচিত শ্রদ্ধেয় শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ও সুপরামর্শে স্থাপিত হল 'দক্ষিণ ২৪-পরগনা ক্রীড়া ও ব্যায়াম সংঘ'। ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শিবপ্রসন্ন ঘোষালের সর্বাঙ্গীণ সাহচর্যে স্বীকৃতি লাভ করল এই সংঘ। সুশীলকৃষ্ণ দত্তের নেতৃত্বে এই সংঘের ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে আবির্ভূত হন অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু, লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ সিংহ এবং আরও অনেকে। ডায়মন্ডহারবারের সন্ন্যাসী ব্যানার্জী ও সরিষার বিভুপ্রসাদ বসু দুই খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় ওই অঞ্চলের খেলাধুলা সংগঠিত হয়। বজবজ ও মহেশতলায় অজিত ঘোষ ও অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বিভিন্ন রকম খেলাধুলা সংগঠিত করা হয়।

কেবলমাত্র খেলাধুলাকে সংগঠিত করলে হবে না, চাই দক্ষ ও যোগ্য ক্রীড়া পরিচালক। শৈলেন্দ্রকুমার দত্ত ও রাধাশ্যাম নন্দীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সদর সাব-ডিভিশন্যাল রেফারিজ বোর্ড। প্রথম দিকে রেফারিদের শিক্ষণের ব্যাপারে নিকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে রণজিৎ বসু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে এই সংঘ দক্ষিণ ২৪-পরগনা রেফারি সংঘ নামে পরিচিত। এর বহু সভ্য কেবলমাত্র জেলার বিভিন্ন খেলাধুলা পরিচালনা করেন না, রাজ্য স্তরে, জাতীয়স্তরে, এমনকী আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন খেলাধুলা পরিচালনা করেন সুনামের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ক্রিকেট আম্পায়ার ডাঃ শেখর চৌধুরী।

দক্ষিণ ২৪-পরগনায় সাঁতারের সুনাম সর্বজনবিদিত এবং বহু ছেলেমেয়ে কেবলমাত্র জাতীয় স্তরে নয়, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রতিনিধিত্ব করেছে। আমাদের জেলার সাঁতারের প্রশিক্ষক কে পি সরকারের অবদান আছে। গৌতম পুরকাইত, শান্তনু পুরকাইত, নিতাই পুরকাইত, গৌর পুরকাইত, নূর হোসেন ঢালী, সুপ্রিয়া সর্দার ও বিশ্বজিৎ দেচৌধুরী, নিখিল হালদার এবং আরও অনেক সাঁতারু জেলার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। অ্যাথলেটিক্সেও আমাদের জেলার সুনাম ছিল এবং আছে। হকি ও বাস্কেটবল পরে শুরু হলেও ইতিমধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা পশ্চিমবঙ্গে একটা জায়গা করে নিয়েছে।

তারপর প্রয়োজন পড়ল নিজস্ব খেলাধুলার আস্তানা। বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটির সহযোগিতায় একখণ্ড জমি পাওয়া গেল এবং সেখানে গড়া হয় সংঘভবন। প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ২৪ এপ্রিল ১৯৫৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তৎকালীন জেলাশাসক বি আর গুপ্ত সংঘের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন।

নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল খেলাধুলা। নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে, যথা গোসবা, বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলীর মত প্রান্তিক এলাকায় স্থাপিত হল আঞ্চলিক ক্রীড়া সংঘ খেলাধুলাকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে। ১৯৮৬ সালে সুবিস্তীর্ণ ২৪-পরগনা জেলা প্রশাসনিকভাবে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সুবাদে জন্ম নিল নতুন দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা। তাই ক্রীড়া সংঘের জীবনে ঘটল পুনর্জন্ম নতুন নামে ও নতুন কলেবরে। বারুইপুরে স্থাপিত হল 'দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলা ক্রীড়া সংঘ' এবং রচিত হল নতুন সংবিধান। স্বভাবতই খেলাধুলার ক্ষেত্রে সংযোজিত হল এক নতুন অধ্যায় আর সূচিত হল নবদিগন্তের উন্মেষ। প্রথম বছর কোনও নির্বাচন নয়, সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি হলেন জেলাশাসক শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য মহাশয়, কার্যকরী সভাপতি ডঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅমল কবিরাজ আর পরিচালকমণ্ডলীতে আনা হল দক্ষ, কর্মঠ ও অভিজ্ঞ ক্রীড়া সংগঠকদের। এক এক করে পাওয়া গেল এগারোটি রাজ্যস্তরের স্বীকৃতি যথা ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট,

১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের অন্যতম খেলোয়াড় বিজয় বসু বহড়ুর বসু পরিবারের সন্তান, ছবিতে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিও আছেন

সাঁতার, বাস্কেটবল, হকি, কবাডি, অ্যাথলেটিক, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও গ্লোবল ইত্যাদি।

১৯৯২ সালে সভাধিপতি শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য ও তৎকালীন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীহেমেন মজুমদারের আন্তরিক প্রয়াসে সরকারি অনুদান ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহযোগিতায় সংঘগৃহ দ্বিতল করা হয় এবং এর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়। ইতিমধ্যে আমাদের জেলায় আরও তিনটি নতুন মহকুমা স্থাপিত হয়েছে। তাই মহকুমাভিত্তিক খেলাধুলার পরিকাঠামো পুনর্গঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে।

অতীত দিনে যাঁরা ফুটবলে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের দু-একজনের নাম উল্লেখ করছি যা আমার স্মৃতিগোচরে আছে। যথা হৃদয় দাস, রতন বসু, সন্ন্যাসী ব্যানার্জী, সোমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রভাত রায়চৌধুরী, মঙ্গল পুরকায়স্থ প্রমুখ এবং এর পরবর্তীকালে প্রতাপ ঘোষ, অতনু ভট্টাচার্য, অমিত ভদ্র, সুনির্মল চক্রবর্তী, শঙ্কর ব্যানার্জী, মানস ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। এই ধারাকে অব্যাহত রেখেছে আমাদের জেলার খেলোয়াড়রা। কারণ একটা উদাহরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বিগত বছর জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্য দলে আমাদের জেলার পাঁচজন খেলোয়াড় যথা আলি রেজা, প্রশান্ত চক্রবর্তী, অমিত দা... ...জন ... ও বাসুদেব মণ্ডল অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে জেলার ... ...ৃদ্ধি করেছে। আন্তঃজেলা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আমাদের ... ... বিজয়ী ও বিজিতের সম্মান অর্জন করেছে। বিগ... ...৯৮... ...লে আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হ... ...ৃআই এফ এ শিল্ডে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পায় এবং এই ... দল ...মেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে উজ্জ্বল কৃতিত্বে... ...হল। দক্ষিণ ২৪-পরগনায় সাঁতারের সুনাম সর্বজন... ...এবং ...ছেলেমেয়ে কেবলমাত্র জাতীয় স্তরে নয়, এমনকী আন্ত... ...তিনিধিত্ব করেছে। আমাদের জেলার সাঁতারের প্রশি... ...রের অবদান আছে। গৌতম পুরকাইত, শান্তনু পুরক... ...কাইত, গৌর পুরকাইত, নূর হোসেন ঢালী, সুপ্রিয়া ... ও ... দেচৌধুরী, নিখিল হালদার এবং আরও অনেক ... ...র সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। অ্যাথলেটিক্সেও আমাদে... ... ছিল এবং আছে। হকি ও বাস্কেটবল পরে শুরু ...ও ...ধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েরা পশ্চিমবঙ্গে একটা জায়গা করে নিয়েছে। অন্যান্য খেলাধুলায় আমরা পিছিয়ে নেই।

আমাদের জেলায় নরেন্দ্রপুরে ও সন্তোষপুরে দুটি স্টেডিয়াম আছে। আরও দুটি ডায়মন্ডহারবার ও বজবজে তৈরি হচ্ছে। জেলা ক্রীড়া সংঘের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কোনও স্টেডিয়াম নেই, তবে এটা বিশেষ প্রয়োজন। বারুইপুর ও কালিকাপুরে দুটি স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। কিছু কিছু কাজ শেষ হলেও এখনও অনেক কাজ বাকি। সরকারি অনুদানে তালদিতে একটি সুইমিং পুল তৈরি হয়েছে এবং ক্যানিংয়ে নিজেদের উদ্যোগে একটি সুইমিং পুল তৈরি হয়েছে। বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি একটি সুইমিং পুল তৈরি করলেও এখনও তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সাঁতারুদের স্বার্থে এই ব্যাপারে আমাদের আন্তরিক প্রয়াস চালানোর দরকার যাতে এই পুল ব্যবহার করা যায়। ধানুয়ায়ও একটি সুইমিং পুল তৈরির কাজ শুরু হবে শীঘ্র। আমাদের বহু ক্লাব নিজেদের উদ্যোগে খেলার মাঠ তৈরি করলেও প্রান্তিক এলাকায় খেলার মাঠের অভাব আছে। বারুইপুর স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সে একটি জিমন্যাস্টিক্ হল আছে এবং সেখানে সারা বৎসরব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

আজও আন্তঃজেলা যে কোনও প্রতিযোগিতায় আমাদের জেলাদল সুনামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলেছে। তবে কিছু কিছু সাফল্য আমাদের আনন্দিত করেছে, উৎসাহিত করেছে আবার কিছু কিছু ব্যর্থতা আমাদের নিরাশ করেছে, দুঃখ দিয়েছে। জেলার খেলাধুলাকে সচল রাখার জন্য আমাদের কর্মীরা আন্তরিক প্রয়াস রাখলেও, কাজের বিশালতা অনুযায়ী আরও চাই দক্ষ, অভিজ্ঞ সক্রিয় কর্মঠ কর্মীর।

একদিকে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অপরদিকে কর্মের পরিধি আমাদের ভাবিত করছে। আমরা চাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক সংখ্যক ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করুক সারা বৎসরব্যাপী বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে। কারণ এর উপর নির্ভর করবে খেলাধুলার গুণগত মান। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ক্রীড়াসংগঠকদের আন্তরিক প্রয়াসে ও প্রশাসনিক সাহচর্যে জেলার খেলাধুলা আরও সুসংগঠিত হোক, সমৃদ্ধ হোক—এই প্রত্যাশা রাখছি।

লেখক পরিচিতি : চব্বিশ পরগনা জেলা ক্রীড়াসংঘ (দক্ষিণ)-এর প্রাক্তন সচিব

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরবনের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) পটভূমিতে বাংলা ছোটগল্প ও উপন্যাস

বাংলা কথাসাহিত্যে কোনও বিশেষ অঞ্চলের জনজীবন, সংস্কার, বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি ও বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবনের কথা এসেছে অনেক পরে। এসব কথা প্রায় সব সাহিত্যেই আসে অনেক পরে। একটু একটু করে জীবনমুখী হতে হতেই লেখকেরা বিশেষ অঞ্চলকে ভর করতে থাকেন। বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে যিনি জোয়ার আনলেন, তিনি উপন্যাসে এনেছিলেন কিছু অভিজাত মানুষ, যারা মোটেই গ্রামীণ নয়। তাঁর লেখায় সামাজিক বিষয় এসেছে, কিন্তু সে-সমাজ এক বিশেষ অঞ্চলের সমাজ নয়, কথাসাহিত্যের সূচনাপর্বে তাই নগরই আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এই পর্বের উপন্যাসধর্মী কিছু আখ্যান ও নকশার ক্ষেত্রেও ঘটেছে ওই একই ঘটনা। 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবু বিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'য় উনিশ শতকী কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবি এসেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা। অবশ্য গ্রাম এসেছে তাঁর গল্পে। শরৎচন্দ্রে লেখায় আছে কলকাতা, রেঙ্গুন, পাটনা, আগ্রা। আছে পল্লী ও পল্লীসমাজ। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক রূপায়ণ তাঁর লেখায় ঘটেনি।

সাহিত্যে প্রত্যন্ত এলাকা নিয়ে লেখার একটা ঝুঁকি আছে। কাছে গিয়ে সেখানকার জীবন না দেখলে তাকে কলমে তুলে আনা যায় না। টেবিল-ওয়ার্ক এক্ষেত্রে অচল। সাজানো-চাপানো ঘটনার বুননে আর যাই হোক চমক সৃষ্টি করা যায় না। তবে দেখা যাচ্ছে—এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটি কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সক্ষম লেখকের নজরে পড়ে গেছে। এটাই আশার কথা।

লেখার বিষয় ও ধরন বেশিদিন একরকম থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখার ধরন ও বিষয় পাল্টে যায়। ত্রিশের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে ঘটল ভৌগোলিক বিস্তৃতি। সাহিত্যে যারা নিতান্ত অপাঙক্তেয় ছিল, তাদের নিয়ে লেখকেরা লিখতে আগ্রহবোধ করতে থাকলেন। বিশেষ কিছু অঞ্চল নিয়ে লেখালেখি শুরু হল। উঠে এল আঞ্চলিক উপন্যাস ও Local colour fiction. কোনটাতে শুধু ভৌগোলিক বিস্তারই নয়, ঘটল জীবনবোধের বিস্তার, আবার কোনওটাতে এল স্রেফ একটা আঞ্চলিক জীবনচিত্র, জীবনের গভীরে যাওয়া এখানে দেখা গেল না। বিশেষ অঞ্চল নিয়ে কথাসাহিত্যের সূচনা করলেন শৈলজানন্দ। কয়লাখনি অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে লিখলেন 'কয়লাকুঠির দেশ'। তারপর সাহিত্যে এক এক করে এলো বীরভূম-মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী-লালিত ভূখণ্ড, বিহারের জনপদ, পদ্মানদী সংলগ্ন অঞ্চলের জেলে জীবন, রাঢ়বাংলা জনজীবন, এল কুমিল্লার তিতাস-তীরের জেলে জীবন, পদ্মালালিত মাঝিমাল্লা অধ্যুষিত বাংলা, কুরুপালার জনজীবন, পশ্চিমবাংলার জেলে জীবন ও জলজীবন ইত্যাদি।

খুব স্বাভাবিকভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে এল আরেকটি জনপদ। ২৪-পরগনার সমুদ্রঘেঁষা শ্বাপদসংকুল জলজঙ্গলময় সুন্দরবন অঞ্চল। কথাসাহিত্যে ধরা পড়ল প্রত্যন্ত একটি এলাকার জনজীবন, যা বাঙালি পাঠকের কাছে ছিল নিতান্ত অপরিচিত। এক বিচিত্র সংগ্রামী জীবনের স্রোত এখানে বয়ে চলে। জীবনসংগ্রাম এখানে বড় কঠিন। এখানকার বাসিন্দাদের বলা হয় 'দোখ্নো' (দক্ষিণের অধিবাসী অর্থে)। এই দোখ্নোরা এখানে বেঁচে থাকে বাঘ-সাপ-কুমীরের কামড় বাঁচিয়ে এবং লোভী হিংস্র মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এখানকার আরণ্যক পরিবেশ, এক মুঠো ভাতের জন্য লড়াই, 'দোখনো'দের বঞ্চিত শোষিত জীবন তো অনায়াসেই লেখার খোরাক হতে পারে। শুধু দরকার লেখকদের একটু সুন্দরবনমনস্কতা।

বঙ্কিমচন্দ্র যে একেবারেই সুন্দরবনের কথা তোলেননি এমন নয়। তাঁর 'লোকরহস্যে'র গল্পরসাশ্রিত স্তবক 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। 'কপালকুণ্ডলা'তেও এসেছে গঙ্গাসাগরের একটুকরো প্রসঙ্গ। বঙ্কিমের সহযোগী অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রায় বঙ্কিমী কায়দায় 'সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকার' নামের একটি গল্প লিখেছিলেন। এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুচরিত' তো প্রায় সকলেরই জানা। সেখানে সুন্দরবন নিয়ে মজলিশি গল্প শুনতে পাই ডমরুধরের মুখে। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা 'হরিণের আত্মোৎসর্গ' নামের ব্যঙ্গাত্মক গল্পও আমাদের কাছ থেকে এখনও হারিয়ে যায়নি। শিবনাথ শাস্ত্রীও শুনিয়ে গেছেন সুন্দরবনের

বাঘের গল্প। তাঁর গল্পে লোকালয়ে বাঘ ঢোকার যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সে ঘটনা আজও ঘটে। এ গল্পের বাঘটি নাকি একটি মহিলার হাতের জ্বলন্ত কাঠ দেখে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'বনেজঙ্গলে'-তে সুন্দরবনের যেসব গল্প আছে, তা আমাদের কাছে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সুন্দরবন চর্চা আমাদের কাছে অজানা নয়। কিশোরদের জন্য তিনি লিখে গেছেন 'সুন্দরবনের রক্ত পাগল', 'সুন্দরবনের মানুষ বাঘ।' এইসব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে আছে তাঁর শখের গোয়েন্দা চরিত্র জয়ন্ত-মানিক, রসচরিত্র সুন্দরবাবু। তাঁর অমাবস্যার রাতে আছে ভুলু ডাকাতের কথা।

অথচ রবীন্দ্রনাথ যে সুন্দরবন সম্পর্কে কেন চুপচাপ ছিলেন তা বলা মুশকিল। খোদ সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে (১৯৩২ সালে, গোসাবায়) রবীন্দ্রনাথ সুন্দরবনের পটভূমিতে অন্তত একটা গল্প লিখে যেতে পারতেন। লেখেননি। শুধু 'সে'-র দাদু-নাতনির আসরে দাদামশাইয়ের মুখ দিয়ে সোঁদরবনের একটি ছড়া বলিয়েছেন মাত্র। অবশ্য একটা কৈফিয়ৎও তিনি দিয়ে গেছেন—"আমি যে ওদের ভাষা জানি না, না হলে আমিই লিখতাম।" রবীন্দ্রোত্তর শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তে'র ১ম পর্বে মেজদার মুখে শুধু একটু 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগারে'র কথা বসিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। অবশ্য রাজশেখর বসু সুন্দরবনের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছেন। তাঁর 'দক্ষিণ রায়' গল্পের বকুলাল তো ভোটে দাঁড়াবার জন্য সুন্দরবনকেই বেছে নিয়েছিল।

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে নিশ্চিন্দিপুর, পাঁচপোতা প্রভৃতি অঞ্চলের পাশে আমরা পেয়েছি সুন্দরবনের টাকি-শ্রীপুর নকীপুর অঞ্চলের উল্লেখ। 'পথের পাঁচালি'র বীরু রায়ের কাহিনীতে দেখি সুন্দরবনের জলপথ বিভূতিভূষণের জানা। 'ইছামতী'তে সুন্দরবনের সামান্য একটু ছোঁয়া পাই—'সেই ফাল্গুনের' 'চৈত্রে' 'কত মহাজনী নৌকা' "গাঙ বেয়ে যাবে এই পথে সুন্দরবনের মোম, মধু সংগ্রহ করতে।" তাঁর লেখা 'ডালুর বিপদ', 'বাঘের মন্তর' গল্পে আছে সুন্দরবনের কথা। 'বাঘের মন্তরে' নিধিরাম ভট্টচাজ যেমন শুনিয়েছেন সুন্দরবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, তেমনি 'ডালুর বিপদে'ও এক বৃদ্ধ মাঝি ডালুকে শুনিয়েছে সুন্দরবনের গল্প। কিশোরদের জন্য লেখা একটা উপন্যাসও আছে [illegible]তিভূষণের। 'সুন্দরবনে সাত বছর'। অবশ্য উপন্যাসটি লেখা [illegible] করে[illegible]নমোহন রায়, শেষ করেন বিভূতিভূষণ। দাদামশায়ে[illegible]পের মেলায় গিয়ে একটি কিশোর ডাকাতের হাতে [illegible] এইভাবেই শুরু হয়েছে।

অখণ্ড বাদা অঞ্চ[illegible]পকার মনোজ বসু। তাঁর জলজঙ্গল, বন কেটে বস[illegible] সুন্দরবনের সংগ্রামী মানুষের জীবন পাঁচালি, বৃত্তিকেন্দ্রি[illegible]স্ত দলিল। তাঁর বাদাবনের গান, বনমর্মর, পৃথিবী ক[illegible]াধিক ছোটগল্পে বাদা অঞ্চলে যে জীবন আছে, তা তাঁর [illegible]খানকার সৌদামিনীদের কথা তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন—[illegible]টোয়ারা করে দিয়েছিস্ তবে আমাদের সেখানে পাঠা[illegible] এসব মনোজ বসুর টেবিল ওয়ার্ক নয়। পুববাং[illegible] সুন্দ[illegible] নিয়ে লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর [illegible]। ওঁদের উপন্যাস যথাক্রমে উপনিবেশ, সুন্দরবনে আর্জান সরদার। উপনিবেশে তেঁতুলিয়ার মোহনায় গড়ে ওঠা চরইসমাইলের জনজীবন। ইতিহাসচেতনা ও জীবনবোধ মিশিয়ে লেখক আমাদের অনেকখানি চিনিয়ে দিয়েছেন সুন্দরবন। তাঁর 'দোসর' গল্পে আছে খুলনার বাদা অঞ্চলের একটি মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

সুন্দরবন একটি প্রাচীন জনপদ। আগে একে আমরা কখনও সমতট, কখনও ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল, কখনও ভাটির দেশ নামেই ডেকেছি। তারপর ষোড়শ শতক থেকে সুন্দরবন নামে ডাকতে শুরু করেছি। মাঝখানে এই জনপদ জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর নতুন করে আবার গড়ে উঠেছে এখানে জনপদ। দেশভাগ এসে দু-টুকরো করল একে। ওপারে পড়ে রইল খুলনা-বরিশাল, এপারে ২৪-পরগনা। তারপর এই সেদিন ২৪-পরগনাও হয়ে গেল দুভাগ। উত্তর আর দক্ষিণ। এই দক্ষিণের কিছু জনপদ গোসাবা, সাতজেলিয়া, ক্যানিং, বাসন্তী, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর ইত্যাদি। এসব অঞ্চল ও এখানকার অভাবী নিম্নবর্গের মানুষের জীবন দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যে ছিল উপেক্ষিত। অথচ জল-মাটির গন্ধ-মাখানো এই জনপদ থেকে কথাসাহিত্যিকরা অনায়াসেই পেয়ে যেতে পারেন লেখার প্রচুর উপাদান।

বিশ শতকের সূচনাতেই নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ একটি উপন্যাস লিখে গেছেন। উপন্যাসটির নাম 'কুমুদানন্দ'। প্রকাশকাল ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। জয়নগরের নীলকণ্ঠ মতিলালের বাড়ির দুর্গোৎসবের ঘটনা দিয়েই উপন্যাসের শুরু। উপন্যাসে রায়নগর রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যে রাজ্যটি ৮৯৫-৯৭ সালে রাজা সুবুদ্ধি রায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখনকার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় রায়নগর। জয়নগর, মগরা ইত্যাদি অঞ্চলগুলোও এই রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। উপন্যাসটি সুন্দরবনের ইতিহাস জানার পক্ষে অনেকটা বিশ্বস্ত। তবে এটা যে ঐতিহাসিক উপন্যাস—লেখকের এ দাবি মেনে নেওয়া অসম্ভব।

বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান ব্যক্তিত্ব প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন সুন্দরবনমনস্ক ছোট গল্পকার। তাঁর 'সাগরসঙ্গম', 'অরণ্য পথ' গল্প দুটি সুন্দরবনের পটভূমিতে লেখা। শহরের উদ্দেশে লেখক অরণ্য পথের এক জায়গায় বলেছেন—'তোমার পাষাণ বন্দীশালায় অনেক ঘুরিয়াছি—তবু কিছু মেলে নাই।" তাই কি শহর ছেড়ে সুন্দরবনের নির্জনতায় গা-ঢাকা দেওয়া? তাঁর 'সাগর সঙ্গমে' আছে গঙ্গাসাগর যাত্রার কথা। দাক্ষায়ণী ও বাতাসীরা চলেছে গঙ্গাসাগরে। সে সময়ে গঙ্গাসাগর যাওয়াটা যে কত ঝুঁকিবহুল, তা গল্পটি পড়লে জানা যায়। এখানকার দাক্ষায়ণী চরিত্রে দেখানো হয়েছে মাতৃত্বের বিশালতা। গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গ এসেছে একাধিক বাংলা গল্প উপন্যাসে। যেমন, চারু মুখোপাধ্যায়ের 'রোহিনী', মানিকের 'হলুদ নদী সবুজ বন' ইত্যাদি। মানিকের 'হলুদ নদী সবুজ বনে'র কাহিনীর মধ্যে প্রথম থেকেই ঢুকে আছে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং তাকে মারতে দেশি-বিদেশি' শিকারী-চরিত্র। উপন্যাসের শেষে আছে—লখার মাদের সঙ্গে বনানীর গঙ্গাসাগর যাওয়ার উল্লেখ। এই উপন্যাসের ঘটনা নিয়ে লেখা 'বড়দিন' নামের ছোট গল্পে দেশি শিকারী ঈশ্বরকে নিয়ে বড় মিঞার বনে পিকনিক করতে যাওয়ার প্লান হয়েছে।
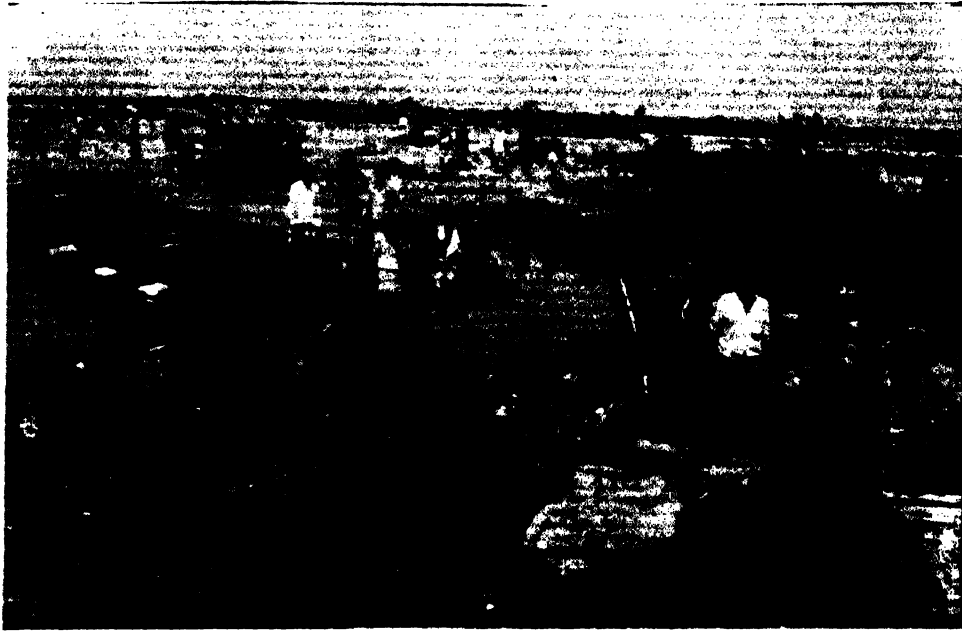
সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের নিয়েই সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস 'গঙ্গা'

শিবশঙ্কর মিত্রের লেখার বিশেষ বিষয় সুন্দরবন। তাঁর বেদে-বাউলে উপন্যাসে আছে সুন্দরবনের স্থানবিবরণ, তথা জীবন-জীবিকার কথা। ওপার বাংলার সুন্দরবন থেকে এসে বেদে বাউলে ডেরা করেছিল এপার বাংলার সুন্দরবনে। সে বলতে চায়—বন আছে আর আছে আমার এই ডিঙি। কে আমাকে জীবনযুদ্ধে হারাবে। অবশ্য উপন্যাসে ঘটনার বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। শিবশঙ্কর মিত্রের আছে একাধিক ছোটগল্প। এইসব ছোটগল্পের মানুষেরা বনে যায় মাছ-কাঠ-মধু আনতে। বনে ওরা বাঘের আক্রমণের শিকার হয়। বাউলে-মউলেদের নিয়ে লিখতে গেলে তাদের জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, তা লেখকের ছিল। গল্পের দুগ্যো সর্দার, মঙ্গল মোড়ল বিশু বাউলেদের কাছে বনের বাঘকেও মাঝে মধ্যে হেরে যেতে হয়।

এসব দেখে মনে হয়—

"এখানে বাঘ যেমন ভয়ঙ্কর, মানুষও তেমনি কেউ কাউকে রাস্তা ছেড়ে দেয় না!"

আশাপূর্ণা দেবীর 'হঠাৎ দোলা' গল্পটি সুন্দরবনের এক মধুর স্মৃতিচারণ। গল্পের নীরজা এখনও বসে বসে ওখানকার এক দুধওয়ালিকে ভাবে। কারণ নীরজা সুন্দরবনের মানুষের মধ্যে আন্তরিকতার সন্ধান পেয়েছিল।

সমরেশ বসু শুধু নাগরিক লেখকই নন। তিনি ঢুঁ মারেন সুন্দরবনেও। হাসনাবাদের মৎস্যজীবীদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে মিশেছেন। ওদের সঙ্গে থেকেছেন, মাছ ধরেছেন, আর দেখেছেন ওদের জীবন, ওদের হাসিকান্না। তাই তাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে 'বিলে নগর'। 'কপালকুণ্ডলা : ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ' তাঁর লেখা একটি ছোট গল্প। গল্পের তোরাপ সর্দার বাঘের সাক্ষাৎ যম। সুন্দরবনের গহন অরণ্যে সে দাপিয়ে বেড়ায়। এমন একটা দুর্ধর্ষ চরিত্রের মধ্যে লেখক আবিষ্কার করেছেন এক মানবিক দিক। ভয়াল হলেও সে একজন পিতা। মরতে হয় সে ময়নাকে নিয়েই মরবে। গল্পটি অবশ্য বিবৃতিধর্মী। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত একটি উপন্যাস 'গঙ্গা'র পটভূমি সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের নিয়ে।

সুন্দরবনভিত্তিক বাংলা কথাসাহিত্যে শক্তিপদ রাজগুরু আরেক শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘদিন ধরে সন্দেশখালি ব্লকের তুষখালিতে এক কাঠের আড়তে ডেরা করে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরেছেন তিনি এবং দেখেছেন ওখানকার জনজীবন, মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই। ৪০-এর দশক থেকে কলকাতার বাসিন্দা হয়েও শহর সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড উদাসীনতা। তিনি বলতে চান—সুন্দরবনের মানুষেরা বাঁচে অন্যভাবে—তাদের মধ্যে আছে বাঁচার একটা নগ্ন প্রচেষ্টা। তাদের লড়াইটাও অনেকখানি রিপ্রোডাকটিভ্। তাঁর লেখা 'গহনবন গহীন গাঙ', 'নোনাগাঙ', 'অবিচার', 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি', 'আঘাত' ইত্যাদি উপন্যাসে আছে এখানকার মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। সুন্দরবনের বঞ্চিত শোষিত জেলেজীবনের চেহারা তাঁর হাতে শিল্পরূপ পেয়েছে। মাঝি-মাল্লাদের জীবনরহস্যের সন্ধান করতে করতে তিনি অবশেষে বুঝেছেন—এরা সুন্দরবনের ভয়াল পরিবেশে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে হয়ে ধর্মপরায়ণ হতে শেখে। মনে করে এই অরণ্য—ও নদী—এর সামনে সে অতিক্ষুদ্র। তিনি তাঁর শেষ উপন্যাস 'আঘাতে' (এই লেখা তৈরির আগে পর্যন্ত এটাই শেষ উপন্যাস) দেখিয়েছেন—সুন্দরবনের জনজীবনের একটা পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের পদ্ধতিও পাল্টে যাচ্ছে। শক্তিপদ রাজগুরুর 'আঠারো ভাটির মা' ও 'শরৎ গুনিন' নামের দুটি ছোট গল্প গুনিনদের নিয়ে লেখা। বনে গিয়ে বনবিবির নামে শশী গুনিন যে ঘেরবন্ধন, দেহবন্ধন, মুখবন্ধন করে, তা কখনও মিথ্যে হতে পারে না—এটাই এখানকার গুনিনদের অন্ধ

বিশ্বাস। তাই শশী গুনিন বিশ্বাসই করতে পারে না যে তার ছেলে বিলেসকে বাঘে খেয়েছে। শরৎ গুনিনও বলে—"মুখবন্ধন, দেহবন্ধন, ক্ষেত্রবন্ধন এর মাহাত্ম্য দেখলেন বাবু? এই বত্রিশ কাঠা জায়গায় ক্ষেত্রবন্ধন দিই দিলাম, কই আসতি পারলো বড়শিয়ালের প্রো?" সংস্কার আর বিশ্বাস নিয়েই এরা বেঁচে থাকে। সহজ শিশুর মতো। বিভূতিভূষণের বাঘের মন্তরেও শোনা গেছে—'মন্তর আসল জিনিস। বাঘ টেনে আনে।" শক্তিপদ রাজগুরুর আঞ্চলিক কথ্য ভাষা-প্রয়োগও মন্দ নয়।

সুন্দরবনের মানুষ শহরের সুখী মানুষের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে তাকাতে ভাবে—বাবুদের আবাদের জমিতে এত ঝিঙেশাল ধান ফলে আর ওদের ঘরে ভাতের আকাল? এইসব অভাবী মানুষের কাছে এক মুঠো ভাত যে কত কামনার ধন, তা এখানকার উচ্ছব নাইয়াদের দিকে তাকালে বোঝা যায়। অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পটি পাঠককে পড়ে নিতে হবে। মাতলার রাগী জলস্রোত উচ্ছবদের ঘর সংসার ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত খিদের পেটে ভাতের ভার নিয়েই উচ্ছব নাইয়াদের মরে যেতে হয়। মহাশ্বেতার শক্তিশালী কলমে উচ্ছব একটি বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে।

বাদা অঞ্চলের আরেক রূপকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। পঞ্চাশের দশকে সুন্দরবনে মাস্টারি করতে যাওয়ার সুযোগে বাদা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আর সেই জন্যই লিখতে পেরেছেন সুন্দরবনভিত্তিক একাধিক উপন্যাস, ছোট গল্প। তাঁর 'বনবিবির উপাখ্যানে' বাংলা ১৩২২-এর সময়ের সুন্দরবনের চেহারা চিত্রিত হয়েছে। ওই সময়কার জঙ্গলহাসিল ও জনপদ তৈরির কাহিনী নিয়েই এই উপন্যাসটি। লেখার মধ্যে ইতিহাস, জনজীবন, আরণ্যক পরিবেশ, মানুষের সংস্কার বিশ্বাস প্রতিফলিত। তাঁর 'বাগদা' উপন্যাস সুন্দরবনের জলকরের পটভূমিতে লেখা। এখানে আছে খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা, আছে জলকর মালিক অক্ষয়বাবু। প্রসন্নবাবু এখানে কায়েমি স্বার্থের প্রতীক। অক্ষয়বাবু প্রসন্নবাবুদের দিয়ে ফায়দা লুটতে চায়। ভেড়ির সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা এখানে আছে। আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারও অনেকখানি প্রশংসনীয়। বরেনের ছোট গল্পেও আছে এখানকার নানাশ্রেণীর মানুষ। 'বজরা' গল্পে দেখি বুনো বাতাসীকে, শুনি বাতাসীর সকরুণ উক্তি—"এ জমি আমার বাবা। ওদের দিস্ নি বাবা। কোথায় দাঁড়াবো গো বাবা?" এই দীর্ঘশ্বাস নিয়েই বাঁচতে হয় এখানকার মানুষদের। 'জুয়া' গল্পের কচি শেখ নবচন্দ্রেরা অভাবের দায়ে রাতে লোকের ঘর থেকে গয়নার বাক্স হাতায়। ভরতকে নিয়ে ওরা জুয়া খেলতে চায়। ওদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বরেন অনেকখানি উত্তীর্ণ। বরেন 'ক্ষুধা' গল্পে পরান মুচি আর খুশির মধ্যেও ফুটিয়ে তুলেছেন এক জীবনযন্ত্রণা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শুধু ইতিহাস আর শহর ঘাঁটেন না। লেখেন 'জলজঙ্গলের কাব্য'ও। সুন্দরবনের মানুষ বছরে সবসময় কাজ পায় না, তাই তাদের জঙ্গলে যেতে হয়, জঙ্গলে বাঘের ভয়, কিন্তু পেটের খিদে ভয় মানে না। এইসব খবর নিয়েই 'জলজঙ্গলের কাব্য'। কাহিনীতে অবশ্য নতুনত্ব নেই, কিন্তু লেখায় চমক আছে। সুন্দরবনের সুধন্যরা মহাজনের কাছে অনেকসময় ধার চেয়েও ধার পায় না, মহাজনকে শাপশাপান্ত করে, মঙ্গলারা আনাচে কানাচে কলমি শাক তোলে আর পেটে অঢেল বাচ্চার জন্ম দেয়, নন্দবাবুর জমিতে চাষ বন্ধের প্রস্তাব ওঠে—জনজীবনের এইসব টুকরো ছবি নিয়েই তাঁর ছোট গল্প 'দেবতা'। এখানকার জনজীবনের ছবি ফুটে ওঠে আবদুল জব্বারের লেখাতেও। তাঁর 'বাঘের খোঁজে' উপন্যাসে সুন্দরবনের মানুষের এক বিচিত্র পেশার সন্ধান পাওয়া যায়। বনের বাঘ গোপনে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলজঙ্গলের কাব্য'-এর বিষয় গহন সুন্দরবন অরণ্য *ছবি : অঞ্জন খান*
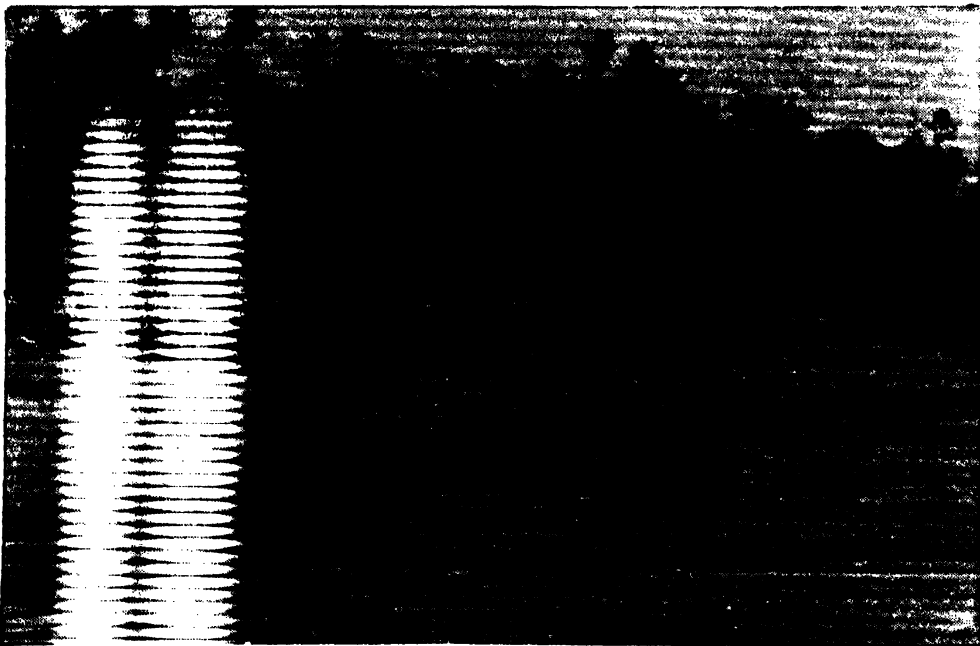
বাদা অঞ্চলের জনজীবন নিয়ে কলম ধরেছেন বহু নবীন লেখক

মেরে তার চামড়া বাইরে চালান দেওয়া—এই হল চাঁদ মিয়া আর জালালদের কাজ। সরোজ দত্তের 'বাঘের বাচ্চা'তে ও কলিম গাজীরও এই পেশা দেখি। আবদুল জব্বারের জালাল অবশ্য এই পেশা ছেড়ে দিতে চেয়েছে। এ অঞ্চলের কথ্যভাষার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লেখককে প্রশংসা করতেই হয়। তাঁর গল্পরসাশ্রিত ফিচারেও থাকে এখানকার সাধারণ মানুষ। তাঁর লেখা 'সাগর দ্বীপের মহাজন', 'জয়নগরের মোয়া' পড়লে তা বোঝা যায়।

বুদ্ধদেব গুহ ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সুন্দরবনের চলে যান। সুন্দরবনে পটভূমিতে লেখা তাঁর 'জোয়ার' একটি ভিন্ন স্বাদের ছোট গল্প। গল্পের অয়ন নটবরের লাশ খুঁজতে চলে গেছে সুন্দরবনের গহন জঙ্গলে। আর এই ঘটনার সূত্র ধরে দেখানো হয়েছে অয়ন-লিলি-মিলির ভালবাসার টানাপোড়েন। বুদ্ধদেব গুহ ছোটদের জন্যও লিখেছেন। তার 'বনবিবির বনে' উপন্যাসটি লেখা ঋজুদা ও রুদ্রের দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে। বরেনের 'জলের ভেতর আগুন জ্বলে'তেও দেখি ব্রজদা ও মাঘুর অভিযান। আসলে ছোটদের জন্য লেখা প্রায় সব গল্প-উপন্যাসের বিষয়ই হল বাঘ-ডাকাত আর দুঃসাহসিক অভিযান। অনেক সময় মাঝি-মাল্লাদের মুখ থেকে বলানো হয় গল্প। শৈবাল মিত্রের 'অজিতদার বাঘ শিকার' গল্পেও আছে একটা বাঘ। ঝড়খালিতে গিয়ে অজিতদার এই বাঘ জব্দ করে আসার রোমাঞ্চকর কাহিনী শৈবালের কলমে চমৎকার শিল্পরূপ পেয়েছে। হালআমলের অনেকেই ছোটদের জন্য সুন্দরবনভিত্তিক গল্প লিখেছেন। যেমন, আবদুল জব্বার, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, উত্তম দাস, সম্বুদ্ধ, পুণ্ডরীক চক্রবর্তী, বিজনকুমার ঘোষ, কল্যাণ চক্রবর্তী, দ্বৈপায়ন, উত্থানপদ বিজলী প্রমুখ।

বাদা অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকার মানুষ ঝড়েশ্বর। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর ভাষায় ও কলমে নোনাজল আর গেঁমো-গরানের গন্ধ। তাঁর ''রামপদর অশন ব্যসন'', 'চরপূর্ণিমা' ইত্যাদি উপন্যাসে এবং একাধিক ছোটগল্পে থাকে পদোবাবু, সীতাকান্ত মাস্টার, অক্ষয়ের মা, দুলালের বউ, উলপীর মা, নির্মল দাস, বনবিহারী, ভবতারণ কুইতি, রাসবিহারীদের লম্বা মিছিল। ঝড়েশ্বর তুলে ধরেন এদের দাবি দাওয়া, প্রতিবাদ আর জীবন সংগ্রামের কাহিনী। ঘোড়ামারা-লোহাবড়া দ্বীপে রামপদর কারবার। তার আশ্রয়টুকুতে লাগে একদিন ধাক্কা। চর নিয়ে বাধে সংঘর্ষ। চরপূর্ণিমাতেও চর দখলের লড়াই। সমস্যার টানা পোড়েন আর স্বার্থের সংঘাতে এখানে ঘটনা এগিয়ে চলে। সাধারণ মানুষেরা চায় চর দখলে রাখতে। কিন্তু প্রকৃতি বিরূপ। চর ভাঙে। তবু মানুষের সংগ্রাম থামে না। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দ্যাখে তারা। ঝড়েশ্বরের কলমে বালিচর, দ্বীপভূমি যেন উপন্যাসের চরিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর 'আকাশকোঠা' গল্পেও দেখি চর ভাঙছে। আর মানুষ ঘর-গেরস্থালি গুটিয়ে ছুটছে অন্য দ্বীপে ঘরের খুঁটি গাড়তে।

মানুষই একদিন জঙ্গল হাসিল করে এইসব দ্বীপ জনবসতি গড়ে তুলেছিল। জঙ্গল হাসিল হয়েছিল কয়েকজন বিদেশিদের চেষ্টায়। তাদের মধ্যে ফ্রেজার সাহেব অন্যতম। এই ফ্রেজার সাহেবের জঙ্গলহাসিলের পটভূমিতে লেখা শচীন দাসের উপন্যাস 'অরণ্য পর্ব'। শচীন দাস কথাসাহিত্যে এসেছেন সত্তর দশকে। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি একটা সময় তিনি তাঁর 'অরণ্য পর্বে' ধরেছেন। জঙ্গল হাসিলের কাজে এসে 'অরণ্য পর্বে' নিবারণ-অর্জুন-মঙ্গলেরা যখন টের পেল যে জমি এদের সবার হবে না, তখনই এরা পালাবার রাস্তা

দেখছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল নিবারণ, উপন্যাসের শেষে সূচিত হয়েছে সাধারণ মানুষের জয়ের ইঙ্গিত। ঘটনায় অপদেবতার প্রসঙ্গ এনে সাধারণ মানুষের চরিত্রকে কিছুটা বিশ্বস্ত করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। ঘটনার বুনুনিও মন্দ নয়। 'অরণ্য পর্বে' যে ফ্রেজার সাহেবকে দেখলাম, সেই ফ্রেজার সাহেবকে একটা বিশেষ চরিত্র করে বিশ্বনাথ বসু লিখলেন 'ফ্রেজার সাহেবের বিবিজান'। উপন্যাসে যে সময়টা ব্যাখ্যানো হয়েছে, তা হল বিশ শতকের প্রথমার্ধ। ইতিহাস বলতে বলতে লেখক ফ্রেজার-নারায়ণীর ভালবাসার একটি রঙিন কাহিনী তুলে ধরেছেন। লেখায় ঔপন্যাসিকের মুনশিয়ানা অবশ্য কমই চোখে পড়ে। উপন্যাসের শেষে ভাবাবেগজড়িত কিছু লম্বা ভাষণ আছে।

এই সুন্দরবনে একদিন গড়ে উঠেছিল তেভাগা আন্দোলন। একদিকে জমিদার, আর অন্যদিকে খেটে-খাওয়া নিরন্ন মানুষ। মানুষগুলো বলতে চেয়েছিল—আমাদের তেভাগা চাই। এখানকার কাকদ্বীপ, বুধা খালি, চন্দনপিঁড়ি, লালগঞ্জ, গেঙাজোড়া প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এই আন্দোলন। এই আন্দোলনের পটভূমিতে শিশির দাস লেখেন 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা'। উপন্যাসের গণপতি যখন একটুকরো জমির সন্ধানে সুন্দরবনে আসে, তখন এখানে জোতদারদের খুবই দাপট। এদের সাঙ্গে বাধল সংঘর্ষ। গণপতির পাশে দাঁড়াল অর্জুন-সাগর রেণুপদরা। কিন্তু সংগ্রাম সার্থক হল না। লেখক এবার ইঙ্গিত দিলেন—ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখানে নানা ঘটনার ভিড়ে আছে অত্যাচার আর শোষণের প্রতিচ্ছবি। চরিত্রচিত্রণ ও ভাষাপ্রয়োগে লেখক নজর না দিলেও সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলনের এক বিশ্বস্ত দলিল এই 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা।' বাদার গল্পের রূপকার শংকর বসুর 'টঙ' গল্পটিও তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা। এই প্রসঙ্গে ঝড়েশ্বরের 'স্বজনভূমি'র উল্লেখ অনায়াসেই করা যেতে পারে। কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ইতিহাসের তেভাগা ও তেভাগার উত্তাল স্মৃতি। মানুষ এখানে শুধু বাঘ-সাপের সঙ্গে সংগ্রাম করে না, সংগ্রাম করে মানুষের বিরুদ্ধে, কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে। জমি দখলের সংগ্রামও করতে হয়েছে এখানকার মানুষের। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে। সৌরি ঘটকের 'অরণ্যের স্বপ্নে' গুণধর-ত্রিপুরারিরা চালিয়েছে এই জমি পুনর্দখলের সংগ্রাম। ওদের স্বপ্ন—আন্দোলন শেষ হলে ওরা জমি পাবে, ধান পাবে।

সুন্দরবনের অত্যাচা[illegible] মানুষের জীবন দেখেছেন আরেকটি মানুষ। তিনি সা[illegible] তাঁর 'গহীনগাঙ' গোসাবার জেলে জীবনকে নিয়ে লে[illegible]মারারা নিজেদের জীবন যেন পুরোটাই বিকিয়ে দি[illegible]হাজন-খটিদারদের কাছে। জলের কামট যেমন হিং[illegible]ই খটিদাররা। তিনি তাঁর 'নাগপাশে' (১টি বড় গ[illegible]—সেখানকার জোতদারেদের হীন চক্রান্তে একটা সং[illegible]ায়, সঠিক সংগ্রাম থেকে সরে আসে। জোতদাররা [illegible] নি[illegible]ার্থে ব্যবহার করতে চায়। সুন্দরবনের কুমীরমারী প্র[illegible] পট[illegible] গল্পটি লেখা। গল্পের শেষে জোতদারদের চক্রান্তে নষ্ট [illegible]টি আবার সঠিক সংগ্রামের পথে হাজির হয়েছে। সা[illegible] 'কুমীর', 'চিংড়ি' ইত্যাদি গল্পেও আছে এখানকার [illegible]টি[illegible] কোনও ঘটনা অবাস্তব মনে হয় না আমাদের। এখানকার ধর্মীয় কৃত্য ও বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের আঞ্চলিক জীবনযাত্রাকে লেখায় ধরার চেষ্টা করেছেন সাধন। ধীরক্ষিতের 'দক্ষিণ রায়' উপন্যাসটিতেও দেখানো হয়েছে এখানকার আঞ্চলিক জীবনযাত্রা, যে জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওখানকার কিছু লৌকিক দেবদেবী—বিবিমা-ঘেঁটু-দক্ষিণ রায়। শোষণে ঝাঁঝরা হতে হতে এখানকার 'ছোট জাতের দল' অবশেষে একদিন বলে ওঠে 'পিরতিশোধ চাই।' ওরা জোট বেঁধে বড়বাবুর বাড়ি ঘেরাও করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। উপন্যাসটিতে একটা বিক্ষোভের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উপরের আলোচনার আলোকে পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—কোনও কোনও লেখায় সুন্দরবন এসেছে—

(i) কখনো হঠাৎ এবং সামান্যই
(ii) অনেকটাই
(iii) ঘটনার কেন্দ্রে

সুন্দরবনভিত্তিক কথাসাহিত্যে কখনও এসেছে গতানুগতিক বিষয়, যেমন, বনে মধু-মাছ-কাঠ আনতে যাওয়া, বাঘের কবলে পড়া, ওঝা-গুনিনদের ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি, আবার কখনও এসেছে বিষয়-বৈচিত্র্য। যেমন, মৃণাল গুহঠাকুরতা এনেছেন এক সারেঙ জীবন ('জল শুধু জল' উপন্যাসে)। 'আবহমান' গল্পটিতে লেখক জয়কৃষ্ণ কয়াল পরশের চরিত্রে এনেছেন একাল ও সেকালের দ্বন্দ্ব। ইতিহাসের ছাত্র পরশুরাম বাদা অঞ্চলে আনতে চায় একটা পরিবর্তন। পদ্ম ঠাকমাও একটা অভিনব চরিত্র। পরশের বিপরীতে এই চরিত্রটি উপস্থিত করার পরিকল্পনাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটায়' (স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা একটি ছোটগল্প) পরান বলে, আবাদে আমাদের ইচ্ছেয় জীবন চলে না। এই পরাণ কলকাতায় যেতে যেতে ধনা মৌলের ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পায়। স্বপ্নময়ের লেখায় থাকে সময়ের দাগ। তরুণ প্রজন্মের লেখকেরাও লিটল্ ম্যাগাজিনের পাতায় সুন্দরবনকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। নয়ের দশকের পূর্ণেন্দু ঘোষ, উৎপলেন্দু মণ্ডলদের লেখার অন্যতম বিষয় সুন্দরবন। ইতিমধ্যে উৎপলেন্দু মণ্ডলের দুটি ছোটগল্প সংকলন 'সুমনের ভারতবর্ষ ও আবাদমলের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশ গল্প সুন্দরবনের মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে রচিত। তাঁর গল্পে আছে বন কেটে আবাদ করা মানুষের জীবন ও জীবিকা, সামাজিক জীবনের সুখ দুঃখ। আঞ্চলিক কথ্যভাষায় আজন্ম অভিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত হয়ে গল্পগুলি যথার্থ আঞ্চলিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

সাহিত্যে প্রত্যন্ত এলাকা নিয়ে লেখার একটা ঝুঁকি আছে। কাছে গিয়ে সেখানকার জীবন না দেখলে তাকে কলমে তুলে আনা যায় না। টেবিল-ওয়ার্ক এক্ষেত্রে অচল। সাজানো-চাপানো ঘটনার বুননে আর যাই হোক চমক সৃষ্টি করা যায় না। তবে দেখা যাচ্ছে—এই প্রত্যন্ত অঞ্চলটি কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সক্ষম লেখকের নজরে পড়েছে। এটাই আশার কথা।

লেখক পরিচিতি : শিক্ষক, বিশিষ্ট প্রবন্ধকার

মনোরঞ্জন পুরকাইত

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিশুসাহিত্য

দক্ষিণ ২৪-পরগনার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে শিশুসাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহ। ভৌগোলিকভাবে এক প্রান্তের সঙ্গে আর এক প্রান্তের প্রাকৃতিক বৈপরীত্য থাকলেও শিশুসাহিত্যের চর্চা সারা জেলা জুড়ে।

অন্যান্য ধারার মতোই শিশুসাহিত্য সম্পদশালী। খাল, বিল, নদী-নালা, সাগর, মাঠ ও সবুজ বন সংবলিত এই ভূমি সাহিত্য উপাদানে ভরপুর।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় প্রথম শিশুসাহিত্যিক হিসাবে যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রাতঃস্মরণীয়। যোগীন্দ্রনাথের ছোটদের ছড়া ও গল্প সারা বাংলার শিশুদের কাছে চিরকালীন আবেদন নিয়ে উপস্থিত।

ডায়মন্ডহারবার থানার নিতাড়া গ্রামে ১৮৬৬ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করা শিশুরা যখন আধো-আধো বুলিতে প্রিয়জন ও পরিবেশ চিনতে ও জানতে শুরু করে ঠিক তখনই মনের আগোচরে বাংলার লক্ষ লক্ষ শিশুরা মায়ের মুখে শুনে শুনে যোগীন্দ্রনাথের ছড়া একাত্ম করে ফেলে। তাঁর ছড়া ছোটদেরকে এক নির্মল খুশিতে দোলায়।

শিশুর অবাধ্য মনে তাঁর 'মজার মুল্লুক' কড়িংবাবুর বিয়ে খেলাচ্ছলে এসে গেছে। ছিচকাঁদুনে-বদ মেজাজি শিশু থেকে শুরু করে স্কুল পালানো ছোটরা কিছু না শিখুক যোগীন্দ্রনাথের একটা ছড়া অন্তত শিখেছে অনায়াসে। তাঁর প্রথম বই 'হাসি ও খেলা'। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত শিশুদের জন্য লেখা 'হাসি ও খেলা' প্রাণহীন একঘেয়েমি গতানুগতিক লেখালিখির জগতে নতুন হাওয়ার সন্ধান দেয়। তিনিই বাংলার শিশুসাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা শিশু-সাহিত্যের আদি পুরুষ। প্রাণহীন জড়তাপূর্ণ শিশু-সাহিত্যে প্রাণের সঞ্চার করেন তিনি। কিন্তু ছোটদের মনোরাজ্যের একান্ত গভীরে তেমনভাবে প্রবেশ করতে পারেননি। যোগীন্দ্রনাথ সেখানে সফল। ছোটদের কল্পনার জগতের গভীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হন তাঁর রচনায়। তাঁর লেখার প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ "সাধনা" পত্রিকায় লেখেন—বাঙলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তা স্কুলে পড়িবার বই, তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণ উৎপীড়ন হয়, সে পরিমাণ উপকার হয় না। এই যোগীন্দ্রনাথ সরকার জন্মসূত্রে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মানুষ।

'হাসি ও খেলা'র পর যোগীন্দ্রনাথের বহু বই প্রকাশ পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর লেখা 'হাসি-খুশি প্রথম ভাগ' শিশু- সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। হাসি-খুশি প্রথম ভাগ প্রকাশ পায় ১৮৯৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। বইটি একশো বছরের বেশি সময় ধরে আজও ছোটদের কাছে আদরের হয়ে সমাদৃত।

'হাসি-খুশি' কেবলমাত্র বর্ণ পরিচয়ের একটি বই নয়, স্বকীয়তায়, স্বাতন্ত্র্যে অতুলনীয়—অনন্য। যোগীন্দ্রনাথের আগে ছড়ার সাহায্যে বর্ণ পরিচয় করানোর কথা কেউ ভাবেননি। পরে অবশ্য অনেকেই ছড়ার সাহায্যে বর্ণ পরিচয়ের কথা ভেবেছেন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'। ছড়ার সাহায্যে বর্ণ পরিচয়। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চুরাশি। হাসি ও খেলা, খুকুমণির ছড়া, হাসি-খুশি, ছড়া ও ছবি, ছড়া ও পড়া, ছবি ও গল্প, ছোটদের মহাভারত, ছোটদের রামায়ণ, বনে জঙ্গলে, শিশু-সাথী, মজার গল্প, রাঙা ছবি, লঙ্কাকাণ্ড

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সময় থেকে দক্ষিণ ২৪-পরগণায় শিশু- সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। কিন্তু কখনো সংগঠিতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধরূপে জেলার কবি ও সাহিত্যিকগণ একত্রিত হয়ে চলার চেষ্টা করেননি বা চলতে পারেননি। দীর্ঘদিন পর নয়ের দশকের প্রথমে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বারুইপুর থেকে শিশু-সাহিত্যিকদের একসঙ্গে একই মঞ্চের মাধ্যমে পথ চলা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা হয় 'দক্ষিণবঙ্গ শিশু-সাহিত্য পরিষদ।' এই পরিষদের মুখপত্র—'ছোটদের সোনার কেল্লা'র মাধ্যমে শুরু হয় নতুন প্রতিভার সন্ধান।

প্রভৃতি। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— ছেলেমেয়েদের যেমন দুধভাত চাই, তেমনি চাই গল্প। যে মা তাদের খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে। আজকের দিনে মা-মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে। কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাস ভোলেনি। ছেলেরা আজও বলছে গল্প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গল্প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যাঁরা কোমর বেঁধেছেন—তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করছেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না। সেই আশীর্বাদ করার ভার নিলেন তাঁদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যেকর্ম নিয়ে এর পর কারই বা কি বলার থাকতে পারে।

এই যোগীন্দ্রনাথ সরকার দক্ষিণ ২৪-পরগনার ভূমিপুত্র।

তিনি মারা যান ১৯৩৭ সালে। কিন্তু আজও 'আয়রে আয় টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে,' বা 'এক যে আছে মজার দেশ সব রকমের ভালো রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো'—শিশুদেরকে নিয়ে যায় নতুন জগতে। এই রকম শত শত ছড়া লিখেছেন। গল্পও লিখেছেন প্রচুর, যা শুধু শিশু-সাহিত্য নয়, সমগ্র বাংলাসাহিত্যে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মারা যাওয়ার পর দীর্ঘদিন দক্ষিণ ২৪-পরগনার শিশুসাহিত্য অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। বহুদিন তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি যাঁকে তাঁর উত্তরসুরি হিসাবে গণ্য করা যায়। সারা বাংলার মতো এই ভূখণ্ডেও শিশুসাহিত্য ব্রাত্যই ছিল। আধুনিক কবিতা-চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন প্রায় সবাই। তাই শিশুসাহিত্যকে জনপ্রিয় করার কাজে ব্রতী হতে আর কাউকে তেমনভাবে পাওয়া যায়নি।

নিশিকান্ত মজুমদার, কাকদ্বীপের সামসুল হক, নরোত্তম হালদার, জয়নগর বহড়ুর শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুভাষগ্রামের সলিল চৌধুরী, সুন্দরবন রাঙাবেলিয়ার বিনোদ বেরা প্রমুখ কবিরা বেশ কিছু শিশু-উপযোগী ছড়া ও গল্প লিখেছেন। কিন্তু এই কবিরা কেউ কেউ আর শিশুসাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আটকে রাখেননি। তাঁরা কবিতা আর প্রবন্ধ দিয়েই তাঁদের সা[illegible]কর্ম সম্পাদনার কাজে ব্রতী হলেন। ক্ষতিগ্রস্ত হলো ও নতুন [illegible] হলো ছোটরা। এদের পরপরই আমরা পাই [illegible] অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ [illegible] দেশের মানুষ। কিন্তু বহু দিন ধরে বাস করছেন দ[illegible]। নির্মলেন্দু গৌতম, সরল দে, কার্তিক ঘোষ ও ছান্দ[illegible]মার দত্তের উৎসাহে শিশু-সাহিত্যে প্রবেশ। আ[illegible] সমান তালে। তাঁর লেখা—চাঁদমারীর মাঠ [illegible]ইকে আন্দোলিত করে। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে দ[illegible] ২৪ [illegible] ও সারা বাংলায় তিনি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত [illegible] বহু বই ছোটদের জন্য। পড়া নিয়ে ছড়া, লাগ ভে[illegible] ছড়া বড়োর ছড়া, মজার মজার ছড়া, হঠাৎ এসে [illegible]কারাম চোখারাম প্রভৃতি। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [illegible]পুরের অর্জুন দাস ও বহড়ুর অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী [illegible]র লিখেছেন।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার একমাত্র জাতীয় পুরস্কার পাওয়া শিশু-সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী থাকেন যাদবপুর সন্তোষপুরে। তিনি তাঁর কুসুমপুরের শালিক গল্পগ্রন্থের জন্য জাতীয় পুরস্কার পান। তাঁর অন্য জনপ্রিয় বই কানামাছি ভোঁভোঁ, মজায় ভরা মাঠের ছড়া, দুপুর দুপুর মিষ্টি দুপুর প্রভৃতি।

কবিতার ঢেউ যখন সাগরের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে, যখন শিশু-সাহিত্যের জগতে নাভিশ্বাস উঠছে, ঠিক তখনই কয়েকজন তরুণ কবি শিশু-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার জন্য নিভৃতে কাজ করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সোনারপুর রাধাগোবিন্দপল্লীর সুখেন্দু মজুমদার, বারুইপুরের কবি নজরুল সরণির হাননান আহসান, যাদবপুর সন্তোষপুরের সমর পাল, ডায়মন্ডহারবার বাসুল ডাঙার সাকিল আহমেদ, পূর্ব পুটিয়ারির অপূর্বকুমার কুণ্ডু, সুব্রত ভট্টাচার্য, ফলতা গোবিন্দপুরের সেকেন্দার আলি সেখ, বাটানগরের শঙ্করকুমার চক্রবর্তী, বজবজের উৎপলকুমার ধাড়া ও ক্যানিং ঘুটিয়ারি শরিফের প্রমোদরঞ্জন মালাকার অন্যতম। এই সব কবিরা ছড়া ও গল্পের মাধ্যমে ছোটদের মনরাজ্যের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হয়েছেন।

শিশুমেলা পত্রিকার সম্পাদক কবি অরুণ চট্টোপাধ্যায় পঁচিশ বছর ধরে ছোটদের জন্য কাজ করছেন। ছোটদের জন্য লেখা, লেখা সম্পাদনা করা, ছোটদের জন্য ছবি আঁকা তাঁর প্রাত্যহিক দিনলিপি।

অবি সরকার দুই সহযোগী মিত্রা সরকার ও সুমন বসুকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আবোল তাবোল' নামক শিশু-সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র গড়িয়ার ফরতাবাদে। নরেন্দ্রপুরের দীননাথ সেন ছোটদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। তাঁর 'গল্প বলেন টলস্টয়' একটি মূল্যবান বই।

রাজপুরের অঞ্জন দাস, গড়িয়া বোড়ালের অলোক দত্ত চৌধুরী, হরিনাভির সমীরণ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি চক্রবর্তী, সাউথ গড়িয়ার স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়, বাসন্তীর বিশ্বজিৎ মিত্র, চম্পাহাটির পূর্ণেন্দু ঘোষ, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, ঢোসা গাববেড়িয়ার কৃষ্ণকিশোর মিদ্যা, বাটানগরের ঘোষ শেখ মুস্তাক আহমেদ, মগরাহাট থানার তসরলার শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারিকেলডাঙ্গা গ্রামের উত্থানপদ বিজলী, বারুইপুরের নির্মল ব্যানার্জি, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ ভট্টাচার্য, নবারুণ চক্রবর্তী, আনসার-উল-হক, বিপদবারণ সরকার, কাকদ্বীপের কবি ওয়াজেদ আলি, অপূর্ব দাস, সাগরদ্বীপের আশিস ভুঁইয়া, বাটানগরের ব্রজেন্দ্রনাথ ধর, ঠাকুরপুকুরের অর্নির্বাণ ঘোষ, শিরাকোলের রাজকুমার বেরা, চাউলখোলা উমেদপুরের স্বপনকুমার মান্না, প্রদীপ সামন্ত, ফলতার সুমিত মোদক, অরুণ পাঠক, বারুইপুরের ভগীরথ মাইতি, চন্দ্রচূড় ঘোষ, বিশ্বনাথ রাহা, আমতলার পরেশ সরকার, রায়দিঘির ফণিভূষণ হালদার, কিশোরীমোহন নস্কর, মথুরাপুরের সাধনচন্দ্র নস্কর, জয়নগরের প্রণবকুমার পাল, পুণ্ডরীক চক্রবর্তী, বহড়ুর সজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলপির বিশ্বনাথ ভাণ্ডারী, মালবিকা ভাণ্ডারী। হরিদেবপুরের দিলীপ চক্রবর্তী, বারুইপুরের সৌরেন বসু, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিনয় সরদার, তপন নস্কর, আব্দুল রফিক শেখ, গোসাবার শশাংকশেখর মৃধা, অজয় তরফদার, সুধারানী মৃধা, অরবিন্দ রপ্তান, এল ওয়াজেদ, বাসন্তী থানার সুজাউদ্দীন গাজী, সুকুমার দেবনাথ, সুপর্ণা দেবনাথ, ক্যানিং থানার এন জুলফিকার, কে এম সৈফুদ্দিন, মগরাহাট থানার আবুল বাশার হালদার, নিরাশা নস্কর,

ডায়মন্ডহারবার থানার এম বাকিবিল্লা, রিয়াদ হায়দার, অমলেন্দুবিকাশ দাস, তপন ত্রিপাঠী, সোনারপুর থানার স্বপনকুমার রায়, মানসী বালা, কল্পনা ভট্টাচার্য, মেঘনাদ বিশ্বাস, ছোট মোল্লাখালির ভবশেখর মণ্ডল, কানাই পরমান্য, তালদির অজিত নস্কর, নেতড়ার আজিজুল হক, বারুইপুরের অমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক চক্রবর্তী, প্রশান্ত সরদার, পাঁচুগোপাল রায়, জয়ন্ত দাস, মানস চক্রবর্তী প্রমুখ কবি ও লেখকগণ শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এঁদের অনেকেই ছোটদের বই প্রকাশ করেছেন। অনেকেই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন ছোটদের মনের মতন করে। এই কবি-সাহিত্যিকরা মূলত ছড়া লিখছেন ছোটদের জন্য।

ছোটদের জন্য গল্প লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন উৎপলেন্দু মণ্ডল, প্রশান্ত সরদারের 'কাগজের নৌকো' সুন্দর গল্পের বই ছোটদের জন্য। সুখেন্দু মজুমদার, সমর পালের একাধিক গল্পগ্রন্থ ছোটদের সমাদর লাভ করেছে। কল্পনা ভট্টাচার্যের 'ছোট মামার ট্রাজেডি', সুখেন্দু মজুমদারের 'সাত সমুদ্দুর' ছোটদের জন্য মনের মতন বই। দক্ষিণ ২৪-পরগনার কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত ছোটদের জন্য কিছু ছড়া ও গল্পের বই—শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'মিষ্টি কথায় বিষ্টিতে নয়', দীননাথ সেনের 'গল্প বলেন টলস্টয়' সামসুল হকের—'আসুন কুটুম বসুন কুটুম', 'দিশি ছড়া', 'গাধার ছড়া', সুখেন্দু মজুমদারের, 'বাগান জুড়ে ফুলের মেলা', 'শোলোক পরীর নোলোক', 'ইচ্ছে নদীর গান', 'টাপুর এবং টুপুর', 'সাত সমুদ্দুর', হাননান আহসানের 'ছড়ার গাড়ি', 'ঝিকির ঝিকির', পঞ্চানন দাসের 'রোদ বৃষ্টি ঝাল মিষ্টি', উত্থান পদ বিজলীর 'রাজপুত্র ফিরে এলো', প্রণবকুমার পালের 'ডাম্পি', কল্পনা ভট্টাচার্যের 'এসোকিছু ছড়া শিখি', 'ছোট মামার ট্রাজেডি' স্বপনকুমার রায়ের 'মেঘ মুলুকে', 'খুশির বাগান', অবি সরকার, মিত্রা সরকার ও সুমন বসুর তিন পাগলের ছড়া, সমর পালের 'পশু পাখির ছড়া, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে', 'আমাদের পরিবেশ' 'দুষ্টু মিষ্টি গল্প', আনসার উল হকের 'আইকম বাতকম', 'কু ঝিক ঝিক রেলের গাড়ি', সৌরেন বসুর 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে', 'ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না', শিশির বসুর 'আপুর ছড়া', সাকিল আহমেদের 'পদ্মবনে পেখম মেলে', আদম সফির 'ফুস্ মন্তর চিচিং ফাঁক', অমলেন্দুবিকাশ দাসের 'বিষ্টি ভেজা মিষ্টি ছড়া', অপূর্বকুমার কুণ্ডুর 'আলোর পথিক', 'ঝিলিক মিলিক হীরের কুচি', 'বুনো রামনাথ', 'হঠাৎ তারার দেশে', সুব্রত ভট্টাচার্যের খুশির জাহাজ, মানসী বালার 'উড়লো টিয়ে জানলা দিয়ে', বিশ্বনাথ রাহার 'নিধু খুড়োর ঢাক', 'টুন টুনির পাঠশালা', 'জব্দ হলো', চন্দ্রচূড় ঘোষের 'জিরাফ বুড়ো', নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর 'আঁকছে খোকা আকাশ নদী', 'বালক দুখু', রামচন্দ্র ধাড়ার 'ছড়ায় গড়া', 'ছড়ায় টেন্‌স', ফণিভূষণ হালদারের 'ছড়ায় ছড়ায় সুরের ছোঁয়া', কে এম শহীদুল্লাহর 'সবুজ সোনার দেশে', আবুল বাশার হালদারের 'আলোর শিশু', নরোত্তম হালদারের 'কুসুম', 'সোনার বাংলা', সাধনচন্দ্র নস্করের কথ্যভাষায় লেখা 'কোড়ের মার কড়ি পড়া', এল ওয়াজেদের 'ছবি তীর্থ', মনোরঞ্জন পুরকাইতের 'সবুজ বনে হলুদ পাখি', 'আয় ছুটে আয়', 'এসো গল্প বলি', 'সবুজ দেশের কথা', 'একটি ছুটির দিন', 'দাঁড় ছপছপ নৌকো, উত্থানপদ বিজলীর 'মিষ্টি দিনের বিষ্টি' প্রভৃতি। এ ছাড়াও ব্রজেন্দ্রনাথ ধর ও শঙ্করকুমার চক্রবর্তীর কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সোনারপুর আঞ্চলিক
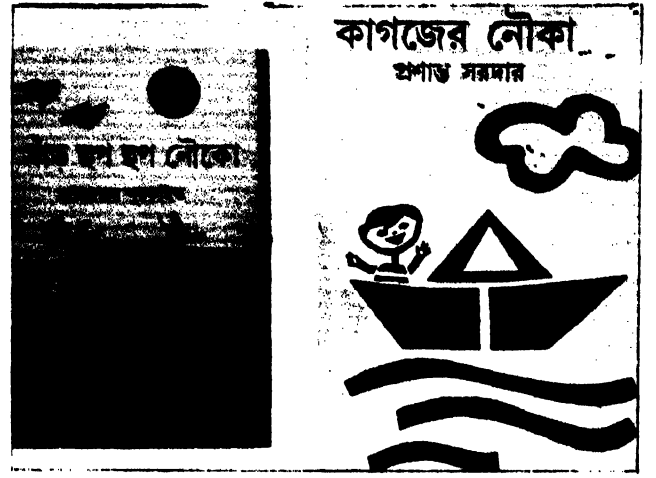
কমিটি প্রকাশ করেছেন—অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবি সরকার, সমীরণ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন্দু মজুমদারের ছড়া নিয়ে সুন্দর ছড়া সংকলন 'বৃষ্টি পড়ে', কাজটি খুবই প্রশংসার যোগ্য।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সময় থেকে দক্ষিণ ২৪-পরগণায় শিশু-সাহিত্যের চর্চা হয়ে আসছে। কিন্তু কখনো সংগঠিতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধরূপে জেলার কবি ও সাহিত্যিকগণ একত্রিত হয়ে চলার চেষ্টা করেননি বা চলতে পারেননি। দীর্ঘদিন পর নয়ের দশকের প্রথমে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বারুইপুর থেকে শিশু-সাহিত্যিকদের একসঙ্গে একই মঞ্চের মাধ্যমে পথ চলা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা হয় 'দক্ষিণবঙ্গ শিশু-সাহিত্য পরিষদ।' এই পরিষদের মুখপত্র—'ছোটদের সোনার কেল্লা'র মাধ্যমে শুরু হয় নতুন প্রতিভার সন্ধান। দক্ষিণ ২৪-পরগনার শিশু-সাহিত্যের জগতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো। ছোটদের সোনার কেল্লার মাধ্যমে বাংলার ছড়া ও ছোটদের গল্পের জগতে পরিচয় ঘটানো গেল কিছু নতুন প্রতিভার। সারা জেলা জুড়ে শিশুসাহিত্যচর্চা আন্দোলনের রূপ নিল। জেলার নানা প্রান্ত থেকে নতুন নতুন প্রতিভার বিচ্ছুরণে জেলার সাহিত্য আলোকিত হতে শুরু করলো। প্রকাশ পেতে শুরু করলো শিশু ও কিশোর সাহিত্য পত্রিকা। একঝাঁক তরুণ কবি ও গল্পকার সম্পাদনার কাজে নিজেদের ব্রতী করলেন। ছোটদের সোনারকেল্লার পথ ধরে প্রকাশ পেল কিশোর কল্লোল, চয়নিকা, এলোমেলো, পক্ষিরাজের বাড়ি, আলোর পাখি, বন্ধু, ছড়াকাশ, চয়ন, সঞ্চিতা, ঢিল প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পত্রিকা যা সহজেই ছোটদের মনকে ছুঁতে সমর্থ হলো।

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' (১৩০২-১৩০৭) প্রথম ছোটদের পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যার লেখক তালিকায় ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রামব্রহ্ম সান্যাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী ও হেমলতা সরকার।

মুকুল প্রথম বছরের দ্বিতীয় সংখ্যার (১৩০২ শ্রাবণ ১ম ভাগ ২য় সংখ্যা) লেখক তালিকায় স্থান পান যোগীন্দ্রনাথ সরকার। তারপর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় যোগীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছোটদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মুকুল পত্রিকায় লিখেছেন উপেন্দ্রকিশোর

রায়চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকারগণ।

সম্পাদক হিসাবে শিবনাথ শাস্ত্রী ছোটদের জন্য নানা বিষয়ে প্রতিটি সংখ্যায় লিখেছেন। তাঁর সম্পাদনায় মুকুল শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালের চৈত্র মাসে (১৩০৭ চৈত্র, ৬ষ্ঠ ভাগ ১২শ সংখ্যা)। তার পরপরই বা সমকালীন এই জেলায় ছোটদের কোনও পত্রিকা ছিল কিনা জানা যায় না। বহু পরে আটের দশকের প্রথম থেকে কিছু পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। নিচে মুকুল ব্যতীত সাম্প্রতিক প্রকাশিত পত্রিকাগুলির নাম পরিবেশিত হল—

দক্ষিণ ২৪-পরগনার থেকে প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য পত্রিকা—

পত্রিকার নাম	সম্পাদক	স্থান (প্রকাশের)
● শিশুমেলা	অরুণ চট্টোপাধ্যায়	গড়িয়া
● কচিপাতা	সমর পাল	যাদবপুর সন্তোষপুর
● মুনিয়া	সুখেন্দু মজুমদার	সোনারপুর
● ছড়া দিলেম ছড়িয়ে	হান্নান্ আহসান	বারুইপুর
● সূয্যি মামা	রামচন্দ্র ধাড়া	কাকদ্বীপ
● আবোল-তাবোল	অবি সরকার	গড়িয়া ফরতাবাদ
● ছোটদের সোনারকেল্লা	মনোরঞ্জন পুরকাইত (প্রধান সম্পাদক)	বারুইপুর
● পক্ষিরাজের বাড়ি	পরেশ সরকার অনিলকুমার দত্ত	আমতলা
● রিমঝিম	শঙ্করকুমার চক্রবর্তী	বাটানগর
● সাহিত্য তারুণ্য	দিলীপ চক্রবর্তী	হরিদেবপুর
● কিশল মন	উৎপলকুমার ধাড়া	বজবজ
● টোটাই টো	ব্রজেন্দ্রনাথ ধর	বাটানগর
● সঞ্চিতা	স্বপনকুমার রায়	বাওয়ালি
● কিশোর কল্লোল	কল্পনা ভট্টাচার্য	সোনারপুর
● চয়নিকা	স্বপনকুমার মান্না	উমেদপুর
● ঢিল	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	সাউথ গড়িয়া বারুইপুর
● ছই	মাকসুদা খাতুন	(মগরাহাট (পশ্চিম)) রাজারহাট
● এলোমেলো	স্বপনকুমার রায়	সোনারপুর
● আলোর পাখি	কাশী[illegible] ভট্টাচার্য	বারুইপুর
● চিলড্রেন্স রসগোল্লা	[illegible]	বহড়ু জয়নগর
● চয়ন	[illegible]	শিরাকোল
● বন্ধু	[illegible]	সোনারপুর
● ছড়াকাকা	[illegible]	বারুইপুর
● পদাতিক	[illegible]	বসন্তপুরে ডায়মন্ডহারবার

পৃথিবী বিখ্যাত ছড়াকার [illegible] একবার বলেছিলেন ছড়া হলো 'ননসেন্স রাইমস'। [illegible] ননসেন্স রাইমস্-এর প্রবক্তা উপেন্দ্রকিশোর রায়[illegible]। [illegible] পর যার নাম খুব বেশি উচ্চারিত তিনি হলেন দক্ষিণ ২৪ [illegible] ভূমিপুত্র যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পর দক্ষিণবঙ্গে ছড়া লেখার চর্চা আজও অব্যাহত। পৃথিবীর নানা বির্বতনের মতো সাহিত্যেও বিবর্তনের এসেছে। বিবর্তন এসেছে শিশুসাহিত্য ও ছড়া সাহিত্যে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সারা পৃথিবীতে সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটেছে আমাদের দেশেও। ব্রিটিশ শাসনে দেশীয় সংবাদ আইন দ্বারা পত্র-পত্রিকার উপর চরম আঘাত হানায় এই জেলায় কিছুকাল শিশু-সাহিত্যের গতি রুদ্ধ হয়। দক্ষিণ ২৪-পরগনা এই ভারতভূমির ছোট ভূখণ্ডমাত্র। এবং এখানেও এসেছে পরিবর্তনের ঢেউ। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের যুগ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছি আধুনিকতম যুগে। আমরা শিশু-সাহিত্য, বিশেষ করে ছড়া সাহিত্যের বিবর্তনের ধারাকে এবার অনুসরণ করব।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'মজার মুল্লুক' ছড়াতে লিখেছেন

"এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমে ভালো
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।....."

ইত্যাদি।

এক অবাস্তব জগতের কথা তিনি শোনালেন। এছড়ার সঙ্গে বাস্তবের কোথাও কোনও মিল আছে কিনা জানি না, তবে তাঁর ছড়াগুলি একশো বছর পরেও শিশুদের সঙ্গে বড়দেরকে আন্দোলিত করে। অবাস্তব বিষয়ের পাশাপাশি বাস্তবকে নিয়ে তাঁর অনবদ্য ছড়া পাঠশালা—

চ্যাপটা নাকে চশমা আঁটা
গুরু মহাশয়
কানে কলম, হাতে ছড়ি,
দেখেই লাগে ভয়।.....

ছোটবেলায় এ দৃশ্যের মুখোমুখি সবাইকে হতে হয়েছে। তিনি সব ধরনের লেখায় ছিলেন দারুণ পারদর্শী এবং আজও অনন্য। সুভদ্রা, লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীকে উপস্থাপন করেছেন ছড়া ও ছন্দের মাধ্যমে।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সমসাময়িক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি তাঁর সম্পাদিত মুকুল পত্রিকার ১৩০৩ জ্যৈষ্ঠ : ২য় ভাগ ২য় সংখ্যায় লেখেন 'মোদের পুষী' নাম ছন্দবদ্ধ কবিতা ছোটদের জন্য।

'মোদের পুষী' বড়ই চালাক, ছোট পাখির সম
চোখ দুটিতে আগুন জ্বলে দেখিতে বিষম।
ইঁদুর ছুঁচো, সাপ কেঁচো, কার নাই নিস্তার
সকাল-বিকাল করে পুষী কত্তু কি শিকার।
.......গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিক চালচিত্র।

দক্ষিণ ২৪-পরগনার প্রাকৃতিক সম্পদ যাঁদের লেখায় সমাদর পেয়েছে তাঁদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনিও দক্ষিণ ২৪-পরগনার ভূমিসন্তান—

তিতি তাতার দু ভাইবোন
বেড়াতে গেল সুন্দরবন
সুন্দরবনের কুমীর বাঘ
দেখতে পেলো পয়লা মাঘ।........

সুন্দরবনকে নিয়ে কবি ওয়াজেদ আলি তাঁর 'বনবিবির বন' ছড়ায় লিখেছেন—

গঙ্গা রিডির রাজ্যে আছে বন বিবির বন
কোনখানে তা সঠিক করে জানে বা কয়জন?
রায়দিঘির মাঠ থেকে ভুটভুটিতে যাবে—
পূর্বদিকে গেলে শেষে মইপীঠ-দ্বীপ পাবে।.......

ইত্যাদি।

এমনিভাবে কবিগণ আরও বহু বিষয়কে কেন্দ্র করে ছড়া ও গল্প রচনা করেছেন এবং তাতে লক্ষ্য করা যায় আধুনিকতার ছোঁয়া—

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর মজার মজার ছড়াতে লিখলেন,

'এ্যাঙা, ব্যাঙা, চ্যাঙা,
তিনজনাতে তর্ক তুমুল
কে কার চেয়ে ঢ্যাঙা;........ইত্যাদি।

ছড়ায় এলো নতুন রঙ।

তিনি লিখছেন— ভায়া রে ভায়া
ব্যাপারটা কি
তুমি নাকি
যাচ্ছো টাকি
আমরা আদার
ব্যাপারী হলেও
উড়োজাহাজের
খবর রাখি।

দক্ষিণ ২৪-পরগনায় মহাপুরুষদের নিয়ে প্রথম ছড়া লেখেন নরোত্তম হালদার—

ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে লিখলেন—

"বীর ক্ষুদিরাম! তব প্রাণদান
দেশের সবার তরে
তাই তব গান ক্ষুদ্র মহান্
গাইছে পরান ভরে।"

বিবেকানন্দকে নিয়ে লিখলেন—

"হে মহা সাধক বিবেকানন্দ
তোমাকে প্রণাম করি
গড়িয়া উঠুক ধ্যানের ভারত
তোমাকে স্মরণ করি।"

পরবর্তীকালে জীবনীমূলক ছড়া লিখেছেন অনেকেই। তরুণ কবি হান্নান আহসান্ লিখেছেন—

সবাই বলেন গর্ব করে তিনি
আমি বলি আরও
.....হারো
সবাই বলে মহান মানুষ
আমি বলি খুব যে
.....ডুবছে
সবাই বলেন শ্রেষ্ঠ অতি
আমি বলি ভীষণ
....কি-সন
সবাই বলেন অনেক কিছু

আমি বলি কবি
.......রবি।

এখানে কবি প্রথাগত ছন্দ ভেঙে নতুন ছন্দের ব্যবহার করেছেন সুন্দরভাবে। ছড়ার চিরকালীন চলনকে নতুন পথে আনার চেষ্টা করেছেন।

কল্পনার জগৎকে ছোঁবার চেষ্টা করেছেন কবি সুখেন্দু মজুমদার—

ইচ্ছে আমার অনেক দিনের
তেপান্তরে যাবার
কি সব মজা লুকিয়ে আছে
সেটাও জানা বাবার
বলতো বাবা আয়না ঘুরে
কি আর ক্ষতি পড়ায়
সিলেবাসের খুনসুটিতে
রোজ দুবেলা গড়ায়.......ইত্যাদি।

কল্পনার জগৎ নিয়ে আধুনিক ছড়া।

ছুটিকে কীভাবে দেখেছেন এই প্রজন্মের কবিরা—পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

অপুর ছুটি কাটবে কেমন? যা খুশি তাই করে
গুলতি গুলি, লাট লাটাই, বড়শিতে মাছ ধরে
ভাবছে ভোলা এই ছুটিতে ঋণটা করে শোধ
গ্রামটি জুড়ে গাছ লাগিয়ে করার দূষণ রোধ।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিশুসাহিত্য গ্রন্থ *ছবি : আশিস দাস*

কবি আনসার উল হক লিখেছেন তাঁর "বিশ্বাস" কবিতায়—

ঈশ্বরে বিশ্বাস, বিশ্বাস সুখেতে
বিশ্বাস আছে তাই বেঁচে আছি সুখেতে
বিশ্বাস চমকায় গালিবের ছন্দে
বিশ্বাস দোল খায় ভালো আর মন্দে।

ইদানীং প্রচুর জীবনীমূলক ছড়া লিখেছেন দক্ষিণ ২৪-পরগনার কবিগণ।

বিদ্রোহী কবি নজরুলকে নিয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর ছড়া—উত্থানপদ বিজলী লিখেছেন—

চিরদিনের বিদ্রোহী
তোমায় বলো কী কহি
লৌহ কপাট করলে লোপাট
ন্যায়ে ধ্বজা যাও বহি........ইত্যাদি।

ভগীরথ মাইতি লিখেছেন—

.......বিদ্রোহী ফুল কাজী নজরুল
বাজায় বিষের বাঁশি
যে সুর ঘনায় অগ্নিবীণায়
তাকে [illegible] ভা[illegible]।............

কবি সেকেন্দার আ[illegible] কবি। ছড়ার মাধ্যমে দেশ সেবার কথা বলেছেন—

লড়াই ক[illegible] গড়তে হয়
সত্য কথ[illegible]
সবার ক[illegible]
সাহস ক[illegible] হতে হয়।........

নদীবেষ্টিত আমা[illegible] এই নদী নিয়ে মনোরঞ্জন পুরকাইত লিখেছেন—

আমার [illegible]
তোমার [illegible] নাম
জানিয়ে [illegible] একটি [illegible]
পাঠিয়ে [illegible]....

ছোটদের গল্প ছড়ায় ভূত একটি আকর্ষণীয় বিষয়। ভূতকে নিয়ে বিখ্যাত কবি সুনির্মল চক্রবর্তী লিখেছেন—

ভূতের বাচ্ছা ভূতো
বলে বাবা জুতো
দেচে আমায় কিনে
ধিতাং ধিতাং নাচব আমি
এবার জন্মদিনে।......

দীপক চক্রবর্তী লিখেছেন মজার ছড়া—

ভূতের পুরুত এলো সবে
নামাবলি পরে
বরযাত্রী আসছে উড়ে
নাজনা ডালে চড়ে।.........

এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য কবি ও ছড়াকাররা বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিকতার পরিচয় রেখেছেন তাঁদের ছড়া ও গল্পে—

কবি অপূর্বকুমার কুণ্ডু লিখেছেন—

গান ছড়ালো বুকের ভেতর
গান ছড়ালো প্রাণে।
তার সে সুরের টানে,
খুশির পথে চলছি ছুটে,
কে জানে কোনখানে।.........

তরুণ কবি ও সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী লিখছেন

"ঝিক্‌মিক্ তারা জ্বলে
চিক্‌মিক্ আলো
পড়াশুনা করা ভাই
সবচেয়ে ভালো।........"

সুব্রত ভট্টাচার্য লিখছেন—

দেখতে দেখতে সূর্যি ডোবে
এ্যাত্তটুকু বেলা
লেখাপড়ায় সেরা হতে
হয় না কোন খেলা।........ইত্যাদি।
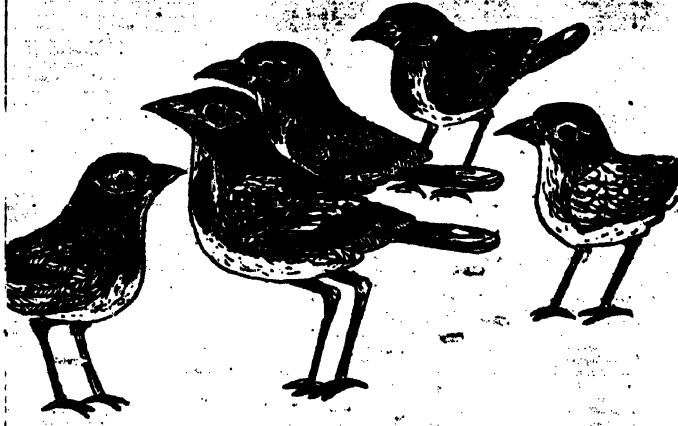
বিশ্বনাথ রাহা লিখেছেন—

কাঠঠোকরা ঠক্ ঠকাঠক্
ঠুকছে কেমন গাছ
মাছ রাঙা ঐ পুকুর জলে
খুঁজছে খাবার মাছ।.........

প্রবীণ কবি নিশিকান্ত মজুমদার—

টুনটুনি শুনলাম
তুই নাকি রোব্বার
জলসায় নেচে সেরা
হয়েছিস সব্বার?
শালিকের সেজ বোন
সেই সাথে ছিল কি?
মুনিয়ার মেজ মেয়ে
এসেছিল সেও কি?
সেই নাচ গান শুনে
পালেদের চুমকি
গিয়েছিল ভুলে তার
দুপুরের ঘুম কি?

বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সেই সঙ্গে উপনিবেশবাদ ও তার ভয়াবহতা নিয়ে ব্যতিক্রমী ছড়া মানস চক্রবর্তীর 'চাঁদের বুড়ি'—

চাঁদের বুড়ি চুনসুপুরি
ডিবে ভরা পান
থুরথুরিয়ে মেঘ সরিয়ে
ঠাম্মা কোথায় যান!

রাগ করেছে রাগ করেছে
চাঁদ যে হ'ল ভাগ
কারা যেন বলল ডেকে
যা না বুড়ি ভাগ।

ছড়িয়ে ডলার মেরিকা
বেশ তো তোর জাদু
এবার তোরা বনলি কিরে
চাঁদের ওপর চাঁদু।

তাই কি বুড়ি এদিক ওদিক
খুঁজছে তার ডেরা
কোথায় পাবে চরকা সুতোয়
স্বপ্নে ঘর ঘেরা!

সুন্দরবন নিয়েও প্রচুর ছড়া ও কবিতা লেখা হয়েছে। মূলত গল্পকার পূর্ণেন্দু ঘোষ, তিনি একটি সুন্দর ছড়া লিখেছেন—

সুন্দেরবনে বাঘের ছাও
হাম্বুর হাম্বুর করে রাও!
কে বাঘ রে ডোরা কাটা
এক বাঘরে চৈতা
বামুন মাইরা নিল পৈতা।
এক বাঘের কপালে সিন্দুর,
পুড়াইয়া খায় মাইর‍্যা ইন্দুর।......ইত্যাদি।

কবি শশাংকশেখর মৃধা থাকেন সুন্দরবন এলাকায়, তিনি লিখেছেন তাঁর 'কেওড়া ফুলের বাস' ছড়ায়—

কেওড়া বনে ফুল ফুটেছে
টক মিষ্টি বাস
তার ছায়াতে ঘুরলে খনেক

মনের দুঃখ নাশ।......

........প্রজাপতি মৌমাছিরা

গুনগুনিয়ে রোজ

ফুলের সাথে গল্প করে

ফুলেই করে ভোজ।

তপন গায়েন লিখছেন—

বনে থাকে বাঘ খুব হাঁকডাক

ভাগ সব ভাগ উঁচু করে নাক।

জঙ্গল থমথমে কোথা পাবে হংস

গ্রামে গ্রামে প্যাঁক প্যাঁক খাও তবে বংশ।

একবার ভেবে দেখো যদি নাক ভাঙে

বুড়ো বাঘ হাবুডুবু ঘোলা জল গাঙে।

সুন্দরবনের আর এক কবি সুধারানী মৃধা লিখছেন—

এ পারেতে থাকে মানুষ

ওই পারেতে বাঘ

পেরিয়ে নদী রাত বিরেতে

লোপাট করে ছাগ।

গভীর বনে নদীর জলে

বাগদা মাচের মীন

কেওড়া পাতায় যায় কেটে যায়

হরিণগুলোর দিন।

বাঘ কুমীরের ভীষণ লড়াই

কাঁপে সোঁদরবন

জানতে কথা সবুজদ্বীপের

রহিল নিমন্ত্রণ।

প্রবীণ কবি নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখছেন—

কাজের বাড়ি বাসন মাজে

একটি মেয়ে ছোট

মন বলে তার আকাশ জুড়ে

দিনের আলো ফোটো।..........ইত্যাদি।

রামচন্দ্র ধাড়া—

.....মাঠে মাঠে সোনার ধানের খবর আনে কে?

চাষাচাষীর [illegible] ডাকে সুখের বান

মরাই ভ[illegible] অমূল্য এ দান।

সুখের দু[illegible] হেমন্তকে।

সাকিল আহমেদ—

এক মা [illegible]

সংযোগ [illegible]

এক মা [illegible]

শুধুই প্র[illegible]

এক মা [illegible]

তাঁর জ[illegible]

এই ভাবে দক্ষিণ [illegible] অসংখ্য কবি ও ছড়াকারগণ নানা বিষয় নিয়ে ছড়া [illegible] বাংলার ছড়া ও শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাধনচন্দ্র ন[illegible] পরগনার কথ্য ভাষায় সুন্দর সুন্দর ছড়া লিখেছেন। দ[illegible] রেরের সাধনবাবুর উপার্জনের উৎস একটি ছোট্ট চায়ের দোকান। মাধবপুর স্টেশনের কাছে। তাঁর বই "কোড়ের মা'র কড়ি পড়া।" যাঁরা কথ্য ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁদের কাছে খুবই মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি লিখেছেন—

পাঁচমিশিলি ডালটা নাগে ভালো

সেটা আবার সেদ্দ যেদি হয়—

পাঁচজোন নোক এ্যাকসাতে সব জুটে

ভালো নাগে ভালো কোতা কয়।

তিনি আরও লিখেছেন—

শাস্তর বোজে পুণ্ডিতেরা, চাষ বোজে চাষী

মা সেটা বোজদে পারে বুজবে কি আর মাসী।......ইত্যাদি।

এমনি অনেক অনেক অসাধারণ ছড়া লিখেছেন তিনি। সেখানে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্য ভাষাকে খুব সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন।

শুধু ছড়ায় নয়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকরা প্রচুর গল্প লিখেছেন ছোটদের জন্য। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সুন্দরবনের গল্পগুলো আজও শিশু-সাহিত্যের অনন্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ২৪-পরগনায় ছড়াচর্চার মতো গল্পের চর্চা তেমনভাবে হচ্ছে না। তবে বড়দের জন্য কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের পাশাপাশি কিছু পত্রিকা ছোটদের জন্যও ছড়া ও গল্প প্রকাশ করে। বারুইপুর থেকে প্রকাশিত বিশ্বনাথ রাহা সম্পাদিত সাগ্নিক, শক্তি রায় চৌধুরী সম্পাদিত আদিগঙ্গা, তপন গায়েন সম্পাদিত—নাগরিক, লিটল স্টার ড্রামা ইউনিটের দর্পণ। ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রকাশিত সাকিল আহমেদের কুসুমের ফেরা, নিমপীঠ থেকে প্রকাশিত অহীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত সুন্দরবন আলেখ্য, গোসাবা থেকে শশাংকশেখর মৃধা সম্পাদিত বনফুল, ছোট মোল্লাখালি থেকে প্রকাশিত অজয়কুমার হালদার ও কানাইলাল পরমাণ্য সম্পাদিত তীরন্দাজ, কাশীনগর থেকে ফণিভূষণ হালদারের বিসারী নীল দিগন্ত, কাকদ্বীপ থেকে প্রকাশিত নরোত্তম হালদার সম্পাদিত গঙ্গারিডি, নেতড়া থেকে প্রকাশিত আজিজুল হক সম্পাদিত রেঁনেসা প্রমুখ। দক্ষিণ ২৪-পরগনার শিশু-সাহিত্য সারা বাংলার কাছে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এই প্রজন্মের শিশু-সাহিত্যিকরা কেউ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের উচ্চতায় পৌঁছবেন কিনা জানি না। তবে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে লেখার চর্চা ও সৎভাবে অনুশীলন করতে পারলে ব্যক্তিগতভাবে না হোক সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ ২৪-পরগনার শিশু-সাহিত্যকে বাংলাসাহিত্যে মর্যাদার আসনে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। এই পথ চলায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার উত্তরসুরিদের জন্য ধ্রুবতারার মতো পথ দেখাবেন—তিনি আমাদের ভগীরথ।

তথ্যসূত্রঃ

(১) পশ্চিমবঙ্গ শিবনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা।

(২) ছোটদের অমনিবাস—যোগীন্দ্রনাথ সরকার—সম্পাদনা হিমাংশু সরকার।

(৩) হাসি খুশির একশ বছর—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

(৪) লাল পলাশ—সম্পাদনা—মনোরঞ্জন পুরকাইত।

(৫) আদিগঙ্গা—সম্পাদনা—শক্তি রায়চৌধুরী।

(৬) দক্ষিণবঙ্গ সাহিত্যের চালচিত্র—সম্পাদনা—বিপদবারণ সরকার, সুবর্ণ দাস।

লেখক পরিচিতি ঃ ছড়াকার, প্রাবন্ধিক ও কবি।

দীননাথ সেন

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পত্র-পত্রিকা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাটিকে সহজেই জল আর জঙ্গলের হাতে সঁপে দেওয়া যায়। তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নদী আর খাল, লতা যেমন জড়িয়ে থাকে বনস্পতির গায়ে। গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই নেমে এসেছে এই জেলায় আশ্চর্য উদার বাহুবিস্তারে। সোজা কথা তো নয়, বেহুলাকে স্বর্গের পথ দেখিয়েছে এই জেলা মনসামঙ্গলে। পুরাণ, লোককথা, জীবন ও দর্শন একাকার হয়ে একটি বহুরূপ দৃশ্যপট রচনা করেছে এখানে। এ জেলার সাহিত্যের চালচিত্রে জলের নরম দাগ ছোঁয়া যায়, মাটির সোঁদা গন্ধ শোঁকা যায়।

কিন্তু মোহানাই তো নদীর সব নয়, আছে তার উৎস, আছে তার মাঝপথ। এই মাঝপথই তো রাজপথ। কলকাতা। জেলার গায়ে গা লাগিয়ে আছে। যেদিক দিয়ে জেলায় ঢুকুন না কেন, কলকাতা আপনাকে পেরোতেই হবে। কলকাতা কাছে বলে কলকাতার আলো- ছায়া পড়ে এ জেলার সাহিত্যের আঙিনায়। এখন তো কলকাতা এগোতে এগোতে একেবারে ক্যানিং অবধি এসে যায় বুঝি। তবু চোখ থাকলে চেনা যায় সাহিত্যের উত্তর-দক্ষিণ। সবাই বলবেন পত্র-পত্রিকা হচ্ছে সাহিত্য-সংস্কৃতির দরজা-জানালা। তারা সাহিত্যের শিকড়-বাকড়ও বটে। তাই দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মনোভূমির ভাঙাগড়ার খবর পেতে হলে আপনাকে ওলটাতে হবে পত্র-পত্রিকার পাতা।

আমরা এসব পাতা উলটে দেখতে চাই এ জেলার মানুষজনের ভাবার ভঙ্গি, মনের আদল। দেখতে চাই কোথা থেকে শুরু হয়েছিল, এখন কোথায় এসে পৌঁছেছে। সেই পর্যবেক্ষণ বেশ জটিল ব্যাপার। একটি কথা সবার আগে বলতে চাই যে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা গোটা বাংলাকে দিয়েছে অনেক। দিয়েছে সমাজসংস্কার, দিয়েছে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য, দিয়েছে ধর্ম আন্দোলন, বিপ্লব চেতনা। দিয়েছে গান আর নাটকের নতুন বিষয়বোধ। একদিকে ভয়াল বন আর নোনা জলের সম্পদ আহরণের মরিয়া তাগিদ প্রতি মুহূর্তে জীবনমৃত্যুকে একাকার করে দেয়, আবার অন্যদিকে এ জেলাতেই চলছে সাহিত্য-সংস্কৃতির খনিজ সম্পদের আহরণ ও রূপায়ণের বহুমুখী উদ্যম। সে অনেক, অজস্র।

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণে উদ্যোগী হলেন অনেকেই। কলকাতার সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে আমরা এক পাতেই বসাতে পারি অন্তত সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনায়। কেননা ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হচ্ছে 'তত্ত্ববোধিনী', আর তার চার বছরের মাথায় জয়নগর-মজিলপুর থেকে বেরুচ্ছে শিবকৃষ্ণ দত্তের সম্পাদনায় বিদ্যাবিলাসিনী পত্রিকা। সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের প্রবণতা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন—

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকা প্রকাশের সুযোগ গ্রহণে উদ্যোগী হলেন অনেকেই। কলকাতার সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাকে আমরা এক পাতেই বসাতে পারি অন্তত সাময়িক পত্রিকার প্রকাশনায়। কেননা ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হচ্ছে 'তত্ত্ববোধিনী', আর তার চার বছরের মাথায় জয়নগর-মজিলপুর থেকে বেরুচ্ছে শিবকৃষ্ণ দত্তের সম্পাদনায় বিদ্যাবিলাসিনী পত্রিকা।

'নানারূপ গদ্যপদ্য লেখবার এবং ছাপাবার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশি লোকের মধ্যে আজকাল এদেশে দেখা যায়, তা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্তত একখানি মাসিক পত্রের না আবির্ভাব হয়। এবং সে সকল মাসিক পত্রে সাহিত্যের নানারকম মালমসলার কিছু-না-কিছু নমুনা থাকেই থাকে। সুতরাং একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে বঙ্গসাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নবযুগের শিশুসাহিত্য আঁতুড়েই মরবে কিংবা তার একশো বৎসর পরমায়ু হবে, সে কথা বলতে আমি অপারগ।'

সাময়িক পত্রের জন্মমৃত্যু সম্পর্কিত ঠিকুজি-কোষ্ঠী বিচারে প্রমথ চৌধুরী খুব একটা ভুল করেননি। আমরা দেখছি দু বছর পর একই সম্পাদকের সম্পাদনায় একই স্থান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে আর একটি

পত্রিকা—বঙ্গহিতৈষিণী। এবং তার কয়েক বছর পরে ১৮৫৮ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়িপোতা থেকে প্রকাশ করছেন বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ'। সোমপ্রকাশকে নিয়ে বাংলার সাহিত্য পত্রিকার যত না গর্ব, সোমপ্রকাশের সম্পাদক দ্বারকানাথকে নিয়ে এই জেলার গর্ব তার চেয়ে বেশি। পত্রিকাটি এতটাই দাগ কেটেছিল যে প্রায় একশো বছর পরে ১৯৫৭ সালে নবপর্যায়ে সোমপ্রকাশ বের করেছিলেন রাজপুর-হরিনাভির বিদ্বজ্জনমণ্ডলী। আদি পর্যায়ের সোমপ্রকাশের পর ১৮৭০ সালে বারুইপুর থেকে প্রকাশিত হয় বিদূষক (সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) এবং তার পর থেকে নানা বিষয়ে বহু ধরনের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থান থেকে। করঞ্জলি থেকে শীতলা (সম্পাদক শীতলপ্রসাদ ঘোষ ১৯০৪), জয়নগর থেকে প্রচার (সম্পাদক রেভাঃ জে সি দত্ত, ১৮৯৯), চাংড়িপোতা থেকে স্বাস্থ্য ও সমাচার (সম্পাদক ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু, ১৯১৯), হরিনাভি থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ করেন সমদর্শী (১৮৭৪) এবং মুকুল (১৮৯৫)। এ সময়কার ধর্মবিষয়ক কয়েকটি পত্রিকা—আর্যোদয় (সম্পাদক প্রিয়নাথ গুপ্ত, বারুইপুর, ১৮৭১), হিন্দুদর্শন (সম্পাদক, নারায়ণ দাস, বোড়াল, ১৮৭৪), ভারতীয় আর্য পত্রিকা (সম্পাদক গোপাললাল বসু, হরিনাভি, ১৮৭৮), মাহিষ্য সুহৃদ প্রকাশ করেন হরিপদ হালদার (ডায়মন্ডহারবার, ১৯১২)। হরিনাভি থেকে প্রকাশিত মহাকাশ-বিষয়ক পত্রিকা বেপরোয়া (সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯২৬)।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০—৮৬) সোমপ্রকাশ
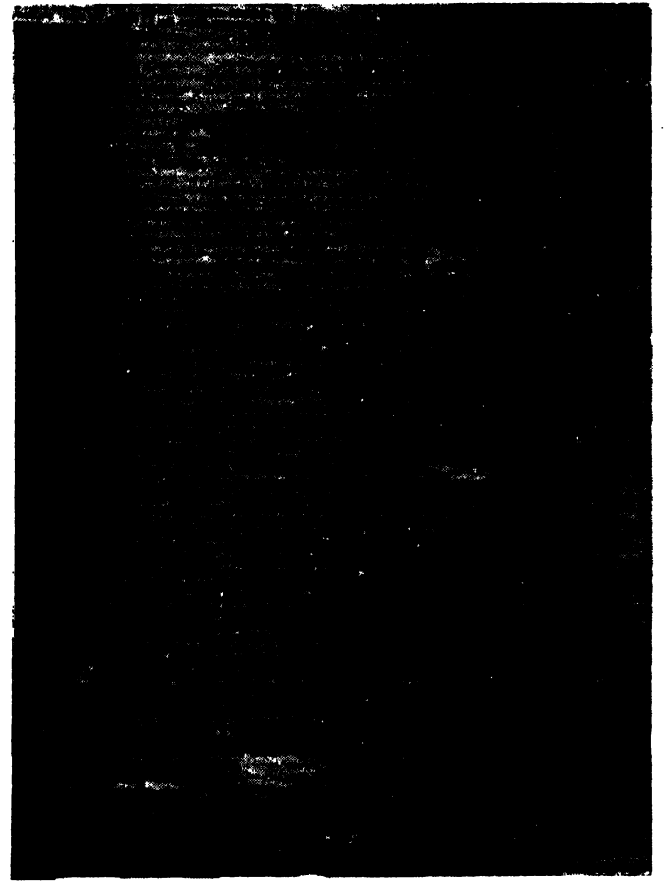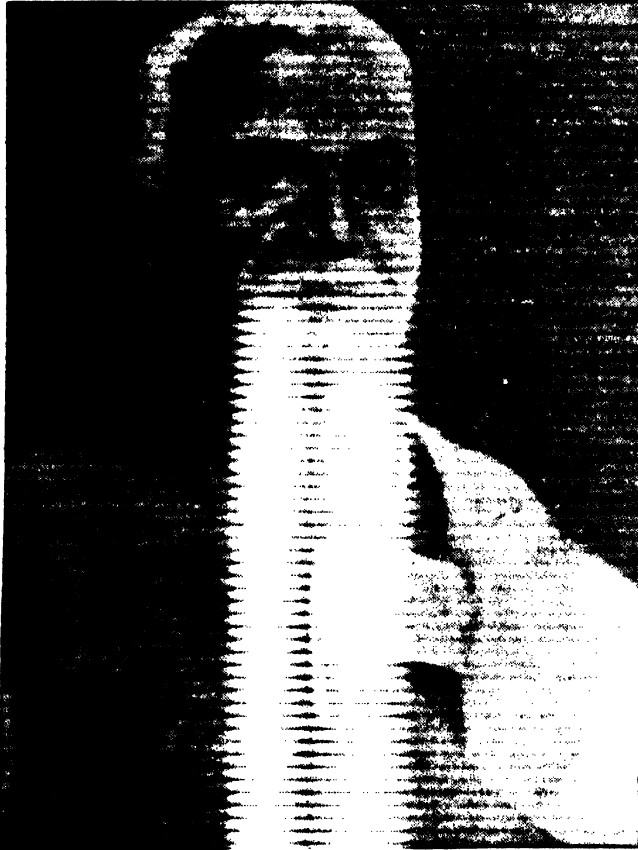
এই অসম্পূর্ণ তালিকা থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি এ জেলার আদিযুগেও ছিল বিদ্যাচর্চার বিবিধ উদ্যোগ এবং সাময়িক পত্রিকায় তার সমৃদ্ধ ছায়াপাত।

২. পরবর্তীকালের সাময়িক পত্রিকায় আসার আগে আমরা আর একবার স্মরণ করে নিতে চাই প্রমথ চৌধুরীকে।

'এই নব্যসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দুচারজনের লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক, পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন। এবং তাঁরা কাব্য দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মন্দির অট্টালিকা স্তূপ স্তম্ভ গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন। ...বস্তুজগতের ন্যায় সাহিত্যজগতেরও প্রাচীন কীর্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভালো, কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য নয়।....পুরাকালে মানুষে যা কিছু গড়ে গেছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হতে আলগা করা, দুচারজনকে বহু লোক হতে বিচ্ছিন্ন করা। অপরপক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা; কাউকে ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়।.... নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে.....। এক কথায়, বহুশক্তিশালী স্বল্প সংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে।'

এ জেলার সাময়িক পত্রিকায় বহুসংখ্যক লেখকের উচ্ছ্বসিত জোয়ার আমরা লক্ষ করব। কে কতটা শক্তি অর্জনে সক্ষম তার হিসাব

কালের হাতে। আমরা এখানে সাময়িক পত্রে সাহিত্যচর্চার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরতে চাইছি। জানি, সমগ্র জেলায় সাময়িক পত্রের তালিকা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হবে না, বা সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখও অসম্ভব।

দৃষ্টিপাতের সুবিধার জন্য আমরা পত্রিকাগুলোকে কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করে নিতে চাই। প্রথম গুচ্ছে থাকুক 'গঙ্গারিডি'র মতো পত্রিকা যেগুলো পরিচালনা করেন গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্রের মতো কোন প্রতিষ্ঠান। কাকদ্বীপ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রাণপুরুষ নরোত্তম হালদার। বিলুপ্ত গঙ্গারিডির ভৌগোলিক অবস্থান, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর বহু মূল্যবান আলোকপাত করে চলেছে এই পত্রিকা। সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত গবেষণায় এঁরা সচেষ্ট। মগরাহাটের প্রভাতি 'বীক্ষণ' সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশ করছে 'প্রভাতী বীক্ষণ'। বহু তরুণ সাহিত্যিক এই পত্রিকাটিতে তাঁদের আত্মপ্রকাশে উৎসাহী হচ্ছেন। কাকদ্বীপের সাহিত্য সম্মেলন-এর মুখপত্রের নাম 'পদধ্বনি'। সম্পাদক মন্মথ নস্কর। বারুইপুর থেকে অভীক্ষা (পূর্ণেন্দু ভৌমিক), গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের 'সাম্নিক' (সম্পাদক বিশ্বনাথ রাহা), সোনারপুর গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের মুখপত্র 'সংবীক্ষণ' (সম্পাদক দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী) ইতিমধ্যেই এক প্রতিশ্রুতিবান লেখক গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোক পরিষদ দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে প্রকাশ করছে 'সমাজ শিক্ষা'। এই পত্রিকা প্রধানত গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি মনোযোগী। সোনারপুর যুবদর্পণ সাহিত্যচক্র প্রকাশ করছেন 'যুবদর্পণ'। বাখরাহাট লোক পরিচয় গবেষণা পরিষদের পত্রিকা 'লোক পরিচয়'।

আমাদের দ্বিতীয় গুচ্ছে রাখছি মেয়েদের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকা। পরিচালনা ও প্রচেষ্টার সিংহভাগ মেয়েরা বহন করলেও লেখকসূচিতে অবারিতদ্বার। এই গুচ্ছের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্রিকা 'সুচেতনা' (সম্পাদক তনুশ্রী রায় ও স্বপ্না গঙ্গোপাধ্যায়)। সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে মূল্যবান অনেক লেখা থাকে এই কাগজে। অঞ্জলি চক্রবর্তীর সম্পাদনায় হরিনাভি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে 'সম সময়'। সাউথ গড়িয়া থেকে ইন্দ্রাণী ঘোষাল প্রকাশ করছেন 'গ্রথন'। নীতা হালদার কলতা থেকে প্রকাশ করছেন 'পল্লীর সুর'। সোনারপুর থেকে কল্পনা ভট্টাচার্যের 'কিশোর কল্লোল' এবং কাকদ্বীপ থেকে সায়রা বানুর 'হলুদ পাখি' পত্রিকা দুটি শিশু-কিশোরদের জন্য সুন্দর প্রকাশনা।

তৃতীয় গুচ্ছে থাকছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি শিশুকিশোর পত্রিকা। বাওয়ালি থেকে 'সঞ্চিতা' (সম্পাদক স্বপন রায়), বাখরাহাট থেকে 'ঠিকঠিকানা' (লোক পরিচয় পরিষদের প্রকাশনা), বিষ্ণুপুর থেকে 'পক্ষীরাজের বাড়ি' (সম্পাদক পরেশ সরকার), বাটানগর থেকে 'টাটাই টো' (সম্পাদক সুধীর ভট্টাচার্য), 'রিমঝিম' (সম্পাদক শংকর চক্রবর্তী), সোনারপুর থেকে 'মুনিয়া'

(সম্পাদক সুখেন্দু মজুমদার) ও আনন্দমেলা (সম্পাদক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

চতুর্থ গুচ্ছে আছে এমন কিছু পত্রিকা যেগুলো বিভিন্ন বিষয়ে কিছু বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। 'অভিযাত্রিক' (ঝিকুরবেড়িয়া, সম্পাদক সুনীতি পাড়ুই ও বিশ্ব মিত্র) প্রকাশ করেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শ্রমিক আন্দোলন ও প্রভাস রায় সংখ্যা। 'বাংলার মুখ' (ডায়মন্ডহারবার, সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রকাশ করেছে ছোটগল্প সম্পর্কিত সংখ্যা। অর্কেস্ট্রা (ডায়মন্ডহারবার, সম্পাদক সুব্রত ভুঁইয়া, দীপক হালদার, বলরাম বাহাদুর) প্রকাশ করেছে বেলজিয়ামের কবিদের একগুচ্ছ কবিতা। 'সমন্বয়' (রাজপুর-সোনারপুর পৌর সমন্বয় সমিতি) প্রকাশ করেছে বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর পূর্তি সংখ্যা। গড়িয়ার 'সাহিত্য মাল্দাস' (সম্পাদক চন্দন রায়, অলোক দস্তচৌধুরী) প্রকাশ করেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা। 'সমারূঢ় ব্যতিক্রম' (সোনারপুর, সম্পাদক পলাশ হালদার) সুন্দরবন এবং পীর সুফি আউল বাউল বিষয়ে দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। নরেন্দ্রপুর থেকে প্রকাশিত 'আবহমান' পত্রিকার বিষয় লিট্‌ল ম্যাগাজিন।

এবারে আমাদের পঞ্চম গুচ্ছ। গল্প কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পল্লবিত এই সব পত্রিকায়। চেহারা-চরিত্রে অনেকটাই মিল একটির সঙ্গে আরেকটির। লেখকসূচিতে অধিকাংশই স্থানীয় উদীয়মানেরা। পত্রিকার মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খ্যাতিমান কিছু লেখকের লেখাও সংযোজিত হয়। বলা বাহুল্য এই সব পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে ওঠে একটি বিশেষ লেখক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর প্রধান সাধারণত তিনিই হন যিনি এই কাজে সময় ও অর্থব্যয়ে পারঙ্গম। এরকম গোষ্ঠী ততদিন ঐক্যবদ্ধ থাকে যতদিন না এদের কেউ একজন মনে করেন যে এবার তিনিই একজন সম্পাদক হতে পারেন এবং পৃথক একটি গোষ্ঠী গঠনে সক্ষম। আমরা দক্ষিণ থেকে শুরু করি। গোসাবা থেকে লোনাজল (তাপস মিত্র), বাণীদীপ (মেঘনাথ দাস), লবণাক্ত (সুপবিত্র প্রধান) ও প্রশাখা। কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাহৃদি (কিশোরীমোহন নস্কর ও রামচন্দ্র ধাড়া), নক্ষত্রের বার্তা (সামসুল হক), হলুদ পাখি (সাররা বানু), সিসিফাস, ফুল (দুটিরই সম্পাদনায় সামসুল হক)। ডায়মন্ডহারবার থেকে বাংলার মুখ (তপন বন্দ্যোপাধ্যায়), গ্রাম নগর, পদাতিক, বার্ণিক, এবং ডাঃ ইয়ার নবী সম্পাদিত ২০ বছর বয়স্ক পত্রিকা 'তরঙ্গ'। অভিযাত্রিক (সুনীতি পাড়ুই ও বিশ্ব মিত্র), অর্কেস্ট্রা (সুব্রত ভুঁইয়া, দী[illegible] [illegible]লদা[illegible] [illegible]লরাম বাহাদুর)। বাসুলডাঙা থেকে কুসুমের ঘরে ফেরা [illegible] ও আবুল বাসার)। সরিষা থেকে বসুধারা (বিভূপ্রস[illegible]), [illegible] আলেখ্য (অহীন্দ্র রায়)। মন্দিরনগরী বাওয়ালি থে[illegible] [illegible]বলচন্দ্র রায়), মিতা (হীরেন ঘোষ ও অমিয় দাস), ঢে[illegible] আমি, অভিশ্রুতি (বৃন্দাবন দাস), বাংলার মাটি, অ[illegible]), তরুণিমা (মজিবুল হক), প্রেমলোক (গোলাম মোস্ত[illegible] [illegible]চক থেকে ব্যঞ্জনা, চকমাণিক থেকে বীক্ষ্য (গৌতম মি[illegible] অশনি (আবদুল আজীজ)। বিষ্ণুপুর থেকে আভাতি[illegible] সামন্ত), কথা ও সংস্কৃতি (গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়[illegible] এবং গঙ্গা ভাগীরথী (দুটি পত্রিকারই সম্পাদনায় [illegible]) রক্তার্ক (করুণাময় ঘোষ)। শিবানীপুর থেকে দেশ [illegible] মাটি [illegible]র (তপন মণ্ডল)। বিদ্যানগর থেকে রাণার (অমর প[illegible]ন্ত)। সামালি থেকে দেশলোক (অনুপ সাঁতরা)। বজবজ থেকে মিতা (হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অমিয়কুমার দাশ), কবিতা (কানাই সরকার), মেঘ রোদ্দুর (তাপস অধিকারী) পরিক্রমা (বিমলেন্দু দাস), অন্যগতি (দীপক ঘোষ)। বাটানগর থেকে কৃশানু (দীনেশ সিংহ), ঋচিক (ব্রজেন্দ্রনাথ ধর), খবরের কথা (রতন ধর), আবর্ত (অর্ধেন্দু চক্রবর্তী), উল্কা (সুব্রত মণ্ডল)। এদিকে জয়নগর-মজিলপুর থেকে বেরুচ্ছে কবিতা আভাস (উত্থানপদ বিজলী), সোনার কেল্লা (মনোরঞ্জন পুরকাইত)। বারুইপুর থেকে মহাদিগন্ত (উত্তম দাস), ছড়া দিলেম ছড়িয়ে (হান্নান আহসান), অন্বীক্ষা। সুভাষগ্রাম থেকে স্ফুলিঙ্গ। বোড়াল থেকে সর্বজয়া। গড়িয়া থেকে নীলপলাশ (তারাপদ পাল), নোদাখালি থেকে বলতে দাও, আলোচনা (গোপাল অধিকারী ও অরুণ মণ্ডল), চয়নিকা (স্বপন মান্না ও তরুণ পোড়ে), ছোট মোল্লাখালি থেকে 'তীর' (অজয় কুমার হালদার ও কানাইলাল পরমান্য) সোনারপুর থেকে 'অরণ্য দূত' (হিমাদ্রি শেখর মণ্ডল), চম্পাহাটি থেকে 'দিবারাত্রির কাব্য' (আফিফ ফুয়াদ)

৩. পূর্বেই স্বীকার করেছি পত্র-পত্রিকার এ তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়। মাতলা-বিদ্যাধরীর ভাঙন-গড়নের মতো এ জেলার পত্রিকাজগতে অবিরাম উদ্ভব, বিরতি এবং বিলোপ চলছে। সুতরাং সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে আমরা বিষয়গত কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চাই। এ প্রসঙ্গে একটু প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করি আবার।

'দেশকাল পাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্রধর্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে তার জন্য আমার কোন খেদ নেই। একালের রচনা ক্ষুদ্র বলে

আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয় তা হলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই।'

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পত্র-পত্রিকায় আমরা অনেক 'আংটি' পাই যেগুলি সত্যিই নিরেট এবং এ কারণেই আদরণীয় ও উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনে কেরী—এই শিরোনামে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন —'হঠাৎ টমাস বাংলায় তাদের শাস্ত্রের কথা বলায় তারা অবাক হয়ে যায়। এক বুড়ো জেলে উত্তর দেয়—সাহেব, শাস্ত্রই যদি জানব জলে ভিজে রোদে পুড়ে মাছ ধরতে আসব কেন?....কেরী যখন সপরিবারে ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় আসছিলেন তখন সুন্দরবনে নেমেই বাংলার মাটি প্রথম স্পর্শ করেন। (*গঙ্গারিডি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪*)। সুন্দরবনের অবহেলিত জনসমাজের বলিষ্ঠ জীবনবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে এই অংশে—'একটা কালাজকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মারার সময় রাগ, দুঃখ, ঘৃণা, হতাশা ঝরে পড়ে বাঁশের প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে। প্রতিপক্ষ তখন আর একটা সামান্য বিষধর সাপ নয়, সে তখন হয়ে দাঁড়ায় সব দুঃখ বেদনা ক্ষোভের একমাত্র কারণ। একটি সাপকে পিটিয়ে মারার নৃশংসতার মধ্যেই খুঁজে পাবার চলে—এই অসহায় নিষ্পেষিত জীবনযন্ত্রণার মধ্যে একটু আলোর ঝলক, একটু প্রতিবাদের ভাষা। এটাই প্রমাণ করে প্রতিবাদের ভাষা এখনও সুন্দরবনের মানুষের অন্তর থেকে হারিয়ে যায়নি। (*সেলিম কর্মকার, নোনাজল, আশ্বিন ১৪০২*)। সুন্দরবনের সীমাহীন জলরাশি গড়ে তোলে আশ্চর্য কাব্যচেতনা। তার
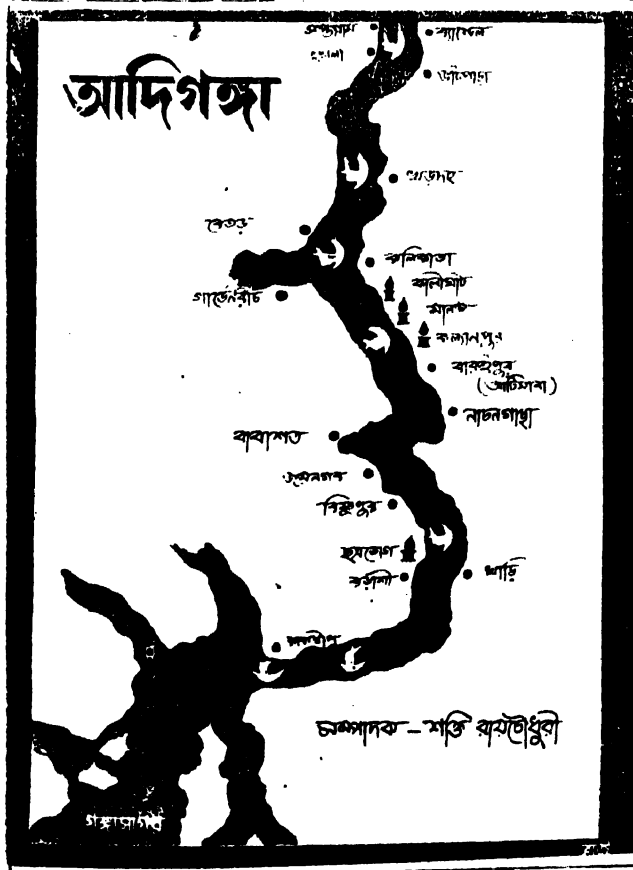
একটি চকিত ইঙ্গিত—জলে ভাসো, জলে ভাসো দেরি নয় আর/থাক মায়া, থাক স্নেহ, ভালবাসা প্রেম/নতুন জীবন পেতে ভয় কি মরণে/মাতলার কালো জলে তরী ভাসালেম।

(*রবীন ভট্টাচার্য, দখলাভ, অক্টোবর ১৯৯৫*)।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকায়ত সংস্কৃতির অনেক পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক পত্রিকায়। তার একটি দৃষ্টান্ত—'একই সঙ্গে সিন্নি দরগার পশ্চিমা বাতাস (পীর, সুফী) যুক্ত হয় দক্ষিণা বাতাসে। এইভাবে ভেদাভেদহীন এক মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি সুন্দরবনে। মানিকপীর—গাজীবাবা—দক্ষিণরায়—বনবিবির সুন্দরবন এই বিচ্ছিন্নতা ও ভেদাভেদের যুগে মিলিত মৈত্রের উজ্জ্বল মাস্তুল।'

(*পলাশ হালদার, সমারূঢ় ব্যতিক্রম, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫*)।

'...যে শুভ বোধ থেকে চেতনার সৃষ্টি, সেই সুচেতনার স্রোতে সমবেত হতে হবে গ্রাম শহর, মহিলা পুরুষ—সর্বস্তরের জনগণকে। স্বচ্ছন্দ, সুস্থতা আর নৈকট্যের পরিপূর্ণতা আজ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনেই নতুন করে ভাবনা, সেই প্রয়োজনেই চেতনার স্তরকে উন্নীত করা। শুভ বোধকে জাগ্রত করার বিনীত প্রয়াস থেকেই 'সুচেতনা'র জন্ম।' (*সুচেতনা, আগস্ট, ১৯৯৫*)

সেই সুনীলের কবিতার ক্যানভাস কম পড়ে গেছে। এখন যে ক্যানভাস ওর হাতে, তাতে শুধু গদ্য। ক্যানভাস নয় মাউন্ট বোর্ড। তেলরঙের মমতা বা জলরঙের জলতরঙ্গ নয়—অ্যাক্রেলিক।'

(*রবি সরকার, সাহিত্য ময়দান, বৈশাখ ১৪০৩*)।

আমরা কিছু কবিতা ও ছড়ার অংশ উল্লেখ করছি এ জেলার কবিতাচর্চার গতিপ্রকৃতির একটা আঁচ দেবার জন্য। কবিতা সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি প্রথমে দেওয়া যাক। 'কেবল সামাজিক ও ব্যক্তিগত জ্ঞান বা গভীরতর প্রজ্ঞার আধার [illegible] কবিতা, [illegible] কোনও সাংবাদিকতা নয়, নয় কোনও দুর্বোধ্য ও বিভ্রা[illegible] [illegible] কীর্তন।....এক অন্তরঙ্গ উন্মোচনের সঙ্কেত থাকে ক[illegible] নিঃশেষ ও ক্লান্ত হয় না কখনও। জীবনের মতোই [illegible] তাই বর্তমান জীবনে অনুপ্রেরণার মশাল....। আজ[illegible] [illegible]ড়ো মাটিতে আমাদের রক্তঘামের সেচে ফোটানো [illegible]সের ফুল।'

(*ক্যাকটাসের ফুল* [illegible] *[illegible]কেল্লা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪*)।

এবারে দেখুন কবিতা:

১. চাদর বিছিয়ে অপে[illegible] [illegible]চি ধান গাছে গভীরতা ঢাকে ভ্রূণ/বৃষ্টির পরে রোদ [illegible] যদি [illegible] উষ্ণ মাটির বাঁধ ভেঙে নামে খুন। (*[illegible]পাধ্যায়; সুচেতনা, ১৯৯৬*)

২. আমি খুঁজছি সেই [illegible] [illegible]ছটি/ফিরে যাচ্ছি মর্তে/যেখানে ছড়ায় সূর্যের কণা/[illegible] [illegible]খানে মানুষ-মানুষ-মানুষ

(*[illegible] রায়, অভিযাত্রিক, ১৩৮৪*)

৩. সময় পিছনে টানে/সামনেও বুক ভাঙা ঢেউ/সমুদ্রের মাঝখানে চারিদিকে নীল অন্ধকার/সেইখানে আর কেউ নয়/শুধু তুমি-তুমি স্বপ্ন/তবুও অক্ষয়'

(*সলিল চৌধুরীকে—অমিয় ভট্টাচার্য, সংবীক্ষণ, ১৯৯৫*)

৪. চাইলেই কি যাওয়া যায়, না যাওয়ার/অনুমতি পাওয়া যায়?/তোমার হৃৎপিণ্ডটা যে আমি সিন্দুকে লুকিয়েছি/আর তার চাবি হারিয়েছি বৃষ্টির কাছে। (*কল্পনা ভট্টাচার্য, সম সময়, ১৪০২*)

৫. সব কিছুতে খেলনা হয়/কে বলেছে তোকে?/বাঘ কখনো খেলনা হয়/গরু ভেড়ার চোখে?/সব কিছুতে খেলনা হয়/ভাবতে গেলে ছবি/আগুন নিয়ে খেলতে গেলে/বেগুনপোড়া হবি।

(*শান্তিময় ভট্টাচার্য, কিশোর কল্লোল, বৈশাখ ১৪০৩*)

৬. ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি/বললো ডেকে—আমরা আসি/বন-কাপাসি যা চলে তুই/ঘুমের পাড়া...' (*সুখেন্দু মজুমদার, মুনিয়া, ১৪০২*)

আমরা কি এই সব উদ্ধৃতাংশ থেকে চিনে নিতে পারি না দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাহিত্যের এই ভূখণ্ডকে? নতুন জাগা এই সব চরে আবাদ এখন অষ্টপ্রহর। ফলতে শুরু করেছে অনেক উজ্জ্বল ফসল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাময়িক পত্রে যেমন সম সময়কে ধরবার

একটা আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ করা যায় তেমনই দেখা যায় অতীত অন্বেষণের প্রয়াস। ইঙ্গিত দেখা যায় অনাগত ভবিষ্যতের তরুণ তাজা লেখকবৃন্দের যাঁরা গড়ে তুলবেন এই জেলার সমৃদ্ধ এক সাহিত্য দিগন্ত।

পত্র-পত্রিকার আলোচনায় অসংখ্য হাতে লেখা দেওয়াল পত্রিকার কথাও এসে যায়। এগুলো দেখা যাবে ক্লাব সংঘের বারান্দায়, স্কুলের নোটিশ বোর্ডের পাশে, রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। এরা প্রচার-পৃষ্ঠপোষকতার তোয়াক্কা করে না। এদের নাম জানে মুষ্টিমেয় কিছু পাঠক। পরম উৎসাহে দিনের পর দিন সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন এই সব পত্রিকার পাতায় একদল উদ্যমশীল সাহিত্যপ্রিয় লেখক-কবি। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য অসংখ্য বিদ্যালয় পত্রিকা। বছরে একবার প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাগুলো। লেখক-লেখিকারা প্রায় সকলেই শিশু-কিশোর ছাত্রছাত্রী।

৪. আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই পত্রিকার আর এক অপরিহার্য অঙ্গের দিকে যার নাম বিজ্ঞাপন। অনেকটা অনুরোধে পড়ে কিংবা তারুণ্যের প্রতি মমতাবশত বিজ্ঞাপনদাতারা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। এর জন্য অর্থব্যয় করেন সামান্যই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিচ্ছি দেব করে ধারে পড়ে থাকে বহুকাল। ওই আর্থিক দিক নিয়ে বলার কথা অনেক আছে। আপাতত আমরা তাকাচ্ছি বিজ্ঞাপনের প্রয়োগ-সাহিত্যের দিকে। কয়েকটি বিজ্ঞাপনের ভাষাবোধ সুন্দর।

(১) বিশাখা বেকারি (২) রঙ্গনা টেলার্স (৩) শরৎ আকাশে আগমনী সুর/বন্দিত প্রাণ আজও সুমধুর (গোসাবার এক কেরোসিন ডিলারের বিজ্ঞাপনে) (৪) লেখক এবং শিল্পীর দায়িত্ব সমাজমানসে সুস্থ সংস্কৃতির স্রোত বইয়ে দেওয়া (একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে) (৫) সুন্দরম বস্ত্রালয় (৬) জ্ঞান বিজ্ঞান বিচিত্রা (একটি খাতার দোকানের নাম) (৭) মনীষা (একটি হোটেলের নাম)।

এরকম কত যে সুন্দর সাহিত্যরুচিকর নাম পাওয়া যায় পত্রিকার পাতায়। হয়তো অজ্ঞাতসারে রুচিবোধ জন্ম নিচ্ছে এ জেলার গ্রামগঞ্জের বাণিজ্য-পসরায়।

৫. এ জেলার সামাজিক জটিলতা পত্রিকাতেও হানা দিচ্ছে। আঙ্গিক নিয়ে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন জাগছে। কবিতার শব্দচয়নে, ছন্দবিন্যাসে, গল্পের গঠনে কিংবা প্রবন্ধের উপস্থাপনা প্রকরণে পুরোনো রীতি-রেওয়াজ নিয়ে অনেক অতৃপ্তি জাগছে। অথচ নব-নির্মাণের কৃৎকৌশলও যথেষ্ট আয়ত্তে আসেনি। বিভিন্ন পত্রিকাকেন্দ্রিক আড্ডায় আসরে বারবার বিতর্কে নামতে হচ্ছে লেখককে ও পাঠককে। এদিকে জীবন-জীবিকার ব্যস্ততা সাহিত্যের জন্য সময় ও মনোযোগকে ক্রমশ কেড়ে নিচ্ছে। পত্রিকার পাঠক সংখ্যা সীমিত। মুদ্রণব্যয় সামাল দেওয়া দিন দিন কষ্টকর হয়ে উঠছে।

কবিতাবহুল হয়ে উঠেছে কাগজগুলো। তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে কবিতা লিখতে ও ছাপতে সময় ও জায়গা লাগে কম। অনেককে সুযোগ দেওয়া যায় বলে অনেককে সন্তুষ্ট করা যায়। কবিতা শুধু নয়, গল্পে-উপন্যাসেও (এসব ছোট পত্রিকায় উপন্যাস বিরল) বিষাদ হতাশা মুখ তুলছে। অনেক কথাই যেন ব্যক্তিগত হয়ে উঠছে। এইসব স্থবিরতা থেকে বেরুবার পথ খুঁজে চলেছে এ জেলার সাহিত্য।

অবশ্য বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সমস্যাগুলো সব জেলার, সারা রাজ্যের পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধেই কমবেশি সত্য। গত দশ বছরে কত ডাকসাইটে কাগজ উঠে গেল, কত কাগজ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এ নিয়ে আফশোসেরই বা কী আছে? এগুলো যে সব অর্থেই ক্ষুদ্র এবং সাময়িক। এসব দেখেশুনে যাঁরা পথ বদল করার কথা ভাবেন তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলছেন—

দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুরনো দিনের পত্র-পত্রিকা

ছবি : সুবর্ণ দাস

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

১২শ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ২৩শে পৌষ মঙ্গলবার, ১৩২৫ সাল। ইংরাজী ৭ই জানুয়ারী ১৯১৯। নগদ মূল্য /০ এক আনা। বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা।

'আমাদের নবসাহিত্যের যেন তেন প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি দমন করতে না পারা যায়, তাহলে বঙ্গসরস্বতীকে যে পথে দাঁড়াতে হবে সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কোন শাস্ত্রেই একথা বলে না যে, বাণিজ্যে বসতে সরস্বতী।....সাহিত্যের বাজারদর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে সেই সঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে। সুতরাং নবসাহিত্যে লোভ নামক রিপুর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক; কেননা শাস্ত্রে বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যের চর্চা এই লোভ, পাপ ও মৃত্যুকে জয় করে নিক, সজাগ ও সজীব থাক নিরন্তর।

তথ্যনির্দেশ :

১। দক্ষিণ ২৪-পরগনার ইতিহাস : সুকুমার সিং।
২। আদিগঙ্গার তীরে তীরে : ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী।
৩। ব্যক্তিগত সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ।
(ক) সন্তোষ মাজী (সূর্যতৃষ্ণা সম্পাদক)
(খ) মেঘনাথ বিশ্বাস (চৈতালী বাণীদীপ সম্পাদক)

লেখক পরিচিতি : শিক্ষক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশের স্থান	প্রকাশের কাল	সম্পাদকের নাম
১।	মজিলপুর পত্রিকা	মজিলপুর	১৮৫৬ (মা)	হরিদাস দত্ত
২।	সোমপ্রকাশ	চাংড়ীপোতা	১৮৫৮ (সাঃ)	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
৩।	রাজপুর পত্রিকা	রাজপুর	১৮৬০ (ঐ)	অজ্ঞাত
৪।	বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব	বারুইপুর	১৮৭১ (পাঃ)	ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস
৫।	ভারতীয় [illegible] পত্রিকা	হরিনাভি	১৮৭৮ (ঐ)	গোপাল বসু
৬।	সুরভী	বেহালা	১৮৮২ (সাঃ)	রাজনারায়ন বসু, গোপিন্দ্রনাথ বসু
৭।	চব্বিশ [illegible]	ডায়মন্ডহারবার	১৯০৬ (ঐ)	হরিপদ ঘোষ
৮।	ডায়মন্ড[illegible]	ডায়মন্ডহারবার	১৯১৩	অজ্ঞাত
৯।	অভিযা[illegible]	মজিলপুর	১৯৪৭ (পাঃ)	সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০।	বন্ধু	মজিলপুর	১৯৫১ (মাঃ)	কালিদাস দত্ত
১১।	অগ্নি[illegible]	বজবজ	১৯৫৭ (পাঃ)	শেখ রওশন আলি
১২।	দক্ষিণা	ডায়মন্ডহারবার	১৯৬৩ (পাঃ)	গণনাথ মন্ডল
১৩।	বেহাল[illegible]	বেহালা	১৯৬৫ (বাঃ)	অজ্ঞাত
☆১৪।	আলি[illegible]	বিষ্ণুপুর	১৯৬৭ (সাঃ)	বিরুপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
☆১৫।	ফুটপা[illegible]	ডায়মন্ডহারবার	১৯৬৮ (পাঃ)	অজয় ভট্টাচার্য্য, কিংশুক ভট্টাচার্য্য
১৬।	হীরক [illegible]	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭০	অমল মাইতি

নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশের স্থান	প্রকাশের কাল	সম্পাদকের নাম
১৭।	বহ্নিদূত	(হালতু) কসবা	১৯৭১ (পাঃ)	রবীন্দ্রনাথ মন্ডল
১৮।	গাঙ্গেয়	বারুইপুর	১৯৭২ (মাঃ)	প্রফুল্ল কুমার রায়
☆১৯।	পতাকা	(আমতলা) বিষ্ণুপুর	১৯৭৩	করুনাময় ঘোষ
২০।	মহেশতলা সংবাদ	মহেশতলা	১৯৭৪ (মাঃ)	রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
☆২১।	দেশ আমার মাটি আমার	(শিবানীপুর) ফলতা	১৯৭৫ (মাঃ)	তপন কান্তি মন্ডল
২২।	মহাকাব্য	(আতাবাগান) গড়িয়া	১৯৭৫	অশোক রায়চৌধুরী
২০।	ভাঙ্গড় বার্তা	ভাঙ্গড়	১৯৭৬ (মাঃ)	সুশিল নস্কর, নজরুল ইসলাম
২৪।	ভাঙ্গড় সমাচার	ভাঙ্গড়	১৯৭৬ (পাঃ)	কালীপদ মন্ডল
২৫।	প্রসুন	ক্যানিং	১৯৭৬ (পাঃ)	সুনিল কৃষ্ণ দেবনাথ
২৬।	প্রসুন দীপ	(ধলীর বাটি) ক্যানিং	১৯৭৬ (পাঃ)	নারায়ন চন্দ্র হালদার
২৭।	জলতীর্থ	ডায়মন্ডহারবার	১৯৭৭ (পাঃ)	অজিত নাগ
☆২৮।	গ্রেট বেঙ্গল	সরশুনা	১৯৭৮	মলয় ঘোষ, বিজয় চট্টোপাধ্যায়
২৯।	মাটির কাছাকাছি		১৯৭৯ (মাঃ)	দিলীপ কুমার বৈদ্য
৩০।	গ্রামে গঞ্জে	(সারেঙ্গাবাদ) বজবজ	১৯৮১ (মাঃ)	রবীন্দ্রনাথ মাঝি
☆৩১।	জেলাবার্তা	সুরশুনা	১৯৮২ (পাঃ)	বিজয় চট্টোপাধ্যায়
৩২।	দিনরাত্রি	নামখানা	১৯৮২ (সাঃ)	নির্মল কুমার মাইতি
৩৩।	লোক সংবাদ	মগরাহাট	১৯৮২ (সাঃ)	পরিমল চক্রবর্তী
৩৪।	দিগ-দিগন্ত	বারুইপুর	১৯৮২ (সাঃ)	এম.এ.মান্নান
☆৩৫।	হালচাল	ক্যানিং	১৯৮২ (পাঃ)	এম.আকরম
৩৬।	সুন্দর বনের মতামত	ভাঙ্গড়	১৯৮৩ (মাঃ)	শুকুর আলি
৩৭।	মতামত	ভাঙ্গড়	১৯৮৪ (ঐ)	শুকুর আলি
☆৩৮।	অহল্যা	কাকদ্বীপ	১৯৮৪ (পাঃ)	প্রমোদ পুরকাইত
৩৯।	গাঁয়ের খবর	(পোলের হাট) ভাঙ্গড়	১৯৮৪ (পাঃ)	হাসনুহেনা বেগম
☆৪০।	দক্ষিণ বঙ্গ বার্তা	(বিজয়গঞ্জ) মন্দিরবাজার	১৯৮৫ (পাঃ)	শ্রীমন্ত কুমার মন্ডল
৪১।	দিগন্ত	(চন্ডিতলা) বজবজ	১৯৮৫ (পাঃ)	দীপক ঘোষ
৪২।	মেদন মল্ল সংবাদ	(সাউথ গড়িয়া) বারুইপুর	১৯৮৫ (মাঃ)	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়,দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়
☆৪৩।	পূজারী	জয়নগর	১৯৮৬	ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য
☆৪৪।	নব নিম্নবঙ্গ	জয়নগর	১৯৮৮ (মাঃ)	প্রভাত ভট্টাচার্য্য
☆৪৫।	মুক্তি কামী	(ট্যাংরাখালি) ক্যানিং	১৯৮৮ (মাঃ)	চিত্তরঞ্জন দাস
☆৪৬।	কাগজের খবর এবং	মহেশতলা	১৯৮৯ (মাঃ)	সুমিত রতন কর
৪৭।	সবার গাঁয়ের খবর		১৯৯০ (সাঃ)	দীপক মুখোপাধ্যায়
৪৮।	দেশবার্তা	রাজপুর	১৯৯১ (পাঃ)	প্রদীপ নাথ
☆৪৯।	আমাদের বজবজ	বজবজ	১৯৯১ (পাঃ)	দেবাশীষ ঘোষ
৫০।	দলিত সংবাদ	(সারাঙ্গাবাদ) বজবজ	১৯৯১ (পাঃ)	রবীন্দ্রনাথ প্রামানিক

নং	পত্রিকার নাম	প্রকাশের স্থান	প্রকাশের কাল	সম্পাদকের নাম
✫৫১।	ফ্রেন্ড অফ অল	ঠাকুরপুকুর	১৯৯১ (মাঃ)	নিত্যানন্দ ব্যাণার্জী
৫২।	মজিলপুর বলাকা	মজিলপুর	১৯৯২ (পাঃ)	প্রবীর চক্রবর্তী
৫৩।	সুন্দরবন সংবাদ	বারুইপুর	১৯৯২ (মাঃ)	শ্যামল রায়চৌধুরী
৫৪।	দক্ষিণ প্রান্তিক	রাজপুর	১৯৯২ (মাঃ)	প্রদীপ নাথ
✫৫৫।	এ মাসের খবর	মহামায়াতলা	১৯৯৩ (মাঃ)	সুকুমার সিং
৫৬।	সংস্কৃতি সন্ধানে	বজবজ	১৯৯৩	বাদল মাঝি
✫৫৭।	ইলাসট্রেটেড ক্যালকাটা	অকসি টাউন মহেশতলা	১৯৯৩ (সাঃ) (সাঃ ভারত)	রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
✫৫৮।	অন্যগতি	(সারেঙ্গাবাদ) বজবজ	১৯৯৪ (সাঃ)	দীপক ঘোষ
✫৫৯।	সমকালীন একতা	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৪ (মাঃ)	দেবাশীষ চৌধুরী
৬০।	নব বিসারী	(বিরেশ্বরপুর) মন্দিরবাজার	১৯৯৪	শচীন্দ্রনাথ ঘরামী
৬১।	বিষাণ	রাজপুর	১৯৯৫ (মাঃ)	অসিত ভট্টাচার্য
৬২।	তরঙ্গ	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৫ (সাঃ)	ইয়াব নবী
✫৬৩।	নাগরিক পৌরবার্ত্তা	রাজপুর	১৯৯৬ (মাঃ)	তপন ভট্টাচার্য
✫৬৪।	অরণ্যদূত	(ঘাসিয়াড়া) সোনারপুর	১৯৯৬ (সাঃ)	হিমাদ্রি শেখর মন্ডল
৬৫।	কলম	ভাঙ্গড়	১৯৯৭ (পাঃ)	লালমিয়া মোল্লা
✫৬৬।	ভাঙ্গর সংবাদ	ভাঙ্গর	১৯৯৭ (পাঃ)	প্রশান্ত সেন
✫৬৭।	সাপ্তাহিক বজবজ দর্শন	বজবজ	১৯৯৭ (সাঃ)	কল্লোল ঘোষ
৬৮।	সংবাদ সমকাল	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৭ (দৈনিক সান্ধ্য)	মতিয়ার রহমান
৬৯।	সুন্দরবন	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৭ (মাঃ)	ডঃ দুলাল চৌধুরী
✫৭০।	আলপথ	বারুইপুর	১৯৯৭ (মাঃ)	হান্নান আহসান
৭১।	সংবাদ পুর পঞ্চায়েত	বারুইপুর	১৯৯৭ (মাঃ)	সুব্রত রায়
✫৭২।	নয়াপথ	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৭	দেবব্রত সাহা
৭৩।	জনজীবন	বারুইপুর	১৯৯৮ (মাঃ)	সৈকত হালদার
✫৭৪।	প্রতিবাদ	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৮ (পাঃ)	দিপালী ভট্টাচার্য্য
✫৭৫।	নব বিষাণ	রাজপুর	১৯৯৮ (মাঃ)	যুক্তি বিকাশ কর
✫৭৬।	শব্দাঞ্জলি	বারুইপুর	১৯৯৯ (ত্রৈঃ)	অরুণোদয় সরকার
✫৭৭।	বঙ্গপদেশে	লক্ষীকান্তপুর	১৯৯৯(সাঃ)	তিমির বরণ দাস
✫৭৮।	দক্ষিণবঙ্গ [illegible]	বোড়াল	১৯৯৯(পাঃ)	বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও কিন্নর রায়
✫৭৯।	ডায়মন্ড টা[illegible]	ডায়মন্ডহারবার	১৯৯৯(পাঃ)	শাকিল আহমেদ
✫৮০।	ব-দ্বীপ বা[illegible]	বাঁশড়া (ক্যানিং)	১৯৯৯(মাঃ)	শাহজাহান সিরাজ
✫৮১।	জন্মভূমি স[illegible]	বারুইপুর	১৯৯৯(মাঃ)	প্রবীরকুমার মিত্র

✫ এই পত্রিকাগুলি এখনও [illegible]

● সংকলন : শক্তি রায়চৌধুরী

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ঃ লোকায়ত জীবন ও জীবিকা

মানুষের মুখ দিয়ে যে ভাষা অর্থাৎ অর্থবোধক বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টি নির্গত হয় তাকে মুখের ভাষা তথা কথ্যভাষা বলে ধরা হয়ে থাকে। এই মুখের ভাষাকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপে ও নিয়মে গ্রথিত করে লিপিবদ্ধ করলেই তা লেখার ভাষা হয়ে যায়। আর লিপিবদ্ধ করলেই ভাষা স্থায়িত্ব ও নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। মুখের ভাষার কোন স্থায়িত্ব নেই, তা ক্ষণিক—উচ্চারণেই তার কার্য শেষ। তা উচ্চারিত হতে হতে নদী প্রবাহের মতো নিরন্তর বয়ে চলে এবং চলার পথে ক্রমাগত রূপ বদল করে। আদিম কালের গুহামানব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কত মানুষের মুখ নিঃসৃত কত ভাষা এই ভাবে উচ্চারিত হয়ে হয়ে কালের বুকে ঝরে গিয়েছে তা কে জানে। লিপিবদ্ধ হয়নি বলেই তাদের কথা আমরা জানতে পারিনি।

সাধারণভাবে ভাষার দুটো রূপ ধরা হয়ে থাকে। তারা হল— কথ্যভাষা ও লেখ্যভাষা। লেখ্যভাষা তৈরি করা ভাষা। একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও আদর্শ অনুসরণ করে এই ভাষাকে তৈরি করা হয়। কিন্তু কথ্যভাষাকে জোর করে তৈরি করতে হয় না। তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং অকৃত্রিম। মানুষের মুখে মুখেই তার জন্ম ও বিকাশ। কিন্তু মুখের ভাষা তথা কথ্যভাষার ব্যবহারে কিছু অসুবিধা আছে। বক্তা এবং শ্রোতা উভয়পক্ষ না থাকলে কথ্যভাষার কোনও সার্থকতা থাকেনা। কিন্তু কথ্যভাষাই হল আসল ভাষা।

প্রত্যেক ভাষার ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী থাকে যাদেরকে ভাষা সম্প্রদায় বলে। এই ভাষা সম্প্রদায় কোন না কোন সমাজগণ্ডীর অন্তর্গত। সেই সমাজ আবার কোনও অঞ্চলে আবদ্ধ। সুতরাং সেই অঞ্চলের সেই সমাজের ভাষা ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হল সেই অঞ্চলের ভাষা সম্প্রদায়। আর কথ্যভাষা যেখানে মুখের ভাষা, ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ। সুতরাং কথ্যভাষায় সেই অঞ্চলের সেই সমাজের ছায়াপাত ঘটে। কথ্যভাষার মধ্যে সেখানকার সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি, নিয়ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ইত্যাদি অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার কথ্যভাষায় দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় খুবই প্রকট।

> **এখানকার সাধারণ মানুষেরা কাজকর্ম, গৃহস্থালী, উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, ক্রোধ-কলহ ইত্যাদিতে এমন কতকগুলি শব্দ, বাক্য, ইডিয়ম প্রভৃতি ব্যবহার করে বা করে আসছে যেগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের উৎপত্তি এবং বিবর্তন এখানেই। আবার সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম, প্রথা ইত্যাদি সংক্রান্ত কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে যেগুলি তারা বহুকাল ধরে কিংবা বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। এছাড়া ভৌগোলিক পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই কিছু শব্দ, বাক্য, ছড়া, গান, কৌতুক, গল্প, ধাঁধা, হেঁয়ালী প্রভৃতি নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে, যেগুলিতে তাদের সহজ-সুন্দর নিরাবরণ জীবনযাত্রার রূপ প্রতিফলিত হয়ে থাকে।**

পণ্ডিতগণ আবার কথ্যভাষার রূপ ভেদ কল্পনা করেছেন। তাঁদের মতে বিশুদ্ধ কথ্যভাষা এবং ভদ্র কথ্যভাষা—এই দুই ভাবে ভাবা যায়। সাধারণ অর্থে মুখ নিঃসৃত ভাষাকে কথ্যভাষা হিসাবে ধরলে শিক্ষিত, পরিশীলিত মানুষের মুখের ভাষাকেও কথ্যভাষা বলা যাবে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষাতে শিক্ষার, জ্ঞানের, অধীত বিদ্যার, পাঠ করা পুস্তকের ভাষার প্রতিফলন থাকতে পারে। তাই এই কথ্যভাষাকে বিশুদ্ধ কথ্যভাষা হিসাবে ধরা যায় না। একে ভদ্র কথ্যভাষা বলা যায়। শিক্ষিত মানুষের ভদ্র কথ্যভাষার বাইরে শিক্ষা ও উন্নত সংস্কৃতির স্পর্শবিহীন লোক সাধারণের মুখের ভাষাই বিশুদ্ধ কথ্যভাষা। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজও বিশুদ্ধ কথ্যভাষার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তবে এই জেলার সর্বত্র বিশুদ্ধ কথ্যভাষার সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চল এবং যে অঞ্চলগুলি আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে, সেই অঞ্চলগুলিতে কথ্যভাষার বিশুদ্ধতা বজায় থাকেনি। এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা প্রধানত ভদ্র কথ্যভাষা।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মানুষের মুখের ভাষাকে বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ বসবাস করে তাদের মুখ নিঃসৃত ভাষাকে কথ্যভাষার আদর্শরূপ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বহুদিন পর্যন্ত এই অঞ্চল অনাদৃত ছিল। শিক্ষা, উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতির আলো এখানে অনেকদিন পর্যন্ত প্রবেশদ্বার খুঁজে পায়নি। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলের মোট জন সমষ্টির অধিকাংশ অশিক্ষিত ছিল। আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচারে এই দেশকে অনুন্নত মানুষের দেশ, গরীব মানুষের দেশ, শ্রমজীবী মানুষের দেশ বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানকার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। তারা চাষবাস করে, নদীতে মাছ ধরে, মাটির হাঁড়ি কলসী তৈরি করে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন করে, লোকের বাড়ি জন-মুনিষের কাজ করে আবার শিল্প সৃষ্টিও করে। এই সমস্ত মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তা কোন বই থেকে শোখা নয়, অন্য জায়গার মানুষের কাছ থেকে শোনা নয়। এ ভাষায় কোন পুস্তক রচিত হয়নি। এ ভাষা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের মুখের ভাষা, যা তারা তাদের কাজে কর্মে, প্রয়োজনে, উৎসবে, আনন্দে, ক্রোধ-কলহে, শিল্প রচনায় ব্যবহার করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। এমনও দেখা গিয়েছে কিছু কিছু শব্দ এই জেলার কোন কোন অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে, ঐ সব অঞ্চলের বাইরে যাদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের আলোচ্য ভাষা সম্প্রদায় হল প্রধানত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। যাদের অনেকেই লেখাপড়া জানে না, কিংবা সামান্য কিছু লেখাপড়া জানে, তবে তা তাদের জীবনে তেমনভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। তাদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত কথ্যভাষাই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার সাধারণ মানুষের জীবন খুব সুখের নয়, সমৃদ্ধির নয় এমনকি খুব স্বাচ্ছন্দ্যের ও নয়। দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অনটনের মধ্যে তাদের জীবন কাটে। তবে তাই বলে তাদের জীবনে আনন্দের অভাব নেই। তারা ঘর-সংসার করে, কাজকর্ম করে, ঝগড়া-মারামারি করে আবার উৎসব-অনুষ্ঠানে আনন্দে মাতামাতি করে। কবির কথায়—"আবাদ করে, বিবাদ করে সুবাদ করে তারা।" এক কথায় এখানকার লোক সাধারণের জীবন [illegible] সরল এবং আনন্দময়। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার এইস[illegible] তথা লোক সাধারণের অধিকাংশ হল শ্রমজীবী মানুষ [illegible] নর উপর নির্ভর করে জীবিকা উপার্জন করে। এদে[illegible] চাষী, জেলে, কামার, কুমোর, মুচি, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি [illegible] নাপিত, তাঁতি, শিউলী, ঘরামী, গোয়ালা, শোলাশিল্পী [illegible] মানুষদের জীবন যাত্রার মান স্বাভাবিকভাবেই নিম্নমা[illegible] শ্রমজীবী মানুষেরা দিন আনে দিন খায়, সহজভাবে [illegible] খুলে হাসে, দুঃখে কেঁদে গড়িয়ে যায়, পাড়া-পড়শীর [illegible] পড়ে, আবার ক্রুদ্ধ হলে নিজের ভাইকেও খুন ক[illegible] না। আর এই সব করতে গিয়ে তারা যে ভাষা ব্যবহার [illegible] ও তাদের জীবন যাত্রার রূপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই [illegible] ভাবে, স্বতঃস্ফূর্ত রূপে তাদের মুখ হতে নির্গত হয়। [illegible] বিশ পরগনার কথ্যভাষা এখানকার সাধারণ মানুষের [illegible] গৃহস্থালী, উৎসব, আমোদ প্রমোদের রূপকে প্রতিফলিত করে। এক কথায় এখানকার কথ্যভাষা এখানকার মানুষের জীবন দর্পণ।

এখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জীবন যাপন সংক্রান্ত যে কথ্যভাষার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি আলোচনা করা হবে। এই আলোচনা করতে গিয়ে কতকগুলি ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানকার সাধারণ মানুষেরা কাজকর্ম, গৃহস্থালী, উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, ক্রোধ-কলহ ইত্যাদিতে এমন কতকগুলি শব্দ, বাক্য, ইডিয়ম প্রভৃতি ব্যবহার করে বা করে আসছে যেগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের উৎপত্তি এবং বিবর্তন এখানেই। আবার সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম, প্রথা ইত্যাদি সংক্রান্ত কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করে যেগুলি তারা বহুকাল ধরে কিংবা বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। এছাড়া ভৌগোলিক পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই কিছু শব্দ, বাক্য, ছড়া, গান, কৌতুক, গল্প, ধাঁধা, হেঁয়ালী প্রভৃতি নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে, যেগুলিতে তাদের সহজ-সুন্দর নিরাবরণ জীবনযাত্রার রূপ প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জীবনযাত্রার রূপ যেমন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর; গৃহস্থালীর চেহারা ও সরঞ্জাম তেমনি মামুলী ও সাধারণ। কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কিত ভাষা অসাধারণ। জীবন যাত্রা ও গৃহস্থালী সম্পর্কিত এমন কিছু শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয় যার প্রচলন অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

আওটানো—জ্বাল দেওয়া। যেমন—দুধ আওটানো।
আস্কার—আমাদের।
তোস্কার—তোমাদের।
তাগার—তাদের।
আদাড়ে—বেপরোয়া।
আওলানো—ঘাঁটাঘাঁটি করা।
আজ্জানো—রোপন করা
আবজুৎ—সংরক্ষিত।
আকাঁড়া—ভালো পরিষ্কার নয় এমন চাল বা কুঁড়ো মেশানো চাল।
দোকামালা—উড়কি মালা। ডাল ঘাঁটার জন্য নারকেল মালা দিয়ে তৈরি।
উঁতো—ভিজে কাঠ ঘুঁটে উনুনের উপর রেখে গরম করার বা শুকনো করার ব্যবস্থা।
অপেল—নাকের গহনা, নাকছাবি।
আই—মায়ের মা বা দিদা।
পাই—তেল রাখার পাত্র।
আগুট পাতা—কলাপাতা গোটা অবস্থায়।
হঁসিন—তেল না দিয়ে কেবল নুন হলুদ দিয়ে কাঁচা মাছ মেখে গরম করে রাখা।
এঁশিয়ে—অল্প অল্প শুকনো হয়ে ওঠাকে বলে।
এনতার—যত ইচ্ছা তত, প্রচুর।
কাওরা হাঁস—পুরুষ হাঁস।
কটা—খুব বেশি ফরসা।
ক—কোয়া। যেমন লেবুর কোয়া।

ধান খেতে আগাছা পরিষ্কার করছেন মহিলা শ্রমজীবী

কুরুণ্ডে—অপুষ্ট বা চিমসানো।
কালা—ঠাণ্ডা।
কানাচি—ঘর বাড়ির এক কোণ বা একধার।
কুরুই—কাঁকর।
কুঁজি—কুঁড়ে ঘর।
খ—খোয়া।
খালাস—প্রসব।
গালা—ধার।
গদ—কাদা।
গড়ে—কুড়ে বা অলস।
গাছি—জামিন।
গ—গ ওঠা। কুকুর পাগল হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়।
ঘেতো—কাজে অলসতা বা অনিচ্ছা আছে যার।
কড়কড়া—বেশি শুকনো, সকালের রান্না ভাত বিকেল পর্যন্ত জল না দিয়ে রাখলে যে অবস্থা হয়।
চেকনাই—উজ্জ্বল।
চুঁই—খুব ছোট।
ছিঁড়ু—বাপ মা মরা ছেলে মেয়ে। ছিন্ন > ছিঁড়ু।।
ছানা—ছোট ছেলে। শাবক > ছানা।
ছানি—ছোট মেয়ে।
ছোড়ান—চাবি।
ঝোর—ঘরের ছাঁচ।
ঝুঁঝাকো—ভোর বেলা আবছা অন্ধকার থাকলে।
কেলুন—ভোর বেলা স্পষ্ট আলো ফুটলে।
টিকনে—মাথার মধ্য স্থান।
ঠুনকো—স্তনের অসুখ।
ডবাসি—জলীয় পদার্থ জ্বাল দেওয়ার সময় নাড়বার জন্য কাঠি।
তাড়ড়ানো—গোছানো-সংরক্ষণ করা।
তামরি লাগা—কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাওয়া।
তিউড়ি—সাময়িক ভাবে রান্নার জন্য মাটিতে গর্ত কেটে তৈরি ছোট উনুন।
দেড়ি—উদ্‌বৃত্ত।
ধাড়ী—স্ত্রী ছাগল।
নয়চা—নূতন।
পাকা—উনুন।
পাকুণ্ডে—পাকানো শরীর।
পয়মাল—সর্বনাশ।
পেনা—মত বা সদৃশ।
প—বেতের তৈরি এক পোয়া চাল মাপার পাত্র।
ফল—হাঁসের ডিম।
ফল্লা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেয়েরা স্বামী কিংবা গুরুজনদের নাম না ধরে 'ফল্লা' বলে উল্লেখ করে। যেমন—ফল্লা নস্কর।
ফজবানি—ভঙ্গুর।
ফুতি মারা—ভাংচি দেওয়া।
ফ্যাচাং—ঝামেলা।
ফ্যারাং—কাপড় পরার স্টাইল।
বাঁত—বমি।
বখিল—কৃপণ। বখিলের ধন বাড়ে।
বলোক্—তরল পদার্থের ফুটন্ত অবস্থা। বুদবুদ উঠলে।
বালতি—বেওয়া।
বিঁদ—ছিদ্র।
ময়তা—মূল অংশ।
শাড্ডা—মাচা বা ভারা।
শেলাক—আলগা।
হাঁড় ছানা—ঝিনুক।

ছড়ো—নটে শাকের গোড়া।

বাক্য ব্যবহার ঃ ও ছানির মা ছোড়ানটা কোথায় আকলি? একনো দুধ টা আওটানো হলুনি? সাঁঝের বেলা আগ্গার বাড়ী এস। তোগ্গার ছানাটা এমন আদাড়ে কারোর কথা শোনে না। আমি যেন মাল আবজুৎ করে একেটি-চাইলেই অমনি দে দোব। দোকা মালা দে ডালটা ঘেঁটে নে। এমনি করে উঁতো দেয় নাকি, কিচ্ছু শেকোনি বাপু। গাঙসো মাছগুলো ভাল করে হঁসিন দে কাল সোকালে পান্তা ভাতে খাবি। আমি কারোর কানাচির ধার দে চলিনা হ্যাঁ। মাগীরা কাওরা হাঁস পুষেচে, ধানগুনো সব খেয়ে নেলো। ইত্যাদি।

ভাষার রূপান্তর গ্রহণ ও নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ হল ধ্বনির উচ্চারণে বিকৃতি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আর্যগণের ভারতে আগমনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষার যে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার মূলেও এই উচ্চারণ বিকৃতি। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার কথ্যভাষায় এই উচ্চারণ বিকৃতি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। উচ্চারণ বিকৃতির ফলে এখানকার মানুষের মুখের ভাষায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাতে কথ্যভাষার এক নূতন রূপ তৈরি হয়েছে। এই বিকৃতি ঘটেছে ঋ-ধ্বনি, র-ফলা, র, ল প্রভৃতির উচ্চারণে। যেমন—

কৃমি > কিরমি	ভদ্র > ভদ্দর	লোক > নোক
কৃশ > কুশো	গর্ত > গত্ত	লাউ > নাউ
ঋতু > ইতু	অক্রূর > অক্কুরো	লাল > নাল
মৃগী > মিরগি	গর্দান > গদ্দান	লিচু > নিচু
কৃত্তিবাস > কিত্তিবাস	রাজা > আজা	লেখা > নেকা
বৃহস্পতি > বেস্পতি	রুটি > উটি	লুচি > নুচি
অদৃষ্ট > অদেষ্ট	রতন > অতন	লুট > নুট
ঋণ > ইন	রাগ > আগ	লেপ > নেপ
মৃগেল > মিরগেল	রঙ > অঙ	লোহা > নোয়া

ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদে এই উচ্চারণ বিকৃতি প্রকট।

বলছে > বলতেচে/বলতেছে।

করছে > করতেচে/করতেছে।

চলছে > চলতেচে/চলতেছে।

হাসছে > হাসতেচে/[illegible]তেছে।

রাঁধছে > রাঁধতেচে/[illegible]

লিখছে > নিকতেচে[illegible]

কাঁদছে > কাঁদতেচে[illegible]

উচ্চারণ বৈকল্যের [illegible] নূতন ধ্বনি বা বর্ণের আগমন হয় এবং অপিনিহি[illegible] স্বরধ্বনির আগমন কিংবা স্বরব্যঞ্জনের বিপর্যাস ঘটে [illegible] বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষায় যত [illegible] অন্যত্র তা পাওয়া যায় না।

দেখিয়ে > দেইকে

উড়িয়ে > উইড়ে

কুটিয়ে > কুইটে।

কাটিয়ে > কাইটে

গড়িয়ে > গইড়ে

পালিয়ে > পাইলে/পেইলে।

দাঁড়িয়ে > দাঁইড়ে/দেঁইড়ে।

লাগিয়ে > লাইগে/লেইগে/নেইগে।

চালিয়ে > চাইলে/চেইলে ইত্যাদি।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার লোক সাধারণত কেবল কাজে কর্মে, উৎসবে আনন্দে, ক্রোধ-কলহে ভাষা ব্যবহার করে না, তারা মুখে মুখে ছড়া বাঁধে, ধাঁধা বানায়, হেঁয়ালি সৃষ্টি করে। এগুলি যেমন কথ্যভাষার সম্পদ তেমনি লোক সংস্কৃতির উপাদান। এগুলির মধ্য দিয়ে লোকায়ত জীবন, রীতি-নীতি, প্রথা-আচার এমনকি আর্থ সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় প্রচলিত এই রকম কিছু ছড়া, ধাঁধা হেঁয়ালি, প্রবাদ প্রবচনের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। ছড়া—

"কুড়ুনির বেটা উড়ুনি গায়।
গদের ওপর জুতো পায়।"

কুড়ুনি—যারা (স্ত্রী) ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি কুড়িয়ে জীবিকা অর্জন করে।

গদ—কাদা।

"এক পালি ধানে দু'পালি খই।
বিছনে মোতার ঘর কই।।"

পালি—বেতের তৈরি চাল মাপার পাত্র।

বিছনে—বিছানায়।

"ন্যাড়া মাথা খই চাড়া বগে খুঁটে খায়।
হোগলা বুড়ি পেদে দিলে চোকলা উঠে যায়।।"

খই চাড়া—চালুনিতে ভালো খই চেলে নেবার পর যে অবশিষ্ট খই পড়ে থাকে।

পাদ—বাৎকর্ম। শরীরের দূষিত যে গ্যাস মলদ্বার দিয়ে নির্গত হয় তাকে বলে।

"এক যে ছিল শিয়াল।
তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।।
মা বেড়তেছিল খানা।
ছাবালে তুলতেছিল পানা।।
তার বাপের নাম রতা।
ফুরোলো আমার কতা।।"

খানা—মাটির উপর কাটা নালা।

ছাবালে—ছেলে। ছেলেরা।

রতা—রতিকান্ত।

কতা—কথা-গল্প।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার গ্রামে গঞ্জে, আনাচে কানাচে এই রকম কত গ্রাম্য ছড়া ছড়িয়ে আছে কে তার হিসাব রাখে। এগুলির মধ্য দিয়ে কথ্যভাষার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সহজ সরল জীবন চিত্র ফুটে ওঠে। গ্রামের মানুষেরা হাতের কাছে পাওয়া চোখের সামনে দেখা উপকরণ নিয়ে কত অনায়াসে সাবলীলভাবে কথ্যভাষার মালা গেঁথেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। এমনি করে লোক সাধারণ প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, হেঁয়ালি রচনা করেছে যাদের মধ্যে কথ্যভাষার পরিচয় তো আছেই সঙ্গে সঙ্গে লোকায়ত জীবনের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের রীতি, নীতি, প্রথা সংস্কার ইত্যাদির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল।

ধাঁধা ও হেঁয়ালি—"এক নৌকো সুপারি।
গুনতে নারে ব্যাপারি।"

উত্তর—আকাশের তারা।

"কাঁচা বেলা তুপতাপ পাকলে সিঁদুর।
যে না বলতে পারে তার বাবা বুড়ো ইঁদুর।।"

উত্তর—কুমোরদের মাটির হাঁড়ি তৈরি করা।

"রাতে গরু চরালাম
দিনে গরু নাই।
কোন পথে গেছে গরু
গোঠে গোবর নাই।।"

উত্তর—আকাশের তারা।

"পুঁটি ঘরে থাকে জামা গায়।
পুঁটি ন্যাংটো হয়ে হাটে যায়।।"

উত্তর—পাকা তেঁতুল।

প্রবাদ-প্রবচন—"পরের সোনা দিওনি কানে।
ছিঁড়ে নেবে হ্যাঁচকা টানে।।"

"ধোপা বড় বন্ধু হয়।
চাল দিলে চিড়ে দেয়।।"

"অতি বাড় বেড়োনি।
ঝড়ে পড়ে যাবে।
অতি ছোট হওনি
ছাগলে মুড়োবে।।"

"নোড়া জব্দ শিলে।
বউ জব্দ কিসে।।"

"ভাগ্য ছাড়া পথ নি।
ভাতার ছাড়া গত নি।।"

গত—গতি।

এমনি কত ধাঁধা প্রবাদ-প্রবচন হেঁয়ালি ইত্যাদির উদাহরণ দেওয়া যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় বহু বৃত্তিধারী কিংবা জীবিকা-ধারী মানুষের বাস। এইসব জীবিকাধারী মানুষেরা আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত। অর্থাৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নানা প্রকার জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সাহায্যে জীবনযাপন করে। যেমন চাষী চাষ করে, জেলে মাছ ধরে, কুমোর মাটির হাঁড়ি কলসি তৈরি করে, তাঁতি কাপড় চোপড় বানায়। চাষী, জেলে, কুমোর তাঁতি প্রভৃতি হল বৃত্তি বা জীবিকাধারী মানুষ। এরা আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, মাহিষ্য, ডোম, বাগদী, হাড়ি, সদগোপ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আবার এই সব বৃত্তিধারী মানুষের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বৈষ্ণব, খৃষ্টান প্রভৃতি আছে। কিন্তু জাতি অথবা সম্প্রদায় যা হোক না কেন জীবিকা তথা বৃত্তি এই অঞ্চলের মানুষের শ্রেণীবিভাগকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। এক এক প্রকার বৃত্তিকে ঘিরে এক একটি শ্রেণী যেমন গড়ে উঠেছে। তেমনি গড়ে উঠেছে তাদের ভাষা পরিমণ্ডল। যেমন, যারা চাষ করে তারাই চাষী। তারা হিন্দু হতে পারে, মুসলমান হতে পারে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হতে পারে, কৈবর্ত হতে পারে, সদ্‌গোপ হতে পারে। এই ভাবে বৃত্তি মূলক শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি এই চাষবাসকে ঘিরে তৈরি হয়েছে
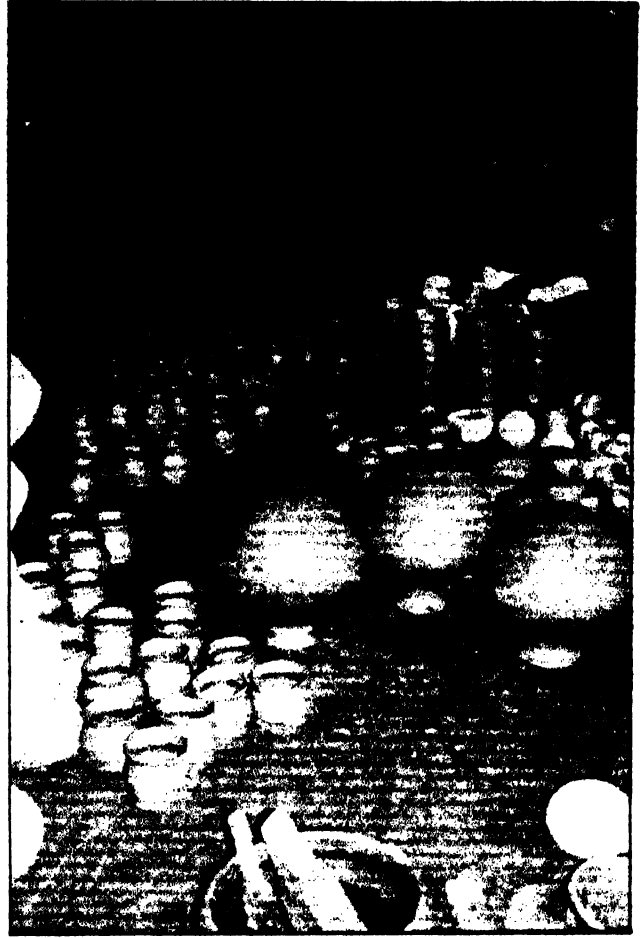
কুমোর সম্প্রদায়ের অধিকাংশের এখনও জীবিকা মাটির হাঁড়ি কলসি তৈরি করা

এক বিশেষ ভাষাজগৎ, যার ব্যবহার শুধু কৃষি কর্ম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এর বাইরে এই ভাষাজগৎ অচল। এই রকম কামার, কুমোর, জেলে, ছুতোর, তাঁতি, শোলাশিল্পী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের আলাদা আলাদা ভাষাজগৎ আছে। আবার এর মধ্য দিয়েঃ ফুটে উঠেছে তাদের লোকসংস্কৃতির পরিচয়।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কিছু কিছু জাতিগত বৃত্তি অর্থাৎ বংশানুক্রমিক পেশার মানুষ আছে, বাকী সবাই প্রয়োজন ভিত্তিক শ্রমকার্য করে। যেমন, চাষী প্রয়োজনে করে জেলের কাজ, তাঁতির কাজ, ঘরামীর কাজ কিংবা শোলা-শিল্পীর কাজ। তেমনি কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে সময় সময় চাষবাস করে। আসলে এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষকে মিশ্র জীবিকা গ্রহণে বাধ্য করেছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল পূর্বে বিভিন্ন বৃত্তিধারী জনগোষ্ঠী অন্ন সংস্থানের উপায়স্বরূপ বংশানুক্রমিক বৃত্তিগুলি অবলম্বন করেছিল। পরবর্তীকালে সেই বৃত্তিগুলি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে তারা অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন ঘরামী, নাটুয়া, নাইয়া, পটুয়া, গায়েন প্রভৃতি বৃত্তিধারী মানুষগুলির জাতিগত বৃত্তি বর্তমানে লুপ্ত কিংবা লুপ্ত প্রায়। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার গ্রামে গ্রামে কেবল মানুষের পদবী হিসাবে এগুলিকে পাওয়া যায়। এই জন গোষ্ঠীর বংশধররা যারা আজ বেঁচে আছে তারা অন্য জীবিকা গ্রহণ করেছে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার জীবিকাগুলির মধ্যে দুটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। একটি ধারা হল কিছু মানুষ সম্পূর্ণভাবে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্য ধারা হলো—কিছু মানুষ কায়িক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প চর্চা করে কিংবা শিল্প তথা লোকশিল্পকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। উভয় ধারার মধ্যে বংশগত বা জাতিগত বৃত্তি ও আছে। তেমনি এই সব জীবিকাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ভাবা পরিমণ্ডল। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার কথ্যভাষা ও লোক সংস্কৃতিতে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

অন্নসংস্থান তথা জীবননির্বাহের উপায় হিসাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত কায়িক শ্রম নির্ভর বৃত্তি বা জীবিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেই সমস্ত জীবিকাধারী সম্পর্কিত শব্দাবলী এবং প্রচলিত অর্থে তাদের পরিচয় দেওয়া হল—

চাষী—যারা কৃষিকর্ম তথা চাষবাস করে।

জেলে—যারা খালে বিলে নদীতে মাছ ধরে এবং মাছ বিক্রি করে।

নাপিত—যারা চুল দাড়ি কাটে।

গোয়ালা—যারা দুধ দোয় ও দুধের যোগান দেয়।

বারুই—পানচাষী।

তেলি—তৈল উৎপাদনকারী। তৈল ও তামাক ব্যবসায়ী।

ঘরামী—যারা খড়ের ঘর ছায়। বর্তমানে এই বৃত্তির প্রচলন কম।

নেয়ে/নাইয়া—নাবিক/মাঝি অর্থে। যারা নৌকা চালিয়ে জীবিকা অর্জন করে। সুন্দরবন অঞ্চলে এই শ্রেণীর মানুষদের বেশি দেখা যায়। পূর্বে এই বৃত্তিধারী নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল। বর্তমানে তারা লুপ্ত প্রায়। আজ অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষ এই জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

মাঝি—যারা নৌকার মাঝিগিরি করে।

গায়েন—যারা গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। পূর্বে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল। বর্তমানে বহু মানুষ এই পেশায় যুক্ত।

বায়েন—বাদ্যকর। পূর্বে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ছিল।

ঢাকী—যারা পূজা বাড়ীতে ঢাক বাজায়

নেটো/নাটুয়া—নট/ন[illegible] অভিনেতা। প্রাচীনকালে এক শ্রেণীর জনগোষ্ঠী মুখে রঙ [illegible] কৌতুক [illegible] জীবিকা নির্বাহ করত। চর্যাপদে তাদের কথা আছে। [illegible] এই [illegible] জনগোষ্ঠী লুপ্ত। বর্তমানে অন্য মানুষ এই পেশায় যু[illegible] যুক্ত।

শিউলি—যারা তাল [illegible] গ্রহ করে গুড় পাটালি তৈরি করে।

মউলে—যারা বন [illegible] মধু [illegible] করে।

মেথর—যারা ময়লা [illegible] করে।

রাজ মিস্ত্রি—যারা [illegible] বানায়।

ধোপা—যারা কাপড় [illegible] চব্বিশ-পরগনায় ধোপাদের মধ্যে কিছু মানুষ চিড়ে [illegible]

হাড়ি/ডোম—যারা [illegible] কাজ করে। প্রাচীন কালে এই শ্রেণীর মানুষদের বি[illegible] পাওয়া যায় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে কিংবা লোকছড়ায়। এই [illegible] খুব শক্তিশালী ছিল এবং সৈন্যদলে কাজ করত। [illegible] এরা [illegible] কম পেশায় নিযুক্ত।

কাওরা/কাহার—যারা ডুলি পাল্কী বহন করে। বর্তমানে এই পেশার প্রচলন কম।

মালী—যারা বাগানে ফুল ফোটায়।

ধাই—প্রসবকারিণী মহিলা। পূর্বে এই বৃত্তি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে লুপ্ত প্রায়।

ভানকি—যারা বাড়ীতে বাড়ীতে ধান ভানার কাজ করে।

করাতি—করাত দ্বারা কাঠ চেরাই করা যাদের পেশা।

দেয়ালি—মাটির দেওয়াল গাঁথা যাদের পেশা।

বাগানী—বাগান চাষ করা যাদের পেশা।

ওঝা/গুণীন—মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড় ফুঁক করে যারা রোগ উপশম করে, ভূত ছাড়ায়, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা ইত্যাদি করে।

কীত্তুনি/কীর্তনীয়া—কীর্তনগান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করত এক শ্রেণীর মানুষ। আজ এই পেশার প্রচলন কমে গিয়েছে।

বৈরাগী—বৈষ্ণব শ্রেণীর মানুষ।

কবিয়াল/টপ্পাদার—কবি টপ্পা গেয়ে যারা জীবিকা অর্জন করে।

কয়াল—যারা বাড়ী বাড়ী ধান চাল মাপার কাজ করত। এখন প্রচলন কম। অন্য শ্রেণীর মানুষ এই পেশায় যুক্ত।

পাটুনী/পাটনি—যারা খেয়া পারাপারের কাজ করে।

বদ্যি/কবিরাজ—এককালে এই শ্রেণীর মানুষ গাছের মূল, গাছ-গাছড়া (Harbs) লতাপাতা প্রভৃতির সাহায্যে চিকিৎসা করত। বর্তমানে প্রচলন কম। অন্য মানুষ এই পেশায় যুক্ত।

ঘটক—যারা বিবাহ সম্পর্কিত যোগাযোগ করে জীবিকা উপার্জন করে।

বাজীকর—যারা বাজী তৈরি করে জীবিকা উপার্জন করে। নানা প্রকার খেলা দেখিয়ে জীবিকা উপার্জন করে।

দর্জি—যারা জামা কাপড় বানায়।

শুঁড়ি—যারা মদ্য উৎপাদন কার্যের সঙ্গে যুক্ত।

এখন দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বিভিন্ন গ্রাম থেকে এই সকল জীবিকা সম্পর্কিত যে শব্দাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের কিছু কিছু এখানে উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী বিচার—বিশ্লেষণ আলোচনা, বাক্য ব্যবহারও দেখানো হবে। একটা কথা বলে রাখা ভাল—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আয়তন যেমন বড় তেমনি বহু মানুষের বাস এবং বিচিত্র তাদের কর্মকাণ্ড। সুতরাং জীবিকা সংক্রান্ত যত শব্দাবলী সংগৃহীত হয়েছে তাদের সবগুলি এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ শব্দগুলিই কেবল দেওয়া হবে।

হাল—হল অর্থে। সাধারণত গরু, লাঙ্গল, জোয়াল ইত্যাদি নিয়ে চাষ করার সমগ্র ব্যবস্থাকে বোঝায়।

আঙড়া—লাঙ্গল ও জোয়ালকে সংযুক্ত রাখার জন্য সাধারণত বাবলা কাঠ কিংবা বাঁশের তৈরি জিজ্ঞাসার চিহ্ন আকারের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

আঙড়া দড়ি—আঙড়ার নীচে বাঁধা থাকে। এই দড়ি দিয়ে জোয়ালকে লাঙ্গলের সাথে বাঁধা হয়।

মুটে/মুঠে—লাঙ্গলের যে অংশ মুঠো করে ধরা হয়।

জুৎ—লাঙ্গল ঠিক সোজাভাবে থাকার অবস্থা।

আটন—জমির সীমানা।

বেমন—ধান চারা। রোপণ করার জন্য যখন তোলা হয়।

তলা—ধান চারা। জমিতে যখন থাকে।

আঁকা—ধান চারার বাণ্ডিল সাধারণত দু'ভাগে বাঁধা হয়।

গুচি—গুচ্ছ > গুচি। তিন চারটি করে ধান চারা পোঁতা হয়। এগুলিকে বলে গুচি।

রোয়া—রোপণ অর্থে। বর্ষাকালে মাঠে/জমিতে ধান চারা পোঁতা।

পাই—ধান চারা পোঁতা অবস্থায় লাইন।

কাড়ানো—প্রথমবার জমি চষা। সাধারণত লাঙ্গল দিয়ে তিনবার চষে ও তিনবার মই দিয়ে সমান করে ধান চারা লাগানো হয়। প্রথমবার চষাকে বলে কাড়ানো।

দোয়ার—দ্বিতীয় বার জমি চষা।

কাদা করা—তৃতীয় বার জমি চষা।

বলানে—জমিতে ঘাস আগাছা ইত্যাদি পচে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা।

কাদাসারা—চাষের কাজ শেষ হওয়া।

বলঙ্গা বাড়ি—বেশি জলের মধ্যে জমির চষা অংশ চিনতে পারার জন্য বাঁশের কঞ্চি পুঁতে চিহ্ন দেওয়া হয়। এই কঞ্চিগুলিকে বলে বলঙ্গা বাড়ি।

ছাট—খেজুর ডাগের মাথার পাতাগুলি চিরে চিরে নরম করে গরু তাড়াবার কাজে ব্যবহার করা হয়।

সিরোল—হাল চষার লম্বা দাগকে বলে সিরোল বা শিরোল। শিরার সঙ্গে সাদৃশ্য করে এই শব্দ সৃষ্টি হয়েছে।

আঁতড়—জমির এক মাথা থেকে আর এক মাথা আবার সেখান থেকে পূর্বস্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত হাল চষাকে বলে আঁতড়। আঁচড়—আঁতড়।

পাটাশিরে—মোটা এবং চওড়া ধান চারা।

কাগড়ি—ধান চারার এক বিশেষ পর্যায়। সাধারণত গ্রীষ্মকালে জমি চষে বীজধান ছড়ানো হয়। এই ধান থেকে যে চারা জন্মায়।

গেঁকে—বর্ষার সময় কাদা করা জমিতে অঙ্কুরিত বীজধান ছড়িয়ে যে চারা পাওয়া যায়।

গোছপুণ্য—জমিতে প্রথম ধান চারা রোপণ। ভিজে চাল গালে নিয়ে প্রথম ধান চারা রোপণ করে চাষীরা। খালি পেটে ধান চারা রোপণ করলে ফসল ভাল হয় না বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে, সেইজন্য এই আচার। লোক বিশ্বাস/লোকাচারের দৃষ্টান্ত।

কোলাট—বসতির আশেপাশের জমি।

দোনা—নীচু জমি

কোরোঙ্গা—গরুর হাল চাল বোঝে এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চাষী।

নেত—বীজতলার আঁটি শিকলের মত গেঁথে লম্বা লাইন করে রাখা হয়। এগুলি জলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

জাঁকা—চাষের মাঠে আগুন রাখার জন্য খড় দিয়ে তৈরি মোটা গদাকৃতি জিনিস।

ডাঁড়—উঁচু এবং শুকনো জমি।

ঘোলা—পরিষ্কার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমন্বিত জমি নয়। বাঁকা ট্যারা, গোল, লম্বাটে, কোণাকৃতি জমি।
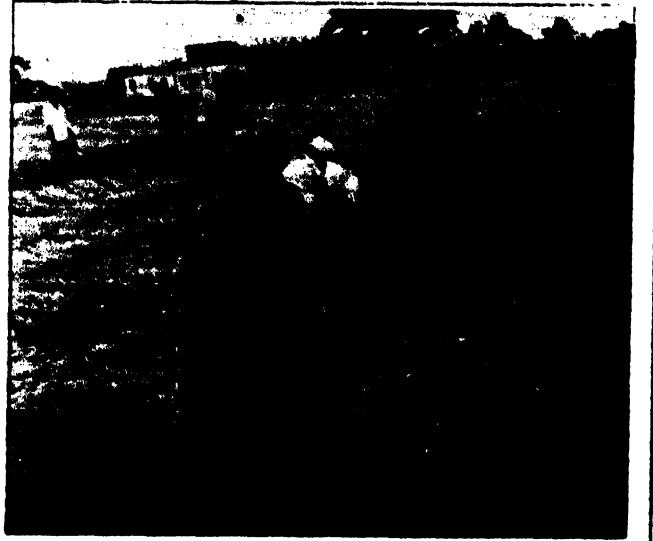
ধান কাটছেন মহিলা শ্রমজীবী

গাঁতা—হাল ধরে দেওয়ার ব্যবস্থা।

দাওয়া—দাওয়ৎ > দাওয়া। ধান কাটা অর্থাৎ ফসল তোলার কাজ শেষ হওয়া।

গললা—ধান বা খড়ের বিচালি।

পালকুঁড়ি—ঝরে পড়া ধানের শীষ।

পোয়াল—ধান ঝাড়ার পর অবশিষ্ট খোলা এলোমেলো খড়। এতে ধানও থাকে।

তড়পা—কুড়িটা করে বিচালি একত্র বাঁধা হয়। একে তড়পা বলে।

টাল—তড়পাগুলি এক জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়। একে টাল বলে।

পুড়ো—খড় সাজিয়ে তার মধ্যে বীজ ধান সংরক্ষণ করা হয়। একে বলে পুড়ো।

চিটে—অপুষ্ট ধান।

আকড়া—শাঁসহীন ধান।

আড়া—মাছ ধরার সরঞ্জাম।

উপড়ো—মাছ ধরার জন্য গর্ত-ফাঁদ।

কাড়া—মাছ ধরার কৌশল।

ঘাল—জালের তলার অংশ। যেখানে মাছ ঢোকে।

আটল

মগরী

ঝাঝরি —মাছ ধরার যন্ত্র।

চেড়ো

কাঁইজাল—বড় মাছ ধরার জাল।

ফুট জাল—মাঝারি সাইজের মাছ ধরার জাল।

ঘুনি জাল—ছোট অর্থাৎ চুনো মাছ ধরার জাল।

চুড়ো—জালের শীর্ষ দেশ।

সেত—জালের দড়ি।

পেলেমা—ঘরামী খড় দিয়ে ঘরের চাল ছাওয়ার সময় একজন সহকারী চাল সমান করে দেয়। একে বলে পেলেমা।

গোড় দেওয়া—খড়ের চাল ছাওয়ার এক বিশেষ কায়দা।

গল্লা ছাওন—খড়ের বিচালি না খুলে ছাওয়া।

মটকা মারা—খড়ের ঘরের মাথা ঠিক করে বাঁধা।

বাক্য ব্যবহার—অত সরু আঁকা বাঁধলি হবেনি খুড়ো মোটা করে আঁটি বাঁধ। জমিটায় দোয়ার দেওয়া হলুনি এর মধ্যে কাদা করে দিলি। পাই সমান করে পোঁতে হে। তুমি এমন কোরোক্সা লোক, তোমার হাতে গরু চলেনা? আমাদের পাঁচ গণ্ডা মোটা ধানের তলা ধরে দিও দাদা। আষাঢ়ের মাঝামাঝি হয়ে গেল এখন ও জমিতে গোছপুণ্য হলুনি। আজ উপড়োতে বড় একটা শোল মাছ পড়েছে। ঘুনি জাল বেয়ে চুনো মাছ গুলো ধরে ফেল কাকা। খ্যাপলা ফেললে হবেনি, টানা দিতি হবে। কাঁই জালের ঘালটা ছিঁড়লো কি করে? ঘরের মটকামারাটা ঠিক হলুনি।

এখন দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার শ্রমজীবী মানুষের বৃত্তি তথা জীবিকার অন্যধারা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। কিছু মানুষ কায়িক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পচর্চা করে চলেছে এখানে অর্থাৎ তারা শিল্প তথা লোকশিল্পকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। একটা বিষয় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রায় সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ লোকশিল্প চর্চার সঙ্গে যুক্ত। যেমন চাষী চাষ করে আবার চাষবাস করার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার চাষীরা শোলার শিল্প দ্রব্য, খেজুরপাতার চাটাই, তালপাতার পাখা, ঝাঁটা, কুঁন্তে, শনের জাল, কাঠের জিনিসপত্র, মাদুর, ঝ্যাতলা প্রভৃতি তৈরি করে। আবার জেলেরা বাঁশের ঝোড়া চুবড়ি কুলো প্রভৃতি বানায়। ঘরামী কেবল ঘর ছায় না, সেও বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করে। শিউলীদের, করাতিদের, কাঠের কাজ করতেও দেখা গেছে। আজকাল অনেক শ্রমজীবী মানুষ মাটির মূর্তি তৈরির কাজে যুক্ত—তাদের অন্য জীবিকা থাকলেও। সুতরাং বলা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শ্রমজীবী মানুষের কাছে লোকশিল্প ধীরে ধীরে অন্যতম প্রধান জীবিকা হিসাবে গৃহীত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, একটা কথা বলে রাখা ভাল, যদিও লোকশিল্প সংশ্লিষ্ট কথ্যভাষা আমাদের আলোচনার [illegible], [illegible] দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার আর্থ-সামাজিক অবস্থায় লোক[illegible] [illegible]িক গুরুত্বের জন্য এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা কর[illegible]। [illegible] লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক পরিচয় উৎপত্তি, প্রা[illegible] [illegible]দি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পরে লোক শিল্পগু[illegible] [illegible] কোথায় কোথায় এই শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তার ক[illegible] [illegible] সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা[illegible] [illegible]ৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটা [illegible] গিয়েছে যে এই লোক শিল্পের পিছনে শিল্প সৃষ্টির [illegible], তার চেয়ে বেশি আছে জীবিকার তাগিদ। সমস্ত লো[illegible] ইতিহাসটাই হয়ত এই রকম। ব্যবহারিক প্রয়োজনে [illegible] জন্ম। জীবিকা অর্জনের জন্য শিল্পকে উপায় হিসাবে [illegible] কোনও অঞ্চলের মানুষ সমষ্টিগতভাবে পেশা হিসা[illegible] এই শিল্পকর্ম করে এবং বংশ পরম্পরায় এই কাজ [illegible]লীর উৎকর্ষতার বিচারে লোকশিল্পে মননশীল সূক্ষ্ম [illegible] সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রবণতা কম এবং সুযোগ প্রায় নে[illegible] লোক সাধারণের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মত শিল্প কর্মগুলি সাদামাটা সরল সৌন্দর্যময়। কোন বুদ্ধি দিয়ে মনন দিয়ে এর বিচার করা চলে না। জীবনের সহজ অভিব্যক্তির প্রকাশ এখানে মূর্ত। আর একটা ব্যাপার হল—লোকশিল্পের শিল্পীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন) নেই বললেই চলে। অধিকাংশ নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত মানুষ বাঁচার তাগিদে কিংবা কোথাও কোথাও বংশগত বৃত্তি হিসাবে বহুদিন ধরে শিল্প রচনা করে চলেছে। সাধারণতঃ সমাজের শ্রমজীবী মানুষ এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষরাই এর কারিগর আর শিল্পকলার চরম উৎকর্ষের ব্যাপারটা প্রধান নয় বলেই শিশু থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্যন্ত দক্ষ অদক্ষ সবাই শিল্পকর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

লোকশিল্পে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজবদ্ধ জীবনের ছায়াপাত ঘটে থাকে একথা আগেই স্বীকার করা হয়েছে। সমাজ-জীবনের এই প্রতিফলন একে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকাচার লোকবিশ্বাস সংস্কার রীতি নীতি ধ্যানধারণা কিংবা জীবনযাত্রার পরিচয় যেমন পাওয়া যেতে পারে লোকশিল্পের মধ্য দিয়ে, তেমনি লোকশিল্পকে অবলম্বন করে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণও করা যেতে পারে। মোটকথা লোকশিল্প কেবল শিল্প নয়, সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের দলিল। আর এই লোকশিল্পকে ঘিরে তৈরি হয় ভাষাজগৎ। শিল্প সৃষ্টির কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে যে সব শব্দ বাক্য ইডিয়ম ইত্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে, সেগুলিকে কথ্যভাষা তথা লোকভাষার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর্থ-সামাজিক ইতিহাস রচনায় এদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

লোকশিল্পের উৎপত্তি কবে থেকে সে সম্পর্কে সঠিক কালসীমাজ্ঞাপক কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে এটুকু বলা যায় আদিম সমাজ ব্যবস্থার পরবর্তী যুগে সামাজিক ভিত্তি দৃঢ় হবার সাথে সাথে যখন কর্মের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প চেতনা এবং সৌন্দর্য চেতনা জাগ্রত হয়েছে, তখন মানুষ ব্যবহারিক প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি করেছে। সংগঠিত সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ শিল্পের মধ্য দিয়ে তাদের রূপ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলেছে। অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে প্রস্তর এবং পোড়ামাটির ফলকে খোদিত শিল্পকীর্তিগুলিতে বাংলার যে নিজস্ব শিল্পবৈশিষ্ট্যের সাক্ষর লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে পণ্ডিতগণ লোকশিল্পের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। এখানকার কিছু কিছু ফলকে সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনের অনাড়ম্বর চিত্র শোভিত হয়েছে। যেমন—ব্যাধ জীবনের চিত্র। এতে আছে ধনুর্বাণ হস্তে ব্যাধ, মৃত জন্তু বহনকারিনী ব্যাধ নারী, ব্যাধ স্ত্রী-পুরুষের প্রেমালাপ প্রভৃতি। এ সকল ছাড়া শিশু কোলে কূপ থেকে জল তোলায় ব্যস্ত রমনী, জলের কলসী নিয়ে ঘরে ফেরা নারী, লাঙ্গল কাঁধে কৃষি ক্ষেত্রে গমনরত কৃষক, লাঠিতে ভর দিয়ে বিশ্রামরত দ্বারপাল, গাছ পালা, পত্রপুষ্প এবং নানাবিধ পশুপক্ষীর চিত্র শিল্পীরা খোদাই করেছেন। প্রকৃত অর্থে এগুলিকে লোকশিল্প হিসাবে ধরা না গেলেও লোক জীবনের শিল্পকীর্তির অনবদ্য নিদর্শন হিসাবে এগুলিকে গণ্য করা যায়। সব চেয়ে বড় কথা লৌকিক জীবনের সঙ্গে শিল্পীদের নিবিড় সম্পর্কের কথা চিত্রগুলির মধ্য দিয়ে জানতে পারা যায়।

লৌকিক জীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগই লোকশিল্পের মূল কথা। বাংলার লোকশিল্প সেকথা প্রমাণ করে দেয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকশিল্পে তার বিশদ পরিচয় মেলে। প্রসঙ্গত একটা কথা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মৃৎশিল্পী

বলা যায়—দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় বৃহৎ শিল্প তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণ এর পিছনে বর্তমান। তবে মূলত আঞ্চলিক দ্রব্যের উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত শিল্পের মধ্যে শোলাশিল্প, মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, তাঁত শিল্প, শঙ্খ শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, মাদুর শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তালপাতার পাখা ও শার্সী; হোগলার ছই, মাদুর ও অন্যান্য জিনিস; খেজুর পাতার চাটাই ও কুস্তে; পিছে পাতার তথা হেঁতাল পাতার কুস্তে ও ঝাড়ু; নারকেল পাতা থেকে তৈরি ঝাঁটা; পাটের বিভিন্ন প্রকার ঝাড়ন ও তুলি; খড়ের তৈরি কাঁচের বোতল ঢাকার সরঞ্জাম ও আসন; শনের তৈরি জাল; সূতা এবং নাইলন সূতার মাছ ধরার জাল, জালের ব্যাগ; পালকের ঝাড়ন; ব্যাটমিন্টন খেলার ফুল; কাঁথা; খঞ্চিপোষ; সূতার তৈরি গেঁচে (টাকা রাখার থলি); পাতি ঘাসের ঝাঁতলা; কুশ ও কাশের তৈরি আসন; শামুকের চুন; নানাপ্রকার আতস বাজি; নারকেল মালার হুঁকো; খেজুর গুড়; নলেন গুড়ের মোয়া ও নারকেল বরফি; তাল পাটালি; লোহার তৈরি নানা প্রকার সরঞ্জাম; রূপার তৈরি নানা প্রকার ছোট ছোট গহনা ও ছাঁচ ইত্যাদি তৈরি করে রুজি রোজগার করে এখানকার মানুষ।

এই সমস্ত শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে কাজ কর্মের প্রয়োজনে এখানকার শ্রমজীবী মানুষেরা যে ভাষা ব্যবহার করে বা করে আসছে—ধীরে ধীরে তা দিয়ে এক ভাষাজগৎ তৈরি হয়ে গিয়েছে। এগুলিকে কথ্যভাষা তথা লোকভাষা বলা যায়। এই লোকভাষার মধ্য দিয়ে অতীত ও বর্তমানের সভ্যতা এবং সমাজব্যবস্থার রূপের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শ্রমজীবী মানুষেরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে কাজকর্ম করে চলেছেন, তাতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে কিংবা শিল্প সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁরা অজ্ঞ। আবার কাজকর্মের প্রয়োজনে দীর্ঘকাল ধরে কিংবা বংশ পরম্পরায় যে ভাষা ব্যবহার করে আসছেন, তাতে যে ভাষাজগৎ তৈরি হয়ে গিয়েছে সে সম্পর্কে ও তাঁরা অবহিত নন। অথচ তাঁদের সৃষ্ট শিল্প সমাজ সভ্যতার ইতিহাসের দলিল। তেমনি দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত ভাষা কথ্যভাষা তথা লোকভাষার সম্পদ। আর একটা কথা—দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার আজকের কামার, কুমোর, তাঁতি, স্বর্ণকার ময়রা, মুচি, ডোম, শিউলী, শোলা শিল্পীরা সমাজের শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু তাঁদের পূর্বপুরুষেরা হয়ত এই রকম শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন না। তাঁরা হয়ত কোনও সুসভ্য শক্তিশালী জাতি, বীর যোদ্ধা, সংস্কৃতিবান অন্য কোনও মানুষ ছিলেন। কালের আবর্তে দুলতে দুলতে জীবনের, ইতিহাসের ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের বংশধরেরা আজ শ্রমজীবী মানুষে পরিণত হয়েছেন। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে এমন তথ্য পাওয়া যায়। এখানে প্রাচীনকালে 'গঙ্গারিডি' নামে এক রাজ্য এবং এক শক্তিশালী জাতি ছিল। গঙ্গারিডি-গবেষক শ্রীনরোত্তম হালদারের গবেষণালব্ধ তথ্যের সাহায্যে জানতে পারা যায়—এখানকার অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ সেই প্রাচীন বীর্যবান সংস্কৃতিবান যোদ্ধ জাতির বংশধর। সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ফেলে আসা দিনের সেই সভ্যতা সংস্কৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, তারা লোকশিল্পের মধ্যে লোকভাষার মধ্যে কোন না কোন ভাবে বেঁচে আছে রূপ বদল করে করে।

এখন দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বিভিন্ন লোকশিল্প সমন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে—

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীন একটি লোকশিল্প হিসাবে শোলা শিল্পের নাম করা যায়। কবে থেকে এদেশে এই শিল্পের আবির্ভাব ঘটেছিল তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। তবে এটুকু বলা যায়—ইংরেজরা বাংলায় আসার পূর্ব থেকে এখানে বিশেষ করে মন্দির বাজার থানার মহেশপুর গ্রামে (পূর্বে কুলপী থানার অন্তর্গত ছিল) শোলার কাজ হত। এ বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে বহু তথ্য পাওয়া

গিয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হল—মন্দিরবাজার থানার কাছাকাছি রামনাথপুর গ্রামে 'বানচাবড়ার মন্দির' নামে একটি মন্দির (১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) আছে। তার কাছাকাছি জগদীশপুর গ্রামের উত্তর প্রান্তে 'হাউড়ির হাট' নামে একটি হাট আছে। ওই হাটের প্রান্তে দুটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। গবেষকগণের মতে মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ। মন্দির দুটির আগে হাট স্থাপিত হয়েছিল। ওই হাটে মহেশপুরের শোলার টোপর, পাটাশী, শোলাপাতির মালা বিক্রয় হত। এই টোপর মালা কিনে নিয়ে পরদিন বিবাহ হত। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার এই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখনকার দিনে পাঁজি-পুঁথির প্রচলন ছিল না। এখানকার লোকেরা বিবাহের দিন ঠিক করত সাধারণত 'হাউড়ি হাটের' পরদিন। কারণ হাউড়ির হাট থেকে বিবাহের দ্রব্যাদি বিশেষ করে শোলা পাতির মালা সংগৃহীত হত। শোলা পাতির মালা না হলে তখন বিবাহ অসিদ্ধ হত। এই সমস্ত তথ্য থেকে বলা যায় মহেশপুর গ্রামে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শোলার কাজ হত। এদিক দিয়ে এই শোলা শিল্প তিনশ বছরেরও বেশি প্রাচীন। এছাড়া পরবর্তীকালে মহেশপুর গ্রাম থেকে ইংরেজদের টুপির (Hat) জন্য শোলার কাঠামো সরবরাহ করা হত।

এই মহেশপুর গ্রাম থেকে শোলার কাজ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, এ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রমাণ আছে। বর্তমানে বিভিন্ন গ্রামে এই শোলার কাজ হয়। যেমন—মহেশপুর, পুকুরিয়া, পূর্ব গোপালনগর, হাটতলা, বাঙ্গাবেড়িয়া, বাজার বেড়িয়া, চৈতন্যপুর, চাঁদপুর, উদয়পুর, ভবানীপুর, বল্লভপুর, দুর্লভপুর, যুগদিয়া, নস্করহাট, মৌখালি, বাঁশবেড়িয়া, রত্নেশ্বরপুর, ধনঞ্জয়পুর, মৌরলতলা, জগদীশপুর, নালুয়া, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, খুচখিদির, কাশীনগর, ৪নং শ্রীধরপুর লাট, গোবিন্দপুর, রামবাটী, শিবপুর, রাজাপুর, জেলেবাড়ি, দুলালপুর, প্রভৃতি বহু গ্রামে এই শিল্প ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধানত নিম্নশ্রেণীর মানুষরাই এই শিল্পের কারিগর। শোলাশিল্পী হিসাবে নির্দিষ্ট কোনও জাতি বা বৃত্তিধারী মানুষ নেই। তবে বিভিন্ন জাতির ও বৃত্তিধারী মানুষ এই শিল্পে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে বহু মানুষ এই শিল্পকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

শোলা (সোলা) এক প্রকার লতা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ। জলের উপরে লতানে অংশটুকু [illegible] নিয়ে ভেসে থাকে। জলের নীচে ১ ইঞ্চি/২ ইঞ্চি [illegible] থাকে। এই কাণ্ড রৌদ্রে শুকিয়ে ধারাল ছুরি (কা[illegible]) হয়। ছাল ছাড়িয়ে সরু-পাতলা পাত তৈরি করে [illegible] কর্ম করা হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পর[illegible] বিবাহের টোপর পাটাশী (মুকুট), ফুল, পাখি, চাঁদ[illegible]দমফুল, চালচিত্রের কলকা, হাতি, ঘোড়া, প্রতিমার [illegible] মুখ, পুতুল, ফুলের মালা মণ্ডপসজ্জার বিভিন্নদ্রব্য, [illegible] উৎসবের উপকরণ, গাছ, লতাপাতা, মাছ, বিভি[illegible]র, ঠাকুর দেবতার মূর্তি, মহাপুরুষদের মূর্তি, মন্দি[illegible]-রাণী, কলসী কাঁখে নারী, উড়োজাহাজ প্রভৃতি তৈ[illegible]। শিশু থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—পরিবারের স[illegible] এই [illegible] অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে মেয়েরা শোলার কাজে [illegible]তার কুমারটুলিতে ও বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন হাটে গঞ্জে [illegible]র এই সব শোলার সামগ্রী বিক্রি হয়। শিল্পীরা নিজে[illegible]ফৎ মালপত্র বিক্রি করেন। আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিল্পীদের কাছ থেকে মাল নিয়ে বিদেশে পাঠাচ্ছে। পুকুরে জলা জায়গায় শোলা জন্মায়। পূর্বে শিল্পীরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে এগুলি সংগ্রহ করতেন। আজকাল বিধান নগর রেলস্টেশনের কাছে শোলার (কাঁচামালের) বেশ বড় বাজার তৈরি হয়েছে।

শোলাশিল্প বাংলার বিখ্যাত লোকশিল্প। প্রাচীন বাংলায় যে লোকায়ত শিল্পভাবনার ও সংস্কৃতি চেতনার মধ্য দিয়ে সুন্দরের জন্ম হয়েছিল, শোলাশিল্পে তার মূর্ত প্রকাশ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শোলা শিল্পীরা শুধু ফুল, পাখি, লতা গাছ তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা বাংলার বার মাসের তের পার্বণের মঙ্গল সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন তাঁদের শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাঁদের তৈরি টোপর, পাটাশী, মালাপাতি হিন্দু বিবাহের আচারের প্রধান উপকরণ। প্রতিমার সাজ, অলংকার, চাঁদমালা উৎসবের অন্যতম প্রধান উপচার, শোলার তৈরি কদমফুল, প্রতিমার চাল চিত্রের কলকা, মণ্ডপ সজ্জার বিভিন্ন দ্রব্য পুজা অনুষ্ঠানের অন্যতম উপকরণ। শোলার তৈরি পুতুল, বিভিন্ন মূর্তি, হাতি ঘোড়া, প্রতিমার/ঠাকুর দেবতার মুখ, ফুল, ফুলের মালা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে—এতে বাংলার শিল্প সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিক দিয়ে বাংলার শিল্প সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার শোলাশিল্পের এক বিরাট ভূমিকা আছে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন শিল্পকীর্তির অন্যতম নিদর্শন হল মৃৎশিল্প। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে-যজুর্বেদে, খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীর বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলিতে মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পীদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মহাভারতে মৃৎশিল্পের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদে মৃৎপাত্রের কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও কুমোরের পোয়াণ-এর প্রসঙ্গ আছে। খাদ্য ও পানীয়ের সংরক্ষণের জন্য মৃৎপাত্র বহু প্রাচীনকাল থেকে মানব সভ্যতায় অপরিহার্য বস্তু ছিল একথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায়ও মৃৎশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরতলা, হরিনারায়ণপুর, দেউল পোতা, রাক্ষসখালি, আটঘরা, সীতাকুণ্ডু, দেউলবাড়ি, জি-প্লট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পোড়ামাটির মূর্তি, মৃৎপাত্র, ইট, ঘট প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলি শুঙ্গ-কুষাণ যুগের বলে মনে করা হয়। এখানকার মৃৎশিল্পের মধ্য দিয়ে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা জানতে পারা যায়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মৃৎশিল্পকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার উপযোগী মাটির তৈরি জিনিস (২) পুতুল, বিভিন্ন মূর্তি, ঠাকুর প্রতিমা ও অন্যান্য সৌখিন মাটির জিনিস। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—হাঁড়ি, কলসি, সরা, মালসা, জালা, খুলি, গামলা, ফুলের টব, ঘট, গুড়ের ডাবরি, প্রদীপ, দেরকো, ঠাকুর পুজোর নানা উপকরণ, ডালি, ধুনুচি, দই হাঁড়ি, চায়ের ভাঁড়, খুরি, কটরা, তুবড়ির খোল, কলকে, ভাঁড়, পিঠে খোলা, মাটির উনুন, সন্ধ্যাহাঁড়ি, জলের কুঁজো, সহস্রধারা, চাল ধোওয়া হাঁড়ি প্রভৃতি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—মাটির তৈরি পুতুল, খেলনা, বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের মূর্তি, ঠাকুর প্রতিমা, দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি, মনীষী-মহাপুরুষদের মূর্তি, বিভিন্ন টেরাকোটার কাজ, বারামূর্তি, ঠাকুর দেবতার

ছলন, পাখি, মাছ, পুতুল নাচের পুতুলের মাটির মাথা, বিভিন্ন প্রকার ছাঁচ প্রভৃতি।

সাধারণত এঁটেল মাটি, মাঠের কাঁকড়ার ঢিল প্রভৃতি দিয়ে মাটির জিনিস তৈরি হয়। মাটি সংগ্রহ করে উঁচু ঢিবি করে রাখা হয়, তারপর জল দিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে কোদাল দিয়ে নেড়ে চেড়ে জুৎ করা হয়। এই অবস্থায় পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ময়দা দলার মত করে মাটির তাল বানানো হয়। এবার বাঁশের/কাঠের চেড়া দিয়ে বা লোহার সরু শিক দিয়ে প্রয়োজন মত মাটি তাল থেকে কেটে নিয়ে আবার চটকানো হয় এবং দানা বালি কাঁকর বাছা হয়। এর পর চাকে বসিয়ে জিনিস পত্রের এক একটি অংশ বানানো হয়। পরে সেগুলি জুড়ে 'আতালি' তে বসিয়ে 'পিটুনি' দিয়ে পেটা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মত বালি ইত্যাদি দেওয়া হয়। এর পর রঙ করে পোয়াণে পোড়ানো হয়। এখন বিদ্যুৎশক্তি চালিত চাক বেরিয়েছে যাতে হাত দিয়ে ঘোরাবার প্রয়োজন হয় না।

মৃৎ শিল্পের উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণী হল মূর্তিশিল্প। মাটির মূর্তির গঠন পদ্ধতি আলাদা। প্রথমে বাঁশ খড় কাঠ দিয়ে কাঠামো বানানো হয়। তারপর মাটি লাগানো হয়—একে 'একমেটে' বলে। দ্বিতীয়বার মাটি লাগানো 'দুমেটে'। এরপর নাক মুখ, কান, আঙুল ইত্যাদির পরিষ্কার আকৃতি দেওয়া হয়। এরপর রং এবং পালিশ। শেষে চোখ মুখ আঁকা। ছোট ছোট পুতুল, মূর্তি, ছলন ছাঁচে তৈরি হয়। বারামূর্তি-ও ছাঁচে তৈরি হয়। টেরা কোটার কাজ অনেকটা গ্রামের কুমোরদের মত। মাটি দলে মেখে তৈরি করে চাকে বসানো হয়, এর পর চাক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের চেটি দিয়ে হাতের কায়দায় বিভিন্ন ডিজাইন বানানো হয়। এখানেও ছাঁচের ব্যবহার আছে। তবে এঁটেল মাটি বা কাঁকড়ার ঢিল শুকিয়ে গুঁড়ো করে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে তাকে আবার জলে ভিজিয়ে প্রয়োজন মত কাদার তাল বানানো হয়। গ্রামের কুমোরদের সঙ্গে তফাৎ এখানেই। এছাড়া কুমোররা সাদামাটা জিনিস তৈরি করেন আর টেরাকোটার শিল্পীরা সূক্ষ্ম কারুকার্য করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। আজকাল বহু শিক্ষিত মানুষ টেরাকোটার কাছে এগিয়ে আসছেন।

পণ্ডিতগণ মনে করেন মৃৎপাত্রের আকৃতি বা গড়ন তৈরির পিছনে প্রাচীন কালের দেহাশ্রিত লোকায়ত ভাবনার প্রভাব আছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে মানবদেহকে অবলম্বন করে ভারতীয় তত্ত্ব দর্শন প্রতিফলিত হয়েছিল। দেহের বিভিন্ন অংশ এক একটি তত্ত্ব ভাবনার প্রতীক। মৃৎপাত্রের আকৃতি নির্মাণে সেই সব ভাবনার প্রতিফলন আছে। দেহকে বলা হয়েছে দেহভাণ্ড। ভাঁড়, কলসি, ডাবরি প্রভৃতির আকৃতি মানুষের গলা নিয়ে বক্ষ পেট অর্থাৎ কোমর পর্যন্ত অংশের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। মাথার খুলি হল সরা, মাটির গামলা, মেছলা বা খুলি। প্রদীপ হল নারী জননাঙ্গ, দেরকো হল পুরুষের লিঙ্গ প্রতীক। এমনি ভাবে প্রাচীনকালের মৃৎশিল্পীরা মৃৎপাত্রের আকৃতি দিয়েছিলেন।

সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জুড়ে কুমোরদের কাজ হয়। তবে কিছু কিছু অঞ্চলে বহুকাল ধরে বংশ পরম্পরায় এই বৃত্তি চলে আসছে। যেমন—মন্দিরবাজার থানার গোপালনগরে, জয়নগর থানায় দুর্গাপুরে পাল পাড়ায়, মথুরাপুরের হরিণখালিতে—এমনি অনেক স্থানে পুরুষানুক্রমে এই কাজ চলছে। এ সকল ছাড়া গোঁড়ের হাট, নপুকুরিয়া, মাসটিকারী, হোগলা, বয়ারগদী, চাঁদপুর, গাববেড়িয়া, কালীপুর,

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একদা দারুশিল্পের নিদর্শন
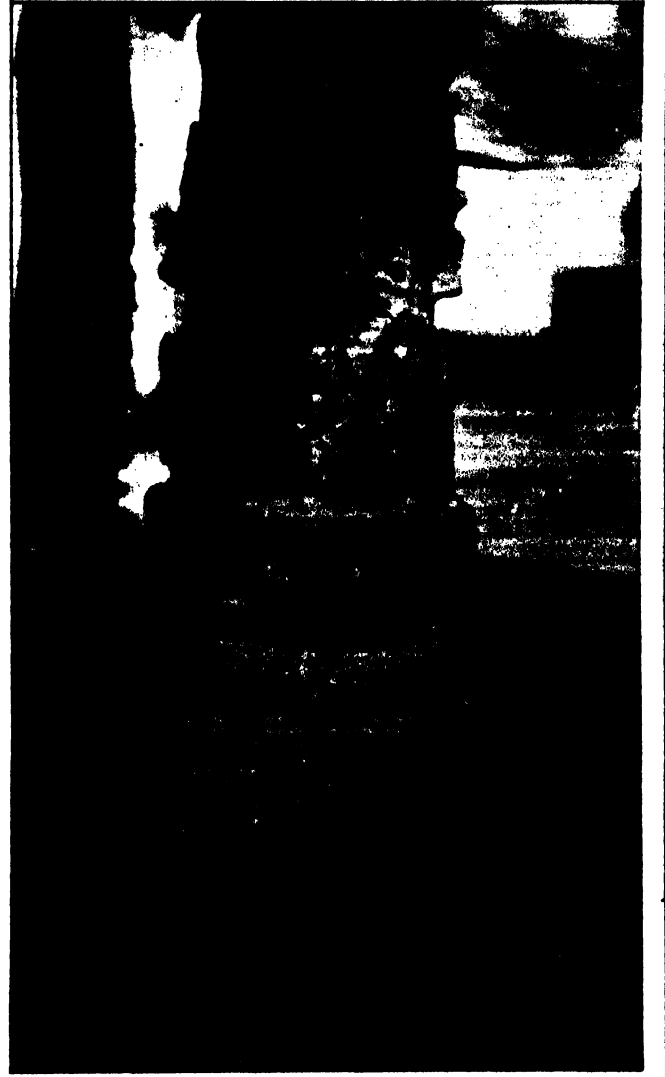
পূজালী, ডোঙাড়িয়া, গোড়খাড়া, আটঘরা, মদারাট প্রভৃতি বহু স্থানে মাটির গৃহস্থালীর সরঞ্জাম তৈরি হয়। পুতুল, প্রতিমা, বিভিন্ন মূর্তি, বারাঘট প্রভৃতিও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রায় সর্বত্র তৈরি হয়। অনেক কুমোর মাটির গৃহস্থালীর সরঞ্জাম তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট পুতুল, খেলনা প্রভৃতি তৈরি করেন। আবার এই কুমোরদের কেউ কেউ মূর্তি গড়েন। এছাড়া মূর্তিশিল্পী তথা পটুয়ারা প্রতিমা, বিভিন্ন মূর্তি, বারাঘট প্রভৃতি তৈরি করেন। রায়নগর, মরিশ্বর, কালিকাপুর, জয়নগর, সোনারপুর, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, বারুইপুর, গোপালনগর, জাফরপুর, শিবানীপুর, চাঁদপুর, চৈতন্যপুর প্রভৃতি বহু অঞ্চলে পুতুল প্রতিমা ইত্যাদি তৈরি হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় মাটির হাঁড়ি কলসী যাঁরা তৈরি করেন তাঁদেরকে কুম্ভকার বা কুমোর বলা হয়। কুম্ভকার একটি আলাদা জাতি। কিন্তু মাটির মূর্তি তৈরি করেন বিভিন্ন জাতির মানুষ। এদের মধ্যে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ যেমন আছেন তেমনি উচ্চবর্গের মানুষরাও মূর্তি শিল্পের শিল্পী। মৃৎশিল্পীরা যেমন সমাজের লোকায়ত শিল্প ভাবনাকে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে সংস্কৃতির প্রসার ঘটান, তেমনি

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সুন্দরের উপাসনা করেন। তাঁদের তৈরি মাটির জিনিস গৃহকর্মের নিত্য সঙ্গী; পূজা উৎসবের উপকরণ। এগুলি ধর্ম ও মঙ্গল সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করে চলেছে। প্রতিমা, বিভিন্ন মূর্তি নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁরা শিল্প ও সৌন্দর্য চেতনার প্রসার ঘটিয়ে চলেছেন। শোলা শিল্পের মত মৃৎশিল্পের সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। এদিক দিয়ে জাতীয় গৌরব ও ঐতিহ্য রক্ষায় দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মৃৎশিল্পীদের অবদান কম নয়।

বাংলা দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে দারুশিল্প একটি প্রাচীন শিল্প। কবে কোন সুদূর অতীত থেকে কাঠের কাজ এদেশে চলে এসেছে তার সঠিক হিসাব দেওয়া কঠিন। আদিম মানুষ একদিন রোদ ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করতে গাছ তথা কাঠের ব্যবহার ঘটিয়েছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠের ব্যবহার জীবনযাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

গাছ কেটে কাঠের কাজ করার কথা আমরা পাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদে—"ফাড়িঅ মোহতরু পাটি জোড়ি অ।" মোহতরু ফেড়ে পাটি জোড়া হল। এর মধ্য দিয়ে নৌকা নির্মাণের প্রসঙ্গ আভাসে ইঙ্গিতে ধরা পড়ে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় বহু প্রাচীন কাল থেকে কাঠের নৌকা তৈরির কাজ চলে আসছে। নদী-নালা-খাল বন-জঙ্গল অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকা, ডোঙ্গা, তেলো ডোঙ্গা জল যান হিসাবে যানবাহন ব্যবস্থার মূল অঙ্গ ছিল। সেখানে ডোঙ্গা-নৌকা তৈরির কর্মকাণ্ড তো থাকবেই। কাকদ্বীপ, ক্যানিং, ডায়মন্ডহারবার, গোসাবা, খাড়ি, রায়দীঘি এবং আরো অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতির নৌকা তৈরি হত, কিছু কিছু স্থানে এখনও হচ্ছে। এছাড়া চৌকিতলা, নালুয়া, আটেশ্বর তলা, মণিরতট, গম্ভীর নাদ, কুয়েমুড়ি, চুবড়িঝাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে কাঠের ডোঙ্গা ও তেলো ডোঙ্গা তৈরির কথা জানা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রায় সর্বত্র ডুলি, পালকি, ঢেঁকি তৈরির কথা জানা যায়। এককালে এগুলি লোকায়ত জীবনচর্যার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। আজ এগুলির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। এক শ্রেণীর মানুষ এগুলি তৈরি করেই জী[illegible]কা নির্বাহ করত।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা[illegible] তথা কাঠের কাজকে মোটামুটিভাবে দুটি ধারায় ভা[illegible]টি ধারা হল গৃহস্থালীর সামগ্রী তৈরি। এই পর্যায়ে [illegible]জা, জানালা, চৌবন্ধী, চেয়ার টেবিল, আলমারী, পা[illegible]ক্তাপোষ, খাট, দেরাজ, র‍্যাক, শেলফ, কাঠের সিঁড়ি. [illegible]ো, বারকোশ, গামলা, ঠাকুরের সিংহাসন, শো-কেস[illegible]হুকো, ছাতার বাঁট, ছড়ি লাঠি, মুগুর, পাটা, সিঁড়ি, [illegible] মুষনি, তসিল, নৌকা, ডোঙ্গা, তেলো ডোঙ্গা, ডুলি[illegible], নাদা, তবলার খোল, ঢোলক, বিভিন্ন জিনিসের [illegible]য়াল, গরুর গাড়ীর চাকা প্রভৃতি। একটা কথা বলা [illegible] কাস্তে-কোদাল-কুড়ুল-বাটালি-দা-হাতুড়ি প্রভৃতির [illegible]ত্রা বা ছুতোররা আজকাল প্রায় করে না, এগুলি এ[illegible]শ তৈরি করে। আজকাল কামারশালে গরুর গাড়ীর [illegible] তৈ[illegible]।

দ্বিতীয় ধারার দারুশি[illegible] মূর্তি শিল্প। ঠাকুর দেবতার বিগ্রহ, পুতুল, পুতুল নাচে[illegible] রথ, বৃষ কাষ্ঠ প্রভৃতি এই ধারার জিনিস। এছাড়া কাঠের খেলনা হারমোনিয়ম বেহালা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র এবং দারু-ভাস্কর্যও দ্বিতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম ধারার দারুশিল্প বা কাঠের কাজ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার গ্রামে গ্রামে সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। কাঠের দেবদেবীর মূর্তি তৈরির ব্যাপারে নাম আছে মথুরাপুর, মন্দিরবাজার ও মগরাহাট থানা অঞ্চলে। রায়দীঘি থানার কিছু গ্রামে ও কাষ্ঠ বিগ্রহ তৈরি হত। এখন কাঠের বিগ্রহ ও মূর্তির প্রচলন প্রায় নেই। এই সব দারুশিল্পীরা পুরানো দিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছেন কিংবা তাঁদের সন্তান সন্ততিরা অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। রস পুঁজি, খাকড়াকোনা, মায়া হাউড়ি, বাড়িভাঙ্গা, বাজার বেড়িয়া, বাঙ্গাবেড়িয়া, গিলারছাট, ২৩ নং লাট, চৈতন্যপুর, কামারচক, দাড়া প্রভৃতি গ্রামের শিল্পীরা এই কাজ করতেন।

পুতুল নাচের কাঠের পুতুল তথা ডাঙ-পুতুল প্রথম তৈরি হয় মন্দিরবাজার থানার বাঙ্গাবেড়িয়া গ্রামে। বাংলা ১২৮০-৮২ সাল নাগাদ বাঙ্গাবেড়িয়া গ্রামের উদ্ধব ব্যাপারী খেয়াল বশত খড়ের পুতুল তৈরি করে মজা দেখাতেন। তাই দেখে ঐ গ্রামের গোবিন্দ আড়ালদার কাঠ দিয়ে পুতুলের মাথা ও ধড় তৈরি করিয়ে তাতে বাঁশের লাঠি লাগিয়ে পুতুল নাচের ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে বাঙ্গাবেড়িয়া গ্রামে ডাঙ-পুতুল তৈরী হতে থাকে। পরবর্তীকালে রাজারবেড়িয়া চৈতন্যপুর গ্রামের দারুশিল্পীরা এই কাজে হাত দেন। পরে ডায়মন্ডহারবার থানার খাক্‌ড়াকোনা গ্রামে ডাঙ-পুতুল তৈরি হয়। এখন ডাঙ-পুতুল নাচের প্রচলন খুবই কমে গিয়েছে। তবুও বাঙ্গাবেড়িয়া বাজার বেড়িয়া চৈতন্যপুরে গ্রামে কিছু কিছু এই পুতুল তৈরি হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার দারু-ভাস্কর্যের কাজ এখন অতীত দিনের স্মৃতি মাত্র। এককালে দক্ষিণ নিম্নবঙ্গে মন্দিরের কাঠের কাজ, রথ, বৃষ কাষ্ঠ প্রভৃতি হত ব্যাপক হারে। সেখানে সূক্ষ্ম কারুকার্যের অবকাশ ছিল। বর্তমানে এই ধারাটি প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মন্দিরবাজার থানার বাজার বেড়িয়া গ্রামের কিশোরী কর্মকার ডাঙ-পুতুল, রথ এবং বৃষকাষ্ঠ নির্মাণে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই প্রতিবেদকের জন্মস্থান ওই অঞ্চলে মন্দিরবাজার থানার মহেশপুর গ্রামে। তাই ছোট বেলা থেকে ওই সব শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে। যজ্ঞডুমুর নিম, পাকুড়, অশ্বত্থ ও বেলকাঠে তৈরি হয় দেবদেবীর বিগ্রহ, রথ, বৃষকাষ্ঠ আর প্রধানত তেপলতে ও যজ্ঞডুমুর কাঠে তৈরি হয় ডাঙ-পুতুল।

দারু-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল মহেশপুরের মন্দির, মন্দিরটি আজ নেই, শুধু প্রাচীন দিনের স্মৃতি বহন করে টিকে আছে অসাধারণ কিছু শিল্পকর্ম। সেগুলিও আজ বিলুপ্তির পথে। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলি থেকে অনুমান করা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কিংবা শেষের দিকে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। দালান কোঠার উপর সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি জোড়বাংলো প্যাটার্ণের মন্দির ছিল এটি। কাঠের এত সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং অলংকরণ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার আর কোথাও দেখা যায়নি। বোধ হয় সমগ্র বাংলা দেশে এই দারু-ভাস্কর্য বিরল। লতাপাতা ফুল পাখি ছাড়া পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী খোদাই করা ছিল। জোড়বাংলোর কয়েকটি কাঠের খুঁটি আজ অবশিষ্ট আছে—সেগুলিতে কৃষ্ণ লীলা, কূর্ম অবতার

সুন্দরবনের জলাভূমিগুলি জীবিকার উৎস হতে পারে

প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী খোদিত আছে। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় বাসুদেব হালদার (?) নামে এক ব্যক্তি এই মন্দিরের শিল্পী ছিলেন। এই মন্দির সম্বন্ধে বহুজনশ্রুতি, কিংবদন্তী আজও ছড়িয়ে আছে।

দারু শিল্প বা কাঠের কাজ যারা করে তাদেরকে সূত্রধর বা ছুতোর বলা হয়। সূত্রধর একটি জাতি। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার অনেক জাতির মানুষ কাঠের কাজ করেন। যেমন—পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, কৈবর্ত, কাওরা, মুসলমান, সদ্‌গোপ প্রভৃতি জাতির মানুষরাও কাঠের কাজ করে থাকেন। এই সব মানুষরা বাঁচার তাগিদে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে কাঠের কাজকে বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু কখন তাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ফেলেছেন তা তাঁরা অনেকেই হয়ত জানেন না। লোকশিল্প চর্চার বৈশিষ্ট্য এখানেই।

তাঁতের সাহায্যে যাঁরা কাপড় গামছা চাদর ইত্যাদি বানায় তাঁদেরকে তাঁতি বলা হয় আমাদের সমাজে। এই তন্তুবায় বা বস্ত্র বয়নকারী মানুষরা আলাদা একটি জাতি। এঁদের কাজকর্মগুলিকে লোকশিল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় আর এই শিল্পই হল তাঁতশিল্প। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যায় অন্যজাতির মানুষরা আজকাল এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

অন্যান্য লোকশিল্পের মত তাঁত শিল্পও প্রাচীন শিল্প। তাঁত বোনার এবং তাঁতের জিনিস বিক্রয় করার কথা প্রাচীন কালের বাংলা সাহিত্য 'চর্যাপদে' পাওয়া যায়—"তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবর না চাঙ্গেড়া।" এক সময় সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষরা এই কাজ কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজও প্রধানত সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ তাঁত ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বহুস্থানে তাঁতের শাড়ি, ধুতি, চাদর গামছা প্রভৃতি তৈরি হয়। তবে গামছার চলন বেশি। মথুরাপুর থানার সীতাগাছি গ্রামে বহুকাল থেকে তাঁতের কাজকর্ম চলে আসছে। এখানকার গামছা বিখ্যাত। তেমনি গজমুড়ি, রায়দীঘি, ঝিনকি, সিদ্ধেশ্বর, ধোপা হাট কৃষ্ণপুর, টেকপাঁজা, কালীনগর, প্রভৃতি স্থানে তাঁতের কাজ হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার তাঁতিদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ খারাপ। দেশি তাঁতে তৈরি শাড়ি, ধুতি, চাদরের প্রচলন কমে গিয়েছে। অন্যান্য জেলা থেকে এগুলি এখন আমদানী হয়। একমাত্র গামছার উপর নির্ভর করে এখানকার তাঁতিরা টিকে আছে। তাও আবার বাঁকুড়া হাওড়া, নদীয়া, মেদিনীপুরের গামছা বাজার ছেয়ে গেছে।

শাঁখা, শাঁখের গহনা এবং শাঁখের দ্রব্যাদি যাঁরা নির্মাণ করেন তাঁদেরকে শাঁখারি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শাঁখা কিংবা শাঁখের দ্রব্যাদি যাঁরা বিক্রি করেন তাঁরাও শাঁখারি নামে অভিহিত। শাঁখারি আলাদা একটি জাতি। কিন্তু শাঁখা তৈরি এবং শাঁখা ও শাঁখের দ্রব্যের বিক্রির সঙ্গে আজ অন্যান্য জাতির মানুষরাও জড়িত। বিশেষ করে কিছু নিম্ন শ্রেণীর (?) ব্রাহ্মণ শাঁখা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

পণ্ডিতগণের মতে শাঁখার ব্যবহার অন্‌-আর্য সভ্যতার দান। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর নারীরা হাতে বলয় বা বালা পরত। পরবর্তীকালে এই বলয় শঙ্খবলয়ে পরিণত হয়। পবিত্রতার এবং এয়োতির প্রতীক হিসাবে শাঁখা ব্যবহৃত হতে থাকে।

শাঁখা নারীর প্রিয় অলংকার। সুখ সৌভাগ্য এবং বিবাহিতার চিহ্ন হিসাবে নারী শাঁখা পরে থাকে। সোনারূপার গহনা না থাকলেও এয়োর হাতে শাঁখা থাকবেই। এই অপরিহার্যতার কারণে এদেশে শঙ্খশিল্প অন্যান্য শিল্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় এই শিল্পের অবস্থা কিছুটা খারাপ। শিল্পীরা পুঁজির অভাবে কাঁচামাল কিনতে পারছেনা। ফলে আগে যাঁরা শাঁখ কেটে শাঁখা তৈরি করতেন, তাঁরা এখন শাঁখা কিনে এনে ব্যবসা করায় মন দিয়েছেন। মন্দিরবাজার থানার মন্দিরবাজার, কৃষ্ণদেবপুর গ্রামের শাঁখা বিখ্যাত। বহু পূর্বকাল থেকে এখানে শাঁখার কাজ হয়, আজও হচ্ছে—তবে তুলনামূলক ভাবে

কিছুটা কম। মন্দিরবাজারের শাঁখা কিনে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হয়। আগের দিনে শাঁখারিরা টিনের ছোট ছোট বাক্সে করে শাঁখা নিয়ে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় শাঁখা পরানোর কাজ করতেন, আজকাল সেগুলি আর হয় না। জনশ্রুতি আছে মন্দির বাজারের পাশে হাউড়ির হাটে মন্দিরবাজার কৃষ্ণদেবপুরের শাঁখা আর মহেশপুরের শোলার মালাপাতি টোপর পাটাশী বিক্রি হত। এগুলি না হলে বিয়েই হত না। মন্দিরবাজারের শঙ্খশিল্প একশ বছরেরও বেশি পুরানো। কৃষ্ণদেবপুরের শাঁখার কাজ অনেক কমে গিয়েছে। আগে এক চেটিয়া শাঁখার কাজ হত, এখন শঙ্খশিল্পী পরিবারের লোকজনেরা হয় শাঁখা কিনে এনে ব্যবসা করছেন, নতুবা অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। শাঁখা তৈরির কাজ অবশ্য কিছু কিছু বজায় আছে। এমনিভাবে জয়নগরে, বহড়ুতে, বেণীপুরে, বারুইপুরে শাঁখা তৈরির কাজ কমে গিয়েছে। তবে একদিকে গ্রামীণ শঙ্খশিল্প যেমন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, তেমনি শাঁখা বিক্রির বাজার বড় হয়েছে। কাকদ্বীপে এই রকম বড় শাঁখার বাজার হয়েছে। গ্রামীণ শিল্পীরা এখানে দোকানে দোকানে মজুরির বিনিময়ে শাঁখা তৈরির কাজ করেন। এছাড়া বাইরে থেকে তৈরি শাঁখা কিনে এনেও বিক্রি করা হয়। এই রকম মগরাহাট থানার হোটরে, জয়নগরের মিত্রগঞ্জে, রায়দীঘিতে, বারুইপুরে, ডায়মন্ডহারবারে, কাকদ্বীপে, মন্দিরবাজারে, শাঁখার দোকান বাজার তৈরি হয়েছে। এই সব বাজারকে কেন্দ্র করে গ্রামের শঙ্খশিল্পীরা কিছুটা আশার আলো দেখছেন।

প্রাচীনকালের বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণীয়দের সমাজমান যেমন নিম্নতর ছিল তেমনি আর্থিক মানও অনুন্নত ছিল। ফলে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'চর্যাপদে' এই রকম কয়েকটি শ্রমনির্ভর বৃত্তির কথা জানা যায়। সমাজের ডোম শ্রেণীর মানুষদের প্রধান বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও বাঁশের চ্যাঙারি ইত্যাদি তৈরি করা। বহু কাল কেটে গেছে। আজও নিম্নশ্রেণীর সমাজে মানুষের বৃত্তি নির্ভর, শ্রমনির্ভর জীবন যাপনের চরিত্রটি বজায় আছে। আজও ডোম, মুচি, হাড়ি, কাওরা এবং প্রায় সমপর্যায়ের মানুষরা বাঁশ ও বেতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। [illegible] ক্ষুদ্র [illegible] শিল্প তথা লোক শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। তবে আজকাল [illegible] মানুষরা এই শিল্পকর্মের সঙ্গে কিংবা বাঁশ ও বে[illegible] পত্রের ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পর[illegible] সর্বত্রই বাঁশের জিনিসপত্র তৈরি হয়। কিন্তু ঝোড়া, [illegible] কুলো, চালা প্রভৃতি প্রায় জায়গায় তৈরি হলেও বাঁ[illegible] সরঞ্জাম তৈরি হয় যেখানে খাল বিল বেশি। সেদি[illegible]প, কুলপী, মন্দিরবাজার, নামখানা, ক্যানিং, পাথর [illegible], রায়দীঘি, গোসাবা প্রভৃতি থানা অঞ্চলে বাঁশের ঘুনি [illegible] চেড়ো ইত্যাদি বেশি তৈরি হয়। কুলপী থানার চণ্ডী[illegible] পাকুড়তলা, মগরাহাটের চৌকিতলা ঘুনি-আটলের [illegible]।

জেলার যেখানে [illegible] মুচি জাতির মানুষের বাস, সেখানে বেত শিল্প গড়ে [illegible] কুলপীর চণ্ডীপুর, হরিশপুর, মন্দিরবাজারের গোকুলনগর; সোনারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বেতের কাজ হয়।

সংস্কৃত 'মন্দুরা' শব্দের অর্থ অশ্বশালা এবং মাদুর। মনে হয় দুটি শব্দের মধ্যে যোগসূত্র আছে। অশ্বশালায় তৃণ বিছানো হত। সেইরকম তৃণ নির্মিত আচ্ছাদনই পরবর্তীকালে 'মাদুর' নামে পরিচিত হয়েছে এমন সম্ভাবনার কথা মনে আসে। যাই হোক মাদুর হল এক জাতীয় তৃণ দ্বারা নির্মিত পাটি যা সাধারণত গৃহস্থ ঘরে খাট-বিছানা, তক্তাপোষ, বারান্দা, ঘরের মেঝেতে পাতবার জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্রামের ঘরে ঘরে বসার এবং শোয়ার জন্য মাদুর অপরিহার্য। সরু, গোলাকার চার-পাঁচ কিংবা পাঁচ-ছয় হাত দীর্ঘ একপ্রকার তৃণ যার নাম 'মাদুর কাটি', সেই মাদুর কাটি সরু দড়ি বা সুতলি দিয়ে বুনে মাদুর তৈরি হয়। মাদুর মোটামুটি তিন রকমের হয়—একহারা, দোহারা এবং সৌখিন। অনেকে সৌখিন মাদুরকে মসলন্দ বলে। এক একটা কাঠি পাশাপাশি বুনে একহারা (single); উপর নীচে দুটি কাঠি বুনে দোহারা (double) এবং সুন্দর সবুজাভ কাঠিদ্বারা নির্মিত মাদুর মসলন্দ। এই মাদুর বেশ মসৃণ। আবার খুব লম্বা (২০-২৫ হাত কিংবা ২৫-৩০ হাত) মাদুরকে 'সপ' বলা হয়। আগের দিনে উৎসব অনুষ্ঠানে সপ বিছিয়ে দেওয়া হত। এখন 'সপ' আর তৈরি হয় না।

কুলপীর চণ্ডীপুর, গাববেড়িয়া, দয়ারামপুর, ঢোলা, পাথর বেড়িয়া, সিদ্ধিবেড়িয়া, নারায়ণপুর, দৌলতপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে বেশ মাদুর তৈরি হত। এখনও তার কিছু কিছু বজায় আছে।

হোগলা পাতা চিরে আজকাল মাদুর তৈরি হচ্ছে। যদিও সেগুলি তেমন আরামদায়ক কিংবা সৌখিন নয়, কিন্তু দামে কম। আজকাল গরীব মানুষেরা এগুলি ব্যবহার করে বেশি। বারুইপুর থানার গঙ্গা জেয়ার, কেশবপুর, নারায়ণপুর, কাওরাখালি, শিখরবালি প্রভৃতি; মগরা হাট থানার আতাসুরা, তাঁতির হাট, উড়েল চাঁদপুর, গোকর্নি, তসরালা, জলধাপা, বনসুন্দরিয়া; মন্দিরবাজার থানার বাঙ্গাবেড়িয়া, চৈতন্যপুর অঞ্চলে, জয়নগরে, বারুইপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হোগলার চাষ হয়। এই সমস্ত অনেকস্থানে হোগলার মাদুর শিল্প গড়ে উঠেছে। বনসুন্দরিয়াতে ব্যাপক হারে এই মাদুর তৈরি হয়

এক সময় কুলপী থানার চণ্ডীপুরে গরু-মহিষের শিং থেকে চিরুনি এবং নানাবিধ শিল্পদ্রব্য খেলনা প্রভৃতি তৈরি হত। এখন সেগুলি অনেক কমে গিয়েছে।

সাধারণভাবে বলা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা গরীব মানুষের দেশ। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ শ্রমজীবী। গ্রামে গঞ্জে, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে, কুঁড়ে ঘরে অভাব অনটনের মধ্যে তারা বাস করে। তাদের আর্থিক সংগতি যথেষ্ট কম। সুতরাং সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপনের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর, হয়ত অসম্ভবও। তাই আশে পাশের পরিবেশ থেকে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় বাঁচবার জন্যে এবং এগুলিকে অবলম্বন করেই তাদের কর্ম প্রচেষ্টা এবং শিল্পভাবনা গড়ে উঠেছে। লোকায়ত জীবনের এই কর্মধারাকে লোক শিল্প বললে অত্যুক্তি হয় না।

এমন ধারার লোক শিল্প হল 'ব্যাঁতলা' তৈরি করা। গ্রামের ধানের মাঠে এক প্রকার লম্বা পাতি ঘাস জন্মায়—সেগুলিকে ক্ষেত

থেকে সংগ্রহ করে রৌদ্রে শুকিয়ে মাদুরের মত দড়ি দিয়ে বুনে ঘর-বারান্দায় পাতবার এবং শোয়ার জিনিস বানানো হয়। বড় ঝাঁতলাকে বলা হয় 'ধাউড়ে'। আগে সভা সমিতিতে, হরিনামের আসরে, যাত্রাপালার আসরে ইত্যাদিতে ধাউড়ে পাতা হত। এগুলি বিক্রির জন্য নয়, গৃহস্থালীর প্রয়োজনে তৈরি হয়। কাকদ্বীপ থানা অঞ্চলে ধাউড়ে বেশ তৈরি হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সর্বত্র—বিশেষ করে গ্রামে ঝাঁতলা তৈরি হয়।

ঘরে ব্যবহারের জন্যে শামুক পুড়িয়ে চুন, খেজুর পাতার চাঁচ বা চাটাই, খেজুর পাতার কুন্তে, নারকেল পাতার শিরা থেকে ঝাঁটা বা ঝাড়ু, তালপাতার পাখা, শার্শী (বৃষ্টি নিবারণের সরঞ্জাম) তৈরি করা হত। এখন এগুলি সর্বত্র বিক্রি হয়। কাকদ্বীপে জয়নগরে শামুক চুন তৈরির কারখানা হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বারুইপুর থানা, মন্দিরবাজার থানা এবং মগরাহাট থানার বিভিন্ন অঞ্চলে হোগলার চাষ হয়। কাকদ্বীপ থানার অনেক জায়গায় হোগলার চাষ হয়। এই সব অঞ্চলগুলি থেকে হোগলার ছই পাওয়া যায়। পাটের বিভিন্ন প্রকার ঝাড়ন ও তুলি প্রায় সর্বত্র তৈরি হয়। খড় দিয়ে বোতল ঢাকার সরঞ্জাম ও আসন তৈরি হত মন্দিরবাজার থানার কয়েকটি গ্রামে। মগরাহাট থানার সংগ্রামপুর, ধনপোতা, বামনা, গড়িজিলা; উস্থি থানার অনেক গ্রামে শনের জাল তৈরি হয়। মাছ ধরার সূতীর জাল, নাইলন সূতীর জাল তৈরি হয় প্রায় সমগ্র প্রত্যন্ত গ্রামে বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে। হেঁতাল পাতার কুন্তে হয় সুন্দরবন অঞ্চলে। পালকের ঝাড়ন, ময়ূর পালকের পাখা, তৈরি হয় মগরাহাট থানার কলস প্রভৃতি গ্রামে। কাঁথা, খঞ্চিপোষ প্রায় সর্বত্র তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রকার আতসবাজী তৈরি হয় চাম্পাহাটির হাড়ালে, গোচারণের কাছে জাঙ্গালেতে। নারকেলমালার হুঁকো তৈরি হয় জয়নগর থানা অঞ্চলে। খেজুরগুড় (নলেনগুড়) তৈরি হয় মন্দির বাজার মথুরাপুর এবং জয়নগর থানা অঞ্চলে। তবে বহড়ুর কাছে শ্রীপুরের নলেন গুড় বিখ্যাত। জয়নগরের নলেন গুড়ের মোয়া ও নলেন গুড়ের বরফি ভারত বিখ্যাত। এই মোয়ার জন্য উৎকৃষ্ট মানের গুড় আসে বহড়ু অঞ্চল থেকে বিশেষ করে শ্রীপুর থেকে। ডায়মন্ডহারবার, মন্দিরবাজার এবং মথরাপুর অঞ্চলের তালপাটালি বিখ্যাত। লোহার তৈরি গৃহস্থালীর সরঞ্জাম—কাস্তে, কোদাল, দা, কুড়ুল, খুরপি, বাটালি, লাঙলের ফাল প্রভৃতি দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার প্রায় সর্বত্র কামার দোকানে তৈরি হয়। তবে কাশীনগরের কাছাকাছি কৃষ্ণচন্দ্রপুর ও চণ্ডীপুর গ্রামের দা, গাছকাটা দা, কাস্তে, কোদাল বিখ্যাত। মহেশপুরের শোলা শিল্পীদের ফুলকাতি এখানে তৈরি হয়। রূপার ছোট ছোট গহনা এবং ছাঁচ তৈরি হয় মগরাহাট থানার শালকিয়া আলিদা প্রভৃতি অঞ্চলে।

এখন দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার লোকশিল্প সম্পর্কিত লোকভাষা তথা কথ্যভাষার আলোচনা করা হচ্ছে। পূর্বেই বলা হয়েছে শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে এখানকার লোকসাধারণ তথা শ্রমজীবী মানুষেরা কাজকর্মের প্রয়োজনে যে ভাষা ব্যবহার করে বা করে আসছে—ধীরে ধীরে তা দিয়ে এক ভাষাজগৎ তৈরি হয়ে গিয়েছে। তার মধ্য দিয়ে বর্তমান ও অতীত সমাজ ব্যবস্থার রূপের সন্ধান মিলতে পারে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার লোক শিল্পীদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক শিল্পী জাতিগত বৃত্তি হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় শিল্প কর্ম করে আসছেন। অনেকের বৃত্তি জাতিগত না হলেও বহুকাল ধরে বংশানুক্রমিক ভাবে কাজ কর্ম করে চলেছেন। অনেকে ইদানীং কালের হলেও প্রচলিত ভাব ধারাকে অবলম্বন করেছেন। এই ভাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজকর্মের প্রয়োজনে যে শব্দ, বাক্য, ইডিয়ম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির দ্বারা একটি পৃথক ভাষা পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে এবং এই সব ভাষা ব্যবহারকারী মানুষ অনেকাংশে আলাদা ভাষা সম্প্রদায়ে (Speech Community) পরিণত হয়েছেন বলা যায়। যদিও এই প্রকার ভাষা সম্প্রদায়ের আয়তন ছোট তবুও ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহারে, বাক্য গঠনে, প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহারে এবং রূপতত্ত্বের (morphology) বিভিন্ন নিয়ম কানুনের দিক দিয়ে দেখা যায় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জুড়ে লোক শিল্প সম্পর্কিত আলাদা ছোট ছোট ভাষা জগৎ তৈরি হয়েছে। প্রচলিত ভাষা স্রোত থেকে তাদের রূপ আলাদা। তবে এই তফাৎটা এত সূক্ষ্ম যে সহজে বোঝা যায় না।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দারুশিল্পের নিদর্শন : বৃষকাষ্ঠ ছবি : কালিকানন্দ মণ্ডল

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় লোকশিল্প সম্পর্কিত যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়, বিচার বিশ্লেষণ করে এই শব্দগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় হল—কিছু শব্দ আছে যেগুলি মূল থেকে বিবর্তিত শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব। এগুলি দীর্ঘকাল ধরে আমাদের শব্দ ভাণ্ডারে বেঁচে আছে—এখানকার লোকশিল্পীরা সেগুলি ব্যবহার

মৎস্যজীবী পরিবার

করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের শব্দগুলি হল মূলত অজ্ঞাতমূল শব্দ। বহু প্রাচীনকাল থেকে কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় চলে আসছে—যাদের উৎপত্তিস্থল আমরা জানতে পারিনি। সম্ভবত, অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষার শব্দ এগুলি। পণ্ডিতগণ এই জাতীয় শব্দকে দেশি শব্দ বলেছেন। আর্যগণ এদেশে আসার আগে এই ভাষাগুলির প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আর্যভাষা প্রবেশ করার পর এই সকল ভাষার বহু শব্দ তথা আর্যেতর ভাষার বহু শব্দ শব্দভাণ্ডারে রয়ে যায়। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় এমন বহু শব্দ লোকশিল্পীরা ব্যবহার করেন। তৃতীয় পর্যায়ের শব্দ হল প্রয়োজনের সূত্র ধরে নূতন শব্দ নির্মাণ। এই সকল শব্দের সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত কাজের সুবিধার জন্য—কোথাও যে কাজে ব্যবহার করা হয় সেই কাজের অর্থবোধক শব্দ হিসাবে কিংবা হাতের কাছে পাওয়া চোখের সামনে দেখা কোন কিছু বস্তুরূপের সাদৃশ্যবোধক শব্দ হিসাবে। চতুর্থ পর্যায়ের শব্দ হল উচ্চারণ বিকৃতি জনিত শব্দ। দক্ষিণ [illegible] পর[illegible] লোক সাধারণের তথা লোকশিল্পীদের বিকৃত উচ্চার[illegible] [illegible]নরূপে জন্ম নিয়েছে। এসকল ছাড়া কিছু বিদেশী [illegible] [illegible]ত্তিকেন্দ্রিক পারিভাষিক শব্দকে লোকশিল্পীরা ব্যবহার [illegible] সুতরাং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকশিল্পসংক্রান্ত [illegible]

(১) মূল থেকে বিবা[illegible] [illegible] মূল হল সংস্কৃত এবং অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, চীনীয় ইত্যা[illegible] [illegible] গৃহীত শব্দ)।

(২) অজ্ঞাতমূল শব্দ [illegible]

(৩) প্রয়োজন ভিত্তিক [illegible]

(৪) উচ্চারণ বিকৃতি [illegible]

(৫) বিদেশী শব্দ।

(৬) বৃত্তি কেন্দ্রিক প[illegible]

এখন দক্ষিণ চব্বিশ-প[illegible] [illegible] অঞ্চল থেকে লোকশিল্প সংক্রান্ত যে শব্দগুলি সংগ্র[illegible] [illegible] সেগুলি দেখানো হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের মধ্যে কিছু শব্দের ধ্বনিগত ও রূপতত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণ দেখানো হবে উদাহরণ হিসাবে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বাক্ ব্যবহারের উদাহরণ ও দেওয়া হবে।

শোলা—এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ। ৪/৫ হাত সরু গোল কাণ্ড জলের নীচে থাকে। একে রৌদ্রে শুকিয়ে সূক্ষ্ম ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে কাজ করা হয়।

টোপর—শোলার তৈরি মুকুট—শঙ্কু আকারের। বিয়ের সময় বরের মাথায় থাকে।

পাটাশী—শোলার তৈরি কনের মাথায় মুকুট।

মালাপাতি—শোলার সরু পাতির মালা।

পাতি—শোলা ছাড়িয়ে কাগজের মত সরু চওড়া পাত করা হয়। একে 'পাতি' বা 'পাতা' বলে।

সং পত্র > পত্ত > পাতা + ই; সং পত্রী > পাতি।

বাক্য—এই ছানি পাতিগুলো জইড়ে নে।

কাপ—শোলার পাতা জড়িয়ে জড়িয়ে মোটা বাণ্ডিল তৈরি করা হয়।

কাতি—শোলা কাটার ছুরি। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় একে বলা হয় অস্ত্র। সং কর্ত্তরী > প্রা. কত্তরী > বা. কাতি।

বাক্য—খোকা কাতিটা ধার দে দেতো।

ফুলকাতি—কাতিকে ফুলকাতি ও বলা যায়। শোলার ফুল তৈরি করার অর্থ থেকে এই শব্দ এসেছে।

বেলেট— শোলা কাটার অস্ত্রে ধার দেবার জন্য কাঠের লম্বা চ্যাপটা দণ্ড। এতে বালি দিয়ে অস্ত্রে ধার দেওয়া হয়। শব্দটি ইংরাজী blade শব্দের সাদৃশ্যে তৈরি।

জামির—চক চকে পাত। শোলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভূরো—চক চকে গুঁড়ো। শোলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

অব্বর—অভ্র > অব্বর। উচ্চারণ বিকৃতি জনিত শব্দ। অভ্রের পাতলা পাত শোলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

চুমকি, গোটা, কিরণ, সলমা, গোখরি, বুলেন জরি,—শোলার কাজে ডাকের সাজে ব্যবহৃত হয়। ধাতুর চক চকে পাতলা, গোল বিভিন্ন আকৃতির জিনিস।

তেঁতুল আটা—তেঁতুল বীচি সিদ্ধ করে বেটে জলে গুলে আগুনে জ্বাল দিয়ে আটা তৈরি করা হত পুরানো দিনে। বর্তমানে তেঁতুল বীচির পাউডার দিয়ে আটা বানানো হয়। শোলার কাজে তেঁতুল আটা খুব প্রয়োজনীয়।

বশমা—চক চকে জামিরের পিছনে কাগজ দেওয়া। শোলার কাজে লাগে।

কাঁকরো, বুটি, টিপ—শোলার তৈরি বিভিন্ন আকারের ছোট ছোট জিনিস। টোপর, কল্কা, পাটাশী প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

কাচানো, কোঁচানো, কোচা, ছে দেওয়া—শোলার কাজের এক একটি পর্যায়।

গড়ে—এক বিঘত লম্বা বা নির্দিষ্ট মাপ করে কাটা শোলার টুকরো। গাছের গোড়ে বা গুঁড়ির সাদৃশ্যে শব্দটি তৈরি হয়েছে।

ফুলের গড়ে—ফুল তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট মাপের শোলার টুকরো।

চড়ন—টোপরে ব্যবহৃত শোলার নক্সাকাটা পাত।

বাঁটিপাত—বাঁটির আকৃতির লম্বা সরু শোলার পাত—টোপরে ব্যবহৃত হয়।

বাঁট—চাল চিত্রে ব্যবহার করা হয়। সরু লম্বা পাত।

লপট—চালচিত্রের লতা।

নাকবোনা—চালচিত্রে ব্যবহার করা হয়।

কল্কা—চালচিত্রের ধারে লাগানো হয়। নক্সা করা শোলার কাজ।

ছটা—প্রতিমার পিছনে লাগানো হয়। সূর্যের ছটার মত গোলাকার সাজ।

ছড়—কল্কাতে ব্যবহৃত শোলার পাত/দণ্ড।

ঝালট—কল্কার নীচে লাগান হয়।

গোঁড়ি—শোলার তৈরি ছোট ছোট টুকরো। কদমের ঝুরিতে ব্যবহৃত হয়। শব্দটিতে অন্-আর্য ভাষার প্রভাব আছে।

নল—নলাকৃতি ছোট ছোট শোলার টুকরো। কদমের ঝুরিতে ব্যবহৃত হয়।

চাকতি—শোলার তৈরি গোল গোল ছোট পাত।

ঝুরি—ঝোলানো কদম ফুলের অংশ। গোঁড়ি, চাকতি, নল দিয়ে তৈরি মালা।

ডুমি—শোলার পাতা কাটার পর অবশিষ্ট সরু নলাকৃতি অংশ।

পাতা কাটা—শোলার কাপ তৈরি করা।

টোপ—শোলার তৈরি সাহেবীটুপির কাঠামো।

পাগড়ি—শোলার তৈরি নক্সা করা প্যাঁচ পাগড়ি।

শিরপ্যাঁচ—ঢালা পাগড়ি।

তাক বুক—প্রতিমার পাশে থাকে। নক্সা করা শোলার কাজ।

কার্নিশ, লব—তাকবুকে ব্যবহৃত হয়।

বাক্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—এবেলা টোপরের কাঁকরোগুনো নেইগে নিবি। বিকেলে পাটাশী গুনো ধরবি। কল্কাগুনো এখনো কাচানো হলুনি। কদম কোচা বাকি। হরের মামার কাছে তিন পন ঝুরি কদমের অটার আছে। বগলো দশটা কাপ নে গেচে। এক দিন্তে বশমা আনতে হবে। চুমকি, গোটা, কিরণ সব ফুইরে গেচে।

প্রতিমার সাজ, শোলার কাজ :

ঘের, কপালি, খন্তি, চাঁদ—মুকুটের অংশ।

ঘেড়োবেণী, মকরবেণী, মাকড়ি—কানের গহনা।

সীতে পাটি—মুকুটের অংশ।

বুক মালা—বুকের সাজ।

আঁচলা ও কোল আঁচলা—শোলার তৈরি—শাড়ির আঁচল হিসাবে ব্যবহৃত।

চিক ও সীতা হার—গলার গহনা।

সরল, খাড়ু কনকন, চুড়, বাজু, বালা, কৃষ্ণচূড়া, মানতাসা—হাতের গহনা।

চরণ, চরণপাত, চরণ চাঁদ, গুজরী—পায়ের গহনা।

চৌদানী—কান ও ঘাড় সংযুক্ত গহনা।

তাবিজ, ঝাঁপা, মুদো—হাতের গহনা।

খড়ম, ছাতা, ঘেঁটু, ঝারা—বনবিবির সাজ। সাধারণত মৌলেদের কাজে লাগে।

শোলার তৈরি রাস উৎসবের দ্রব্যাদি :

চটকা—শোলার তৈরি চটকাফুল। ঝ্যাটাকাটির মাথায় লাগানো থাকে।

চাঁপা—ঝ্যাটাকাটির মাথায় ডুমির খাঁজ করা চাঁপা ফুল।

ঝাড়—শোলার তৈরি ফুলগাছ।

সখি—রাস উৎসবের পুতুল।

খোল—মাটির ছাঁচের উপর শোলার পাত জড়িয়ে পাখির কাঠামো তৈরি হয়।
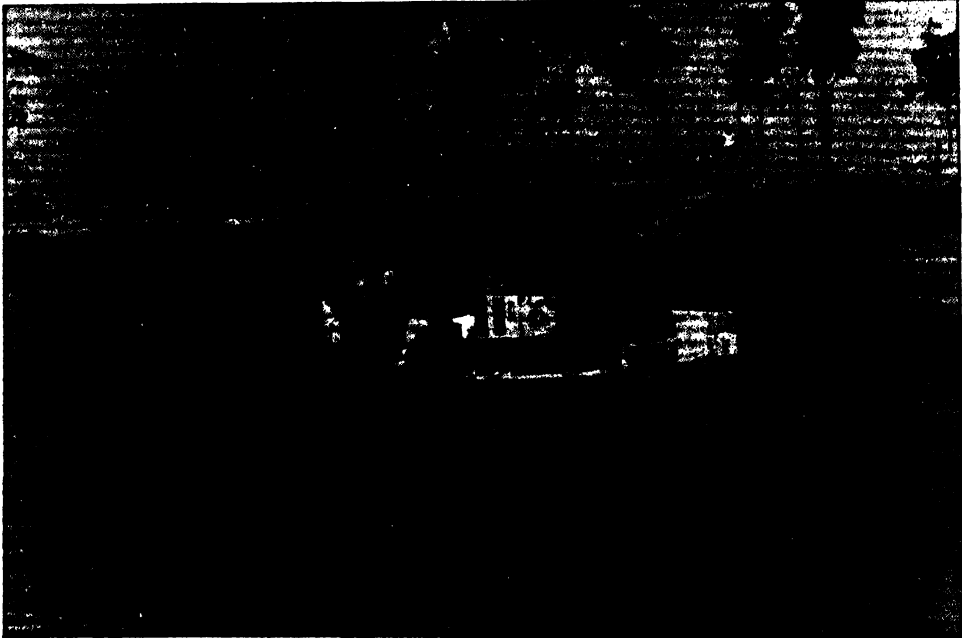
সুন্দরবনের একমাত্র যাত্রী পরিবহন ভুটভুটি — *ছবি : অঞ্জন খান*

কিছু মানুষ লোকশিল্পকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন

পর—শোলার তৈরি পাখির পালক।

পাপড়ি—শোলার পাত দিয়ে তৈরি ফুলের পাপড়ি। এগুলি চাঁদমালাতেও ব্যবহৃত হয়।

ঝারা—বনবিবির সাজের মত। রাসউৎসবে ব্যবহৃত হয়।

বাক্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—বুক মালায় বুটিগুনো নেইগে নে। কোল আঁচলার ছাঁদটা ভাল হলুনি। সরল খাড়ুতে টিপ নাগাসনি কেন? চটকাগুনো জুড়ে নে। এক ডজন ঝাড় তৈরি করতে হবে। লালুরা দশটা টিয়াপাখির খোল নে গেচে। পাপড়ি জোড়া হলুনি এখনো? ঝন্টুকে বল কাকাতুয়ার পর কেটে দিতে।

আমাদের সমাজে নারী ... গহনা পরে, দেবদেবীর ক্ষেত্রে তেমন গহনার প্রচলন ... শিল্পীরা। তবে প্রাচীন কালের গহনার আদর্শ এখ... হয়েছে। শব্দগুলিও নেওয়া হয়েছে প্রাচীনকালের ... য়ী। এদের মধ্যে কিছু আরবি-ফারসি শব্দ আছে। ... সামনে দেখা জিনিসের রূপ সাদৃশ্যে শব্দগুলি তৈরি ...

অতি প্রাচীন কাল থে... ও মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ চব্বি... কুমোরের বাস। প্রাচীন কাল থেকেই এদের বসবাসে... জীবিকার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এদের ব্যবহৃত ভাষা ... রগনার কথ্যভাষা তথা লোকভাষায় আজও বর্তমান।

চাক—কুমোরদের মা... ইত্যাদি নির্মাণের মূল সরঞ্জাম।

পোন—পোয়ান। সং পাবন > প্রা. পোআন > বা. পোয়ান। যেখানে মাটির জিনিসপত্র পোড়ানো হয়।

পাতিল—এক ধরণের মাটির পাত্র।

তিজেল—এক ধরণের মাটির হাঁড়ি।

দয়ে হাঁড়ি—দই বসানোর হাঁড়ি।

পশুনি—অনেকটা ডেকচির মত মাটির পাত্র। বড় আকারের পশুনি করে আগের দিনে পশুদের জল খাওয়ানো হত। হয়ত সেই থেকে শব্দটির নাম 'পশুনি' হয়েছে।

দলন হাঁড়ি—বড় হাঁড়ি। অনেকটা লম্বা হাঁড়ি।

বেনুন হাঁড়ি—তরকারী অর্থাৎ ব্যঞ্জন রান্নার হাঁড়ি।

ছলন হাঁড়ি—বিচিত্র নক্সা করা মাটির হাঁড়ি। উৎসবের কাজে লাগে।

মঙ্গল হাঁড়ি—বরণডালাতে লাগে রঙ করা ছোট মাটির হাঁড়ি।

চাঁপুই হাঁড়ি—সাধারণতঃ দুধ জ্বাল দেওয়া হয় এমন মাঝারি ধরণের মাটির হাঁড়ি।

কুড়ি—সম্বাটে ধরণের মাটির পাত্র। আগে নুন মাপা হত।

ঝাঁঝরি হাঁড়ি—চাল ধোয়ার হাঁড়ি। নীচে ছোট ছোট ছিদ্র করা থাকে।

বল্লক হাঁড়ি—ছোট ছোট হাঁড়ির আকারের মাটির পাত্র। চুন রাখার জন্য ব্যবহৃত হত।

খুলি—মাটির মেছলা। সাধারণত ধান ভেজানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। মানুষের মাথার খুলির সাদৃশ্যে শব্দটি তৈরি হয়েছে।

ডাবরি—কলসীর আকারের ছোট পাত্র। সাধারণত খেজুর রস সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়।

মেটে—জালা। জলরাখা, ধান চাল রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

হাত খোলা—অন্ন পরিবেশনের কাজে ব্যবহৃত মাটির পাত্র।

খঞ্চে—মাটির তৈরি ঠাকুর পূজার ডালা।

ভাঁড়—মাঝারি আকারের মাটির পাত্র। গুড় রাখা, মাছ রাখা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।

কোনা—মাটির ছোট ছোট ঘট।

পাকুই—হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি মাটির পাত্রের উপরের অংশ।

খাপরা—হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি মাটির পাত্রের নীচের জোড়াই অংশ।

আতালি—যার উপর রেখে কাঁচা অবস্থায় মাটির পাত্র পেটানো হয়।

বোলো—সিমেন্ট দিয়ে জমানো। যা ভেতরে রেখে কুমোররা প্রাথমিক পর্যায়ে মাটির পাত্র পিটে পিটে গড়ন দেয়।

পিটুনি—যে কাঠ দিয়ে কাঁচা অবস্থায় মাটির পাত্র পেটা হয়।

গড়ন—চাকের উপর রেখে কুমোরদের কাদার ছাঁচ তৈরি করা।

ভিয়ান—মাটির হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের রূপ দেওয়া কাঁচা অবস্থায়।

উঁচু, চেড়ি—কুমোরদের গড়ন ভিয়ানের কাজে লাগে।

টিবি/টিপি—কুমোরদের গড়নের ডাইস।

চাকশীল—চাকের মধ্যেকার গোল অংশ।

আল—সার কাঠের তৈরি—তীরের আকার। যার অগ্রভাগে চাক ঘোরে।

বেগো—চাকের মধ্যস্থিত সরু সরু ব্যাসার্দ্ধ।

বন্নক—হাঁড়ি কলসীতে রং করা—পোড়ানোর আগে।

বর্ণ > ক (স্বার্থে)-বর্ণক > বন্নক।

আগের দিন রং করার কাজে চুন ব্যবহার করা হত। সেই জন্য দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় 'চুন' কে 'বন্নক' বলা হয়।

বাক্য-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত : মা যেন আমার আধ পয়সার তিজেল, একটুতেই গোঁসা। দলন হাঁড়ি করে ঠাকুরের চালগুলো আখ বাছা। বিকেলে চাঁপুই হাঁড়ি করে দুধটা জ্বাল দিয়ো। খুলিতে আধকুড়ি ধান ভেজানো আছে। রসের ডাবরিগুনো ধোয়া হলুনি। হাতখোলাটা কোথায় গেল? ভাঁড়ে করে জল আনলি ক্যান? এই মেটেতে এক মন চাল ধরে।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন লোকশিল্প সংক্রান্ত যে শব্দাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি দেওয়া হচ্ছে—

লাঙল—হাল চষার মূল সরঞ্জাম। কামাররা তৈরি করে।

জোয়াল— ঐ

ঈশ—লাঙলের মধ্যেকার লম্বা কাঠ।

ফাল—লাঙলের লোহার ফলা। কামাররা বানায়।

ডাঁসা—চাকার উপরের বেড়।

মুদম—গরু/ঘোড়া গাড়ীর চাকার মধ্যেকার মোটা কাঠ।

পাকি—মুদম থেকে ডাঁসা পর্যন্ত।

হাল—আট খণ্ড ডাঁসাকে ধরে রাখার জন্য লোহার বেড়।

বিশ্বকর্মা/নেই—কামার শালায় যার উপর লোহা পোটানো হয়।

পোড় কাঠ—ক্রুশ কাঠের মত দেখতে মাথায় পেরেক থাকে। যার উপরে রেখে যন্ত্রপাতি ঘষা হয় কামারশালে।

দং—সব চেয়ে বড় হাতুড়ী।

দাবালি—দা। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় 'দা' কে 'দাবালি' বলে।

খুরপো—ছোট কোদাল।

ফারসি—খুরপোকে ফারসি বলে।

ওকনা—লোহার খন্তি।

ফুড়কোবাড়ি—লোহার লম্বা শলা দিয়ে তৈরি। উনুনে আগুনে জ্বাল দিতে সাহায্য করে।

বাক্য ব্যবহার : দাবালি দে নারকেলটা ছুলে দে। ফুড়কো বাড়ি দে উনুনে জ্বালটা ঠেলে দে। ওকনাটা কোথায় রাখলি? ডাঁসাটায় ভাগনো ধরে গেছে। ফারসি দে গাছের গোড়াগুনো কুইপে দে। ইত্যাদি।

প—বেতের তৈরি পাত্র। এক পোয়া চাল বা ওই জাতীয় জিনিস মাপার কাজে আগে ব্যবহৃত হতো। শব্দার্থ সংকোচের নিদর্শন।
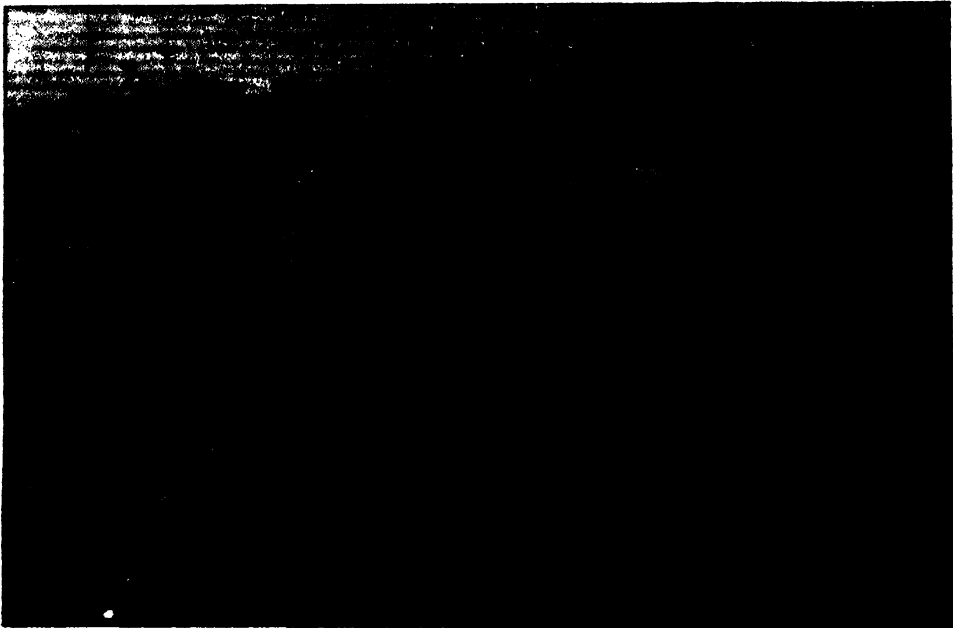
এখনও পুরনো পদ্ধতিতে চাষবাস গ্রামবাংলার সাধারণ চিত্র
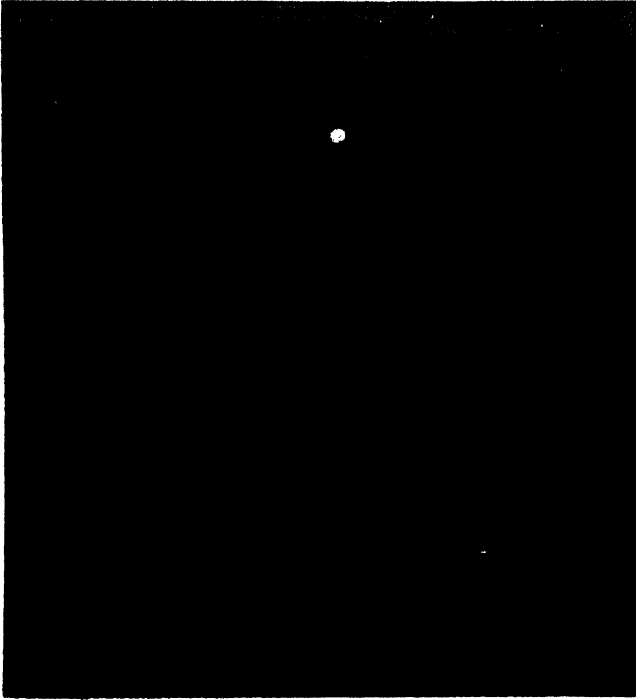
সুন্দরবনের নদী যে সময় মায়াবী হয়ে ওঠে — *ছবি : অঞ্জন খান*

পালি—বেতের তৈরি বড় আকারের পাত্র। ধান চাল মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় ধান চাল বিক্রি হত পালি হিসাবে। এখনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'পালি' শব্দের ব্যবহার আছে। সাধারণত আড়াই সেরে এক পালি হয়।

সের—বেতের তৈরি মাঝারি আকারের পাত্র। সাধারণত এক সের চাল ধরত বলে এগুলির নাম হয়ে গিয়েছিল সের। শব্দার্থ সংকোচের নিদর্শন।

আধসের—আধ সের চাল মাপার বেতের তৈরি পাত্র।

খুঁচি—বেতের তৈরি ছোট পাত্র।

খড়া—বেতের তৈরি ধামা।

বেত্তি—বেতের সরু পাতি।

ছোট—পাত্রের [illegible] বেত [illegible] যে বাঁধন দেওয়া হয়।

চালা—বাঁশের [illegible]

খই চালা—খই [illegible] করার বাঁশের চালনি।

গুঁড়োচালা—[illegible] জন্য বাঁশের চালনি। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় কুড়ো[illegible]

চুবড়ি—বাঁশের [illegible] ধোয়ার জন্য ছোট/মাঝারি জিনিস।

চাঙারি—বাঁশের [illegible] মত জিনিস।

ঘনি—বাঁশের [illegible] মাচ চিংড়ি ধরার সরঞ্জাম।

আটল—বাঁশের [illegible] প্রভৃতি মাছ ধরার সরঞ্জাম।

চেড়ো—বাঁশের [illegible] মাছ ধরার বড় যন্ত্র।

গড় গড়া—বাঁশে[illegible] যন্ত্র।

ঘোঁয়া—ঝাঁটা [illegible] মাছ ধরার যন্ত্র।

মগরী, ঝাঁঝরি, [illegible] তৈরি মাছ ধরার সরঞ্জম।

পোলো—বাঁশের [illegible] মাছ ধরার জিনিস।

বাতাসী—তাল পাতার পাখা। বাতাস + ই (ঈ) = বাতাসি/বাতাসী। বাতাস করা হয় যা দিয়ে। প্রয়োজন ভিত্তিক শব্দ নির্মাণ।

চেটাই—তাল পাতার তৈরি আসন।

ঝেঁতলা—মাদুরের মত জিনিস। 'পাতি' নামক এক প্রকার ঘাস জাতীয় তৃণ পাটের দড়ি দিয়ে বুনে তৈরি করা হয়।

ধাউড়ে—খুব লম্বা ঝেঁতলা।

ওলো—ঝেঁতলা বোনার জন্য মাটির তৈরি ছোট ছোট লম্বাটে গোলা।

পাট কাটা—পাট থেকে দড়ি তৈরি করা।

ঢেরা—পাট কাটার যন্ত্র।

তাকুড়—সূতা পাকাবার সরঞ্জাম।

নাল, ফলতি—জাল বোনার সরঞ্জাম।

মাদুর—এক প্রকার তৃণ থেকে তৈরি গৃহে পাতবার/শোবার জিনিস। সং মন্দুরা > মাদুর।

সপ—খুব লম্বা মাদুর। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আসরে পাতা হয়।

বাক্য-ব্যবহারের দৃষ্টান্ত—বাতাসীটা দে হাওয়া কর। দাওয়ায় চেটাইটা পেতে দে। ঝ্যাতলাটা বিইচে দে।

গ্রাম্য ছড়া—এক পালি ধানে দুপালি খই।
বিছনে মোতার ঘর কই।।

খুঁচি করে মুড়ি নে আয়। এক খড়া চাল নে হাটে যা। খই চালাটা কোথায় আকলি? পাঁচুর মা আঙ্গার বাড়ি থে এক সের চাল ধার নে গ্যাল। ওরা মাগ-ভাতারে ঘনি আটল বুনতেছে। পুকুরের জানে ঝাঁঝরিটা পেতে দে। তোঙ্গার ঘোঁয়ায় নাকি আজ দুটো কুঁচে পড়েছে? আজ আর পাট কাটতে পারবুনি।

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার লোকশিল্পে এমন বহু শব্দ ছড়িয়ে আছে যেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করলে অতীত দিনের কত ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতির কথা বেরিয়ে আসতে পারে। এখানকার লোকায়ত জীবনে কত কথার জন্ম হয়—কাজ কর্মের সূত্র ধরে শিল্প চর্চার ফাঁকে ফাঁকে। কালের বুকে তাদের কত যে হারিয়ে গিয়েছে তা কে জানে। যেগুলি টিকে আছে, সেগুলি কুড়িয়ে এনে চর্চা করার কাজে আমরা কতটুকুই বা এগিয়েছি। প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষা দীক্ষাহীন লোক সাধারণ তাদের কর্মময় জীবনচর্যার মধ্যে কত যে অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে তা তারা জানে না, আর আমাদের উদাসীন উন্নাসিক সভ্যতা তেমন করে জানতে চেষ্টা করে না। ট্র্যাজেডি এখানেই।

তথ্য সূত্র :

বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার

গঙ্গারিড়ি : আলোচনা ও পর্যালোচনা—নরোত্তম হালদার

ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শৈব তীর্থ—ধূর্জটি নস্কর।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোক শিল্প—সত্যানন্দ মণ্ডল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কথ্যভাষা ও লোক সংস্কৃতির উপকরণ—বিমলেন্দু হালদার (১ম খণ্ড)।

গ্রামোন্নয়ন—অমৃতলাল গাঙ্গুই।

লেখক পরিচিতি : লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ও বিশিষ্ট গল্পকার।

অশোক চৌধুরী

সুন্দরবনচর্চা

প্রকৃতি আপন খেয়ালে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মোহনায় ২৫,৫০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ গড়ে তুলেছে। এই ব-দ্বীপগুলি অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী, ছোট-বড় খাল-নালা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং গভীর অরণ্যময়। এই অরণ্যময় দ্বীপগুলিতে পৃথিবী বিখ্যাত হলুদ-কালো ডোরা কাটা বৃহৎ আকারের বাঘ থাকে—যার নাম দেওয়া হয়েছে "রয়েল বেঙ্গল টাইগার"। বনে অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আছে—হরিণ, বন্যবরাহ, বাঁদর, নানান ধরনের সাপ। নদীতে আছে বিচিত্র রকমের মাছ এবং কুমির, শুশুক, হাঙর। বনের মধ্যে নানান রকমের পাখি, বনমোরগ। এই সকল ঘন গভীর অরণ্যময় দ্বীপসমূহের নাম সুন্দরবন। কিন্তু কে বা কারা এই দ্বীপসমূহের নাম সুন্দরবন দিয়েছিল তা অজ্ঞাত।

পশ্চিমবাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত এমনই একটি এলাকা ভয়াল হিংস্র বাঘ, কুমির, সাপ, হরিণ, বন্যবরাহ, অজস্র পশুপাখি, অসংখ্য নদীনালা বেষ্টিত আদিম অরণ্য। এই আদিম ভয়াল অরণ্যের পাশে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে মানুষের অবস্থান— এটা এত বৈচিত্র্যময় ও রহস্যে ঘেরা যা গভীর মনযোগ আকর্ষণের দাবি করতে পারে।

গত কয়েক বছর ধরে সুন্দরবন নিয়ে এই রাজ্যের সরকারি ও বে-সরকারি মহলে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কেবল রাজ্য নয় কেন্দ্রীয় সরকার ও সুন্দরবন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে বলে মনে হয়। কেবল সাধারণ মানুষই যে রহস্যময় সুন্দরবন সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করছে তা নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী আর ভেঙ্কটরমণ, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, প্রয়াত কংগ্রেস নেতা ও বাংলার রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু, প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী বি এন পাণ্ডে রাজ্যপাল প্রয়াত সৈয়দ নুরুল হাসান সুন্দরবনের রহস্যময়তা ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এড়াতে পারেননি।

ভারতের যে ভাগে সুন্দরবন পড়েছে তার আয়তন ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। অবশিষ্ট ১৬,৭৭০ বর্গ কিলোমিটার পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানে অধুনা বাংলাদেশে। এটা দেখা গিয়েছে যে সমগ্র সুন্দরবনের অরণ্যময় দ্বীপসমূহের মধ্যে এক-একটি দ্বীপে এক এক রকমের বৃক্ষের আধিক্য রয়েছে। কোনও কোনও দ্বীপে হেঁতাল। কোনও কোনও দ্বীপে গরান, কোনও দ্বীপে গেঁউরা, কোনও দ্বীপে কাঁকড়া, কোনও দ্বীপে ধুঁধুল, কোথাও কেওড়া, কালোবাণী, কোথাও সাদাবাণী পেয়ারবাণী, কোথাও আবার গর্জন গাছের আধিক্য দেখা যায়। পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনের অংশে সামান্য পরিমাণ গোলপাতা ও সুন্দরী গাছ আছে। এখন আর গোলপাতা ও সুন্দরী গাছ কাটতে দেখা যায় না। এই সব গোলপাতা ও সুন্দরী গাছের এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সুন্দরবনের অংশে গোলপাতা ও সুন্দরীগাছের আধিক্য রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মধ্যে বহু নদনদীর মিষ্টি জলের প্রবাহ সুন্দরবনের লোনা নদীসমূহে পড়ে মিশ্রিত হওয়ার ফলে নদীর জলের লবণাক্ততা কম থাকে। সেজন্যই বাংলাদেশের সুন্দরবনের অংশে সুন্দরী ও গোলপাতার আধিক্য রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের অংশেও এক সময় গোলপাতা ও সুন্দরীগাছ ছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবনের অংশের নদীগুলিতে মূল ভূখণ্ডের নদীর মিষ্টি জলের প্রবাহের সূত্রগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুন্দরী ও গোলপাতার গাছ আর নূতন করে জন্মাচ্ছে না। তীব্র লবণাক্ত জলে গোলপাতা ও সুন্দরীগাছ বাঁচে না বা প্রাকৃতিকভাবে নদী স্রোতে ভেসে আসা বীজ থেকে গাছে জন্মায়

> কোন বনময় দ্বীপ কোন সালে আবাদ হয়েছিল সেই সকল দলিলপত্র এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে সংগতভাবেই অনুমান করা যায় যে ১৮৮৫-১৯১০ সালের মধ্যে সুন্দরবনের ইজারা দেওয়া অংশের আবাদ করার কাজ শেষ হয়। সুন্দরবনের নয়া জনবসতি এলাকার আয়ু ১১০/১২৫ বছরের বেশি নয়। অরণ্যময় বনভূমির বনকাটার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গরু বা মোষের লাঙল চালিয়ে ভূমি চাষ করা সম্ভব ছিল না। মাটির উপরেই গাছ কাটা হলেও মাটির নীচের গাছে বড়- ছোট নানান আয়তনের অগণিত গুঁড়ি মাটির গভীরে প্রোথিত অবস্থায় থেকে যায়।

না। সুন্দরবনের নদীসমূহে তীব্র লবণাক্ততা থাকার দরুন পশ্চিমবাংলার অংশে গোলপাতা ও সুন্দরীগাছ হচ্ছে না। তবে সুন্দরবনের লোকালয়ের সংলগ্ন গ্রামে গোলপাতার গাছ হতে পারে।

একদা গোলপাতা দিয়ে যশোহর, খুলনা, এবং ২৪-পরগনা জেলার গ্রামের মানুষের ঘর ছাওয়া হত। এখন গোলপাতার অভাবে খড় দিয়ে গ্রামে বাসগৃহের চাল ছাওয়া হয়। কিন্তু বাসগৃহের ঘরের চালের ছাউনি হিসাবে খড় বিশেষ কাজে আসে না। এখন আবার অধিক ফলনশীল ধানের খড়গুলি ছোট ও কাঠির মতো, তা দিয়ে ঘরের চালের ভাল ছাউনি হয় না। গ্রামের বসবাসকারী মানুষের বাসগৃহের সমস্যার প্রতিকার হতে পারে যদি সুন্দরবনের বসতি এলাকায় ব্যাপকভাবে গোলপাতার চাষ করা যায়।

সুন্দরবনটি কী রকম? কী এর বৈশিষ্ট্য? বিশ্বের সর্ব বৃহৎ এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ভিয়েতনাম মায়ানমার, কাম্বোডিয়াসহ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও এরকম ছোট-বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য আছে। তার মধ্যে ভিয়েতনামের ম্যানগ্রোভ অরণ্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তুলনায় বৃহৎ আকারের ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার বোমা বর্ষণের ফলে ভিয়েতনামের সমগ্র ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ভিয়েতনামে "জীবপরিমণ্ডল রক্ষার" এবং সমুদ্রের ভাঙন রোধে "ম্যানগ্রোভ অরণ্য সৃষ্টি"র প্রচেষ্টা শুরু করা হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনে দ্বীপময় অরণ্যভূমির অধিকাংশ অঞ্চলই সমুদ্রের প্রবল জোয়ারে ডুবে যায় আবার ভাঁটার সময় বনভূমি জেগে উঠে। এই প্রক্রিয়া ২৪ ঘণ্টায় দুইবার ঘটে থাকে। মনে হবে সাগরের জোয়ারের জলে বনভূমি প্রতিদিনই স্নান করে থাকে। বনের গাছের পাতা মোটা ভারী, ঘন সবুজ রঙ, তৈলাক্ত ও বিষাক্ত। গাছের মোটা সবুজ পাতাগুলি সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আকাশের

সুন্দরবনে গোলপাতা গাছ
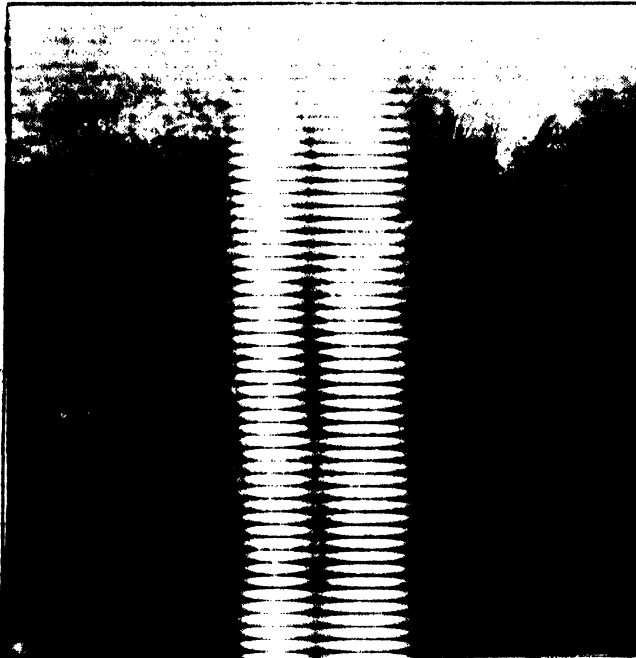
সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখি — *ছবি : জয়দেব দাস*

দিকে মুখ করে সালোক-সংশ্লেষ করে গাছকে বাঁচায়। ভাটার টানে জোয়ারের জল নেমে গেলে গাছের ডালের মতো বিস্তৃত শিকড় ও বর্শাফলকের মতো উত্থিত শিকড় শূলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে গাছকে মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে এবং ওই শিকড় শূল দিয়ে শ্বসন ক্রিয়া পরিচালনা করে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ব্যতীত বনের মধ্যে আলো বিশেষ প্রবেশ করতে পারে না। গাছের পাতায় সমগ্র বনভূমি ঢেকে রাখে। বনের প্রাণীদের কিয়দংশ উভচর, বাঘ, হরিণ ও বন্যবরাহ ভাল সাঁতারু। সাপ, বাঁদর ও পাখিরা জোয়ারের সময় বনভূমি প্লাবিত হয়ে গেলে গাছেই আশ্রয় নেয়। বনভূমি বিষাক্ত পোকামাকড়ে পূর্ণ। ঘন সবুজ পত্র পল্লবে সমাচ্ছাদিত জল থেকে জেগে ওঠা প্রায়ান্ধকার এই বনভূমি সুন্দর ও ভয়াল।

পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনের অংশে মোট ১০২টি অরণ্যময় দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপের বন কেটে চারদিকে মাটির উঁচু বাঁধ তৈরি করে ধানচাষের জমি ও মনুষ্য বসতি করা হয়েছে। এই ৫৪টি দ্বীপের মোট কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ ৩০,০৩৮২ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। জমিতে গড় ফলন একর প্রতি ২৪/২৫ মন। সমগ্র সুন্দরবন এক ফসলি। বর্ষার জল ধরে রেখেই চাষাবাদ হয়। গত ১৫/২০ বছরে সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় ফসল চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে শতকরা ১৫ ভাগ কৃষি জমিতে। সুন্দরবনের জনবসতি যে দ্বীপগুলিতে গড়ে তোলা হয়েছে সেই সকল দ্বীপের চার ধারে যে মাটির বাঁধ দিয়ে লোনা জল আটক করা হয়েছে ওই মাটির বাঁধগুলিই সুন্দরবনের (Life Line) জীবনরক্ষাকারী-বাঁধ। নদী বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৫০০ কিলোমিটার। এই বাঁধ রক্ষার জন্য প্রভূত অর্থ প্রতিবছর রাজ্য

সরকারকে ব্যয় করতে হয়। নদীর প্রবল স্রোত, ঘূর্ণীঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবনের মানুষের জীবনে প্রতিবছরই দেখা দেয় অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট। এভাবে অসংখ্য প্রাণহানিও ঘটে।

বাকী ৪৮ টি বনময় দ্বীপ সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এই বনময় ৪৮ টি দ্বীপে মনুষ্যবসতি নেই। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যেই "জীব পরিমণ্ডল" গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলেই ব্যাঘ্র প্রকল্প (Tiger Project) স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বাঘ, হরিণ, কুমির, পাখি প্রভৃতি জলচর বা স্থলচর যে কোনও প্রকার পশুপাখি হত্যা বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চল—যেখানে মানুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাহিরে নিরপেক্ষভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রেও একথা মনে রাখা দরকার যে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির আবহাওয়া মণ্ডলে, সমুদ্রের জলদূষণ, গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া নিরন্তর ঘটে চলেছে। সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ওই প্রভাবের বাইরে নয়। যদিও এই বনাঞ্চল এখনও পৃথিবীতে বহু পূর্বে ধ্বংস হয়ে যাওয়া নানাবিধ পশু ও পাখি, গাছপালা, সামুদ্রিক বহু রকমের মৎস্যকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেজন্যই এই বনাঞ্চল নিয়ে দেশ-বিদেশের মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। বর্তমানে সুন্দরবনের বসতি এলাকায় যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত, যানবাহন, রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার ফলে শীতকালে বহু ভ্রমণার্থীর শুভাগমন ঘটে এই এলাকায়।

সুন্দরবন নিয়ে বহু প্রবাদ, কিংবদন্তী, কৌতূহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত আছে। এই সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা আলোচনা বিশেষ হয়নি। বহু ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে একদা বহু তীর্থক্ষেত্র, নদী-বন্দর; সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। আজ যে সুন্দরবন এলাকাকে সবাই দেখছে তা সুন্দরবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়। সুন্দরবনের আয়তন আজ যা আছে অতীতে সেই আয়তন আরও বহুগুণ বিস্তৃত ছিল।

আধুনিক কলকাতা, ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আলিপুর সদর মহকুমা ও বসিরহাট মহকুমাসহ অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার সবটাই একদা সুন্দরবন বলে গণ্য করা হত।

পূর্বে ইওরোপীয় গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে সৃষ্টিকাল থেকেই সুন্দরবন অরণ্যময় ছিল। বাংলাদেশ ইংরেজ অধিকারে আসবার পরেই সেখানে সর্বপ্রথম আবাদের কাজ আরম্ভ হয়। ভূতত্ত্ববিদগণও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপসমূহকে বয়সে নবীন বলায় অনেকের এ ধারণাও হয় যে খুব প্রাচীন কালে এই অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল না। বঙ্গোপসাগরের ও গঙ্গানদীসহ অন্যান্য অসংখ্য নদনদী বাহিত পলিমাটিতে দ্বীপসমূহ গঠিত হয়ে কিছুকাল পূর্বে এই অরণ্যময় দ্বীপসমূহের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু দ্বীপের জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে জনবসতি ও কৃষি ব্যবস্থা পত্তন করার সময় বহু অরণ্যময়-দ্বীপ এলাকা থেকে ভগ্ন দেবদেবীর মন্দির, গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, গড়, পুকুর খনন কালে যে সকল তাম্রপট্টলিপি, মৃন্ময়, ধাতব ও প্রস্তরের দেবদেবী মূর্তি, তৈজসপত্রাদি, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রভৃতি বহুসংখ্যক পুরাকীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে ইউরোপীয় গবেষকদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও অমূলক। অতীত যুগে সেখানে এক সমৃদ্ধ গ্রাম ও জনপদ এবং নদী-বন্দর ছিল। কিন্তু কেন যে নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত বহু প্রসিদ্ধ জনপদ, বন্দর, বর্ধিষ্ণু গ্রাম, তীর্থস্থান জনশূন্য হয়ে হিংস্র বাঘ, সাপ, বন্যবরাহ, হরিণের অরণ্যময় বাসভূমিতে পরিণত হল তার সঠিক কারণ আজও অজ্ঞাত।

অনেক গবেষক ও ঐতিহাসিক মনে করেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগই এর অন্যতম কারণ। আবার অনেক গবেষক মনে করেন যে গঙ্গার প্রবাহ মজে যাওয়ার দরুন গঙ্গার তীরবর্তী বাণিজ্যভিত্তিক বন্দর, জনপদ ও জনবহুল গ্রামগুলি ক্রমেই সমৃদ্ধিহানি হয়ে নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়েছিল। কোথাও ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কোথাও কলেরা বসন্ত রোগের প্রকোপে জনশূন্য হয়ে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয়। এই সকল অঞ্চলের ইতিহাসের ক্ষীণ ধারার ছেদ বিভিন্ন জায়গায় পড়লেও অধুনা অনেক গবেষক অনুমান করেন যে সুন্দরবনের গভীরে হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যময় দ্বীপসমূহে বাংলা তথা ভারতের এক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী ভারত ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রহস্যাবৃত হয়ে চাপা পড়ে আছে।

সুন্দরবনের অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে কিছু তথ্য উপস্থাপিত করা কর্তব্য বিধায় কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল। অধুনা মথুরাপুর থানার লট নম্বর ২২ (দ্বীপ) বকুলতলায় ও দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনদেবের দুইখানি তাম্রপট্টে খোদিত ভূমি দান-সনদ পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে অনুমিত হয় যে "সেন রাজত্ব" কালে শাসন সৌকার্যার্থে আদি গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী ছত্রভোগ প্রভৃতি স্থান বর্ধমান ভুক্তির "বেতড্ডচতুরকের" অধীনে ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে সপার্ষদ কীর্তন করতে করতে বারুইপুরের নিকট (আটিঘরা) গ্রামে একদিন অবস্থান করেন এবং আটিসারা গ্রাম থেকে পুনরায় সদলে কীর্তন করতে করতে ছত্রভোগে উপস্থিত হন। এই আগমন কালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

"নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আস্তি করি।
আইলেন সব পথ আপনাপসারি।।"

*　　*　　*

"এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহাকুতূহলে"

শ্রীচৈতন্যদেব ছত্রভোগের তৎকালীন গৌড়ের শাসনকর্তা হোসেন শাহের নিযুক্ত কর্মচারী রামচন্দ্র খাঁর গোপন আনুকূল্যে গভীর রাত্রিতে নৌকাযোগে সপার্ষদ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করেন। ওই সময় গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে ওড়িশার রাজার যুদ্ধ চলছিল। এই সময় গৌড় থেকে কোনও ব্যক্তির ওড়িশা যাওয়া নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। সেই জন্য বিপদসঙ্কুল নদীপথে গোপনেই শ্রীচৈতন্যদেবকে ছত্রভোগ থেকে নীলাচলে যেতে হয়েছিল।

চৈতন্যভাগবতের সমকালীন বিবরণ থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রথমভাগেও ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ, সমুদ্রযাত্রার উপযোগী নদী-বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত চৈতন্যদেবের ছত্রভোগ থেকে নীলাচলে গমনের উল্লিখিত বিবরণের পরবর্তী অংশে দেখা যায় যে ওই সময়ের আগেই ছত্রভোগের দক্ষিণাংশের প্রদেশ বনময় প্রদেশে পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং ডাকাত ও জলদস্যুতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যদেব ও তাঁর
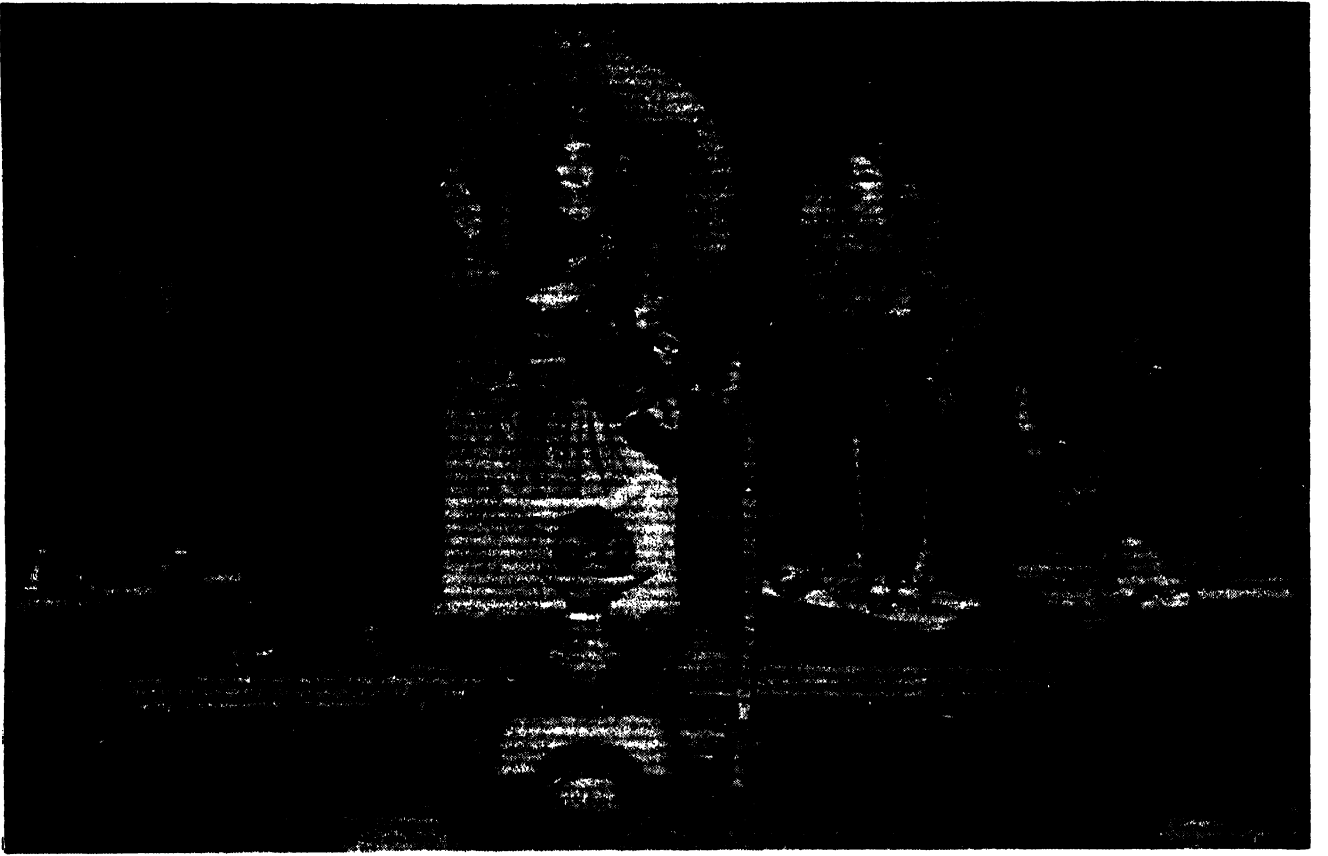
লৌকিক দেবদেবী—বনবিবি ও দখিন রায়

পার্ষদগণ নৌকাতে কীর্তন করতে থাকলে নৌকার মাঝি কীর্তন বন্ধ করতে বলে; তার বর্ণনা নিম্নরূপ—

"অবুঝ নাইয়া বোলে হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি বুঝি প্রাণ নাহি রয়।।
কূলে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে যে বোল কুম্ভিরে খায়।।
নিরন্তর এই পানি[illegible] ডাকা[illegible] ফিরে।
পাইলেই ধন প্রা[illegible]।।
এতেক যাবৎ উ[illegible]।
তাবৎ নীরব হ[illegible]"।।

মুসলমান শাসনে[illegible] কারণে ছত্রভোগ এলাকার সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটে [illegible]মে পরিণত হয় তার কারণ অজ্ঞাত। তবে এই প্রবা[illegible]যে ভাগীরথীর অন্তর্ধান এবং আরাকানের মগ ও পে[illegible]র ভয়াবহ অত্যাচার, লুণ্ঠনই ছত্রভোগের পতনের [illegible]

চৈতন্যভাগবতাদি [illegible] গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে "ছতরভোগ" বা "ছ[illegible] যথেষ্ট বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। এর উ[illegible]শে কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কাটানদিঘি, বড়াশী, মাদপুর, কাশীন[illegible] ছত্রভোগ বলে প্রচারিত ছিল। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়[illegible]ত কতকগুলি মনসার ভাসান, চণ্ডীর গানের পুঁথি [illegible] প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর তীরে ছত্রভোগ একটি নদীবন্দর ও তীর্থক্ষেত্র ছিল। যদিও ছত্রভোগের প্রাচীনত্ব এখনও পুরোপুরি নির্ধারিত হয়নি বটে, তবে বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকারে আসবার বহু পূর্বেই সেখানে সমৃদ্ধ জনপদ; তীর্থস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমুদ্রযাত্রার ব্যবস্থা ছিল। পাল ও সেন রাজাদের আমলের অনেকগুলি কৃষ্ণ প্রস্তরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং কয়েকটি কারুকার্যমণ্ডিত দ্বার ফলক ও স্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্যে উক্ত গ্রন্থের নায়ক ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের আদিগঙ্গার পথে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ছত্রভোগ ও তার নিকটে অবস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। ওই সময় ওই স্থানেই কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর নৃসিংহমূর্তি, একটি শিবলিঙ্গ এবং কয়েকটি কৃষ্ণপ্রস্তর পাওয়া গিয়েছে। ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস রচিত তাঁর মনসার ভাসানে ছত্রভোগও বদরিকা কুণ্ড এবং অম্বুলিঙ্গ মন্দিরের উল্লেখ আছে।

সুন্দরবনের মধ্যে দক্ষিণ ২৪-পরগনায় খাড়ী নামে আরও একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রামের কথা ইতিহাস থেকে জানা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেভিনিউ জরিপের ৪৯ নং মৌজায় এই খাড়ী এলাকা অবস্থিত ছিল। এই খাড়ী সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় কালিদাস দত্ত মহাশয় বিস্তারিতভাবে গবেষণা করে লিখেছেন যে "দক্ষিণ ২৪-পরগনার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার মধ্যে যে সকল প্রাচীন জনপদ ছিল খাড়ী তার মধ্যে অন্যতম একটি স্থান"। "দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে খাড়ী

ছত্রভোগ, বড়াশী, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি স্থান সম্পর্কে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের দিক থেকে কোন অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়নি।"

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে রচিত, "ডাকার্ণব" নামে একখানি পুঁথিতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের চৌষট্টি পীঠের মধ্যে অন্যতম পীঠস্থানরূপে খাড়ীর নাম দেখা যায়। এছাড়া লক্ষ্মণসেনদেবের সুন্দরবন তাম্রশাসনখানি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ২২নং লটে (দ্বীপে) দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে একটি পুকুর খননকালে আবিষ্কৃত হয়।

এই লিপি পাঠে জানা যায় যে বঙ্গদেশে সেনরাজাদের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে) খাড়ী তৎকালীন শাসনবিভাগ পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তির এক শাসন মণ্ডলের সদরস্থান ছিল এবং তার অধীনে মণ্ডলগ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণসেনদেব ব্যাসশর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন।

হিন্দু রাজত্বকালে শাসনকার্যের সুবিধার্থে বঙ্গদেশভুক্তি নামে কয়েকটি বড় বড় বিভাগে বিভক্ত ছিল। এই ভুক্তির অধীনে মণ্ডল নামে ছোট ছোট বিভাগ ছিল। রাজার অধীনে ভুক্তির শাসনকর্তারা ভুক্তিশ্বর এবং মণ্ডলের শাসনকর্তারা মণ্ডলেশ্বর নামে ওই সকল ভুক্তি ও মণ্ডলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও কামন্দকীয় নীতিসার পুঁথিতে উল্লেখ আছে যে এক-একটি মণ্ডলের বিস্তার চারশত যোজন ছিল (৩২০০ বর্গমাইল) এই আয়তনের এলাকায় শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মণ্ডলেশ্বরের কোষ, দণ্ড, অমাত্য, দুর্গ থাকত। এই থেকে বুঝা যায় যে খাড়ী মণ্ডলের আয়তনও ওইরূপ ছিল। ওই সময় আদিগঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত সমগ্র পশ্চিম সুন্দরবন খাড়ীভুক্তি বা মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান সময়ে খাড়ীর উত্তর ও পূর্ব পাশের লট নং ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩২, ১১৬, ১১২ লট বা দ্বীপের বন কাটার সময় যে সমস্ত প্রস্তর, ধাতব ও মৃণ্ময় দেবদেবীর মূর্তি ও তৈজসপত্রাদি এবং মন্দির ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, মজা পুকুর, গড় প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই সমুদায় উক্ত মণ্ডলের প্রাচীন গ্রাম ও নগরাদির নিদর্শন বলা যায়। এছাড়া ঐ সময় জঙ্গল কাটার সময় ছোট আকারের কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এই মূর্তিগুলি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বলে গণ্য করা হয়। ওই এলাকা থেকে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রস্তরের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির গাত্রের চৌকাঠ পাওয়া গিয়েছে। এগুলির সচিত্র পরিচয় "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ১৯২৮/২৯ সালের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পুরাতন রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে জানা যায় যে ১৮৫৭ সালে ওই স্থানের (খাড়ীর) দক্ষিণ জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং ৩০-৪০ ফুট উঁচু মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা দুইটি বৃহৎ পুকুরের মজা গর্ত ঘন অরণ্যময় অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান সময়ে ওই স্থানে যে সকল পুরাবস্তু আছে তার মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়

ঢোসা গ্রামে মাটির নিচে অনাবিষ্কৃত পুরা নিদর্শন

ছবি : জয়ন্ত হালদার

মনুষ্যপ্রমাণ একটি কাষ্ঠনির্মিত "বড় খাঁন" গাজীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তি মসজিদের ন্যায় একটি ইষ্টক নির্মিত গৃহে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন বিবরণাদি পাঠে জানা যায় যে, নিম্নবঙ্গে মুসলমান অধিকার কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল পীর ফকির দরবেশ আরব, পারস্য থেকে এতদঞ্চলে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন উক্ত "বড়খাঁন গাজী" তার মধ্যে অন্যতম। উক্ত 'বড়খাঁন গাজীর' কার্যকলাপ নিম্নবঙ্গের নানাস্থানে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে শুনতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে চব্বিশ পরগনায় বহু হিন্দুকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন।

রায়মঙ্গলে উল্লেখ আছে যে ওই সময় খাড়ীতে দক্ষিণ রায় নামেও এক প্রভাবশালী শক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৎকালীন অরাজকতায় উৎপীড়িত হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণে বাধা দিতেন। দক্ষিণ রায় এধরনের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে ছিলেন, সেজন্য তার সঙ্গে "বড় খাঁন গাজীর" যুদ্ধবিগ্রহ হত। বর্তমান জয়নগর থানার অধীন 'খনিয়া' নামক স্থানে ওইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণ 'রায়মঙ্গল' পুঁথিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'দক্ষিণ রায়'ও খাড়ীতে ছিলেন রায়মঙ্গলেও তার উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে এই দক্ষিণ রায়ই অসাধারণ শক্তি, পরহিতৈষণা, স্বধর্ম, স্বজাতি রক্ষার জন্য হিন্দুদের দেবতায় পরিণত হন। এখনও নিম্নবঙ্গের নানাস্থানে তাঁর যোদ্ধবেশী মূর্তিকে পূজা করা হয়। বর্তমান দক্ষিণ বারাসত তাঁর পূজা ও মূর্তির জন্য বিখ্যাত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বঙ্গদেশ মুসলিম অধিকারে যাওয়ার পূর্বে সেন রাজাদের রাজত্বকালে খাড়ী মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে খাড়ীর যে অংশের উপর লোকালয় ছিল তা নিয়ে মুসলমান আমলে খাড়ী পরগনার সৃষ্টি হয়। আইন-ই-আকবরিতে সুবহ্ বাংলার পশ্চিম সীমান্তরূপে খাড়ী পরগনার উল্লেখ আছে। কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে দেখলে দেখা যাবে যে হুগলী জেলার ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম থেকে কলকাতা, চিৎপুর, বেহালা, কালিঘাট, চব্বিশ পরগনা জেলার বৈষ্ণবঘাটা, বারুইপুর, জয়নগর মজিলপুর, ছত্রভোগ, বড়াশী হয়ে খাড়ী গ্রাম পর্যন্ত মজে যাওয়া আদিগঙ্গার জলপ্রবাহের একটি সুনির্দিষ্ট পথ এখনও লক্ষ করা যায়। গঙ্গার এই প্রাচীন প্রবাহ শতধারায় প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হত।

জয়নগর-মজিলপুরে[illegible] প্রখ্যা[illegible] পুরাতত্ত্ববিদ কালিদাস দত্ত মহাশয় তাঁর চব্বিশ পর[illegible] অ[illegible] প্রাচীন যুগ নামক একটি মূল্যবান প্রবন্ধে লিখেছেন [illegible] গঙ্গানদী এই প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব[illegible] হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে ও ব্যাসদেবকৃত মহাভার[illegible] পৌরাণিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সুদূর অতীত যুগ [illegible] মিলন স্থানটি গঙ্গাসাগর তীর্থ কপিলাশ্রম নামে বি[illegible] গ্রন্থাদির মধ্যে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের গঙ্গাসাগর [illegible] প্রসঙ্গ পঞ্চশতনদী নামে সর্বপ্রথম গঙ্গানদীর উল্লে[illegible] সংখ্যায় অধিক থাকার বোধ হয় মহাভারতকার ওই[illegible] ছেন। এই পঞ্চশত অথবা শতমুখী লুপ্ত গঙ্গা ও [illegible] গুলিকেই বুঝানো হয়েছিল। বর্তমান কুলতলি থানার [illegible] বাড়ী মৌজায় জটার দেউল বলে এক দীর্ঘ প্রাচীর [illegible] ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আধুনিক কলকাতা [illegible] অবস্থিত বর্তমান বেহালা, বড়িষা, ঠাকুরপুকুর, শিয়[illegible] চৌরঙ্গী, গড়েরমাঠ একদা অরণ্যময় জলাভূমি ছিল। মৌজা কোলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুরের অতি সামান্য লোকবসতি ছিল। ওই জনবসতি বস্তুত জঙ্গল ও খাল-বিলে ভর্তি ছিল। গঙ্গানদীর বিস্তার ছিল বিশাল। বর্তমান কালীঘাট বা কালীক্ষেত্র গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। শিয়ালদহ রেল স্টেশন নির্মাণের সময় মাটি খোঁড়া হলে মাটির নীচ থেকে সুন্দরী কাঠের গুঁড়ি এবং "Peat Bed" আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান ক্রীক্ রো-টি একটি প্রশস্তখাল গঙ্গানদী থেকে বার হয়ে শিয়ালদহকে বেষ্টন করে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান বামনঘাটা হয়ে পূর্বদিকে হাড়োয়া নদীতে পড়েছে। বামনঘাটা থেকে বেদ্‌রা পর্যন্ত বহু জলাভূমি দেখা যায় এখন ওই সকল জলাভূমিতে মৎস্যচাষ হয়ে থাকে। এই সকল জলাভূমি অতীতে বিদ্যাধরী নদীর Spill Area বা প্লাবন ভূমি ছিল। মজাবিদ্যাধরীর নিকট অবস্থিত 'শাঁকসর' গ্রামটির নামকরণ হয় ওই স্থানে নদীর চরে প্রভূত পরিমাণ শঙ্খ পাওয়া যেত, তাই ওই স্থানের নাম হয় শাঁকসর। এই জলাভূমির চারপাশের ঘন বনজঙ্গল পূর্ণ ছিল। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব ছিল না।

বর্তমান বোড়াল গ্রামটি আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে আদিগঙ্গা গতিপথ পরিবর্তন করে বহুদূরে সরে গিয়ে একটি শীর্ণকায় খালে পরিণত হয়েছে। গঙ্গার তীরে এই গ্রামের মাটি খুঁড়ে বহু প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যে সুন্দরবনের কাছে এই নিম্নভূমি গঙ্গার জোয়ারে ডুবে যেত। এই জায়গার ক্ষেত-খামার ইত্যাদির সীমানা চিহ্নিত আলগুলি জোয়ারের জলে 'বুড়ে' বা 'বুড়িয়া' যেত, অর্থাৎ ডুবে থাকত। সেই কারণে "বোড়া আল" থেকে বোড়াল নামের উৎপত্তি হয়েছে।

বোড়ালের জঙ্গলাকীর্ণ সেন দিঘির পাড়ে উঁচু ঢিবির মাটির স্তূপ খুঁড়ে দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর দারুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। সাত-আটশত বছরের পুরাতন দেবীমূর্তি দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকায় এর অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। ত্রিপুরাসুন্দরী, দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ষোড়শী মূর্তি। এই প্রাচীন মন্দিরও উঁচু ঢিবিগুলি খুঁড়ে কারুকার্যখচিত বিভিন্ন আকারের ইট, মাটির পাত্র এবং খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর একটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি, পাথরে খোদিত বিষ্ণুপাদপদ্ম, হরিণের শিং (দীর্ঘকাল মাটির মধ্যে প্রোথিত থাকায় পাথরে পরিণত হয়) পাওয়া গিয়েছে। এই সকল জিনিসপত্র পরীক্ষা করে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্ত করেন যে খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল ও সেন রাজবংশীয় স্বাধীন রাজারা দিঘি খনন, মন্দির নির্মাণ, জনপদ ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সেনদিঘির পশ্চিম পাড়ে লাল বেলে পাথরের একটি তারা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এইসব উল্লিখিত মূর্তিসকল ইট ও মন্দিরাদি খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর। এইসব মূর্তি ও সংস্কৃতির ধারার মধ্যে এই এলাকার একটি সুসভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় যা এক সময়ে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্যে লুপ্ত ছিল। এই সকল পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন কতকগুলি বোড়াল গ্রামে অবস্থিত ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরে রক্ষিত আছে এবং অপর জিনিসপত্রগুলি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে দান করা হয়েছে।

একদা জয়নগর-মজিলপুরের মধ্যেও গঙ্গানদী প্রবহমান ছিল। এই জনপদ দুইটি সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা না বললে সুন্দরবন চর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বর্তমান লুপ্তস্রোতা আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরবর্তী জয়নগর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ এবং একদা মজে যাওয়া ভূখণ্ডের উপরেই মজিলপুর গ্রামের পত্তন হয়েছিল এইরূপ অনুমান করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণরাম রায় রচিত রায়মঙ্গল কাব্যে বহির্বাণিজ্য অন্তে গঙ্গানদী দিয়ে সওদাগরদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর বর্ণনায় জয়নগর গ্রামের বিশেষ উল্লেখ আছে। স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণউদ্‌গাতা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মজিলপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন বলে জানা যায়। তিনি যশোরের চন্দ্রকেতু দত্ত নামে জনৈক ভূস্বামীর কুলপুরোহিত ছিলেন। মোগল সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক যশোর আক্রান্ত হলে দত্ত পরিবারের সঙ্গে তিনিও মজিলপুরে চলে আসেন। জয়নগরের মিত্র, ঘোষ, মতিলাল, সরখেল, এবং মজিলপুরের দত্ত, ভট্টাচার্য, পাণ্ডা প্রমুখ পরিবারগুলির এই এলাকার প্রগতি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়নগর নামকরণের অনেক কাহিনী ও প্রবাদ আছে। কোনও কোনও গবেষক বলেন "জয়চণ্ডী" নামে প্রাচীন দেবীমূর্তি থেকে জয়নগর নামকরণ করা হয়েছে। আবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত "দেশাবলী বিবৃতি" নামে একটি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি থেকে জানা যায় যে জয়নগর নিবাসী জনৈক পণ্ডিতের কাছে ন্যায়শাস্ত্র বিচারে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ পরাজিত হন। তাঁর জয়গৌরব হিসাবে এই গ্রাম জয়নগর নামে খ্যাত হয়।

বর্তমান কাকদ্বীপ থানার অধীন ভরতগড় গ্রামটি প্রায় একশ বছর পূর্বে জঙ্গল কেটে আবাদ হয়। আবাদ করার সময় একটি গড়, একটি বড়দিঘি উঁচু পাড় যুক্ত গ্রামের সব দক্ষিণ প্রান্তে ইটের গাঁথনিযুক্ত দ্বাদশটি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান জরিপে ওই সকল শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অবস্থান হিরন্ময়পুর নামে একটা নতুন সৃষ্ট রেভিনিউ মৌজায় দেখানো হয়। ভরতগড় ও তৎসংলগ্ন হিরন্ময়পুর গ্রাম দুইটি গরাণবোস নদীর পূর্ব পাশে অবস্থিত। ওই স্থানের মন্দিরের ইটগুলি নয় ইঞ্চি চওড়া এবং বারো ইঞ্চি দীর্ঘ, দুই-তিন ইঞ্চি মোটা, দেখতে অনেকটা টালির মতো। আবাদ করার সময় কৃষকরা এসকল ইট ও মন্দির গাত্রের টেরাকোটা, ভগ্ন দেব-দেবী মূর্তিগুলি নিয়ে গিয়েছে। এখন একটিমাত্র মূর্তির পাদপদ্ম গোলাকৃতি কৃষ্ণ প্রস্তরের নির্মিত ভগ্নমূর্তি রাণীগড় পি-ডব্লিউ রাস্তার পাশে একটি বটগাছের নীচে সিন্দুর চর্চিত অবস্থায় পূজিত হচ্ছে। ভরতগড়ের দক্ষিণ সীমায় নদীর পশ্চিম দিকে বিরিঞ্চিবাড়ী গ্রাম ও আবাদ করার সময় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। কিন্তু কোনপ্রকার সংরক্ষণের অথবা গবেষণা করার ব্যবস্থা না থাকায় ওই সকল পুরাতাত্ত্বিক বস্তুসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার ১৯৩২ সালে মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় এই বিষয়ে উল্লেখ করেন।

এছাড়া গোসাবা থানার স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন জমিদার কর্তৃক গোসাবা দ্বীপের জঙ্গল কাটার সময় বর্তমান গোসাবা বাজারের নিকট একটি অতীব সুন্দর ইট বাঁধানো বড় পুকুর আবিষ্কৃত হয়। এই পুকুরের বৈশিষ্ট্য হল পুকুরের তলদেশ, চারদিকের পাড় উত্তমরূপে ইট দিয়ে বাঁধানো যাতে নোনাজল কোনক্রমে পুকুরের মধ্যে জমানো বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশ্রিত হতে না পারে। ওই পুকুরের জল কারা পান করত আবাদ হয়ে জনবসতি স্থাপনের পূর্বে তা অজ্ঞাত। পরবর্তীকালে আবাদ হাসিল করার পর বহু বছরে ওই পুকুর সংস্কার করে ওই জলই পানীয় হিসাবে স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যবহার করত।

গোসাবা থানার থেকে ৫০-৬০ মাইল দক্ষিণের নেতিধোপানী নামে গভীর বনমধ্যে একটি ইটের তৈরির বিরাট বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। ওই ধ্বংসস্তূপের পাশে ইট বিছানা এক পাকারাস্তাও আছে। এখন ওই স্থানে বাঘ দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি গোসাবা থানার রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া গ্রামের কয়েকটি স্থানে প্রবল জোয়ারের জলে নদীবাঁধ ভেঙে গভীর গর্ত হয়ে যায়। ওই সকল স্থান মেরামত করার সময় গ্রামবাসীরা সোনারূপার অলঙ্কার, মাটির তৈজসপত্র পায়। তবে মূল্যবান ধাতব মুদ্রাগুলি গ্রামবাসীরা নিয়ে যায়। মাটির অপরূপ কারুকার্যময় তৈজসপত্রগুলি ফেলে যায়। ওই সকল তৈজসপত্রগুলিও রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়নি।

দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার সাগর থানার রেভিনিউ মৌজার ১২ বামনখালি এবং ১৩ নং মন্দিরতলা গ্রামে মাটির নীচে এক বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। মন্দিরতলা ও বামনখালি গ্রাম দুইটি হুগলীনদী তীরে অবস্থিত। একদা হুগলী নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ওই স্থানের বৃহৎ অট্টালিকার কিয়দংশ বার হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে মাটির তৈজসপত্র রৌপ্য ও দস্তার তৈরি মুদ্রা, মুদ্রার উপর মূর্তি ছাপ রয়েছে। তাছাড়া লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী, মনসা মূর্তি সবই পাথরের পাওয়া গিয়েছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরতলা ও বামনখালি গ্রাম দুইটি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে এই ধারণা প্রকাশ করেছে। মৃন্ময় পাত্র, সিলমোহর ইত্যাদি গুপ্ত, সেন ও তাম্রলিপ্ত সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে গণ্য করার সঙ্গত কারণ আছে। বামনখালি গ্রামের শিক্ষক শ্রীঅনিল খাঁড়া মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় ওই যুগের মূল্যবান নিদর্শন রয়েছে। আশুতোষ মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এইসকল জিনিসপত্রগুলির পরীক্ষাও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য। সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায় এখনও চাপা পড়ে আছে। হয়তো কখনও কোনও গবেষক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ সুন্দরবনের লুপ্ত ইতিহাসের উপর আরও উজ্জ্বল আলোকপাত করতে সক্ষম হবেন।

তারপর কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর অসংখ্য নদীনালা বেষ্টিত অতীতের এক লুপ্ত সভ্যতার ভূমিতে হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত গভীর অরণ্যময় দ্বীপপুঞ্জে নয়া মানুষের পদধ্বনি শোনা গেল। সমগ্র অরণ্যভূমি লক্ষ লক্ষ আদিবাসী, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও শ্রমিককে হস্তধৃত কুঠারের আঘাতে অরণ্যের কয়েক শতাব্দীব্যাপী ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। বন কেটে জনপদ স্থাপনের চেষ্টা প্রবলভাবে শুরু হল। এই শুরুটা হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লাভের লোভে।

সুন্দরবন চর্চার অঙ্গ হিসাবে চব্বিশ পরগনা জেলা, কলকাতা, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বাংলার নবাবী শাসনের অন্তিম পর্বের কিছু প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত এসে গেলেও এই ইতিবৃত্ত বিস্তারিত-ভাবে বিবৃত করার অবকাশ এই নিবন্ধে নেই।

১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সম্রাট ফাররুখশিয়ারের এক ফরমানবলে কলকাতা পরগনার জমিদারির মধ্যে তিনটি গ্রাম—কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুরসহ গঙ্গানদী (হুগলী) পূর্ব তীরবর্তী অনেকগুলি জনপদ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া হলেও, ইংরেজরা ওই উল্লিখিত তিনটি গ্রাম ছাড়া অধিকাংশ স্থানের দখল ফরমান অনুসারে পায়নি। দিল্লির সম্রাটের অধীনস্থ বাংলার সুবাদার, ফারমানবলে প্রাপ্ত জমিদারির এলাকাসমূহের দশভাগের নয় ভাগই নানা অজুহাতে ইংরেজদের দখল করতে দেয়নি। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে দেশের অভ্যন্তরে, বাণিজ্য করবে—এটা বাংলার নবাবরা আদৌ পছন্দ করতেন না। অথচ বাংলার নবাবরা দিল্লির নিযুক্ত কর্মচারীমাত্র। সেজন্য নানা কৌশলে জমিদারির অন্তর্গত ছোট ছোট তালুকের জমিদারদের উপর হুমকি ও প্ররোচনা দিয়ে বাংলার নবাবরা বাদশাহী ফরম্যানবলে প্রাপ্ত এলাকা ইংরেজদের দখল করতে দেয়নি।

কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের জমিদার ছিল বড়িশার চৌধুরীরা। তাঁদের কাছে সংবাদ গেল যে ইংরেজরা আবার পাঁচটি জাহাজ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছে। বড়িশার চৌধুরীরা বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। তাঁদের বিরাট জমিদারির এলাকা ছিল বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। চৌধুরীরা ভাবলেন ইংরেজরা খাজনা দিয়ে আর পাঁচজন প্রজার মতো থাকবে। সুতরাং ইংরেজদের তো পাত্তা দেবার কী আছে? কিন্তু বড়িশার চৌধুরীরা ভাবতেও পারেননি যে তাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে লোভী শকুন উঁকি দিচ্ছে। আসলে এই তিনটি গ্রাম ছিল দিল্লির সম্রাটের খাসমহল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় যশোহরের প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা দিল্লির সম্রাটকে মান্য করতেন না, খাজনাও দিতেন না। সুতরাং, তাকে ধরে বন্দী করে আনার জন্য মোগল সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে যশোহর আক্রান্ত হয়। প্রতাপাদিত্য মোগল বাহিনীর কাছে পরাজিত ও বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় মারা যান। বড়িশার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের এক পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করতে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করেন। এই লক্ষ্মীকান্তই ছিলেন প্রতাপাদিত্যেরই একজন দেওয়ান। এই সাহায্যের জন্যই তখন সম্রাট জাহাঙ্গির খুশি হয়ে কলকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের জমিদারির ভার লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের হা[illegible] তুলে দিয়েছিলেন এবং খেতাবও দিয়েছিলেন। এটা হলো [illegible]ঘাত[illegible] পুরস্কার। এত লাভের জমিদারি সাবর্ণ চৌধুরীর [illegible]স[illegible]ধিকার সূত্রে। এই লাভের জমিদারি চৌধুরীরা ছাড়[illegible] বাড়িতে ইংরেজরা অনেক ধরনা দিল বটে কিন্তু চৌ[illegible] তারা জমিদারির এই তিন গ্রাম বিক্রয় করবে না। ইং[illegible]দা। তারা খোঁজখবর নিয়ে জানলেন যে ওই তিন গ্রা[illegible] জমি। চৌধুরীরা জিম্মাদার মাত্র। সর্বপ্রকার গোপ[illegible] ও [illegible]ল ঘুষ, নজরানা দিয়ে মোগলদরবারে কর্মচারীদে[illegible] ১৬৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্রাটের নাতি (আজিম[illegible]রে আজিমুউস্সান রূপে পরিচিত। তাঁর ফরমানে [illegible]র্ণ [illegible]রা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা, সু[illegible] গো[illegible]র তেরোশত টাকায় বিক্রয় করে দখল দিতে বাধ্য হ[illegible] ১৭০৬ [illegible]র দিকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর জরিপ হ[illegible] সুতানুটির মোট জমি ১৬৯২ বিঘার মধ্যে ১৫৫৮ বিঘ[illegible] ধান খেত। গোবিন্দপুরের ১১৭৮ বিঘার মধ্যে ১১২১ বিঘা পুরা জঙ্গল। ডিহি কলকাতা ১৮১৭ বিঘা এবং বাজার কলকাতা ৪৮৮ বিঘা। মোট ৫১৭৫ বিঘা জমি। এই জমির বেশিরভাগই বনজঙ্গল, খাল, নালাজলাভূমি, হিংস্র বাঘ, ডাকাত সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। এই তিন গ্রামও সুন্দরবনের অংশ।

১৬৯৬-১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকা ও দিল্লির অগোচরে সুতানুটি, গোবিন্দপুর কোলকাতায় এক নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। এই নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলটি সুন্দরবনের সন্নিহিত বাদা অঞ্চল। এই বাদা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর সঙ্গে সমুদ্রের যোগ থাকায় ইংরেজ নৌবাণিজ্য এবং স্থল ও নৌসৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সামরিক গুরুত্ব লাভ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ইংরেজরা কলকাতার পাশের চব্বিশ পরগনার জমিদারি হাতে পেল। এই জমিদারি এলাকা ছিল আনুমানিক ১০০০ বর্গমাইল। ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায় যে তখনও ইংরেজরা বিশ্বাস করত না যে তারা সহসাই তামাম হিন্দুস্থানের মালিক হতে চলেছে। তাই কী ভাবে কলকাতা ও চব্বিশ পরগনার উপর তাদের অধিকার রাখা যায় সে জন্য তারা দিল্লির বাদশাহ ও বাংলার নবাবের কাছ থেকে জমির উপর স্বীকৃত বিভিন্ন স্বত্বগুলির প্রত্যেকটি স্বত্বের জন্য পৃথক পৃথক পরোয়ানা আদায় করে নিল। এই সময় ১৭৫৮ সালে এক দেওয়ানী সনদবলে কলকাতা বন্দর, শহর দুর্গ এলাকা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লাখেরাজ সম্পত্তি বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। পরবর্তী সময়ে এক সনদে ক্লাইভকে চব্বিশ পরগনা ও কলকাতার জায়গিরদার ও জমিদাররূপে ঘোষণা করা হয়। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ শাহ আলম, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুবাহ বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি প্রদান করলেন। অথবা বলা যেতে পারে যে ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি ঘুষ দিয়ে হস্তগত করলেন। তারপর যে লুণ্ঠনের ইতিহাস তৈরি হল তা ভয়াবহ। বণিকের ধর্ম আর রাজধর্ম এক নয়। বণিক যতদিন রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণের ভিতরে থেকে কাজ করে, ততদিন শোষণ ও জুলুমের একটা মাত্রা রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোম্পানির বণিকেরা যখন রাজশক্তি হাতে পেল, তখন অন্যায়-অত্যাচারের কোনও সীমা থাকল না। দেশীয় বণিকদের ব্যবসা তুলে দেওয়া হল। উৎপাদকরা কম দামে ইংরেজ কোম্পানি উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করতে বাধ্য হল। এবং সাধারণ মানুষ বেশি দামে দেশি পণ্য চাল, ডাল, নুন, চিনি, গুড়, কাপড় ইত্যাদি কিনতে বাধ্য হল। জমিদারদের জমিদারি কেড়ে নিয়ে বেশি বেশি খাজনা আদায়ের জন্য নিলামে চড়ানো হল। অনেক জমিদার, রায়ত পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাওয়া জমিদার ও রায়তদের খাজনা যারা পালায়নি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। খাজনা আদায়ের জন্য চরম অত্যাচার শুরু হল। এভাবে ৭/৮ বছরের মধ্যে দেশের আবাদী জমি বনজঙ্গলে পরিণত হয়ে অনাবাদী হয়ে গেল। বাং ১৩৭৬ সালের (১৭৭১-৭২) সালে মহামন্বন্তর দেখা দিল যার ফলে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। বাংলা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়।

বহু বিতর্কিত রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হিসাবে ১৭৯৩ সালে ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি করার ফলে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ে কিছুটা সুস্থিতি আসে। কিন্তু ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো এবং চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানোর চিন্তা এই সময় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষের মাথায় ছিল। ১৮০০ সালের দিকেই

ইংরেজ কোম্পানি নিজস্ব কোষাগারের অর্থ ব্যয় না করে চাষে এলাকা বাড়িয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকে। এই সময় থেকেই অধুনা দক্ষিণ জেলার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত গভীর অরণ্যময় হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত সাগর দ্বীপে মিঃ বিমাউন্ট নামে জনৈক ইংরেজকে একশত একর জমি ইজারা দেওয়া হয়। তখন ওই স্থানে কোনও লোকবসতি ছিল না। তিনি ওই স্থানে চামড়ার কাজ করবেন। এর কিছুকাল পরে বাংলায় রেভিনিউ বোর্ড সাগরদ্বীপের জমি উদার শর্তে আবাদ করার জন্য বন্দোবস্ত দেয়ার ঘোষণা করলে মিঃ বিমাউন্ট অনেক বেশি জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু রেভিনিউ বোর্ড তার ওই প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন এই যুক্তিতে যে কোনও ইউরোপীয়কে চাষাবাদ করার জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে না। ওই সময় ভারতে ইউরোপীয়দের জমি কেনার অধিকার ছিল না। কেবল দেশীয় ব্যক্তিদের অথবা দেশীয় ও ইউরোপীয় যৌথ কোনও সমিতিকে উদার শর্তে জমি আবাদের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। এই সময় ১৮১৯-২০ সালের দিকে ২৪-পরগনা জেলার কালেক্টর মিঃ ট্রোয়ার, Saugor Iland Society নামে এক যৌথ ইঙ্গ ইউরোপীয় কোম্পানী গঠন করেন। মিঃ ট্রোয়ারও এই কোম্পানির সদস্য ছিলেন। এই কোম্পানি সমগ্র সাগরদ্বীপ আবাদ করার জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করে খুবই উদার শর্তে। সাগরদ্বীপ আবাদ করার শর্ত হল (১) ত্রিশ বছর পর্যন্ত কোনও রাজস্ব দিতে হবে না। (২) ত্রিশ বছর পর জমি জরিপ হবে এবং বিঘা প্রতি বাৎসরিক চার আনা খাজনা দিতে হবে। (৩) Saugor Iland Society-কে বনজঙ্গল কেটে, দ্বীপের চারপাশে নদীবাঁধ দিয়ে লোনা জলের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং দ্বীপের অভ্যন্তরে জলনিকাশি ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করে জনবসতি ও চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) আবাদ করা জমিতে দেশীয় কৃষক ও ধনী ব্যক্তিদের ধান ও খাদ্য ফসল চাষ করার জন্য বন্দোবস্ত দিতে পারবে। (৫) Saugor Iland Society স্থির করবে কৃষক ও ধনীব্যক্তিদের কী শর্তে ও বিঘা প্রতি বাৎসরিক কত রাজস্বের বিনিময়ে জমি বন্দোবস্ত দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারবে। সাগরদ্বীপের মধ্যস্থলে একটি স্থানের নাম "ট্রোয়ার ল্যান্ড" নামে পরিচিত। এখনও ওই স্থান ট্রোয়ার ল্যান্ড নামে আখ্যাত হয়। ১৮২০-১৮৩৩ সাল পর্যন্ত প্রবল উদ্যোগের সঙ্গে সাগরদ্বীপে জঙ্গল কাটা ও নদী বাঁধ বাঁধার কাজ চলতে থাকে। ওই সময় জঙ্গল কাটা ও নদী বাঁধ নির্মাণের কাজে আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও শ্রমিকদের রাঁচী, হাজারিবাগ, মানভূম, সিংভূম থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এদের সংখ্যাই ছিল বেশি। রায়ত চাষীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। রায়ত চাষী যারা ওই সময় সাগরদ্বীপে জমির জন্য এসেছিল তাদের বাসভূমি ছিল নিকটবর্তী মেদিনীপুর জেলা। এই সময় এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে আবাদের সমস্ত কাজই পণ্ড হয়ে যায়। তদুপরি Saugor Iland Society সাময়িকভাবে আবাদ করার কাজ পরিত্যাগ করে। দুই-এক বছর পরে পুনরায় দ্বীপের উত্তরাংশে Saugor Iland Society আবাদ করার কাজ শুরু করে। কিন্তু পুনরায় ১৮৬৪ সালে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সাগর-দ্বীপের মোট জনসংখ্যার ৪১৩৭ জনের মধ্যে চারভাগের তিনভাগ মরে গিয়েছিল (মাত্র ১৪৮৮ জন কোনরকমে বেঁচেছিল) তারপরেও এই দ্বীপে জঙ্গলকাটা, বসতি স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

সুন্দরবনে সুন্দরী মুণ্ডা তরুণী

এখানে বসতি স্থাপন করেছে প্রধানত মেদিনীপুর থেকে আগত কৃষক ও ধনী জোতদারগণ। আবাদপত্তনি শ্রমিকরূপে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, মাহাতো রাজোয়ার গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী এবং ওড়িশাবাসী স্বল্পসংখ্যক কৃষক। সাগরদ্বীপ আবাদ করার সময়ই জঙ্গলের মধ্যে কপিলমুনির আশ্রম আবিষ্কৃত হয়। ওই সময় উক্ত আশ্রমে যাতায়াতের জন্য একটি মাটির রাস্তাও নির্মাণ করা হয়। এই রাস্তা নির্মাণ করে Saugor Iland Society। বহু প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হিন্দুদের সর্বভারতীয় তীর্থক্ষেত্র হিসাবে গঙ্গাসাগরের নাম উল্লেখ থাকায় এই দ্বীপে জনবসতির বিস্তার যাতায়াতের পথের দুর্গমতা কিছু পরিমাণে দূর হওয়ার ফলে এই তীর্থক্ষেত্রের আকর্ষণে জনসমাগম বাড়তে থাকে। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে সাগরস্নান, কপিলমুনির পূজা, গোদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রায় আড়াই হাত উঁচু পাশাপাশি তিনটি শিলায় খোদিত দেবদেবী মূর্তি আছে। তার একটি চতুর্ভুজা মকরবাহিনী গঙ্গামূর্তি কোলে ভগীরথ; অপর দুইটির মধ্যে একটি কপিলমুনির মূর্তি অপরটি সগর রাজার। কপিলমুনি ও সগর রাজা দুইজনেই বিস্ফারিত নেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট এবং দীর্ঘশ্মশ্রুধারী। কপিলমুনির মাথার উপর পঞ্চনাগের ছত্র বিস্তৃত। বামহাতে কমণ্ডলু এবং উর্ধ্বে তোলা ডানহাতে জপের মালা। মূর্তি তিনটির শিল্প সৌন্দর্যহীনও সর্বাঙ্গে সিন্দুরলিপ্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে মানত বা মানসিক করে সাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়া এক কালে বহুল প্রচারিত রীতি ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আইন করে এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গাসাগরে এখন সন্তান বিসর্জনের কথা শোনা যায় না। তবে নদীপথে যারা স্টিমারে করে সাগরতীর্থে যান তারা আজও দেখতে পাবেন ডায়মন্ডহারবার ছাড়িয়ে মোহনার
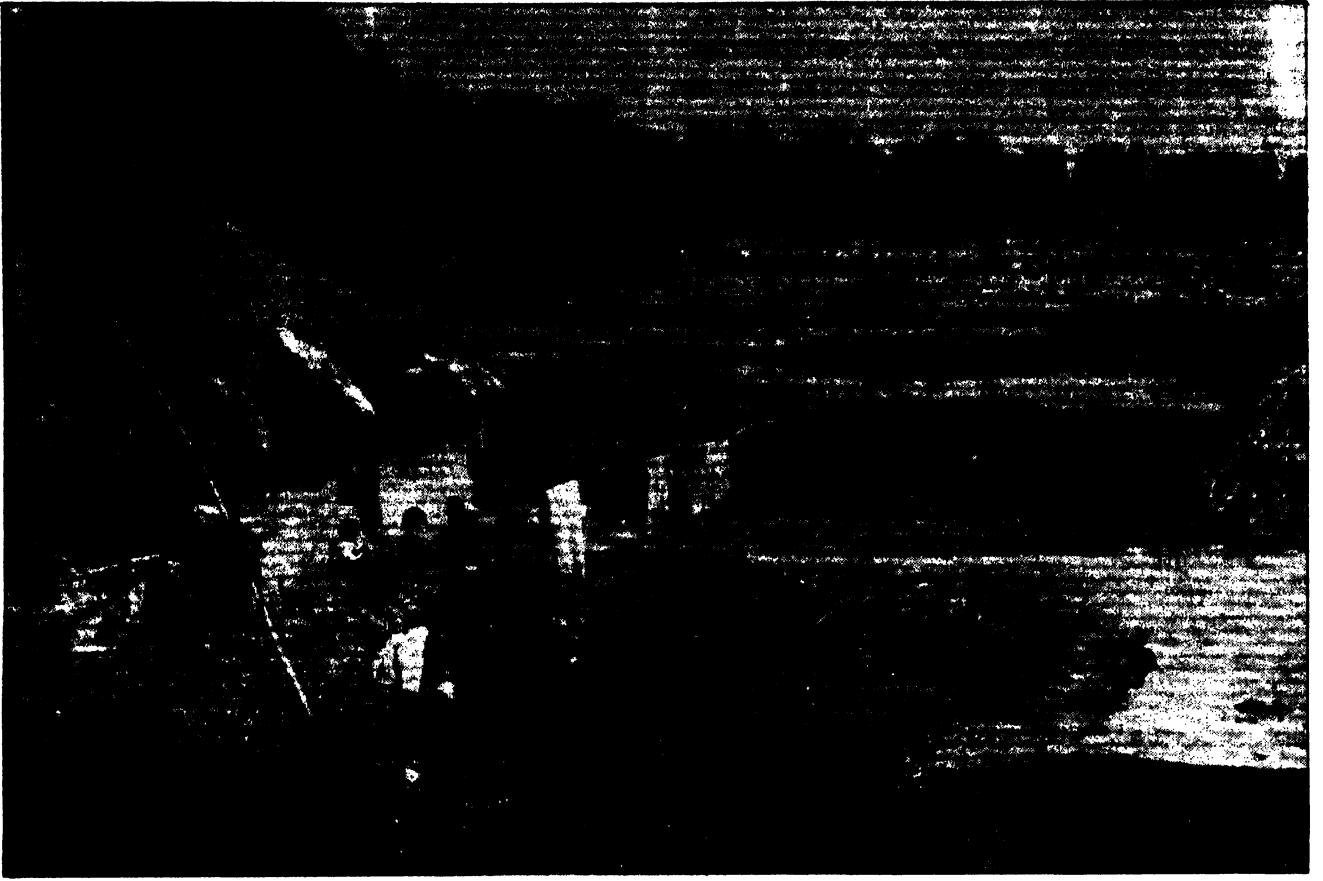
আবাদ করে নতুন জনবসতি

দিকে এগিয়ে গেলেই যাত্রীরা মানত করে অর্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কার গোটাফল, বিশেষ করে নারকেল নদীগর্ভে ও সাগরে নিক্ষেপ করে থাকে। অনেকে ডাবকে সিন্দুর চর্চিত করে সেই সঙ্গে ঘটি-ঘটি সরষের তেলও ঢেলে দেন। কেহ কেহ কাঁসর-ঘণ্টা বাজান, হুলুধ্বনি দেন, গঙ্গা স্তব করেন। কপিলমুনির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত বিগ্রহাদির উৎসবকালে পূজার্চনা করেন অবাঙালী রামানন্দ পন্থী তিন-চারজন মহান্ত। উত্তরপ্রদেশের হনুমানগড়ি থেকে এই সকল মহান্তরা উৎসবকালীন গঙ্গাসাগরে [illegible]। সা[illegible]তীর্থের মালিকানা যে কী সূত্রে অবাঙালি রামানন্দ পন্থীদে[illegible] সে সম্পর্কে কোনও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

সাগরদ্বীপ আবাদে[illegible] সকল হওয়ার পরেই ১৮০০ সালের প্রথম দিকে [illegible] এলাকা বাড়িয়ে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি ও খাদ্য ঘাটতি দূর [illegible] হয়। এই উদ্দেশ্যে বাংলার রেভিনিউ বোর্ড খুব উদা[illegible]র কতকগুলি বনময় দ্বীপ আবাদ করা ও কৃষি ব্যবস্থা[illegible] লিজ দেওয়ার নীতি ঘোষণা করে। সুন্দরবনের কতি[illegible] কেটে ধান চাষ বাড়ানো ও বসতি স্থাপন করার [illegible] ভারতের বড়লাট পরিষদের সদস্য এবং স্কটল্যান্ড এর [illegible] বড় জমিদার এবং ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি নামক বিখ্যাত [illegible] কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার স্যার ড্যানিয়েল্ ম্যাকিনন্ [illegible] একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরের [illegible]ত দ্বীপাঞ্চলের আবহাওয়া, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ধানচাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে ১৮০০ সালের প্রথম ভাগেই স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন্ হ্যামিল্টন সহ, পোর্ট ক্যানিং জমিদারি কোম্পানি, নফরপাল চৌধুরী, মহেশচন্দ্র ল্যান্ড রিক্লামেশন কোম্পানি, শোভাবাজারের রাজা জানকীনাথ রায়, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রয়াত শম্ভুনাথ পণ্ডিতসহ মেদিনীপুর, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ থেকে ধনী ব্যক্তি বাংলা সরকারের নিকট থেকে আবাদ করার জন্য বহু বনময় দ্বীপ ইজারা নেয়। মেদিনীপুর জেলার, জানা, দিন্দা, মাইতি, মণ্ডল, উপাধীধারী বহু ধনী ব্যক্তি সুন্দরবনের বিভিন্ন বনময় দ্বীপ ধানচাষ করা ও প্রজাপত্তনের জন্য ইজারা নেয়। খুলনা ও যশোহর জেলাতে অনুরূপভাবে ধানচাষের ও প্রজাপত্তনের জন্য কতকগুলি বনময় দ্বীপ ইজারা দেয়া হয়। এই ইজারার শর্ত ৪৯ বছর। প্রথম দশ বছর খাজনা দিতে হবে না। দশ বছর পরে জরিপ হবে এবং অধিকৃত বা দখলীকৃত জমির মোট এলাকা স্থির হবে এবং ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য কর নির্ধারণ করা হবে। এই দশ বছরের মধ্যে বন কেটে, দ্বীপের চারদিকে উঁচু মাটির বাঁধ নির্মাণ করে লোনা জলের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং দ্বীপের অভ্যন্তরে জলনিকাশি ব্যবস্থা ও বৃষ্টির জল ধরে রেখে ধানচাষের ব্যবস্থা করা এবং জনপদ স্থাপন করা। সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজ কোম্পানি বড় বড় ইজারাদারদের দেয় খাজনা ও অন্যান্য করের পরিমাণ স্থির করে দিলেও ইজারাদার ও জোতদারগণ তাদের দ্বারা স্থাপিত রায়ত চাষীদের কত পরিমাণ রাজস্ব ও অন্যান্য কর দিতে

হবে তা কিন্তু স্থির করে দেয়নি। ফলে ইজারাদার ও জোতদারগণ বন কেটে আবাদ করা ও নদীবাঁধ বাঁধার যাবতীয় খরচ সবই অতি উচ্চহারে রায়ত চাষীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তা আদায় করেছিল।

কোন বনময় দ্বীপ কোন সালে আবাদ হয়েছিল সেই সকল দলিলপত্র এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে সংগতভাবেই অনুমান করা যায় যে ১৮৮৫-১৯১০ সালের মধ্যে সুন্দরবনের ইজারা দেওয়া অংশের আবাদ করার কাজ শেষ হয়। সুন্দরবনের নয়া জনবসতি এলাকার আয়ু ১১০/১২৫ বছরের বেশি নয়। অরণ্যময় বনভূমির বনকাটার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গরু বা মোষের লাঙল চালিয়ে ভূমি চাষ করা সম্ভব ছিল না। মাটির উপরেই গাছ কাটা হলেও মাটির নীচের গাছে বড়-ছোট নানান আয়তনের অগণিত গুঁড়ি মাটির গভীরে প্রোথিত অবস্থায় থেকে যায়। মাটির নীচের গাছের গুঁড়িকে স্থানীয় ভাষায় "মুড়া" বলে থাকে। খোন্তা, শাবল, কোদাল, কুড়ুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে অসংখ্য গুঁড়ি তুলে না ফেলা পর্যন্ত জমিতে গরু বা মোষ দিয়ে লাঙল চালিয়ে চাষ করা যেত না। যারা মাটির নীচের এই গাছের মুড়া তুলেছে এবং চাষাবাদ করেছে তাদের প্রাচীনত্ব বুঝাতে বলা হত 'মুড়াকাটি প্রজা'। একদিকে যেমন মুড়া উৎপাটনের কাজ চলতে থাকল, তেমনই অপরদিকে মানুষের পদযুগল ও কোদাল দিয়ে কাদা ও পলিমাটি চট্‌কিয়ে বৃষ্টির জলের সাহায্যে হাত দিয়ে ধানের বীজ ছিটিয়ে বোনা হতে লাগল। এইভাবেই সর্বত্র অতি আদিম প্রথায় সুন্দরবনের সর্বত্র চাষের কাজ শুরু হয়েছিল। বনকাটার পর্বে রাঁচী, হাজারিবাগ, মানভূমি, সিংভূম জেলার আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ করা হত। "আড়কাঠির" সাহায্যে জমি লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসা হত। এই আদিবাসী শ্রমিকেরা খুব পরিশ্রমী এবং কঠোর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ওই সময়ে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহু শ্রমিক মারাও গিয়েছে। তাছাড়া বাঘের ও কুমিরের খাদ্যও ওই শ্রমিকরা হয়েছে। কিন্তু এই শ্রমিকদের জমি দেওয়া হয়নি। কারণ তখন জমির দাম ও চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং রায়তী বন্দোবস্তের জমির মূল্য, নজরানা, খাজনা এই দরিদ্র শ্রমিকদের পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিল না। যারা টাকা দিতে পেরেছে, টাকা দিয়ে জমি কিনতে পেরেছে তারাই জমি পেয়েছে। যে দরিদ্র শ্রমিকরা সাপের কামড়ে এবং বাঘের ও কুমিরের পেটে গিয়েছে তাদের বংশধরেরা জমি না পেয়ে অর্ধহারী শ্রমিক হিসাবেই রয়ে গেল। সুন্দরবনের আবাদের প্রথম দিকের জীবনযাত্রা ছিল এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। পানীয় জল, চাল, ডাল সবই বড় বড় নৌকা করে ক্যানিং, সোনারপুর, বসিরহাট থেকে আবাদ অঞ্চলে নিয়ে যেতে হত। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে যেমন চাষ হত তেমনই বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা পানীয় হিসাবে তা রান্নার কাজে ব্যবহার করা হত। কোনও কোনও সময় লোনা জলও পান করতে হত। বর্ষা অথবা কালবৈশাখীর ঝড় থাকলে উত্তাল নদীপথে, ওই সকল খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল, বহু দূরবর্তী স্থান থেকে আনা যেত না। ফলে অখাদ্য, লোনা জল পান করতে হত। কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, বসন্ত এই সকল রোগ এক এক স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিত। মানুষ মারা যেত। চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। এ সকল খবর রাখার ব্যবস্থাও ছিল না। সুন্দরবনে নলকূপ হয়েছে ১৯৫০ সালের দিকে। এর পূর্বে বৃষ্টির জল এবং পুকুরের জলই মানুষের জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় ভরসা স্থল ছিল। সুতরাং, কলেরারূপী মহামারীর আগমন প্রতিবছর ব্যতিক্রমহীনভাবে সুন্দরবনের জনপদে ঘটত।

দেশীয় ধনী ব্যক্তি যাঁরা সুন্দরবনের এক বা একাধিক দ্বীপ আবাদ করে জনবসতি স্থাপন করে জমিদারি শুরু করেন তারা প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতিতেই নিজ নিজ এলাকায় প্রজা পত্তন, জমির রায়তী ব্যবস্থা, খাজনা বা রাজস্ব আদায় প্রভৃতি করতেন। এই ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নায়েব, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ, লোক-লাঠিয়াল প্রভৃতির নিয়োগ করা হত। জমিদারি এলাকায় অধিকাংশ জমিদারই বসবাস করত না। বছরে একবার হয়তো জমিদারিতে পদার্পণ করত। তারা জেলা শহরেই অথবা কলকাতায় বসবাস করত। বিনা শ্রমের অর্থে বিলাসের প্রাচুর্যে ও আলস্যের মধ্যে জীবনযাপন করত। জমিদারির আয় থেকে কৃষির উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করা হত না। এর ফলে প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বাধিকারী, জোতদার, ধনীকৃষক ও সুদখোর দাদনী মহাজন কৃষকদের সর্বনাশ শুরু করল। সুতরাং, বাংলার সর্বত্র (সুন্দরবনসহ) কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু হল। খাদ্য উৎপাদন বাড়ল না, জনসংখ্যা বাড়ল। কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে জমি বন্ধক রাখতে শুরু করল। জমি কৃষকের হাতছাড়া হতে শুরু করল। খাদ্য সংকট, আর্থিক সংকট গভীরতর হল। দেশীয় জমিদারী ব্যবস্থায় ব্যতিক্রমহীনভাবে চক্রাকারে এই অবস্থা চলতেই থাকল ততদিনই যতদিন না এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ হল।

সুন্দরবনে স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন্ হ্যামিল্টন যে তিনটি দ্বীপ আবাদ করার জন্য লিজ নিয়েছিলেন তার অভ্যন্তরে জমি বিলি বণ্টন প্রজাপত্তন ইত্যাদির সঙ্গে দেশীয় জমিদারীর ব্যবস্থার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই তিনটি দ্বীপ হল গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া। এই তিনটি দ্বীপের অবস্থান পূর্বে ছিল সন্দেশখালি থানার এলাকাধীন। অধুনা থানা ভাগ হয়ে গোসাবা থানা হল। ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের জমিদারীর মধ্যে মধ্যস্বত্বাধিকারী সৃষ্টি করা হয়নি। গ্রামীণ দাদনী মহাজনী ব্যবস্থা রাখা হয়নি। জমি বাঁধা বন্ধক নেওয়া অথবা অন্যান্য কোনও প্রকার সুদ গ্রহণ করে ব্যবসা করার সুযোগ রাখা হয়নি। মাদকদ্রব্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ ছিল। মাদকদ্রব্য সেবন করা অপরাধ বলে গণ্য করা হত। জমিতে প্রজা বা রায়তী জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এইরূপ যে বেশি সদস্যবিশিষ্ট যৌথ কৃষক পরিবার একশত বিঘার বেশি কৃষি ও অকৃষি জমির রায়তী পাট্টা পাবে না। একশত বিঘা জমিই রায়তের জমির সর্বোচ্চ সীমা ছিল। সর্বনিম্ন রায়তী জমির পরিমাণ পনেরো বিঘা ছিল। এই নিয়মেই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বিঘা জমির রায়তী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। আরও প্রায় ত্রিশ হাজার বিঘা জমি হ্যামিল্টন জমিদারের খাস চাষের জমি যা 'কৃষিমজুর' দিয়ে চাষ করানো হত। এই কৃষি মজুররা অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ভাগচাষীই ছিল। (পরবর্তী সময়ে আর এস পি পরিচালিত কৃষক আন্দোলনে ভাগচাষী হিসাবে প্রমাণিত হয়) অবশিষ্ট পনেরো হাজার বিঘাজমি নদীবাঁধ খাল, নালা, রাস্তা, জমির আলপথ, মৎস্যচাষ, বন, হাট-বাজার ইত্যাদি অকৃষি জমি ছিল। জমিদার ও প্রজার মধ্যে অন্য কোনও স্বত্বভোগী সম্প্রদায় থাকবে না—এটাই ইংরেজ জমিদারির বিশেষত্ব (অবশ্য খাস ইংল্যান্ডে)।

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন জমিদারির প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ সরবরাহ করার জন্য সমবায় সমিতি ছিল।
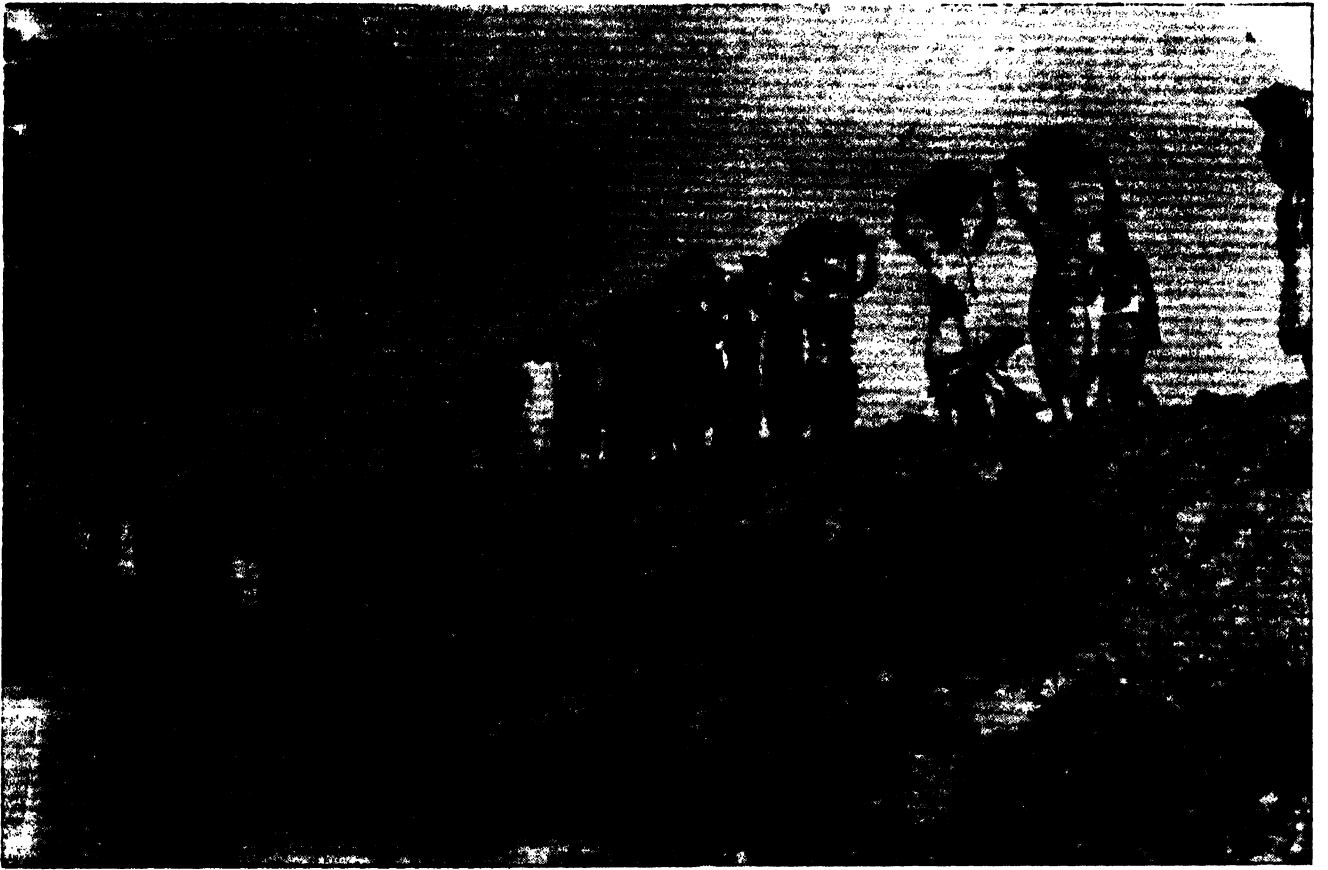
বিগত বছরগুলিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে

অভাবের সময় কৃষকদের খাদ্য সরবরাহের জন্য সমবায় ধর্মগোলায় ধান মজুত থাকত। জমিদারি প্রধান কার্যালয় গোসাবা বাজারে অবস্থিত ছিল। গ্রামীণ প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণের টাকা সরবরাহ ও বিধিমতে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গোসাবাতে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল। কৃষকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত ধান ক্রয় করার জন্য সমবায় রাইস মিল ছিল। ন্যায্যমূ[illegible] নিত্যপ্র[illegible]নীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করার জন্য বিশাল সমবা[illegible]র [illegible] এই ভাণ্ডারের শাখা প্রত্যেক এলাকায় ছিল।

শিক্ষাব্যবস্থার জন্য [illegible]ক [illegible] একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৬/৭টি গ্রাম নিয়ে এক[illegible] [illegible] (৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) এবং গোসাবাতে একটি অবৈত[illegible] [illegible]জি বিদ্যালয় এবং ৪/৫ টি ছাত্রাবাস ছিল। ওই ৪/৫[illegible] [illegible] ১০০ ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্র মাসিক এক টাকার [illegible]য়ে [illegible]ছর দুইবেলা সাহায্য পেত। তাছাড়া এই জমিদারির শি[illegible] কৃ[illegible]দের বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের জন্য Institute of Inde[illegible]n[illegible]ood নামে স্বনিযুক্তির জন্য নানান ধরনের কাজ শে[illegible] [illegible] ছিল।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য[illegible] এব[illegible]য় জল সরবরাহের সুব্যবস্থা ছিল। একজন বিশেষজ্ঞ [illegible]প্যা[illegible] [illegible]ৎসক এই ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এখানে আয়ো[illegible] [illegible]বেধক উভয় প্রকার চিকিৎসা হত। সেই সময় নলকূল [illegible]। [illegible] জল সরবরাহের জন্য প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে বৃহৎ [illegible]কৎ [illegible] ছিল। নিয়মিত সেই পুকুরের জল ঔষধ দিয়ে পরিশোধন করা হত এবং একজন পাহারাদার সর্বক্ষণ পুকুর পাহারা দিত। জমিদারির আয় জমিদারিতে ব্যয় করতে হবে— এটাই ছিল নীতি। সংক্ষেপে এই ছিল স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিল্টনের জমিদারির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা। এটা ছিল ইংরেজদের দেশের নিয়মে পরিচালিত জমিদারি। এর বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন করাই তখন সম্ভব ছিল না। এই ব্যবস্থা দেখার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালে ৩০-৩১ ডিসেম্বর গোসাবা গিয়েছিলেন ড্যানিয়েলের আমন্ত্রণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতে যে ধনবাদী সংকট সৃষ্টি করে তার ফলে অনেক কিছুরই উথাল-পাথাল হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে বাংলার যুদ্ধের দরুন ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দেয় যার ফলে ৩০/৩৫ লাখ মানুষ খেতে না পেয়ে রোগে ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই মন্বন্তর ভারতের সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত করেছে তেমনই কৃষকদের দুর্দশাকে অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই সময়েই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বের সূচনা হয়। এই পর্বের নাম "ভারত ছাড়ো আন্দোলন"। এই দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদানীন্তন ইংরেজ সরকার ফ্লাউড্ কমিশন নামে এক কমিশন নিয়োগ করে। ওই কমিশন দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে জমিদারিব্যবস্থা, মহাজনীঋণ এবং যে কৃষক ফসল ফলায় তার উপর বহু রকমের শোষণ চালু থাকা, কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা না থাকা এবং অনগ্রসর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে দায়ি করেছে। ওই কমিশন কৃষকদের উপর থেকে সর্বপ্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থা উচ্ছেদ
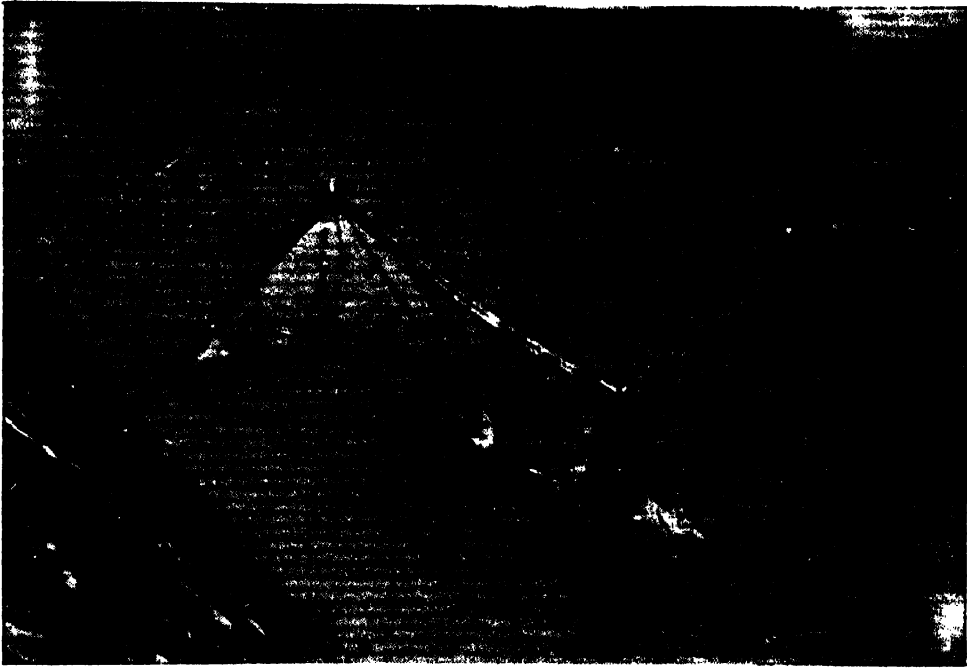
সুন্দরবনের নদীতে চিংড়ির পোনা ধরে সাধারণ মানুষের সচ্ছলতা এসেছে

করার সুপারিশ করেছিল। ইংরেজ রাজত্বে ওই সুপারিশ আর কার্যকর করার সময় হয়নি।

ভারত স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে জমিদারি উচ্ছেদ, কৃষকের হাতে জমি বণ্টনের দাবি এবং ভাগচাষী বা আঁধিয়ার জমিতে চাষের অধিকার এক ফসলের চারভাগের তিনভাগের অর্থাৎ 'তেভাগা' দাবিতে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে ভাগচাষীদের জন্য বর্গাদার অর্ডিন্যান্স জারী করতে হয় এবং পরবর্তীকালে ওই বিষয়ে স্থায়ী আইন পাশ করতে হয়। পশ্চিমবাংলায় এই 'তেভাগা' ফসলের দাবির আন্দোলন দরিদ্র কৃষকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এই আন্দোলন কেবল ফসলের তিনভাগ পাওয়ার আন্দোলনই ছিল না। এই আন্দোলনের সঙ্গে দরিদ্র কৃষকের ঋণমুক্তির প্রশ্নও জড়িত ছিল। এই আন্দোলনের ফলে কৃষক উৎপন্ন ফসলের তিনভাগ পেল। জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ হল। ঋণের ফাঁস থেকে মুক্তি পেল। নানান রকম বেগার খাটার হাত থেকে অব্যাহতি পেল। কৃষক শতাব্দীব্যাপী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘুম ভেঙে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস পেল। ষাট বছর পূর্বে এই আন্দোলন হলেও তেভাগা আইনের প্রয়োগ নিয়ে আরও ১০-১২ বছর আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল। কৃষকের স্বার্থে আইন পাশ হলেও জমিদার-জোতদার এবং কায়েমী স্বার্থের রক্ষক আমলাতন্ত্র এই আইনের প্রয়োগের পথে প্রবল বাধা দিত। আজ যে কৃষক জাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনা সুন্দরবনের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় তার ফলশ্রুতি বিধানসভার ও লোকসভার নির্বাচনে বামপন্থীদের পক্ষেই দেখা যায়। এই আন্দোলন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সুন্দরবনের প্রতিগ্রামে "তেভাগা" আন্দোলন ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বহু বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মি ও দরিদ্র কৃষকদের আত্মত্যাগ, আত্মবলিদানের মাধ্যমে আন্দোলন তীব্রতম হয় এবং কৃষকদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।

এই আন্দোলনে যাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাদের মধ্যে ছিলেন তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত নেতা ভবানী সেন, আবদুল্লা রসুল, প্রভাস রায়, রাসবিহারী ঘোষ, নিত্যানন্দ চৌধুরী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। আর জীবিতদের মধ্যে উল্লেখ্য কংসারী হালদার, বিনয় চৌধুরী, মনোরঞ্জন শূর, হেমন্ত ঘোষাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ঠিক ওই সময়েই আর এস্ পি দলের নেতৃত্বে গোসাবার স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন্ জমিদারিতে 'তেভাগার' দাবিতে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। আর-এস-পি কর্মি ও নেতারা সন্দেশখালি, ক্যানিং, জয়নগর থানা এলাকায় তেভাগা কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। আর এস্ পি সংগঠকদের মধ্যে প্রয়াত অরিন্দম নাথ, সেবক দাস, গজেন মাইতি, অচিন্ত্য প্রধান, রামকৃষ্ণ পাঠক, ধনঞ্জয় বর্মন, ধনঞ্জয় নায়েক প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য। আর এস পি-র প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক মাখন পাল, বর্তমান রাজ্য সম্পাদক নিখিল দাস এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ও লোকসভা সদস্য প্রয়াত ননী ভট্টাচার্য এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত ছিলেন।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় বারের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার সময়ে প্রাক্তন ভূমিরাজস্বমন্ত্রী এবং প্রয়াত কৃষক ও সি পি আই এম নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের আহ্বানে যে কৃষক আন্দোলন হয় তার ফলে বহু বেনামি লুকানো জমি কৃষকরা দখল করে নেয়। সুন্দরবনে জোতদার-জমিদারদের বেনাম ও বাড়তি জমি ছিল, তা কৃষকদের অধিকারে আসে। সুন্দরবনের কৃষক একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল। ধনী জোতদারদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ক্ষীণতর হয়ে গেল।

এখন যে আধুনিক সুন্দরবনের লোকালয়, জনপদ আমরা সচরাচর দেখি ৩০/৩৫ বছর পূর্বের ছবির সঙ্গে তা মিলবে না। গত

২০/২৫ বছরের মধ্যে সমগ্র সুন্দরবনের জনবসতি এলাকার প্রায় সর্বত্র কোথাও পিচ রাস্তা, কোথাও ইট বিছানো রাস্তা, কোথাও কংক্রিটের রাস্তা নির্মিত হয়েছে। দ্বীপগুলি একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হয়েছে। রাস্তায় সরকারি, বেসরকারি বাস চলছে, অটোরিকশা, সাইকেল রিকশায় মানুষের যাতায়াতের গতি সঞ্চার করেছে। জলপথে যাতায়াতের জন্য অসংখ্য যন্ত্রচালিত নৌকায় পরিবহনের ব্যবস্থা হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পরিষেবা সীমিত হলেও বহু গ্রামে, ব্লকে তা প্রসারিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে। কলেরা, বসন্তসহ অন্যান্য মহামারী মারাত্মক রোগের আক্রমণ বন্ধ হয়েছে।

সুন্দরবনের সামগ্রিক আর্থিক উন্নয়নের এবং বৃহত্তর উন্নয়নের পরিকাঠামো নির্মাণে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সংগঠন এবং সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড বিশ বছর ধরে কাজ করার ফলে বর্তমান সুন্দরবনের আর্থিক বিকাশ ঘটেছে—একথা কোনপ্রকার বিতর্কের অবকাশ না রেখেই বলা যায়। সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড বড় বড় খাল খনন, জলনিকাশি স্লুইস গেট নির্মাণ, বহু কংক্রীট জেটি নির্মাণ ইট বিছানো রাস্তা, মজা নদীগুলির মধ্যে লোনাজলের প্লাবন বন্ধ করে বৃষ্টির জল ধরে রেখে চাষাবাদ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ফলে এক ফসলি স্থানে আরো একটি ফসল উৎপাদন করার সুযোগ কৃষকরা পাচ্ছে। একথা মনে রাখা দরকার সুন্দরবনের ভৌগোলিক দুর্গমতা ও উন্নয়নের কাজকে দুরূহ করে তোলে। গত কুড়ি বছরে সুন্দরবনের অভাবিত উন্নয়ন হয়েছে যা প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রধানত এক ফসলি দেশ—সুন্দরবনের মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস জমি বছরে একবার ফসল চাষ করা, বনে মধু সংগ্রহ করা, কাঠ কাটা, নদীতে মাছ ধরা, ফিসারি করা এবং সামান্য দোকানপাট ব্যবসা করা। দারিদ্র ছিল, বেকারি ছিল এখনও দারিদ্র ও বেকারি আছে। চেষ্টা হচ্ছে এগুলি দূর করার জন্য। কিন্তু গত ১৫/১৬ বছর পূর্বে একটি আপতিক ঘটনা বিদেশের বাজারে বাগদা চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের জীবনে উথাল-পাথাল ঢেউ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সমুদ্র থেকে নদী স্রোতে বাগদা চিংড়ির পোনা ভেসে লোকালয়ের মধ্যে প্রবহমান নদীতে চলে আসে। ওই বাগদা চিংড়ির পোনা নাইলনের মশারির কাপড় দিয়ে ধরে ফিসারির এজেন্টদের কাছে বিক্রয় করা হয়। প্রকৃতির এই বাগদা চিংড়ির অফুরন্ত ভাণ্ডার গত ১৫/১৬ বছর ধরে সুন্দরবনের প্রায় ৬০/৭০ ভাগ দরিদ্র মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে কোনও কোনও সময় প্রতি পরিবারের দৈনিক আয় ১০০/১৫০ টাকা হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে নদীর প্রতি কিলোমিটারে ৩০০/৪০০ আবাল-বৃদ্ধবনিতা চিংড়ির পোনা ধরার কাজে লেগে আছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আর্থিক দৈন্য সাময়িকভাবে হলেও দূর হয়েছে। তাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারছে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, আর্থিক বিষয়ে নিজস্ব মতপ্রকাশ করতে পারছে।

তবু পরিশেষে একটা কথা বলতেই হল যে আর্থিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের প্রসার ও অগ্রগতি হলেও জনজীবনের সর্বত্র কুসংস্কার, সদাচার ও সুস্থ সংস্কৃতির উন্মেষ কাম্যরূপে ঘটেনি। বরং শহরাঞ্চলের নগর জীবনের অবক্ষয়জনিত পাপাচার, স্বার্থপরতা, দুর্নীতি হিংসা অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতোই সুন্দরবনের মানুষের সহজ-সরল জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। তার ফলে তাদের নাগরিক চেতনা ও মানবিক বিকাশের পথে এক জটিল বাধার সৃষ্টি হয়েছে। আশা করব আগামী দিনে সুন্দরবনের অধিবাসীদের মধ্যে সদাচার ও নব-মানবিকতার উদ্বোধন হবে। যাঁরা সমাজ উন্নয়নের কাজে ব্রতী, তাঁরা এই নব-মানবিক চেতনা ও সদাচার সৃষ্টির কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগী হবেন।

তথ্যসূত্র—

(১) District Census Hand Book of 1951 by Sri A. Mitra I.C.S.

(২) পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত বাংলার ভ্রমণ ১ম খণ্ড।

(৩) ডঃ দীনেশ চন্দ্র [illegible] বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

(৪) ১৯৬১ সালে [illegible] প্রকাশিত ব্রজ মিত্র লিখিত প্রবন্ধ।

(৫) Bengal Distr[illegible] S.S.O. Malley.

(৬) 'আদিগঙ্গা নদী' [illegible] প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫১।

(৭) 'পৌণ্ড্রবর্ধন ও [illegible] দত্ত, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা।

(৮) Inscriptions [illegible] III, Page 57 By Mr. N.G. Majum[illegible]

(৯) শ্রীচৈতন্যভাগব[illegible]

(১০) বঙ্গীয় সাহিত্য [illegible] ১৩৫৫ সালের ১ম, সংখ্যা।

(১১) Statistical A[illegible] Vol. I.

(১২) Hunters Stat[illegible] Ac[illegible] Bengal Vol. I & II.

(১৩) শ্রীচৈতন্যভাগব[illegible] খণ্ড [illegible] অধ্যায়।

(১৪) বাংলার ইতিহা[illegible] খণ্ড [illegible]দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৫) বিপ্রদাস চক্রবর্তির "মনসার ভাসান" ছাপা হয় নাই। এর দুখানি পুরাতন নকল বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। উক্ত পুঁথির বিশদ বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৪৩ সনের ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

(১৬) বরাহপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩০ অধ্যায়।

(১৭) ১৫০৯ খ্রীঃ উৎকলরাজ প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে গৌড় সুলতান হুসেন শাহের যে যুদ্ধ হয় সেই সময়ের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে।

(১৮) Varendra Research Society, Monographs, No. 3. Page 1-2.

(১৯) Statistical Account of Bengal, W.W. Hunter Vol. I, Page 235.

(২০) বাল্মীকি রামায়ণ।

(২১) ব্যাসদেব রচিত মহাভারতের অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ (গদ্য)

(২২) Essays on Religion of Hindus (1882) Vol. I. H.H.Wilson.

(২৩) রায়মঙ্গল, কৃষ্ণরাম রায়।

লেখক পরিচিতি : অশোক চৌ[illegible] [illegible]সভা সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এবং জেলা পরিষদ সদস্য

কুমুদরঞ্জন নস্কর
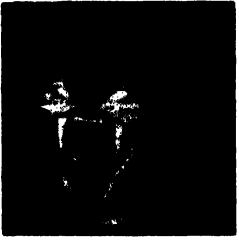
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি

ভূমিকা ঃ

সুন্দরবনের প্রসঙ্গ, প্রকৃতি ও পরিচিতি নিয়ে ইদানীং প্রায় সর্বত্র আলোচনা শোনা যায়। সুন্দরবনের বাঘ ও বাগদা চিংড়ি কিংবা মাছ-কাঁকড়া ও মধুর গৌরব এবং খ্যাতি সারা বাংলাতো বটেই ভারতের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া শীতকালে সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়া—বিশাল নদী ও ঘনজঙ্গলের দেশ, বাঘ-কুমির সাপ-হাঙর-কামট-নৌকাডুবি ও জলদস্যু ইত্যাদি নানান রটনা এবং ঘটনাও বটে।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ, উর্বর কৃষিজমি, মাছ ও চিংড়ি চাষের ভেড়ী ইত্যাদি বৈচিত্র্যে ভরা; বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ-ম্যান্গ্রোভ ও কতসব রং বে-রঙের পাখি, জন্তু জানোয়ার ও প্রাণীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র এই সুন্দরবন। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিশাল ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তর ও বিখ্যাত লবণাম্বু বৃক্ষের (Halophyte) অরণ্য সুন্দরবন। এই লবণাম্বু উদ্ভিদের বনকেই 'ম্যানগ্রোভ' (Mangrove) বা স্থানীয় ভাষায় 'বাদাবন' বলা হয়। সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল উভয়েই বৈচিত্র্যময়, যদিও কয়েক'শ বছর আগের সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সঙ্গে এখনকার সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের অনেক প্রভেদ। বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি সে সময়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের দিব্যি মানিয়ে নিলেও পরবর্তীকালে তারা লোপ পেয়ে গেছে। এখন তাদের আদিম অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ তাদের কঙ্কাল বা অস্থি। বুনো মহিষ, ব্রহ্মদেশীয় গণ্ডার, স্বর্ণমৃগ, বিশালকায় মানুষ-খেকো কুমীর আজ আর সুন্দরবনে নেই, সুন্দরীবৃক্ষ (হেরিটিয়েরা ফোমিস) বা গড়িয়া (ক্যাণ্ডেলিয়া ক্যান্ডেল) উদ্ভিদও আজ সুন্দরবনে বিরল। পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের গভীর বনরাজি বিগত দুই শতকে প্রায় অর্ধেকে পরিণত হয়েছে। কারণ মানুষের হস্তক্ষেপ।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অপরূপ সৌন্দর্য—সমুদ্র মোহনার শতাধিক ব-দ্বীপ অঞ্চল; আর সদা বয়ে যাওয়া নদীর জোয়ার ভাঁটির টান—তার সাথে সাথে প্রাকৃতিক নিয়মে মাঝে মধ্যে জোরে বয়ে আসা বা ধেয়ে যাওয়া সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণী ঝড় কোন নতুন ঘটনা নয়; যাকে আবার অনেকাংশে প্রশমিত বা সীমিত করে ঘন এই ম্যানগ্রোভ বন; রক্ষা পায় গ্রামগঞ্জের ঘন লোকবসতি, কৃষিক্ষেত্র ও গৃহপালিত জীবজন্তু।

বাঘের মানুষ মারা, গ্রামে গঞ্জে প্রায় বা মাঝেমধ্যে বাঘের আনাগোনা, নদীনালায় মাছ চিংড়ী, কাঁকড়া ধরার সময় কুমীর, কামট ও হাঙরের শিকার হওয়া, বিষাক্ত সাপের দংশনে প্রাণনাশ, কিংবা নৌকাডুবিতে মরা অথবা মুক্তিপণের জন্য গরীব সুন্দরবনের জেলে-কাঠুরে—মৌলেসের জলদস্যুর হাতে ধরা পড়ার-কথা সুন্দরবন ও শহর কলকাতার মানুষের আজ আর অজানা নয়।

এক ফসলি বর্ষা নির্ভর কৃষি কর্ম, সেচের জলের অপ্রাচুর্যতা ও অভাব, কলকারখানার বা কুটির শিল্পের অনুপস্থিতি, অসহায় দ্রুত তালে বেড়ে যাওয়া বর্তমান সুন্দরবনের প্রায় ৪০ লক্ষ সমস্যা জর্জরিত জনগণের অনেককেই অহরহ হাতছানি দিয়ে টানে বা আকর্ষণ করে বিপদসংকুল শার্দুল কুমীর ও বিষধর সাপের প্রতিপত্তিতে খ্যাত এই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গল; প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ কাঠ ও জলের সম্পদ মাছ-চিংড়ি কাঁকড়া সংগ্রহ করার ও

গত দু'শত বছরে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দু-তিন দশক হতে ব্যাপক বনসংস্কার করার জন্য দেশীয় ও বিদেশীর প্রায় ১৪৪ জন জমিদারকে সুন্দরবনের জঙ্গল পাট্টা দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। আর এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫% বা অর্ধেকের বেশী ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস ও সংকোচন করা হয়। আর এত সব ধ্বংস হওয়ার পর গত প্রায় দু-তিন দশক যাবৎ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের গুরুত্ব পাচ্ছে সরকারী ও নানান বেসরকারী-সংস্থায়। কারণ, ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব আজ সবাই জেনেছেন কিন্তু বর্তমানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নদীনালায় নিত্যনূতন পলি জমা, বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের ভারসাম্য আর বজায় থাকছে না।

জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ

রুজিরোজগারের তাগিদে বাঘের পেটে যাওয়া, নৌকাডুবির কিংবা কুমীরের আক্রমণে মারা যাওয়া পিতার সন্তানকে-রুটির তাগিদে দুঃখ ভুলতে বাধ্য হতে হয়; —আবার তাকে ছুটতে হয় এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের ও নদীর প্রাকৃতিক সম্পদের খোঁজে। এর পিছনে যেমন থাকে পেটের তাগিদ, তার সাথে সাথে মহাজনের ঋণের টাকা শোধ দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস। জেলে- কাঠুরে-মৌলে-বাউলে বনে গেলে এদের হতভাগী স্ত্রীরা সদাচিন্তায় নিয়ম নিষ্ঠা মেনে সিন্দুর না পরে, চুল না বেঁধে, শোবার ঘরে দরজা বন্ধ না করে, নানান সংস্কার মেনে অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে স্বামীর নিরাপদে ফেরার অপেক্ষায়; অনাহারে বা অর্ধাহারে কোলে অভুক্ত সন্তান-সন্ততি নিয়ে ঘরের মানুষ ফেরার অপেক্ষায়, ফিরলে শান্তি। সুন্দরবনের যত্রতত্র বেড়ে চলে বিধবাপল্লীর সীমানা।
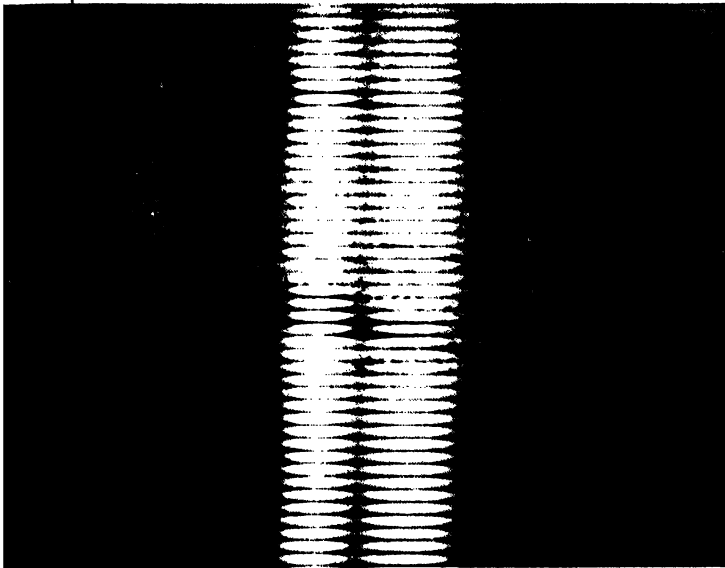
না আছে ভাল রাস্তাঘাট, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, ডাক্তার-বদ্যি, ঔষধ, ইস্কুল-পাঠশালা ও আনন্দ বিনোদনের সুব্যবস্থা। তবু বেড়ে চলে দ্রুত তালে জনস্রোত। আধুনিক সভ্যতার দান কণামাত্র ভোগ করার সুযোগ মেলে না সুন্দরবনবাসির। সংস্কার ও সংস্কৃতি এখানে বিচিত্র, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান একই দেবি—বনবিবি, মা মনসা, চণ্ডী, নারায়ণী বা দেব—দক্ষিণরায়, কালুরায়, গাজীসাহেব, পীরসাহেবকে পূজা করে বা হাজত দেয়।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ—তার রক্ষণাবেক্ষণ বা সুষ্ঠ ব্যবহার, সংরক্ষণ কিংবা স্থায়ীত্ব বজায় রাখার প্রয়াস তেমন ভাবে দেখা যায়নি—চলছিল গতানুগতিক ব্যাবস্থাপনা। মাঝে মধ্যে শোনা যেত বাঁধ ভেঙে গ্রামেগঞ্জে নোনাজল ঢোকা, নিত্য নতুন বন কেটে বসতি স্থাপন করা, কৃষি জমি ও মাছ চাষের ভেড়ি বানানোর ও সরকারের ঔদ্যাসীন্যতার কথা।

মাত্র সত্তর দশকের কথা—সুন্দরবনে এল নানান বিবর্তন; দেশী নৌকায় বসানো হল ইঞ্জিন—যুগ এল ভট্‌ভটির, নদীনালায় বাড়ল গতি। গ্রামেগঞ্জে তৈরী হল নিদেন পক্ষে ইটের রাস্তা (ক্রমান্বয়ে বাড়ল ভ্যান রিক্সা। আজ একমাত্র হাঁটা সম্বল ক'রে সুন্দরবনের মানুষকে আর গ্রাম হতে গ্রামান্তরের উদ্দেশ্য বের হতে হয়না। যথেষ্ট না হলেও গড়ে উঠেছে ইস্কুল, বাজারহাট, ছোটখাটো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, অফিস আদালত, পানীয় জলের ব্যবস্থা, আর জেনেরেটর চালিয়ে বিদ্যুতের আলো ও ভিডিও পারলার। একদিনে শহর কলকাতায় গিয়ে সন্ধ্যার পরেই আবার গ্রামে ফেরা এখন সম্ভব—যা ছিল সুন্দরবনে এক সময় স্বপ্ন, তা এখন বাস্তবায়িত। যদিও এসব প্রয়োজনের তুলনায় এখনও অনেক পিছিয়ে (মানচিত্র-১)।

১৯৭৩ সালে গঠিত হল 'সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, আর এই পর্ষদের দায়িত্বের মধ্যে ন্যস্ত হলো রাস্তাঘাট বানানো, যান-চলাচলের, কৃষিকর্মে, মাছচাষে, পানীয় জল সরবরাহে, মজা পুকুর, খালবিল

সংস্কারে, ছোটখাটো সেতু বানানোয়, জেঠিঘাট বানানোয়, সমাজ-ভিত্তিক বনসৃজনে, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের ও রক্ষণাবেক্ষনের।

আবার ১৯৭৩ সালের ২৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সহয়তায় ও পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মাতলা নদীর পূর্বে ২৫৮৫.১০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে ঘোষণা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। এই ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত ১৩৩০.১০ বর্গ কিলোমিটার ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে ৪ মে ১৯৮৪ খ্রীঃ জাতীয় অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয় (সারণি-১, সারণি-২ এবং সারণি-৩)। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি বনাঞ্চলের ৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার, হ্যালিডে দ্বীপের ৫.৯৫ বর্গ কি.মি. (ব্যাঘ্র প্রকল্প বহির্ভুত অঞ্চলে) এবং লোথিয়ান দ্বীপের ৩৮.০০ বর্গ কি.মি. অঞ্চলে (ব্যাঘ্য প্রকল্প বহির্ভুত অঞ্চল) বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় ১৯৭৬ খ্রীঃ জুন মাসে: এবং ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত ৮৯২.৬০ বর্গ কি. মি. বাফার অঞ্চল হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল ১৯৭৩ খ্রীঃ (সারণি-৪ ও সারনি-৫)। এই বাফার অঞ্চলে বন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে ও নির্ধারিত কর প্রদান করে স্থানীয় মানুষের মাছ ধরা, কাঠ কাটা, মধু ভাঙা এবং বেড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু চোরাচালানী ও শিকারীদের হাতে এই বন ও বনসম্পদ ধ্বংসে করার ক্রিয়াকর্ম আজও যথেষ্ট ভাবে বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের সচেনতা ও এই বনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর গুরুত্ব সর্বস্তরে উপলব্ধি করা হয়েছে।

১৯৭৬ খ্রীঃ, মোহনার কুমীর প্রজাতির (*Crocodilus porosus*) দ্রুত অবলুপ্তি বা হ্রাস লক্ষ্য করে আন্তর্জাতিক সহায়তায় পাথরপ্রতিমা অঞ্চলের ভগবতপুর গ্রামে গড়ে তোলা হয় সুন্দরবন কুমির প্রকল্প। এই কুমির প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন্ ও বনাঞ্চল থেকে কুমীরের ডিম সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা
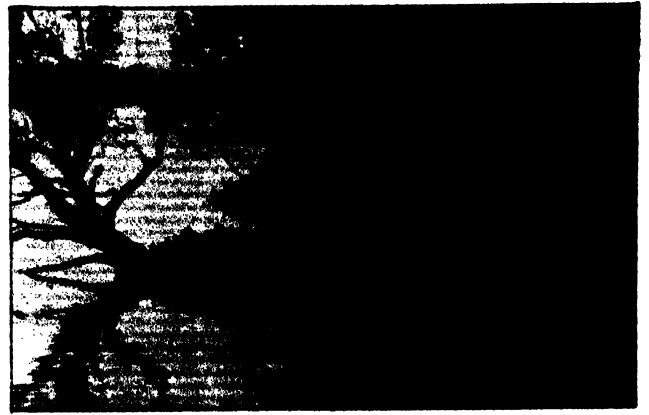
সুন্দরবন অরণ্যের ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের মূল, ছবি : অঞ্জন খান

তৈরী করে, তাদের লালনপালন করে সুন্দরবনের নদীনালায় ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয়। নদীনালার সর্বোচ্চ এই খাদক কুমির প্রজাতি কামট, হাঙর, আড়মাছ, কান মাগুর, পাঙাস ও অন্যান্য মানুষের খাবার অন-উপযোগী মাছ ও প্রাণীকে খেয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে; ফলে নদীনালায় মানুষের প্রয়োজনীয় উপযোগী মাছ-চিংড়ি ও কাঁকড়ার উপস্থিতি বজায় থাকে।

সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চলের (২৫৮৫.১০ বর্গ কি.মি.) ব্যাতিরেকে প্রায় ১৬৮১.৫০ বর্গ কি.মি. অঞ্চল, যা বিদ্যা ও মাতলা নদীর পশ্চিম তীর হতে সপ্তমুখী ও বড়তলা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত করে সংরক্ষিত বন হিসাবে রক্ষণাবেক্ষন করার ব্যবস্থা করা হয়। এই অঞ্চলের ৩৮.০ বর্গ কিমি. বনাঞ্চল লোথিয়ান দ্বীপে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয় 'ম্যানগ্রোভ জিন কেন্দ্র' (Mangrove Gene Centre).

সমগ্র সুন্দরবনের বনাঞ্চল সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৩টি ব্লক অঞ্চল ও উত্তর ২৪ পরগণার ৬টি ব্লক অঞ্চল ঘিরে মোট ৯৬৩০

জঙ্গলের অভ্যন্তরে খালে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে বাগদার মীন ধরছেন ধীবরেরা ছবি : হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল
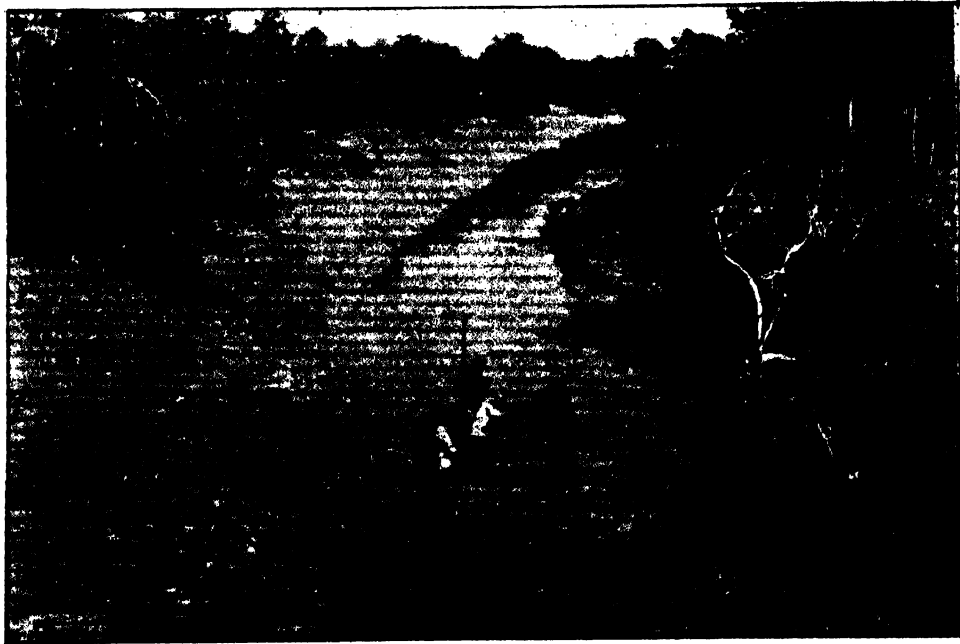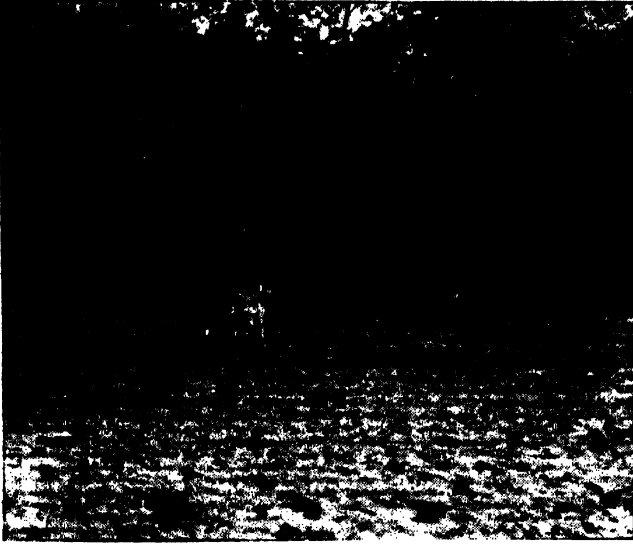
সুন্দরবন অরণ্যে হরিণের বিচরণক্ষেত্র

বর্গ কি.মি. অঞ্চলকে ১৯৮৯ সালে ঘোষণা করা হয় "সুন্দরবন জীব মণ্ডল" (Sundarbans Biosphere Reserve); এরফলে সর্বপ্রকার জীবকুলকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় (মানচিত্র-১)।

এছাড়া সুন্দরবনাঞ্চলের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (Central Soil Salinity Research Station, Canning) লবন জলে মৎস্য চাষও প্রসারের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়। Brackishwater Fisheries Research Station Kakdwip; আর আছে ব্যারাকপুরের মৎস্য প্রগ্রহণ গবেষণা সংস্থার মোহনা শাখা (Estuarine Division); কাকদ্বীপের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, নিমপীঠের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, লবন হ্রদের মৃত্তিকা অনুসন্ধান গবেষণা কেন্দ্র (Central Soil Survey and Land Use Planning), ন্যাশন্যাল ফেলোর গবেষণামূলক সুন্দরবন প্রকল্প। এই সমস্ত উপযোগী গবেষণা ক্রিয়াকর্মে অর্থ সহায়তা করে চলেছে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (I.C.A.R.)। ভারতীয় উদ্ভিদ নিরীক্ষণ বিভাগ (Botanical Survey of India), ভারতীয় প্রাণী নিরীক্ষণ বিভাগ (Zoological Survey of India) ভারতীয় নৃবিদ্যাগত নিরীক্ষণ সং... ও ... বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার—অথবা বেসর... সং... গবেষকরা সুন্দরবনের নানান প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য উদ্ভি... ...মানবসভ্যতা কিংবা সর্বোপরী বাস্তুতন্ত্র নিয়ে নানান ... গবেষণায় যুক্ত। সুন্দরবনের বহু বেসরকারী সংস্থা (N...) ...নিমপীঠের রামকৃষ্ণ আশ্রম, রাঙাবেলিয়ার টেগর ... ডেভেলপমেন্ট, ক্যালকাটা ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি, ... দেবী চৌধুরাণী সামুদ্রিক জীব গবেষণা কেন্দ্র, নরে... মিশন আশ্রম, গোসাবার রূপায়ণ সংস্থা, ক্যানিং ... সংস্থা ও আরো নানান সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান সুন্দরব... সেবা কর্ম ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সচেতনতা জাগরণের ... আছে।

কিন্তু সুন্দরবন ... সমস্যায় জর্জরিত। সুন্দরবনের সুস্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক স... সংরক্ষনের অন্তরালে লিপ্ত আছে কলকাতার সমস্যা সম... ও ...কাতার পরিবেশের ভারসাম্যের সমস্যার রক্ষা, প্রাকৃ... ...তাতে রক্ষা হওয়ায় সমস্যা। কলকাতার বাজারে মাছ, চিংড়ি, কাকঁড়া, দুধ, মধু, মোম, কাঠ, চাল, শাকসব্জী যেমন সুন্দরবন হতে যোগান হয়, তার সাথে সাথে কলকাতা হতে দুষিত আবর্জনা মেশান জল সুন্দরবনের নদীনালা ও ম্যানগ্রোভ অরণ্যশোধন করার গুরুদায়িত্বও পালন করে চলেছে। সুন্দরবনের ৩৫-৪০ লক্ষ জনগণ যদি কোন প্রাকৃতিক কারণে, বা সমুদ্রপৃষ্টের জলস্তরের উত্থানের ফলে বাস্তুহারা হয় তবে তাদের আশ্রয় হবে কলকাতা শহরতলীর রাস্তাঘাট ও রেললাইনের ধারে ফাঁকা যায়গা। ফলে সমস্যাবহুল কলকাতার দুর্দশার অন্ত থাকবে না। ফলে সুন্দরবনের সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি—যদিও এই সমস্যা অতি গভীরে।

সুন্দরবনের ভৌগলিক অবস্থান নদী-নালা ও বিবর্তন :

কর্কটক্রান্তির সামান্য দক্ষিণে ২১°৩৫'—২২°৩০' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°১০'—৮৯°৫১' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন অবস্থিত। এই নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল পশ্চিমবাংলার দক্ষিণে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ও উত্তর ২৪ পরগণার যথাক্রমে-১৩টি ও ৬টি ব্লক অঞ্চল এবং জোয়ার-ভাঁটা দ্বারা সদাপ্লাবিত শতাধিক দ্বীপ-অঞ্চল নিয়ে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল গঠিত। ডায়মন্ডহারবারের কিছু দক্ষিণে কুলপী হতে একটি আনুমানিক সরলরেখা বরাবর উত্তর-পূর্বের বসিরহাট পর্যন্ত কল্পনা করলে এবং এই কাল্পনিক সরলরেখার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেই ভারতীয় সুন্দরবন অঞ্চল। ব্রিটিশ সরকারের দুই জন জরিপবিদ, যাঁরা সুন্দরবন জরিপ করেছিলেন তাঁদের নাম অনুসারে ওই সরলরেখাকে "ড্যাম্পিয়র ও হোজেস (১৮৩১) লাইন" বলা হয়। বর্তমান সমগ্র ভারতীয় এই সুন্দরবন অঞ্চল ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার (মানচিত্র-১)।

গঙ্গার মোহনায়, বঙ্গোপসাগরের কোলে, হিমালয় ও ছোটনাগপুর পর্বতমালা হতে বয়ে আসা নুড়ি, পলি, কাদা, মাটি জমে গড়ে উঠেছিল এই সুন্দরবন অঞ্চল, তা প্রায় ৬-৭ হাজার বছর পূর্বে। গঙ্গামোহনার এই ব-দ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই অঞ্চল, যা গত ৩০০ বছর যাবৎ ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপে ও পরিকল্পনামাফিক বনসংস্কার শুরু হয়েছিল। সে সময় প্রকৃতি পরিবেশের সংরক্ষন বা তার ধংসের কুফল মানুষের কাছে তেমন গুরুত্ব পায়নি—তখন প্রয়োজন ছিল আরো কৃষি জমির সম্প্রসারণ, আরো মাছচাষের ভেড়ি বানানো, লবণ কারখানা বানানো বা কাঠের জোগান মেটানো; ফলে গত দু'শত বছরে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দু-তিন দশক হতে ব্যাপক বনসংস্কার করার জন্য দেশীয় ও বিদেশীর প্রায় ১৪৪ জন জমিদারকে সুন্দরবনের জঙ্গল পাট্টা দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। আর এ পর্যন্ত প্রায় ৫৫% বা অর্ধেকের বেশী ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংসে ও সংকোচন করা হয়। আর এত সব ধ্বংস হওয়ার পর গত প্রায় দু-তিন দশক যাবৎ সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের গুরুত্ব পাচ্ছে সরকারী ও নানান বেসরকারী-সংস্থায়। কারণ, ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব আজ সবাই জেনেছেন কিন্তু বর্তমানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি, নদীনালায় নিত্যনূতন পলি জমা, বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত উদ্‌বাস্তু আগমনে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের ভারসাম্য আর বজায় থাকছে না। ১৯৫১ খ্রীঃ আদমশুমারী (Census) অনুযায়ী সুন্দরবনের ১২ লক্ষ জনসংখ্যা ১৯৯১ খ্রীঃ প্রায় ৩২ লক্ষে এবং বর্তমানে আনুমানিক ৪০ লক্ষে পৌঁছে গেছে। এক ফসলী বর্ষানির্ভর জমির উপর নির্ভর করে এই সদাবৃদ্ধি জনস্রোত ঠেকানো যাচ্ছে না—বাড়ছে বনের উপর ব্যাপক

হস্তক্ষেপ। অরণ্য সম্পদ যেমন—কাঠ ও জলসম্পদ-মাছ চিংড়ি ও কাঁকড়ার উপর ব্যাপক হস্তক্ষেপ ও ধ্বংস লীলা। তার সাথে সাথে শুরু হয়েছে বন হাসিল করে চিংড়ি ও মাছ চাষের ভেড়ি বানানো ও লক্ষাধিক মানুষের বাগদা চিংড়ির মীন সংগ্রহ করার মারাত্মক ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ড।

নদীনালায় সমৃদ্ধ সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলি সুন্দরবনের উত্তর অঞ্চল থেকে দক্ষিণে বয়ে গিয়েছে; প্রধানত নয়টি নদী, যথা—মাতলা, বিদ্যা, ইছামতি, রায়মঙ্গল, হেড়ভাঙ্গা, ঠাকুরান, গোসাবা, সপ্তমুখী, বারাতলা বা হুগলীর মোহনা। সুন্দরবনের পূর্বে হরিণভাঙা বা হেড়ভাঙা নদী বা, প্রকৃতপক্ষে উত্তর হতে ইছামতি, ও রায়মঙ্গল নামে এবং দক্ষিণে হেড়ভাঙ্গা নামে বঙ্গোপোসাগরে মিশেছে। এই নদীগুলি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার সুন্দরবনকে পৃথক করে রেখেছে। তারপরে পশ্চিমদিকে পরপর, যথাক্রমে গোসাবা, মাতলা, ঠাকুররান বা যামিরা সপ্তমুখী, বারাতলা ও হুগলীর মোহনা, আরও প্রায় ২১টি ছোট শাখা নদী ও অসংখ্য সুতিখাল বা খাড়ি সমস্ত স্থানটিতে জালিকার মত ছড়িয়ে আছে। সমগ্র সুন্দরবনের ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতায় মোটামুটি ভাবে ৩-৮ মিটার এবং এই অঞ্চলে জোয়ার ভাটার ওঠা নামা ৫-৬ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা যায়; প্রধানত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কোটালে এবং বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে জোয়ারের জল ৭-৮ মিটার পর্যন্ত উঠতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৭৩৭ খ্রীঃ সুন্দরবনে জলোচ্ছাসের সময় সমুদ্রের জল প্রায় ৪১ ফুট উঁচু হয়ে সমগ্র অঞ্চল প্লাবিত করেছিল এবং তার সাথে সাথে ছিল ভূমিকম্প এবং ২৫০ কি.মি. প্রতি ঘন্টায় বেগে ঘূর্ণিঝড়। মাঝে মধ্যে এত ব্যাপক না হলেও বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি ও জীবননাশের-নজির বিরল নয় (সারণি ৭)। সুন্দরবনের এই ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য বা বন প্রাকৃতিক এইসব বিপর্যয় ও সংকটের হাত হতে সুন্দরবনকে বহুক্ষেত্রে বাঁচাতে সক্ষম। কিন্তু ব্যাপক বন সংস্কার করায় ও নদীনালাগুলো অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বেঁধে ফেলার ফলে ধীরে ধীরে মজে যাওয়ায়—সুন্দরবনের নদীগুলি দিন দিন নাব্যতা হারাচ্ছে; আর নদীর জলপূর্ণ জোয়ারের সময় নদীবাঁধ উপছে বা ছাপিয়ে মাঝে মধ্যে গ্রামে গঞ্জে, কৃষিক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছে, জীবনহানি ঘটছে; —এসব হলো সুন্দরবনের সবসময়ের সমস্যা।

মাতলানদী সুন্দরবনের তৃতীয় বৃহৎ নদী হিসাবে গন্য হতো। পূর্বে মাতলানদী বিস্তৃতি, আকারে ও স্রোতে ছিল ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহও বটে। মাতালরূপী, তাই এই নদী মাতলা। বড়বড় সমুদ্রগামী জাহাজও এই মাতলানদী দিয়ে অবলীলাক্রমে পোর্টক্যানিংয়ে যাতায়াত করতে পারত; আর ব্রিটিশ সরকার তখন ক্যানিংয়ে পোর্ট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে মাতলানদীর বুকে চর পড়ায় ভাঁটার সময় ছোট দেশী নৌকাও চলাচলে অক্ষম। ক্যানিংয়ে মাতলানদী আজ অবলীলাক্রমে মানুষে হেঁটে পার হয়। মাতলাসহ অন্যান্য নদীগুলি মজে যাওয়ার প্রধান কারণ নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে কাত হয়ে যাওয়া (Neo-tectonic movement এবং Tilting Effect) এবং প্রধান নদীগুলি যথা-গঙ্গা ও পদ্মার সাথে সুন্দরবনের অধিকাংশ নদীনালার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া। বর্তমান সুন্দরবনের নদীগুলির যে সমস্ত বাঁধ আছে তা প্রায় ৩৫০০ কি.মি. দৈর্ঘ্য; এই সমস্ত বাঁধগুলির অধিকাংশই সুন্দরবনের জমিদাররা তৈরী করেছিল। বর্তমানে এসব বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সেচ দপ্তরের হাতে ন্যস্ত। সুন্দরবনের নদীবাঁধের ভাঙন বর্ষাকালে প্রায়ই ঘটে থাকে, তার প্রধান কারণ এইসব নদীগুলির নাব্যতা হ্রাস হওয়া, নদীবক্ষে পলি জমা, নদীর বাঁধের ভিতর চিংড়ি মাছের মীন ধরায় এবং অনেক সময় নদীর বাঁধ মেরামতের কাজে গাফিলতি ও সময় মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। ফলে বহুক্ষেত্রে মানুষের অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে যখন মাঝে মধ্যে নদী-বাঁধ ভাঙে।

সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৬০০-২০০০ মি.মি., গড় উচ্চ তাপমাত্রা এখানে প্রায় ৩২°-৩৫° সেলসিয়াস এবং নিম্ন তাপমাত্রার গড় ১২°-১৩° সেলসিয়াস। বায়ুর গড় আদ্রতা সাধারণত বেশি থাকে এবং বায়ু প্রবাহও ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন রকম লক্ষ্য করা যায়। বর্ষাকাল সাধারণত জুন মাসের মাঝামাঝি হতে শুরু করে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত, প্রায় চারমাস কাল ব্যাপি। এই সময় মোট বর্ষার ৮০% ঘটে থাকে। বাকি ৮ মাস মাত্র মোট বর্ষার ২০% হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে কালবৈশাখী এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ঘূর্ণি ঝড়ের প্রকপ সুন্দরবনের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (সারণি ৭)।

সুন্দরবনের ভূমির উৎপত্তির ইতিহাস ও তার বিবর্তন :

অনুমান করা যায়, প্রায় ৭ হাজার বছর আগে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের তলায় নিমজ্জিত ছিল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দ্বারা হিমালয় ও ছোটনাগপুর পর্বতমালা থেকে বাহিত পলি ও কাদামাটি বঙ্গোপসাগরের নোনা জলের সংস্পর্শে এসে জমে জমে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের অসংখ্য ব-দ্বীপ অঞ্চল ও তার মাঝে মাঝে সৃষ্ট হয়েছে ছোট-বড় নদী ও সুতি খাল। সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ ও অন্যান্য অঞ্চলের ৩০০ মিটার গভীরতায় নল কূপ খনন করে ছোটনাগপুরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লাল মাটি ও পাথরের টুকরো পাওয়া গেছে (মাইতি, ১৯৭৫)। এমন কি কলকাতার মাটির নিচ থেকেও অনেক সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল ও উদ্ভিদের নিদর্শন পাওয়া গেছে (ঘোষ, ১৯৪৪)। হিমালয় ও তার পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ পরিবর্তনশীল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিম-দক্ষিণ স্থানসকল আজও নির্মীয়মাণ (Orogenic phase) অবস্থায় আছে (দেব, ১৯৫৬)। গঙ্গা ও তার অন্যান্য শাখা-প্রশাখা নদী অধিক মাত্রায় পলি বহনের জন্য বর্তমানে গঙ্গানদীর স্রোতের পরিবর্তন হয়ে বাংলাদেশের পদ্মানদীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে (ব্লাজো, ১৯৭৫)। গুপ্ত (১৯৫৭) লিখেছিলেন ১৪শ শতাব্দীতে গঙ্গানদীর মূল স্রোত গাঙ্গেয় উপত্যকার পশ্চিমাংশ দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এবং প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায়, প্রাচীন 'তাম্রলিপ্ত' সমুদ্র বন্দর (বর্তমান তমলুক) গঙ্গার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত ছিল। নদীবাহিত বিপুল পরিমাণ পলিমাটির জন্যই সুন্দরবন অঞ্চলে নতুন নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হচ্ছে। হেড়োভাঙ্গা নদীর বুকে গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাশা ও বাংলাদেশের তালপাট্টি —এমনই দুটি নতুন দ্বীপ। এখানকার নদীগুলির পরিবর্তনও সদানিয়ত হয়ে চলেছে আজও; সুন্দরবন অঞ্চল সদা পরিবর্তনশীল।

ঘন বন, জল বা বাতাস মাটি ক্ষয়ের পরিপন্থী। কিন্তু মানুষের বেহিসেবি কাজের ফলে বনের ব্যাপ্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। রাও (১৯৫৯) লিখেছেন গত কয়েক দশকের মধ্যে সুন্দরবনের বনাঞ্চল প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। ব্যানার্জি (১৯৬৪) বর্ণনা করেছেন গত ৬৩

বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের মোট ৫৬৫ বর্গ কি.মি. ঘন বন সংস্কার করে লোকবসতি গড়ে উঠেছে। রাও (১৯৫৯) লিখেছেন গত ১০০ বছরে সুন্দরবনের ১,২৮০-১,৫৪০ বর্গ কি.মি. ঘন বন সংস্কার করে কৃষিক্ষেত্র ও লোকবসতি সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া হাজার হাজার বর্গ কি.মি. বনভূমি সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছে। বকখালির সমুদ্র সৈকতে গেলে দেখা যায় এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত অসংখ্য গাছের গুঁড়ি ও গাছের নিম্ন অংশ আজও বালির ওপর সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে আছে।

কোন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করতে হলে কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ও সংস্কার অপরিহার্য, কিন্তু বনভূমিরও প্রয়োজন সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীগণ সাবধান করেছেন যে এইরূপে অপরিণত বনাঞ্চল ধ্বংস হতে থাকলে আশু বিপদের সম্মুখীন হতে হবে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটবে। সুন্দরবন অঞ্চলে বন সংস্কার ও তা কৃষিক্ষেত্রে বা মাছচাষের ভেড়ীতে পরিবর্তন কতকগুলি ধাপে ঘটে থাকে।

গভীর বনাঞ্চলকে সংস্কার করে ও নদীনালাগুলি উঁচু মাটির বাঁধ দিয়ে ঘিরে জোয়ারের জল ওঠা নামা বন্ধ করে দিয়ে, অপরপক্ষে বৃষ্টির জল দ্বারা বারে বারে ধৌত করে নিয়ে সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলকে ঘন বনাঞ্চল থেকে ধান চাষযোগ্য কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং আজ সেখানে চাষবাস ও ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে (সারণি-৬)। প্রাকৃতিক কারণে বন যেখানে ধ্বংস হচ্ছে বা ঘন বনের মধ্যে বড় বড় গাছ কেটে নেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মরুভূমির মত বালুকাতে ঢাকা হয়ে শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে। বিশেষত সমুদ্র-তীরভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদ কুল ও পরিবেশ আধা মরুঅঞ্চলের সামিল। সুন্দরবনের এই অবক্ষয় লক্ষ্য করে সরকার এখন বন সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। সারণি-৬ এ, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন সংস্কার করে যে সব লোকালয় গড়ে উঠেছে তা দেখান হল।

সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মানবসভ্যতার বির্বতন :

প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা মনে করে বর্তমান সুন্দরবনের আদি নাম ছিল 'গঙ্গারাষ্ট্র' বা 'গঙ্গারিডি'। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও আমরা গঙ্গারিডির নাম জানতে পারি। এই গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী ছিল 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গেরেজিয়া' এবং এই রাজ্য ছিল ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে। তৎকালীন এই [illegible] ছিল [illegible] এক শ্রেষ্ঠ সমুদ্র বন্দর। অনুমান করা হয় মহা[illegible] মাটির তলায় সেই প্রাচীন পুরাকীর্তির কিছুটা ঢাকা [illegible] সমুদ্র ও নদী তরঙ্গের মধ্যে তার অধিকাংশ ধ্বংস [illegible]রবনের নানা স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুরাকী[illegible] উজ্জ্বল কাহিনীর সন্ধান বহন করে চলেছে। [illegible] বালান্দা নামক এক প্রাচীন পুরাকীর্তির সন্ধান পাও[illegible]নেক ঐতিহাসিক মনে করেন প্রাচীন বালান্দার এই [illegible] সভ্যতার সমসাময়িক, কি তারও প্রাচীন। হাড়োয়া[illegible] সংগ্রহশালায় বালান্দার সেই পুরাকীর্তির নিদর্শন সয[illegible]

বারুইপুরে, সুন্দর[illegible] হতে সংগৃহীত নানান পুরাকীর্তি 'সুন্দরবন সং[illegible]' [illegible] রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১১৬ নং লাটে[illegible] তীরে ১৮৬৮ খ্রীঃ বর্তমানের জটারদেউল নামে বিচিত্র [illegible] মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়েছে।

তারপর ভিন্ন সময়ে সুন্দরবনের নানা স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে পাথরের তৈরী সূর্য-মূর্তি, মৌর্যযুগ হতে আরম্ভ করে পাল ও সেন আমলের মাতৃকা মূর্তি, শীলমোহর পট্টোলী, গুপ্ত মুদ্রা, পাতকুয়া, পাতলা ইটের তৈরী বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ; সাগরের মন্দিরতলায় মাটির নিচে চাপা থাকা মন্দির, অন্যত্র পাওয়া গেছে কারুকার্য মন্ডিত মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি, শিলনোড়া, অভিনব স্বর্ণবলয়, নানা ধরনের অলংকার, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, বিভিন্ন ধরনের স্বর্ণ খণ্ড, ক্ষুদ্রাকৃতি স্বর্ণ-ইট, পাথরের বা পিতলের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, কাঠের কাজ, নরনারীর কঙ্কাল, বন্যমহিষ-জাভাদেশীয় গন্ডার বড় তিমি মাছের কঙ্কাল ইত্যাদি, প্রাচীন সুন্দরবনের অন্যান্য অনেক ঘটনার নিদর্শন। এই সমস্ত নিদর্শন এক বা একাধিক সমৃদ্ধশালী জনপদের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এবং পূর্বে বনের অন্যান্য প্রাণীর উপস্থিতি সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করেছে।

এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল ব্যাপী ঘন জনবসতি ছিল এবং জলদস্যুদের আক্রমণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বারবার উত্থান পতন হয়েছে। এই জলদস্যুদের অত্যাচারের কাহিনীর শেষ নেই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রেনেলের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মগেদের অত্যাচারে সমগ্র সুন্দরবন জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে শাসন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। তখন মগ ও পর্তুগীজরা দক্ষিণবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে অবাধ হানা দিয়ে লুটতরাজ গৃহদাহ ইত্যাদি চালিয়ে যেত। তারা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রি করে দিত। এই জলদস্যুদের অত্যাচার দমনের জন্য মোগল রাজকুমার সুজা ও আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা পর্তুগীজদের বাংলাদেশ হতে তাড়িয়ে দিলে তারা সাগরদ্বীপ ও হিজলী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। তখন ভাগীরথী নদীর এই অংশের নাম ছিল 'দস্যু নদী'। ১৬৩২ সালে পর্তুগীজরা আরাকান রাজের সাহায্যে সাগর-দ্বীপে একটি দুর্গ নির্মাণ করে।

মধ্যযুগে এই অঞ্চল ছিল প্রবল প্রতাপশালী ভুঁএ্যা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত। পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য প্রতাপাদিত্যের নৌবহর আদি গঙ্গা, বিদ্যাধরী ও মাতলানদীতে টহল দিয়ে বেড়াত। জলদস্যুদের অত্যাচার বন্ধে ব্রিটিশ সরকার ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে চিংড়িখালির দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

১৭৫৮ সালে প্রকাশিত 'ইস্ট ইণ্ডিয়া ক্রনিক্যাল' থেকে জানা যায় যে, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মগ জলদস্যুরা সুন্দরবন অঞ্চল হতে ১৮০০ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে ধরে নিয়ে যায়, আরাকান রাজ তাদের এক চতুর্থাংশকে কারিগর রূপে নিয়োগ করে ও বাকিদের বাজারে পাঠিয়ে জনপ্রতি বিশ থেকে সত্তর টাকায় বিক্রি করে।

অতীতের সুন্দরবন একটি প্রায় অখণ্ড ভূখণ্ড ছিল, প্রাকৃতিক নাশ ও বিপর্যয়ে এবং বহু উত্থান পতনের ফলে ঐ অখণ্ড সুন্দরবন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে অসংখ্য দ্বীপমালায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানের সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, নামখানা, ঘোড়ামারা, ঘাসিমারা, লোহাচড়া একই ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল; ঐ সময় কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের মধ্যেকার 'বড়তলা' নদীর জন্ম হয়নি। সাগরদ্বীপের উত্তরে কালি জললের নিকট স্থানটি পূর্ব ও পশ্চিমের ভাঙনের ফলে ১৯০৩ সালে ঘোড়ামারা সাগর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমানে প্রায় তিন কিলোমিটার সরে গিয়েছে।

রঘুবংশে, মহাভারতে এবং পুরাণে গঙ্গা উপত্যকার এই অংশের বিবরণ আছে।

বিপ্রদাস (১৪৯৫) বর্ণনা করেছিলেন চাঁদ সদাগর আদিগঙ্গা দিয়ে ভাটপাড়া ও বারুইপুর হয়ে সাগরের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন।

কলিকাতার কথা আইন-ই আকবরীতে (১৫৮২) উল্লেখিত আছে এবং তাতে প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলা সাতগাঁও রেভিনিউ বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

ব্রিটিশ আমলে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিনম্যান হেঙ্কেল ১৭৮১ খৃঃ প্রথম সুন্দরবনে বনসংস্কার করে কৃষিপত্তনের ব্যাবস্থা করেন এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৭৮৫ খ্রীঃ ১৫০টি ইজারার ব্যাবস্থা করেন। সেই সময় হেঙ্কেল প্রথমেই নাবিক ও চাষীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য তিনটি ঘাঁটি পত্তন করেন সুন্দরবনের বুকে; সেই ঘাঁটিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল হিংঙ্গলগঞ্জ-হেঙ্কেলের নাম অনুসরণ করে।

১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহ ও তার পরবর্তী ঘটনাগুলি হল পর্যায়ক্রমে কৃষি ও কারিগরী ব্যবস্থায় ঐ অঞ্চল উন্নতি সাধন করে। এখানকার যোগাযোগ ব্যাবস্থা দ্রুত গড়ে ওঠে এবং জনবহুল স্থানে পরিণত করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ৪৪৪টি জমিদারী নিয়ে গড়া হয়েছিল ২৪ পরগনা জেলা, কিন্তু ১৮১৬ খ্রীঃ বর্ধমানের কিছু সংখ্যক জমিদারী ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত করায় মোট জমিদারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬৮টি। কিন্তু বর্ধমানের ঐ জমিদারীগুলি ১৮৬২ খ্রীঃ আবার বর্ধমানের অন্তর্গত করা হয়।

এই সময় অল্প কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণা জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—আলিপুর ও বারাসাত এবং দু'জন সতন্ত্র বিচারকের বা জেলা শাসকের অধীনে রাখা হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ ২৪ পরগনা জেলাকে ৮টি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) ডায়মন্ডহারবার, (২) বারুইপুর, (৩) আলিপুর, (৪) দমদম (৫) ব্যারাকপুর, (৬) বারাসাত, (৭) বসিরহাট (৮) সাতক্ষিরা। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীঃ সাতক্ষিরা মহকুমা ২৪ পরগনা জেলা থেকে পৃথক করে বাংলাদেশের খুলনাজেলার সাথে যুক্ত করা হয় এবং ১৮৮৩ খ্রীঃ বারুইপুর মহকুমা, ১৮৯৩ খ্রীঃ দমদম ও ব্যারাকপুর মহকুমা তুলে নেওয়া হয়। ব্যারাকপুর মহকুমা ১৯০৪ খ্রীঃ পুনরায় গঠন করা হয় এবং বারাসাত মহকুমা পূর্ববাংলা থেকে এনে ২৪ পরগনার অন্তর্গত করা হয়। তা ছাড়া কলকাতাকে আলাদা জেলা হিসাবে ২৪ পরগনা থেকে বের করে নেওয়া হয় ১৯০৩ খ্রীঃ।

শুধু নদীর গ্রাসে নয়, সমুদ্রের গ্রাসে সাগরদ্বীপের ইস্পুর, রাধাকান্তপুর, বিশালাক্ষীপুর, গঙ্গাসাগর আদিমেলাভূমি, শিকারপুর, দেবী মথুরাপুর, করালপাড়া, মৃত্যুঞ্জয় নগর ও চেমাগুড়ির গ্রামগুলির অনেক অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ও হচ্ছে এবং বিনষ্ট হয় প্রাচীন পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনগুলি।

বরেন্দ্র রিসার্চ 'সোসাইটির' প্রকাশিত এক মানচিত্রে দেখা যায় যে, আদিগঙ্গা, কালিঘাটের পাশ দিয়ে গড়িয়া, রাজপুর, হরিনাভি, বারুইপুর, দক্ষিণ বারাসাত, জয়নগর, মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, কাশিনগর, শিকারপুব খাল, চেমাগুড়ির খাল ও গঙ্গাসাগর খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়েছিল। ঐ সময় কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের মধ্যে বারাতলা বা বুড়িগঙ্গা নদীর জন্ম হয়নি। বর্তমানে সাগরদ্বীপ ও কাকদ্বীপের দক্ষিণ পূর্বে জম্বুদ্বীপের ও হেড়োভাঙ্গা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরের উপর পূর্বাশা দ্বীপের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি আজও হয়ে চলেছে; নদীর তীর ভূমির উত্থান-পতন ও নদীর গতির পরিবর্তন সদা সত্য ও চিরন্তন পদ্ধতি এই সুন্দরবনে (মানচিত্র-৫)।

এই গাঙ্গেয় উপত্যাকা বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত ও পরিচিত সুন্দরবন অঞ্চল। গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যাকার ঐ সমতল, সমুদ্রতট নিয়ে এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় সুন্দরবন বিরাজ করেছে, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে। এই স্থানকে হুগলী-পদ্মা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল, মোহনা বা ইসচুয়ারী (ESTUARY) বলা হয়। জল জঙ্গল ও হিংস্র জীব জন্তুর বন এই সুন্দরবন।

সর্বমোট ৫৬টি দ্বীপ নিয়ে কিংবা ১১৯টি বাঘ জঙ্গলের ছোট বড় দ্বীপ মিলিয়ে, ৩১টি নদনদী ও অজস্র সুতি খাল নিয়ে সমুদ্রের ফিকে গাঢ় নীল টইটুম্বর অরণ্যের রাজধানী সুন্দরবন। ৮০ হাটের দেশ এই সুন্দরবন, প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে ২২ জন ফকির এখানে জঙ্গল কেটে প্রথমে হাট-বাজার সৃষ্টি করেছিল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে উঠেছিল, এরকম ধারণা অনেকে পোষণ করেন।

বেদে এই নিম্নবঙ্গ উপত্যাকার কোন উল্লেখ না থাকলেও উপনিষদে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা আছে; পুরানেও এই নিম্নবঙ্গের কিছু নৃপতির কথা আছে। আর্যরা অনার্যদের অধিকাংশ সময়ে পরাজিত করলেও নিম্নবঙ্গের এই সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের সহজে পরাজিত বা বশীভূত করতে পারেনি। আর্যরা প্রথমে পাটলিপুত্রে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে নিয়ে পরে নিম্নবঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এর প্রধান কারণ স্বরূপ অনেকে মনে করেন যে আর্যরা নৌ-বিদ্যায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না। আর্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশ্ব আরোহণ করে যুদ্ধ করার কৌশল রপ্ত করায় বহু প্রাচীন ভারতীয় রাজা ও নৃপতি হস্তির পিঠে চেপে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছিলেন; কিন্তু নিম্নবঙ্গের এই নদীনালা দ্বারা পরিব্যাপ্ত স্থানে আর্যরা যুদ্ধে অশ্ব ব্যাবহার করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা নৌ-বিদ্যা রপ্ত করেছিলেন এবং দক্ষিণ বাংলার এই নদী-নালার দেশে তারা রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন।

মহাভারতের বন পর্বে নিম্নবঙ্গের উল্লেখ আছে; যুধিষ্ঠির কলিঙ্গ যাবার আগে ৫০০ নদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করেছিলেন। সম্ভবত সেই স্থান সাগর-সঙ্গম; ভীম যখন পূর্ব ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন সমুদ্র সেন, চন্দ্র সেন এবং তাম্রলিপ্তের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছিলেন তারা উভয়েই এই নিম্নবঙ্গের নৃপতি।

পানিনির লেখাতে আর্যদের রাজ্যের যে পশ্চিম সীমানা দেখানো আছে তাকে 'কলিকাবন' নামে উল্লেখ করা ছিল; এটাকেই বর্তমানে সুন্দরবন বলে অনেকে মনে করেন। বহু সাহিত্যিকদের লেখনী হতে একটি সিদ্ধান্তে অনেকে পৌঁছেছেন যে নিম্নবঙ্গে আর্যদের বহু পূর্বেই অনার্যরা বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরা হাতি ও নৌকায় চেপে যুদ্ধকৌশল রপ্ত করেছিলেন। এই সময় গ্রীক্ পরিব্রাজকরা এই অঞ্চলকে 'গঙ্গারিডি' নামকরণ করেছিলেন। গঙ্গা বন্দরের উল্লেখ প্যারিপ্লাসের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। এটি একটি সমৃদ্ধশালী বন্দর হিসাবে উল্লেখ আছে এবং অনুমান করা যায় সাগরদ্বীপের কাছে সেই বন্দর অবস্থিত ছিল; খ্রীষ্ট জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্বেও গঙ্গারীডির খ্যাতি এবং ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট রাজ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন ডিওডোবাস এবং সিকুলাস। প্রাচীন পর্যটকরা এই স্থানের

কোন নৃপতি বা রাজার নাম উল্লেখ না করায় অনুমান করা হয় যে, গঙ্গারীডির জনসাধারণ সম্ভবত ভোটের দ্বারা নেতা নির্বাচন করে থাকতেন এবং গণতন্ত্র মেনে চলতেন। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এমন কোন রাজ্য, রাজা বা প্রজাদের উল্লেখ না থাকায় নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন জাতি যথা-মোকোলিঙ্গি, কলিঙ্গি, মদ্গলিঙ্গি হতে বর্তমানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

বনসংস্কার ও সুন্দরবনের বর্তমান মানবসভ্যতা :

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭খ্রীঃ বাঙলার নবাবের কাছ থেকে সুন্দরবন, তথা ২৪-পরগণার জমিদারী স্বত্ব নিয়ে সুন্দরবন সংস্কারে মনযোগ দেয় এবং ক্লাউড রাসেলের তত্ত্বাবধানে ১৭৭০খ্রীঃ-র মধ্যে কৃষিজমি সংস্কার ও বনের কাঠ কেটে নেওয়ায় মননিবেশ করে। যশোর জেলায় জেলাশাসক মিঃ টিলম্যান হেঙ্কেল, গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে সুন্দরবন অঞ্চলে শান্তি স্থাপন এবং শাসন ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ২০শে ডিসেম্বর ১৭৮৩ খ্রীঃ প্রস্তাব দেন, এবং ওয়ারেন হেস্টিং ঐ প্রস্তাবে ১৭৮৪ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারীতে স্বীকৃতি দেন; এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ জন দেশী ও বিদেশী জমিদারকে সুন্দরবনের বনাঞ্চল সংস্কারের ঠিকা দেওয়া হয়। ঐ সময় মোট ৬৪,৯২৮ বিঘা জমির সংস্কারের অনুমতি দেওয়া হয় এবং শর্ত হয় যে—(১) কতকগুলি নির্দিষ্ট সীমানায় বন সংস্কার করা চলবে মাত্র। (২) এর জন্য প্রথম তিনবছর কোন খাজনার দিতে হবে না কিন্তু চতুর্থ বৎসর হতে প্রতি বিঘা জমির জন্য বছরে ২ আনা খাজনা লাগবে এবং পরবর্তী সময়ে ঐ খাজানার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। ৩রা এপ্রিল, ১৭৮৪ খ্রীঃ হেঙ্কেল সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারিণ করেন-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পশ্চিমে রায়মঙ্গল, উত্তরে দুল্যানপুর, কাগবীঘাট, চিংড়ি খালী, চাকীখাল, সারপাটালয়া, কাচুয়া, কালীজ্ঞা নদী, যুমনা নদী, কাবাদাক, মারজাটা, পাবডর, ধানখালী ও বালেশ্বর। হেঙ্কেল তাঁর রির্পোর্টে উল্লেখ করেছিলেন সুন্দরবনের নানান উপযোগিতার কথা; যথা—ইহা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে সমুদ্র ঝটিকা ও প্লাবন থেকে রক্ষা করবে, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করবে, নদীর মোহনায় নতুন দ্বীপ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে, নদীর স্রোতে ভূমিক্ষয় রক্ষা করবে এবং প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও গৃহস্থালী কাঠের যোগান দেবে।

পরে হেঙ্কেল সুন্দ[illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। তাঁর নির্দেশিত রায়মঙ্গল ও হ[illegible]টা [illegible] মধ্যে বনাঞ্চল কেটে প্রায় ৬৪,৯২৮ বিঘা কৃষি জমি [illegible]। কিন্তু তখন এই সব জমির সীমানা নিয়ে বিভিন্ন ঠি[illegible] বিবাদ শুরু হয়। হেঙ্কেলের প্রচেষ্টায় সুন্দরবনাঞ্চলে[illegible] ভাড়াকরা শ্রমিকদের সঙ্গে জমিদারদের "দাসের" ম[illegible] অনেকাংশে রোধ হয়। লবণ-কারখানায় স্থানীয় জনসা[illegible] করা ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত হতে বাঁচালেন হে[illegible] শ্রমিকদের শোষণ মুক্ত করতে তৎকালীন ব্রিটিশ গর্ভনর [illegible] কর্ণওয়ালিস দ্বারা কিছু আইন প্রণয়ন করিয়ে নিয়েছিলেন হে[illegible]

লেঃ ডবলিউ ই. ম[illegible] ১৮[illegible]১৮১৪ খ্রীঃ সুন্দরবনের হুগলী নদী থেকে পাণ্ডর নদী প[illegible] জরি[illegible] এবং তাঁর সেই জরিপের পূর্ণ সংস্কার করেন ১৮১[illegible] তাঁর [illegible] ক্যাপটেন হোজেজ মরিশন। কিন্তু তাঁরা পাণ্ডর নদীর [illegible] কোন [illegible]প করেননি—যদিও মাঙ্গলা হতে বালেশ্বর পর্যন্ত জলপথের উল্লেখ করেছিলেন। ১৮১৯ খ্রীঃ ক্যাপটেন রবাস্টোন, হুগলী নদী থেকে নোয়াখালির বামনি নদী পর্যন্ত প্রধান প্রধান জলাস্থানগুলি জরিপ করেছিলেন। হুগলী থেকে ঠাকুরাণ পযন্ত স্থানগুলি ১৮১৩-১৮১৪ খ্রীঃ লেঃ ব্লেন জরিপ করেছিলেন। এই সময়ে, ১৮১৬ খ্রীঃ ডি. স্কাণ্টকে নিয়োগ করা হয় সুন্দরবনের কমিশনার হিসাবে—এবং কালেক্টরের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাঁকে। তখন বন জরিপ করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রিলেপ-(১৮২২-১৮২৩ খ্রীঃ) জরিপ আরম্ভ করেন যমুনা নদী থেকে হুগলী নদী পর্যন্ত এবং সমগ্র গভীর বনাঞ্চলে। তিনি সুন্দরবনাঞ্চলকে বিভিন্ন ব্লক বা খণ্ডে ভাগ করেন এবং তার জন্য নির্দিষ্ট—নম্বর নির্ধারণ করেন। এটাই সুন্দরবনাঞ্চলে সর্ব প্রথম লট বা লাটনম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই সমস্ত লট বা লাট নম্বর নামে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল আজও পরিচিত আছে। ১৮২৯ খ্রীঃ হোজেস সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত করার জন্য জরিপ শুরু করেন এবং ডবলিউ. ই. মরিশনের (১৮১৪ খ্রীঃ) ম্যাপকে চিহ্নিত করা হয়। একাজ ১৮৩১ খ্রীঃ সম্পূর্ণ হয় এটি হোজেস ম্যাপ অফ সুন্দরবন (Hodge's Map of Sundarban) নামে খ্যাত।

এই অঞ্চলে জমির পরিমাণ মোট ৫১,৪৯,৮২০ বিঘা বা ৬,৮৬,৬৪৩ হেক্টের (৬৮৬৬.৪৩ বর্গ কি.মি.)। এই মানচিত্রে হুগলী হতে মেঘনা পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীরবর্তী স্থানের প্রায় ৫-৮ মাইল স্থান মেজর র‍্যানেলের (১৭৮৩-১৭৯৩ খ্রীঃ) মানচিত্র হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮২৯-১৮৩০ খ্রীঃ তখনকার কমিশনার ড্যাম্পিয়ার ও লেঃ হোজেস জরিপ করেছিলেন সুন্দরবনের সীমারেখা এবং তখন (১৮২২-১৮২৩ খ্রীঃ) মিঃ প্রিলেপের যমুনা-নদী পর্যন্ত সুন্দরবনের পূর্ব সীমানা স্থির করা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন লিয়েড ১৮৪০খ্রীঃ সুন্দরবনের সমুদ্রের দিকের বনাঞ্চল জরিপ করেন এবং ১৮৫০খ্রীঃ ক্যাপ্টেন স্মিথ দ্বিতীয়বার প্রিলেপ ও হোজেসের সীমারেখার পূর্ণ জরিপ করেছিলেন। তখন এই প্রিলেপ হোজেসের সীমারেখা সুন্দরবনের প্রকৃত সীমারেখায় চিহ্নিত হয়েছিল। এই সময় সুন্দরবন ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে সংস্কার করা হচ্ছিল; ১৮৩০-১৮৩১খ্রীঃ মধ্যে বন হাসিল করা মোট ৯৮টি লাট বেসরকারী মালিকানায় বিলি করা হয়। ১৮২৮খ্রীঃ ৩নং আইনে সরকার সমগ্র সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সম্পত্তিকে সরকারের নিজস্ব বলে ঘোষণা করে বলেন, এই জমি কখনই কোন জমিদারকে দেওয়া চলবে না। তবে সরকার মনে করলে এই বন সংস্কার করতে পারবে, চাষবাস করতে পারবে বা কাউকে পাট্টা দিতে পারবে। এই আইনে সুন্দরবনের বন সংস্কার বা সংরক্ষণ করা সরকার নিজের অধীনে রাখেন। ১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত ডাম্পিয়ার-হোজেস সীমারেখার দক্ষিণে ৭৯০৮ বর্গ কিমি অঞ্চলের ৩৭৩৪ বর্গ কিমি স্থানে বন কেটে চাষবাস ও বসবাস শুরু হয়েছিল। এই সীমারেখা সুন্দরবনের বনাঞ্চলের উত্তর সীমানা হিসাবে চিহ্নিত। এটিকে আবার দুটি আলাদা আলাদা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল, যেমন—সংস্কার করা লোকালয় এবং অবশিষ্ট বন-অধ্যুষিত অঞ্চল। এই সীমারেখা উত্তর-পূর্বে বসিরহাট থেকে আঁকাবাঁকা ভাবে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কুলপীর নিকট হুগলী নদীর তীর পর্যন্ত অবস্থিত। অন্য একটি হিসাবে (১৮৭২ খ্রীঃ) মোট কৃষিজমি ২৭৮৩ বর্গ কি.মি. নির্ধারিত হয়। এর $\frac{১}{৩}$ ভাগ ১৮৩০-১৮৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কার করা হয়। আবার ১৯০৪ খ্রীঃ এখানকার মোট ৫১৫৮ বর্গ কি.মি. স্থান লোকালয় হিসাবে গড়ে ওঠে। এই ৩০ বছরের হিসাবে সে সময়ে কি দ্রুতভাবে বন সংস্কার হয়েছিল তা দেখা যায়। ১৯৩৯ সালের জরিপে কিছু কিছু বনভূমি জমিদারদের

মধ্যে ৯৯ বছরের পাট্টায় বিতরণের ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথম নির্দিষ্ট আইনকানুন স্থির হয় ১৮৫৩ খ্রীঃ। যার ফলে নির্দিষ্ট করে জমির পাট্টা ব্যবস্থা নির্ধারণ করা এবং বন সংস্কার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এ সময়ে মোট ১৭৮টি পাট্টা ব্যবস্থার মধ্যে ৩০টি পেয়েছিল ইংরেজরা, একটি পেয়েছিল এক আমেরিকান, ২টি পেয়েছিল স্থানীয় খ্রিষ্টানরা, ৩০টি পেয়েছিল মুসলমানরা, আর ১০৫টি পেয়েছিল হিন্দুরা। এই গ্রাহকদের বলা হত লাটদার (Tenure Holder) অথবা মালিক। তারাও আবার চকদারদের, চকদারেরা আবার রায়তদারদের এবং রায়তদারেরা তাদের অধীনস্থ রায়তদারদের বিলি করতে পারত। ১৮৬৫ সালে এই জমি বেচাকেনা করার ব্যবস্থা হয়।

সুন্দরবন অঞ্চলের সর্বশেষ ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মানচিত্র স্টুয়ার্ট ১৯০৫-১৯০৮ খ্রীঃ সম্পূর্ণ করেছিলেন।

সুন্দরবন সংস্কারের প্রধান ভূমিকাগ্রহণকারীদের অন্যতম ২৪ পরগনার কালেক্টর মিঃ ট্রয়েড, ১৮১২ খ্রীঃ সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটি সৃষ্টি করে সাগরদ্বীপের উত্তর ও মধ্য অঞ্চল সংস্কার শুরু করেন। সাগরদ্বীপের মধ্য অঞ্চল আজও ট্রয়েডল্যান্ড নামে পরিচিত। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রীঃ এই ট্রয়েড কোম্পানি ধ্বংস হয়। পরবর্তীকালে অন্যেরা বন সংস্কার শুরু করলেও জুন ১৮৪২ খ্রীঃ, অক্টোবর ১৮৬৪ খ্রীঃ, নভেম্বর ১৮৬৭ খ্রীঃ বিভিন্ন প্রকার ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় এই অংশ সম্পূর্ণ সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। এই অঞ্চলকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে বাঁচানোর জন্য সাগরদ্বীপে ১৮৭৫ খ্রীঃ কতকগুলি উচ্চ বাঁধযুক্ত পুষ্করিণী খনন করা হয়। ঐ পুষ্করিণীর বাঁধে টাওয়ার হাউস তৈরী করা হয়, যেখানে প্লাবনের সময় সবাই আশ্রয় নিতে পারবে। সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রম ভারত বিখ্যাত। মকর সংক্রান্তিতে সাগরসঙ্গমে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্নান করেন। হিন্দুরা অনেক সময় এই সাগরসঙ্গমে সন্তান অথবা আত্মবিসর্জন দিতেন। কিন্তু মারকুইশ ওয়েলেসলি এই বর্বর প্রথা ১৮০২ খ্রীঃ আইন করে বন্ধ করেন। সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সুন্দরবনের

সুন্দরবনের জঙ্গলে বানরের অবাধ বিচরণ

গেঁওয়া গাছের জঙ্গল

বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের সুবিধার্থে নানাস্থানকে গড়ে তুলেছিলেন; যেমন মোরেলগঞ্জ, ক্যানিং, হিঙ্গলগঞ্জ; সুন্দরবন সংস্কার ইতিহাসের আরেক জন সাধুপুরুষ স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন। সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সুন্দরবনের উন্নয়নে তাঁর সমস্ত শক্তি ও অর্থ ব্যয় করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ তিনি গোসবা, রাঙ্গাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া দ্বীপ তিনটি সরকারের কাছে থেকে নিয়ে গোসবায় Estate স্থাপন করেন। এখানে তিনি সমবায় ক্রেডিট স্থাপন করে কৃষক ও স্থানীয় জনসাধারণকে ঋণ দিতে থাকেন; মহাজনদের হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজনে অসময়ে চাষীদের বা গরিব লোকদের খাদ্য শস্য ঋণও দিতেন। তিনি কিছু অবৈতনিক স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে সাধু হ্যামিলটনের কাছে এসেছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়ে খুব অল্প সংখ্যক সরকারী চাকুরে এই সুন্দরবনের প্রকৃত উন্নয়নের সঠিক চেষ্টা করেছিলেন। অধিকাংশ শাসকশ্রেণী, বনসম্পদ ধ্বংসে ও স্থানীয় বাসিন্দাদের শোষণে ব্যস্ত ছিলেন।

সুন্দরবনের বনাঞ্চল সংস্কার করার বিভিন্ন সময়কাল :

১৭৮০-১৮৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত হাসনাবাদ, হাড়োয়া, ভাঙড় এবং কুলপী অঞ্চলে বন সংস্কার করা হয়েছিল। এই সময়ে হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখাঁ, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর এবং সাগরের ব্যাপক অঞ্চলে বন সংস্কার করা হয়েছিল। ১৮০০-১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত বন সংস্কার করার কাজ প্রায় বন্ধই ছিল। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের উত্তর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাপক বন সংস্কারের কাজ চলেছিল ১৮৭৩-১৯৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত। সন্দেশখালির প্রায় সমগ্র ও কাকদ্বীপের সমগ্র এবং ক্যানিং, সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী, মথুরাপুর, কুলতলি, গোসাবা এবং হিঙ্গলগঞ্জের অবশিষ্ট বনাঞ্চল এই সময় সংস্কার করা হয়েছিল। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫০-১৯৭১খ্রীঃ পর্যন্ত হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা ও সাগরদ্বীপের কিছু কিছু স্থান যেখানে বন অবশিষ্ট ছিল সেখানেও সংস্কারের কাজ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯১১খ্রীঃ থেকে কোন জমির পাট্টা ব্যবস্থা দেওয়া হয়নি এবং সমগ্র
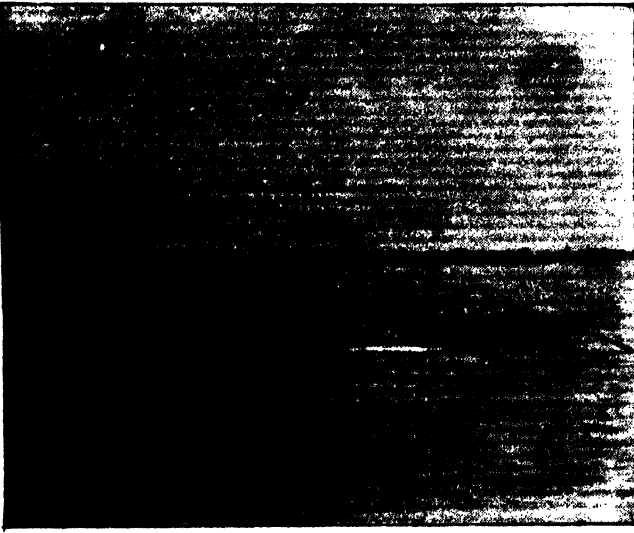
ছোটবড় সব নদীতেই মাছের সন্ধানে ধীবরের পাতা জাল

সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৬৩ খ্রীঃ বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ৫০০০ একর বনাঞ্চল হেড়োভাঙা ও ঝড়খালি অঞ্চলে সংস্কার করা হয়। ১৯৭৭-১৯৭৮ খ্রীঃ দণ্ডকারণ্য হতে ফিরে আসা বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরা জোর করে মরিচঝাঁপি অঞ্চলে আরবাসি ২-এর ব্যাঘ্র প্রকল্প (টাইগার প্রজেক্ট) সংরক্ষণ এলাকার বনাঞ্চল ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং বসতি স্থাপনের জন্য জোর করে কিছু বন কেটে ফেলে। কিন্তু জনগণের বিরূপ মন্তব্য উপেক্ষা করে, বনের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার পক্ষ হতে এই অনুপ্রবেশ ও বন সংস্কার বন্ধ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে মীরজাফরের কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭খ্রীঃ সুন্দরবনের বন সম্পদ সংগ্রহ ও এই অঞ্চলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করে; কিন্তু সে সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা এবং বিচ্ছিন্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলের অবস্থানের জন্য এইসব অঞ্চলে বসতির আগ্রহ জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি; বাঘ এবং কুমির এই সময়ে বনাঞ্চলে বসতি সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তখন যদিও কাঠুরে, জেলে, বাউলে সম্প্রদায়ের লোকেরা জীবিকার জন্য বনে সচরাচর যেত কিন্তু সেখানে বসবাস [illegible] সাহস তাদের হয়নি। তাছাড়া মিঠে জলের অভাব, অপ্রতিহত প্র[illegible] এবং কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত জমির অভা[illegible] বনাঞ্চলে বসতির বাধা হয়েছিল। কিন্তু বারংবার [illegible] জমিদার মহাজনের কাছে নিপীড়িত হয়ে এবং ক্ষুধ[illegible]র তাগিদে আশেপাশের জেলাগুলি থেকে নিম্নশ্রেণী[illegible] মানুষ এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা এইস[illegible] বসবাস শুরু করেছিল। এই সময় জমিদারেরা এবং [illegible] তাদের এই দুর্দশার সুযোগ নিয়ে, অল্প সুযোগসুবিধা দি[illegible]স করতে বাধ্য করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে [illegible]ক্ষিত বন ঘোষণা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে ব্যাপ[illegible]য়ে বর্তমান সুন্দরবন ব্যস্ত জনপদে রূপান্তরিত হয়ে[illegible]

আদিতে সুন্দরবনে[illegible]সব [illegible] নিম্ন সম্প্রদায়ের কিংবা আদিবাসী গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত [illegible] অনেকে কালক্রমে জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আদিতে তাদের যার যা জীবিকা ছিল তা থেকে গিয়েছিল। ক্রমান্বয়ে তারা তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সতন্ত্র এক সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়। আর্য বা মুসলমান সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল এই সংস্কৃতি। এই স্থানে আদিবাসী সম্প্রদায় ওঁরাও, মুন্ডা ও সাঁওতাল, মুসলমান বা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বন সংস্কার করার সময় শ্রমিকের কাজ করার জন্য পৌঁছেছিলেন এবং বহু শতাব্দী এক সাথে মিলেমিশে থাকার ফলে নতুন এক সংস্কৃতি সৃষ্টি করে যা প্রায় অন্যত্র বিরল। ক্রমশ তারা যুগ্মভাবে কোন কোন দেবদেবীকে পূজা করতে থাকে—তাদের রক্ষক বলে সুন্দরবনের প্রায় সকলেই জাতিধর্ম নির্বিশেষে বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবিকে কিংবা বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়-এর পূজা করে থাকেন। এটি এমনি একটি স্থান যেখানে ধর্মের বাধায় একে অন্যকে পৃথক করতে পারেনি। জমিদার, জমির মালিক কিংবা তাদের নির্দয় কর্মচারিবৃন্দ এই শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে করে অত্যন্ত জটিল ও পশ্চাদপদ এক সমাজ গড়ে তুলেছে। যারা বাঁচার তাগিদে, অন্নের তাগিদে দিনরাত খেটে চলেছে, বাঘ কুমিরের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে আর তাদেরই পরিশ্রমের মূল্য ভোগ করছে বুদ্ধিমান ধনী বা শোষক সম্প্রদায়। জমিদার প্রথার উচ্ছেদ হলেও এই প্রথার প্রচলন সুন্দরবন থেকে আজও মুছে যায়নি, সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ কষ্ট আজও প্রকট। সুন্দরবনের অধিকাংশ লোক পৌন্ড্র ও নমঃশুদ্র, এছাড়া মালো, বাগদী ও উড়িষ্যা হতে আসা কলিঙ্গ, মেদিনীপুর হতে আসা মাহিষ্য ও কৈবত সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানকার বাসিন্দা। সেই সময় এমন বহু নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকজন—মুসলমান শেখ সম্প্রদায়ে পরিবর্তিত হয়েছিল। আরাকান থেকে আসা মগ্ সম্প্রদায় সুন্দরবনের বহুস্থানে স্থায়ী বাসিন্দাদের সাথে মিশে গিয়েছে। বন সংস্কার করার কাজে যে সব সাঁওতাল, ভূমিজ, ওঁরাও বা মুন্ডা সম্প্রদায় রাঁচী, হাজারীবাগ, বীরভূম মানভূম, বাঁকুড়া এবং ওড়িশা থেকে আনা হয়েছিল, তারা এখানে মিলেমিশে স্থায়ী জনগণের সাথে একই সংস্কৃতির মানুষে পরিণত হয়েছে।

সুন্দরবনের সংস্কারের প্রাথমিক অবস্থায় বেশ কিছু কৃষক প্রতি বছর চাষের সময়, যথা—আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং ধান কাটার সময় যথা—পৌষ-মাঘ মাসে এখানে পর্যায়ক্রমে আসত এবং চাষের ফসল নিয়ে সুন্দরবনের উত্তর অঞ্চলে নিজ গৃহ চলে যেত। পরে অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। কৃষি শ্রমিকেরা প্রথমাবস্থায় এই রকম চাষের সময় এখানে আসতো এবং চাষের পরে তাদের দেশে ফিরে যেত—কিন্তু পরবর্তীকালে তারাও স্থায়ী বসবাস করতে শুরু করেছিল। এভাবে সুন্দরবনে একে একে গ্রামাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল।

এরূপ কষ্টকর ও ভয়ানক স্থানে এবং উপার্জনের অনিশ্চয়তা বর্তমান থাকায় একই পেশার মানুষ পাশাপাশি বসবাস শুরু করেছিল, যাতে একের আপদ-বিপদে অন্যে সহায়তা পেতে পারে।

নিম্ন আয়ের ও নিম্ন সম্প্রদায়ের এই সব নব প্রতিষ্ঠিত বাসিন্দারা অর্থনৈতিক কারণে খুবই দুর্বল এবং সামান্যতম আয়ের সম্ভাবনা পেলে তারা বেদুইনদের মতো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই যেতে প্রস্তুত। এভাবে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের আদি জনস্রোত দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালের জনগণনায় এই সুন্দরবনাঞ্চলে মোট ২.৪ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে তালিকাভুক্ত জাতি

ও তালিকাভুক্ত উপজাতির সংখ্যা ৬০.৫০%। বর্তমানে ১৯৯৯ (খ্রীঃ) এই জনসংখ্যা প্রায় ৪.০ মিলিয়নে পৌঁছেছে (নস্কর, ১৯৯৮)।

সুন্দরবনের শাসনভার কমিশনার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল ১৮১৬ খ্রীঃ থেকে এবং তখন কমিশনার রাজস্ব আদায় এবং অন্যান্য কর্তব্য পালন করে থাকতেন। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীঃ এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ২৪ পরগণা জেলার কালেক্টর সুন্দরবনের শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং সুন্দরবনের সমগ্র কাজকর্ম এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা অধিগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ আইন সংশোধন করে সুন্দরবনের এলাকাভুক্ত তিনটি জেলা যথাক্রমে ২৪ পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ গড়ে তোলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময় মোট সুন্দরবনের $\frac{২}{৩}$ অংশ বাংলাদেশের অন্তর্গত ও মাত্র $\frac{১}{৩}$ অংশ পশ্চিমবঙ্গের ভাগে আসে। কিন্তু পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষাকৃত ভাবে জোরদার হাওয়ায় উভয় দেশের সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রায় সমান। যদিও বাংলাদেশের মাটি ও জলের লবণের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অপেক্ষা কম হওয়ায় বাংলাদেশে ম্যানগ্রোভ গাছের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত ভালো (নস্কর ও মন্ডল, ১৯৯৯)

সুন্দরবনের প্রকৃতি ও জীবকূল :

সুন্দরবন নাম করণের উৎপত্তি সুন্দর, সমুদ্র উপকূলবর্তী ও সুন্দরী বৃক্ষের বন হতে সৃষ্টিবলে অনেকে মনে করলেও 'চন্দ্রদ্বীপের' বন হতে 'সুন্দরবন' নামের উৎপত্তি বলে অন্য মতও আছে। সুন্দরবনের 'ম্যানগ্রোভ' উদ্ভিদ বা অরণ্য শব্দটির আবির্ভাব পর্তুগীজ শব্দ 'ম্যাংগু' স্পেনিশ শব্দ 'ম্যাঙ্গেলে' ও ইংরেজী শব্দ 'গ্রভ' হতে সৃষ্টি তাই এর সঠিক কোন বাংলা পরিভাষা আজও প্রচলিত হয়নি। তবে এই জোয়ার ভাঁটার লবণাম্বু বৃক্ষের বনকে স্থানীয় ভাষায় 'বাদাবন' বলা হয়। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা অরণ্য এমন কতকগুলি বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদের সুষ্ঠ সুগাঠনিক সহবস্থানের ফলে গড়ে ওঠে যাহা আবার জোয়ার ভাঁটার প্রভাব হতে অন্যত্র ও লবণবিহীন স্থানে সাধারণত জন্মায় না; অনুরূপ ভাবে অন্য প্রকৃতির উদ্ভিদ প্রজাতিরা এই জোয়ার ভাঁটাযুক্ত উচ্চ লবণের ম্যানগ্রোভ পরিবেশে জন্মাতে পারেনা। এই বিশেষ কারণে ও বাস্তুরীতির বৈশিষ্ট্যে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদরা পৃথিবীর গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও অর্ধ গ্রীষ্মমন্ডলী (৩০°উঃ হতে ৩০°দঃ অক্ষাংশের মধ্যে) বলয়ের সমুদ্রউপকূলবর্তী স্থানে, ছোটবড় নদী মোহনায়, ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও ভিন্ন ভিন্ন সামুদ্রিক দ্বীপাঞ্চলে যেখানে জোয়ায়ের জল নিয়মিত পৌঁছায় ও পলি বা বালুকা দ্বারা গড়ে ওঠা স্থানে জন্মায়। সমগ্র বিশ্বের এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে মাত্র ৪৮টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতি ও প্রায় ৩৫টি ম্যানগ্রোভ সহবাসী বা পশ্চাৎ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ প্রজাতির উপস্থিতির বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি পাওয়া গেছে (টম্‌লিনসন, ১৯৮৬)। বলা বাহুল্য আমাদের এই ভারত ভূখণ্ডেই প্রায় ৩৫টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতি ও ৩০টি ম্যানগ্রোভ সহবাসী বা পশ্চাৎ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের উপস্থিতি ভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে নস্কর (১৯৯৩)। ভারত ভূখণ্ডের সুন্দরবনেই প্রায় ২৮টি প্রজাতির প্রকৃত ম্যানগ্রোভ ও ১৫টি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ সহবাসী উদ্ভিদ জোয়ার ভাঁটার অরণ্যে বসতি স্থাপন করে এখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখেছে নস্কর (১৯৮৩)। এছাড়া আরো কিছু লবণ সহিষ্ণু পশ্চাৎ ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন হতে নস্কর (১৯৯৩) উল্লেখ করেছেন। (সারণি ৮)

ভারতের মধ্যে সুন্দরবনের এই ম্যানগ্রোভ অরণ্য প্রায় ৬৫ শতাংশ স্থান জুড়ে অবস্থান করে আছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ছড়ানো বিক্ষিপ্তভাবে ভারতের ১৮ শতাংশ ম্যানগ্রোভ আর অবশিষ্ট ১৭ শতাংশ ম্যানগ্রোভ জঙ্গল বা ঝোপঝাড় অবস্থিত আছে উড়িষ্যায়—মহানদী উপত্যাকার বিতরকনিকায়, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা ও গোদাবরীর উপত্যাকায় করিঙ্গায়, তামিলনাড়ুর-কাবেরী উপত্যাকায় পিচাভরমে, মুথুপেট ও ছত্রামে কেরালার কোচিন অঞ্চলে, কর্ণাটকের-কুন্দপুর ও মালপি অঞ্চলে, গোয়ার-জুয়ারী ও মান্দোভী অঞ্চলে, মহারাষ্ট্রের-বোম্বাই উপকূলে, গুজরাটের-কচ্ছ উপকূল ও নর্মদার তাপ্তি উপকূল, ইত্যাদি অঞ্চলে (মানচিত্র-৭)।

ভারতসহ পৃথিবীর সর্বত্র এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল আজ ব্যাপক ধ্বংসের সম্মুখীন। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংস্কার করে কৃষিজমি স্থাপন, মৎস্যচাষযোগ্য ভেড়িতে রূপান্তর, বন্দর নির্মাণ, লোকালয় গড়ে তোলা, লবণক্ষেত্র বানানো, দূষিতজল পরিত্যাগ করা, এছাড়া গৃহস্থলী ও জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ কিংবা গবাদি পশুর অবাধ বিচরণ ভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে. এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানকে সমুদ্রে সৃষ্ট ঝড়ঝঞ্ঝা ও সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসকে যেমন প্রশমিত করতে সক্ষম, তেমনি মৃত্তিকার ক্ষয়রোধে এই বন ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের গুরুত্ব অসীম। আবার অন্যভাবে বলা যায়—ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা অরণ্য বাস্তুরীতি সামুদ্রিক ও স্থলজ জীবকূলের এক মধ্যবর্তীয় অবস্থা (interphase) বা সংযোগরক্ষাকারী বাস্তুতন্ত্র। বহু সামুদ্রিক প্রাণী, অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রজাতির আদর্শ বাসস্থান বা বিচরণ ভূমি এই ম্যানগ্রোভ বনভূমি। খাদ্যের অন্বেষণে, প্রজনন ক্রিয়ার তাগিদে বা আঁতুড় ঘর রূপে ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে বেছে নেয় বহু প্রজাতির সামুদ্রিক, তথা-মোহনার জীব, পক্ষী ও কিছু কিছু স্থলজ প্রাণী।

পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গেছে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বহু স্থান হতে, ফিলিপাইনস্ দ্বীপপুঞ্জ হতে অবাধ ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংস্কার করায়, এমনকি সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে মানুষের ব্যপক হস্তক্ষেপে যে সমস্ত মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও প্রাণী প্রজাতিরা সচারাচর সুন্দরবনে দেখা যেত তাদের সংখ্যা কমে গেছে বা সম্পূর্ণরূপে সেখান হতে বিলুপ্ত হয়েছে। সুন্দরবনে, ১০০-১৫০ বছর পূর্বেও জাভা দেশীয় গন্ডার, বুনো মহিষ, তিমি মাছের ভিন্ন প্রজাতি উপস্থিত ছিল, আজ সম্পূর্ণ ভাবে সেই সব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। মাত্র ২০-২৫ বছর পূর্বেও সুন্দরবনে স্বর্ণ মৃগ, অন্য বহু প্রজাতির হরিণ বিরাজ করলেও আজ তাদের দেখা আর মেলেনা। এর প্রধান কারণরূপে আমরা আজ জেনেছি-বনের বাস্তুরীতির উপর মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপ ও বন হাসিল করার ফলে বহু বন্য প্রাণীর এই বনে বসবাস করা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গত দু-দশক যাবত সারা বিশ্বে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সুন্দরবনের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বহু দেশী ও বিদেশী সংস্থা অর্থ সহায়তা করে চলেছেন। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ, যাঁরা বনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত—যাঁরা দৈনন্দিন খাদ্যের অন্বেষণে

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল, তাঁরা যদি না এই বনের সম্যক উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারেন আর সহযোগিতার হাত না বাড়ান ওই সমস্ত প্রকল্প সফলকাম হবে না-তা হলপ করে বলা যায়।

সাধারণ মানুষ সহ অনেকে এখনও যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে পারেনি—স্থানীয় মানুষের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা বহুলঅংশে উপেক্ষা করে ব্যাঘ্র ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের তাৎপর্য কোথায়? বিশেষত সুন্দরবনের সেই ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রকুল বছরে যখন ৫০-৬০ কিংবা তারও অধিক নিরীহ গরীব বনসম্পদ আহরণকারীর প্রাণনাশ করে, কিংবা লোকালয়ে ঢুকে গরু, বাছুর, ছাগল, শুকর এমনকি মানুষকে মারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সুন্দরবন তথা সমগ্র বিশ্ব হতে ব্যাঘ্রকুল প্রায় নিঃশেষিত হতে চলেছিল; তাই সংরক্ষণবিদগণ এই ক্রমহ্রাসমান ব্যাঘ্রকুল রক্ষা করার নিমিত্তে ভারতে ১৯৮৯ পর্যন্ত ১৭টি ব্যাঘ্র প্রকল্প ও পৃথিবীর অন্যত্র বহু ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে তোলায় সচেতন হয়েছেন। কারণ, প্রকৃতির প্রতিটি জীবের বাঁচার অধিকার আছে—বাস্তুরীতিতে তার উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—সুন্দরবনের বাঘ যদি মেরে শেষ করা হয় তবে বাড়বে তৃণচারী হরিণ ও শুকরের সংখ্যা বাড়বে এবং স্থানীয় মানুষ ক্ষুধার অন্ন যোগাড়ের তাগিদে প্রায় বিনা বাধায় বনের কাঠ কাটবে, মাছ ধরায় আত্মনিয়োগ করবে-আর অচিরেই এইসব বন ধ্বংস হয়ে ফাঁকা মাঠে রূপান্তরিত হবে। তার বহু নিদর্শন সুন্দরবনের এখানে ওখানে চোখে পড়ে। এই বনবিহীন সমুদ্র উপকূল সদানিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে স্থানীয় মনুষ্য বসতি ও কৃষি জমির উপর বারবার আঘাত করবে। গত ১৯৮৯ সালে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, ঘন্টায় ২৫০ কি.মি. বেগে ধেয়ে এসে সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চলে যে বিপর্যয় বয়ে এনেছিল তাতো প্রত্যক্ষদর্শীরা কোন দিনই ভুলতে পারবে না। গভীর বনই একমাত্র এই প্রাকৃতিক প্রলয়কে অনেকাংশে প্রশমিত করতে সক্ষম। তাছাড়া গভীর বন দ্বারা ঢাকা ও ম্যানগ্রোভের মূল দ্বারা আঁকড়ে থাকায় নরম পলি মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ, সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে পলি জমা, কিংবা সমুদ্রতলের উত্থানের সাথে সাথে ব্যাপক অঞ্চল জলের তলায় তলিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পাবে। পরিবেশ দূষণরোধে বনের উপযোগিতার কথা আজ আর জনসাধারণের [illegible]না [illegible] তাই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনকে রক্ষার জন্য, সু[illegible]র [illegible]তি বজায় রাখার জন্য, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক খাদ[illegible] খাদক ব্যাঘ্রকুলকে রক্ষার ও বংশ বিস্তারের ব্যবস্[illegible]রে 'সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প' প্রাকৃতিক পরিবেশকে চি[illegible]নিয়োজিত থাকতে সহায়তা করেছে। ব্যাঘ্রছাড়া সামুদ্রি[illegible] বিলুপ্ত-প্রায় কচ্ছপ প্রজাতি, যথা—*বাটাগুর বাসকা*, [illegible] গ্রীণ. রিটলে প্রজাতির কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ ক[illegible] বাচ্চা ফুটিয়ে, বাচ্চাগুলিকে লালন পালন করে অব[illegible]দ্রে ছেড়ে দিয়ে ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ও পক্ষী প্রজাতি[illegible]বশ ও অভয়ারণ্যে রূপান্তর করে সুন্দরবনের প্রকৃতি[illegible]ত সহায়তা করছে। ইদানিং সুন্দরবনের বৃহত্তম 'জীব[illegible]স্থা, ম্যানগ্রোভ বনের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ কমিয়ে [illegible] ফাঁকাস্থানে বনসৃজনের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশকে র[illegible]যর বিকল্প রুজিরোজগারের ব্যবস্থার ভিন্ন প্রকল্প অধি[illegible] ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আর এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে জনজাগরণ—যারা এই বনকে প্রকৃত রক্ষা করবে।

অন্য উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, সুন্দরবনে কুমীরের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট ছিল; —ব্যাপকভাবে, নির্বিচারে কুমীর মারার জন্য সুন্দরবন হতে কুমীর প্রায় শেষ হতে বসেছিল। কিন্তু গত ১৯৭৬ সালে সুন্দরবনের ভগবতপুরে 'কুমীর প্রকল্প' স্থাপন করে নদীর চড়া, ঝোপ ও জঙ্গল হতে কুমীরের নিক্ষিপ্ত ডিম সংগ্রহ করে ও কৃত্রিম উপায়ে তাপ সৃষ্টি করে কুমীরের ডিম হতে বাচ্চা ফুটিয়ে-সেই সব কুমীর শাবক, কুমীর চাষ খামারে লালনপালন করে ২-৩ ফুট বাড়লে সুন্দরবনের নদীতে ছাড়া হয়। এই কুমীর প্রকল্পের সহায়তায় ইদানিং সুন্দরবনের নদীতে, নদীচড়ায় শীতকালে প্রায়ই কুমীরের দেখা মেলে। সুন্দরবনের কুমীরই জলজ বাস্তুরীতির সর্বোচ্চ খাদক, কুমীর সাধারণত বড় বড় মৎস্য খাদক মাছ-যেমন—আড় মাছ, আড় ট্যাংরা, পাঁঙাস মাছ; কামট হাঙর খেয়ে থাকে, আর তার ফলে ওই সব দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মৎস্য খাদক মাছেদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় বহুল অর্থকরী ও মানুষের খাবার উপযুক্ত মাছ ও চিংড়ি যেমন—পারসে, ভাঙন, ট্যাংরা, গুরজালি, বাগদা, চামনে, হন্নে-চিংড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই সব কারণে জেলেরা সুন্দরবনের কুমীরের উপস্থিতির বহুল উপযোগিতা উপলব্ধি করেছে। এছাড়া নদী নালায় কুমীরের উপস্থিতি থাকায় যত্রতত্র, অবাধ মৎস্য শিকারও কম হবে। তাই সুন্দরবনে এই কুমীর প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মানুষজন স্বীকার করেন। কিন্তু ইদানিং সেই কুমীরপ্রকল্প টাকার অভাবে প্রায় বন্ধ হতে বসেছে।

আলোচনা এতদূর অগ্রসর হওয়ায় এখন সুন্দরবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ প্রজাতি ও তাদের উপর নির্ভরশীল প্রাণীর উল্লেখ করা হলো—

প্রকৃত ম্যানগ্রোভ ও ম্যানগ্রোভ সহবাসী প্রজাতির উদ্ভিদগুলি হ'লো যথা—গর্জনের দুইটি প্রজাতি—খামু ও ভোরা (*রাইজোফোরা মিউক্রোনাটা ও রাইজোফোরা এপিকুলেটা*), কাঁকড়া নামে দুইটি প্রজাতি (*ব্রুগুয়েরা জিমনোরাইজা ও ব্রুগুয়েরা সেক্স্যাংগুলা*), বকুল কাঁকড়ার দুইটি প্রজাতি, যথা (*ব্রুগুয়েরা পারভিফ্লোরা ও ব্রুগুয়েরা সিলিনড্রিকা*), জাত গরান বা মট্ গরান (*সেরিওপস্ ডেকান্ড্রা*), জেলে গরান (*সেরিওপ্স ট্যাগাল*), গড়িয়া (*ক্যান্ডালিয়া কেন্ডাল*), জাত বাইন (*অ্যাভিসিন্নিয়া অফিসিনালিস*), পেয়ারা বাইন (*অ্যাভিসিন্নিয়া ম্যারিনা*), কালবাইন (*অ্যাভিসিন্নিয়া অ্যালবা*), কেওড়া (*সোন্নারেসিয়া অ্যাপেটালা*), চাককেওড়া (*সোন্নারেসিয়া সেসিওলারিস*), ওড়া (*সোন্নারেসিয়া গ্রীফিথিই*), ধুন্দুল (*জাইলোকার্পাস গ্রানেটাম*), পশুর (জাইলোকার্পাস মোকেন্নজেনসিস) সুন্দরীর একটি প্রজাতি (*হেরিটিয়েরা ফোমিস*), লতা সুন্দরী (*ব্রাউনলোইয়া ল্যানসিওলেটা*), তরা (*অ্যাজিএলাইটিস রোটানডিফোলিয়া*), খলসি (*অ্যাজিসেরাস করনিকুলেটা*), আমুর (*অ্যাগলইয়া কিউকেল্যাটা*), সিঙ্গার (*সাইনোমেট্রা র‍্যামিফ্লোরা*), কৃপা বা কৃপাল (*লুমনিটজেরা রেসিমোজা*), গেওঁয়া (*এক্সোকারিয়া অ্যাগালোচা*), হরকোচকাঁটা (*অ্যাকান্থাস ইলিসিফোলিয়াস ও অ্যাকান্থাস ভলুবিলিস*), বন জুঁই (*ক্লিরোডেন্ড্রন ইনারমি*), চুলিয়া কাঁটা (*ডালবারজিয়া স্পাইনোজা*), হেতাল (*ফোনিক্স পালুডোজা*), গোলপাতা (*নিপা ফ্রুটিক্যান্স*), কলিলতা (*ডেরিস ট্রাইফোলিয়াটা*), নোনা লতা (*ডেরিস স্কানডেন্স*),

ধানিঘাস (*পোরটারেসিয়া কোয়াকট্যাটা*), বাউলে লতার দুটি প্রজাতি (*সারকোলোবাস ক্যারিন্যোটাস ও সারকোলোবাস গ্লোবোসাস*), নাটার দুটি প্রজাতি (*সিজালপিনিয়া নুগা ও সিজালপিনিয়া ক্রিস্টা*), গিরিয়া শাকের দুটি প্রজাতি (*স্যুয়েডা ন্যুডিফ্লোরা ও স্যুয়েডা ম্যারিটিমা*), নোনা ঝাউয়ের তিনটি প্রজাতি (*ট্যামারিক্স গ্যালিকা, ট্যামারিক্স ডাইওয়েকা ও ট্যামারিক্স ট্রাওপি*) ইত্যাদি, (সারণি ৭)।

এই সমস্ত অধিকাংশ ম্যানগ্রোভ ও ম্যানগ্রোভ সহবাসী উদ্ভিদেরা প্রতিদিন দুইবার জোয়ারের সময় সমুদ্রের উচ্চ লবণযুক্ত জলে ডুবে যায়, আর ভাঁটার সময় এদের গোড়া থেকে জল সরে যায়। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় এই ম্যানগ্রোভ ও ম্যানগ্রোভ সহবাসী উদ্ভিদগুলি ব্যতীত অন্য প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে জন্মাতে পারে না। এই সমস্ত উদ্ভিদের পাতা, শাখা ও প্রশাখার পচনের ফলে এই উচ্চলবণযুক্ত মৃত্তিকা ও জল হয়ে ওঠে উর্বর, ফলে নানা প্রকার সবুজ শ্যাওলা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী কণার দ্রুত স্বতস্ফূর্ত বৃদ্ধি ঘটে। ম্যানগ্রোভের জৈব পদার্থের পচনের কাজ ত্বরান্বিত করে নানা প্রজাতির ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ; যার ফলে জৈবসার কণা কাদা ও জলের সংস্পর্শে এসে মাছ বা অন্যান্য প্রাণীর উপাদেয় প্রাথমিক খাদ্য গঠিত হয়। অধিকাংশ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদের বায়বীয় মূল যা মাটির উপর গড়ে ওঠে তার গায়ে জন্মায় নানাপ্রকার প্রাথমিক পর্যায়ের শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ ও ছোট ছোট জীবাণু বা কীটপতঙ্গ। জোয়ারের জলে ঐ সমস্ত ম্যানগ্রোভের বায়বীয় মূল অঞ্চল প্লাবিত হ'লে নানা প্রজাতির নোনা মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও নানা প্রকার ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী ঐ সমস্ত শৈবাল বা জীব অনু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এ ছাড়া ম্যানগ্রোভের ঘন ঠাসাঠাসি ঝোপঝাড় বা অরণ্যের মধ্যে জোয়ারের স্রোত যখন তীব্রভাবে বয়ে থাকে তখন বহু প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও নানাপ্রকার ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী ঐ সমস্ত শৈবাল বা জীব অণু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এ ছাড়া ম্যানগ্রোভের ঘন ঠাসাঠাসি ঝোপঝাড় বা অরণ্যের মধ্যে জোয়ারের স্রোত যখন তীব্রভাবে বয়ে থাকে তখন বহু প্রজাতির মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী নিরাপদে সেখানে আশ্রয় নেয়, তাই ম্যানগ্রোভ অরণ্য সমুদ্র তীরবর্তী প্রাণীদের আদর্শ বাসস্থান। (মন্ডল, ১৯৮৯)

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে যে সমস্ত প্রাণী প্রজাতি সচরাচর বিরাজ করে তাদের কতকগুলির উল্লেখ এখানে করা হলো। এদের অধিকাংশই বর্তমানের পরিবর্তিত পরিবেশে ভারসাম্যহীন হয়ে দেখা দিয়েছে। সুন্দরবনে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাঘ (*প্যান্থেরা টাইগ্রিস*), বন বিড়াল (*ফেলিস চাওস*), মেছো বিড়াল (ফেলিস ভাইভেরিনা), ভোঁদড় (*প্যারাডোক্সুরাস হারমাফ্রোডিয়াস*), চিতল হরিণ (*সারভাস এক্সিস*), বন শুয়োর (*সুস স্ক্রোফা*), উদ্ বিড়াল (*লুট্রা লুট্রা*), শুশুক (*প্লাটানিস্টা গ্যাংগেটিকা*), বাঘরোল (*ফেলিস বেঙ্গালেনসিস*), সজারু (*হিসট্রিস ইন্ডিকা*), বাঁদর (*ম্যাকাকা মুলাট্রা*), বড় বাদুড় (*টেরোপাস জাইগানটিয়াস*) ইত্যাদি।

সুন্দরবনের জলে ও স্থলে যে সমস্ত সরীসৃপ প্রাণী বুকে ভর দিয়ে হেঁটে চলে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোহনার কুমীর (*ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস*), ভিন্ন প্রজাতির গোসাপ (*ভ্যারানাস বেঙ্গালেনসিস, ভ্যারানাস সালভাটোর, ভ্যারনাস ফ্লাভেসেন্স*), সামুদ্রিক কচ্ছপ (*বাটাগুর বাস্কা*), ধুসর সবুজ সামুদ্রিক কাঠা (*লেপিডোচেলিস অলিভ্যাসিয়া*), তক্ষক প্রজাতি (*জিকো জিকো*), অজগর (*পাইথন মোলুরাস*), বালি বোড়া (*এরোনকরভাস গ্রানুলেটাস*), শাঁখামুটি সাপ (*বুংগেরাস সেরুলিয়াস*), কালাসাপ (*বুংগেরাস ফেসিয়েটাস*), কেউটে সাপ (*নাজা নাজা*), গোখুরো সাপ (*অফিওফ্যাগাস হান্নাহ*), বোড়া সাপ (*ভাইপেরা রুসেসল্লি*)।

উভচর প্রাণীর সংখ্যা সুন্দরবনে সীমিত যেমন—গেছো ব্যাঙ (*র‍্যাকোফোরাস ম্যাকুলেটাস*), কুনো ব্যাঙ (*বুফো মেলানোস্টিকটাস*), সোনা ব্যাঙের ভিন্ন প্রজাতি (*রানা সায়ানোফ্লিকটিস, রানা লিমনোক্যারিস, রানা টিজেরিনা, রানা হেক্সাডাকটিলা*), ইত্যাদি।

সুন্দরবনের স্থানীয় পক্ষী প্রায় ৩৫০টি প্রজাতি, এছাড়া বর্ষা হতে শীতের প্রথমে পরিযায়ী পক্ষী প্রজাতি সুন্দরবনে প্রতিবছর অতিথি হয়ে আসে। এদের অধিকাংশই মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, সাপ, ব্যাঙ, শামুক খেয়ে বাঁচে; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সারস জাতীয় পাখি (*আরডেয়া গলিয়থ, প্যানডিওন হ্যালিয়েটাস, আরডেয়া সাইনেরেয়া, আরডিওলা স্টায়াটাস, ইকেসাগ্রিকাস মাইনুটাস, ইক্সোব্রিকাস সিন্নোমোমেয়াস, ইক্সোব্রিকাস ফ্লাবিকোল্লিস, অ্যানাসটোমাস অসসিট্যানস, থ্রিসকিওরনিস মেলানোসেফালা, লেপট্রোপটিলোস ডুবিয়াস, জেনোরাইকুস অ্যাসিএটিকাস*); ভিন্ন প্রজাতির বক (*এগ্রেট্টা অ্যালবা, বুবুলকাস ইবিস, এগ্রেট্টা ইনটারমিডিয়া, এগ্রেট্টা এগ্রেট্টা*), কুচিলা বক (*আরডিওলা গ্রায়ি*), পেলিক্যান (*পেলিক্যানাস ফিলিপিনেসিস*), হাঁস বা বালি হাঁস জাতীয় পাখি (*এইথ্রিয়া ফেরিনা, অ্যানাস ক্রেক্কা, অ্যানাস একুটা, অ্যানাস স্ট্রেপেরা, এইথ্রিয়া নাইরোকা, ট্যাডোরনা ফেরুজিনেরা, এইথ্রিয়া মারিলা, ডেন্ড্রোসিগনা জাভানিকা, নেট্টা রুফিনা, বাজপাখি জাতীয় পাখি (ফালকো পেরিগ্রিনাস*) ইত্যাদি। এছাড়া সুন্দরবনে আরো বহু প্রজাতির পাখি বর্তমান।

সুন্দরবনে নদীনালার জলে ও মোহনায় যে সমস্ত অর্থকারী মাছ ও চিংড়ি জন্মায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ইলিশ (টেনুওলোজা ইলিশা), খয়রা মাছের বিভিন্ন প্রজাতি (*অ্যানোডনটোসটমা চাকুন্ডা, অ্যানোডনটোসটমা থাইল্যান্ডিই, গনিয়েলোজা মানমিনা, নেমাটালোজা নাসুস*), চেলা বা মুখপোড়া ইলিশ (*ইলিশা ইলঙ্গ্যাটা*), বিভিন্ন প্রজাতির ফেঁসামাছ (*রাকুন্ডা রুসসোলিএনে, কাইলিয়া রামকরাতি, কাইলিয়া রেনাল্ডি, সেটিপিন্না ফাসা, সেটিপিন্না টাটি, থ্রিসসা হ্যামিলটোনি* ইত্যাদি), ভিন্ন প্রজাতির আমুদি মাছ (*কোইলিয়া ডুসোমিয়েরি, কোইলিয়া নেগলেক্টা* ইত্যাদি), ভিন্ন প্রজাতির ট্যাংরা (*মিসটাস গুলিও, মিসটাস ক্যাভাসিয়াস*), আড়ট্যাংরা (*অওকুরিখিস জ্যাওর, অ্যারিয়াস অ্যারিয়াস, অ্যারিয়াস গ্যাগোরা, অ্যারিয়াস ফ্যালেটাস, অ্যারিয়াস প্লাটিসটোমাস, অস্টিওজে নিওসাস মিলিটেরিস*), কানমাগুর (*প্লোটোসাস ক্যানিয়াস*), পাঙাশমাছ (*পাঙ্গাসিয়াস পাঙ্গাসিয়াস*), চেনোসমাছ (*চেনোস চেনোস*), নিহেড়ে বা লুটিয়া মাছ (*হারপোডোন নিহেরিয়াস*), ভেটকি মাছ (*ল্যাটিস ক্যালকেরিফার*), নামচাঁদা বা ভিন্ন প্রজাতির চাঁদামাছ (*চাম্ভানামা প্যারামবেসিস, ব্যাকুলিস, প্যারামবেসিস রাঙ্গা*), কাটকই (*টেরাপন জারবুয়া*), তুলবেলে (*সাম্নাজিলপসিস প্যানিজুস*), গাঙবেলে (*গিলাগো সিহামা*), নড়েভোলা (*অটোলিথোইডিস বাইঅরিটাস*), লালভোলা (*পামা পামা*), পায়রা চাঁদার (*স্কেটোফ্যাগাস আর্গাস*), পায়রা তলি (*এট্রোপ্লাস সুরাটেনসিস*), রাম পারসে (*লিজা মাইক্রোলেপিস*), পারসে (*লিজা পারসিয়া*), আখভাজন (*লিজা সারাভিরিটিস*,
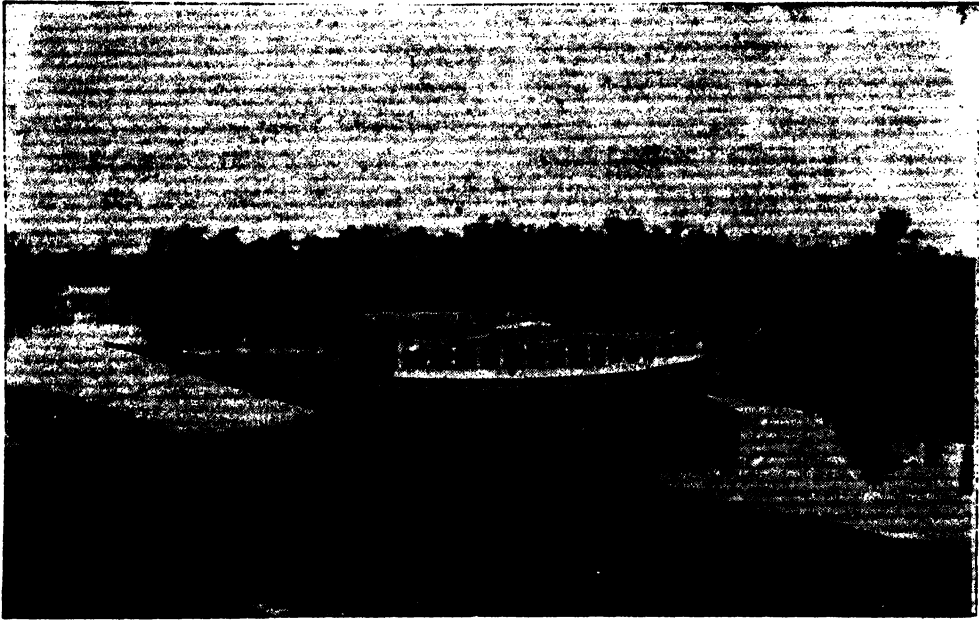
সুন্দরবন ভ্রমণ অথবা যাতায়াতের অন্যতম পরিবহন ভুটভুটি

মিউজিল সেফালাস), ভাঙন (*লিজা ট্যাডে*), খরশুলা (*রাইনোমিউজিল করসুলা*), চ্যাটাপারসে (*ভালামিউজিল ক্যানসিয়াস*), গুরজালি (*ইলিউথেরোনেমা টেট্রাডাকটাইলাম*), শেলে (*পলিডাকটাইলাস ইন্ডিকাস*), তপসে (*পলিনেমাস প্যারাডিসিয়াস*), বেলেমাছের ভিন্ন প্রজাতি (*গ্লাসোগোবিয়াস গিউরিস, ব্রাকিগোবিয়াস নানুস, গবিওপটেরাস চুনো*), ডাকুমাছ (*পেরিওপথ্যালমোডান শ্লেকাসেসরি, পেরিও থ্যালমাস কোলরেউটোরি, পেরিওপথ্যালমাস পিয়ারসি*), মেনুমাছ (*বোলিওথ্যালমাস বোডার্টি*), পাতামাছ (*লেপ্টুরাকান্থাস পানটুলাই, লেপ্টু রাকান্থাস গ্যাংগেটিকাস*, ইত্যাদি)।

সুন্দরবনে তরুনাস্থিযুক্ত মৎস্য প্রজাতিগুলি হ'লো হাঙর (*চিরোসকাইলাম গ্রিসেয়াম, স্টোগোস্টোমা ফেসিয়েটোম, কারকারহিনাস লিমবেটাস, কারকারহিনাস মেলানপটেরাস, গ্লীফিস গ্যাংগেটিকাস, স্কিরমা ব্রোচি* ইত্যাদি)। করাত হাঙর (*প্রিসটিস মাইক্রোডোন*), মরুলী... (...*ব্যাটোস অয়ানডালিই, নারসিনেব্রেয়ো* যথা বাগ... ...)।

সুন্দরবনের বিভিন্ন ... ...*য়াস মোনোডন*) চাপড়া চিংড়ি (*পিনিয়াস ইন্ডিকা...* ... (*ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রুডি*), গলদা চিংড়ি (*ম্যাক্রোব্রা... ...রোসেনবারগাই*), চামনে চিংড়ি (*মেটাপিনিয়াস ব্রেভিক...*), ... চিংড়ি (*মেটাপিনিয়াস মনোসেরাস*), লাল চিংড়ি (...*স স্কালপটিলিস*), টেকো চিংড়ি (প্যারাপিনিওপসিস ...), রসনা চিংড়ি (*পেলিমন স্টাইলিফেরাস*), *মুদ চি... (... ইন্ডিকাস*), সমুদ্র কাঁকড়া (*স্কাইলা সেরেটা*), চিতি ... ...*নাস পেলাজিকাস*), লাল কাঁকড়া (*উকা অ্যাকুটা*, ... সূ... ইত্যাদি)।

এই সমস্ত উচ্চশ্রেণী... ...প্রাণীকুল ব্যাতিত সুন্দরবনের লবণ জলে ও মৃত্তিকায় অ... ...পর্বের প্রাণীর উপস্থিতিও জানা গেছে। এই ম্যানগ্রো... ...র যেমন বিশেষ চারিত্রিক গুণ সম্পূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সমষ্টি, তেমনিও এই বনের উপযোগিতা অসীম। প্রত্যক্ষভাবে এই বন, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সাথে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে এই নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যাকাকে রক্ষা করে চলেছে, অপরপক্ষে পরোক্ষভাবে স্থানীয় মানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করে চলেছে।

প্রায় ১০০০ মৌলে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হতে শীতকালে ডাঁস মৌমাছির (এপিস ডরসোটা) মোম ও মধু সংগ্রহ করে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকে। কয়েক হাজার কাঠুরে বন হতে কাঠ কেটে এবং হাজার হাজার মৎস্যজীবী সুন্দরবনের নদীনালা থেকে মাছ ধরে জীবনধারণ করে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অধিকাংশই বন থেকে কাঠ কেটে জ্বালানীর প্রয়োজন মেটায়। ইদানিং বাগদা চিংড়ির মীন ধরা হাজার হাজার সুন্দরবনবাসীর জীবিকা।

সুন্দরবনের বন হাসিল করা ব্যাপক স্থানে প্রায় ৩৩০০০ হেক্টর জমিতে নোনা মাছ ও চিংড়ি চাষ স্থানীয় জনসাধারণের অন্যতম জীবিকা। ইদানিং কালে বাগদা চিংড়ি বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় ও উচ্চ মূল্যের জন্য বাগদা চিংড়ি চাষ সমগ্র সুন্দরবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাগদা চিংড়ির পোনাবা নদী খলের জোয়ারের জল থেকে ধরার জন্য সমস্ত সুন্দরবনে প্রায় দু'লাখ নরনারী দিবারাত্র ব্যস্ত থাকে। ছোট ছোট নাইলনের হাঁপা বা ছাকুনী জল দ্বারা, কখনো কখনো নৌকা থেকে ঘন পাটা জালদিয়ে বাগদা চিংড়ির পোনা ধরা হয়। ফলে নষ্ট হচ্ছে অন্য মাছ ও চিংড়ির 'আন' বা পোনা, কখনো কখনো ধস্ নামছে নদীর বাঁধে, নষ্ট হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে লাগানো ম্যানগ্রোভের চারা গাছ এবং কামট, হাঙর, কুমীরের আক্রমণে বা জলে ডুবে মারা যাচ্ছে অনেকে। তথাপি জীবনধারণের তাগিদে, রুজি-রোজগারের নিমিত্তে নিয়োজিত এই স্থানীয় জনগণকে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস ক্রিয়ার বাঁধা দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নষ্ট হচ্ছে বাস্তুরীতি, রিক্ত হচ্ছে নদীনালা হতে অন্য মাছের বীজ আর বাগদা চিংড়ি কৃত্রিম উপায়ে ধরা, বহন করে নিয়ে যাওয়া ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেড়িতে

চাষ করার প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ক্ষতি ক্রমান্বয়ে হয়ে চলেছে। ইদানিং প্রচুর পরিমাণে বাগদা চিংড়ির মীন নদী পথে বাংলাদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সুন্দরবনের মৎস্য চাষের ভেড়িগুলোকে লবণাক্ততা অনুযায়ী ভাগ করে তাদের কিছু উপযোগিতার উল্লেখ করা হলো যথা—

(১) উত্তরের নিম্ন লবণ জল যুক্ত (লবনাক্ততা ১০ পি.পি.টির মধ্যে) ভেড়িগুলিতে বর্ষাকালে ধান চাষ হয়ে থাকে এবং শীত হতে গ্রীষ্মকালে প্রায় ৬ মাস কাল সেই ধান মাঠে নোনা জল তুলে নোনা মাছ, তেলপিইয়া ও বাগদা চিংড়ির চাষ করা হয়। কলকাতা করপোরেশনের ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত জল কুলটিতে শাখাবিদ্যাধরী নদীর সাথে মিশে ঐ নদীর জল যেমন দূষিত হয়ে ওঠে তেমনি এর উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। পরিমিত ভাবে ঐ নদীর জল নিয়ে ধান মাঠে চিংড়ি ও মাছ চাষের অধিক ফলন যেমন পাওয়া যায় বর্ষায় ধান চাষে ঐ জমি উর্বর হয়ে ওঠে ও ভাল ফলন দেয়। উপরন্তু সারা বৎসর জমিতে জমে থাকায় মাটি নরম থাকে ও কৃষিকার্যে প্রাথমিক খরচ ও অনেক কম হয়।

(২) সুন্দরবনের বন হাসিল করা জমিগুলি যেখানে জলে লবণাক্ততা ১০-২০ পি.পি.টি. সেখানে নোনা মাছ ও চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। সেরূপ জমির উৎপাদন ও মধ্যম মানের।

(৩) কিন্তু সুন্দরবনের গভীর বনাঞ্চল সংলগ্ন বা দক্ষিণের ভেড়িগুলির জলে লবণাক্ততা সাধারণত ২০ পি.পি. টির উর্দ্ধে থাকে, আর এখানে নোনা মাছও চিংড়ির উৎপাদনও তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়।

দেখা গেছে ঐ বিভিন্ন প্রকার মৎস্য ভেড়িতে বাগদা চিংড়ি উৎপাদনের জন্য অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। বহুক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক বাগদা চিংড়ির পোনা নদী হতে ধরে বা কিনে এইসব ভেড়িতে ফেলা হয়। তাছাড়া জোয়ারের জল ভেড়িতে ঢোকানোর সময় অন্যান্য ছোট চিংড়ি প্রজাতি ও মৎস্য খাদক মাছ, যেমন—ভেটকী, পাঙাস, ট্যাংরা, ভেড়ে, গুরজালী, বেলে মাছ ও চিতি কাঁকড়া এই সব ভেড়িতে প্রবেশ করে এবং বাগদাসহ অন্যান্য অর্থকারী মাছকে খেয়ে, উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটায়। অনেক সময় অধিক লাভের আশায় নোনা ভেড়িতে তেলপিয়া মাছ ছাড়লে চিংড়ি উৎপাদনের বিঘ্ন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই সমস্ত নোনা ভেড়ি হতে উৎপাদিত চিংড়ির সংখ্যা মোট চিংড়ি পোনা ছাড়ার মাত্র ১০-১২% শতাংশ।

সাধারণভাবে বড় বাঁশের খাঁচার মধ্যে পরিপূরক খাদ্য দিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে বাগদার 'পিন' বা মীন অবস্থা থেকে ৫০/৬০ গ্রাম ওজনের চিংড়ি উৎপাদের ক্ষেত্রে ৮০-৮৫ শতাংশ চিংড়ি বাঁচানো সম্ভব। সহজেই অনুমান করা যায় বর্তমানের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ত্যাগ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করে ৫-৬ গুন বেশী উৎপাদন করা সম্ভব।

কিন্তু সর্বোপরি মনে রাখা দরকার আমরা যদি সদানিয়ত প্রকৃতি হতে সম্পদ অবিবেচকভাবে অর্থাৎ অধিক মাত্রায় সংগ্রহ করি বা প্রাকৃতিক ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটাই তবে অচিরেই সেই সম্পদশীল প্রকৃতি দীন হতে দীনতর হয়ে পড়বে। আমরা সবাই বাঁচি আর কষ্টকরে সযতনে রক্ষা করার চেষ্টা করি নিজস্ব সম্পদ; যাতে কিনা আমাদের সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ অটুট থাকে বা নিশ্চিত হয় তাদের বাঁচার পথ। তবে কেনইবা অবিবেচক ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ যাহা বর্তমান আছে তা ধ্বংস করে আমাদের সন্তান সন্ততি বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপদের মুখে ঠেলে দেব? উদাহরণরূপে আর ছোট্ট একটা কথা বলে আমার এই বক্তব্য শেষ করব—ধরুন—সুন্দরবনের বন ধ্বংসে হল—গড়ে উঠল লোকালয় বা নগর, কৃষিভূমি বা মৎস্যচাষের ভেড়ি। কিন্তু প্রাকৃতিক কোপ মাঝে মধ্যে সুন্দরবনের উপর যখন আছড়ে পড়বে তখন কে তাকে প্রতিহত করবে? এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। বন না থাকলে মোহনার মাছ বা চিংড়ির বাচ্চা কোথা হতে যোগান হবে ঐ সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্য ও চিংড়ি চাষের, ভেড়িতে? চিন্তার বিষয় সুন্দরবনের নদীনালা থেকে বাগদা চিংড়ির বাচ্চা যেভাবে হাজার হাজার নরনারী গত ২০-২৫ বছর যাবৎ দিবারাত্র ধরতে শুরু করেছে এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই চিংড়ির পোনা কি আর পাওয়া যাবে? তখন কি চিংড়ি চাষের এই প্রযুক্তি আর কাজে লাগবে?

সুতরাং, পরিবেশ হতে সম্পদ আহরণ করার পূর্বে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে পরিবেশের সুষ্ঠ সংরক্ষণের উপর। বিশেষত সেই পরিবেশ যদি সুন্দরবনের মত নিত্ত পরিবর্তনশীল ও সংবেদনশীল পরিবেশ হয়।

সুন্দরবনের প্রকৃতি ও স্থানীয় মানুষজনের পেশা বা অভিজ্ঞতা মাছ চাষ, মাছ ধরা ও কৃষিকর্মর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং, প্রাকৃতিক সম্পদকে ঠিক্ ঠিক্ ভাবে কাজে লাগিয়ে—স্থানীয় মানুষকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে ও বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ বাস বা কৃষিকর্ম ও মাছ ধরার দিকে সুষ্ট পরিকল্পনা রচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সুন্দরবনের আর্থসামাজিক অবস্থা :

ভারতীয় সুন্দরবনের বর্তমানের প্রায় ৪০ লক্ষ জনগণের ৬০ শতাংশই অনুন্নত-তালিকাভুক্ত জাতি, ৩০-৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘু, অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় এবং মাত্র ৫-১০ শতাংশ অপেক্ষাকৃত উন্নত ও ধনী বা মধ্যবিত্ত মানুষ। এখানকার ৮০ শতাংশ মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করতে হয় কৃষিকর্ম, মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ ও নদীনালা কিংবা মোহনায় মাছ ধরার উপর। বর্ষা নির্ভরশীল এবং প্রধানত এক ফসলি ধান চাষ এখানকার কৃষিকর্ম। ইদানিং কিছু কিছু মানুষ তাদের নিজেদের চেষ্টায় ও কায়ক্লেশ শুখা মরশুমে আশেপাসের খাল-বিল-পুকুরের জলের ওপর ভরসা করে রবি মরশুমে লঙ্কা, তরমুজ, শাকসবজী চাষের চেষ্টা করে। ঐ সব পলিজমা দোঁয়াস মাটির উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র যদি সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে সুন্দরবনের ব্যাপক এই একফসলি জমিকে দু-ফসলি করা কোন সমস্যা নয়। উপযোগী জমির সাথে দক্ষ কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা সুন্দরবনে অপ্রতুল নয়। বর্ষার ৪—৫ মাস সারা বছরের গড় বর্ষার ৮০ শতাংশ বৃষ্টি হয়, তখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে নদীনালা দিয়ে নোনা নদীতে ও মোহনায় ঐ জল বের করে দিয়ে বছরের অন্যান্য সময়ে চাষের জলের জন্য হাঁ করে বসে থাকতে হয় অসহায় সুন্দরবনবাসীর। সুন্দরবনের ৪০ শতাংশ জমিহীন কৃষিশ্রমিক, বারো মাস কাজের অন্বেষণে-গ্রাম হতে গ্রামান্তরে শহরের অলিতে গলিতে আনাগোনা করে; না আছে কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক সুযোগ, সুতরাং দুর্বিসহ অভাব-অভিযোগ বেকারত্ব, দুর্লভ চিকিৎসা ব্যবস্থা দু-বেলা দুমুঠো অন্নজোগাড় করা প্রায় অনেকের সাধ্যাতীত।

একবিংশ শতাব্দীর শুভারম্ভে, বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতির যুগে—নানান বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান লাভ করেও—সুন্দরবন সহ দেশের এমন সব সমস্যা পীড়িত অঞ্চলের সমস্যা যদি নির্মূল করা না

নেতি ধোপানির ঘাট *ছবি : হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল*

যায়—তবে ব্যর্থ আমাদের সমস্ত কর্মপন্থা—ব্যর্থ হবে আমাদের উন্নতি বা অগ্রগতির আত্মতুষ্টি।

সুন্দরবনের যান চলাচল ব্যবস্থা :

নদীমাতৃক সুন্দরবনের যান ব্যবস্থা বললে পূর্বে যে দেশী নৌকার ও মটরলঞ্চের কথা মনে পরতো—আজ তার পরিবর্তন হয়েছে। নদীনালার গভীরতা বা নাব্যতা কমায় সুন্দরবনের অন্যতম প্রধানকেন্দ্র ক্যানিং-এ মরাণি বা ভাঁটার সময় লঞ্চচলাচল সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র ভরা জোয়ারের সময় বিশেষত শীতকালে ভ্রমণার্থীদের জন্য ও বনবিভাগের কাজকর্মের জন্য কখনো বা অল্পসংখ্যক মটরলঞ্চের দেখা মেলে। উপরন্তু মাল বহন করা ছাড়া মানুষে দাঁড়টানা-বা পাল দেওয়া নৌকা সুন্দরবনে দিন দিন কমে যাচ্ছে—কারণ, বর্তমানে মানুষ কায়িক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি চায়, ফলে বেড়েছে যন্ত্র চালিত বিভিন্ন আকারের দেশীয় নৌকা, স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় ভট্‌ভটি। এই ভট্‌ভটি সুন্দরবনের দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে যাওয়ার যান ব্যবস্থা।

এখন গ্রামে গঞ্জে অনেক ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে সরু সরু ইটের রাস্তা, কোথায় কোথায় ও পীচ ঢালা পাকা রাস্তা, আর সেইসব রাস্তায় চলছে—মনুষ্যচালিত রিক্সাভ্যান, কোথায় ও বা অটোরিক্সা, কিংবা ট্রেকার ও ম্যাটাডোর। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে লোপ পেয়েছে বলদ ও মহিষচালিত গাড়ী।

রাস্তাঘাট হয়েছে অনেক—যদিও পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট নয়। ইদানিং, মাঝেমধ্যে সুন্দরবনের অনেক ভিতরে গ্রামে গঞ্জে চলে যাচ্ছে কোলকাতার শহরতলী থেকে সরকারী Express বাস। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে কোলকাতা [illegible] সর[illegible] বাসরাস্তা, যেমন কলকাতা — হাসনাবাদ, — বসির[illegible] [illegible] — কালিনগর, — চৈতল, — কোলকাতা —মালঞ্চ, [illegible] কালমারী, — সোনাখালি, — ভাঙনখালি, — ডক[illegible] [illegible] ভাঙর, — জীবনতলা, — তালদি, —ক্যানিং, [illegible] ঢোষা, — জয়নগর, — জামতলা, — চী[illegible] [illegible] —আটনস্থল, —কুলপি, —লক্ষ্মিকান্তপুর, — রা[illegible] [illegible]পানা, —কাকদ্বীপ, ইত্যাদি নানান রাস্তা ও বাস চলা[illegible] যদিও নদীবহ সুন্দরবনের দ্বীপ হতে অন্য দ্বীপে [illegible] ভট্‌ভটি একমাত্র বাহন। সুন্দরবনে রেলপথ এ প[illegible] [illegible]বহাট-হাসনাবাদ, ক্যানিং ও লক্ষ্মিকান্তপুর-নিশ্চিন্তেরপু[illegible]।

বর্তমানে সুন্দরবনের [illegible]বিশ [illegible]স্যা :

(ক) লাগাম ছাড়া [illegible] উচ্চ জন্মহার) এবং পার্শ্ববর্তী দেশ—বাংলাদেশ থেকে [illegible] আসা সুন্দরবনে আজ ও অব্যাহত। ফলে বিপুল এই জনসংখ্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনের ও বন্য সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে এবং এই বন ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

(খ) যত্রতত্র বিনা বাধায় ও নানানভাবে বাধা অতিক্রম করে বনের কাঠ কাটা ও তা পাচার হওয়ার ঘটনা সুন্দরবনে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। সুন্দরবনের গাছ সুন্দরবনের মানুষের জ্বালানীর ভরসা।

(গ) বন ধ্বংসের ফলে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের অবিবেচক হস্তক্ষেপে মৃত্তিকার ক্ষয় হওয়া এবং সেই মৃত্তিকা নদীবক্ষে বা মোহনার জমা হয়ায় মাঝে মধ্যে নানান সমস্যা দেখা দেয়,—ব্যাপক জলোচ্ছ্বাস হয়ে নদী বাঁধ উপ্‌ছে গ্রামে গঞ্জে নোনা জল ঢোকে।

(ঘ) যত্রতত্র বহমান নদী আড়াআড়ি বেঁধে ফেলার কুফল সুন্দরবনের অনেক অঞ্চলে চোখে পড়ে। মাতলানদী উপরের অংশ বেঁধে ফেলায় অনেক ক্ষেত্রে মজে যাচ্ছে। পিয়ালীড্যাম বা কেল্লায় গেলে সেই অবক্ষয় চোখে পড়ে।

(ঙ) মাঝে মধ্যে প্রায়শই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনে অনেক দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়।

(চ) নাইলনের ঘন জাল দিয়ে হাজার হাজার সুন্দরবনবাসী মানুষের বাগদা মীন ধরা ও অন্যান্য মাছ চিংড়ির পোনা বা আন ধ্বংস করার ও বহুরকম সমস্যার কথা আজ আর মানুষের কাছে অজানা নয়।

(ছ) চরপাটা জাল ও অন্যান্য ঘনজাল সদানিয়ত নদীনালায় টানার ফলে ছোট ছোট ডিমপোনা ও চারামাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে চলেছে সুন্দরবনে।

(জ) মটর, ভটভটি হতে দূষিত তেল, কৃষিক্ষেত ও মৎস্যচাষে ব্যবহৃত বিষাক্ত ঔষধ ও কলকারখানা কিংবা শহরতলির ময়লা জল ও আবর্জনা প্রায় সবসময় দূষণের নানান উপাদান যোগান দিয়ে চলেছে সুন্দরবনের জলে ও জঙ্গলে।

(ঝ) বাগদা চিংড়ির চাষ ও রপ্তানীর আপাতত লাভের আশায় ও লোভে নিত্য নতুন বাগদা চিংড়ি চাষের ভেড়ী তৈরী করা বন কেটে সংস্কার করার ভয়াবহ ভবিষ্যৎকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে না।

(ঞ) নদীনালা দিন দিন মজে যাওয়ায় মটরলঞ্চ তো দূরের কথা সুন্দরবনের বহু ক্ষেত্রে নৌচলাচল আজ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদারণস্বরূপ বলা যায় ক্যানিংএ মাতলানদী।

(ট) নিত্য নূতন মাছের—বিশেষত বাগদা চিংড়ির রোগ, মহামারী আকার ধারণ করে—ফলে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানষের ভয়নক দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়।

(ঠ) গভীর সমুদ্রে ঘন জাল দিয়ে ডিম ছাড়ার উপযুক্ত ও বড় বাগদা চিংড়ি ধরাও ব্যাপক ক্ষতির কারণ। গভীর সমুদ্রে চিংড়ি ও মাছ ধরার জন্য বিদেশী জাহাজ ও নৌকার আনাগোনা ও ক্রিয়াকর্ম সমগ্র সুন্দরবনের সমস্যা। সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপে গেলে চোখে পড়বে—বাংলাদেশ হতে নিত্য নূতন জেলে সম্প্রদায় এসে ঐ ম্যানগ্রোভ অধ্যুসিত সুন্দরবনের দ্বীপ অঞ্চলে কেমন ঘাঁটি গড়েছে।

(ন) ডাকাত, ছিনতাইবাজদের হাতে সুন্দরবনের জেলেদের কেমন ভাবে সর্বস্ব হারাতে হয়, এমন কি প্রাণ ও দিতে হয়—এ ঘটনা আজ অজানা নয়। সুন্দরবনের বাঘের—কুমীরের থেকে ও হিংস্র এই সব ভিনদেশী এমনকি দেশীয় জলদস্যু সম্প্রদায় সুন্দরবনে আজ বিভীষিকা।
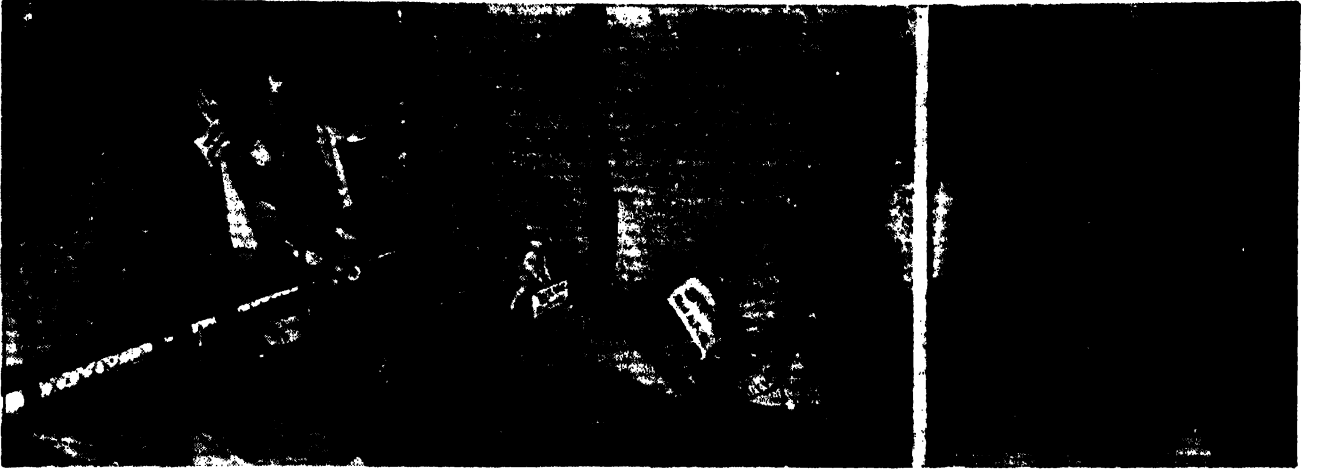
সুন্দরবনাঞ্চলের দেবদেবী

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যের কিছু উপযোগিতা :

১। **প্রত্যক্ষ উপযোগিতা :**

(ক) সুন্দরবনে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণের নোনা মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মধু ও মোম। এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ স্থানী মানুষ সহ কোলকাতার মানুষের চাহিদা মেটায় এবং চিংড়ি কাঁকড়া, মধু রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হয়।

(খ) কিছু কিছু গাছের ফল—যথা, কেওড়া ওড়া, চাককেওড়া, ধানীগাছের ধান স্থানীয় মানুষ খেয়ে থাকে এবং অনেক গাছগাছালি থেকে ভেষজ ঔষধ পাওয়া যায়।

(গ) বনের কাঠ জ্বালানী, ও আসবাবপত্রে এবং নানাবিধ গৃহস্থালী কাজে বহুলভাবে ব্যবহিত হয়।

(ঘ) ঘন ম্যানগ্রোভ বন বহু প্রজাতির বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর একান্ত নিবিড় বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল। এই বন ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

২। **পরোক্ষ উপযোগিতা :**

(ক) ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্যই একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল হতে সুন্দরবনের লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করতে সক্ষম। বঙ্গোপসাগরের বুকে উদ্‌ভুত ঘূর্ণিঝড় জলচ্ছ্বাসকে ঘন এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যই প্রায়শ প্রশমিত করেও সদা নিয়ত জোয়ার ভাঁটার ওঠানামার সময় মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করে ঘন এই বনাঞ্চল।

(খ) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলেই উৎপন্ন হয় বিশাল এই মোহনার মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়ার প্রকৃতি খাদ্য।

(গ) এই অঞ্চলে ব্যাপক কৃষিকর্মের উপযোগী অবহাওয়া ও পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘন এই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

সুন্দরবনের দেবদেবী :

সুন্দরবনের নিজস্ব দেবদেবী অপৌরাণিক ও লৌকিক। জাতি-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সুন্দরবনের মানুষ একই দেবদেবীকে পূজার্চনা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ আপদ বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বা রক্ষা পাবার জন্য এই সব লৌকিক দেবদেবীদের আরাধনা হয়। সুন্দরবনে ছিল ঘন অরণ্য — বাঘ — সাপ — কুমীর — দৈব দুর্যোগে মাঝে মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। সেই সব আপদ-বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পূজার্চনা। তাই তারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে পূজা করতো, একই দেবদেবী; —তাঁদের অধিকাংশ লৌকিক দেবদেবী— অপৌরাণিক দেবদেবী। তারা পূজা করতো বাঘের দেবী ও দেবতা; যথা—বনবিবি বা বনদেবীকে, বাঘের দেবতা—দক্ষিণরায়কে, কুমীরের দেবতা কালুরায়কে, সাপের দেবী—মনসাকে। এদের সাথে সাথে পূজা করা হত লোকদেবতা পঞ্চানন, পাঁচুঠাকুর, শীতলা, ওলাবিবি, বাবাঠাকুর, বিবিমা, নানান পীর আর গাজীসাহেবদের। নীলাচলে যাত্রাপথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুন্দরবনের ছত্রভোগ আসেন এবং তাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম সুন্দরবনে ব্যাপকতা লাভ করে। সুন্দরবনের মাঝিমাল্লারা নদীতে নৌকা নিয়ে যাবার সময় পাঁচপীরের, যথা—গিয়াসুদ্দীন, সামসুদ্দীন, সেকেন্দর গাজী, কালুগাজী ও গাজীসাহেবকে স্মরণ করতো। সুন্দরবনে আরো যে সমস্ত দেবদেবীর পূজার্চনা বা আরাধোনা হত তাঁরা হলেন দক্ষিণরায়ের মা নারায়ণী, কাটামুন্ড বারাঠাকুর, ইত্যাদি। বনে কাঠ কাটতে যাওয়া, মধু ভাঙতে যাওয়া মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে সবাই এই সমস্ত দেবদেবীদের পূজার্চনা ও স্মরণ করতো—ভয়ের বশে এবং বিপদের হাত থেকে বাঁচবার প্রয়াস মাত্র। নানান সব মন বাঁধানো—আজগুবি গল্প—দুখে—ধোনা—মোনা—বনবিবির উপাখ্যান মানুষের মনে অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল। এই সব অধিকাংশ দেবদেবী ছিল প্রকৃত পক্ষে প্রভাবশালী জমিদার বা স্থানীয় ব্যক্তিগণ। জোর করে—ভয় দেখিয়ে মানুষের মনের মধ্যে এই সব দেবদেবীদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিল। এমনকি এসব দেবদেবীরা নিজেদের মধ্যে ও আত্মকলহে লিপ্ত ছিল—; দক্ষিণরায়ের সাথে বনবিবির সেইসব বিবাদের কথা—আর গাজীসাহেবের মধ্যস্থতার কথা সুন্দরবনে পুরাতন সব মানুষের মুখে মুখে প্রচার হত।

সুন্দরবন ভ্রমণ :

ইদানিং সুন্দরবন ভ্রমণ বেশ আলোড়ন তুলেছে শহুরতলী মানুষের মনে। ফলে গড়ে উঠেছে প্রচুর ট্যুরিষ্ট সংস্থা। ক্যানিং-এ বহু এমন বেসরকারী ট্যুরিষ্ট সংস্থা দলবল যোগাড় করে বিশেষত শীত কালে মটরলঞ্চে করে সুন্দরবনের সজনেখালি—পাখিরআলয়-সুধন্যাখালী—পীরখালি—নেতীধোপানি—কখনো বা হলদিবাড়ী যায়।

নদীবক্ষে লঞ্চের উপর রাত্রে থাকা, দিনের বেলায় খাল—নদীপথে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো—আর বাঘ দেখার প্রত্যাশা,—কিন্তু অধিকাংশ সময়ে কষ্টকরভাবে লঞ্চে রাত্রি বাস ও বাঘ না দেখে—বেশীরভাগ মানুষই হতাশ হন। তবে যাঁরা প্রকৃতি প্রেমিক—তাঁরা বনের মধ্যে—নদীনালায় বেড়াবার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

ছোট ছোট দলে—ভট্ভটি ভাড়া করে অনেকে আবার সুন্দরবন ভ্রমণে যান। প্রত্যেককে—ক্যানিং বা সজনেখালির ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অফিসে প্রতি জনের ৪টাকা প্রতিদিন হিসাবে বনে প্রবেশ বাবদ জমা দিতে হয়। সুন্দরবনে থাকবার জায়গার বিশেষ অভাব—; সজনেখালীর ট্যুরিষ্ট বাংলো—যার ভাড়া ইদানিং অবশ্য বেশ বেশী, একমাত্র থাকবার সুব্যবস্থা। এছাড়া ইদানিং পাখীরআলয়ে কিছু ব্যক্তিগত মালিকানায় লজ, গোসাবায় কিছু হোটেল গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের কোথায় কোথায়ও আবার সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের কুঠী বা বাংলো, সেচ দপ্তরের বাংলো—বিশেষ জানা শোনা থাকলে ব্যবস্থা হয়। এছাড়া বকখালি আজকাল নামকরা ট্যুরিস্ট অঞ্চল হয়ে উঠেছে। সরকারী ও বেসরকারী হোটেল গড়ে উঠেছে। অনেকে আবার সাগরদ্বীপে, ফ্রেজারগঞ্জে ট্যুরিষ্ট বাংলোয় বেড়াতে গিয়ে ওঠে। পিয়ালী বা কেল্লায় বাংলো গড়ে তোলা হয়েছে—মনোরম বেড়াবার স্থান তো বটেই—তবে সেখান যাতায়াতের সমস্যা—চুরিছিনতাইয়ের ভয়ে অনেক ভ্রমণপিপাসু মানুষ পা বাড়ায় না।

সুন্দরবন ভ্রমণে বাঘের দেখা পাওয়া যাঁদের প্রথম বা একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁরা বেশীভাগ সময় হতাশ হন। তবে বাঘের দেখা নাই বা মিললো—সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ—গাছগাছালি—পাখী—নদী নালা—ঘন—বিচিত্র ধরনের বন অন্যত্র বিরল। এই বনের হাতছানি উপভোগ করার—যদিও কিছু থাকা খাওয়ার সমস্যা বিদ্যমান। সদ্যনির্মিত সুন্দরবনের ঝড়খালিতে ম্যানগ্রোভ ইকোলজিক্যাল পার্ক ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের জন্য উল্লেখযোগ্য বেড়াবার স্থান।

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের সংরক্ষণের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব :

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন—মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মধু, কাঠ, মোম ও সবাঙ্গীণ [illegible]নীতি ঐতিহ্যময় ও আশ্চর্যের; এই বনের উপস্থিতি [illegible]কাকে সমৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য র[illegible] যুগিয়ে আসছে বিগত প্রায় ৬-৭ হাজার বছর ধ[illegible] আজ ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র ১০০-১৫০ [illegible] কিংবা আর অনেক পরেও সুন্দরবনাঞ্চলে ব্রহ্মদে[illegible]মোষ, স্বর্ণমৃগ, নানা প্রজাতির মাছ, পাখি, বহু বিলু[illegible] প্রাণী, গাছগাছালির উপস্থিতি ছিল-আর প্রাকৃতিক বৈ[illegible] ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সহ অবস্থান, শুধু ভারতে [illegible]র কাছে আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নি[illegible]ংসক্রিয়ার জন্য—সুন্দরবনের খ্যাতি আজ ম্রিয়মান।

জরুরী ভিত্তিতে [illegible]লে প্রাকৃতিক নানান উপযোগী উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথি[illegible]কে [illegible] হয়তো বিলীন হয়ে যাবে।

এতসব আলো[illegible] পর [illegible]নকে অসুন্দরের' পথে এগিয়ে না দিয়ে তার সবাঙ্গীণ রক্ষার জন্য কতকগুলী করণীয় বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা হল :

১। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা বনের প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে আপন হতে গড়ে ওঠবার সুযোগ বজায় রাখতে হবে। কোন নদী বা খাল আশু লাভের জন্য বেঁধে দিয়ে জলস্রোতের স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ করা অযৌক্তিক; তার সঠিক প্রাকৃতিক ধারা-বাহিকতা পর্যালোচনা করেই কোন পরিবর্তন করা চলতে পারে মাত্র। যত্রতত্র বনভূমি ধ্বংসকরা, মৎস্য চিংড়িচাষের ভেড়ি তৈরী করার কাজকর্ম জরুরী ভিত্তিতে বন্ধকরা আশু প্রয়োজন। অধিক ও তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হয় বলে শুধুমাত্র বান বা বানীগাছ লাগায়ে সুন্দরবনের বন্য বাস্তুতন্ত্রকে বজায় রাখা যাবে না। সেখানকার জলবায়ুর উপযোগী আরও অন্যান্য গাছ লাগানো দরকার। এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বর্তমান ক্রমহ্রাস পর্যায়ে কাঠকাটা পুরোপুরি ভাবে বন্ধ করা দরকার।

২। নদী নালায় ঘন মশারীর মত চট জালদ্বারা মাছ ধরা ও মাছের আন (চারা), চিংড়িমীন ধরা বন্ধ হওয়া দরকার।

৩। আগের মত নোনা ভেড়ীতে সমস্ত প্রকারের নোনা মাছ—চিংড়ি, কাঁকড়া চাষ পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া আশু প্রয়োজন। রপ্তানীর দিকে নজর রেখে চিংড়ি চাষে লাভ তাড়াতাড়ি করা গেলেও ক্ষতির সম্ভাবনা ও যথেষ্ট। আর এই চাষের ফলে প্রকৃতি ও তাড়াতাড়ি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

৪। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ সঠিক পথে চলতে দেওয়া বা চালনা করার জন্য সাধারণ মানুষের এগিয়ে আসা বা তাদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। এজন্য সুন্দরবনের মানুষের মধ্যে সাড়া জাগানো, বোঝানো আশু প্রয়োজন।

জরুরীভিত্তিতে কর্মপন্থা গ্রহণ করা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে হাত না দিলে অদূর ভবিষ্যতে বহু প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ্য করতে হবে। সুন্দরবন ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুন্দরবনের বিশেষ চরিত্রিক গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের চেনা এবং সবাইকে চেনানো আশু প্রয়োজন। এইসব গুরুত্ব উপলব্ধি করে সুন্দরবনের ঝড়খালিতে ম্যানগ্রোভ ইকোলজিক্যাল পার্ক বানানো ও মানুষের অবগত করার প্রয়াস সার্থক। এই কাজে কলিকাতা ওয়াইল্ড লাইফ সোসাইটির তরফে বর্তমান লেখকের প্রচেষ্টায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের অর্থ সহায়তায় ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের বদান্যতায় সুন্দরবনের ঝড়খালিতে ম্যানগ্রোভ ইকোলজিকাল পার্ক-জনজাগরণ করার জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে।

সারণি-১

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিচিতি

পশ্চিমবাংলার সমগ্র সুন্দরবনাঞ্চলের পরিমাণ = ৯৬৩০ বর্গ. কি.মি.

□ সুন্দরবনের শুধুমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল = ৪২৬৬.৬ বর্গ কি.মি.

Δ সুন্দরবনের মোট বনভূমি (৫৫%) = ২৩৪৭.০ বর্গ. কি.মি.

Δ সুন্দরবনের মোট জলাভূমি (৪৫%) = ১৯২০.০ বর্গ. কি.মি.

+ সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্প অঞ্চল = ২৫৮৫.১০ বর্গ. কি.মি.

+ সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্প বহির্ভূত অঞ্চল = ১৬৮১.৫০ বর্গ. কি.মি.

☐ সুন্দরবনের বনহাসিল করা লোকালয়, কৃষিক্ষেত্রে ও লবণ জলীয় মাছ চাষের ভেড়ী = ৫৩৬৩·৪ বর্গ. কিমি

সারণি-২

সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রকল্প অধিগ্রহণের সময়

- সুন্দরবন উন্নয়নপর্ষদ গঠিত হয়—(৯৬৩০ বর্গ. কি.মি.) = ১৯৭৩ সাল
- সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প গঠিত হয়—(২৫৮৫.১০ বর্গ. কি.মি.) = ১৯৭৩ সাল
- সুন্দরবন কুমীরপ্রকল্প (ভগবৎপুরে)— = ১৯৭৬ সাল
- সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা (৩৬২.৪০ বর্গ কি.মি.)— = ১৯৭৬ সাল
- লোথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা (৩৮ বর্গ কি.মি.) = ১৯৭৬ সাল
- হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা (৫.৯৫ বর্গ কি.মি) = ১৯৭৬ সাল
- সুন্দরবন জাতীয় অরণ্য বা উদ্যানরূপে ঘোষণা (১৩৩০.১০ বর্গ কি.মি.) = ১৯৮৪ সাল
- সুন্দরবন জীবমন্ডল সংরক্ষণ ঘোষণা (৯৬৩০ বর্গ কি.মি) = ১৯৮৯ সাল
- সুন্দরবনকে বিশ্বের জীববৈচিত্র্য ক্ষেত্র ঘোষণা করে (World Heritage Site) = ১৯৮৪ সাল

সারণি-৩

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্পের আয়তন ও ভৌগোলিক অবস্থান

- সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অন্তগর্ত মোট অঞ্চল = ২৫৮৫·১০ বর্গ. কি.মি.

  Δ সুন্দরবন ব্রাঘ্রপ্রকল্পের অন্তর্গত কোর অঞ্চল, যা ১৯৮৪ খ্রীঃ জাতীয় উদ্যানরূপে ঘোষণা হয়েছে = ১৩৩০·১০ বর্গ. কি.মি.

  Δ সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অন্তর্গত বাফার অঞ্চল = ৮৯২·৬০ বর্গ. কি.মি.

  Δ সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য = ৩৬২·৪০ বর্গ. কি.মি.

☐ ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তগর্ত মোট বনাঞ্চল = ১৬৮০ বর্গ. কি.মি.

☐ ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট জলাঅঞ্চল যথা—নদী, সুঁতিখাল, খাল ইত্যাদি = ৯০৪·৭৮ বর্গ. কি.মি.

সারণি-৪

সুন্দরবনের ব্যাঘ প্রকল্পে অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লক ও স্থানের পরিমাণ।

ক্রমিক সংখ্যা	ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত ব্লকের নাম ও বন কম্পার্টমেন্টের সংখ্যা	মোট পরিমাণ (হেক্টর)
১.	পঞ্চমুখানী—৫টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,৬৬৫·৯৬
২.	পীরখালী—৭টি কম্পার্টমেন্ট	১৮,৫৭৬·১২
৩.	মাতলা—৪টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,৬২৯·৯৪
৪.	চামটা—৮টি কম্পার্টমেন্ট	২২,০৬৮·৬৯
৫.	ছোটহরদি—৩টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,৫৬৬·৮১
৬.	গোয়াসবা—৪টি কম্পার্টমেন্ট	১৭,১৭৩·০৩
৭.	গোনা—৩টি কম্পার্টমেন্ট	১৩,৯০৩·৪৬
৮.	বাগমারা—৫টি কম্পার্টমেন্ট	২৯,৩৯৩·৩৫
৯.	মায়াদ্বীপ—৫টি কম্পার্টমেন্ট	২৭,৩৩৬·২৬
১০.	আরবেশী—৫টি কম্পার্টমেন্ট	১৫,০৪২·৬৯
১১.	ঝিলা—৫টি কম্পার্টমেন্ট	১২,৩১৩·৮০
১২.	খাটুয়াঝুড়ি—৩টি কম্পার্টমেন্ট	১৩,২৪১·৩৭
১৩.	হরিণভাঙ্গা—৩টি কম্পার্টমেন্ট	১১,৬৮৬·৯১
১৪.	নেতীধোপানি—৩টি কম্পার্টমেন্ট	৯,৩০০·০০
১৫.	চাঁদখালি—৪টি কম্পার্টমেন্ট	১৫,৫৯০·৬৫
মোট	=	২,৫৮,৪৮৯·০৪

সারণি-৫

সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অন্তর্গত ব্লকঅঞ্চলে নাম ও পরিমাণ।

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	মোট স্থানের পরিমাণ (হেরে)	জলাভূমির পরিমাণ (হেরে)	বনাঞ্চলের পরিমাণ (হেরে)
১.	পঞ্চমুখানি ব্লক	১৭,৬৬৫·৯৬	৩,৭১৯·১৯	১৩,৯৪৬·৭৭
২.	পীরখালি ব্লক	১৮,৫৭৬·১২	৪,৮৯১·৬০	১৩,৬৮৪·৫২
৩.	মাতলা ব্লক	১৭,৬২৯·৯৪	৬,১২২·৩০	১১,৫০৭·৬৪
৪.	চামটা ব্লক	২২,০৬৪·৬৯	৫,১৯২·৭০	১৬,৮৭৫·৯৯
৫.	ছোটহরদি ব্লক	১৭,৫৬৬·৮১	৮,৩০৬·০৬	৯,২৬০·৭৫
৬.	গোয়াসবা ব্লক	১৭,১৭৩·০৩	৬,৬৫৮·৯৩	১০,৫১৪·১০
৭.	সোনা ব্লক	১৩,৯০৩·৪৬	৫,৩৪০·৮২	৮,৫৬২·৬৪
৮.	বাগমারা ব্লক	২৯,৩৯৩·৩৫	১২,৮১৬·৮৪	১৬৫৭৬·৫১
৯.	মায়াদ্বীপ ব্লক	২৭,৩৩৬·২৬	১৪,৩৩৮·১১	১২,৯৯৮·৮৪
১০.	আরবেশী ব্লক	১৫,০৪২·৬৯	৫,৩৭৮·৮৬	৯৬৬৩·৮৩

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	মোট স্থানের পরিমাণ (হেঃ)	জলাভূমির পরিমাণ (হেঃ)	বনাঞ্চলের পরিমাণ (হেঃ)
১১.	ঝিলা ব্লক	১২,৩১৩·৮০	৩,৫৭৩·০৯	৮,৭৪০·৭১
১২.	খাটুয়াঝুরী ব্লক	১৩,২৪১·৩৭	৩,৬৯৩·৬৯	৯,৫৪৭·৬৪
১৩.	হরিণভাঙা ব্লক	১১,৬৮৬·৯১	৩,২৯৫·৮৭	৮,৩৯১·০৪
১৪.	নেতাধোপানী ব্লক	৯,৩০০·০০	২,৮৫২·৩২	৬,৪৪৭·৬৮
১৫.	চাঁদখালী ব্লক	১৫,৫৯০·০০	৪,২৯৭·৫০	১১,২৯৩·১৫
	মোট	২,৫৮,৪৮৯·০৪	৯০,৪৭৭·৮৮	১,৬৮,০১১·১৬

* সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত মোট অঞ্চল = ২৫,৮৪৮৯·০০ হেক্টর
* সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত জলা অঞ্চল = ৯০,৪৭৭·৮৮ হেক্টর
* সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত বনভূমি = ১,৬৮০,১১·১৬ হেক্টর

সারণি-৬
সুন্দরবনের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লক (জনবসতি) অঞ্চল, মোট ভৌগোলিক আয়তন কৃষিজমির পরিমাণ ও জনসংখ্যা (১৯৯১ লোকগণনা)

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	ভৌগোলিক অঞ্চল (হেক্টর)	কৃষি জমির পরিমাণ (হেক্টর)	জনসংখ্যা (হেক্টর)
		দক্ষিণ ২৪-পরগনার অন্তর্গত ১৩টি ব্লক অঞ্চল		
১.	গোসবা	৩৩,৭২৫ হেক্টর	২৪,৯৯০ (৪৫৩০)	২,০০,৫১৪
২.	বাসন্তী	২৯,০০০ হেক্টর	২৩,৩৫৯ (৯৮০)	২,২৬,৯৭৪
৩.	ক্যানিং—১	২০,৫৬৮ হেক্টর	১৪,২৫২ (১০৪৫)	২,০৬,১০০
৪.	ক্যানিং—২	২২,৫২৮ হেক্টর	১৮,০৯০ (২২৪০)	১,৫১,৬৩৫
৫.	জয়নগর—১	১২,৭১১ হেক্টর	৯,৯০৩ (১৭৪০)	১,৮৫,২৭১
৬.	জয়নগর—২	১৭,৫১৮ হেক্টর	১৪,৭৭৮ (১২৯৫)	১,৭৭,৩৩৫
৭.	কুলতলী	২৩,৯৪৮ হেক্টর	১৮,৮২৬ (১১৬০)	১,৫৬,৪৫০
৮.	মথুরাপুর—১	১৪,৮৩৮ হেক্টর	১২,১২০ (১৮৬০)	১,৪১,৮৮৮
৯.	মথুরাপুর—২	২৩,০৫০ হেক্টর	১৮,৪২৫ (৩৩০৬)	১,৭২,৯৮২
১০.	পাথরপ্রতিমা	৪৬,৯৫০ হেক্টর	৩১,৪৫৫ (২৮৬৫)	২৪৫,৬০১
১১.	নামখ[illegible]	২২,৭২৩ হেক্টর	১৬,৮৮০ (১৭২০)	১,৩৪,৩৫৪
১২.	সাগ[illegible]	৪৭,০৮০ হেক্টর	১৫,৫৪৪ (২০৯১)	১,৫৪,২০২
১৩.	কাক[illegible]	২৬,১১০ হেক্টর	২১,০৪০ (১৬৭০)	২,২৬,৯৭৪
		উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত ৬টি ব্লক অঞ্চল		
১৪.	মিনা[illegible]	২০,০৯৫ হেক্টর	১১,৫৯০ (১৬৮৭)	১,৩৭,৩৬১
১৫.	হা[illegible]	১৫,৬৭৫ হেক্টর	৯,৭৭০ (৪৪৫৬)	১,৫১,১০০
১৬.	স[illegible]	১৭,৬৭৯ হেক্টর	১২,০০০ (৪৫৭)	১,২০,৫৩৯
১৭.	স[illegible]	১৯,৫০০ হেক্টর	১২,০০০ (৪৪৬)	১,১৮,৮৯৫
১৮.	হাস[illegible]	১৪,৬৮৮ হেক্টর	১১,৫০০ (৯৭১)	১,৫১,১১৫
১৯.	হিং[illegible]	২৩,০৪০ হেক্টর	১৪,০০০ (৫২২)	১,৪২,২৯১
		৪,৫১,৪২৬ হেক্টর	৩১০৫৬২ (৩৫,০৪১)	৩১,৬৪,৬৯৫

মোট কৃষি জমির পরিম[illegible] বর্গ কি. মি. মোট জন সংখ্যা=৩১,৬৪,৬৯৫

*( ) ব্রাকেটের মধ্যে [illegible] জমি দেখানো আছে।

সারণি-৭

সুন্দরবনের ভয়াবহ ও মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূকম্পের খতিয়ান।

খ্রীঃ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	খ্রীঃ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	খ্রীঃ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ
১৫৮২	ঘূর্ণিঝড়	১৮৭৭	৩ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯২৭	১ বার ঘূর্ণিঝড়
১৬৮৮	ঘূর্ণিঝড়	১৮৭৮	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯২৮	১ বার ঘূর্ণিঝড়
১৭০৭	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮০	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯১৯	১ বার ঘূর্ণিঝড়
১৭৩৭	ঘূর্ণিঝড়, ভূকম্প	১৮৮১	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৩২	মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়
১৭৪২	ঘূর্ণিঝড়	১৮৮২	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৩৪	মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়
১৭৬২	ভূকম্প	১৮৮৩	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৩৫	মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়
১৭৭০	দুর্ভিক্ষ	১৮৮৪	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৩৬	মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়
১৭৯১	দুর্ভিক্ষ	১৮৮৫	১ বার বন্যা	১৯৩৭	মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়
১৮২৩	বন্যা	১৮৮৭	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৪০	ঘূর্ণিঝড়
১৮৩০	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৮৮	৩ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৪১	ঘূর্ণিঝড়
১৮৩২	৩ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৮৯	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৪২	দুর্ভিক্ষ
১৮৩৩	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৯০	১ বার বন্যা	১৯৪৩	ঘূর্ণিঝড়
১৮৩৪	১ বার বন্যা	১৮৯৩	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৪৮	ঘূর্ণিঝড়
১৮৩৯	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৪	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৫৬	ঘূর্ণিঝড়
১৮৪০	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৫	১ বার ভূকম্প	১৯৬০	ঘূর্ণিঝড়
১৮৪২	১ বার ভূকম্প	১৮৯৬	৫ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৬১	ঘূর্ণিঝড়
১৮৪৪	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৭	১ বার ভূকম্প	১৯৬২	ঘূর্ণিঝড়
১৮৪৮	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৮	৪ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৬৫	ঘূর্ণিঝড়
১৮৫০	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৮৯৯	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৬৬	বন্যা
১৮৫২	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯০০	১ বার বন্যা	১৯৬৮	মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়
১৮৫৬	১ বার বন্যা	১৯০১	৪ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৭০	ঘূর্ণিঝড়
১৮৫৮	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯০৪	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৭৩	ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা
১৮৫৯	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯০৭	২ বার বন্যা	১৯৭৬	বন্যা
১৮৬২	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯০৯	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৭৮	বন্যা
১৮৬৪	১ বার বন্যা/ঘূর্ণিঝড়	১৯১৩	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৮১	ঘূর্ণিঝড়
১৮৬৫	দুর্ভিক্ষ	১৯১৬	২ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৮২	ঘূর্ণিঝড়
১৮৬৭	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯১৭	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৮৫	ঘূর্ণিঝড়
১৮৬৮	১ বার বন্যা	১৯১৯	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৮৮	মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়
১৮৬৯	১ বার বন্যা	১৯২১	২ বার দুর্ভিক্ষ	১৯৯১	ঘূর্ণিঝড়
১৮৭১	১ বার বন্যা	১৯২২	১ বার ঘূর্ণিঝড়	১৯৯৪	ঘূর্ণিঝড়

সারণি-৮

সুন্দরবনের ভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ ও ম্যানগ্রোভ সহবাসী উদ্ভিদ।

ক্রমিক নং	প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	উপস্থিতির হার
* ১.	*রাইজোফোরা এপিকুলেটা ব্লুম*	ভোরা বা ভরা	+
* ২.	*রাইজোফোরা মিউক্রোনেটা ল্যামার্ক*	খামু বা গর্জন	+++

ক্রমিক নং	প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	উপস্থিতির হার
* ৩.	*ব্রুগুইয়েরা জিম্‌নোরাইজা* (লিন.) ল্যামর্ক	কাঁকড়া	+++
* ৪.	*ব্রুগুইয়েরা সেক্সাংগুলা* (লাউর) পয়ার	কাঁকড়া	+
* ৫.	*ব্রুগুইয়েরা পারভিফ্লোরা* (রক্সবার্গ) ওয়াইল্ড ও আরনল্ড	বকুল কাঁকড়া	+
* ৬.	*ব্রুগুইয়েরা সিলিনড্রিকা* (লিন.) ব্লুম	বকুল কাঁকড়া	++
* ৭.	*সেরিওপস ট্যাগাল* (পার) রবিন্স	মটগরাণ	++
* ৮.	*সেরিওপস ডেকান্ড্রা* (গ্রীফিথ) ডিংহো	জেলেগরাণ	+++
* ৯.	*ক্যাণ্ডেলিয়া ক্যাণ্ডেল* (লিন.) ড্রুস	গড়িয়া	++
* ১০.	*অ্যাভিসিন্নিয়া অফিসিনালিস* লিন.	জাতাবান	+++
* ১১.	*অ্যাভিসিন্নিয়া ম্যারিনা* (ফ্রসকাল) ভিরাহ্	পেয়ারাবান	+++
* ১২.	*অ্যাভিসিন্নিয়া অ্যালবা* ব্লুম	কালবান	+++
* ১৩.	*সোন্নারেসিয়া অ্যাপেটালা* বুচ হ্যাম	কেওড়া	+++
* ১৪.	*সোন্নারেসিয়া ক্যাসিওলারিস* (লিন.) এংগলার	চাককেওড়া	+
* ১৫.	*সোন্নারেসিয়া গ্রীফিথি* কার্জ	ওড়া	++
* ১৬.	*সোনারেসিয়া অ্যালবা* স্মিথ্	ওড়া	+
* ১৭.	*জাইলোকার্পাস গ্রানাটাম* কোয়েন	ধুদুল	+++
* ১৮.	*জাইলোকার্পাস মেকনজেন্‌সিস* পাইরি	পশুর	+++
* ১৯.	*অ্যাগলাইয়া কুকুল্লাটা* পেলেগ্রীন	আমুর	+
* ২০.	*হেরিটেরিয়া ফোমিস* বুচ হ্যাম	সুন্দরী	++
* ২১.	*অ্যাজিএলাইটিস রোটান্ডিফোলিয়া* রক্সবার্গ	তরা	+++
* ২২.	*অ্যাজিসেরাস করনিকুলেটাম* (লিন.) ব্লাঙ্কো	খলসি	+++
* ২৩.	*লুমনিটজেরা রেসিমোজা* ওয়াইল্ড	কৃপাল	++
* ২৪.	*এক্সোকারিয়া অ্যাগালোচা* লিন.	গেঁওয়া	+++
* ২৫.	*ব্রাউনলোবিয়া ল্যানসিওল্যাটা* বেন্থ	লতা সুন্দরী	+
* ২৬.	*স্কাইফিফোরা হাইড্রোফাইলেসিয়া* গার্টেন এফ	টাগরীবাণী	+
** ২৭.	*অ্যাটালানসিয়া কোরিয়া* এম. রোয়েম	বনলেবু	+
* ২৮.	*নিপা ফ্রুটিক্যানস* ওয়ারম্ব	গোলপাতা	++
* ২৯.	*ফোনিক্স পালুডোজা* রক্সবার্গ	হেঁতাল	+++
* ৩০.	*অ্যাকান্থাস ইলিসিফোলিয়াস* লিন.	হরগোজা	+++
* ৩১.	*অ্যাকান্থাস ভলাবিলিস* ওয়াল	লতা হরগোজা	+
** ৩২.	[illegible] ভড্রা[illegible]রমি (লিন.) গার্টেন	বন জুঁই	+++
** ৩৩.	[illegible] *রিয়াম* লিন.	হুডো	+++
** ৩৪.	[illegible] *স্কোয়ার্কটাটা* টেকিওকা	ধানী ঘাস	+++
** ৩৫.	[illegible] লিন.	বন ঝাউ	+++
** ৩৬.	[illegible] হোল	নোনা ঝাউ	+++
** ৩৭.	[illegible] রক্সবার্গ	লাল ঝাউ	+++
** ৩৮.	[illegible] *পেন্‌সিস* বুম্রক	নোনা কচু	+++
** ৩৯.	[illegible] কার গারওয়াল	সুখদর্শন	++
** ৪০.	[illegible] *ক্যারিন্যাটাস* ওয়াল.	বাওলে লতা	+++
** ৪১.	[illegible] *গ্লাবোসাস* ওয়াল.	বাওলে লতা	++
** ৪২.	[illegible] *ইটিকা* ওয়াল.	মান্দা লতা	++
** ৪৩.	[illegible] *কেটা* (লিন.) ইটিং	পরগাছা	++
** ৪৪.	[illegible] *নটেলি* ওয়াইল্ড	মান্দা	+++
** ৪৫.	[illegible] *পাইনোজা* রক্সবার্গ	চুলিয়া কাঁটা	+

ক্রমিক নং	প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম	উপস্থিতির হার
** ৪৬.	*ডেরিস ইন্ডিকা বেনেট*	করঞ্জা	+++
** ৪৭.	*ডেরিস ট্রাইকোলিএটা লাউর*	পানলতা	+++
** ৪৮.	*ডেরিস স্ক্যান্‌ডেন্স বেন্থ*	নোয়ালতা	+++
** ৪৯.	*সিজালপিনিয়া বন্ডুক রক্সবার্গ*	নাটা	+++
** ৫০.	*সিজালপিনিয়া ক্রিস্টা লিন.*	সিংগ্রীলতা	+++
** ৫১.	*সাইনোমেট্রো র‍্যামীফ্লোরা লিন.*	সিংগার	+
** ৫২.	*সোলানাম ট্রাইলোবেটাম লিন.*	লতান বেগুন	+++
** ৫৩.	*সেসুভিয়াম পরটুল্যাকাস্ট্রাম লিন.*	যদুপালং	++
** ৫৪.	*হেলিওট্রফিয়াম কুরাসেভিকাম লিন.*	নোনা হাতিশুঁড়	++
** ৫৫.	*আইপোমিয়া পেসক্যাপরি সুইট*	ছাগলকুঁড়ি	+++
** ৫৬.	*সুয়েডা নুডিফ্লোরা রক্সবার্গ*	গিরিয়া শাক	+++
** ৫৭.	*সুয়েডা মেরিটিমা ডুমোঁট*	গিরিয়া শাক	+++
** ৫৮.	*হিবিসকাস টিলিয়েসিয়াস লিন.*	ভোলা	++
** ৫৯.	*হিবিসকাস টুরটুওসাস রক্সবার্গ*	বনভেন্ডি	+
** ৬০.	*থেসপেসিয়া পপুলনিয়া সোলান্ডার*	পরশ	+++
** ৬১.	*ক্রিস্টোকোরাইন সিলিয়েটা রক্সবার্গ*	কেরালী	+
** ৬২.	*রুপিয়া ম্যারিটিমা লিন.*	নোনা ঝাঁজি	++
** ৬৩.	*মিমিসপস অরবিকুলোরিস বেন্থ*	———	+
** ৬৪.	*স্যালিকরনিয়া ব্যাক্রিয়েটা রক্সবার্গ*	নোনাশাক	++

দ্রঃ— ক্রমিক নং এরপাশে—'*' চিহ্ন দ্বারা দেখান হয়েছে প্রকৃত ম্যানগ্রোভ এবং ক্রমিক নং এর পাশে '**' চিহ্ন দ্বারা দেখান হয়েছে ম্যানগ্রোভ সহবাসী বা পশ্চাৎ ম্যানগ্রোভ। + চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে উপস্থিতির হার; যে প্রজাতি ক্ষেত্র '+++' চিহ্ন দ্বারা দেখান হয়েছে সর্বত্র উপস্থিত। '++' চিহ্ন দ্বারা দেখান হয়েছে মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় ও '+' চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে যে অল্পই পাওয়া যায়।

সারণি ৯

সুন্দরবনের বিপন্নপ্রায় প্রাণী প্রজাতি

	বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম		বৈজ্ঞানিক নাম	স্থানীয় নাম
১।	ক্রোকোডাইলাস পরোসাস	মোহনার কুমীর	৬।	কাচুগা টেক্টা	সামুদ্রিক কচ্ছপ
২।	গ্যাভেলিস গ্যাংগেটিকাস	মেছো কুমীর	৭।	ভারানাস বেঙ্গালেসি	গোসাপ
৩।	লেপিডোচেলিস অলিভেসিয়া	অলিভ কাঠা	৮।	ভারানাস স্যালভাটির	গোসাপ
৪।	বাটাগুর বাসকা	বাটাগুর কাঠা	৯।	ভারানাস ফ্ল্যাভেসেন্স	গোসাপ
৫।	লেসিমিস পাংক্টাটা	সামুদ্রিক কচ্ছপ	১০।	পাইথন মলুরাস	ময়েলসাপ

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

Banerjee, L.K., A.R.K. Sastri & M.P. Nayar (1989) *Mangroves in India* : Identification M'anuae, BSI, Govt. India, pp. 1-113.

Blasco, F. (1975). *The Mangroves in India* (transtated by Mrs. K. Thanikaimoni from LES MANGROVES DE L'INDE),

Institute Francais de Pondecherry, Inde, Shri Aurobinda Ashram, Pondicherry, India.

Banerjee, A. K. (1964). *Forests of Sundarbans.* Centenary Commemoration Volume, Writer's Buildings, Calcutta, India, pp. 166-175.

Deb, S. C. (1956). Paleoclimatology and Geophysics of the Ganga Delta, *Geogr. Rev. Ind. 28*:11-18. Gupta, A.C. (1957). the Sundarsans, its problems. its possibilities. *Indian Forester, 83* : 481-487.

Ghosh, A.K. (1940). Submerged Forests in Calcutta, *Sci. & Cult., 6* : 669-670.

Maity, J. (1976). *Mahatirtha Ganga Sagar,* Progressive Book Forum, Calcutta, pp. 1-122.

Mandal, A. K. and R. K. Ghosh (1989). *Sundarbans : A Socio-Bio-Ecological Study.* Bookland Private Ltd. Calcutta-1-194.

Das, A. K. (1981). A Focus on Sundarbans. Calcutta Editions. India Naskar, K. R. (1983). Halophytes and their Unique Adaptation on the Sundarbans. Mangrove Swanps, *J. Indian Soc. Coastal agric. Res. 1* (2) : 91-105.

Naskar, K. R. (1993). *Plant Wealth of the Lower Ganga Delta*—An Eco-Taxononical Approach, 2 vols., Daya Publishing House, Delhi-110006, pp. 1-810.

Naskar, K. R. (1998). *Bharater Sundarban O Mangrove Udvid.* West Bengal State Book Board, pp. 1-256.

Naskar, K.R. & D. N. Guha Bakshi (1987). *Mangrove Swamps of Sundarbans—An Ecological Perspectives.* Naya Prokash, Calcutta—1-263.

Naskar, K. R. & R. N. Mandal (1999). *Ecology and Bio-diversity of Indian Mangroves.* Daya Publishing House, 2 vols. pp. 1-754.

Rao, R.S. (1959). Observations on the Mangrove Vegetation of Godavari Estuary, *Proc. Mangrove Symp., India,* Faridabad, pp. 36-44.

Sanyal, P., L. K. Banerjee & M. K. Chowdhury (1984). Dancing Mangals of Indian Sundarbans. *J. Indian Soc-Coastal agric. Res.2* (1) : 10-16.

Tomlinson, P. B. (1986). *The Botany of Mangroves.* Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, pp. 1-414.

Chaudhuri, A. B. & A. Choudhury (1994). Mangroves of the Sundarbans. Volume : One-India, IUCN, Bangkok, Thailend, pp. 247.

লেখক পরিচিতি : ন্যাশন্যাল ফেলো, সুন্দরবনের গাছগাছালি-তার বাস্তুতন্ত্র, মাছ—চিংড়ি—কাঁকড়া চাষআবাদ নিয়ে প্রায় ২৫ বছর যাবৎ গবেষণায় রত এবং সুন্দরবনের উদ্ভিদ বাস্তুতন্ত্র, প্রাণী সম্পদ, কৃষি ও আর্থসামাজিক সম্বন্ধিয় ৬টি গবেষণামূলক বই ইংরাজী ও বাংলায় প্রকাশ; এছাড়া শতাধিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র প্রকাশিত।

বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের স্বীকৃতি হিসাবে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ডঃ নস্করকে ন্যাশন্যাল ফেলো হিসাবে ঘোষণা করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র বিষয়ক গবেষণার দায়িত্ব প্রদান করেছে। ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমি (INSA) ও জাতীয় সামুদ্রিক গবেষণা সংস্থা (NIO, Goa) ডঃ নস্করকে অনাবাসিক ফেলো নির্বাচিত করে।

তুষার কাঞ্জিলাল
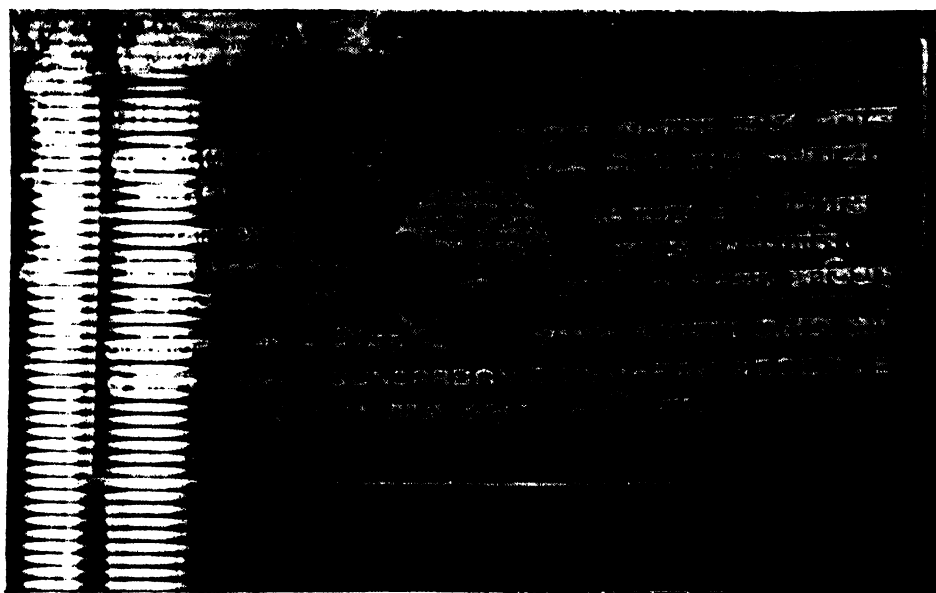
সুন্দরবনের প্রকৃতি, মানুষ ও উন্নয়ন

কোনও বাস্তব সমস্যার কথা দু-চার পাতায় লেখার বিপদ অনেক। কোনও কোনও পাঠক অহেতুক চটে যান লেখকের ওপর, বেশির ভাগই মূল বক্তব্যকে জেনে- বুঝে নিস্পৃহ থাকেন এবং তার অনুষঙ্গগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পছন্দ করেন। যে ঝোপের নিচে কেউটে সাপের অবস্থান নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত, তাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে আশপাশের ঝোপে দমাদম লাঠি চালিয়ে নিজের সমাজচেতন ভাবমূর্তি রক্ষা ও জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া উভয় কার্যই সাধিত হয় কিন্তু সমস্যার সমাধান একচুলও এগোয় না। লেখকের বেদনাও ঠিক সেইখানে। 'সমাজ' উন্নয়নের প্রচলিত মডেল যখন প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর বিপজ্জনকভাবে আগ্রাসন করে, তখন কেউ চেঁচামেচি শুরু করলেই তাকে ইকো-টেররিস্ট বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে গাল পাড়াটা এখন জাতীয়তাবোধ ও প্রগতিশীলতার সমার্থক বলে গণ্য হয়। এত সব অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেও সুন্দরবনের জঙ্গল-নদী-গ্রাম-বাঁধ-চাষবাস আর মানুষ নিয়ে আমার উপলব্ধিগুলোকে উপস্থাপনা করার সাহস পাই এই কারণে যে, এর পরেও যদি মুখ বুজে থাকি তাহলে তা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল হবে। সুন্দরবনের প্রকৃতি আর মানুষ অকৃপণ হাতে আমাকে দান করেছেন, আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন— তাঁদের প্রতি এতটা অকৃতজ্ঞ হলে ধর্মে সইবে না। কথা বলে কাউকে কিছু বোঝানো যায় তা বিশ্বাস করি না—কিন্তু কিছু করে দেখাতে গেলেও দু-চার কথা না বললেই নয়। সে বলার কোনও বিকল্প নেই।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুন্দরবন থেকে সরিয়ে এনে সেখানে জঙ্গল সৃষ্টি করা অত্যন্ত অবাস্তব প্রস্তাব বা সুন্দরবনের মানুষ তাদের আহার, ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য জল, মাটি এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার করবেন না সেটাও অসম্ভব। তাই বর্তমান বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে গোটা সুন্দরবনের সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার ভারসাম্য রক্ষা করাই আজকে প্রথম কাজ। সরকারি বনবিভাগ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, কৃষি বিশেষজ্ঞ, মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞ এরা সবাই এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন এবং নানা ধরনের সমাধানের পথ বাতলাচ্ছেন। এটা শুধু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। গোটা পৃথিবীজুড়ে নানা অঞ্চলে বায়োস্ফিয়ার গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণের দায় তার যে দুর্ঘটনার জন্য দায়ি, বিশেষ করে দায়টা আরও বেশি করে অনুভূত হয় যখন বোঝা যায় ক্ষতিপূরণ না দিয়ে পালাবার পথ নেই। প্রকৃতির কাছে মানুষের অপরাধটাও অনুরূপ। মানুষই ভোগ ও লালসার তাড়নায় তার রাক্ষুসে ক্ষিদে মেটাতে প্রকৃতিকে নানাভাবে প্রতিনিয়ত আঘাত করে চলেছে। সুতরাং সমস্যাগুলি সমাধানের দায়িত্ব মানুষের ওপরই বর্তায়। আবার প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে মানুষ বিপর্যস্ত করলে বিপদগ্রস্ত হতে হবে সেই মানুষকেই। সুতরাং যে দুটো কাজ করলে এটা করা সম্ভব তার কোনটাই আমরা সঠিকভাবে করছি না। প্রথমটি হচ্ছে প্রকৃতিকে আরও দূষিত করার চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া এবং শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিসীম প্রসার ঘটিয়ে প্রকৃতিকে আঘাত ও শোষণ করার প্রয়াস কমানো, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—এ সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া যে, প্রকৃতিকে জয় করে মানবসভ্যতার সঠিক অগ্রগতি এবং মানুষের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। একটি মাত্র পথ যা মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে তা হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা করে তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলা।

আমি গত ত্রিশ বছর বনবাসী। সাগর, নদী, জঙ্গল এগুলিই আমার ঘনিষ্ঠতম পরিবেশ এবং শেষ রক্ষাকর্তা। এ জঙ্গল, নদী, সমুদ্র কোনটাই মানুষের তৈরি নয়। প্রকৃতি নিজের খেয়ালে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় ২৫,৫০০ বর্গ কিমি জুড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদাবনের এ ব-দ্বীপ গড়ে তুলেছে। অজস্র নদী-নালা ঘেরা ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবন। ভারতের ভাগে যে অঞ্চল, তার

Map - 2. Sundarbans Tiger Reserve, India
(Scale 1" = 4 miles)

Blocks	Area (Sq. km.
Panchamukhani – 5 nos.	17,665.96
Pirkhali – 7 nos.	18,576.12
Matla - 4 nos.	17,629.94
Chamta – 8 nos.	22,068.69
Chotohardi - 3 nos.	17,566.81
Goasaba - 4 nos.	17,173.03
Gona - 3 nos.	13,903.46
Bagmara - 8 nos.	29,393.35
Mayadwip - 5 nos.	27,336.26
Arbesi – 5 nos.	15,042.69
Jhilla – 5 nos.	12,313.80
Khatuajhuri – 3 nos.	13,241.37
Harinbari – 3 nos.	11,686.91
Netidhopani – 3 nos.	9,300.00
Chandkhali – 4 nos.	15,590.00
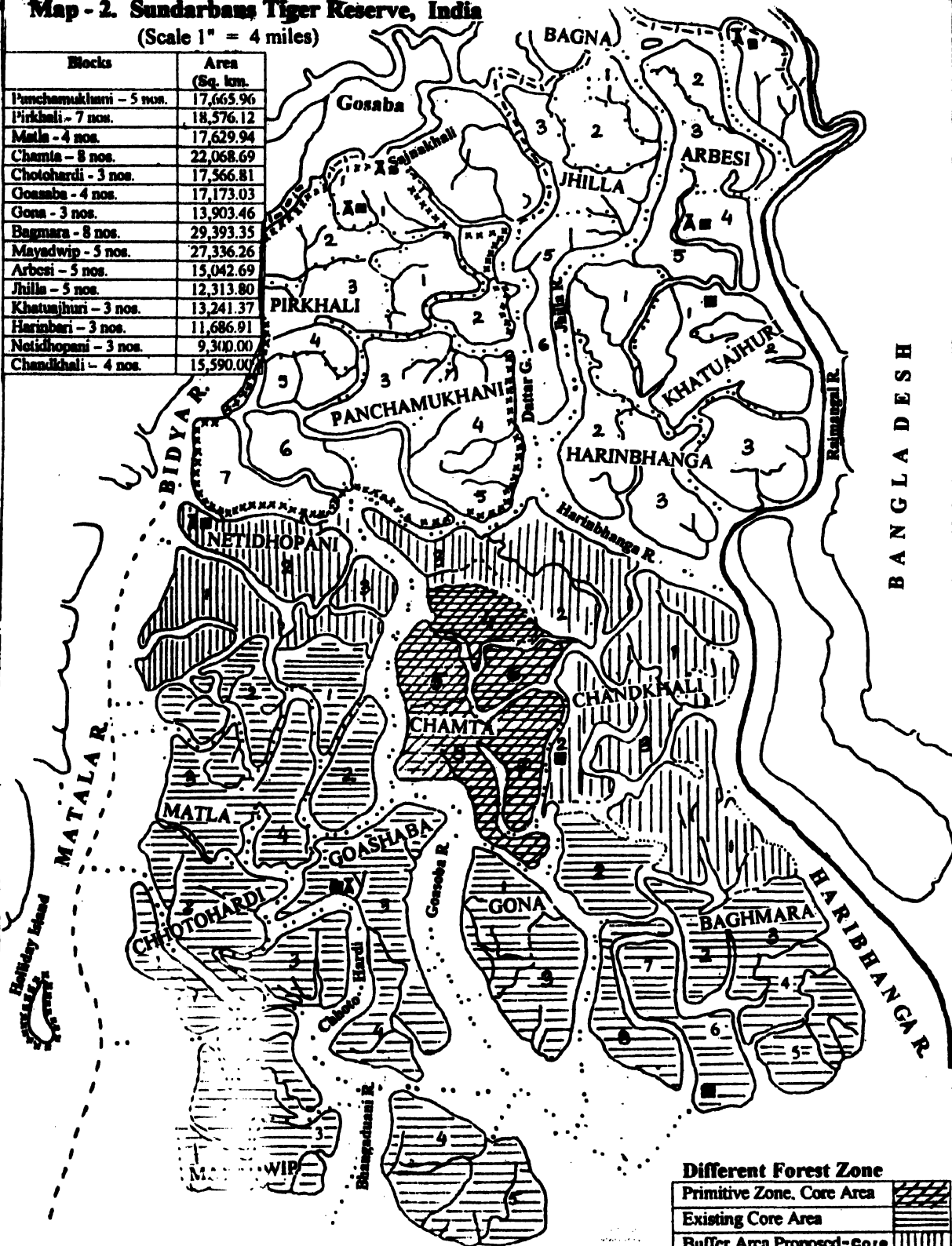
BAGNA
Gosaba
Sajnakhali
JHILLA
ARBESI
PIRKHALI
KHATUAJHURI
PANCHAMUKHANI
Dattar G.
Jhilla R.
Raimangal R.
BANGLADESH
BIDYA R.
HARINBHANGA
Harinbhanga R.
NETIDHOPANI
CHANDKHALI
CHAMTA
MATLA R.
MATLA
GOASHABA
Gosaba R.
GONA
CHHOTOHARDI
Holliday Island
BAGHMARA
HARIBHANGA R.
Chhoto Hardi
Bhangaduani R.
WIP
BAY OF BENGAL
Different Forest Zone
Primitive Zone, Core Area
Existing Core Area
Buffer Area Proposed-core
Buffer Area
Wild Life Sanctuary
Tower
Sweet Water Pond
State Boundary

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য *ছবি : কুমুদরঞ্জন নস্কর*

পরিমাণ ৯,৬৩০ বর্গ কি.মি. জায়গা জুড়ে। এ জঙ্গল ম্যানগ্রোভ ধরনের জঙ্গল এবং গোটা পৃথিবীতে একমাত্র ম্যানগ্রোভ জাতীয় বন যেখানে বাঘ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখনও টিকে আছে।

গঙ্গা অতীতে এখন যেটা সুন্দরবন অঞ্চল তার মধ্য দিয়ে বইত। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময়ে প্রাকৃতিক কারণে বাংলা বেসিন পূর্বদিকে কিছুটা হেলে পড়ায় গঙ্গা তার গতিপথ পালটিয়ে পদ্মামুখি হয়ে অধুনা বাংলাদেশের দিকে বইতে শুরু করে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে সুন্দরবন বর্তমান চেহারা পেয়েছে। এর দুটো বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অন্য কোনও বাদা অঞ্চলে নেই—দ্বীপগুলিকে ঘিরে থাকা নদীগুলিতে জোয়ার-ভাটার নিত্য খেলা এবং উপরের অংশে জলের কোনও উৎস না থাকা।

সুন্দরবন সম্পর্কে যতটুকু জানার চেষ্টা হচ্ছে তা অনেকটাই ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণাভিত্তিক। কিন্তু এ অঞ্চলে যে ভাঙা ঘরবাড়ি এবং আরও নানা নৃ-তাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ মাঝে মাঝেই দেখা যায়, তা নিয়ে খুব একটা গবেষণা হয়নি। এটাও দেখা গেছে যে, সঙ্গমের মুখ থেকে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের গাছের চরিত্রের মধ্যেও একটা পরিবর্তন আসে। যেমন সপ্তমুখী নদীর পশ্চিমে যে ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায় তার পূর্বাংশের বিরাট এলাকাজুড়ে গাছপালা কিছুটা অন্য ধরনের। সুন্দরবন গোটা পৃথিবীজুড়ে উৎখাত হয়ে যাচ্ছে এমন ধরনের গাছপালা ও পশুকে সংরক্ষণ করে চলেছে। সুন্দরবনকে মোটামুটি বোধ হয় কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। **প্রথমটি**—সাগর, মহিষানী, ঘোড়ামারা, স্যান্ড-হেড দ্বীপগুচ্ছ এগুলির জন্মকাল খুব বেশি দিনের নয়। হুগলি নদীর মুখে প্রায় ৯০ বর্গ কিমি অঞ্চলে মনুষ্যবসতি গড়ে উঠেছে এবং চাষবাস হয়। জমিতে নোনার ভাগ কম, এমনকী ৪০ ফুট নিচেও মিষ্টি জল পাওয়া যায়। হুগলি নদীর মিষ্টি জলের প্রভাব এ অঞ্চলে স্পষ্ট।

দ্বিতীয়ত—পশ্চিমে মহিষানী নদী ও পূর্বে ঠাকুরান নদী-মধ্যবর্তী ৯০০ বর্গ কিমি এলাকা। তার মধ্যে ৭০০ বর্গ কিমি এলাকায় মনুষ্য-বসতি গড়ে উঠেছে এবং চাষবাস হয়। এ অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য জলে লবণের মাত্রাধিক্য। তাই এখানকার কৃষি ও মৎস্যচাষ দুটোই লবণ নিয়ন্ত্রিত।

তৃতীয়ত—ঠাকুরাননদী ও মাতলা নদীর মাঝে ১,৬০০ বর্গ কিমি অঞ্চল—এ অঞ্চলে জঙ্গলজুড়ে আছে ১,৪০০ বর্গ কিমি এবং মানুষের বসতি মাত্র ২০০ বর্গ কিমি জুড়ে। এই বনাঞ্চল থেকে কাঠ কেটে শহরে-গঞ্জে চালান করা অন্যতম একটি পেশা।

চতুর্থ অংশটি—পশ্চিমে মাতলা, পূর্বে হরিণভাঙা নদীর মাঝামাঝি অংশ যার আয়তন ১,৭০০ বর্গ কিমি। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এলাকা এ অঞ্চলজুড়ে আছে। এর মধ্যে ১,৩০০ বর্গ কিমি এলাকাকে জাতীয় পার্ক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

পঞ্চম অংশ—৮৮৫ বর্গ কিমি জুড়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের বাফার জোন।

ষষ্ঠ অংশ—মাতলা নদীর পশ্চিমের বাকি অঞ্চল যে ইছামতী নদীর মিষ্টি জলের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সুন্দরবনের গোটা এলাকার মধ্যে এ অঞ্চলেই কৃষি ও মৎস্যচাষের দিক থেকে উন্নত। বাগদার জোগানও এ অঞ্চলে সব থেকে বেশি। সুন্দরবনে গড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৯০০ মিলি। এবং লবণের পরিমাণ ১.১১ শতাংশ থেকে ২.৩৭ শতাংশ পর্যন্ত।

সুন্দরবনের সার্বিক পরিচয় এত স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয় তাই তার পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, বর্তমানের সমস্যা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকটাই বলতে চাইছি। প্রথমেই মনে রাখতে হবে সুন্দরবনের জল, জঙ্গল, নদী, নালা, পশুপাখি সবারই বাসভূমি। যে অঞ্চলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং যে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে প্রায় ২৪ লক্ষ মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে এর সব কিছুই সুন্দরবনের জলহাওয়া এবং বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। সুন্দরবনকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বোধ হয় তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

একটা অঞ্চলে হচ্ছে যেখানে প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে মানুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবমুক্ত থেকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে টিকিয়ে রেখেছে। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে গোটা বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে যে মূল পরিবর্তনগুলি ঘটে চলেছে—যেমন, বাতাস দূষণ, সমুদ্রের জলদূষণ, গ্রিন হাউসের প্রভাব—এ সব কিছু থেকে এ অঞ্চলও মুক্ত নয়।

দ্বিতীয় আর একটা অংশ বনাঞ্চলের মধ্যে আছে যেখানে মানুষের আংশিক অনুপ্রবেশ ঘটতে দেওয়া হচ্ছে। যেমন মানুষ কাঠ কাটতে, মধু ভাঙতে, মাছ ধরতে এ অঞ্চলে ঢুকছেন। ভ্রমণকারীরাও এ সব অঞ্চলে প্রচুর ঘোরাঘুরি করছেন। মানুষের এ ধরনের অনুপ্রবেশ প্রকৃতির মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

কড়খালিতে বিশ্বপরিবেশ দিবসে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল

তৃতীয় অংশ হচ্ছে সুন্দরবনের বিরাট অঞ্চল, যেখানে মানুষ প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করে জঙ্গল কেটে পশুপাখি তাড়িয়ে আবাদ গড়ে তুলেছে। এ অংশে মানুষের সম্পূর্ণ অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং যে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা সবই মনুষ্য-নিয়ন্ত্রিত। মানুষ বাঁচার তাগিদে এখানে জঙ্গল হাসিল করে নদীকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে চাষবাস, মাছধরা এগুলি শুরু করেছিলেন। ভবিষ্যতে উপার্জন বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং লোভের তাড়নায় প্রকৃতিকে অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে ধর্ষণ করে যাবেন এটারই সম্ভাবনা বেশি।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুন্দরবন থেকে সরিয়ে এনে সেখানে জঙ্গল সৃষ্টি করা অত্যন্ত অবাস্তব প্রস্তাব বা সুন্দরবনের মানুষ তাদের আহার, ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য জল, মাটি এবং প্রকৃতিকে ব্যবহার করবেন না সেটাও অসম্ভব। তাই বর্তমান বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে গোটা সুন্দরবনের সামগ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার ভারসাম্য রক্ষা করাই আজকে প্রথম কাজ। সরকারি বনবিভাগ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, কৃষি বিশেষজ্ঞ, মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞ এরা সবাই এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন এবং নানা ধরনের সমাধানের পথ বাতলাচ্ছেন। এটা শুধু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। গোটা পৃথিবীজুড়ে নানা অঞ্চলে বায়োস্ফিয়ার গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। গোটা পৃথিবীর ৭৪টি দেশে ২৬৯টি বায়োস্ফিয়ার অঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবনকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা না থাকলেও যেটুকু জেনেছি তা হচ্ছে প্রধানত এরা তিন ধরনের কাজ করবেন।

প্রথমটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে মানুষের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত অঞ্চল হিসাবে সংরক্ষিত করা। দ্বিতীয় অঞ্চলটি হচ্ছে যেখানে বনাঞ্চল সংরক্ষণ করে নানা ধরনের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটিয়ে একটি সমৃদ্ধ তথ্য-ভাণ্ডার সৃষ্টি করা। এ তথ্যগুলি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে মূলনীতিগুলি ঠিক করতে সাহায্য করবে। দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশগত সব সমস্যাই শেষ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর সমস্যা। যদিও কখনও কখনও তার প্রকাশ স্থানীয় ভিত্তিতে নানা রূপ নিতে পারে। সে কারণে স্থানীয় সমস্যার মূল সমাধানের চেষ্টাও আন্তর্জাতিক চরি[illegible] এবং [illegible] পেতে বাধ্য। তৃতীয় অঞ্চল যেখানে মানুষ বসতি [illegible] তুলেছে[illegible] তাঁদের উৎপাদন পদ্ধতি, উপার্জন বৃদ্ধি এবং জীব[illegible] [illegible] [illegible]মর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হবে। এর একটা [illegible] [illegible] [illegible]র্থনৈতিক কারণে বনাঞ্চলে মানুষের ক্ষতিকারক হ[illegible] [illegible] ব[illegible] [illegible]।

এ সম্পর্কে যতটু[illegible] [illegible] [illegible] মনে হয়েছে চিন্তা এবং ভাবনার দিক থেকে এই [illegible] [illegible] [illegible]ত হবার সুযোগ কম। কিন্তু আমাদের দেশের প্রায় স[illegible] [illegible] [illegible]রিকল্পনা বাস্তব রূপ দেওয়ার মধ্যে একটা বিরাট গর[illegible] [illegible] [illegible]রবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রাথমিক [illegible] [illegible] [illegible]বনের মানুষকেই এর দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। কারণ [illegible] এক[illegible] কাজটা করতে পারেন, অন্য কেউ বোধ হয় নয়। সেট[illegible] [illegible] [illegible] প্রথমে যে কাজটা করা দরকার তা হচ্ছে সব মানুষকে [illegible] [illegible] বলা এবং তাঁদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। [illegible] [illegible] কর্মচারীদের, জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছি যে ব্যাপ[illegible] [illegible] [illegible] এ কাজটা সুন্দরবনে করে চলেছেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই যে বাস্তব অভিজ্ঞতায় এটাকে কিছু না করেই সন্তুষ্ট হবার প্রবণতা বলে মনে হয়েছে। বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বাইরের দু-একজন বিজ্ঞানী এবং ভ্রমণপিপাসু উর্ধ্বতন অফিসারকে নিয়ে, দু-চারজন পঞ্চায়েতের লোক এবং স্থানীয় সরকারি কর্মচারীকে ডেকে বনসংরক্ষণ কমিটি তৈরি করলেই যদি মানুষ সচেতন হত ও বন রক্ষা পেত তাহলে কাজটা সরকারি কর্মচারীদের জন্য আটকে থাকত না।

সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে বনের সম্পর্ক খুব মধুর নয়। মানুষ যুগ যুগ ধরে গাছ কাটতে, মাছ ধরতে, মধু ভাঙতে জঙ্গলে বাঘের শিকার হচ্ছেন। আবার বনের বাঘ ও অনান্য পশুরা মানুষকে তাদের রাজত্বে অনুপ্রবেশকারী বলেই বোধহয় ভাবে। গাছ কাটা, নির্বিচারে মাছ ধরতে গিয়ে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের শিকড় উপড়ে ফেলা, বনের আসল বাসিন্দাদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা, এ সবের স্থায়ী এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া যে মানুষকেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করবে এ সম্পর্কে কোনও সচেতনতা আজও সৃষ্টি হয়নি। এ সব দেখে আমার মনে হয়েছে যে সুন্দরবনবাসীর মধ্যে বন, তার চরিত্র বা বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, গোটা সুন্দরবনের ওপর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বন ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সুন্দরবনবাসীদের দায়িত্বশীল করে তোলার চেষ্টাই প্রধান কাজ। নতুন গবেষণালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এবং তাঁদের গ্রহণযোগ্য করে যদি পৌঁছনো যায় তবেই একমাত্র আসল কাজটা হতে পারে। যেমন নদী সুন্দরবনে যে নতুন জমি সৃষ্টি করছে তাতে বাদা-জঙ্গল তৈরি করা এবং তার সংরক্ষণ সুন্দরবনের মানুষই একমাত্র করতে পারেন।

সুন্দরবনের জঙ্গলে বেআইনিভাবে প্রচুর গাছ কাটা হচ্ছে, প্রতিদিন হাজার হাজার টন কাঠ জ্বালানি হিসাবে শহরে চলে আসছে, এটা সরকারি বা বেসরকারি কারুর কাছে অজানা তথ্য নয়। এটা বন্ধ করার জন্য সরকারি আইন, ব্যবস্থা, কর্মচারী সবই আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে এই বেআইনি কাজ চলছে এবং ভবিষ্যতেও শুধুমাত্র সরকারি এটা বন্ধ করা যাবে না। মানুষ যেমন চেতনা থাকায় নিজের ঘরে আগুন লাগায় না তেমনই একমাত্র নিজের সর্বনাশ সম্পর্কে সচেতন হলেই তাঁরা নিজে থেকে এ অন্যায় বন্ধ করবেন। বাগদা চিংড়ির পোনা ধরা সুন্দরবনের গরিব মানুষের দ্বিতীয় অর্থকরী পেশায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা আইন করে বা জোর করে বন্ধ করা যাবে না। প্রকৃতিকে রক্ষা করে, সুন্দরবনের সর্বনাশ না ঘটিয়ে কী পদ্ধতিতে বাগদা ধরা যায়, অন্য ধরনের মাছগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কী বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যায় এ সম্পর্কে সুন্দরবনের মানুষকে সচেতন করলেই একমাত্র এর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। আমি সুন্দরবনবাসী হিসাবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে এ সচেতনতা সৃষ্টির কাজ ঠিকভাবে এখনও শুরুই হয়নি।

সুন্দরবনেও আজকাল ইস্কুল-কলেজ প্রচুর বেড়েছে। তার কোথায়ও ছাত্রছাত্রীদের সুন্দরবন সম্পর্কে তথ্য শেখানো হয় না। যদি শুধুমাত্র অঞ্চলের স্কুল-কলেজগুলির ছাত্রছাত্রীদের তাদের নিকট পরিবেশে সমস্যা এবং সমাধানের পথ ও স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে তাদের কী করা এবং না করা উচিত এটা অবশ্যপাঠ্য করা হয় তবে আগামী প্রজন্ম যারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে, তারা সচেতন হবে
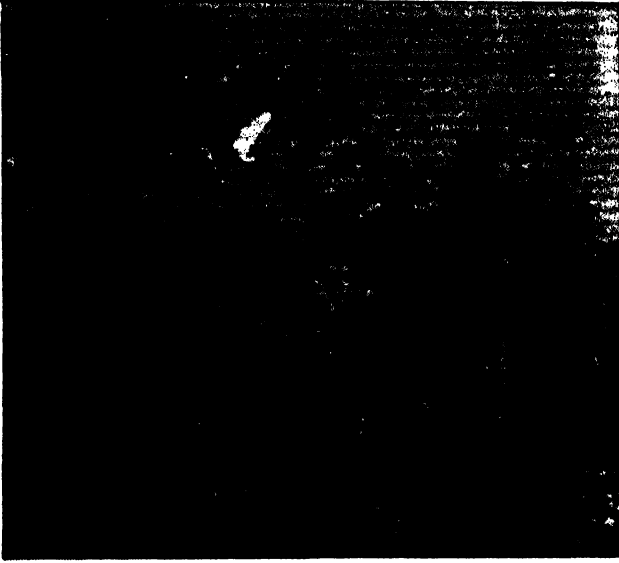
সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য, ছবি : অঞ্জন খান

এবং তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যেও চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। রাজনৈতিক দলগুলি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সর্বস্তরের পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিরও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার আছে। কাউকে সমালোচনা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না নিয়ে একটি বাস্তব সত্য বলতে চাই। সরকারি যে কোনও কর্মসূচিতেই দেখি যারা রূপায়ণের দায়িত্বে থাকেন তাঁদের সব কিছুর মধ্যে দায়সারাভাবে কাজটা করার প্রবণতা থাকে। যে মোটিভেশান থাকলে এত বৃহৎ কাজ করা সম্ভব অনেক ক্ষেত্রে সেই মোটিভেশানের অভাব আছে। সৃষ্টি করা সহজ কাজ নয় কিন্তু না করলে কাজটা কখনোই সঠিকভাবে হবে না। আজকাল সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রেই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সে অংশগ্রহণ পাওয়া এবং পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচিকে এভাবে নিলে সুন্দরবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। সোনার ডিম পেতে হলে হাঁসটাকে বাঁচিয়ে রাখা কর্তব্য। আমরা যদি সেটা না করি তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

সামগ্রিকভাবে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নিয়ে বলার সময়ে একটা কথা বলা হয়নি। ভারতের অন্যান্য জঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরবনের একটা প্রধান পার্থক্য হল জঙ্গল আর মানুষের ভৌগোলিকভাবে পাশাপাশি অবস্থান। অর্থাৎ জঙ্গলের ভেতরে কোনও গ্রাম নেই। মানুষ বাস করে যে গ্রামগুলিতে সেগুলি জঙ্গলের দ্বীপ থেকে আলাদা। পশ্চিমবাংলার সুন্দরবন অংশে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি, তার মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে আবাদ পত্তন হয়েছে। বাকি ৪৮টি দ্বীপে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, যেখানে কোনও মনুষ্যবসতি নেই। এ অঞ্চলের প্রধান বাসিন্দা হচ্ছেন প্রায় চল্লিশ লক্ষের মতো মানুষ এবং তিনশর মতো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এক শতাব্দীরও বেশিকাল আগে থেকে ৫৪টি দ্বীপে মানুষ বসবাস করতে শুরু করেছে। যখন আমরা সুন্দরবন নিয়ে আলোচনা করি তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রসঙ্গ চলে আসে জঙ্গল-সংলগ্ন মানুষের কথা, তাদের গ্রামের বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক খামখেয়ালের মধ্যে মানুষের জীবনধারণের প্রবৃত্তির বর্ণনা। সুন্দরবনের ৫৪টি দ্বীপকে মনুষ্য বাসযোগ্য করে তোলার পূর্বশর্তের প্রথমটি ছিল দ্বীপের জঙ্গল হাসিল করে বাঘ, সাপ এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণীকে দ্বীপ থেকে তাড়ানো। দ্বিতীয়টি নোনা জলের প্লাবন ঠেকাবার জন্য গোটা দ্বীপকে চারদিকে বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা।

নদীবাঁধের সমস্যার শুরু হয়েছে সেদিন থেকে যেদিন ভূমিকাঙাল মানুষ ধৈর্য ধরতে না পেরে দ্বীপের জমি পলি পড়ে যতটা উঁচু হলে মনুষ্যবসতি গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেটা না মেনে তার আগেই বসতি গড়ে তুলেছেন। কেননা তার ফলে যা ঘটে চলেছে তা হচ্ছে পূর্ণ জোয়ারে চারদিকের নদীর জলের উচ্চতা যতটা থাকে দ্বীপের মধ্যেকার জমির উচ্চতা থাকে তার চেয়ে কম। ফলে বাঁধ না দিলে ২৪ ঘণ্টায় দুবার দ্বীপগুলির মধ্যে নোনা জলের প্লাবন বয়ে যাবার কথা এবং সে ক্ষেত্রে মনুষ্যবসতি এবং চাষবাস দুটোই অসম্ভব। তাই এই নোনা জলের প্লাবন ঠেকাবার জন্য পূর্ণ জোয়ারের জলের উচ্চতার চেয়ে কিছুটা উঁচু করে মাটির বাঁধ দিয়ে দ্বীপগুলিকে ঘিরতে হয়েছে। শতাব্দীকাল আগে এ কাজটা করেছিলেন বড় বড় জমিদাররা। সরকার থেকে গোটা দ্বীপ ইজারা দিয়ে নাগপুর সাঁওতাল পরগনা অঞ্চল থেকে ওরাঁও, ভূমিজ, মুণ্ডা শ্রেণীর আদিবাসীদের আমদানি করে তাদের দিয়ে এ কাজটা করানো হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান-প্রকৌশল প্রয়োগ করে এবং পর্যাপ্ত অর্থব্যয় করে এ বাঁধগুলি তৈরি হয়নি। করার স্বার্থও জমিদারদের ছিল না।

পরবর্তীকালে একটা সময়ে নদীবাঁধ সংরক্ষণের এবং প্রয়োজন বোধে পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচবিভাগের ওপর বর্তায়। সুন্দরবনের মোট নদীবাঁধের আয়তন ৩৫০০ কিমি। এই বাঁধ সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন তা এতাবৎকাল কোনও সরকারই কখনই বরাদ্দ করেনি। আবার বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয় তারও প্রায় ৬০ শতাংশ টাকা খরচ হয় কর্মচারীদের মাইনে, অফিসকাছারির ঠাঁট বজায় রাখা এবং যানবাহনের খরচা বাবদ।

পৃথিবীর নদীবিজ্ঞানীদের একটি অভিমত হচ্ছে যে স্রোতের কারণে যে ভাঙন সৃষ্টি হয় তাকে স্থায়ীভাবে রোধ করা সম্ভব নয়।

কুমীর প্রকল্প *ছবি : অঞ্জন খান*
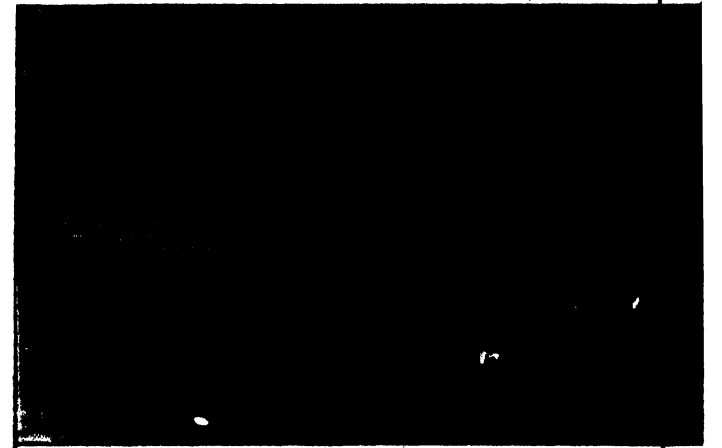
সে ক্ষেত্রে একটিই বোধহয় করণীয় থাকে তা হচ্ছে প্রাকৃতিক ইচ্ছার সঙ্গে সমঝোতা করা। স্রোতজনিত ভাঙনের সম্ভাবনা যেখানে দেখা দেবে অনেক আগে থেকে সে অংশকে চিহ্নিত করে নদীবাঁধকে পেছনে সরিয়ে নেওয়া। সঠিকভাবে আগে থেকে চিহ্নিত করার প্রধান শর্ত হচ্ছে নদী এবং স্রোতের প্রকৃতি, আচরণ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ। প্রতিটি নদীর গতিপথ, গভীরতা, স্রোতের বেগ, পলি বহনের ক্ষমতা, জমা পলির চরিত্র সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তথ্য সংগ্রহ করে একটা তথ্যভাণ্ডার সেচবিভাগের হেফাজতে মজুত রাখা দরকার। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা প্রায় অনুপস্থিত। তাই কোনও ক্ষেত্রে ভাঙন সৃষ্টি হলে স্থানীয়ভাবেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা হয় এবং মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতে তাকে ঠেকাবার চেষ্টা হয়। টাকা প্রচুর খরচ হয়, আনুপাতিক হারে ফল পাওয়া যায় অনেক কম।

দ্বিতীয় স্তরে কর্তব্য হচ্ছে ভাঙনের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা। যদি নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে নদীর গভীর স্রোতই ভাঙন সৃষ্টি করছে বা করবে তবে রিং-বাঁধ করে পিছনে সরে আসাই বোধ হয় সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদদের কাজ হচ্ছে সঠিক হিসাব করে ঠিক কতটা পিছনে সরতে হবে, বাঁধ কী ধরনের মাটি দিয়ে তৈরি করা ঠিক হবে এবং ঢাল কতটা রাখতে হবে তা স্থির করা।

নদীবাঁধকে পিছনে নিয়ে আসার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই বাঁধ সরাতে গিয়ে কয়েকটি পরিবারেরচাষের জমিরা বাস্তু বাঁধের ভেতরে এবং কালক্রমে নদীর ভেতরে চলে যাবে। তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের যুক্তি দিয়ে বোঝানো সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়েই এ সমস্যার সমাধান করা যায়। ক্ষতিপূরণ দেবার একটা ব্যবস্থা আমাদের দেশের আইনে আছে। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থায় তা পেতে গেলে চাষিকে কয়েক বৎসর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয় এবং যা পাওয়া যায় তা খুবই কম।

সরকার বাঁধরক্ষার নামে অন্য পদ্ধতিতে যে টাকা খরচ করেন এবং যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপব্যয় হয়ে দাঁড়ায় সে অর্থ থেকেই এই ক্ষতি সহজে পূরণ করা যায়। একটা বিশেষ ক্ষেত্রে হিসাব করে দেখেছি

খাড়িতে জেলেনৌকা, দুই পারে ...
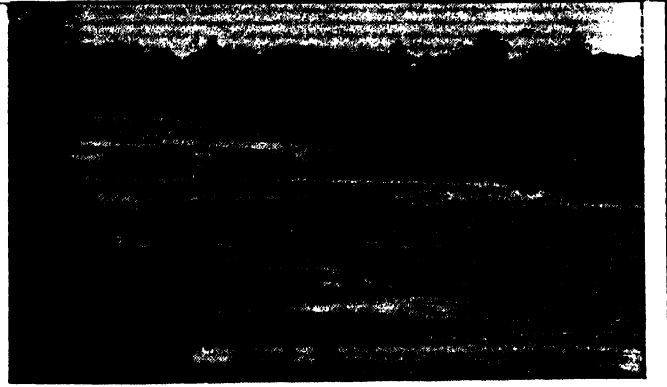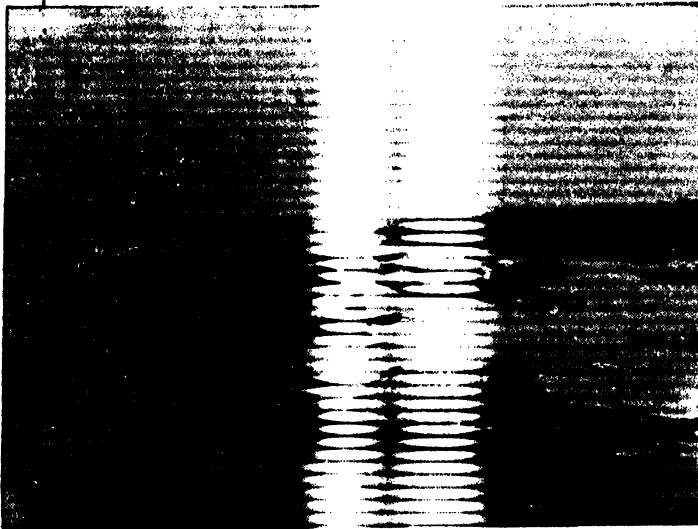
জঙ্গল আর মানুষের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থান

যে নদীবাঁধের মূল সমস্যার একটুও সমাধান না করে কেবলমাত্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই সেচবিভাগকে আগামী চার বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। সেটা না করে যদি বাঁধ পিছিয়ে নেওয়া যায় তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দশ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয় করতে হবে না। একটা দিক ভেবে দেখা দরকার। দেখা যাবে যে এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দশ-পনেরোটি পরিবার কিন্তু উপকৃত হচ্ছেন কয়েক শত পরিবার। বাকি পরিবারগুলির কি এক্ষেত্রে কোনও দায়িত্ব থাকবে না? সরকার না করলে নিজেদেরকেই এ ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহন করতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে নদীবাঁধ সরিয়ে নেওয়াটা কি ভাঙনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান? সহজ উত্তর হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই নয়। তবে এ ছাড়া অন্য কোনও পথ বোধহয় খোলা নেই। কেননা তাহলে লড়াইটা লড়তে হবে সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে যাদের প্রভাবে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা খেলে। নদীবাঁধ সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে নদী থেকে সময় কেনা। প্রকৃতি ভাঙন সৃষ্টি করে আবার অন্য ধরনের প্রাকৃতিক কারণে ভাঙন বন্ধও করে। একই জায়গায় ভাঙন চিরস্থায়ীভাবে চলে, এটা কখনোই হয় না। তাই প্রাকৃতিক কারণে ভাঙন একসময় বন্ধ হয়ে সমস্যার সমাধান করে।

হল্যান্ডের মতো ধনী দেশে ওরা যে ব্যবস্থা করেছেন তা আমাদের দেশে অকল্পনীয় এবং বাস্তবসম্মতও নয়। একসঙ্গে তিনটি বাঁধ পরপর যতটা শক্ত করে করা সম্ভব তা তারা করে ফেলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সমুদ্র প্রতি ২ হাজার বছরে একবার এই তিনটি বাঁধকেই ভেঙে দেশকে ডুবিয়ে দিতে পারে। দীর্ঘ সুন্দরবনবাস এবং হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ দেখে আমার মনে হয়েছে যে, সুন্দরবনের নদীবাঁধ নিয়ে যে বৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তা দরকার ছিল তার শুরুই এখনও হয়নি। বাঁধ ভেঙে দ্বীপে জল ঢুকে দ্বীপবাসীর সর্বনাশ হয়ে গেলে আমাদের চিন্তাভাবনা ও কাজ শুরু হয়। সে ক্ষেত্রেও বাঁধ সংরক্ষণের জন্য যে পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে সেগুলি আজকের দিনে উন্নতমানের প্রযুক্তি এবং জ্ঞানকে ব্যবহার করে করা হচ্ছে না।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশে যে সমস্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত তার সমাধানে সাধারণ মানুষকে সবস্তরে যুক্ত না করলে কোনও স্থায়ী সুফল সৃষ্টি হতে পারে না। যতটুকু করা যায় তাকে ধরে রাখা যায় না। দেখেছি বাঁধরক্ষার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিছু ইঞ্জিনিয়ার-কন্ট্রাক্টর এবং পঞ্চায়েতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই যে কোনও প্রয়াসেরই শুরু হওয়া উচিত যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁদের

সামগ্রিকভাবে সচেতন করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে ২৫ বছর আগেও নদীবাঁধে ভাঙন দেখা দিলে দশগ্রামের লোক ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে ছুটে আসতেন। বাঁধরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এখন মেলা দেখার মতো বেড়াতে আসেন। কিছু জ্ঞান ও উপদেশ দিয়ে সরে পড়েন। সরকারি ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা বানভাসি থেকে সুন্দরবনের মানুষকে কখনও বাঁচাতে পারবে না। নদীর চরে গাছ নিজেদের উদ্যোগে লাগাতে হবে এবং তা রক্ষা করতে হবে। একমাত্র সরকারি বনদপ্তরকে দিয়ে কাজটা হবে যাঁরা ভাবেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

সরকারি বাজেটের বরাদ্দের সময় এই সমস্যাটিতে যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তাও দেখা হয় না। প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে টাকার সংকুলান করা যায় না এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমাদের মনে হয় রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যকরণীয় হিসাবে এ কাজটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন না। রাজ্য সরকারের আর্থিক ক্ষমতা সীমিত কিন্তু কেন্দ্রের কাছে অগ্রাধিকার এবং যে পরিমাণ জোর দিয়ে সমস্যাটিকে তুলে ধরার প্রয়োজন তা করা হচ্ছে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

সুন্দরবনের ২৭ লক্ষের মতো মানুষকে আসন্ন সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে হলে তাই কালবিলম্ব না করে এ কাজগুলি করা দরকার বলে মনে হয়ঃ

১। নদী-সমুদ্র, নদী-স্রোত এগুলি সম্পর্কে সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য প্রতিনিয়ত সংগ্রহ করে একটা তথ্যভাণ্ডার বা ডাটাব্যাংক গড়ে তুলতে হবে।

২। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নদীবাঁধ সংরক্ষণ ও সংস্কারের একটা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি ঠিক করে তাকে রূপায়িত করতে হবে।

৩। সুন্দরবনের মানুষের মধ্যে বাঁধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং পরিকল্পনা ও রূপায়ণের সর্বস্তরেই তাদের প্রকৃত অর্থে যুক্ত করতে হবে।

৪। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্য সরকার, পরিকল্পনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

নদীবাঁধের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার পর বাঁধের আবেষ্টনির মধ্যেকার ৪,৭১,৯৪৪ একর কৃষিজমিতে এককসলি ধান

রসনার তৃপ্তি বাগদা
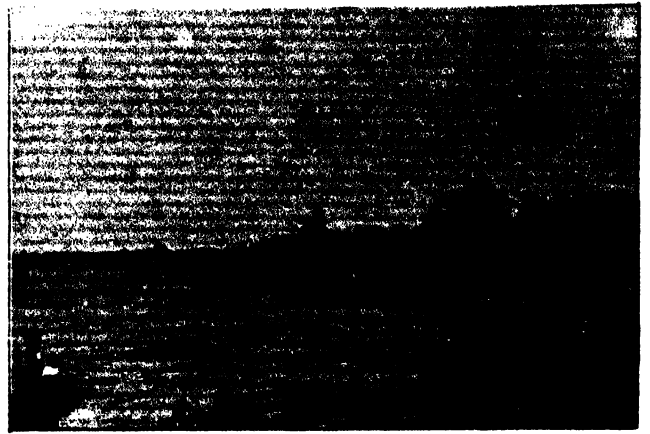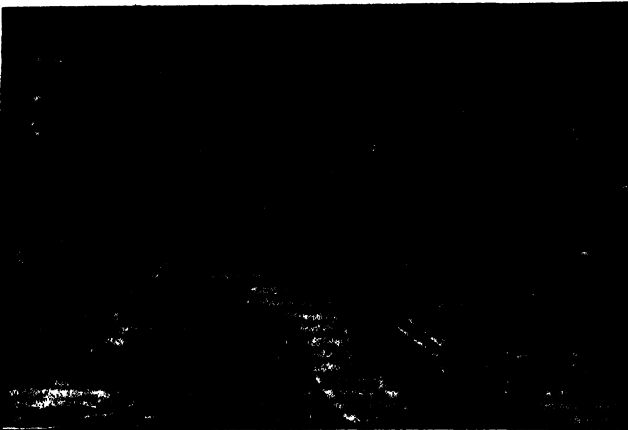
সুন্দরবনের নদীতে বাগদার পোনা সংগ্রহ অন্যতম উপজীবিকা

উৎপাদনকে ঘিরে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যাক। জমিতে গড় ফলন ১৮ মনের মতো। দ্বিতীয় ফসল গত এক দশকে সরকারি ও বেসরকারি চেষ্টায় শতকরা ১০ শতাংশ থেকে পনেরো শতাংশ জমিতে হয়তো করা সম্ভব হয়েছে। রবি মরসুমে যে দ্বিতীয় ফসল হয়, সেগুলির বাজারদর নিয়মিত ওঠাপড়ার কারণে এবং রোগ-পোকার আক্রমণে বছরে প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় দ্বিতীয় অর্থকারি ফসল হিসাবে খুব বড় ধরনের আয় সৃষ্টি করে না। গোটা সুন্দরবনের কোথাও কোনও বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্ব নেই। ছোট এবং ক্ষুদ্রশিল্প প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র ভরতুকি দিতে চলতে পারে। এ ধরনের শিল্প নতুন করে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও অদূর ভবিষ্যতে খুবই কম। কেননা শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান তিনটি শর্ত কাঁচামাল, বাজার ও বিদ্যুৎ তার কোনটাই সুন্দরবনে সহজলভ্য নয়। উৎপাদন হতে পারে এমন সম্পদ আর যা সুন্দরবনে আছে তা হল জল ও জঙ্গল। জলের আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ হচ্ছে মাছ। সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে যে মাছ পাওয়া যায় তার বেশির ভাগটাই প্রায় নিম্নমানের, অতি সম্প্রতি বাগদা পোনা প্রচুর আয়ের সৃষ্টি করছে। দ্বিতীয়ত—বাগদা পোনা ধরতে গিয়ে সুন্দরবনের নদীগুলিতে অন্য সব জাতের মাছের পোনাগুলিকে নষ্ট করা হচ্ছে। এবং তার ফলে অন্য জাতীয় মাছের জোগান দ্রুত হারে কমছে ও কমবে।

সুন্দরবনের বর্তমান যে জনসংখ্যা এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এবং একরপ্রতি ফলনের পরিমাণ যতটা তাতে সুন্দরবন-বাসীদের দু-বেলা ৬০০ গ্রামের বেশি চাল পাওয়ার কথা নয়। মানুষ শুধু ভাত খেয়েই বেঁচে থাকে না তার সঙ্গে পোশাক, ঘরবাড়ি, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের খরচগুলিও তাদের করতে হয়। আমরা জানি যে, উৎপাদন থেকেই একমাত্র আয় সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এটা বাস্তব ঘটনা যে গত ২ দশকে সুন্দরবনে যা বাড়েনি তা হল একইঞ্চি চাষের জমি। শিল্পে আর উপার্জনের পথ সৃষ্টি হয়নি। জল ও জঙ্গল থেকে উপার্জনের সুযোগও খুব একটা বেড়ে যায়নি। কিন্তু অপরদিকে যেগুলি বেড়েছে (১) প্রচুর জনসংখ্যা। (২) পরিবারে বিভিন্ন খাতে খরচ।

উপরি-আলোচিত পটপ্রেক্ষায় আমাদের থমকে দাঁড়িয়ে বোধ হয় ভাবার দিন এসেছে যে, ভবিষ্যতে কী ধরনের কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে আমাদের জীবন ও জীবিকা কিছুটা নিশ্চয়তা পেতে পারে।
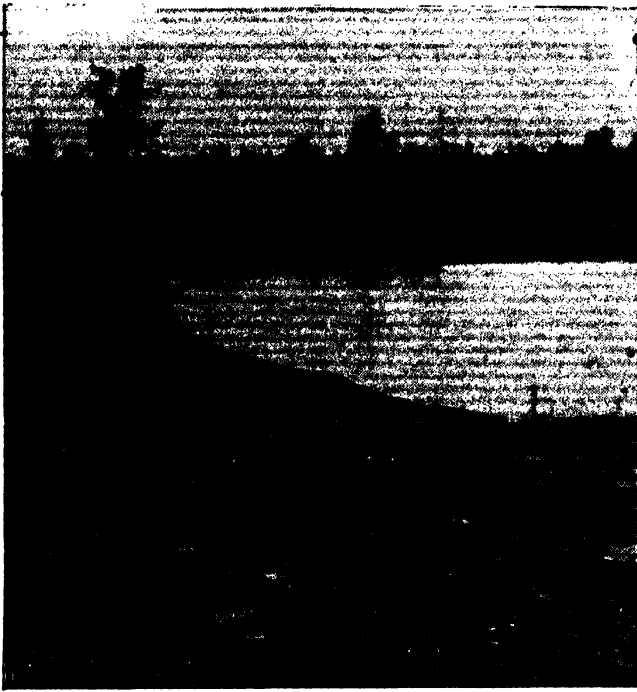
বৃষ্টির জল ধরে রেখে কৃষি কাজে ব্যবহার. *ছবি : কুমুদরঞ্জন নস্কর*

চাষে উৎপাদন বাড়তে পারে নিবিড় চাষ করে, অর্থাৎ একই জমি থেকে দুবার বা তিন বার ফসল তুলে। সুন্দরবনের জমিতে সে সুযোগ বর্তমানে নেই বললে চলে। কারণ এটা করতে গেলে প্রাথমিক প্রয়োজন সেচের জল। নদীতে পর্যাপ্ত জল থাকলে ও লোনার জন্য সে জল চাষে ব্যবহার করা যায় না। মাটির তলার জল চাষে ব্যবহার করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কেননা খাবার জল খেতে গেলেও ৮০০-১২০০ ফুট নিচে টুঁ মারতে হয়। সুতরাং রবি মরসুমে সেচের জলের জোগান বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হচ্ছে বৃষ্টির জল যতটা বেশি সম্ভব ধরে রাখার ব্যবস্থা করা। সে ক্ষেত্রেও মুশকিল হচ্ছে যে সুন্দরবনের গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৯০০ মি মি মতো হলেও জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই এই বৃষ্টিপাত হয়।

দ্বিতীয়ত, দ্বীপগুলির মধ্যে পুকুর, খাল, বিল, নালায় যতটুকু জল সংগ্রহ করে রাখা যায় তার সবটাই পুরোপুরি সেচের কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। অতি সম্প্রতি সুন্দরবনে আমন চাষে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যাপক হারে রবিচা[illegible] সম্ভা[illegible] দিকগুলি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। প্রায় সবাই মনে কর[illegible] যে [illegible]লের মধ্যে পুকুর, খাল, নালা কাটিয়ে বা সংস্কার ক[illegible] [illegible] সম্ভব জল ধরে রেখে রবিচাষের পরিমাণ বাড়াতে [illegible] [illegible]বনের চাষযোগ্য মোট জমির ২০ শতাংশ পুকুর, খা[illegible] [illegible] দেওয়া যায় তাতে পাঁচ ভাবে উৎপাদন বাড়বে। (১[illegible] [illegible] কেটে যে পরিমাণ মাটি উঠবে তাতে চারদিকের জ[illegible] [illegible]ভাবে মাটি ফেলে সমতল করা যাবে। (২) পুকুর ও [illegible] নানা ধরনের ফলগাছ বসিয়ে তার থেকে আয় [illegible]ব। (৩) পুকুরে মাছের চাষ করে তার থেকে আ[illegible] (৪) চাষের জমিতে পরিকল্পিতভাবে দ্বিতীয় [illegible] বাড়ানো যেতে পারে। (৫) পুকুরে বা খালের ধা[illegible] শাকসবজি ও পশুখাদ্য সারা বছর ধরে চাষ করা [illegible] [illegible]ত্রেও প্রধান বাধা হচ্ছে কৃষক কিছুতেই চাষযোগ্য জ[illegible] পুকু[illegible] কাজে ব্যবহার করতে দিতে চায় না। যদি তাদের বোঝানো যায়, তাহলে জমি থেকে উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো যেতে পারে। চাষের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে অল্প আয়াসে ফসল বাড়াবার চেষ্টায় কৃষকরা কোনও বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ছাড়াই নির্বিচারে জমিতে সার-ওষুধ প্রয়োগ করছেন। গ্রামে গ্রামে সার-ওষুধ ডিলাররাই কৃষিবিজ্ঞানীর কাজ করছেন। এইভাবে অবৈজ্ঞানিক ও অনিয়ন্ত্রিত সার-ওষুধ প্রয়োগের ফলে দুটি সর্বনাশ ঘটছে। (১) জমির গুণগত মান এবং উৎপাদনক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। (২) কীটনাশক ওষুধ খাদ্যে, পুকুরে, খালে মিশে গিয়ে নানা ধরনের রোগের জন্ম দিচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দেহে নানা রোগের উপাদান সংক্রমিত করছে। (৩) সমস্যা হচ্ছে চাষের সঠিক ক্রমপর্যায় ঠিক করা।

সুন্দরবনের লোনা সহ্য করতে পারে এবং সেচের জল কম লাগে এমন শস্যেরই চাষ হওয়া উচিত। রবি মরসুমে দেখা যায় মধ্যবিত্ত ও বড় চাষিরা প্রচুর পরিমাণে সার-ওষুধ প্রয়োগ করে উচ্চফলনশীল ধানচাষে বেশি আগ্রহ দেখান। কিন্তু ধানচাষে যে পরিমাণ সেচের জল দরকার তা এমন অনেক অর্থকরী ফসল আছে যেগুলি চাষ করলে সমপরিমাণ জলে অনেক বেশি পরিমাণ জমি চাষ করা যায়। সে ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে সেচের জলের ব্যবহার সম্পর্কে একটা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, নীতি তৈরী ও কার্যকর করা।

সুন্দরবনের চাষের কাজে যে গরু বা মহিষ ব্যবহার করা হয় পশুখাদ্যের অভাবে সেগুলির স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। উন্নত ও শংকর জাতের পশুর সংখ্যা খুবই কম। টিলার বা ট্রাক্টর ইদানীংকালে প্রচুর আমদানি হয়েছে। কিন্তু তেলনির্ভর এই যন্ত্রগুলি ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পৃথিবীতে নতুন করে সৃষ্টি হবে না, এমন জ্বালানি ও শক্তির উৎসগুলিকে যেভাবে নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে একটা সময় আসতে বাধ্য যখন ডিজেল, পেট্রলের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবেই। সুতরাং উন্নত জাতের পশুর জোগান বাড়ানো চাষের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় সুন্দরবনের চাষের উন্নতির জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এভাবে এগোলেই উৎপাদন বাড়ানো এবং প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

প্রথমত, প্রতি ব্লকে একটি করে মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে ছোট্ট একটি কিট দিয়ে দু-দশ দিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউকে দিয়ে সত্যিকারের মাটি পরীক্ষা হয় না। সুতরাং এই মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ করতে হবে। এবং কৃষকদের তাদের জমির বর্তমান অবস্থা ও গুণাগুণ জানার ব্যাপারে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাটির প্রকৃত অবস্থা জেনে জমিতে কী ধরনের শস্য পর্যায় সবচেয়ে বেশি উৎপাদন নিশ্চিত করবে তা স্থির করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষিবিজ্ঞানীদের ভূমিকা অনেক বড়। তারা ব্লক হেডকোয়ার্টারে বসে থেকে এ কাজটা কখনই করতে পারবেন না। তাই কৃষিবিজ্ঞানীদের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে। এবং তাদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে এই পরামর্শ জমিতে বসে দিতে হবে।

তৃতীয়ত, রাসায়নিক সার ও ওষধের পরিমাণ কমিয়ে জমিতে জৈবসারের প্রস্তুত-প্রণালী এবং ব্যবহারের পদ্ধতি কৃষকদের শেখাতে হবে। চতুর্থত, কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে উন্নয়নের নিবিড় যোগ সম্পর্কেও তাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। পঞ্চমত, সুন্দরবনের

সেচের জলবৃদ্ধির আবশ্যিকতা সম্পর্কে তাদের বোঝাতে হবে এবং জলাশয় সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

আমার মনে হয় পরিকল্পিতভাবে এ কাজগুলি কখনও শুরু করা হয়নি। তাই সুন্দরবন রক্ষা এবং উন্নয়নের কাজ করতে গেলে কৃষিক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনা জরুরি। কেননা এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সুন্দরবনের অর্থনীতি মূলত কৃষি-নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য। অবশ্য ইদানীকালে আরেক উপার্জনের রাস্তা সুন্দরবনবাসীদের কাছে খুলে দেওয়া হয়েছে 'উন্নত' দেশগুলির লোভে আর 'উন্নয়নশীল' দেশের প্রত্যক্ষ মদতে। এই পেশাকে এককথায় 'চিংড়ি বিভীষিকা' বলা চলে। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আমেরিকা-জাপানের বাবুভায়াদের চিংড়িমাছ বড় প্রিয়। তাদের পাতে চিংড়ি জোগান দেবার জন্য এদেশ থেকে নির্দিষ্ট সাইজের মুণ্ডহীন চিংড়ি ওদেশে পাঠাতে হবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে এ বাণিজ্য বড় লাভজনক। যেখানে টাকার গন্ধ সেখানে ব্যবসাদার জুটতে কালবিলম্ব হয় না। যেখানে বড় টাকা সেখানে বড় ব্যবসাদার—আরও বড় টাকা হলে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিরা ছোটখাটোদের হাতে-ভাতে মেরে আসর জাঁকিয়ে বসেন। আমরা উদার অর্থনীতির নামে ঘরের দরজা তো হাট করে দিয়ে বসেই আছি।

প্রমাণ সাইজের চিংড়ি ধরলাম আর বিদেশে পাঠিয়ে দিলাম এমনটি হয় না। গোটা কর্মকাণ্ড কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। তার প্রথমটি হচ্ছে সুন্দরবনের নদীনালা থেকে বাগদাচিংড়ির মীন বা বীজ ধরাতে হবে। এ মীন এত ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া সাইজ মাপা দুঃসাধ্য। হতদরিদ্র লোভীর চোখ না হলে গুনে তোলা যায় না। এরা সমুদ্রের মাছ, ডিম পাড়ার সময় হলে একটু কম লোনা নদীতে নেমে আসে। বঙ্গোপসাগর থেকে সপ্তমুখী-জামিরা-গোসাবা-মাতলা নদী দিয়ে ঢুকে কোটিতে কোটিতে শত শত শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। ডিম ফুটে কিছু দিন কম লোনা জলে হেসেখেলে সমুদ্রে ফিরে যাবার কথা। এটা প্রকৃতির নিয়ম। লোভী মানুষের নিয়ম উলটো এদের যেতে দেওয়া হবে না। যত পারো ধরে নাও। সুতোর মতো সাইজের হলেই ধরে তোলো, তারপর ভেড়িতে বা বিশেষ ধরনের আধারে রেখে এদের একটা সাইজ পর্যন্ত বড় করো। তারপর জল থেকে তুলে মুণ্ডটি খসিয়ে যাতে পচে না যায় তার নানা কায়দাকানুন করে প্যাকেটভর্তি জাহাজে ও সব দেশে পাঠিয়ে দাও। বাগদা মীন সুন্দরবনের অতি দুর্বল অর্থনীতির একটা আয় সৃষ্টিকারী সম্পদ হতে পারত। জলে মাছের পরিকল্পিত চাষ এবং ব্যবহার সুন্দরবনের মানুষের স্থায়ী আয় অনেক পরিমাণ বাড়াতে পারে। সুন্দরবনের গরিব মানুষের স্বার্থে এ ধরনের কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনার কথা আমার জানা নেই এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের পরিকল্পনা আছে কিনা তাও জানি না। জোর দিয়ে বলতে পারি এ ধরনের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন এবং সম্ভব। প্রয়োজনীয় মূলধন এবং পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে সাধারণ গরিব মানুষরাই বাগদার আয় থেকে পাইপয়সা শোধ করে দিয়ে স্থায়ী আয় উপার্জনের একটা রাস্তা বার করতে পারেন। তার বদলে বাগদা পোনা ধরার নামে গত একযুগেরও বেশি কাল ধরে যে নিয়ন্ত্রণহীন এবং অপরিকল্পিত ধ্বংসলীলা চলছে তার ফলে সুন্দরবনের মানুষ ভুগতে শুরু করেছেন এবং ভবিষ্যতে ভুগতে হবে। যাঁরা বাইরে থেকে গিয়ে সুন্দরবনের মানুষ এবং সম্পদকে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছেন তাঁরা কখনও এর দায় ভাগ করে নিতে আসবেন না এটা নিশ্চিত বলতে পারি। একটা সোজা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক। এখন সুন্দরবনের নদীনালা সর্বত্র যে মানুষ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার আকাশভাঙা বৃষ্টি, হাড়কাঁপানো শীত,-নদীর কুমির-কামটকে উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত বাগদা পোনা ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা প্রধানত কাদের স্বার্থে? কারা এর থেকে সবচেয়ে বেশি আয় পাচ্ছেন? তারা কি সুন্দরবনের মানুষ? পরিকল্পনাহীন সর্বনাশা এ প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা দেশি-আন্তর্জাতিক শিল্পসংস্থা। মুনাফা ছাড়া এদের এ উদ্যোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও পরিকল্পনা নেই। সুন্দরবনের সম্পদ সুন্দরবনের মানুষের জীবনে কিছু আর্থিক নিরাপত্তা এনে দিক এটা কি তাদের চিন্তায় কোথাও স্থান পায় বা পাবে?

সুন্দরবনের মানুষও কিছু পান। চার-পাঁচ ঘণ্টা ভাটির টান অগ্রাহ্য করে নদীর এ মাথা-ও মাথা চষে বেড়িয়ে একশ-দুশ মাথা-গুনতি বাগদা ধরে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা ঘরে নিয়ে যান। ক্যানিং থেকে রায়মঙ্গল পর্যন্ত চোখ খোলা রেখে জলপথে ঘুরুন দেখবেন হাজার হাজার দুধের শিশু থেকে সত্তরোত্তর বৃদ্ধা মাকুর মতো নদীবাঁধের পাশে চষে বেড়াচ্ছেন। ইস্কুলে ছাত্র যাচ্ছে না। ঘরের বউ বাগদার লোভে বাপের বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারছে না। জলে নেমে বাগদার মীন ধরতে গিয়ে কুমির-কামটের পেটে প্রাণ দেওয়া এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো মীন ধরে যতজন লাভবান হচ্ছেন তার তুলনায় এ জাতীয় দুর্ঘটনায় প্রাণ দিচ্ছেন নগণ্য সংখ্যক মানুষ—কিন্তু কোনও একটি মানুষের প্রাণও কি এতটাই নগণ্য যে আমরা আমাদের সভ্যতার কলঙ্করূপী দারিদ্র্যের জ্বালাকে লেলিয়ে দেব উপায়হীন মানুষের দিকে—যাতে তাঁরা প্রাণ হাতে করে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে দুটো পয়সা ছিনিয়ে আনতে প্ররোচিত হন? কুমিরের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে মোটামুটি সকলেই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু কামটের অত্যাচার চেনেন শুধু সুন্দরবনবাসীই। কামট জলজ প্রাণী। এখনও চোখে দেখা হয়ে ওঠেনি। ক্ষুরধার বুদ্ধি নয়, দুপাটি দন্তের অধিকারী। সদ্য কেনা আসলি সেভেন-ও-ক্লক ব্লেডের মতো ধার। পায়ে বা গায়ে কামড় বসিয়ে একখাবলা মাংস তুলে নিলেও আক্রান্ত মানুষটির টের পাবার উপায় নেই। নিখুঁত অপারেশন—অ্যানাস্থেশিয়ার দরকার পড়ে না। গায়ের ধারের জলে রক্তিম আভা দেখা দিলেই বোঝা যায় অপারেশন সফল। এখন শুধু রোগীর মরণের অপেক্ষা। বড় শিরা বা ধমনী কাটা পড়লে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে শরীরে রক্ত না ঢোকাতে পারলে মরণ আটকাতে পারেন এমন ঈশ্বর এখনও সৃষ্টি হননি। কামড়েছে পয়শমণির গোমর নদীতে, আর রক্ত কলকাতার জরুরী ব্লাড ব্যাংকে। এ অনেকটা অভাগীর স্বর্গে যাবার আশা। তাই শ্যামসমান মরণই এসব ক্ষেত্রে কপালের লিখন। এবং বদলে সুন্দরবনের মানুষকে কী কী মূল্য দিতে হচ্ছে শুধু সেই হিসেবটা একটু করা যাক।

বাগদা পোনা এত ছোট যে অতি সূক্ষ্ম বুনোনের জাল দিয়ে ধরতে হয়। হাতে টানা জাল দিয়ে বাঁধের পাশেই ধরুক আর নৌকা দিয়ে নদীর এপারে জাল দিয়ে বেঁধে ফেলেই ধরুক সে জালের মোটা সুতো পেরিয়ে যাবার মতো ফাঁক থাকে না। সমুদ্রে বা নদীতে তো শুধু বাগদা পোনাই জন্মায় না। একটা তথ্য পেয়েছিলাম, বাগদা ছাড়াও বাহাত্তর রকমের মাছের পোনা এসব নদীতে পাওয়া যায়। তাই জালে শুধু বাগদা পোনাই ধরা পড়ে না—সবরকমের মাছের পোনা ধরা

পড়ে। মুশকিল হচ্ছে যাঁরা বাগদা ধরেন তাঁরা জাল ডাঙায় তুলে বাগদা পোনাগুলিই শুধু বেছে নেন আর বাকি মাছের পোনাদের আস্তাকুড়ে ফেলার মতো ডাঙায় ফেলে দেন। এর ফলে সুন্দরবনের নদীনালায় অন্য সব ধরনের মাছ প্রায় নির্মূল হতে বসেছে। আবাদ পত্তনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দু-চারজন যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের কাছে মাছের গল্প শুনি আর তা স্বপ্ন বলে মনে হয়। তাঁরা ভাত আর হরেক কিসিমের মাছ প্রায় সমান সমান খেতেন। ত্রিশ বছর আগে যখন সুন্দরবনে গেছি নদীতে সুতোজাল ফেলে ফ্যাসা-ভাঙন-ভেটকি-পার্শে-চিংড়ি প্রভৃতি নদীর মাছ হরহামেশা গাঁয়ের লোককে ধরতে দেখেছি। আজ সুন্দরবনে কলকাতার থেকে চড়া দামে মিষ্টি জলের মাছই বেশি পাবেন। সর্বত্র মাছের আকাল। বাগদার জন্য সন্দুরবনের মানুষকে একমাত্র প্রোটিনের ভাণ্ডারকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। লোনা জলের মাছ হাটেবাজারে বেচে যাদের দিন গুজরান হত সংখ্যায় তারা খুব কম নয়। তাদেরও রুজি-রোজগার মার খাচ্ছে।

সুন্দরবনে গত একযুগের বেশি বাগদানির্ভর একটা অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। করকরে নগদ টাকার কারবার। আশির দশকে জোগান ছিল প্রচুর, দাম ছিল কম। বাংলাদেশে পাচার করতে পারলে দুনো রোজগার। উৎপাতের ধন চিরকালই চিৎপাতে যায়। নগদ টাকা আচমকা হাতে আসতে শুরু করায় কয়েক হাজার পরিবারের ভোগ-কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। মরা গরিবের ঘরে দিনে দু-পাঁচশ করে ঢুকতে শুরু করলে মাথার ব্যামো শুরু হয়ে যায়, আর প্রকাশ ঘটে বেহিসেবি খরচায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এর অনেকটাই অপব্যয় হয়। প্রসঙ্গত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত একটি দ্বীপে বাঁধ ভেঙে লোনা জল ঢুকে শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছিল। মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দলবল নিয়ে অকুস্থলে হাজির হওয়া গেল। দেখলাম যাদের ঘর ভেঙেছে তাদের কারুরই পাত্তা নেই। নদীতে বাগদা ধরতে গেছে। বাংলাদেশে পাচারের সূত্রে দিনে চার-পাঁচশ টাকা আয়। ঘরগুলি একটিও মনুষ্য-বাসযোগ্য নয়। বাড়ির ছেলে-মেয়ে-বউ কোনও-না-কোনও রোগের শিকার। ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ স্কুলে যায় না। দিনে চার-পাঁচশ রোজগার কিন্তু সংসারে এ হাল কেন? তার কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। যাই হোক, এ আয়ের [illegible] স্থায়ী [illegible]লেও না হয় বুঝতাম। কিন্তু গত তিন-চার বছর আরে[illegible] [illegible]র্বনা[illegible] [illegible] ঘটে চলেছে। তা হচ্ছে বাগদার জোগান ক্রমেই ক[illegible] [illegible]ছে। [illegible] যেখানে হাতে টানা জালে দিনে হাজার দুই পর্যন্ত এ[illegible] [illegible]কা[illegible] [illegible]চার হাজার পোনা পাওয়া যেত, তা এখন শয়ের কো[illegible] [illegible] [illegible]ছে। এমন দিনও যায় দু-দশটাও ভাগ্যে জোটেনি। বা[illegible] [illegible] [illegible]াম হাজারপ্রতি দর ৬০০ টাকা। আর বিক্রেতারা গ[illegible] [illegible] [illegible]ছ শতখানেক। এ অবস্থাটা হল কেন? কারণ একা[illegible] [illegible] [illegible]লোভের তাড়নায়, কাঁচা পয়সার লোভে বাগদা ধরে [illegible] [illegible] [illegible]বাগদা ফিরে যাচ্ছে কম, আসাটাও সেই হারে কমছে। [illegible] যে[illegible] [illegible]শটা আসত, এখন আসে চল্লিশ-পঞ্চাশটা। এভাবে চ[illegible] [illegible] [illegible]বিষ্যতে আরও কমবে। ভবিষ্যতের যে পঞ্চাশ-ষাট হাজ[illegible] [illegible]রিবা[illegible] [illegible]দানির্ভর ছিলেন, তাদের কী হবে? তাদের ভবিষ্যৎ আ[illegible] অন্য [illegible]ও স্থায়ী পথ কি খুলে গেছে? না যায়নি। গত একযু[illegible] [illegible] ডা[illegible] অনেক কমে গিয়েছিল। ভবিষ্যতে আইন-শৃংখলার সম[illegible] [illegible]ষ্টি [illegible]। প্রকৃতি একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। মানুষ ভারসাম্যহীনতা তৈরি করলে মানুষকেই তার দাম দিতে হয়। দুঃখ হচ্ছে যে লোকেরা দইয়ের অগ্রভাগটা মারলেন তাঁরা এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভাগীদার হতে আসবেন না। সুন্দরবনে তাদের টিকিটিরও খোঁজ পাওয়া যাবে না।

বাগদাকে কেন্দ্র করে আরো নানা ধরনের সমস্যার কথা অতীতে আলোচনা করেছি। তার পুনরুক্তি করতে চাই না। একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেই এই নিবন্ধের শেষ করতে চাই। অতীতে সুন্দরবনে নির্বিচারে বাগদা ধরার বিরুদ্ধে যখন সোচ্চার হই তখন স্বার্থান্বেষী মহল গরিববিরোধী বলে আমাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ভাবটা ছিল এই যে গরিব মানুষ বাগদা ধরে দু-পয়সা পাচ্ছে—আমি তার বিরোধী। আমি বাগদা ধরার বিরুদ্ধে কোনও দিনই ছিলাম না, আজও নই। কিন্তু অতীতেও বারবার বলেছি আজও তার পুনরাবৃত্তি করে জোর দিয়ে বলতে চাই যে বাগদা সুন্দরবনের জলজ সম্পদ। পরিকল্পিতভাবে সুন্দরবনের একটা অংশের মানুষের স্থায়ী আয়ের উৎস হিসাবে এ সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে। সুন্দরবনের দ্বীপে দ্বীপে সীমিত সংখ্যায় বাগদা ধরে সমবায়ভিত্তিক চাষ করার ব্যবস্থা করা যায় কি? নদীর যে অংশে চর জাগছে সে অংশকে পরিকল্পিতভাবে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কি সম্ভব? এর ফলে বাগদা চাষের মুনাফার বেশির ভাগ অংশটাই সুন্দরবনবাসীদের ঘরে উঠবে। আর একটা উপদ্রবকেও এর ফলে ঠেকানো যাবে। তা হচ্ছে চাষের জমি লিজ নিয়ে ভেড়ি বানিয়ে জমিতে লোনা জল ঢুকিয়ে অযোগ্য করে তুলে ভেড়ির প্রসার ঘটানোর অপচেষ্টা। বাংলাদেশের সীমানা বরাবর খোঁজ নিন, ধানের খোসা, তুষের বস্তা চার টাকা কিলো হয়ে গেছে যা পঞ্চাশ পয়সায় পাওয়া যেত। ওপারে ধানের জমি সব ভেড়ি হয়ে গেছে। ধান ফলে না তাই তুষও হয় না। এপারেও সে প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। জানি না, এর শেষ কোথায় আর হাজার হাজার পরিবারের ভবিষ্যতে কী লেখা আছে।

একটা কথা বোধ হয় বলার এবং সুন্দরবনের মানুষের বোঝার দিন এসেছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃংখলার বিরুদ্ধে অতি বাড়ার বিপদ বড় ভয়ংকর। আর 'নাই' রাজ্যের দেশ সুন্দরবনে যতটুকু যা সম্পদ আছে তার পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত, জনমুখী ব্যবহারই সুন্দরবনের মানুষের স্বার্থে প্রথম এবং প্রাথমিক প্রয়োজন। তা না হলে বাগদা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা না এনে সর্বনাশকে ঘরের দরজায় ডেকে আনবে।

পরিশেষে 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার বিদগ্ধ পাঠকবর্গের কাছে বিনম্র নিবেদন রাখি এই যে, সুন্দরবনের জঙ্গল ও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার ও সমৃদ্ধ করার দায় কিছু ব্যক্তিবর্গের নয়, সমষ্টির। এবং এই সমষ্টি শুধু সুন্দরবনের দরিদ্র জনগণের নয়—সমগ্র বাংলার তথা ভারতবর্ষের। এ আমার নেহাত আবেগ নয়, বিগত ত্রিশ বছরের উপলব্ধ সত্য। আমাদের নির্মম নির্বুদ্ধিতাকে প্রকৃতি ক্ষমার চোখে দেখছে না এবং এখনও প্রতিকারের সময় যায়নি। এ আমার সতর্কবাণী নয়, অসহায় আর্তনাদ নয়, এ আমার আহ্বান, সুন্দরবনকে বাঁচানোর অঙ্গীকার আমার, আপনার এবং সুন্দরবনবাসীদের।

লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন বিশিষ্ট শিক্ষক ও টেগোর সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট, রাঙাবেলিয়া প্রজেক্ট-এর পুরোধা।

১ বিপন্ন প্রজাতির রাজা কাঁকড়া
২ বিরল প্রজাতির কাঁকড়া
৩ বিদেশে রপ্তানির তাগিদে সমুদ্রে কাঁকড়া শিকার
৪ সামুদ্রিক কাঁকড়া ডিম পাড়ছে
৫ কাঁকড়া-সাপে লড়াই

● বিপন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ

● বিরল প্রজাতির রিড্‌লে কচ্ছপ

● বিপন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপ (গ্রীন রিড্‌লে)

কমলচন্দ্র কর
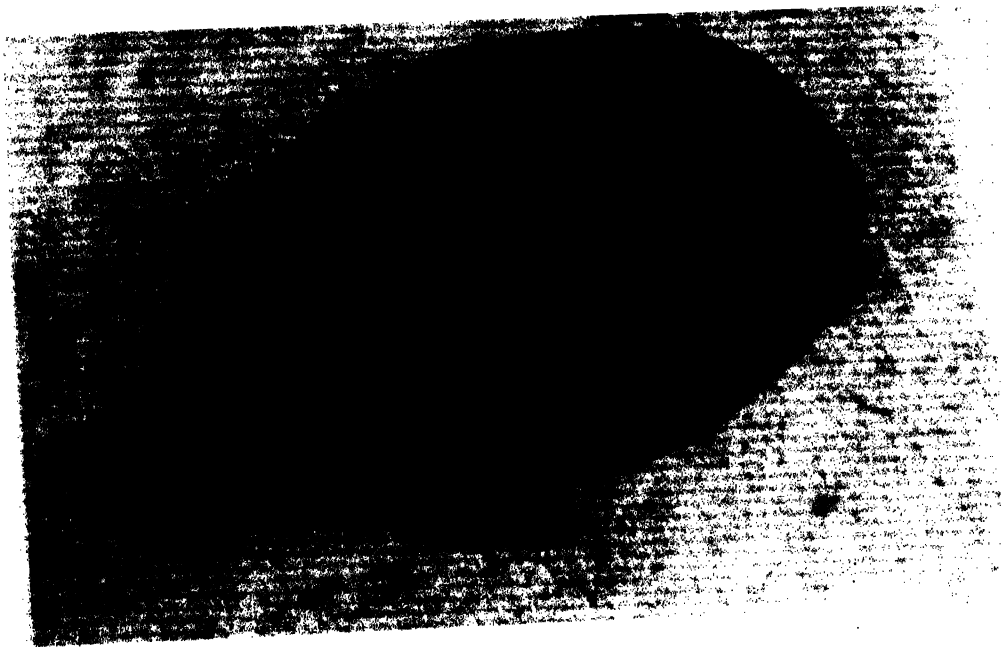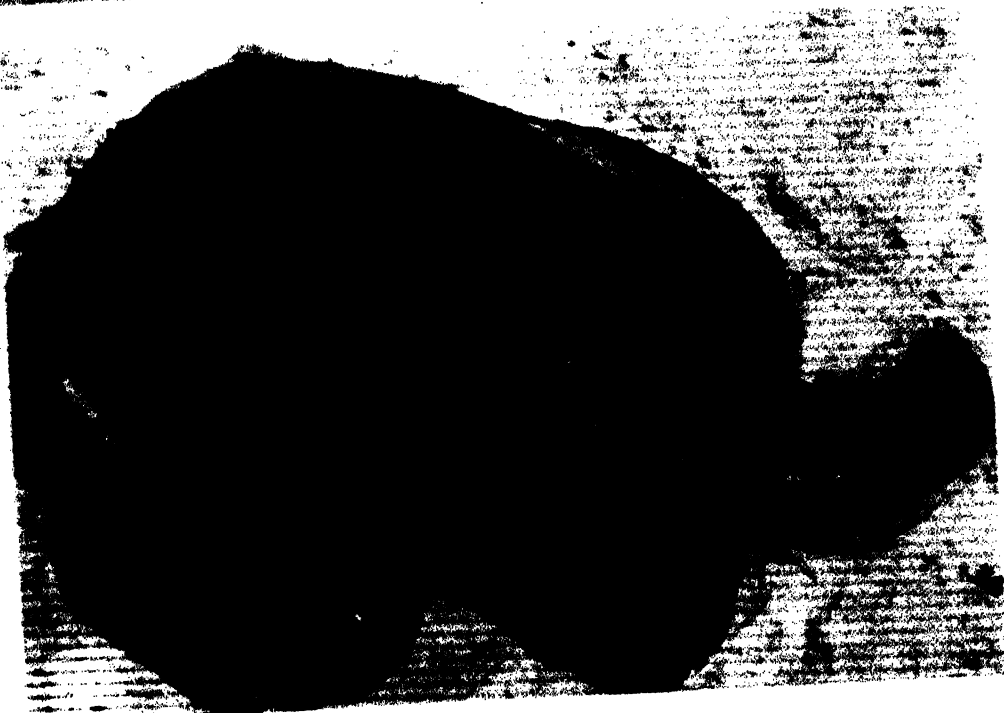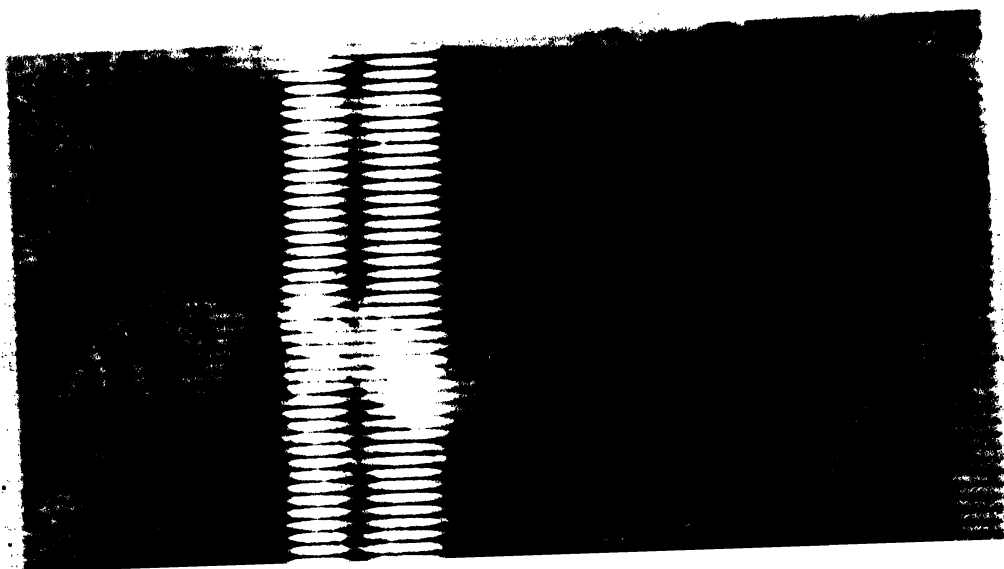
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পর্যটন-পরিক্রমা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পর্যটন শিল্প ও তার বিকাশ সম্পর্কে কিছু বলার আগে সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন ওই জেলার পটভূমির সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন। চব্বিশ পরগনা জেলার নামকরণটি অভিনব। এইরকম সংখ্যাযুক্ত জেলার নাম এই রাজ্যের অন্য কোথাও নেই। এই নামকরণ হয়েছিল বিদেশি ইংরেজ শাসকের দ্বারা। রাজ প্রতাপাদিত্যের সময় ওই অঞ্চল, যশোর রাজ্যের দক্ষিণ অংশ বা দক্ষিণ যশোর হিসাবে পরিচিত ছিল। আরকানী মগ ও পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদের দস্যুতায় সমুদ্র উপকূলবর্তী সমৃদ্ধ সুন্দরবনের অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে জনবিরল জঙ্গলে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহরখুলনার ইতিহাস—২য় খণ্ড গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে কোনও সুশাসন ছিল না, তখন এই মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণ বঙ্গের দক্ষিণ দিক হইতে নদীপথে দেশের মধ্যে যেখানে সেখানে প্রবেশ করিত এবং লুন্ঠন, গৃহদাহ ও জাতিনাশ করিয়া বঙ্গের শান্ত পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বর্তমান বরিশাল, খুলনা ও চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশ উহাদের প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল।" মুসলমান আমলে, শাসন ও কর আদায়ের সুবিধার জন্য রাজ্যকে সরকার 'মহল' 'পরগনা' 'তশিল' প্রভৃতি বড়, ছোট অংশে ভাগ করা হয়েছিল। মুসলমান আমলে এই অঞ্চল ছিল সাতগাঁ সরকারের অধীন। মুঘল রাজত্বকালে বাদশাহের অধীন বাংলাদেশ শাসক বা নবাবের খাস সম্পত্তি ছিল এই অঞ্চলের পরস্পর সংলগ্ন ২৪টি মহল বা পরগনা। যার সমষ্টিগত পরিচয় ছিল 'কলিকাতার জমিদারী'।

> **লৌকিক দেব-দেবী, গাজী, পীর-পীরানী ও বিবিদের বহু অপূর্ব মহিমার কাহিনী ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে, লোককাব্যে, উপকথায়, গল্পকথায় ও কিংবদন্তিতে। জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নানাস্থানে বহু মঠ, মন্দির, মসজিদ, মেলা দেখতে পাওয়া যায়। অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলির সঙ্গে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেককেই বিমোহিত করবে।**

পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর বাংলার নবাব হয়ে লর্ড ক্লাইভকে উক্ত জমিদারি যৌতুক দেন এবং জমিদারি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসে। এই প্রসঙ্গে West Bengal District Gagetteers-24 Parganas-এ উল্লেখ আছে—"In the Battle of Palashi, on 23 june 1757, the English troops led by Robert Clive defeated Siraj-ud-Daulah. Clive then made Mir Jafar, the chief of the traitors, the Nawab of Bengal. On the 2nd july the captive Siraj was murdered by Miran, Mir Jafar's son. On the15th July 1757 the puppet Nawab Mir Jafar concluded a treaty with the East India Company, by which the former ceded to the company the Zamindary rights of 24 mahals. The treaty by which the cession was recorded says that, 'all land lying to the south of calcutta as far as Culpee (Kulpi in Diamond Harbour Subdivision), shall be under the Zamindary of the English Company, and all officers of this Zamindary shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by it (the Company) in the same manner with other Zamindars; These 24 mahals comprised the Parganah Mugra, Parganah Khaspoor Parganah Medinimall, Parganah Ikhtyarpoor, Parganah Barjatty, Parganas Kharijuri, Parganah Dakshin Sagar, parts of the parganahs of Ghar, Calcutta, Paikan, Manpoor, Amirabad, Azimabad, Mudaghata. Pucha Kolin, Shahnagar or Shahpur, Mahmud Amipoor, Melanmahal, Hatigarh, Maida, Akbarpur, Belia, and Bhusundar. The Parganahs to the north of Calcutta, now Comprising Barakpur and Bangaon subdivisions, continued to be with Jessore and Nadiya. লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস উক্ত ২৪টি পরগনা একত্র করে একটি জেলা গঠন করেন এবং তখন এই সমষ্টিগত অঞ্চলের নামকরণ হয় 'চব্বিশ পরগনা জেলা'।

ওয়াচটাওয়ার, নিরাপদ দর্শন মঞ্চ

দীর্ঘকাল অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জেলার মর্যাদা বহন করে এসেছে।

প্রশাসনিক কারণে চব্বিশ পরগনা জেলা ১মার্চ, ১৯৮৬ দুভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা হিসাবে পরিণত হয়। চব্বিশ পরগনা জেলাকে এক সময় বলা হত 'আঠারো ভাটির দেশ', কারণ নদীর ভাটা বয়ে যেত দক্ষিণে। আলোচ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মোট ভৌগোলিক আয়তন ১০,১৫৯ বর্গকিলোমিটার। আলিপুর সদর মহকুমার থানা যাদবপুর, কসবা, তিলজলা, রিজেন্ট পার্ক, বেহালা, মেটিয়াবুরুজ, বিষ্ণুপুর, সোনারপুর, বজবজ, মহেশতলা, বারুইপুর, জয়নগর, ভাঙড়, ক্যানিং, কুলতলি, বাসন্তি, গোসাবা, চিৎপুর, কাশিপুর, মানিকতলা, উল্টোডাঙ্গা, নারকেলডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা, ফুলবাগান, এন্টালি বেনিয়াপুকুর, টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, লেক, ভবানীপুর, কড়েয়া, আলিপুর, নিউ আলিপুর, ওয়াটগঞ্জ, একবালপুর, গার্ডেনরিচ, সাউথপোর্ট এবং ডায়মন্ডহারবার মহকুমার থানা মগরাহাট, ফলতা, মন্দিরবাজার, ডায়মন্ডহারবার, কুলপি, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা সাগর দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অতীত ইতিহাস গৌরবময়। প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতের দক্ষিণতম অংশে বা গাঙ্গেয় বদ্বীপে গঙ্গারিডি নামে এক রাজ্য ছিল এবং উক্ত রাজ্যের রাজধানী 'গঙ্গের' অবস্থান ছিল গঙ্গাসাগর সঙ্গম অঞ্চলে। খ্রিষ্টিয় ১ম-২য় শতকে জনৈক গ্রিক নাবিকের সমুদ্রযাত্রা বিবরণী এবং গ্রিক টলেমি সম্পাদিত মানচিত্র থেকে এই সম্পর্কে একটা ধারণা বা অনুমান করা হয়। কিন্তু উক্ত রাজ্যের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই জেলার দক্ষিণের প্রান্তিক সীমায় বঙ্গোপসাগরের উপকূল সন্নিহিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল—সুন্দরবন। এই অরণ্যময় সুন্দরবন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মৌর্য-শুঙ্গ-শক-কুষাণ, গুপ্ত-পাল-সেন যুগের প্রত্নসম্পদ "প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন সুন্দরবনের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রায়দীঘি গ্রামে পাথরের তৈরী সূর্যমূর্তি, বোড়ালগ্রামের ভূগর্ভ হইতে মৌর্য শুঙ্গ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাল, সেন আমলের অনেক পুরাকীর্তি, ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে হরিনারায়ণপুরে আবিষ্কৃত মাতৃকামূর্তি ও সীলমোহর, দক্ষিণ-পূর্বদিকে বকুলতলা গ্রামে লক্ষ্মণসেনের পট্টোলী, জয়নগর থানার কালীপুর গ্রামের সূর্যমূর্তি, রাক্ষসখালী দ্বীপে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের পট্টোলী, কালীঘাটে গুপ্তমুদ্রা আদি প্রাচীন বাংলায় এক সমৃদ্ধ জনপদের সাক্ষ্য দিতেছে।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন

সুন্দরবনের ভয়ংকর নদীও রয়েল বেঙ্গলের কাছে তুচ্ছ
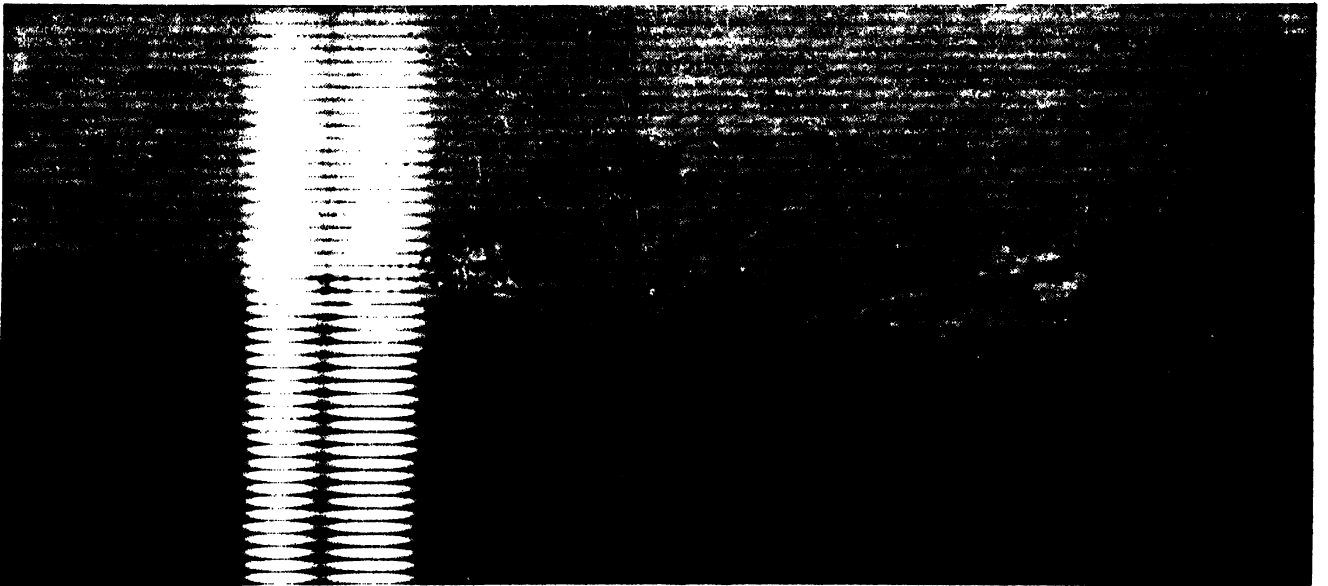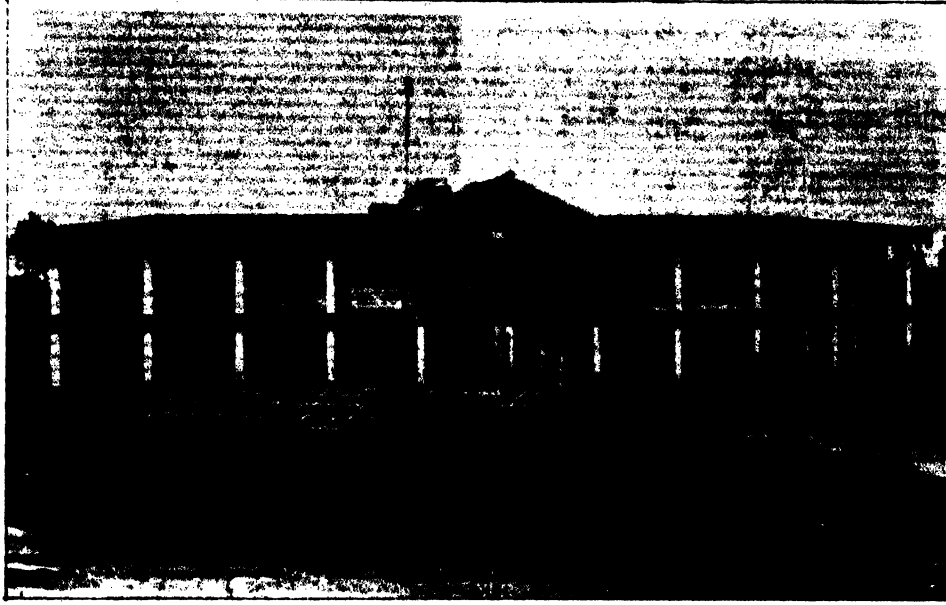
গোসাবার পাখিরালয়ে জেলা পরিষদের বাংলো — *ছবি : হিমাদ্রিশেখর মণ্ডল*

রায়)। লৌকিক দেব-দেবী, গাজী, পীর-পীরানী ও বিবিদের বহু অপূর্ব মহিমার কাহিনী ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে, লোককাব্যে, উপকথায়, গল্পকথায় ও কিংবদন্তিতে। জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নানাস্থানে বহু মঠ, মন্দির, মসজিদ, মেলা দেখতে পাওয়া যায়। অতীত ঐতিহ্য ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলির সঙ্গে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেককেই বিমোহিত করবে।

ভ্রমণ-পর্যটকের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির বিবরণ দেওয়া হল।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকা ।। জাতীয় উদ্যান

আয়তন :

সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান	১৩৩০=১০	বর্গকিলোমিটার
সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য	৩৬২=৪০	বর্গকিলোমিটার
বাফার অঞ্চল (Buffer Zone)	৮৯২=৬০	বর্গকিলোমিটার
সুন্দরবন ব্যাঘ্রসংরক্ষণ এলাকা	২৫৮৫=১০	বর্গকিলোমিটার

সাধারণ বিবরণ : সুন্দরবনের জলাজঙ্গল মানুষের কাছে এক অপার বিস্ময়। বাইন, গেঁওয়া, গরান, গর্জন, কাঁকড়া, সুন্দরী, হেঁতাল, কেওড়া, গোলপাতা, ধানী ও বরুণা ঘাস প্রভৃতি গাছগাছালিতে সমৃদ্ধ। সুন্দরবনের জীবজন্তুর তালিকায় বাঘ, কুমির, কচ্ছপ, কাঁকড়া, হরিণ ইত্যাদি নানা ধরনের স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির সমন্বয় এখানে।

পথ নির্দেশ ও পর্যটক সুবিধা : ক্যানিং বন্দর, হাসনাবাদ, সোনাখালি, রায়দিঘি, বাসন্তি, ন্যাজাট, ধামাখালি, প্রভৃতি স্থানে মোটর বা বাসযোগে পৌঁছে জলযানে এই এলাকা ভ্রমণ করা যায়। ট্রেনযোগেও শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং পৌঁছানো যায়।

যোগাযোগ : ফিল্ড ডিরেক্টর, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ, পোঃ ক্যানিং দঃ ২৪ পরগনা।

সজনেখালি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

আয়তন : ৩৬২=৪০ বর্গকিলোমিটার।

সাধারণ বিবরণ : বিভিন্ন ধরনের কয়েক হাজার পাখির কলতানে আকাশবাতাস মুখরিত। হাঁস, শামুকখোল, পানকৌড়ি, টিট্টিভ, ঈগল, শঙ্খচিল, মরাল ইত্যাদি পাখির সমাবেশ এখানে। সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে বনা-বরাহ, চিতলহরিণ, সাধারণ গোসাপ, মসৃণ উদ্‌বিড়াল, হিংস্র কুমির, বাঘ ইত্যাদি বাসিন্দা।

পথ নির্দেশ ও পর্যটক সুবিধা : কলকাতা থেকে ক্যানিং রেলপথে ৪৬ কিলোমিটার দূরত্ব। সেখান থেকে জলযানে সজনেখালি ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব। সজনেখালিতে পর্যটন আবাস আছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য পর্যবেক্ষণ গম্বুজ আছে।

যোগাযোগ : ফিল্ড ডিরেক্টর, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ, পোঃ ক্যানিং দঃ ২৪ পরগনা।

লোথিয়ান দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

আয়তন : ৩৮ বর্গকিলোমিটার।

সাধারণ বিবরণ : বঙ্গোপসাগরের কাছে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় লোথিয়ান দ্বীপটি অবস্থিত। উদ্ভিদের মধ্যে কেওড়া, বাইন, গরান প্রভৃতি প্রধান। চিতল হরিণ, বন্য বরাহ, বানর, বন বিড়াল ইত্যাদি এখানকার বাসিন্দা। শীতের অতিথি পরিযায়ী পাখিরা এখানে আশ্রয় নেয়। এই জলাজঙ্গলের দ্বীপের আকর্ষণ সামুদ্রিক কুমির।

যোগাযোগ : বিভাগীয় বনাধিকারিক, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বন বিভাগ, ৩৫ গোপালনগর রোড, কলিকাতা—২৭

হ্যালিডে দ্বীপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

আয়তন : ৫=৯৬ বর্গকিলোমিটার।

সাধারণ বিবরণ : সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত। চিতল হরিণ, বন্য বরাহ, মর্কট ইত্যাদি বন্যপ্রাণী এখানে আছে। মাঝে মাঝে কাকর হরিণ ও বাঘের দেখাও মেলে।

পথ নির্দেশ : জলপথে রায়দিঘি থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব ৫০কিলোমিটার। রেল ও সড়কপথে রায়দিঘির সঙ্গে কলকাতা, ডায়মণ্ডহারবার ও বারুইপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ : বিভাগীয় বনাধিকারিক, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) বন বিভাগ, ৩৫ গোপালনগর রোড, কলিকাতা—২৭।

নরেন্দ্রপুর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

আয়তন : ০.১০ বর্গকিলোমিটার

সাধারণ বিবরণ : অভয়ারণ্যটি সোনারপুরের কাছে গড়িয়া-ক্যানিং রোডের পাশে অবস্থিত। কলকাতার খুব নিকটে এই ক্ষুদ্র বিজন স্থানে বেনেবৌ, মুনিয়া, অঞ্জন, টুনটুনি, ছাতারে, স্কুৎকি প্রভৃতি বহু পাখির আশ্রয়স্থল। বহু পক্ষীপ্রেমিক সংস্থা এই স্থানে পাখি দেখতে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেন। পান্নাঘুঘু, শা-বুলবুল আর চাক-দেয়েলের বিশেষ আকর্ষণ।

যোগাযোগ : বিভাগীয় বনাধিকারিক, ২৪পরগনা (দক্ষিণ) বন বিভাগ, ৩৫ গোপালনগর রোড, কলিকাতা—২৭।

গোসাবা : স্যার ডেভিড হ্যামিলটনের আবাসস্থল।

নেতিধোপানি : ৪০০ বছরের পুরানো মন্দিরের একটি ধ্বংসাবশেষ এখানে আছে। 'বনবিবি' এখানকার উপাস্য দেবী।

ভগবতপুর : এখানে মোহনার সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতি কুমিরের ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হয় এবং তারপর সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকার খাঁড়িতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

কনক : অলিভ রিডলে কচ্ছপের স্বাভাবিক আবাসস্থল।

পিয়ালী : সুন্দরবনে যাবার পথ। কলকাতা থেকে দোসরহাট হয়ে ৭০কিমি। জলপথে এখান থেকে সজনেখালি, সুধন্যখালি, নেতিধোপানি খুব কাছে। এখান দিয়ে একটি ছোটনদী 'পিয়ালী' সবুজ ধানক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে মিশেছে মাতলায়। ছবির মতো এই ব-দ্বীপে শান্ত একটা ছুটি কাটিয়ে আসা যায়।

যোগাযোগ : বাসে-এসপ্লানেড থেকে বারুইপুর; বারুইপুর থেকে দোসরহাট; দোসারহাট থেকে মোটর জলযানে পিয়ালী।
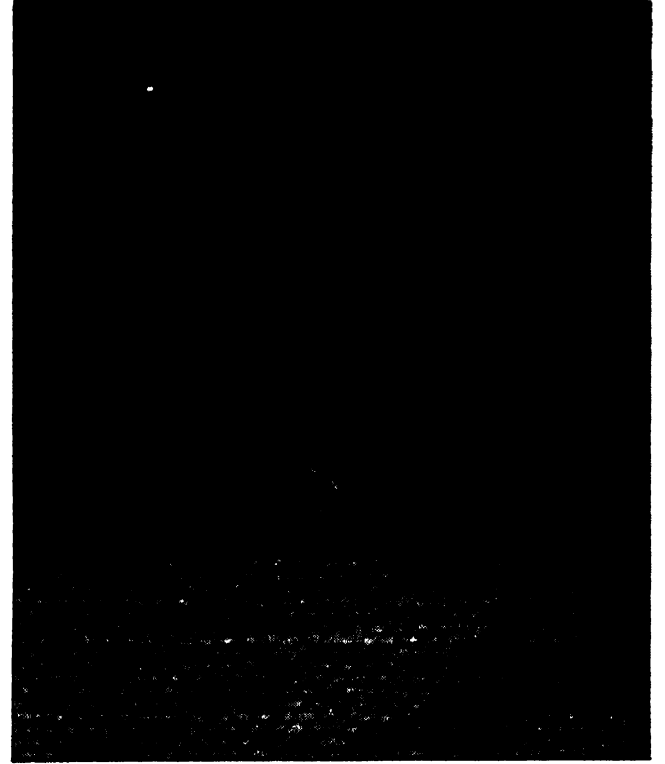
চকিত নয়না হরিণী

ট্রেনে— শিয়ালদহ থেকে গোচারণ; গোচারণ থেকে দোসরহাট অটোরিকশায় : দোসরহাট থেকে মোটর জলযানে পিয়ালী।

কৈখালি : সুন্দরবনের পথে কখনও ভুলেও কৈখালি দ্বীপপুঞ্জ দেখতে যেন ভুল না হয়। পিকনিকের স্বর্গ এই স্থানে প্রকৃতি বর্ণময় ও প্রাণবন্ত। কৈখালি যেতে হলে ট্রেনে শিয়ালদহ থেকে জয়নগরমজিলপুর। জয়নগর থেকে ভ্যান রিক্‌শায় বা বাসে জামতলা।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প, ছবি : অঞ্জন বসু
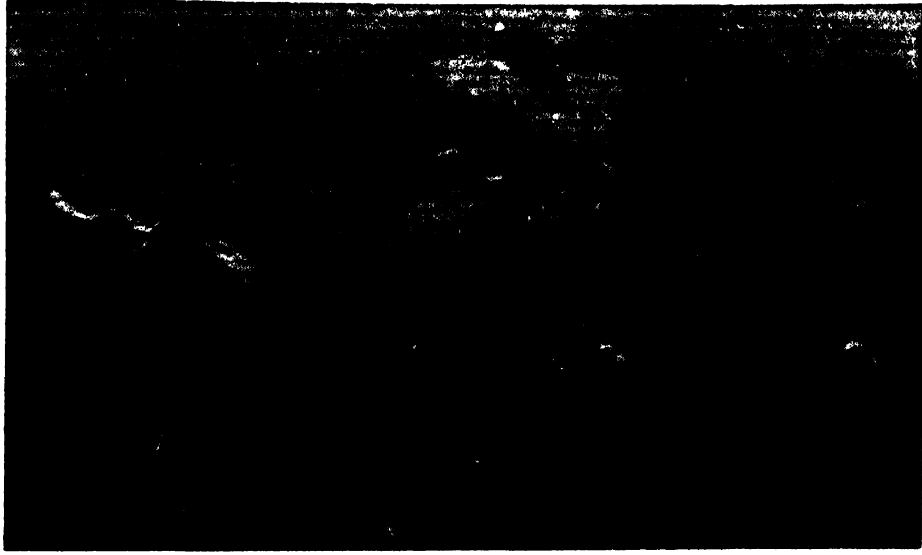
বাসে করে এসপ্লানেড থেকে জয়নগর এবং সেখান থেকে জামতলা। জামতলা থেকে কৈখালি যেতে হবে মোটরবোটে।

গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার শেষ সীমান্তে বঙ্গোপসাগর তীরে সাগরদ্বীপ। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তি যোগে সারা ভারত থেকে মানুষ এখানে আসে পুণ্যস্নানে; গঙ্গাসাগর সঙ্গম হিন্দুদের পরম পবিত্রস্থান। 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। এখানে কপিলমুনির মন্দির আছে। পুণ্যস্নান যোগে মন্দিরের পাশে বসে মেলা। এই সর্বভারতীয় মেলায় প্রায় ৪/৫ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। ডায়মন্ডহারবার থেকে সাগরদ্বীপের দূরত্ব ৬৪ কিলোমিটার। ডায়মন্ডহারবার থেকে বাসে কাকদ্বীপ। কাকদ্বীপ থেকে জলযানে সাগরদ্বীপের উত্তরে কচুবেড়িয়া। সেখানে থেকে হাঁটাপথে সাগরদ্বীপের মেলায় যাওয়া যায়। গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির পূজা সম্পর্কে 'হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি তথ্যে আছে—" ঐ স্থানে যে এক মন্দির আছে তাহা লোকে কহে যে, ১৪০০ বৎসর হইল প্রথিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরে কপিল মুনি নামে প্রসিদ্ধ দেবরূপ এক সিদ্ধর্ষি সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। রামায়ত্ত বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয়েরা তাঁহাকে অতি পূজ্য করিয়া মানেন। ইঙ্গরেজী ৪৩৭ সালে ঐ মন্দির প্রথিত হইলে জয়পুর রাজ্যস্থ গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক উক্ত সিদ্ধর্ষি প্রতিষ্ঠিত হন এবং উক্ত মন্দিরে ৪০ বৎসরে দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্যায়ক্রমে জয়পুরস্থ রামানন্দ নামক এক ব্যক্তি গুরুর অধিকৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ অধিকার রাজগুরু শিবানন্দের হইল। তিনি বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে ঐ মন্দির দর্শন করিতে আইসেন এবং মেলার যোগের পরে কলিকাতায় আসিয়া একটি বন্দোবস্ত করতঃ মেলার বার্ষিক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া অর্থাৎ দিগম্বর ও খাকি ও সন্তকি ও নির্মহী ও নিবাণী ও মহানিবাণী এবং নিরালম্বীতে এক এক শত করিয়া বিভাগ করিয়া দেন। এবং এ মত হুকুম করেন যদি ইহার অতিরিক্ত কিছু থাকে তবে ঐ মন্দিরের মেরামতে ব্যয় করা যায়।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা।। ৩য় খণ্ড)।
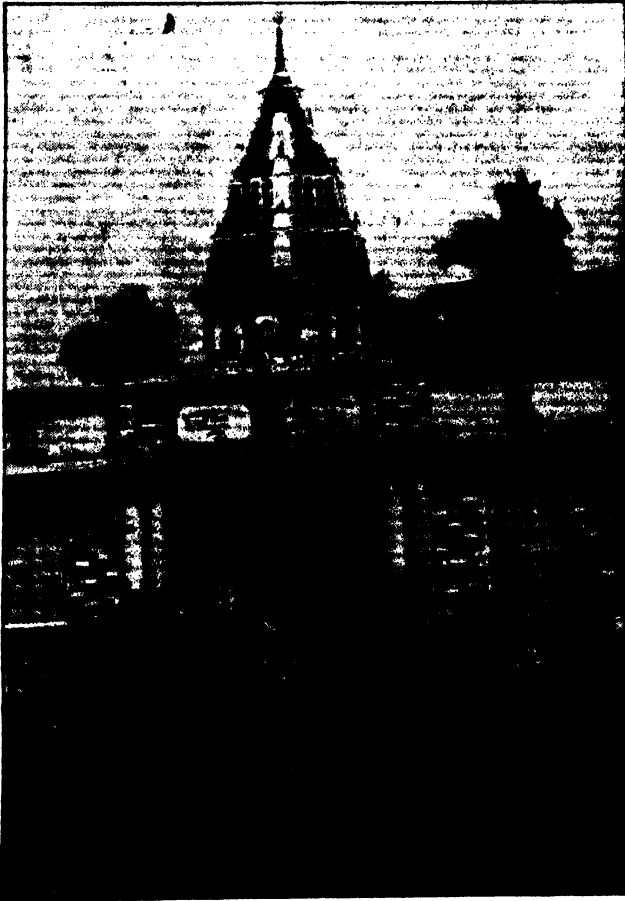
গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দির

মেলা শেষের স্মরণযোগ্য স্মৃতিচিত্র,— "মেলা শেষ হয়। সরকারী কর্মচারীরা একদিন মেলা ভেঙে দেবার কথা ঘোষণা করেন। তার আগেই অবশ্য যাত্রীরা চলে যান যে যার ঘরে। ব্যবসায়ীরা লাভ-লোকসানের হিসাব মিলিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসেন মহাজনী নৌকায়। সরকারী কর্মচারী যাঁরা সবার শেষে সাগরদ্বীপে ত্যাগ করেন, তাদের কাছে শোনা যায়। এই সময় নাকি অসংখ্য কুকুরের দল এসে হাজির হয় সাগরদ্বীপে মেলা প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে থাকা উচ্ছিষ্টাংশ ভোজনের লোভে। তারপর একদিন তারাও ফিরে যায় যে যার

আস্তানায়। দূরে বহুদূরে দিগন্তে মিলিয়ে যায় সাগরদ্বীপ থেকে ছেড়ে যাওয়া শেষ মহাজনী নৌকাটি। জন কোলাহল থেমে যায়, নির্জনতা নেমে আসে সাগরদ্বীপে। কেবল ভাবলেশহীন বিস্ফারিত নেত্রে একদৃষ্টি চেয়ে বসে থাকেন মহামুনি কপিল; কিংবা হয়ত চক্ষু বুজিয়ে সারা বৎসরের জন্য আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয় যান। তাঁরই কল্যাণে যে মোহন্তের দল প্রায় লক্ষ টাকা ধনসম্পত্তি নিয়ে অযোধ্যার 'হনুমানগড়ি মঠে' গিয়ে ওঠেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ একজন রইল না নিয়মিতভাবে তাঁকে দুটো ফুল-বেলপাতা ছুঁড়ে দিতে। সংসার নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, মহাজ্ঞানী মহামুনির তাতে কিছু আসে যায় না। এই অবহেলা তাঁর সুগভীর প্রশান্ত হৃদয়ে কোন্ রেখাপাত করে না। জীবনে হয়তো এই নির্জনতা এই নিঃসঙ্গতাই চেয়েছিলেন তিনি। তাই সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন কোন্ সেই সুদূর অতীতকালে সুবিশাল ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের কূলে নির্জন সাগরদ্বীপকে। শান্ত, মহাশান্ত, পরিব্যাপ্ত; শান্তি, মহাশান্তি বিরাজিত। শুধু শোনা যায়, নির্জন সাগর সৈকতে আছড়ে পড়া, বিরামহীন জলোচ্ছ্বাসের একটানা গর্জন। বর্ষ চক্র ঘুরে চলে।" (পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা। তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ২৭১)।

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে অবস্থিত সাগরদ্বীপ ৫টি দ্বীপের সমষ্টি। পাঁচটি দ্বীপ যথা—(১) সাগর (২) ঘোড়ামারা (৩) সুপারিডাঙ্গা (৪) আগুনমারি ও (৫) লোহাচড়া। আরও কয়েকটি দ্বীপ ছিল। সেগুলি কালক্রমে মিশে গেছে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। সাগরদ্বীপের পশ্চিমে হুগলি নদী; পূর্বদিকে বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা বা চ্যানেল ক্রীক; উত্তরে বারাতলা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বকখালি : কলকাতা থেকে ১৩২ কিলোমিটার দূরত্বে এই রাজ্যের দ্বিতীয় জনপ্রিয় সৈকতাবাস। এই সুন্দর, শান্ত, নির্জন সৈকতাবাসটি পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

ফ্রেজারগঞ্জ : বকখালির অদূরে এক মনোরম পরিবেশে সাগরবেলা ফ্রেজারগঞ্জ। বাংলায় ছোটলাট এনড্রু ফ্রেজারের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এই সৈকতনগরী ও স্বাস্থ্যাবাস।

কলসদ্বীপ : সুন্দরবনের গভীরে বাঘ, শূকর, হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। মাতলা ও বিদ্যানদী পেরিয়ে এই দ্বীপে যেতে হয়।

ডায়মন্ডহারবার : কলকাতার দক্ষিণে ৪৮ কিলোমিটার দূরত্বে এই সৌন্দর্যে ভরা শহর। শীতের দিনে গঙ্গার ধারে পিকনিক স্পটের মনোরম স্থান। এছাড়া এখানে আছে লাইট হাউস ও পুরনো কেল্লার ভগ্নাবশেষ।

জটারদেউল : জটার দেউল সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "....মণি নদীর মোহনার কাছে একটি উত্তুঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে 'জটার দেউল' বলে। বহুদূর হইতে এই দেউল দেখা যায়; উহার উচ্চতা ৬০।৭০ ফুটের কম হইবে না। সম্ভবত ইহা একটি বিজয়স্তম্ভ। ইহার বয়স ৪।৫ শত বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং উহা প্রতাপাদিত্যের আমলের বিজয় স্তম্ভ হওয়া বিচিত্র নহে। কথিত আছে, ইহারই নিকটবর্তী বিদ্যাধরী নদীর এক মোহনায় প্রতাপ-সেনানী রুডা একটি নৌযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন। জটার দেউল একটি মৃত্তিকা স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাহিরের মাপ ৩০'—৯" × ৩০'—৯", ভিতরে ১০'—৯" × ১০'—৯" এবং ভিত্তি ১০ ফুট। উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট। পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ, উহা ৯'—৬" বিস্তৃত। দেউলটি পাতলা ইটের গাঁথুনি, আগাগোড়া সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত, শুধু নিম্নের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিল্পকলা বিলুপ্ত হইয়াছে।" (যশোহর-খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড ।। পৃঃ ২০৬—০৭)

খাড়ি : খাড়িগ্রামে কলকাতা অথবা মথুরাপুর রোড স্টেশন থেকে বাসে যাওয়া যায়। মথুরাপুর রায়দীঘি রোডের দক্ষিণে কাশীনগর

বকখালির সাগরবেলায় অরুণোদয় *ছবি : সুধীর হালদার*

মাইবিবির হাট, উত্তরে খাড়িগ্রাম। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৮, পুস্তকে লিখিত আছে,—

"খাড়িগ্রামে একটি প্রাচীন বৃহৎ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব পারে বড়খাঁ গাজীর আস্তানাটি অবস্থিত। পুষ্করিণীর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পারে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট আছে। ইষ্টক-নির্মিত আস্তানা ঘরটি দক্ষিণমুখী, সম্মুখে বারান্দাযুক্ত ওপরে গম্বুজবিশিষ্ট। সংস্কার অভাবে ঘরটি জীর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী-বাঁধা, মুখে চাপদাড়ি, পায়ে জুতো এবং দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী বড়খাঁ গাজী সাহেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি মনুষ্যপ্রমাণ হইবে। ......বড়খাঁ গাজীর নিয়মিত পূজা হয় না। ভক্তরা যে যখন আসেন তখনই পূজার আয়োজন করা হয়। সুন্দরবনে যাঁহারা কাষ্ঠ কাটিতে অথবা মধু সংগ্রহ করিতে যান তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বড়খাঁ গাজীর আস্তানায় হাজত পূজা দিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন প্রতি বৎসর নন্দা স্নান উপলক্ষে যে সকল যাত্রী চক্রতীর্থে আসেন তাঁহারা খাড়িতে স্নান সারিয়া গাজীর উদ্দেশে পূজা দিয়া যান।"

ছত্রভোগ : এককালের সমৃদ্ধ জনপদ। এখানে ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির আছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এই প্রাচীন সমৃদ্ধশালী জনপদ সম্পর্কে কালিদাস দত্ত লিখেছেন,—"খ্রিষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে সেখানে একরাত্রি কীর্তনানন্দে যাপন করেন। সে কারণে গৌড়িয় বৈষ্ণবদিগের নিকটও উহা একটি তীর্থক্ষেত্রবিশেষ। ....চৈতন্য ভাগবতাদি পুরাতন বাংলা গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, প্রাচীনকালে উহা আয়তনে অনেক বড় ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল এবং এখন উহার উত্তরে জলঘাটা ও দক্ষিণে কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কাটানদীঘি, বড়াশী, মাদপুর, কাশীনগর প্রভৃতি যে সকল গ্রাম আছে সেগুলিকেও লোকে তখন ছত্রভোগ বলিত। অধুনা কাশীনগরের প্রায় তিন চার ক্রোশ দক্ষিণে, ২২ নং লাটের শেষ সীমায় ছুতরা ভোগ নামে একটি নদী আছে। পূর্বে উহারও নাম ছিল ছত্রভোগ নদী। উহা হইতে বোধ হয় প্রাচীনকালে দক্ষিণে ঐ নদী পর্যন্ত ভূভাগ ছত্রভোগ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।.....বিস্তীর্ণ ছত্রভোগ নগরের সমৃদ্ধির কারণ ছিল উহার উত্তর ও পূর্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত অধুনালুপ্ত আদিগঙ্গা নদী। উহার শুষ্ক খাদ এখনও সেখানে মজাগঙ্গা বা গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া বর্তমানে আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কতকগুলি মনসার ভাসান ও চণ্ডীর গানের পুঁথি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর উপর ছত্রভোগ একটি সমৃদ্ধ বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং লোকে তখন ভাগীরথী-পথে ঐ স্থান দিয়াই সমুদ্রে যাতায়াত করিত।

"ছত্রভোগের প্রাচীনত্ব এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তবে বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকারে আসবার পূর্বেও যে সেখানে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল তাহা জানা যায় সেখানকার ভূগর্ভে আবিষ্কৃত পাল ও সেন রাজগণের আমলের অনেকগুলি কালো প্রস্তরের হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এবং কয়েকটি কারুকার্যমণ্ডিত দ্বার ফলক ও স্তম্ভাদি হইতে। প্রাচীন ছত্রভোগ নগরের স্থান এখন জলঘাটা, ছত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ও বড়াশী প্রভৃতি নামে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম অধিকার করিয়া আছে। ঐ সমস্ত গ্রামই ভূগর্ভ খননকালে কিছু কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে। উহা ভিন্ন অনেক প্রাচীন গৃহ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং কয়েকটি দেবতাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।......মুসলমান আমলের শেষ ভাগে কি জন্য ছত্রভোগের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিলোপ ঘটে এবং উহা একটি নগণ্য পল্লীতে পর্যবসতি হয় তাহা অজ্ঞাত। প্রবাদ, ভাগীরথী নদীর অন্তর্ধান ও মগ এবং পর্তুগিজদের অত্যাচারই উহার কারণ। পরে সেখানে নীলকরেরা ঘাঁটি স্থাপন করে। উহার নিদর্শনস্বরূপ অনেকগুলি নীলপ্রস্তুত করিবার গৃহ ও চৌবাচ্চার ধ্বংসাবশেষ এখনও ছত্রভোগ ও কাটানদীঘিতে দেখিতে পাওয়া যায়।" (ছত্রভোগ—কালীদাস দত্ত। প্রবাসী। মাঘ। ১৩৫৯)।

বাওয়ালি : একসময় বাওয়ালি ছিল সমৃদ্ধ গ্রাম। বাওয়ালিরা কয়েক ঘর বহুপূর্বে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। তারা সুন্দরবন অঞ্চলে মধু ও কাঠ সংগ্রহকারীদের সাহায্য করত। "......প্যারীলাল মণ্ডল বহু বৃহদায়তন দেবমন্দির নির্মাণ করান। টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পূর্বকূলে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে তিনি হরিহরধাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির সংলগ্ন জমিতে আটচালা গঠনের দ্বাদশ শিবমন্দির গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার সামান্য দক্ষিণদিকে অবস্থিত রাধা মদনমোহন জীউর মন্দিরটি মণ্ডল পরিবারের। উদয়নারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাধা মদনমোহন জীউর মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার তীরবর্তী আটচালা গঠনের দ্বাদশ শিবমন্দিরগুলি মানিকনাথ মণ্ডল কর্তৃক ১২০০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত বলিয়া জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পশ্চিমতীরে

মণ্ডল টেম্পল লেনের উপর বর্তমানে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত যে নবরত্ন মন্দিরটি দেখা যায় উহাও বাওয়ালি মণ্ডলদিগের কীর্তি। এইরূপ সুবিশাল নবরত্ন মন্দির পশ্চিমবঙ্গে অতি অল্পই আছে। বর্তমানে এই মন্দিরে কোন বিগ্রহাদি নাই।—(পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—তৃতীয় খণ্ড। পৃঃ ১৩২)

বহড়ু: বহড়ু স্টেশনের পশ্চিমে বহড়ু ও পূর্বদিকে ময়দা গ্রাম। বহড়ুর মধ্য দিয়ে কুলপি রোড জয়নগর মজিলপুর হয়ে চলে গেছে কলকাতার দিকে। বহড়ুতে আছে বিখ্যাত শ্যামসুন্দর জীউ মন্দির। "প্রবেশ পথের শীর্ষে অঙ্কিত চিত্রগুলির বিষয়বস্তু রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, শিবলীলা ইত্যাদি। মোট পাঁচটি প্রাচীর এখানে আছে। সর্ববামে বৃষারূঢ় হরপার্বতী, দুই পাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী। দ্বিতীয়টিতে বনবাসান্তে অযোধ্যায় রাজত্বকারী রামের সভাদৃশ্য। তৃতীয়টি বেশ অভিনব, উপবিষ্ট গণেশকে দু ব্যক্তি বন্দনা করছেন, এঁদের একজন নাকি নন্দকুমারের পুত্র রামধন বসু। চতুর্থ প্রাচীরচিত্রটি চৈতন্যলীলা সংক্রান্ত। কেন্দ্রস্থলে তুলসী মঞ্চ স্থাপন করে শ্রীচৈতন্য, নিতানন্দ, অদ্বৈত, যবন হরিদাস ইত্যাদিকে নিয়ে নৃত্য করছেন। পঞ্চতম চিত্রটিই বেশি সুন্দর মনে হয়। বৃন্দাবনের কুঞ্জে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রূপ। অযত্নে অবহেলায় মলিন, তবুও এই প্রাচীর চিত্রটির সজীবতা লক্ষণীয়। অলিন্দের পশ্চিমগাত্রে ৪ফিট ৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিধির এক বৃহৎ রাসমণ্ডল। রাসমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কুঞ্জ এবং স্বচ্ছ সলিলা যমুনা রাসমণ্ডলের কেন্দ্রে দুই সখীসহ বংশীবাদক কৃষ্ণ। কেন্দ্রের বাইরে অষ্টসখী নৃত্যরত কৃষ্ণ। অলিন্দের পূর্ব গাত্রেও ধর্মীয় আখ্যান চিত্রিত হয়েছে। বিষ্ণুর অবতার বিষয়ক চিত্র যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম, কল্কি ইত্যাদি এই অংশে আছে। বলরাম, সুভদ্রা, জগন্নাথ এবং বিষ্ণুলীলার কয়েকটি দৃশ্যও দেখা যায়। কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক বিশেষত বাল্যলীলার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল চৈতন্যলীলার একটি দৃশ্য। চিত্রটিতে চৈতন্যদেবের ষড়ভুজমূর্তি; চৈতন্যদেবের উভয়পার্শ্বে রাজা প্রতাপ রুদ্র এবং তদীয় সভাপণ্ডিত সার্বভৌম। ....একেবারে নীচে, সর্বদক্ষিণে যে চিত্রটি আছে তা নিশ্চয় এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ প্রাচীরচিত্র এবং বিষয়বস্তু হিসাবে এর নির্বাচনে শিল্পীর কল্পনাশক্তির পরিচায়ক চিত্রটি এইরূপ : প্রমোদ উদ্যানে উপবিষ্টা অন্যমনস্কা রাধা। উদ্যান সংলগ্ন প্রাসাদের এক কোণ থেকে কৃষ্ণ গোপান রাধাকে দে[illegible]। কিন্তু তাঁর এই আগমন একজন জানতে পেরে গেছেন, [illegible] রাধাকে সতর্ক করতে চান, জানাতে চান কৃ[illegible] অবশ্য এমনভাবে যে কৃষ্ণ বুঝতে না পারেন। বি[illegible] নিকটে মুকুর ধারণ করে দাঁড়িয়েছেন। মুকুরে কৃষ্ণ[illegible]ছে।"—("চব্বিশ পরগনার মন্দির—অসীম মুখোপা[illegible] পৃ[illegible]—৯৬")।

ঘুটিয়ারি শরিফ : [illegible] অন্তর্গত ঘুটিয়ারি স্টেশনের নিকটে ঘুটিয়ারি শরিফে [illegible] বড়খাঁ গাজীর দরগাহ বা কবরটি রয়েছে, যেখানে [illegible]নুষ আসেন ফুল, ফল, দুধ, বাতাসা দিয়ে হাজত—[illegible] সাহেবকে নিয়ে বহু কিংবদন্তী প্রচারিত। তার একটি [illegible]মিদার রায়চৌধুরীদের নিয়ে। নবাবের দরবারে নিয়ে [illegible] হয় [illegible] মদনমোহনকে খাজনা বাকি ফেলার অপরাধে। গাজী[illegible]দনমোহন। গাজীর স্বপ্নাদেশে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁকে মুক্তি দেন। রায়চৌধুরীরা গাজীর দরগাহ তৈরি করে দেন।

'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা'র তৃতীয় খণ্ডে গাজীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে উল্লেখিত আছে:—

"........সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন পল্লীতে মোবারক গাজীর বেদী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অঞ্চলের কাঠুরিয়ারা গাজীর বেদীতে প্রার্থনা না জানাইয়া সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে যায় না। গাজীর বংশধর বা সাকরেদ পরিচয় দিয়া একদল ফকির কাঠুরিয়াদের ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজাদি করিয়া থাকেন। প্রচলিত প্রথা এই যে, কাঠুরিয়ারা যে অঞ্চলে কাঠ কাটিবে বলিয়া স্থির করেন ফকিরদের কেহ তাহাদের সঙ্গে যাইয়া সেই স্থানে কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মন্ত্র পড়িয়া একটি গণ্ডী কাটিয়া দেন। সেই গণ্ডীর মধ্যে লতাপাতা দিয়া ছোট ছোট সাতটি কুটির নির্মাণ করা হয়। উহার দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমটিতে জগদ্বন্ধু (Friend of the world) দ্বিতীয়টিতে প্রলয় দেবতারূপে মহাদেব এবং তৃতীয়টিতে সর্পদেবতা মনসাদেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়। মনসা দেবীর কুটিরের পাশে রূপপরীর সম্মানার্থে একটি ছোট বেদী নির্মাণ করা হয়। রূপপরী জঙ্গলের অদৃশ্য আত্মা বলিয়া বিশ্বাস। পরের কুটিরটির মধ্যে দুইটি কোঠা থাকে, উহার একটিতে কালী এবং অপরটিতে কালীমাতার কন্যা কালীমায়া অধিষ্ঠান করেন। ইহার পাশেও রূপপরীর জন্য একটা ছোট বেদী থাকে। ইহার পরের কুটিরটিও দুই ভাগে বিভক্ত—একটি দেবী কামেশ্বরীর অন্যটি বুড়িঠাকুরানীর। বুড়িঠাকুরনীর গৃহের পাশে কাণ্ডে সিন্দুর লিপ্ত একটি বৃক্ষ থাকে—উহা রক্ষাচণ্ডীর স্থান। অবশিষ্ট দুইটি কুটিরের একটিতে গাজীপক্ষীর ও তাঁহার ভ্রাতা কালুপীরের এবং অন্যটিতে গাজীপীরের পুত্র ছাওয়াল পীরের এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রামগাজীর। সর্বশেষে কলা পাতায় বাস্তুদেবতার নামে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। নৈবেদ্য খুবই সাধারণ —চাল, কলা, চিনি ইত্যাদি। তবে রক্ষাচণ্ডীর নিকট কোন নৈবেদ্য দেওয়া হয় না।

"দেবদেবীর এই সকল গৃহ নির্মাণ করিবার পর ফকির স্বয়ং স্নান করেন এবং কাঠুরিয়ারা নূতন বস্ত্র পরিধান এবং কপালে ও বাহুতে সিন্দুর লেপন করিয়া পূজা প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রার্থনা জানান। ইহার পর ফকির কাঠুরিয়াদের কনুই হইতে বিঘৎ মাপিয়া যদি হাতের যে কোন আঙ্গুলের সহিত বিঘতের আঙ্গুলি মিলিয়া না যায় তাহা হইলে আশপাশে কোথাও বাঘ আছে বলিয়া মনে করা হয়। ফকির তখন নিজেকে এবং কাঠুরিয়াদের রক্ষা করিবার জন্য পূজা ও নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করেন—"ধুলা, ধুলা, ধুলার গুড়া পড়ুক তোদের চক্ষে হে বাঘ-বাঘিনী...... ইত্যাদি।

"বলা বাহুল্য মন্ত্রশক্তিদ্বারা কাঠুরিয়া এমন কি ফকির নিজেও যে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে জীয়ন্ত রক্ষা পায় না তাহার বহু প্রমাণও আছে। তথাপি বলা যায় স্থানীয় কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটিতে যাইবার কালে এই সকল ফকিরদেরে উপরেই বেশী নির্ভর করে। কাঠুরিয়া সে হিন্দু অথবা মুসলমান হউক গাজী পীর ও তাঁহার ভ্রাতা কালুগাজীর নামে ভক্তিতে মাথা নত করে।"

লেখক পরিচিতি : বনবিভাগের প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক ও বিশিষ্ট প্রবন্ধকার।

বসন্তকুমার মণ্ডল

গঙ্গাসাগর কেবল তীর্থস্থান নয়, পর্যটন কেন্দ্রও বটে

দ্বীপ ও নদীনালার দেশ সুন্দরবন অঞ্চলের বৃহত্তম দ্বীপ সাগর দ্বীপ। এর আয়তন জলসীমাসহ ২২৪.৩ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৯৭১ সালের লোকগণনায় ৯১,৭৪০ জন। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এসে সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ছেচল্লিশটি গ্রামের সমষ্টি এই বিশাল দ্বীপ। পঞ্চতীর্থের শ্রেষ্ঠতীর্থ বলা হয় গঙ্গাসাগরকে। সাগরে স্নান করলে নাকি আর পুনর্জন্ম হয় না। ভারতের অসংখ্য নরনারী পথের বাধা অগ্রাহ্য করে মুক্তির আশায় সাগর সঙ্গমে স্নান করে গেছে। পৌষ-সংক্রান্তির কনকনে ঠান্ডায় সাগরে স্নান করে মলিনমুক্ত হতে চেয়েছেন। অঘ্রান মাসের শেষ ভাগ থেকেই ভ্রমণার্থী ও সাধু-সন্তদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। অসম-মেঘালয়-হিমাচল-দাক্ষিণাত্য-মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের জটাজুটধারী বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও মানুষ আসতে শুরু করেন। বহু বিদেশির আনাগোনাও চলতে থাকে।

মহামুনি কপিলকে ঘিরেই গঙ্গাসাগর। কপিলমুনিই সাগরের মূল আকর্ষণ।

ভাগবতে আছে কর্দমঋষি ও দেবহুতির পুত্র মহামুনি কপিল বাল্যকালেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মাতা দেবহুতিকে সাংখ্যযোগের চতুর্দশ অধ্যায় শুনিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। পাতালে আশ্রম স্থাপন করে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

চন্দ্রবংশীয় রাজা সাগর অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হবেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হলেন। তাঁর ইন্দ্রত্ব চলে যাবে—তাই যজ্ঞ পণ্ড করার আয়োজন করলেন। কৌশলে অশ্বমেধ যজ্ঞের শ্যামবর্ণ অশ্বটি চুরি করে প্রথমে সাগরতটে তপোবনে রাখেন। তারপর পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে প্রবেশ করে। ধ্যানস্থ কপিলমুনির পিছনে ঘোড়াটি বেঁধে রেখে এলেন।

হারউড্ পয়েন্ট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত বড়তলা নদী আর নৌকায় পার হতে হয় না। ভুটভুটি লাগে না। লঞ্চেরও ছুটি হয়ে গেছে। ভূতল পরিবহনের বিশাল ভেসেল তিনশোর ওপর যাত্রী এক সঙ্গে সাবলীল গতিতে নিরাপদে পার করে দিচ্ছে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। সরকারি প্রচেষ্টায় ট্রাক-বাস-প্রাইভেট কার পারাপারেরও ব্যবস্থা হয়েছে।

সগর রাজার দুই রাণী, বিদর্ভী আর শৈব্যা। শৈব্যা অংশুমান নামে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। আর বিদর্ভী প্রসব করলেন একটি অলাবু অর্থাৎ চালকুমড়ো। সেই অলাবুতে ছিল ষাট হাজার দানা। প্রতিটি দানা থেকে একটি করে পুত্র সন্তান বেরিয়ে এল। সেই ষাট হাজার রাজপুত্র ঘোড়ার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। খুঁজতে খুঁজতে পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে প্রবেশ করলেন। চোর চোর বলে চিৎকার করতে লাগলেন। মুনির ধ্যান ভঙ্গ হল। ক্রোধে চোখের আগুনে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে পুড়িয়ে ফেললেন। রাগ থেমে গেলে মুনি বললেন—যাও স্বর্গ থেকে সুরধুনীকে নিয়ে এস। ওর স্পর্শে সবাই প্রাণ ফিরে পাবে। সগররাজার একমাত্র জীবিত সন্তান অংশুমান সুরধনীকে আনার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তাঁর পুত্র অসমঞ্জ ব্যর্থ হলেন। তাঁর পুত্র দিলীপ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং অকালে মারাও গেলেন। তাঁর পুত্র ভগীরথ কঠোর তপস্যা করে সফল হলেন। কৃবিদিদ রাজা ভগীরথ শঙ্খ বাজাতে বাজাতে গঙ্গাদেবীকে পথ দেখিয়ে আনতে লাগলেন। গঙ্গা ওরফে জাহ্নবী ওরফে ভাগীরথীর শুভ আগমন ঘটল বঙ্গদেশে এবং তাঁর সুপেয় পবিত্র জলের স্পর্শে ষাট হাজার রাজপুত্রের শরীরে প্রাণ সঞ্চারিত হল। এই হল পুরাণ কাহিনী।

গঙ্গা যেখানে সাগরে মিশেছে বা সাগরের সঙ্গে সঙ্গম হয়েছে সেখানেই গড়ে উঠল গঙ্গাসাগর ধাম। পঞ্চতীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা হয় গঙ্গাসাগরকে। কপিলমুনির মন্দিরও গড়ে উঠল। এর আগে চারটি মন্দির সাগরগর্ভে চলে গেছে। এটি নাকি পঞ্চম মন্দির। প্রবাদ কপিলমুনির মন্দির নাকি বারমাস জলে ডুবে থাকত। বাঘ, কুমির, বড় বড় অজগর সাপ মন্দির পাহারা দিত। পৌষ সংক্রান্তিতে জল সরে যেত। মন্দির জেগে উঠত, তখন সেখানে পূজা হত।
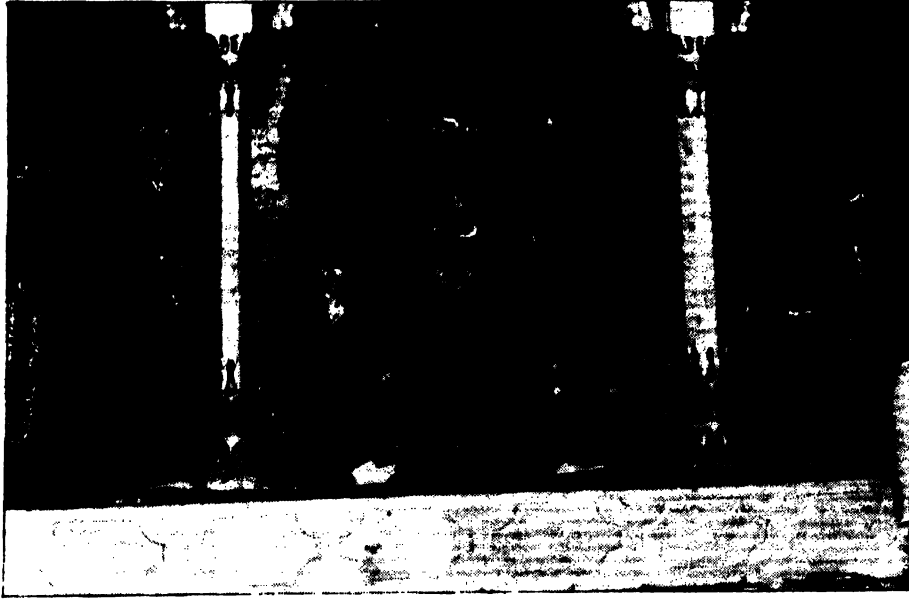
কপিলমুনি মন্দিরের বর্তমান বিগ্রহ

সেকালে পথও ছিল দুর্গম। পাল তোলা নৌকোয়, পায়ে হেঁটে বহু দূর দূর থেকে তীর্থযাত্রীরা আসতেন। কবিগুরুর বিসর্জন কবিতায় সাগরযাত্রার ভয়াবহতার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সাগর যাত্রা এমনই দুর্গম এবং কষ্টকর ছিল যিনি আসতেন তিনি নাকি আর ফিরতেন না। সাগরের বালির চড়ায় তাঁকে সমাহিত করা হত। সাগর যাত্রা করে যতদিন না ঘরের মানুষ ঘরে ফিরতেন ততদিন সে বাড়িতে পিঠে-খোলা জ্বালা হত না। কোনও অনুষ্ঠানই হত না। সাগরযাত্রাই নাকি শেষ যাত্রা। প্রবাদ প্রচলিত ছিল—

সবতীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার।

এখন সে প্রবাদ পরিবর্তিত হয়েছে। বলা যায় সবতীর্থ একবার গঙ্গাসাগর বারবার। গঙ্গাসাগর এখন কেবল তীর্থস্থান নয় পর্যটন কেন্দ্রও বটে।

কপিলমুনির মন্দির চলতি কথায় মুনিমন্দিরকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মন্দির, মঠ এবং আশ্রম। আনুমানিক একশো বছর আগে গড়ে উঠেছে কপিল [illegible] সাংখ্যযোগ আশ্রম এবং ওই আশ্রমই সব চেয়ে প্রাচীন। ভাগু[illegible] স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য কপিলানন্দ স্বামী ১৩০[illegible] শ্বাপদসংকুল জঙ্গলাকীর্ণ গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন। [illegible] প্রচলিত আছে।

তালের ডোঙা ভা[illegible]গার বুকে—
ঢেউয়ের দোলায় [illegible]গাসাগর মুখে।
মুখে কেবল কপি[illegible] বাবার নাম,
কামট কুমির ভর[illegible] প্রাণের দাম।
বাঘের থাবায় হা[illegible] কপিল বলে
কপিল কুটির সা[illegible] জঙ্গলে।

এরপর নাগা সা[illegible] শঙ্করাচার্য আশ্রম স্থাপন করলেন। নৌকাযোগে [illegible]রের আগমন ঘটল। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন যোগেন্দ্র[illegible] ও[illegible]সা দ্বীপে রাখাল মহারাজের চেষ্টায় গড়ে উঠল রামক[illegible] পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস সাগরবাসীর গৌরব। অনেক পরে কানাই মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠল ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সেই মন্দির উদ্বোধন করলেন।

মথুরাপুরের বসন্ত পুরকায়েত কপিলানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন এবং ঋষি বসন্ত কপিল নামে পরিচিত হলেন। আশ্রম প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধিবেদি আজও আছে। বসন্ত কপিলের পুত্র ইংলিশ ফার্মে চাকুরিত ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মনোরঞ্জন পুরকায়েত চাকুরি জীবনে অবসর নেওয়ার আগেই কপিল কুটির সাংখ্যযোগ আশ্রমে যোগ দিলেন। তিনি ছিলেন বস্তুবাদী। তাঁর চিন্তাধারা ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। তিনি বলতেন—হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান

সবাই মানুষ সবাই সমান।

আশ্রমের সাধুদের সঙ্গে তাঁর নীতির দ্বন্দ্ব বাধল। কপিল কুটির সাংখ্যযোগ আশ্রম থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং এককভাবে নতুন আশ্রম গড়লেন। তাঁর আশ্রমের নাম দিলেন—হরি ওঁ আল্লা গড্ কপিল কল্পতরু আশ্রম তথা বিশ্ব মানব মহামিলন কেন্দ্র। অঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। গঙ্গাসাগরে সাধন-ভজনে যাঁরা ব্রতী তাঁরা কপিল আখ্যায় ভূষিত হলেন। সঙ্গত কারণে মনোরঞ্জন পুরকায়েত মনানন্দ কপিল নামে পরিচিতি লাভ করেন। ধর্মনিরপেক্ষতার যুগে তাঁর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত। আশ্রমের মন্দিরে বিভিন্ন দেবদেবী এবং সাধক পুরুষদের ছবি ছাড়াও রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, নেতাজি, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের ছবিও আছে।

বিশেষ ধাতুনির্মিত এক শীর্ণকায় ঋজুদেহী সাধুবাবার মূর্তিই আশ্রমের বিশেষ আকর্ষণ। মূর্তিটির উচ্চতা মাত্র দেড় ফুট। সমগ্র অঞ্চলে এই ধরনের মূর্তি আর কোথাও নেই, মূর্তিটি পাওয়ার পিছনে কিংবদন্তিও জড়িয়ে আছে। মণি নদীতে রায়দিঘির কাছে বেড়াজালে. মাছ ধরছিল এক ধীবর। অপূর্বদর্শন এই মূর্তিটি তার জালে জড়িয়ে

প্রতিবছর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে আসেন

গেল। জটাজুটধারী ঋজুদেহী দণ্ডায়মান এক মহাতেজামুনির মূর্তি। কটিদেশে কৌপিনটিও অন্য সাধুদের চেয়ে ভিন্ন। সবাই বলাবলি করতে লাগল, এটি কপিলমুনির মূর্তি। ধীবর মূর্তিটি বাড়িতে এনে দেয়ালে রেখে দিল। কয়েকদিন পরে তার পরিবারে নেমে এল দারুণ দুর্যোগ। প্রথমে তার ছেলেটি মারা গেল। এরপরে তার স্ত্রীও মারা গেল। ধীবর ভাবল সে নিচু জাত, পূজা-অর্চনা জানে না, পূজা না পেয়ে ঠাকুর তাকে শাস্তি দিল। কাল বিলম্ব না করে মূর্তিটি সে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রেখে এল। সে ব্রাহ্মণও সবংশে নিধন হওয়ার উপক্রম হল। প্রাণভয়ে মূর্তিটি সে কোনও সাধুর হাতে তুলে দিতে মনস্থ করল। কোনও সাধু সে মূর্তিটি নিতে রাজি হল না। মনানন্দ কপিলের শিষ্য

পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ শাস্ত্রাচার পালন করেন আজও

সাগরে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে

বালানন্দ কপিল ওই মূর্তিটিকে স্পর্শ করতে সাহস করলেন না। তিনি ডেকে আনলেন তাঁর গুরু মনানন্দ কপিলকে। উপযুক্ত পূজা-অর্চনার পর মনানন্দ কপিল মূর্তিটি নিয়ে এলেন গঙ্গাসাগরে তাঁর আশ্রমে। এরপর থেকেই আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। এটি কোন মুনির মূর্তি তা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হল। মনানন্দ কপিল ধ্যানে জানতে পারলেন এটি কপিলমুনির মূর্তি নয়।

সংস্থার সভাপতি গোপীচরণ দাস নস্কর প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের শরণাপন্ন হলেন। তিনি দেখামাত্রই বললেন, এটি কাঠিয়া বাবার মূর্তি। এই সম্প্রদায়ের কাহিনী প্রায় পাঁচশ বছরের পুরোন। সুন্দরবন অঞ্চলে এককালে কাঠিয়া সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল যা আজ অবলুপ্ত। কাঠিয়া সম্প্রদায়ের নাম অনেকেই ভুলে গেছে। তাদের মন্দির ছিল ওই মণি নদীর ধারে। সে মন্দির মণি নদীর ভাঙনে চলে গেছে। কাঠিয়া বাবার [illegible] উঠেছিল জেলেদের ওই বেড়াজালে। কাঠিয়ারা প্রা[illegible] চলে। পরনে সুতির কৌপিনের পরিবর্তে কাঠ [illegible] করা এক বিশেষ ধরনের কৌপিন। সমাজের পিছিয়ে [illegible] মানু[illegible] মধ্যে কাঠিয়াদের প্রসার বেশি; এদের ধর্মগুরুকে বল[illegible]। কাঠের তৈরি কৌপিন ব্যবহার করত তাই কাঠিয়া [illegible] বতা বরুণ এদের উপাস্য দেবতা। জলের ওপর ভাসম[illegible] বরুণ দেবতার স্তব করে। এই সম্প্রদায় জলক্রীড়ায় [illegible]। [illegible] পুরুলিয়া জেলায় এখনও কাঠিয়া বাবার শিষ্যবর্গ আ[illegible] করতে এই সম্প্রদায়ের মানুষও আসে। দর্শনার্থীদে[illegible]ছে।

মনানন্দ কপিলের ই[illegible] আশ্রমে একটি কবিভবন হোক, একটি পাঠাগার হোক [illegible] পূরণ হয়েছে। আশ্রমের সভাপতি একানব্বই বছ[illegible] বৃদ্ধ [illegible]গোপীচরণ দাস নস্করের তৎপরতায় এবং ঔপন্যাসিক ত্রিশঙ্কুর সৌজন্যে কবিভবন প্রজ্ঞাবেদি সমাধি মন্দির স্থাপিত হয়েছে। উদারপ্রাণ ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে মন্দির সংস্কার হয়েছে। সাগরসঙ্গম, সাগরতীর্থ, গীতাঘাট নির্মিত হয়েছে। গঙ্গাসাগরে দূরদূরান্ত থেকে আসা পিছিয়ে-পড়া সমাজের মানুষদের আশ্রয়স্থল হরি ওঁ আল্লা গড্ কপিল কল্পতরু আশ্রম তথা বিশ্ব মানব মহামিলন কেন্দ্র।

গঙ্গাসাগরে যাতায়াত ব্যবস্থা সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক উন্নত হয়েছে। হারউড্ পয়েন্ট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত বড়তলা নদী আর নৌকায় পার হতে হয় না। ভুটভুটি লাগে না। লঞ্চেরও ছুটি হয়ে গেছে। ভূতল পরিবহনের বিশাল ভেসেল তিনশোর ওপর যাত্রী এক সঙ্গে সাবলীল গতিতে নিরাপদে পার করে দিচ্ছে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। সরকারি প্রচেষ্টায় ট্রাক-বাস-প্রাইভেট কার পারাপারেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কচুবেড়িয়া থেকে গঙ্গাসাগর ৩১ কিলোমিটার পিচঢালা পথে ভূতল বাস, বেসরকারি বাস-ট্রেকার-মিনিবাস নিয়মিত সাবলীল গতিতে চলছে। সরকারি প্রচেষ্টায় রুদ্রনগরের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। সৌর বিদ্যুৎচালিত পাম্প, এমন কি বায়ুচালিত প্যাম্পও জল সরবরাহ করছে। সারকিট হাউস, মেলাভবন, ঊর্মিমুখর আরও বহু বিভাগের বাড়ি তৈরি হয়েছে। ভ্রমণ বিলাসীদের জন্যে বিশাল যুবভবন, বহুতল বিশিষ্ট গেস্টহাউস নির্মিত হয়েছে। কেবল কপিল মুনির মন্দির আর বিভিন্ন আশ্রমই নয়, গঙ্গাসাগরের বালুকা বেলা, সাগর সৈকত, ঝাউবন আর তপোবন ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণ করে। ছোট বড় বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। সব মিলিয়ে সাগরযাত্রা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেবলমাত্র পুণ্যার্থীদের জন্যে নয়, ভ্রমণবিলাসীদের জন্যও গঙ্গাসাগর এখন একবার নয় বারবার।

লেখক পরিচিতি : কবি ও নাট্যকার, একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা

প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ, হ্যামিলটন ও সুন্দরবন

সুন্দরবনের কথা

"ঝড়ের দাপটে লোনা জলস্রোতে
লড়ে বাঁচে প্রাণপণ,
কত যুগ ধরি, সাগর প্রহরী,
সুঁদরী গাছের বন।"

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্ত যেখানে বঙ্গোপসাগর স্পর্শ করেছে, দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার সেই নদীনালা ভরা 'ব-দ্বীপ বহুল আরণ্য ভূ-ভাগই সুন্দরবন। আসল সুন্দরবনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। অখণ্ডবঙ্গের ভাগীরথীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র কূলবর্তী অঞ্চল, ২৪-পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা (অধুনা বাংলাদেশ) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। দুই-তৃতীয়াংশ সুন্দরবন হয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ২৪-পরগণা জেলার পশ্চিমে ভাগীরথী নদী থেকে পূর্বে কালিন্দী-নদী পর্যন্ত প্রসারিত। কুলপী থেকে উত্তর-পূর্বে হাসনাবাদ অবধি একটা রেখা টেনে মোটামুটি সুন্দরবনের সীমা নির্দেশ করা চলে।

সুন্দরবন নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত প্রচলিত। যে মতটি সবচেয়ে প্রবল সেটি হল সুন্দরবনের অরণ্যে সুন্দরী বা সুঁদরী নামে এক ধরনের গাছ আছে। ল্যাটিন পরিভাষায় এ গাছ **Heritiera Minor** গোষ্ঠীভুক্ত। সুন্দরবনের মধ্যে পুকুর খোঁড়ার সময় মাটির তলা থেকে পাওয়া গেছে প্রস্তর মূর্তি ও তাম্রলিপি। এ ছাড়া মন্দিরের ভগ্নাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। ইসলামী আগ্রাসনের পূর্বে গুপ্ত, পাল, সেন রাজাদের আমলে সুন্দরবন যে জনাকীর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তার পরিচয় পাওয়া গেছে। কঙ্কণদিঘি ও রায় দিঘির " পশ্চিমে মৌর্য আমলের ইষ্টক গৃহের ভিত্তি দেখা যায়। সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত সাগরদ্বীপে কপিলমুনির মন্দিরকে কেন্দ্র করে গঙ্গাসাগর তীর্থের মেলা আজও চলে এসেছে। মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায় অর্জুন গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করে ছিলেন। মহারাজা শশাঙ্কের সময় চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে এসে সুন্দরবন অঞ্চল পর্যটন করেছিলেন। এ অঞ্চলের নাম ছিল 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল'। হিউয়েনসাঙ সুন্দরবনে বৌদ্ধ মঠ দেখেছিলেন। সুন্দরবনে ঠাকুরানি নদীর শাখা মনি নদীর তীরে রয়েছে নাগর রীতিতে নির্মিত জটার দেউল। জটাধারী শিবের মন্দির। রূপেই এটির নাম জটার দেউল বা মন্দির। কারও মতে এটি প্রতাপাদিত্যের "বিজয় গুম্ভ।" প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ফিরিঙ্গি রডা বিদ্যাধরী নদীতে নৌযুদ্ধে মোগল নৌ-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করলে তারই স্মরণে এটি নির্মিত হয়েছিল। ২৪- পরগনা জেলা (তখন অঞ্চলটা ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত), যশোহর ও খুলনা জেলা নিয়ে প্রতাপাদিত্য গঠন করেছিলেন—স্বাধীন যশোর রাজ্য। সুন্দরবনের সাগরদ্বীপে ছিল—রণবীর প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ জাহাজের ঘাঁটি। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে জটার দেউলের কাছে জঙ্গল হাসিল করতে গিয়ে একটি তাম্রফলক পাওয়া যায়। তাতে খোদাই করা দেবনাগরী লিপি পাঠ করে জানা যায়, এই দেউলটি রাজা জয়ন্ত চন্দ্রের দ্বারা ৮৯৭ শকাব্দে নির্মিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জটার দেউলের স্থাপত্য ও শিল্পরীতি পরীক্ষা করে বলেছেন,—এটি পাল যুগের। ১৯২৮ সালে জটার দেউলের কাছে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে প্রাচীন মুদ্রা ভরা একটি মাটির কলস। মুদ্রাগুলি কুষাণ যুগের। এই সব আবিষ্কারের ফলে জানা যায় সুন্দরবন প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমৃদ্ধ ছিল।

সে রাত্রে হ্যামিলটনের বাংলো বাড়ির জানলা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরবনের গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলেন। সেখানে গরান, বচ, কেওড়া, গাছের জড়াজড়ি। হেঁতাল, হদো, গোলপাতা ঝোপের আড়ালে ওত পেতে থাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু। কলকাতার কাছেই মাত্র ৪০/৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অথচ মনে হয় যেন লক্ষ বছর পূর্বের আদিম অন্ধকার জগতে পৌঁছে গেছেন। শীতের কালো মখমলের মতো অন্ধকার নানা শব্দময়। মাতলা নদীর ঝর-ঝর আওয়াজ, আর মাঝে- মাঝে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এর হুঙ্কার। এ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কলম-অচল হয়েছিল বোধ করি। "আফ্রিকা" পেল কবিতা—"সুন্দরবন" পায়নি।

মধ্যযুগে আদি গঙ্গা তীরে ছত্রভোগ বন্দর ছিল প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব নীলচল যাত্রাপথে আদিগঙ্গা তীরে ছত্রভোগ বন্দরে এসে শতমুখী পার হয়েছিলেন নৌকায়। ছত্রভোগ ছিল সুন্দরবনের বন্দর। তীব্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের অবনতি ঘটে। এর উপর মগ জল দস্যু ও পর্তুগীজ বোম্বেটের অত্যাচারে সুন্দরবন জনশূন্য হয়ে যায়। বাঘ ও কুমিরের রাজ্যে পরিণত হয়। লোকদেবতা হন দক্ষিণ রায়—তিনি বাঘের দেবতারূপে ইসলামী আগ্রাসন থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করতেন।

জ্যাও-ডি-ব্যারোস (Jao-De-Barros) নামে এক পর্তুগীজ নাবিক ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে, ও ভ্যান-ডেন-ব্রোক (Van-Den-Brovcke) নামে এক ডাচ্ বণিকের আঁকা মানচিত্রে দেখা যায়—আদিগঙ্গার ধারা সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করে সাগরদ্বীপ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এখানে সাগরসঙ্গমে সাংখ্যকার কপিলের আশ্রম ছিল।

ইংরেজ শাসনের কালে দেখা যায়—'সুন্দরবন' গভীর অরণ্যের আড়ালে ঢাকা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডেম্পিয়ার (Dampeir) ও হেজেস (Hedges) নামে দুজন জরিপ কর্মী সুন্দরবন জরিপ করেন। তাঁদের নামে কল্পিত 'হেজেস লাইন' দ্বারা সুন্দরবন অঞ্চলটিকে ২৪-পরগনা জেলা থেকে পৃথক করা হয়। ২৪টি পরগনা সাতগাঁ সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে মীরজাফর ক্লাইভকে জায়গির বখশিস দেন। ক্লাইভের মৃত্যুর পর ২৪-পরগনা জেলারূপে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির করায়ও হয়। সুন্দরবন ২৪-পরগনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার মধ্যে পড়েছে।

কলকাতার অতি কাছে হলেও (মাত্র ৫০/৬০ কিলোমিটার)। সাংস্কৃতিক বিচারে সুন্দরবনের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এর Primitive Culture-এ কলকাতার প্রভাব পড়লেও এর নিজস্ব ধারা লুপ্ত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ (Renaissance) সুন্দর বনকে স্পর্শ করেনি। বহু শতাব্দীর অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল সুন্দরবন।

Rs. 1 SIR DANIEL MACKINNON HAMILTON Rs. 1

promises to pay the Bearer, on demand, at the Co-operative Bhundar, in exchange for value received, One Rupee's Worth of rice, cloth, salt or other good.

No.

Gosaba

Manager.
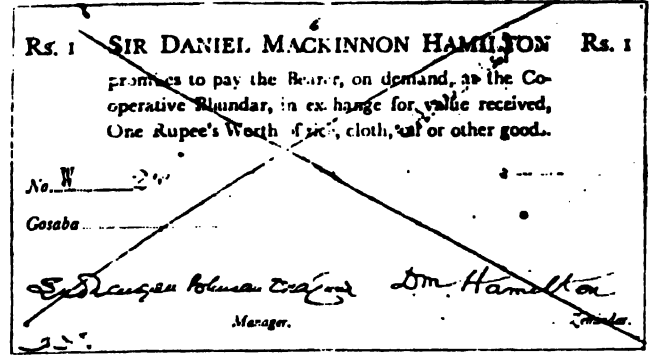
হ্যামিলটন প্রবর্তিত এক টাকার নোট

হ্যামিলটনের লাট

সুন্দরবনের অন্ধকারে আলো জ্বালতে এগিয়ে এলেন—স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন। স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। বিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। বাংলাদেশই ছিল তার কর্মক্ষেত্রে। সুদীর্ঘকাল এদেশে বাস করে এদেশেকে তিনি ভালবেসেছিলেন। এদেশের মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যে তিনি বেদনা বোধ করতেন। তাই অবসর গ্রহণের পর অন্যান্য সাহেবদের মতো চাকুরির সঞ্চিত অর্থ নিয়ে স্কটল্যান্ডে ফিরে যাননি। সুন্দরবন অঞ্চলের তিনটি দ্বীপ,—গোসাবা, সাতজেলে ও রাঙাবেলে—তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেন। এই তিনটি দ্বীপের জমিদারী "হ্যামিলটনের লাট" নামে পরিচিত হয়। হ্যামিলটন সাহেব স্থির করেন এই সাপ, বাঘ, কুমিরে ভরা ভয়ানক অঞ্চলকে করে তুলবেন সভ্য মানুষের রাজ্য। যেখানে খাদ্যাভাব থাকবে না। মানুষ থাকবে না নিরক্ষর, তৈরি হবে ডাক্তারখানা, হাসপাতাল। 'কোনও মানুষ থাকবে না বেকার। আজীবনের সঞ্চিত অর্থ এই তিনটি দ্বীপের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করলেন উদারপ্রাণ হ্যামিলটন সাহেব। তৈরি করলেন অবৈতনিক বিদ্যালয়, ও দাতব্য চিকিৎসালয়। কাটালেন পানীয় জলের পুকুর।
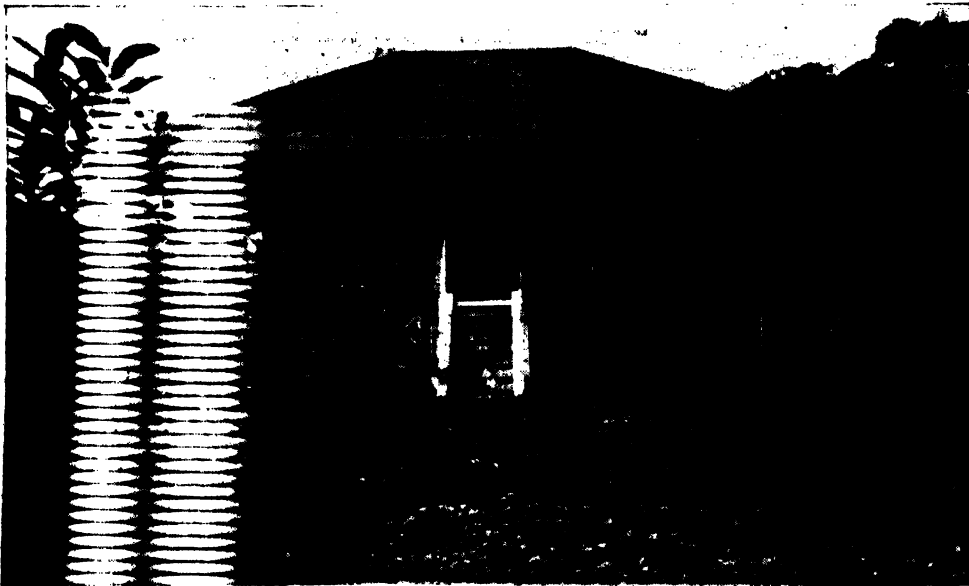
গোসাবার হ্যামিলটন বাংলো *ছবি : অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়*

রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত গোসাবার বেকন বাংলো   ছবি : অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠা করলেন, সমবায় ব্যাঙ্ক। চাষীরা পেতে লাগল নামমাত্র সুদে টাকা। কুটিরশিল্পের কারিগররাও বঞ্চিত হল না। বসল তাঁত। ধর্মগোলা (শস্যভাণ্ডার) তৈরি করে কৃষকদের শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। সমবায় ভাণ্ডার ছাড়া তৈরি করলেন, সমবায় রাইসমিল। মহাজন, জমিদারদের বৈরিতা সত্ত্বেও গোসাবায় জনবসতিও ক্রমে গড়ে ওঠে। গরীব চাষীকে সুদখোর মহাজনদের গ্রাম থেকে বাঁচাবার তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল। তিনি জনগণের শ্রমকে মূলধন করে গোসাবার এক টাকা নোটের প্রচলন করেন। সেই এক টাকা নোট একটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এই এক টাকা নোটের প্রচলন হয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষে হ্যামিলটন সাহেবের প্রচেষ্টার ৩৫ বছর পরে। হ্যামিলটন সাহেব তাঁর গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা ও আদর্শ "New India and how to get there" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়য়ের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকা থেকে কৃষি বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট করে এনেছেন। তাঁকে শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞে নিয়োগ করেন।

ডেভিড হেয়ারের মতো ভারতপ্রেমিক মহাপ্রাণ কর্মী হ্যামিলটনের সুন্দরবন অঞ্চলে কর্মযজ্ঞের সংবাদ রবীন্দ্রনাথ পেয়ে হ্যামিলটন সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হন। হ্যামিলটন, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, "India has some thing better to offer to the world than any of the "Ism" of the West" হ্যামিলটনের "গোসাবা পরিকল্পনা" কে আদর্শ করেই যেন ভারত সরকারের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরু।

বিদেশি হ্যামিলটন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথাও চিন্তা করতেন। হ্যামিলটনের বক্তব্য—"Indias road to Independence runs through Gosaba with its sound man standard finance.

Gandhijis economics are sounder than those of editor of economics. He proposes to build India on the rock of honest labour."

হ্যামিলটনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয় তাঁর 'লাটে' বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে তখন জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। (১৯০৫) হ্যামিলটন বুঝেছিলেন আধ পেটা খাওয়া জীর্ণ মানুষদের দিয়ে কোনও আন্দোলনই সার্থক হবে না। তাই মানুষকে পেট ভরে খাইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে কর্মী মানুষ গড়ে তুলতে চাইলেন। তাই তাঁর লাটে কৃষি কর্মের সুব্যবস্থা করলেন। আনলেন, উন্নত উত্তম বীজ ও সার। রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহের কাছারিতে বসে, দরিদ্র প্রজাদের অসহায় অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। বুঝেছিলেন আদিম আমলের হাল-লাঙল দিয়ে চাষের উন্নতি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান-বুদ্ধি আর আধুনিক কৃষি-যন্ত্র ছাড়া জমি থেকে অধিক ফলনের আশা নেই। তাই শিলাইদহ বাসের অনেক পরে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যা শিখতে আমেরিকায় ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। আর শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুল গ্রামে জমি ও বাড়ি কেনেন—রায়পুরের জমিদার নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহের কাছ থেকে। ইচ্ছা ছিল রথীন্দ্রনাথ এখানে কৃষি ফার্ম খুলবেন। ল্যাবরেটরিতে বসে উন্নত ধরনের বীজ ও সার তৈরি করবেন। কিন্তু কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সুরুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু হাল ছাড়েননি। আমেরিকার আলাপী ইংরেজ যুবক লেনার্ড এলম্‌-হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের গ্রামোদ্যোগ পরিকল্পনায় মুগ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। আমেরিকান বিদুষী মহিলা মিসেস স্ট্রেটের অর্থে শ্রীনিকেতনে গ্রামোন্নয়নের কাজ শুরু করেন। ভূমিলক্ষ্মী নামে একটি কৃষি-বিষয়ক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। এমন সময় গোসাবায় হ্যামিলটন সাহেবের গ্রামোন্নয়ন কাজের খবর তাঁর কাছে পৌঁছায়।

শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের শেষে সমবায় সম্মেলনের অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯) হ্যামিলটন সাহেবকে সভাপতি করে আনেন। সভার উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সুন্দরবনের বাঘ-কুমিরের রাজ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র দেখতে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানান হ্যামিলটন। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। Royal Bengal Tiger-এর রাজ্য সুন্দরবন সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল। তবে তখনই সুন্দরবন যাওয়া সম্ভব হয়নি। বছর তিন-চার কেটে যায়।

রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা ঘুরে আসেন। কলকাতায় তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয়। পারস্য পরিভ্রমণ সেরে ফেরেন। আদরের নাতি নীতিন্দ্রের মৃত্যু হয় জার্মানিতে। কলকাতায় আসেন রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসবে ডাক দিতে। এমন সময় হ্যামিলটনের দূত এসে কবিকে স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর সুন্দরবন আমন্ত্রণের কথা—।

চীন, জাপান, কানাড়া, ইউরোপ, আমেরিকা কোথায় না গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর পথে আর্জেন্টিনায় উপস্থিত হয়েছেন, আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। ভারতবর্ষের বেসরকারি সাংস্কৃতিক দূতরূপে হাজির হয়েছেন বৃহত্তর ভারতের

সুন্দরবনের বিশাল লবণাক্ত নদী, চলেছে সাগর পানে
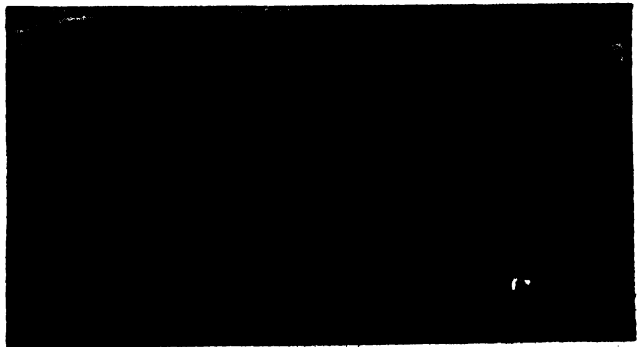
যবদ্বীপ (জাভা), বালি, মালয়, শ্যাম দেশে। বরবুদুরের তীর্থে হয়েছেন প্রণত। শ্যাম (থাইল্যান্ড) ছাড়া ব্রহ্ম, (মায়ানমার), সিংহলেও পদার্পন করেছেন। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ইউরোপের নানা দেশ—ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালী রবীন্দ্রনাথ দর্শনে হয়েছে ধন্য। নরওয়ে, সুইডেন ও স্লাভ দেশগুলি বুলগেরিয়া প্রভৃতি মহাকবির পদচারণায় বাদ পড়েনি। নতুন ব্যবস্থা দেখতে সোভিয়েট রাশিয়ায় গেছেন। সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথ সব বাধা তুচ্ছ করে এরোপ্লেনে উড়ে গেছেন পারস্যে। আরব বেদুইনের তাঁবুতে পেয়েছেন হার্দ্য আতিথ্য। দেখেছেন বেদুইনদের রণনৃত্য। মিশরে গেছেন। আফ্রিকার অভ্যন্তরে অবশ্য প্রবেশ করা হয়নি। যদিও লিখেছেন,—"আফ্রিকা" নামের অনবদ্য কবিতা। ভ্রমণ তালিকায় বাদ পড়েছে—তিব্বত, কোরিয়া, ল্যাপল্যাড আর মেরুর দেশ আন্টার্টিকা। অস্ট্রেলিয়ার আমন্ত্রণ পেয়েও যাননি। কুখ্যাত 'কালার বার' এর প্রতিবাদে।

ভারতবর্ষের কোন প্রান্তেই না গেছেন,—আসাম থেকে গুজরাট, আগ্রা থেকে বোম্বাই (মুম্বাই)-আমেদাবাদ, মাদ্রাজ (চেন্নাই) কিম্বা মহীশূর, অক্লান্ত পরিক্রমায় পার হয়েছেন। পুনায় গেছেন—মহাত্মাজীর অনশন ভাঙাতে আর শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে পণ্ডিচেরী—কাছেই ত্রিপুরায় গেছেন বেশ কয়েকবার। মহারাজা বীরেন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ছিলেন তার গুণগ্রাহী কিন্তু ঘরের কাছেই সুন্দরবনে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাঁর মনের কথাটি ধরা পড়েছে অনবদ্য কবিতার কটি চরণে—

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে,
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।"

কিন্তু কলকাতার কাছেই বাঘ-কুমিরের রাজ্য সুন্দরবনে যাবার সময় ও সুযোগ হয়নি। এবার সেই সুযোগ এল। স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে সুন্দরবন যাত্রা।

সুন্দরবনে রবীন্দ্রনাথ

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে ক্যানিং টাউনে উপস্থিত হন রবীন্দ্রনাথ। দুরন্ত মাতলা নদীর গায়েই শহরটি। শ খানেক বছর পূর্বে এখানে একটা বন্দর গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের বড়লাট। তাঁর নামেই বন্দরের [illegible] হয়েছি[illegible] ক্যানিং।

ক্যানিং থেকে [illegible] রবীন্দ্রনাথ পদার্পণ করেন হ্যামিলটনের প্রধান [illegible]য়।

গোসাবা রবীন্দ্র[illegible] করার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। হ্যামিলটন, বাংলা ব[illegible]নীর মাতব্বর ব্যক্তি নবীনচন্দ্র দে-কে ডেকে বললেন — [illegible] মহাকবি আসছেন গোসাবায়, আদর আপ্যায়নের [illegible] নবীন বাবু ছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলের মহেশ রা[illegible]দারীর নায়েব। (মহেশবাবুরা রাজপুর গ্রামের বিখ্য[illegible]ধুরীদের বংশীয়। সুন্দরবনের বরদা চৌধুরী চক [illegible]ক্ত ছিল।

মহেশ চৌধুরী[illegible] বাড়িতে থেকে আশ্চর্য শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রাবস্থায় ক[illegible] কালীঘাট থেকে আদিগঙ্গা পথে নৌকায় পৈতৃক গ্রাম [illegible]তেন।

নবীনবাবু, রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। তাঁর ছেলে সুধাংশু ও মেয়ে শান্তি। এঁরা দুজনে সুকণ্ঠ। ভাল গাইতে পারেন। ওঁরা তখন ছিলেন মামার বাড়ি বারুইপুরের দক্ষিণে রামনগর গ্রামে। নবীনবাবু, পুত্রকন্যা দুজনকেই গোসাবায় আনালেন। সুধাংশুবাবু সাহিত্যচর্চা করেন। গান, লিখতে এবং সুর দিতেও পারেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানিয়ে একটি গান রচনা করে সুর দিলেন। ছোট বোন শান্তিকে শেখালেন সে গান।

হ্যামিলটন সাহেবের বাংলোর সামনে সভা হল। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি। মৃদু হাসিমুখে শুনলেন বালিকা কণ্ঠে গীত সঙ্গীত।

"স্বাগত সুধি, অতিথি মহান,
পূজিতে তোমারে ভক্তি উপাকারে,
এনেছি শুভ্রপ্রাণ।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা দীন আয়োজন,
আশিসের বাণী বিতর সবারে
করুণা করগো দান।"

গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ এ গান শুনে মনে মনে কৌতুক বোধ করেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু কিশোরী গায়িকা শান্তিকে প্রশংসা করেছিলেন।

সে রাত্রে হ্যামিলটনের বাংলো বাড়ির জানলা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরবনের গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলেন। সেখানে গরান, বচ, কেওড়া, গাছের জড়াজড়ি। হেঁদাল, হদো, গোলপাতা ঝোপের আড়ালে ওত পেতে থাকে সাক্ষাৎ মৃত্যু। কলকাতার কাছেই মাত্র ৪০/৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অথচ মনে হয় যেন লক্ষ বছর পূর্বের আদিম অন্ধকার জগতে পৌছে গেছেন। শীতের কালো মখমলের মতো অন্ধকার নানা শব্দময়। মাতলা নদীর ঝর-ঝর আওয়াজ, আর মাঝে-মাঝে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এর হুঙ্কার। এ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কলম-অচল হয়েছিল বোধ করি। "আফ্রিকা" পেল কবিতা—"সুন্দরবন" পায়নি।

সে রাত্রে রবীন্দ্রনাথ আহার করেছিলেন মাতলা নদীর উৎকৃষ্ট ভেটকি মাছ। আর গোসাবা কৃষিক্ষেত্রের সুবৃহৎ সুমিষ্ট মর্তমান কলা।

দুদিন ধরে হ্যামিলটন সাহেবের লাটের বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র পরিদর্শন করেন রবীন্দ্রনাথ। অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, খেতখামার দেখে সন্তুষ্ট হন। গোসাবার তাঁতশালার তৈরি উৎকৃষ্ট পশমের শাল কবিকে উপহার দেওয়া হয়। কবি স্থির করেন গোসাবার অভিজ্ঞতা শ্রীনিকেতনের কাজে লাগাবেন। হ্যামিলটন সাহেবের সমবায় ব্যাঙ্কের এক টাকার নোট কবিকে চমৎকৃত করে। এ নোটের চলন বাইরের জগতে ছিল না। গোসাবা, রাঙাবেলে, সাতজেলে তিনটি সাহেবের লাটে চলত। রবীন্দ্রনাথ সে নোট কয়েকটি সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

নতুন বছরের প্রথম দিন ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি গোসাবার লঞ্চঘাটে যখন মোটর লঞ্চে চড়লেন রবীন্দ্রনাথ। সেদিন হ্যামিলটনের লাটের সব মানুষ সেই আশ্চর্য সুন্দর পুরুষকে বিদায় দিতে ঘাটে এসে ভীড় করে ছিলেন। সুন্দরবনের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি।

লেখক পরিচিতি : লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক।

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঙাবেলিয়া—একটি প্রায় সার্থক স্বপ্ন

সে প্রায় তিন দশক আগের কথা। জল জঙ্গল সুন্দরবনের একটি দূরতর দ্বীপ গোসাবা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, দ্বীপেরই এক গ্রামের নাম রাঙাবেলিয়া। প্রধান শিক্ষক পদে সবেমাত্র যোগ দিয়েছেন তিনি, শহরের মানুষ। চলছিল বেশ। হঠাৎ একদিন উঁচু ক্লাসের একটি ছেলে জ্ঞান হারাল। শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসা করলেন সে বাড়িতে সেদিন কী খেয়েছিল। উত্তরে ছেলেটি বলে সে সারাদিন কিছুই খায়নি। মাস্টারমশাই ব্যথিত, বিস্মিত। পরের প্রশ্ন: আগের রাত্তিরে? —না, কিছুই খায়নি ছেলেটি আগের রাত্তিরে, তার বাড়ির লোকও। মা তাকে বলেছেন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে জুটবে ফেনাভাত। মাস্টারমশায়ের হৃদয়ে যন্ত্রণা, চোখে জল। পরের দু' এক দিনের মধ্যেই হিসেব নিয়ে দেখা গেল স্কুলের ছাত্রদের একটা বড় অংশের একই বারমাস্যা। সেই শুরু স্বপ্ন দেখার। প্রথমে স্কুলে ফান্ড থেকে, পরে মাস্টারমশাইদের ফান্ড থেকে কেনা হতে থাকল আটা। একেক দিন একেক বাড়িতে তৈরি হতে থাকল রুটি। নথিভুক্ত ছাত্ররা খাবার পেতে থাকল টিফিনে। এর মাঝেই মাস্টারমশাই স্বপ্ন দেখেন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের। কিন্তু কীভাবে? সুযোগও এসে গেল। খবর এলো পাশের দ্বীপে আলোচনার জন্য আসছেন যোজনা কমিশনের সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্ত। তৈরি হলেন মাস্টারমশাই। সেই আলোচনা সভায়ই প্রথম সুন্দরবনের মানুষের সমস্যা আর তার সমাধানের পথ খোঁজায় তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার কথা বললেন প্রধানশিক্ষকমশাই তুষার কাঞ্জিলাল, সুন্দরবনের দূরতম দ্বীপে যাঁকে সকলেই 'মাস্টারমশাই' নামে চেনে, ডাকেও। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁকে একান্তে ডাকলেন কথা বলার জন্য। প্রস্তাব দিলেন টেগোর সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্টের অধীনে এসে কাজ করার। তৈরি হল টেগোর সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট-রাঙাবেলিয়া প্রজেক্ট। সেই শুরু হল বাস্তব যাত্রা স্বপ্নতরণীর। প্রথমেই মাস্টারমশাই স্কুলের কয়েকজন উদ্যমী ছাত্র ও সহশিক্ষককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এলাকা সমীক্ষা করতে। দেখা গেল বেশিরভাগ চাষীর জমি বাঁধা পড়ে আছে মহাজনের কাছে। মহাজনের কাছ থেকে চাষীর জমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ঋণশোধের জামিনদার হল সোসাইটি, চাষীর ব্যাঙ্ক-ঋণেরও জামিনদার হল সোসাইটি। চাষীকে দেওয়া হল বীজ, সার, পাওয়ার টিলারের সুযোগ ঋণ হিসেবে। গড়ে তোলা হল কেন্দ্রীয় গোলা। চাষীর খাবার ধান বাদ দিয়ে বাকি ধান জমা পড়ল কেন্দ্রীয় গোলায়। পরে ধানের দাম বাড়লে চাষীকে দেওয়া হল সেই ধান। বাড়তি দামে ধান বিক্রি করে তার থেকে সংরক্ষণ সামান্য অর্থ সোসাইটিকে দিয়ে বাকি অর্থে চাষী পরিশোধ করতে থাকল মহাজন ও ব্যাঙ্কের ঋণ। একসময় মুক্ত হোল বন্ধকী জমি, চাষীর নিজের জমি, গ্রামেরই কিছু পাশ করা ছেলেকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হল পাওয়ার টিলার মেকানিকের। তারাই রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকলো পাওয়ারটিলারগুলির।

ক্রমশ বাড়তে থাকল সোসাইটির কাজের পরিধি। এমনিতেই জাতীয়জীবনের মূলস্রোত থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের এই সমাজ। তার ওপর সমাজের নারীদের তো কথাই নেই। কারোর কারোর সারা বছর মাত্র একখানা শাড়িই সম্বল। সমাজের উন্নয়ন কখনই নারীজাতির উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই মহিলাদেরও আনা হল প্রকল্পের আওতায়। প্রাথমিকভাবে হাঁস, মুরগি পালন, কিচেন গার্ডেনের কাজে উৎসাহ দেওয়া হল। খুব অল্প হলেও পরিবারের মহিলাদের হাতে আসতে থাকল অর্থ। যার ফলে অল্প অল্প করে নারী পেতে থাকল তার সম্মান, তার গুরুত্ব।

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে সোসাইটি ইতোমধ্যেই স্থাপন করেছে ২০০টি বিদ্যালয়। যারা বিদ্যালয় মুখী নয় আর যারা বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সেই সব ছেলে মেয়েকে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসাই এই Non Formal Education Scheme-এর লক্ষ্য। সময়কাল তিনটি পর্বে তিনবছর। মডেল, চার্ট এবং খেলাধুলোর সাহায্যে পড়াশুনোয় আগ্রহী করে তোলা এবং উপযুক্ত করে শিক্ষার মূল ধারায় ফিরিয়ে দেওয়াই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। আর যারা সত্যিই পারে না তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার। পরবর্তী জীবনে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে মোট ৬৫৯৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনো করেছে এই ব্যবস্থায়।

টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের কার্যালয় *ছবি : লেখক*

অস্তিত্বের লড়াই লড়তে গেলে, জীবনের মান উন্নয়ন করতে গেলে দরকার নীরোগ শরীর। নীরোগ শরীরের জন্য অন্যতম প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং মুক্ত আবাস। দেখা গেল মানুষ যে জল খায় তা পুকুরের, যে ঘরে থাকে তা ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার। আরো আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু। দেওয়া হল ঋণ সোসাইটি থেকে। বড় বড় জানালাযুক্ত ঘর তৈরি হল। মানুষই আস্তে আস্তে পরিশোধ করেছেন সেই ঋণ। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হল, যতটা সম্ভব। নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি হল হাসপাতাল। সারা ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিরক্ষর। পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা কিঞ্চিত আশাপ্রদ হলেও ... রকমের। শিক্ষা তখন অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও ... সমাজের যে অংশটি আজও রয়ে গেছে, শিক্ষা... তাদের প্রতিনিধিত্ব অকিঞ্চিৎকর। তবুও যারা ... ভর্তি হয় তাদেরও একটা বড় অংশ মাঝপথেই ছেড়ে ...। এই সব drop-outs এবং যারা স্কুলে যায় না ... খেলাধুলোর মাধ্যমে, চার্টের সাহায্যে মডেলের ... শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হল। উদ্দেশ্য মূলস্রোতে ... অপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে।

কথা হচ্ছিল সোসাই... কর্মী রবিন মণ্ডলের সঙ্গে। রাঙাবেলিয়ার পাশাপাশি ... মানুষও কেমন কখনও উৎসাহের সঙ্গে, কখনও ... যুক্ত হতে চেয়েছেন এই প্রকল্পের সঙ্গে।

এক থেকে দুই, এইভাবেই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা সমেত আজ ৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৬০০টি গ্রাম এই প্রকল্পের অধীনে এসে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চাইছে। লক্ষ্য সঠিক, উদ্যোগ, কুশল এবং সাধু থাকার জন্যই দেশ বিদেশের বহু সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, দেশের রাষ্ট্রপতি এখানে এসেছেন, নিয়মিত এসে থাকেন রাজ্যপালসহ বহু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, নবোত্তীর্ণ I.A.S. অফিসারেরাও ফি বছর আসেন একটি ২৫ লক্ষ জনগোষ্ঠীর ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা চাক্ষুস করার জন্য।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্ধিত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে সোসাইটির কাজকর্ম। জমির মালিক এখন চাষীই। ফলে মহাজনের ঋণশোধের সমস্যা প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হয়েছে একাধিক গ্রুপ কমিটি। সেই কমিটিই মোটামুটিভাবে স্থির করে দেয় কোন্ বছর কোন্ চাষী কী চাষি করলে আর্থিক দিক থেকে বেশি লাভবান হবে, প্রয়োজন হলে গ্রুপ কমিটি তার নাম সুপারিশ করে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ঋণদানের জন্য। গড়ে উঠেছে Agro Service Centre মাটি পরীক্ষাসহ কৃষি বিষয়ক নানা সাহায্য দিয়ে থাকে এই কেন্দ্র। পাওয়ার টিলারও হাতে এসে গেছে কারোর কারোর। ফলে মেকানিকরাও এখন অনেক স্বাবলম্বী। এবার আসা যাক মহিলা সমিতির কথায়। স্কুলের কাজের অবসরে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে অঞ্চল সমীক্ষায় গিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী বীণা কাঞ্জিলাল। পাশের আদিবাসী গ্রামের মেয়েরা তখন একটি কাপড়কে আধা আধি ভাগ

করে এক ভাগ পরে অন্য ভাগ কাচে। বীণাদির কাছে তারা আব্দার করে অন্তত আর একখানি করে কাপড় দেবার জন্য। সোসাইটি থেকে জোগাড় হয় কাপড়। তারা পরে বাঁচে, আস্তে আস্তে শোধও করে কাপড়ের দাম। প্রয়োজন উপলব্ধি করা গেল মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার। সেটা ১৯৭৬ সাল। প্রথম প্রতিষ্ঠাত্রী চেয়ারপার্সন শ্রীমতী বীণা কাঞ্জিলাল। মহিলাদের বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত রকম অবিচারের প্রতিবাদের লক্ষ্যে আর্থনীতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে, সর্বোপরি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষ হিসেবে, দেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের অধিকারকে যূথবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই পথ চলা শুরু হল মহিলা সমিতির। বীণা কাঞ্জিলালের অকাল প্রয়াণের পর বর্তমানে মহিলা সমিতির চেয়ারপার্সন প্রখ্যাত লেখিকা ও সমাজসেবিকা মহাশ্বেতা দেবী।

প্রাথমিকভাবে যে কাজ শুরু হয়েছিল হাঁস, মুরগি পালন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তা এখন আরও অনেক বিস্তৃত। বর্তমানে টেলারিং উইভিং, নিটিং, প্রিন্টিং, পোলট্রি, গার্ডেনিং, প্যারা ভেটেরেনারি ছাড়াও ডেয়ার কো-অপারেটিভ এবং বাল-ওয়াড়ি এঁদের দৈনন্দিন চর্চার বিষয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৭টি ব্লকের ৪৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৬০০টি গ্রাম মহিলা সমিতির বর্তমান কর্মক্ষেত্র। কতটা কার্যকরীভাবে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মহিলাদের মধ্যে এঁরা কাজ করেন তা বোঝা যায় যখন এবছর ২২ ফেব্রুয়ারি মহিলা সমিতির বার্ষিক সভায় সুন্দরবনের প্রতি কোণ থেকে প্রায় বিশ হাজার মহিলা সমবেত হন বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করার জন্য। জল জঙ্গলের সুন্দরবনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই অনুমান করতে পারবেন কী ভীষণ আকর্ষণ থাকলে তবেই এই বিশাল মহিলা জমায়েৎ সম্ভব। কোনও রাজনৈতিক দলের ডাকেও এই জমায়েৎ সম্ভব হলে তাঁরাও আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন। সত্যি কথা বলতে কী সেদিনের সভায় যোগ দেবার জন্য অনেককেই বেশ কয়েক মাইল পায়ে হেঁটে দীর্ঘ নৌকাযাত্রা করতে হয়েছিল। প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রামগুলি থেকে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে শিক্ষার্থীকে ৬মাসের আবাসিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকে এই সমিতি। প্রতি ব্যাচের ট্রেনিং বাবদ খরচ প্রায় ২ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ৪৫+৪৫ শতাংশ বা ৯০ শতাংশ। বাকি ১০ শতাংশ খরচ বহন করত সোসাইটি। সরকারি কারণে অনুদান বন্ধ হয়েছে কয়েক বছর। এই সময়টায় সোসাইটি ব্যয়ভার বহন করে এসেছে, শিক্ষার্থী পিছু মাত্র ৬০০ টাকার বিনিময়ে। প্রশিক্ষণ শেষে যে যার গ্রামে ফিরে যান মহিলারা। সেখানে তাঁরা এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে বেশ খানিকটা স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন। আছে মহিলা শিল্প কো-অপারেটিভ সোসাইটি, প্রশিক্ষণ শেষে আবার কেউ কেউ কর্মী হিসেবে যোগ দেন এঁদের উৎপাদন কেন্দ্রে। এই মুহূর্তে শিল্প কো-অপারেটিভ সোসাইটির উৎপাদন কেন্দ্রে কর্মরতা আছেন ৩০ জন। টেলারিংএর উৎপাদিত দ্রব্য, হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদিত দ্রব্য, মেসিন নিটিংএর উৎপাদন, বাটিক প্রিন্ট, বাঁধনি, সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টের উৎপাদন সমস্তই বাণিজ্যিক ভাবে হচ্ছে। আদতে মূল লক্ষ্য ছিল মহিলাদের স্বনির্ভরতার পাশাপাশি এলাকার গরিব মানুষদের কম পয়সায় পরিধেয় জোগান দেওয়া। এখন উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধির ফলে লক্ষ্য দিতে হচ্ছে বহির্বাজারের দিকে। চাহিদাও আছে এঁদের উৎপাদনের। বোলপুরের আমার কুটির সোসাইটি পশ্চিমবঙ্গ সমবায় মহিলা মহাসংঘ এঁদের উৎপাদনের বিক্রেতা। একসময় তন্তুশ্রীও এঁদের উৎপাদনের গ্রাহক ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে এরা এখন তন্তুশ্রীর ব্যাপারে হতাশ।

গার্ডেনিং পোলট্রি এবং প্যারা-ভেটেরেনারিতেও মহিলা সমিতি আয়োজন করেন প্রশিক্ষণের। গার্ডেনিং ও পোলট্রি-বিষয়ে আসন সংখ্যা ৩০ এবং প্যারা-ভেটেরেনারিতে আসন সংখ্যা ১০। প্রথম ২টি বিষয়ে ৩০জনই মহিলা এবং শেষেরটিতে ৪জন মহিলা শিক্ষার্থী। যেহেতু প্যারাভেটেরেনারিতে শারীরিক শক্তি এবং যত্রতত্র যাওয়ার সক্ষমতার প্রয়োজন সেহেতু মহিলাদের থেকে পুরুষ প্রার্থীরাই বেশি বিবেচিত হচ্ছেন।

আছে মহিলা সমিতি পরিচালিত মহিলা ডেয়ারি-কো-অপারেটিভ। এলাকার যে সমস্ত গোদুগ্ধ বাজার পায় না তা জমা হয় কো-অপারেটিভে। সেখানে হয় তা বিক্রির ব্যবস্থা। গো-মালিকদের পাশাপাশি কো-অপারেটিভের কর্মী মহিলারাও এতে উপকৃত হচ্ছেন।

দারিদ্র্য এমনই বিষম যে দেখা গেল সুন্দরবনের মায়েদের মধ্যে মাতৃস্নেহ লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষেত্রে, দেশের উন্নতির জন্য তা ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই বাল-ওয়াড়ি কেন্দ্র, যাকে আধুনিক আমরা খানিকটা বুঝি ক্রেশ বললে, গড়ে তুলেছে মহিলা সমিতি। সারা সুন্দরবনে এই রকম ২০টি বাল-ওয়াড়ি কেন্দ্র আছে এঁদের। ৩ থেকে ৬ বছরের প্রায় ৬০০টি

সুন্দরবনের নদীর তীরে দুস্থ মানুষের বসতি

টেগোর সোসাইটির উদ্যোগে মহিলা তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র — *ছবি : লেখক*

ছেলেমেয়ে আশ্রয় পেয়েছে এখানে। অবৈতনিক এই কেন্দ্রগুলিতে সঞ্চালক আছেন ৪০জন। প্রত্যেকের মাসিক ভাতা ২০০ টাকা। সামান্য হলেও টাকা আসে হাতে মহিলাদের। আর জেগে ওঠে তাঁদের ভেতরের ঘুমিয়ে পড়া মা। শিশুরা এখানে পায় বিভিন্ন ধরনের মডেল, খেলাধুলোর সুযোগ, পড়াশুনোর সরঞ্জাম আর সর্বোপরি-মায়ের আদর।

"আগে আগে গ্রামে মেয়েদের বিয়ে হলে মহিলা কর্মী হিসেবে আমাদের জুটত নিমন্ত্রণ, এখন আর নেমন্তন্ন করে না। অবশ্য তাতে আক্ষেপ নেই, আমরা বরং খুশিই" বলছিলেন মহিলা সমিতির কর্মী গৌরী খাটুয়া। কারণটা অ[illegible]ই খুশি [illegible]বে সকলকেই। মহিলা হিসেবে পণপ্রথা সরাসরি বিরুদ্ধ[illegible] [illegible]ন এঁরা। 'আসলে এটাই তো লক্ষ্য আমাদের। মেয়ের[illegible] কেড়ে নেবে প্রাপ্য সামাজিক সম্মান। মেয়েদের আয়[illegible]পাশি তাদের চেতনা ও বুদ্ধি ও বিকাশ ঘটুক এটাই [illegible] —বলছিলেন তিনি, আর তাই যখন জানা যায় সুন্দ[illegible] [illegible]ভীরতর সমস্যা বাঁধ ভাঙার সমস্যা তার মোকাবি[illegible] নিয়ে মহিলারাও এগিয়ে এসেছেন তখন মহিলা[illegible] [illegible]লেও আনন্দিত বোধ করেন।

চেতনা বৃদ্ধি এব[illegible] [illegible]ক্ষ্যে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক সংসদ। সংগঠনের কাজ[illegible] [illegible]রে গান বেঁধে তা নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রয়াতা বী[illegible]ষদের সঙ্গে মহিলারাও সমান উৎসাহে কণ্ঠ দেন কৃ[illegible]।

মহিলা সমিতি সম্প্রতি শুরু করেছেন দলভিত্তিক সঞ্চয়প্রকল্প। পাড়া বা গ্রুপ কমিটি তার সদস্যাদের কাছ থেকে সঞ্চয় হিসেবে টাকা জমা নেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে জমা হয় ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদী আমানত হিসাবে। ফলে সুদের হার বেশি থাকে। নির্দিষ্ট সময় পরে তা ফেরৎ যাবে সদস্যাদের কাছে গ্রুপ কমিটির মাধ্যমে। আবার বেশি ঋণ নেবারও সুযোগ থাকছে সদস্যাদের।

এবার আসা যাক বাসস্থান ও পানীয় জলের কথায়। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনে ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ২৫ বারের মতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১০০ কিলোমিটারের মতো। কিন্তু অন্তত পাঁচবার এই গতিবেগ হয়েছিল ঘন্টায় ২০০ কিলোমিটারের বেশি। এর সঙ্গে তিন থেকে ছয় মিটারের বেশি জলোচ্ছ্বাসের ফলে যেমন সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের, ৫৪টি জনবসতি পূর্ণ দ্বীপের প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার কাঁচা নদী বাঁধ বিপন্ন হয়েছে তেমন দরিদ্র কুটির লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। ঝড়ের এই তাণ্ডবের হাত থেকে বাসস্থান রক্ষা করতে CAPART-এর এবং বাস্তুকারদের সক্রিয় সাহায্যে সোসাইটি তৈরি করিয়ে দিচ্ছে বাড়ি। না, আমাদের অভ্যস্ত চোখের চার দেওয়ালের বাড়ি নয়। তৈরি হচ্ছে ছ'কোণা বাড়ি যাতে ঝড়ের আঘাতকে কমিয়ে দেওয়া যায়। আর পানীয় জলের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কোথাও বা ট্যাপ ওয়াটার আবার কোথাও বা গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল।

সরকারের সহযোগিতায় স্বল্প পয়সায় মানুষকে দেওয়া হচ্ছে স্যানিটারি প্যান।

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে সোসাইটি ইতোমধ্যেই স্থাপন করেছে ২০০টি বিদ্যালয়। যারা বিদ্যালয় মুখী নয় আর যারা বিদ্যালয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক সেই সব ছেলে মেয়েকে শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসাই এই Non Formal Education Scheme-এর লক্ষ্য। সময়কাল তিনটি পর্বে তিনবছর। মডেল, চার্ট এবং খেলাধুলোর সাহায্যে পড়াশুনোয় আগ্রহী করে তোলা এবং উপযুক্ত করে শিক্ষার মূল ধারায় ফিরিয়ে দেওয়াই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। আর যারা সত্যিই পারে না তাদের জন্য ব্যবস্থা আছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার। পরবর্তী জীবনে যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে মোট ৬৫৯৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনো করেছে এই ব্যবস্থায়। সম্প্রতি সোসাইটি Instructor এবং Supervisor-দের জন্য দুটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। Instructor-দের জন্য ১০ দিনের প্রশিক্ষণ এবং Supervisor-দের জন্য ১১ দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৮২টি গ্রামের ১১০ জন এই প্রশিক্ষণ শিবির দুটিতে অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আনন্দদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

একসময় সংসারের কাজের অবসরে যে চর্চা মহিলাদের শেখানো হচ্ছিল সেই পশুপালন বিষয়ে এখন আলাদা একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে Instruction Farm-এর। এখন সেখানে ১২ জন সর্বক্ষণের কর্মী কাজ করছেন। এই কার্মে বেশ কয়েকটি Unit আছে। যেমন ধরা যাক হাঁস মুরগি পালনের Unit এর কথা। পোলট্রি সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য সরবরাহ করার জন্য এবং প্রশিক্ষণ দেবার জন্য এঁরা সদা তৎপর। জল-জঙ্গলের সুন্দরবনে হাঁস পালনও বেশ অর্থকরী। সেই কথা খেয়াল রেখে সোসাইটি কার্মে পালন করছে খাঁকী ক্যামবেল হাঁস যে প্রজাতি সবথেকে বেশি ডিম দেয়। স্বল্প দামে তা বিক্রী করা হয়। এই জাতীয় পুরুষ হাঁস যাতে দেশি হাঁসের সঙ্গে শঙ্কর তৈরি করা যায়। এই শঙ্কর প্রজাতির হাঁস ও দেশী হাঁসের থেকে বেশি ডিম দেয়। পালন এবং সরবরাহ করা হয় সোভিয়েত চিঞ্চিলা জাতীয় খরগোশ। প্রত্যন্ত এলাকায় তা মাংসের চাহিদা পূরণ করে। মাংসের চাহিদা পূরণ করার জন্য, আদিবাসী অঞ্চলের কথা মাথায় রেখে, পালন করা হয় শুয়োর। তবে দেশি শুয়োর নয়, পালন করা হয় লার্জ হোয়াইট ইয়র্কশায়ার প্রজাতির শুয়োর। দেশি শুয়োরের ১ বছরের কাছাকাছি সময়ে যে ওজন হয় এদের ক্ষেত্রে সেটা হয় ১ থেকে ১$\frac{১}{২}$ মাসে। এই প্রজাতির শুয়োর ৩$\frac{১}{২}$ কেজি খাবার খেলে ১ কেজি ওজন বাড়ে। ৯ মাসে এদের গর্ভধারণ ক্ষমতা তৈরি হয়। গর্ভধারণ কাল ৩ মাস ৩ সপ্তাহ ৩ দিন। একসঙ্গে ১০ থেকে ১৪/১৫টি বাচ্চা হয়। এক বছর বয়সে এদের ওজন হয় মোটামুটি ৬০ কেজি। এলাকায় এই প্রজাতির শুয়োরের মাংসের চাহিদা বাড়ছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় এমনও মিষ্টির

সুন্দরবনের নদীতে মৎস্যজীবীদের প্রতিদিনের সংগ্রাম

টেগোর সোসাইটির সবুজায়ন প্রকল্প

দোকানের সন্ধান মেলে যাঁরা মিষ্টি তৈরী করেন গুঁড়ো দুধে। এই বাস্তব চিত্রটি সামনে রেখেই সোসাইটি এগিয়ে এসেছে মানুষকে গোবৎস পালনে উৎসাহ দিতে। দেওয়া হচ্ছে ডেয়ারি ট্রেনিং, ব্যবস্থা করা হয়েছে কৃত্রিম গো প্রজননের। তৈরি করা হচ্ছে জার্সি গরু এবং দেশি গরুর শঙ্কর। যাতে জার্সি গরু পালনের মতো খরচ না করেও দেশি গরুর থেকে বেশি দুধ পাওয়া যায়। এই সমস্ত পশুদের খাবারের জন্য আছে ফীড্ মিক্সিং ইউনিট, ফডার ফিল্ড। এখানকার পশু চিকিৎসকের মতে ঘাস চাষ করে যদি কোনও গরুকে ১০ কেজি ঘাস খাওয়ানো যায় তার ক্ষেত্রে ১ কেজি খাবার কম লাগে। ডোবা বা পুকুরের পাড়েও এই ঘাস চাষ করা যায়। এটা কিন্তু সত্যিই লাভ জনক। ৭টি গ্রামের ১১ জনকে নিয়ে সম্প্রতি একটি ১০দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরও হয়ে গেল। মুরগি এবং গরুর ক্ষেত্রে deworming, immunisation এবং আরও উন্নত শঙ্কর প্রজাতি শঙ্কর তৈরি নিয়েই ছিল এই প্রশিক্ষণ শিবির।

এই বিস্তীর্ণ এলাক[illegible] মানুষের জন্য সোসাইটি এখনও পর্যন্ত তৈরি করতে পেরেছে [illegible] স্বা[illegible]। এই কেন্দ্রে ডাক্তার আছেন তিনজন, ১৫টি বেড [illegible] এ[illegible]বহির্বিভাগে চিকিৎসা হয় মাসে কমবেশি ৫০০জনের। [illegible]কা[illegible]ববাবু অমিতাভ রায় চৌধুরীর কথায় এখানে সব ধ[illegible] রো[illegible]সন। এঁদের সকলকে সঠিক চিকিৎসা দেবার সুযো[illegible] কারণে। অন্যতম প্রধান কারণ বিদ্যুতের অনুপস্থিতি, [illegible]থং[illegible]জিক্যাল কোনও পরীক্ষা করা যায় না, রেফ্রিজারেটর [illegible] যা[illegible] লে ব্লাড ব্যাংক গড়ে ওঠেনি। তবুও আপৎকালীন ব[illegible]হিসে[illegible]স্থ্যকেন্দ্রেই রাখতে হয় এই সব রোগীকে। কারণ সুচি[illegible] আর সুন্দরবনের মানুষের মধ্যে ব্যবধান দুস্তরের, ক[illegible]র। তবে সোসাইটি বিগত অর্থনৈতিক বর্ষে সুন্দ[illegible] চিকিৎসা কেন্দ্রের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছে। [illegible]শক[illegible] লক্ষ্য ছিল ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকের সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই পর্যায়ে ৫০৫২ জন গর্ভবতী মহিলাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, ২৫০০ জনেরও বেশি গর্ভবতীর প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়, ১৯০০ জন টিটেনাস টক্সয়েডের প্রথম ডোজ্ এবং ১৭৩২ জন দ্বিতীয় ডোজ পান। এছাড়াও প্রচুর সংখ্যক শিশুকে BCG, DPT(I) এবং DPT(II) OPV(2) এবং (3) ছাড়াও MMR দেওয়া হয়েছে, মোট চিকিৎসা করা হয়েছে ২৯,৪৫৫ জনকে। তবে ডাক্তারবাবুর কথায় সুন্দরবনের এমন অনেক খাঁড়ি আছে যেখানে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের লঞ্চ ঢুকতে পারেনি। তাছাড়া নোনা হাওয়ায় অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সরকারি প্রকল্পটি উপর থেকে চাপিয়ে না দিয়ে যাঁরা সরাসরি কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সঙ্গে আগে আলোচনা করে নিলে উদ্যোগটি আগামী দিনে আরও সফল হতে পারে।

বোধহয় এইখানেই তফাৎ পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সঙ্গে এই প্রকল্পের। এখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবেশ তৈরি করা হয় না, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়। ফলে অংশগ্রহণ হয় স্বতঃস্ফূর্ত।

পরিশেষে বলতে হয় সোসাইটির সবুজায়ন প্রকল্পের বিষয়ে। যখন প্রায় বৃক্ষহীন শহরে, শহরতলীতে গাছ কাটা চলছে তখন গাছ লাগানো হচ্ছে সুন্দরবনে। পরিবেশমনস্ক সোসাইটির কর্মীদের মনে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন : শহরের মানুষের যান্ত্রিক ধোঁয়ার ফলস্বরূপ কেন আমরা জলের নীচে তলিয়ে যাবার অপেক্ষায় দিন গুণব? কেনই বা সুন্দরবনের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষিত হলেও অবহেলিত রয়ে যাবে সুন্দরবনের মানব সম্পদ?

লেখক পরিচিতি : রাজনৈতিক সহ সুন্দরবনের আর্থ-সামাজিক বিষয়ের উপর নিয়মিত লিখে থাকেন

গোপাল তাঁতী

সুন্দরবনের বাঘ—কিছু অজানা দিক

বাঘ, আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। বাঘের সঙ্গে আমাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক—কথায় বলে 'সাপের লেখা বাঘের দেখা' যার কপালে ঘটে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু এ সমস্ত প্রবাদবাক্য এখন আমরা মিথ্যে করে দিয়েছি। বাঘকে আমরা ভালবাসতে শিখছি। বাঘকে দেখতে বা বাঘের গল্প শুনতে ভীষণ আগ্রহ আমাদের। এই বিরল ও ভয়াল প্রাণীকে ভালোবাসি বলেই তো এর সম্বন্ধে বেশি করে জানতে ইচ্ছে করে। বাঘের খাদ্য, আবাসস্থল ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা সবাই অল্প বিস্তর জানলেও তার কিছু কিছু দিক আছে যা আমরা সবাই জানি না। সেই অজানা দিক নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই।

বাঘ ভারতে আগন্তুক প্রাণী। প্রাগৈতিহাসিক যুগে হিমবাহের ফলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে এবং খাদ্যের সন্ধানে সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে বাঘ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারই একটি দল মঙ্গোলীয়, চীন, বার্মা ইত্যাদি হয়ে উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সমুদ্রের অনেক ভেতরে অবস্থানের ফলে যেমন শ্রীলঙ্কাতে বাঘ যেতে পারেনি। তেমন আফ্রিকাতেও বাঘ আসতে পারেনি। সেজন্য ওসব দেশে বাঘের দেখা মেলে না। সিংহ ভারতের আদি জন্তু। কিন্তু উদ্বাস্তু বাঘের দৌরাত্ম্যে সিংহ আজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ভারতে কেবলমাত্র রাজস্থানের গির অরণ্যে সিংহ পাওয়া যায়। পশুরাজ সিংহের কাছ থেকে জাতীয় পশুর শিরোপা এখন বাঘ ছিনিয়ে নিয়েছে।

জীবজগতে মানুষ সবার উপরে। কিন্তু এই পৃথিবীতো শুধু মানুষের জন্য নয়, মানুষকে বাঁচতে গেলে তার পরিবেশ দরকার। সেই পরিবেশে যেমন গাছপালা থাকবে তেমনিই থাকবে পোকামাকড় থেকে আরম্ভ করে জীবজন্তু। বনে যদি জন্তু-জানোয়ার না থাকে তো পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে না।

এখন সুন্দরবনের বাঘ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুন্দরবনের আয়তন ছিল ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের অংশে সুন্দরবনের আয়তন বর্তমানে ৪২৬৪ বর্গ কিলোমিটার। যা সারা ভারতবর্ষের বাদাবনের ৬০% এরও বেশি। ১৯৭৩ সালে ২৫৮৫ বর্গ কিমি এলাকা নিয়ে তৈরি হয় ব্যাঘ্র প্রকল্প। যার মধ্যে ১৩৩০ বর্গ কিমি কোর এলাকা (নিষিদ্ধ এলাকা), ১২৫৫ বর্গ কিলোমিটার হল বাফার। ১৯৮৪ সালে কোর এলাকার ১৩৮০ বর্গ কিমি জাতীয় উদ্যানরূপে ঘোষিত হয়। পৃথিবীর আর কোনও বাদাবনে বাঘ নেই কেবলমাত্র সুন্দরবন ছাড়া ভারতে ২৫টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে সবথেকে বাঘ বেশি আছে।

সুন্দরবনের বাঘ মানুষখেকো এটা সবাই জানেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়: এদের মধ্যে যেমন হিংস্র ও ভয়ঙ্কর রূপ আছে, তেমনিই এরা সম্ভ্রম আদায় করতে জানে। এর ভয়াল সুন্দর মূর্তি, চেহারা, চলন, বলন সব কিছু আমাদের মুগ্ধ করে। সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যা দেখছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যে, সব বাঘ মানুষ খায় না। বহু ঘটনা আছে যে, রাত্রে লোকের বাড়িতে বাঘ ঢুকেছে। মাটির ঘরের দাওয়াতে ঘুমন্ত লোকের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে রান্নাঘরের বেঁধে রাখা ছাগল ধরেছে, কিন্তু ঘুমন্ত লোকেদের কিছু করেনি। যেমন কুমীরমারির অনন্ত বৈদ্যের বাড়িতে বাঘ ঢুকে ছাগল ধরেছে। কিন্তু ওদের কিছু বলেনি। তেমন—কুমীরমারি ভাঙনঘাটে বিমল মণ্ডলের বাড়িতে বাঘ ঢুকে ঘুমন্ত লোকের বিছানা টানাটানি করলেও ওদের কিছু বলেনি।

গত এপ্রিল' ৯১ একটি বাঘ সত্যনারায়ণপুর গ্রামে ঢোকে ভোর বেলা। কয়েকজন লোক বাঘ দেখে চিৎকার করে খালি হাতে তাড়া করে। বাঘটি কিন্তু পালিয়ে গিয়ে একটি গোয়ালঘরে আশ্রয় নেয়। যদিও সে গোয়ালের গরু তখন ছিল মাঠে। এই বাঘটি কিন্তু মানুষ ধরেনি বা ক্ষতি করেনি। এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। যাই হোক, সব বাঘ মানুষ খায় না এটা আমরা বুঝেছি। বিভিন্ন কারণে সুন্দরবনে মানুষ ঢুকছে। কেউ ঢুকছে বৈধ পথে জীবিকার সন্ধানে, কেউ ঢুকছে বেশি মুনাফার লোভে। যারা অবৈধভাবে যাচ্ছেন তারা
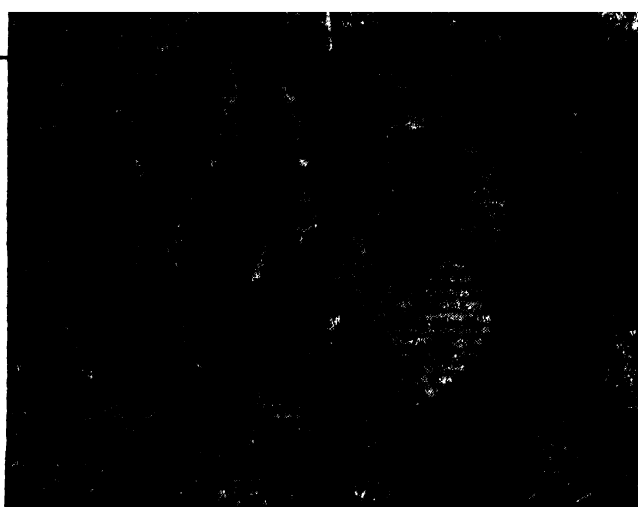
বাঘের পায়ের ছবি *ছবি : অঞ্জন খান*

ধরা পড়লে—কঠোর শাস্তি দানের বিধান আছে। তেমনিই যাঁরা প্রবেশপত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের যতটা নিরাপত্তা দেওয়া যায় সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেমন—যাঁরা মাছ, কাঁকড়া, মধু বা কাঠ সংগ্রহ করতে যান তাদেরকে, কিভাবে সুন্দরবনে চলাফেরা করতে হবে, সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয় যেমন, সকাল ৮টার পরে এবং বিকাল ৪টার আগে পর্যন্ত জঙ্গলে নামতে পারা যাবে। সব সময় ডান কাঁধে লাঠি ধরতে হবে এবং দলবদ্ধভাবে নামতে হবে সর্তক দৃষ্টি রেখে। এছাড়া আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যেমন ডামি বা নকল মানুষের গায়ে বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে রাত্রিবেলা যে সব এলাকাতে বাঘ বেশি বেশি মানুষ ধরছে সেখানে এমনভাবে রাখা হয় যে, বাঘ ওটা মানুষ ভেবে আক্রমণ করলে বৈদ্যুতিক শক্ লাগবে তাহলে পরবর্তীকালে ওই বাঘ আর মানুষ ধরতে সাহস দেখাবে না। আরও একটি বিষয় হল মুখোশ রবারের তৈরি, অবিকল মানুষের মুখ। জেলে, মৌলে বা কাঠুরেদের মাথার পিছনে ঠিক ঘাড়ের উপরে গার্ডার দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। কারণ, যতগুলি দুর্ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সবগুলিতে দেখা গেছে যে বাঘ পিছন দিক দিয়ে অতি সন্তর্পণে নিজেকে লুকিয়ে সেই মানুষটিকে আক্রমণ করেছে। তাই পিছনে মুখোশ থাকা মানে বাঘ ভাববে যে, এটা বোধ হয় সামনের দিক, আর ওই লোকটা আমায় দেখে ফেলেছে। সুতরাং এখন আক্রমণ করতে গেলে নিজেরও বিপদ আছে। তখন ওই বাঘ নিজের গোপনীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং মানুষের আসল-সামনের দিকে যেতে চেষ্টা করে ও গাছ পাতায় নিজের অসাবধানতার পদক্ষেপে শব্দ করে ফেলে। আর তখন ওই মানুষটি সচেতন হয়ে যায়। বাঘ আসছে মনে করে তৈরি হয় নিজেদের বাঁচাতে।

সরকার বিনা পয়সায় মুখোশগুলি দিয়ে তা পরা বাধ্যতামূলক করলেও অনেক সময় দেখা যায় জেলেরা তা ব্যবহার করছে না। তার কারণ, জানা গেছে যে, মুখোশ ব্যবহার করলে বনের দেবী বনবিবিকে অসম্মান করা হয় বা অবিশ্বাস করা হয়। তার ফলে তিনি রুষ্ট হতে পারেন। এই জন্যে মুখোশ পরতে ওরা নারাজ।

এগুলি হল জঙ্গলে যাওয়া মানুষদের জীবন রক্ষার বিষয়। কিন্তু বাঘকে কিভাবে, কতটা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা যায়, সেটাই হল মূল কথা। প্রাকৃতিক পরিবেশে অবাধে, নির্ভয়ে যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে সেটাই সুনিশ্চিত করা।

সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আকার আয়তনে, অন্য জায়গার বাঘের তুলনায় ছোট হলেও ক্ষিপ্রতায়, বুদ্ধিমত্তায় বা চতুরতায় অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে। এদের শিকার ধরার অপূর্ব কৌশল বিস্ময় সৃষ্টি করে। অনেক সময় বাঘ সুন্দরবন থেকে নদী পেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে, ফলে গ্রামবাসিদের মধ্যে—আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার পরে অলিখিত কারফিউ জারি হয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে বাঘ গ্রামের অনেক ভেতরে যাওয়ার ফলে বা কোনও গোয়ালঘরে ঢুকে

ঘুমপাড়ানি বন্দুকের সাহায্যে আমি যতগুলি বাঘ ধরেছি এবং পরে ছেড়ে দিয়েছি (জঙ্গলে/চিড়িয়াখানায়) তার একটা চিত্র নিচে দেওয়া হল—

সংখ্যা	[illegible]	বাঘ ধরার স্থান	ঘুমিয়ে থাকার সময়	মন্তব্য
১.	৬.[illegible] ০০	হিরণ্ময়পুর ঝাড়খালি, বাসন্তী।	২ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
২.	২৩[illegible]-০০	সজনেখালি	৩-১৫ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৩.	৯.[illegible]-০০	দত্তর	২-৩০ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৪.	২৯[illegible] ০০	লাহিড়ীপুর	২-৪৫ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৫.	১[illegible] ৩০	কুমীরমারি	২-০০ ঘন্টা	চিড়িয়াখানায় দেওয়া হয়েছে।
৬.	৬.[illegible] ৭-০০	দয়াপুর	২-১৫ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৭.	২[illegible] ৮-০০	ঝিঙাখালি	৩-০০ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৮.	১[illegible] ৩-০০	নেতিধোপানি	১২-০০ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
৯.	২[illegible]-০০	হেমনগর	২-১৫ ঘন্টা	চিড়িয়াখানায় দেওয়া হয়েছে।
১০.	১[illegible] ৫-০০	কুমীরমারি	০-৪৫ ঘন্টা	চিড়িয়াখানায় দেওয়া হয়েছে।
১১.	২[illegible] ১০-৩০	সত্যনারায়ণপুর	১-৩০ ঘন্টা	জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

● ঘুমপাড়ানি গুলিতে ধরা বাঘকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে

● রয়েল বেঙ্গল টাইগার

● ঘুমপাড়ানির পর পশুচিকিৎসক পরীক্ষা করছেন

● ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়ার প্রশিক্ষণ

● সুন্দরবনের বিলাসবহুল লঞ্চ

● সুন্দরবন ভ্রমণার্থী

ছবি : কুমুদরঞ্জন নস্কর

● সুন্দরবন ভ্রমণে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী

বাঘের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে [illegible] পেছনে মুখোশ

হল ঘুমপাড়ানি বন্দুকের সাহায্য। আগে আমাদের দেশে এই প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল না। বিদেশের লোকজন এই কাজ করতেন। এখন এই সব কাজে আর বিদেশিদের সাহায্য নিতে হয় না। আমরাই এই কাজগুলি করছি। ঘুমপাড়ানি বিষয় কী? কোনও জন্তুকে ধরতে হলে এতদিন যে যে পদ্ধতি নেওয়া হত যেমন, ফাঁদপাতা, জাল দিয়ে ধরা বা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে উলটো দিক দিয়ে তাড়িয়ে ওই গর্তে ফেলে ধরা ইত্যাদি। তাও জন্তুটির পক্ষে মারাত্মক ছিল শুধু তাই নয়, কোনও কোনও সময় ওই জন্তুটির মৃত্যুও হত। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পুরনো পদ্ধতির দরকার হয় না। বন্দুকের সাহায্যে ওষুধ প্রয়োগে বন্য জন্তুকে অজ্ঞান করে ধরা। এরই নাম ঘুমপাড়ানি। যে কেউ এ কাজ করতে পারবে না। এর জন্য চাই যথেষ্ট দক্ষতা ও সঠিক প্রশিক্ষণ।

১৯৮২ সালে মধ্যপ্রদেশের কান্‌হা ন্যাশানাল পার্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে শুধু সুন্দরবনে বাঘ নয়, আমাকে সারা পশ্চিমবঙ্গে বনে-জঙ্গলে দৌড়তে হয়, কখনও হাতি কখনও বা গন্ডার, বাইসন ধরার প্রয়োজনে। এটা কিন্তু এক প্রকার শিকার। শিকারীরা শিকার করেন তাকে মারার জন্য। আর আমরা করছি জন্তুটির বাঁচার পক্ষে যেটি অন্তরায় হয়েছিল—তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে।

আগেই বলেছি যে, সুন্দরবনের বাঘ মাঝেমধ্যে লোকালয়ে চলে আসে এবং বিভিন্নভাবে আটকে পড়ে। তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা না নিলে জনরোষে অনেক সময় ওই বাঘের জীবনহানি ঘটে। তাই কোথাও বাঘ ঢুকেছে শুনলেই—সেইখানে যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে। বাঘের চেহারা, ওজন, বয়স ইত্যাদি দেখে বিচার করতে হয় যে, কতটা পরিমাণ ওষুধ লাগবে।

পড়লে আটকে যায়, সহজে আর জঙ্গলে ফিরতে পারে না। তখন সেই বাঘটির জীবন রক্ষা করা যেমন কর্তব্য তেমনিই গ্রামবাসীদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেটাও নিশ্চিত করা দরকার। সাধারণভাবে বাঘ গ্রামে চলে এলে গ্রামবাসীদের সাহায্যে হই-হল্লা, মশাল জ্বালিয়ে বা পটকা ফাটিয়ে বনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি কোথাও আটকে যায়, সহজে বনে ফেরানো সম্ভব না হয়, তখন অন্য পদ্ধতি নিতে হয়। সেটা

ব্যাঘ্র গণনার কাজ চলছে

ছবি : পি সান্যাল

দ. ২৪-প.-৩১

আগেই বলেছি যে, এটা এক প্রকার তরল ওষুধ। ডাক্তারি সিরিঞ্জের মধ্যে রেখে এক বিশেষ ধরনের বন্দুকের সাহায্যে ছুঁড়ে কোনও জন্তুর শরীরে প্রবেশ করালে ওই জন্তুটি কিছুক্ষণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তেমনিই বাঘের ক্ষেত্রে যে ওষুধটি ব্যবহার করা হয় সেটা হল—'ক্যাটাসেট' (Ketaset)। এই গ্রুপে আরো অনেক ওষুধ আছে যেমন ক্যানানেস্ট, ক্যাটাভেট, ইমালজেন্ ইত্যাদি। এখানে বলে রাখা দরকার হাতি, গন্ডারের ক্ষেত্রে অন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কারণ এরা হল তৃণভোজী। আর বাঘ হল মাংসাশী প্রাণী। একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘকে ধরতে হলে Ketaset ওষুধের মাত্রা হল প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম। সাধারণভাবে সুন্দরবনের একটি বাঘের ওজন ধরা হয় ১০০ কেজি। তাই এ ১০০ কেজি বাঘের জন্য ওষুধ লাগবে ১০০×১০=১০০০ মিলিগ্রাম। (এই ওজনের একটু তারতম্য হতে পারে) ওই পরিমাণ ওষুধ একটি ধাতব সিলিন্ডারের মধ্যে নিয়ে যার এক দিকে লাগানো প্লাস্টিকের পালক এবং ভেতরে ছোট একটি গুলি দিয়ে পরে একটি সূঁচ লাগিয়ে বন্দুকের নলের ভেতরে রেখে দূরত্ব অনুযায়ী আরও একটি গুলির সাহায্যে জন্তুটির যেখানে মাংসপেশী বেশি সেই জায়গাতে বিঁধতে পারলে ৫/১০ মিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন তাকে খাঁচায় ভরে আবার গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়, অথবা যদি প্রয়োজন হয় তো চিড়িয়াখানাতে পাঠানো হয়। আমি আজ পর্যন্ত সুন্দরবনের ১১টা বাঘকে ধরেছি। সেগুলিকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের ভিতরে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেইরকম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর বা উত্তরবঙ্গে কখনও হাতি, কখনও বা গন্ডারকে এইভাবে ধরতে হয়েছে চিকিৎসার প্রয়োজনে অথবা সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে।

বাঘকে বোকা বানাতে মানুষের জামি *ছবি : লেখক*
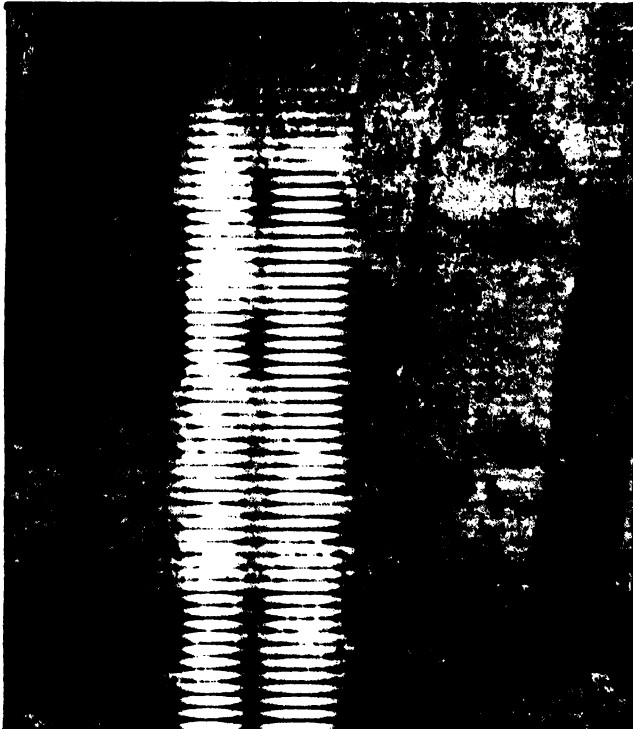
আত্মরক্ষার জন্য জেলেদের মাথার পেছনে মুখোশ *ছবি : লেখক*

গত ১৯৯৭ সালের ব্যাঘ্রশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বাঘের সংখ্যা ৩৬১। গত বারো-চোদ্দ বৎসর বাঘের সংখ্যা ৩৫০-এর ধারে কাছে রয়েছে। বিগত ৪টি ব্যাঘ্রশুমারি অনুযায়ী সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের সংখ্যা ছিল, ২৬৯, ২৫১, ২৪২, (২৫৪-২৬৯)। এ বছরের শেষ দিকে সুন্দরবনে ব্যাঘ্রগণনা হতে চলেছে। আশা করা যায় বাঘের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।

জীবজগতে মানুষ সবার উপরে। কিন্তু এই পৃথিবীতো শুধু মানুষের জন্য নয়, মানুষকে বাঁচতে গেলে তার পরিবেশ দরকার। সেই পরিবেশে যেমন গাছপালা থাকবে তেমনিই থাকবে পোকামাকড় থেকে আরম্ভ করে জীবজন্তু। বনে যদি জন্তু-জানোয়ার না থাকে তো পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে না। বন্যেরা তো বনেই সুন্দর। কিন্তু আজ বিপুল জনসংখ্যার চাপে এবং কিছু অর্থলোভী লোকের আগ্রাসনে শুধু সুন্দরবন নয়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর বনজঙ্গল ধ্বংস হতে চলেছে। সুখের বিষয় এই যে, এখন সাধারণ মানুষ অনেকটা সচেতন হয়েছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ যাতে সুরক্ষিত থাকে সে ব্যাপারে কাজকর্ম করছেন। তবে সেই কাজকর্ম বেশিরভাগটা হচ্ছে শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে না পারলে গ্রামের মানুষ সচেতন না হলে জঙ্গল রক্ষা করা যাবে না। সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সাধারণ মানুষকে বেশি বেশি করে যুক্ত না করতে পারলে জঙ্গলকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

লেখক পরিচিতি: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত রাজ্য সরকারের ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মী এই লেখক ঘুমপাড়ানি বন্দুকের সাহায্যে সুন্দরবন সহ ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলে ও লোকালয়ে বাঘ, হাতি ও গন্ডার ধরার জন্য ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। লেখক নিজেই দক্ষিণ ২৪-পরগনার অধিবাসী।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

সুন্দরবন ভ্রমণার্থীদের কাছে অবশ্য পাঠ্য

লেখক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন সেই সমস্ত "হতভাগ্য চোরা কাঠুরেদের, সামান্য নুন ভাত সংগ্রহ করার জন্য বনে কাঠ চুরি করতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে, যে অসংখ্য মৌলে...... যে সব জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে, তাদের অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশে"....লেখক কেবল অরণ্যকে ভালবাসেননি, বাঘের হাতে মৃত অসহায় ক্ষুধার্ত চোরা কাঠুরে জেলে মৌলেদের স্মরণ করেছেন।

নীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পেশা ছিল স্কুলে শিক্ষকতা। কিন্তু অরণ্য ভ্রমণের নেশায় সুন্দরবন থেকে সোনাই রুপাই অরুণাচলের জঙ্গলে, সমগ্র বিহার ওড়িশার জঙ্গল থেকে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান তথা দক্ষিণভারতে কোনও জঙ্গলই তাঁর ভ্রমণ-সূচিতে বাদ পড়েনি। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে বৃদ্ধ বয়সে এখনও তিনি ঘুরে বেড়ান বনে-জঙ্গলে অদম্য উৎসাহে।

অরণ্যপ্রেমিক নীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অরণ্য থেকে অরণ্য (প্রথম খণ্ড) বাস্তব অভিজ্ঞতায় রচিত একটি অসামান্য ভ্রমণ সাহিত্য। অরণ্য প্রীতির সাক্ষর রেখেছেন এমন গল্পকার উপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে অভাব নেই, কিন্তু নিছক ভ্রমণের আনন্দে অরণ্যকে ভালবেসে আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ শ্রীভট্টাচার্যের মতন খুব বেশি দেখা যায় না।

প্রকৃতিপ্রেমিক ভ্রমণার্থীদের কাছে সুন্দরবন কোনদিনই কুলীন হয়ে উঠতে পারেনি, যেমন হিমালয় দার্জিলিং, পুরী এমনকি সেদিনের দীঘাও। আসলে পর্বত ও সমুদ্রের তুলনায় অরণ্য সভ্যমানুষের কাছে অনাদর ও উপেক্ষা পেয়ে এসেছে এতদিন। ইদানীং পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে ভারতের কিছু অরণ্য সংরক্ষিত করে, কয়েকটিতে ন্যাশনাল পার্কের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বাংলো ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে অরণ্যের প্রতি ভ্রমণকারীরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। অবশ্য তাঁদের পর্যটনসূচিতে সুন্দরবন এখনও সকলের নীচে। এর কারণ সুন্দরবনের দুর্গমতা, পর্যটনের সুযোগ-সুবিধায় অপ্রতুলতা। আরও একটি অন্যতম কারণ সম্ভবত ভ্রমণকারীদের কাছে সুন্দরবন সম্পর্কে ধারণার অস্বচ্ছতা। বহুদিন যাবৎ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সাধারণের কাছে সুন্দরবনকে তুলে ধরার সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। নীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এই গ্রন্থ সুন্দরবন সম্পর্কে অনেক কৌতূহল নিরসন করবে এবং সুন্দরবন ভ্রমণে পর্যটকদের উৎসাহিত করবে।

লেখক একাধিকবার সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে রাত্রি যাপন করেছেন। ডাকাত, হিংস্র শার্দুল ও বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর। তাঁর কথায় 'এই গল্পের প্রতিটি ঘটনাই সত্য ও আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা।' তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছে অরণ্যপ্রীতি, তেমনই প্রকাশিত হয়েছে অরণ্যজীবী দরিদ্র মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিও। আবার যারা চোরা শিকার করে অরণ্যের শান্তি সৌন্দর্য নষ্ট করে, অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় জঙ্গলের নিরীহ জীবজন্তু হত্যা করে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

লেটার প্রেসে সাধারণ কাগজে সাধারণভাবে ছাপা গ্রন্থটি কিন্তু অসাধারণ। প্রতিটি ভ্রমণপ্রিয় ব্যক্তির অবশ্যই পাঠ করা উচিত, বিশেষ করে যাঁরা সুন্দরবন ভ্রমণের কথা ভাবছেন, সুন্দরবন অরণ্য সম্পর্কে কৌতূহলী।

অরণ্য থেকে অরণ্য (প্রথম খণ্ড)
নীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রকাশক ও পরিবেশক : নীতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
পোঃ, গ্রাম—কোদালিয়া
এন এস বসু রোড, (দক্ষিণ) চব্বিশ পরগনা
মূল্য—৪০ টাকা

দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার ইতিবৃত্ত

প্রথমেই গ্রন্থকারকে সাধুবাদ জানাই এই রকম বহু আয়াসসাধ্য এবং গবেষণালব্ধ একখানি ইতিহাস গ্রন্থ আমাদের উপহার দেবার জন্য। গ্রন্থটি পাঠ করলে বোঝা যায় এজন্য তাঁকে বিস্তর পড়াশোনা করতে হয়েছে, বহু ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে এবং ভাবতে হয়েছে প্রচুর। লেখক শুধু পুস্তক নির্ভর না হয়ে সরেজমিনে ক্ষেত্রানুসন্ধানে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থেকেছেন। এই রকম নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং শ্রমশক্তি আজকাল বড় দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থকার বয়স্ক মানুষ (জন্ম ১৯৪০খ্রিঃ)। ঘোর সংসারী, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে। সম্প্রতি মর্মান্তিক পত্নী বিয়োগের ব্যথা বুকে চেপে নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন শেকড়ের সন্ধানে। কেবল এই গ্রন্থই নয় ইতিপূর্বে আরও দুখানি গ্রন্থ 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ' ও 'নীল সাগরকে বলি' (কবিতা গ্রন্থ) ইনি প্রকাশ করেছেন। আলোচনা গ্রন্থটিতে ১৬টি অধ্যায় আছে। সবগুলি 'বিস্মৃত অধ্যায়ে'র পর্যায়ভুক্ত না হলেও আলোচনার অবকাশ আছে। কারণ গ্রন্থটি মূলত পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত। গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীণভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে অধ্যায় অনুযায়ী করা দরকার এবং সেই চেষ্টাই করব। ভূমিকা, অবতরণিকা ও প্রাক্-কথনের মধ্যে যে রচনাটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ রেবতীমোহন সরকারের অবতরণিকা। সন্দর্ভটি যুক্তি প্রমাণে-বিশ্লেষণে ঋদ্ধ এবং বহু অনুশীলনে উপলব্ধ। তবে তিনি Folk Lore কে Cultural Fossils বলেছেন—এটি সুপ্রযুক্ত হয়নি কেননা 'ফসিল' মৃত আর ফোক্ লোর প্রবহমান। 'ধর্মনগরের ভূ-তাত্ত্বিক প্রাচীনত্ব অধ্যায়ে' গ্রন্থকার ধর্মনগরের ভূ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের সন্ধানে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং সন্দেহ নেই অনেক মূল্যবান তথ্য উপহার দিয়েছেন। এ কাজটা বড় কঠিন এবং দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, তবুও যেটুকু হয়েছে তাও কম মূল্যবান নয়। মন্দিরতলার মন্দির-শিল্প অধ্যায়টি যথাযথ। এই অধ্যায়টির পরের অধ্যায় হল লোক-ওষুধের ক্রমবিবর্তন। তবে [illegible] চব্বিশ পরগনা ছাড়াও লোক-ওষুধের প্রচলন অন্যত্রও আছে [illegible] এই [illegible]টিতে অনুক্ত। এই অধ্যায়টিতে যে চরণামৃত পানের [illegible] তা মূলত এক রাসায়নিক ওষুধ বিশেষ। আর প[illegible] গো-মূত্র পান থেকে মানুষের স্বমূত্র পানের সূত্রপাত [illegible] পান আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত। অন্তর্জ[illegible] প্রভৃতি কথাগুলিরও এখানে সঠিক প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় [illegible] চব্বিশ পরগনায় জৈন ও বৌদ্ধধর্ম' অধ্যায়ের আলো[illegible] জেলায় জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা। গ্রন্থক[illegible]ত ও চমকপ্রদ আলোচনা করেছেন এ বিষয়ে। বৌদ্ধধর্মের শ্রেণীবৈষম্যহীন উদার বাণী, সহজসাধনা, সমাজের অধিকাংশ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল—বিশেষ করে নিম্নবর্গের মানুষদের। আর জৈনধর্ম বাংলায় প্রথম প্রবেশ করেছিল বর্ধমান জেলায়—এ কথা লেখক ঠিকই বলেছেন। যদিও অধ্যায়টিতে দু-চারটি ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি রয়েছে, তবুও অধ্যায়টি গ্রন্থকারের অসাধারণ পরিশ্রম, প্রভূত প্রজ্ঞার পরিচায়ক। অধ্যায়টি ভবিষ্যতে বহু গবেষকের সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি। 'লোকায়ত জীবনের প্রধান দুটি উৎসব' অধ্যায়টিতে বহু পরিশ্রমে শ্রীমণ্ডল জেলার মধ্যকার দুটি আবশ্যিক উৎসব ও অনুষ্ঠানের সন্ধান দিয়েছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। পরবর্তী 'স্বাধীনতা সংগ্রামে লোকায়ত সমাজ' অধ্যায়ে শুধুমাত্র লোকায়ত সমাজ বলা হল কেন? এই অধ্যায়ে লোকায়ত সমাজ ও স্বাধীনতা পর্যায়ের সমাজ বিবর্তনের বিশ্লেষণটা পড়লে সামগ্রিকভাবে মনে হয় লেখক একপ্রকার শ্রেণীচেতনায় মগ্ন। জাত-পাতের সংকীর্ণতায় রোগাক্রান্ত কিছু মানুষ সব দেশে, সব জাতির মধ্যে ছিল বা আজও আছে। আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সংগ্রামের আরও ইতিহাস আছে—সুর বিস্তৃত। যাই হোক যেটুকু দিয়েছেন তাও প্রশংসার্হ। গবেষকরা অনেক খোরাক পাবেন। পরবর্তী 'এ কোন দেবীমূর্তি' অধ্যায়ে লেখকের তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস প্রশংসার্হ। 'পুরুকাইত চকের শক্তি শিবলিঙ্গ' অধ্যায়ে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া গেল। গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলো হল 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাতত্ত্ব ও সাহিত্য', 'ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কলকাতা', 'কপিল মুনির সাগর', দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ধর্মঠাকুর'। অধ্যায়গুলিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বহু তথ্যসমৃদ্ধ এবং বহু আয়াসসাধ্য। শেষ দুটি অধ্যায় হল : 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাতাত্ত্বিক কার্যক্রম' ও 'প্রস্তরযুগের আঙিনায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা'। এই অধ্যায় দুটিও তথ্যসমৃদ্ধ। আর ইতিহাসের শেষ কথা বলে কিছু নেই। পরিশেষে বলি, এই গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতির কাজের সঙ্গে ব্যাপৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন এবং এঁদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে সব বিবরণ দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। লেখককে ধন্যবাদ। গ্রন্থটিতে বিন্যাসে কিছু ত্রুটি এবং বর্ণশুদ্ধি রয়েছে। তা সত্ত্বেও গবেষকগণের কাছে এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকজীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি জানতে আগ্রহী ব্যক্তিগণের কাছে এ বই অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য।

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্মৃত অধ্যায়
কৃষ্ণকালী মণ্ডল
প্রকাশিকা মল্লিকা মণ্ডল
পরিবেশক-নবচলন্তিকা
মূল্য—৮০ টাকা